মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
রচনাসমগ্র

ষষ্ঠ খণ্ড

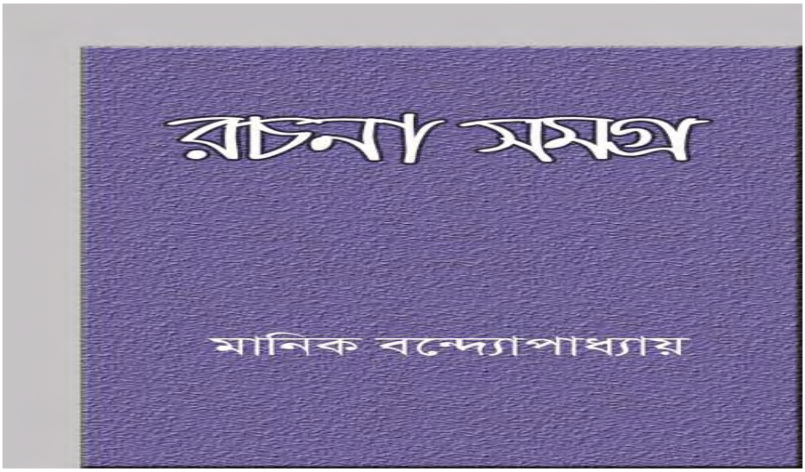

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

গ্রন্থস্বত্ব শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায ও
তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN 81-86908-66-8 (Set)
ISBN 81-7751-025-8

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : ষষ্ঠ খণ্ড

নিবেদন
আদায়ের ইতিহাস ৯
খতিয়ান ৪৫
খতিযান ৪৭
ছাঁটাই রহস্য ৫২
চক্রান্ত ৬১
গুন্ডামি ৭৩
কানাই তাঁতি ৮০
চোরাই ৮৫
চালক ৯২
টিচার ৯৮
ছিনিয়ে খায়নি কেন ১০৪
একান্নবর্তী ১১০
ছোটোবড়ো ১১৭
ভালোবাসা ১২১
তথাকথিত ১২৩
ছেলেমানুষি ১৩০
স্থানে ও স্তানে ১৩৮
স্টেশন রোড ১৪৪
পেরানটা ১৫১
দিঘি ১৫৬
হারাণের নাতজামাই ১৬১
ধান ১৬৯
সাথি ১৭৬
গায়েন ১৭৯
নব আলপনা ১৮৫
ব্রিজ ১৯০
মাটির মাশুল ১৯৫
মাটির মাশুল ১৯৯
বক্তা ২০৯
ঘর ও ঘরামি ২১৪
পারিবারিক ২১৯
ট্রামে ২২৪
ধর্ম ২২৮

দেবতা ২৩৩
ভয়ংকর ২৩৮
আপদ ২৫০
পথান্তর ২৫৪
সিদ্ধপুরুষ ২৫৮
হ্যাংলা ২৬৩
বাগদিপাড়া দিয়ে ২৬৭
ছোটোবকুলপুরের যাত্রী ২৭১
ছোটোবকুলপুরেব যাত্রী ২৭৫
মেজাজ ২৮১
প্রাণাধিক ২৮৬
ঘর করলাম বাহির ২৯৪
সখী ২৯৭
নিচু চোখে দু আনা আর দু পয়সা ৩০৩
নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা ৩০৯
জীয়ন্ত ৩১৩
গ্রন্থপরিচয় ৪৬১
পরিশিষ্ট : বর্জিত পাঠ ৪৯৭
মাটী ও জীয়ন্ত
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনপঞ্জি ৫৩৩

চিত্রপরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সূচনা পৃষ্ঠা
আদায়ের ইতিহাস প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১১
চক্রান্ত গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ৬৭, ৭২
ছোটোবড়ো প্রথম সংস্করণের হাফটাইটেল ১১৯
ছেলেমানুষি গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ১৩৩
মাটির মাশুল প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৯৭
দেবতা গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ২৩৪
ছোটোবকুলপুরের যাত্রী প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ২৭৩
জীয়ন্ত প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ৩১৫
জীয়ন্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ৪২৩
ধানের গোলার ধান গল্পের শিরোনাম চিত্র ৪৯৬
মেজাজ গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ৫৩০-৫৩২

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল-নিমীলিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাঁকে দাবি করা হলেও তাঁর সাহিত্যে অতিরিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিক্যের বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ-ব্যাধি তাঁর সাহিত্য-শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ রহস্যময় রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, দারিদ্র্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুরারোগ্য ব্যাধি সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক-সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক-মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তাঁর রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক-সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একপ্রস্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক-পরিবার ও গ্রন্থালয়-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক-রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমত্যে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য, গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান-পরিবর্তন, প্রথম যুগের প্রকাশকদের অন্যমনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছুকিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে, বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল উদ্রেককারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তায় এবং সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক-সাহিত্যের এক আদর্শ-পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ। প্রথম পাঁচটি খণ্ড প্রকাশের পরে সমস্ত মহল থেকেই প্রশংসা পাওয়া গেছে। ষষ্ঠ খণ্ডও প্রকাশিত হল সময়সূচি রক্ষা করেই। ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

সচিব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
উপ মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅংশু শূর
শ্রীনিমাই ঘোষ

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগাব
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
বরানগর পিপলস লাইব্রেরি
বয়েজ ওন লাইব্রেরি
হিরণ লাইব্রেরি
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
প্রবর্তক সংঘ, সিঁথি
শ্রীপ্রভাতকুমার দাস
শ্রীঅশোক উপাধ্যায়
শ্রীগৌতম ঘোষ
শ্রীঅনিলকুমার সিংহ
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীআশিস হাজরা
শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা
শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীকবীর সেনবরাট
শ্রীমতী ঈশানী মৈত্র
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী অপর্ণা দাস
শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদাব

জন্ম ১৯ মে ১৯০৮

মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

আদায়ের ইতিহাস

আদায়ের ইতিহাস প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

এক

বৈশাখ মাসে ত্রিষ্টুপের জন্ম হয়েছিল। ছাব্বিশ বছর পরে বৈশাখ মাসেই একদিন তার খেয়াল হইল, এ পর্যন্ত জীবনে সে পাওয়ার মতো কিছুই পায় নাই।

সে দিনটা তার জন্মদিন নয়। জীবনের সর্বপ্রথম কান্না সে কোন মাসে কাঁদিয়াছিল, এটা তার জানা ছিল বটে ; কিন্তু তারিখের কোনো হিসাব ছিল না। হিসাব থাকিলে জন্মদিনে মানুষ জন্মমৃত্যুর দুর্বোধ্য রহস্যের কথা হয়তো একটু ভাবে, মনের এলোমেলো খাপছাড়া দার্শনিকতার কষ্টিপাথরে জীবনের দাম কষিবার সাময়িক ইচ্ছাও হয়তো একটু জাগে। ও সব সমস্যা নিয়া ত্রিষ্টুপ আজ মাথা ঘামাইতে বসে নাই। সাধারণ হিসাবে এমন কিছু ঘটেও নাই যে, মনটা তার খারাপ হইয়া যাইবে এবং মনে হইবে এ জগতে সবই ফাঁকি আর জীবনটা তার একদম ফাঁকা। আসলে সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া তখন সে সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

তবে রাত্রে সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বড়োই খাপছাড়া অদ্ভুত স্বপ্ন। তার ছেলেটি যেন মরিয়া গিয়াছে। ছেলের শোকে সে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব টিটকারি দিয়া তাকে বলিতেছে, তার মতো মানুষের কি ছেলের জন্য শোক করা উচিত। স্বপ্নে সে অবশ্য সকলের মনের ভাবটা চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছিল। ছেলের শোকে পাছে সে পাগল হইয়া যায় অথবা সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় সকলে তার শোককে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতেছিল।

উদ্দেশ্য খুব ভালো সন্দেহ নাই। স্বপ্নে সে কারও উপর রাগ করে নাই, শুধু একটু সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া শোকের প্রকাশটা আরও জোরালো করিয়া তুলিয়াছিল। কেমন করিয়া সকলকে সে বুঝাইয়া দিবে যে, তারা ভুল করিতেছে, এ ভাবে তার শোক শান্ত করা যাইবে না ; সকলে তার সঙ্গে একটু কাঁদিলেই বরং তার ব্যথা জুড়াইয়া যাইবে, ভাবিয়া স্বপ্নে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। ঘুম ভাঙিবার পর সকলের উপর সে একটা তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিতেছে। স্বপ্ন মিলাইয়াই গিয়াছে স্বপ্নে, এখন শুধু আছে একটা বেদনামাখা বিস্ময়কর ভার-বোধ এবং সকলের নির্মমতার বিরুদ্ধে অভিমান-ভরা নালিশ।

ছেলে তার নাই। এ পর্যন্ত বিবাহ সে করে নাই। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তার হাসি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নের কথা সে ভাবিতেছে না, স্বপ্নের প্রভাবটা শুধু তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

তার কেউ নাই। সকলে তার পর। তার কিছু নাই। কেউ তাকে কিছু দেয় নাই।

সংসারের কলরব কানে আসিতেছিল। তাকে বাদ দিয়াই সকলে কলরব করিতেছে। স্বপ্নের মতো সে যদি এখন শূন্যে মিশাইয়া যায়, কারও কিছু আসিয়া যাইবে না, এমনই ভাবে কলরব করিয়া চলিবে দিনের পর দিন। এ যে ছেলেমানুষি চিন্তা, ত্রিষ্টুপ তা বুঝতে পারিতেছিল, কিন্তু উপায় কী ! চিন্তাগুলি আজ যেন স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, এতদিনের ধরাবাঁধা পথে শিক্ষিত সৈন্যের মতো সংস্কারগত নির্দেশের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে রাজি নয়। এই ধরনের আরও কত চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া তার মনে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সংযত করিবার কোনো চেষ্টাই কাজে আসিল না।

সাত বছরের একটি মেয়ে দরজার ফাঁকে ডাক দিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, বারোটা পর্যন্ত ঘুমাবে না কি মামা, বিছানা ছেড়ে উঠবে না ?

এদিকে শোন, রাণু।

রাণু নির্ভয়ে কাছে আসিল। মামা তাকে বড়ো ভালোবাসে। হয়তো কাল রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে তার জন্যে কিছু কিনিয়া আনিয়াছে, নয় তো তাকে একটু আদর করিবার শখ জাগিয়াছে মামার। মুখে প্রত্যাশার হাসি ফুটাইয়া রাণু কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র ত্রিষ্টুপ সজোরে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল !

ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, না ?

এ তো আদর নয়, রাগের ভানে খেলার ছলে শাসন করা নয়। চমক ভাঙিয়া আঘাতের বেদনায় চিৎকার করিয়া কাঁদিতে রাণুর একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে বিছানা হইতে নামিয়া ত্রিষ্টুপ গটগট করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

একটি ছোটো দোতলা বাড়ির একতলায় তাহাদের অধিকার। ত্রিষ্টুপ ঘুমায় বৈঠকখানায়। দিনের বেলা তার বিছানা ভিতরে টানিয়া আনা হয়, রাত্রে আবার বৈঠকখানায় চৌকিতে বিছানাটি পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরটিতে দোতলার ভাড়াটেদের ভাগ আছে ; দিনের বেলা ত্রিষ্টুপ একা ঘরটি দখল করিয়া থাকিলে তারা আপত্তি করে। সারাদিন একটি লোকও তাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে কিনা সন্দেহ, তবু তারা সব সময়ে কোনো এক অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করে এবং কেউ আসিয়া পাছে কিছু মনে করে, এই ভয়ে দিনের বেলা ত্রিষ্টুপের বিছানাটি চৌকির উপর গুটাইয়া রাখিতেও দেয় না।

উঠানের এক কোণে তার দিদি প্রভা টিউবওয়েলে জল তুলিয়া বড়ো একটা বালতি ভরিতেছিল, ত্রিষ্টুপকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, রাণু কাঁদছে কেন রে ?

ত্রিষ্টুপ গম্ভীর মুখে বলিল, মেরেছি।

কেন, কী করেছিল মেয়েটা ? কৌতূহলের বশেই প্রভা কথা জিজ্ঞাসা করিল, অনুযোগের জন্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া ত্রিষ্টুপ যেন খেপিয়া গেল।

অত কৈফিয়তে তোমার দরকার ? খুশি হয়েছে—মেরেছি।

প্রভা খানিকক্ষণ অবাক হইয়া ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া রান্নাঘরে গিয়াই দাবি জানাইল, আমার চা কই ?

মা খুন্তি দিয়া তরকারি নাড়িতেছিলেন, বলিলেন, এই যে করে দি। এত বেলা করে উঠলি, চা-ই বা খাবি কখন, চান করে খেতেই বা বসবি কখন ? ওঁর সঙ্গেই তো যেতে হবে তোকে ?

না।

তোর বুঝি দেরিতে আফিস ? তা হোক, ওঁর সঙ্গেই তুই যা বাবা, প্রথম দিনটা। উনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।

আমি চাকরি করব না।

কথা শুনিয়া মা হাতের খুন্তি উঁচু করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর পঁচাত্তর টাকা বেতনের এই চাকরিটি জুটিয়াছে, আজ তার ছেলের প্রথম চাকরিতে যোগ দিবার কথা, এখন সে বলিতেছে চাকরি করিবে না। প্রথমটা মা একেবারে থতোমতো খাইয়া গেলেন। তারপর মনে করিলেন তাই কি কখনও হয় ! ছেলে তার সঙ্গে দুষ্টামি করিতেছে।

নে, খুব হয়েছে, আর ফাজলামি করে না। প্রভাকে ডাক তো, তোকে খেতে দিয়ে চাটা করুক।

গামছা কাঁধে ত্রিষ্টুপের বাবা অবিনাশ তেলের খোঁজে রান্নাঘরে আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এখন আর চা খেতে হবে না, চান করে ফ্যাল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে, নটা পাঁচিশের গাড়িটা ধরতেই হবে। আজ ফিরবার সময় মাপ্লরটা করে ফেলিস কিন্তু, ভুলিস না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, আমি যাব না বাবা।

যাবি না ? যাবি না মানে ?

চাকরি করা আমার পোষাবে না।

অবিনাশ তেলের বাটি হইতে হাতের তালুতে তেল ঢালিতেছিলেন, খানিকটা তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। মার হাতের খুন্তি আবার কড়াইয়ের অনেকখানি উঁচুতে নিশ্চল হইয়া রহিল।

প্রথম কথা কহিলেন অবিনাশ।—কী বলছিস তুই পাগলের মতো ?

এমন সময় রাণুর হাত ধরিয়া প্রভা সেখানে আসিল। রাণুর গালে ত্রিষ্টুপের আঙুলের দাগ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক স্বপ্নে ত্রিষ্টুপের ছেলের শোকে কাঁদার মতো। প্রভার মুখ মেঘে ঢাকা আকাশের মতো অন্ধকার। মেয়ের গালটি সকলের সামনে ধরিয়া সে বলিল, দ্যাখো বাবা, কেমন করে মেরেছে মেয়েটাকে। বেলা হয়ে গেছে, আজ আবার আপিস যাবে, আমি তাই মেয়েটাকে বলেছিলাম তোর মামাকে ডেকে দে তো রাণু। ও গিয়ে যেই ডেকেছে, অমনি মেরে একেবারে খুন করে দিয়েছে। ওর কী দোষটা ? তোমরাই বলো ওর দোষটা কী ? বিশেষ দুটি খেতে-পরতে দিচ্ছ বলে—প্রভা নিজেও ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রভার নালিশ ও কান্না সকলের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ বিচলিত কেউ হয় না। সারাদিনে অন্তত একবার প্রভার নালিশ ও কান্না না শুনিলেই বরং সকলে একটু আশ্চর্য হইয়া ভাবে, কী হইয়াছে প্রভার আজ ? তবে এক হিসাবে প্রভার মন খুব উদার, একটি ধমকেই সে সন্তুষ্ট হয়, কান্না থামিয়া যায়, ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করে না। কেবল ধমকটা দিতে হয় কতকটা এই ভাবে : চুপ কর প্রভা, কী বকছিস তুই পাগলের মতো ? তুই কি পর এসেছিস এ বাড়িতে, কুটুম এসেছিস ?

আজ কেউ ধমক দিল না, কিছুই বলিল না। প্রভা আশ্চর্য হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তার মেয়ের গালে চড় মারার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারা মাত্র কৌতূহলের বন্যায় অভিমান ভাসিয়া গেল।

কী হয়েছে মা ?

হয়েছে আমার অদেষ্ট, আমার পোড়াকপাল !

কী হইয়াছে বুঝা গেল না বটে, কিন্তু ভয়ানক কিছু যে সত্যই হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না প্রভার। ধৈর্য ধরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জলভরা চোখের সে দৃষ্টি কামিনী বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, তিষ্টু চাকরি করবে না বলছে।

ও, এই ! তিষ্টু ফাজলামি করছে।

প্রভার স্বামী রমেশের* আজ চাকরি নাই তিন বছর, প্রভা ভাবিতেও পারে না মানুষ চাকরি পাইয়াও বলিতে পারে, সে চাকরি করিবে না।

বাপের সঙ্গে এ ধরনের ফাজলামি করা ত্রিষ্টুপের স্বভাব নয়, তবু অথই জলে পড়িলে মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়াইয়া ধরে, অবিনাশ ও কামিনীও তেমনি প্রভার কথা শুনিয়া উৎসুকদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আশ্চর্য কী, সকলকে একটু চমক দেওয়ার জন্য ত্রিষ্টুপ হয়তো ফাজলামিই করিতেছে। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল না, সে তখন অবাক হইয়া খোলা দরজা দিয়া ওদিকের রোয়াকে একটা তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ করিতেছিল। রোয়াকে একটি আধপোড়া বিড়ি পড়িয়াছিল, কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া রমেশ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিড়িটা কুড়াইয়া নিয়াছে। বিড়ি নিয়া রমেশ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, সেখান হইতে ডাক আসিল রাণুর। ঘরে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাণু ফিরিয়া আসিল।

দেশলাইটা দাও না দিদিমা, বাবা চাচ্ছে।

* উপন্যাসে পূর্ববর্তী পাঠে নাম ছিল মিহির। কিন্তু পরবর্তী বহুস্থানে মিহিরের বদলে লেখক রমেশ নাম ব্যবহার করেছেন বলে নামটি বর্তমান পাঠে সংশোধিত হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলী

আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া খায়, তিন বছরে রমেশের এমন অবস্থা হইয়াছে ? প্রভার জন্য ত্রিষ্টুপ হঠাৎ গভীর মমতা বোধ করে। রমেশকে আজ আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়াই তো প্রভা সারাদিন নালিশ করিয়া কাঁদিবার অজুহাত খোঁজে। আর কয়েক বছর পরে দুজনের অবস্থা কী দাঁড়াইবে কে জানে ?

অবিনাশ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, একবার একটু কাশিয়া বলিলেন, তাহলে চানটান করে—

দাঁড়াও, আসছি।

ত্রিষ্টুপ একেবারে বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল, গলির মোড়ে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী করা উচিত আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ভাবিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না। দ্বিধা ও সন্দেহে সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। মা ও বাবার জন্য, প্রভা ও রমেশের জন্য কিছুদিন চাকরি সে করিতে পারে, কিন্তু কেন করিবে ? নিজের বিশ্বাস, আদর্শ আর নবলব্ধ প্রেরণা বলি দিয়া লাভ কী হইবে ? এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম বাধার কাছেই যদি সে হার মানে, অত বড়ো প্রতিজ্ঞা করার কী দরকার ছিল ? মন যার এমন দুর্বল, তার অত বাহাদুরি করা কেন নিজের কাছে ? খানিক আগে যে স্থির করিয়াছে সে চাকরি করিবে না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও করিবে না, এত শিগগির তাকে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে—চাকরি করিবে কী না, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য ! সে যে সত্যই অপদার্থ, এর চেয়ে তার বড়ো প্রমাণ আর কী আছে ?

কিছুদিনের জন্য— ? নিজের মনেই ত্রিষ্টুপ সংশয়ভরে মাথা নাড়ে। কিছুদিন পরে তো আর অবস্থা বদলাইবে না, বরং সে আরও জড়াইয়া পড়িবে। আজ চাকরি আরম্ভ না করা যত কঠিন মনে হইতেছে, কিছুদিন পরে চাকরি ছাড়া তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

তবে আর একটা কথা আছে। চাকরি না করিলেই বা এখন সে কী করিবে ? বড়ো একটা আদর্শ সামনে খাড়া রাখিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া দিন কাটাইলে তো আর চলিবে না। নিজের জীবনকে সব দিক দিয়া সার্থক করিবার প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করিয়াছে, মানুষ হিসাবে তার যা প্রাপ্য সব সে আদায় করিয়া ছাড়িবে, জগৎকে বুঝাইয়া দিবে তার কাছে আর ফাঁকি চলিবে না ; কিন্তু সে সম্ভব করিবার জন্য সকলের আগে একটা উপায় তো তার খুঁজিয়া বাহির করা চাই ? ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় স্থির করার সময় অবশ্য সে পায় নাই, কিন্তু সময় পাওয়ার পরেও যদি সে স্থির করিতে না পারে ? যে পথে চলিলে নীচে নামিতে হইবে না, পিছন হটিতে হইবে না, আগাইতে আগাইতে সার্থকতায় পৌঁছিতে পারিবে, সে পথ যদি খুঁজিয়া না পায় ? পথ খুঁজিয়া পাইলেও পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে ?

গভীর বিষাদ অনুভব করিতে করিতে নিজেকে তার বড়ো একা আর অসহায় মনে হয়। আর নিজের মতো জগতের প্রত্যেক মানুষকে একা মনে হয় বলিয়া নিজের অখণ্ড ও অবর্জনীয় একাকীত্বের বোঝা যেন দুঃসহ হইয়া উঠে। কত লোক চলিতেছে পথ দিয়া, কত চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে প্রত্যেকের মনে, কিন্তু কেউ কারও চিন্তার খবর রাখে না। কত কাছাকাছি সকলের দেহগুলি, তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহের কতবার ঠেকাঠেকি হইতেছে, কিন্তু একজনের জগৎ কি এতটুকু কাছে আসিতেছে আর একজনের জগতের ? এমন একটি মানুষও যদি থাকিত— যে তার আপন, যার সঙ্গে তার প্রকৃত যোগাযোগ আছে, হাসিকান্না ছাড়াই যে বুঝিতে পারে সে সুখী কি দুঃখী, এখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত তার কী করা উচিত।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে ত্রিষ্টুপের মনে পড়িয়া গেল, সকালে সে চা খায় নাই, রীতিমতো অস্বস্তিবোধ হইতেছে ; ডাইনে বিধুর চায়ের দোকান—স্বাধীন ভারত রেস্টুরেন্ট। এক কাপ চা খাইতে

খাইতে আর একবার চাকরির কথাটা ভাবিয়া দেখা যায়। তক্তার মতো চ্যাপটা বিধুর করাতের মতো দাঁতালো অমায়িক হাসির জবাবে একটু হাসিয়া, দেওয়ালে জরিপাড় শাড়ি পরা জগদ্ধাত্রীর ছবির পাশে পাকা ফলের মতো টসটসে ও গোলাকার উলঙ্গ জাপানি মেয়ের ছবির দিকে আনমনে চাহিয়া চুমুক দিতে দিতে চায়ের কাপ খালি হইয়া গেল, এলোমেলো ভাবনাগুলিকে কোনোমতেই আয়ত্ত করা গেল না।

কলেজ স্কোয়ারে সস্তায় পাওয়া যায়, তিষ্টু।

মণীশ কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আলগোছে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়া আড়চোখে চাহিয়া আছে। জুতা আর চুলে চকচকে পালিশ, পাঞ্জাবির হাতা গিলা করা, তলায় গেঞ্জি দেখা যায়, সোনার বোতামগুলি সাদা শূন্যতার মধ্যে টুকরো টুকরো সোনালি অলংকারের মতো।

কী পাওয়া যায় ?

চীন জাপানের মেয়ে—এ দেশিও পাওয়া যায়। কষ্ট করে এখানে না এসে কয়েকটা কিনে এনে ঘরে টাঙিয়ে রাখিস, সারাদিন যত খুশি দেখতে পারবি।

মনে মনে বিরক্ত হইলেও, ত্রিষ্টুপ একটু হাসিল।

তবে একটা বিয়ে করলে, অবশ্য সব হাঙ্গামা চুকে যায়। তাই কর না ?

এই ধরনের পরিহাস করিতে মণীশ খুব পটু। বোধ হয় সেই জন্যই মণীশকে সে পছন্দ করে না। মানুষটা মণীশ খারাপ নয় ; সাজসজ্জার দিকে তার অতিরিক্ত ঝোঁকটা ভালো না লাগিলেও, সেটা ত্রিষ্টুপ অপরাধ মনে করে না। মণীশের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, পড়াশোনাও সে অনেক করিয়াছে, ত্রিষ্টুপ বুঝিয়া উঠিতে পাবে না সব সময়ে সে কেন এমন বাবু সাজিয়া থাকিতে ভালোবাসে। ত্রিষ্টুপের সবচেয়ে খারাপ লাগে, মণীশের অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় আর সবজান্তার ভাব। কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না, সমস্তই তার কাছে যেন তুচ্ছ। রাজপুত্রের বেশে এই নোংবা চায়ের দোকানে চা খাইতে আসিয়া এখানকার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে সমানভাবে হাসিগল্প করা আর ছেঁড়া জামা গায়ে চৌরঙ্গীর বড়ো সাহেবি হোটেলে খানা খাইতে গিয়া বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যেন তার কাছে সমান। মাঝে মাঝে সে এখানে আসে, বিনা চেষ্টাতে সকলের সঙ্গে মিশ খাইয়া যায়, তবু যেন একটা দূরত্ব ও ব্যবধান কোনো সময়েই ঘোচে না। ঠিক অহংকার নয়, মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করা নয়, কেমন একটা নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ করিয়া চলা.....প্রতিবেশীব নিন্দায়, গুজবেব সৃষ্টিতে, ঘরের ব্যাপারেব সঙ্গে মিশাইয়া পৃথিবীর রাজনীতির আলোচনায়, তর্কে আর কলহ-বিবাদে সকলে যখন মশগুল হইয়া যায় ; মণীশ তাহাতে যোগ দিতে কসুর না করিলেও, ত্রিষ্টুপের মনে হয় সকলের ছেলেমানুষিতে সে তলে তলে নিছক আমোদ উপভোগ করিতেছে।

দুদিন আগে বিকেলবেলা পরিতোষ আসিয়াছিল, শোকে মুহ্যমান পরিতোষ। একটি চেয়ারও খালি ছিল না, সকলের আগে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মণীশ তাহাকে বসিতে দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তার মুখে এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। মুখ দেখিয়া বরং মনে হইয়াছিল, সে বুঝি ভাবিতেছে অনেক দূরে নৌকাডুবিতে একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে, এখানে একটা মানুষ আধমরা হইয়া যায় কেন !

ভালো লাগে না, কিন্তু মণীশকে তুচ্ছও সে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে ত্রিষ্টুপের মনে হয়, আসলে এটা তার ভালো না লাগা মোটেই নয়, আর দশজনের মতো মানুষের সুখদুঃখ মানুষটাকে বিচলিত করে না বলিয়া তার অভিমান হইয়াছে, তার প্রতিকারহীন অভিমানের জ্বালাকে মনে হইতেছে বিরাগ।

মনটা ভালো নেই, মণীশদা।

মন ভালো নেই ? সে কী কথা ! মন খারাপ করেছ কেন ?

আমি করিনি। ব্যাপারটা শুনুন—

মণীশ শুনিয়া যায় আর শুনিতে শুনিতে তার মুখ গম্ভীর হওয়ার বদলে যেমন ছিল তেমনই থাকে, হাসি হাসি ভাবটুকু পর্যন্ত মিলাইয়া যায় না। দেখিয়া ত্রিষ্টুপের ভালো-না-লাগা অথবা অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে।

কথা শেষ করিয়া ঝাঁঝালো সুরে সে তাই জিজ্ঞাসা করিল, হাসবার কী হল ?

মণীশ বলিল, হাসিনি। চাকরি করতে চাও না বলছ, বড়ো কিছু করতে চাও। কী করবে সেটা এখনও ঠিক করনি। তা যতদিন সেটা ঠিক করতে পারছ না, ততদিন চাকরিটা করলে হত না ? কিছু পয়সা জমাতে পারলে বড়ো কিছু আরম্ভ করতে একটু সুবিধা হবে।

কিছুদিন চাকরি করলে যদি—

ও ভাবে যদির কথা ভাবলে কিছু হয় না তিষ্টু। প্ল্যান করবার সময়ে সমস্ত যদির হিসাব ধরতে হয়—যদি এ রকম হয়, তবে এই ব্যবস্থা করতে হবে, যদি ও রকম হয়, তবে ও রকম ব্যবস্থা করতে হবে ; ব্যস, সেইখানে যদির শেষ। যদি এ রকম না হয়ে ও রকম হয়, ভেবে প্রথমেই ভড়কালে তো চলে না ! তাছাড়া, কিছুদিন চাকরি করে, সময়মতো চাকরিটা ছাড়বার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে—বড়ো কিছু করবার ক্ষমতা তোমার নেই। চাকরি করে যাওয়াটাই তখন সব চেয়ে ভালো হবে তোমার পক্ষে।

কিন্তু চাকরি করলেই জড়িয়ে পড়ব যে ! বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে চাকরি নেওয়ার মানেই দাঁড়াবে—

বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে চাকরি নেবে কেন ? নিজের জন্য চাকরি নেবে, বড়ো কিছু করবার অঙ্গ হিসাবে চাকরি নেবে। কী করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি, চাকরি করে যা পারি উপার্জন করা যাক—এই ভেবে চাকরি নেবে। বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে বড়ো কিছু করা যায় না, তিষ্টু। সাক্‌সেসের জন্য স্বার্থপর না হলে চলে না। অবশ্য বাড়ির লোকের মুখ কেন, পৃথিবীর লোকের মুখ চাইতে কোনো বারণ নেই, সকলকে বঞ্চিত করে নিজের সুখ খোঁজার স্বার্থপরতার কথা বলছি না—সাক্‌সেসের পথে বিঘ্ন হিসাবে যা কিছু দাঁড়াবে, সে সমস্ত বিসর্জন দেওয়ার কথা বলছি। যেমন ধর—তুমি যেদিন চাকরিটা ছেড়ে দেবে, বাড়ির লোক সেদিন কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে, তুমিও তাদের সঙ্গে কাঁদবে, অন্তত মনে মনে কাঁদবে। কিন্তু ভাববে, কাঁদুক, উপায় কী !

সাড়ে দশটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বাড়ি ফিরিল। অবিনাশ রান্নাঘরের দরজার কাছে মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, তখন পর্যন্ত তিনি স্নানও করেন নাই।

আপিস যাওনি যে ?

লজ্জা করে না তোর ? জোয়ানমদ্দ তুই ঘরে বসে থাকবি, বুড়ো বয়সে আমি খেটে খেটে মরব ? তুই যদি না যাস, আমিও আর যাব না।

চলো, চলো আমি যাচ্ছি।—এক খাবলা তেল নিয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

বড়োবাবু পদ্মলোচন অভিমান করিয়া বলিলেন, প্রথম দিনটাতেই দেরি হল !

অবিনাশ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, মন্দিরে একবার পুজো দিতে গিয়ে—

পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, তা বেশ, তা বেশ।

ত্রিষ্টুপ অবাক হইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে। একজন অনায়াসে মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিল ; পূজা দিতে গিয়া আপিস পৌঁছিতে দেরি করার জন্য বিরক্ত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়ে আর একজনের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া গেল। দুজন সমবয়সি নিরীহ গোবেচারি মানুষ, জীবনটাও

হয়তো দুজনের একই ছাঁচে ঢালা—পরীক্ষা পাস, চাকরি ও সংসার—কিন্তু একজন মন্দিরের নামে মিথ্যা বলিতে ভয় পায় না, আর একজন মন্দিরের নাম শুনিলেই ভড়কাইয়া যায়।

আপিস ত্রিষ্টুপের অপরিচিত নয়, আগে মাঝে মাঝে দরকার পড়িলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে ; চাকরি হওয়ার সময়ে বিনা দরকারেই ঘনঘন অনেকবার আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গেই তার চেনা ছিল, অবিনাশ আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন—প্রত্যেকের ভদ্রতা ও শুভ কামনার জবাবে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, আপনার দয়া।

বাড়ি ফিরিবার সময়ে ট্রামে ও ট্রেনে অবিনাশ ছেলেকে অনেক রকম উপদেশ দিলেন, আপিসে কোন লোকটা ভালো আর কোন লোকটা বজ্জাত মুখে মুখেই তার লম্বা তালিকা শুনাইয়া দিলেন ; কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করিতে হইবে তাও বুঝাইয়া দিলেন।

—আস্তে আস্তে ডিপ্লোমেসি শিখতে হবে, নইলে উন্নতির কোনো আশা নেই বাপু। দেরি করার জন্য পদ্মলোচন চটে ছিল, দেখলি তো কেমন সামলে নিলাম ?—অবিনাশ সগর্বে ছেলের মুখের দিকে তাকাইলেন —অন্য কেউ হলে কেঁউ কেঁউ করত, আর ও ব্যাটা আবও চটে যেত, আমি তো জানি কত ধানে কত চাল, এমন কৈফিয়ত দিলাম যে আব টুঁ শব্দটি করতে পারল না !—একটু থামিয়া উপসংহার করিলেন, তবে লোকটা সত্যি ধার্মিক। মন্দির দেখলেই আধঘণ্টা ধরে প্রণাম করে।

ত্রিষ্টুপ বলিল, আর প্রার্থনা করে, আমার মাইনে বাড়ুক ?

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে তো সবাই করে !

বিধুর চায়ের দোকানে মণীশ বসিয়াছিল। সূর্য চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এত আগে মণীশ কখনও বিধুর চায়ের দোকানে আসে না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, তুমি এগোও বাবা, আমি আসছি।

চায়ের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছে দেখিয়া অবিনাশ শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, খালি পেটে চা খেয়ো না তিষ্টু।

ত্রিষ্টুপ মাথা নাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগল তিষ্টু ?

ত্রিষ্টুপ বলিল, কেমন যেন লাগল, মণীশদা।

কেমন লাগল বুঝতে পারছ না ? তার মানে ভালোও লাগেনি, খারাপও লাগেনি।

সব যেন কেমন খাপছাড়া মনে হল।

মণীশ মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, বোসো, চা খাও।

ত্রিষ্টুপ দ্বিধাভরে বলিল, খালি পেটে—

মণীশ হাসিল, পেট খালি থাকবে কেন ? চপ খাও, কাটলেট খাও, টোস্ট খাও,—বাড়ির খাবার না হলে কী তোমার পেট ভরে না ?

মণীশের কাছে চিরদিন নিজেকে ত্রিষ্টুপের ছেলেমানুষ মনে হয়, আজ আরও বেশি মনে হতে লাগিল। একটু শ্রান্তিও সে বোধ করিতেছিল, শারীরিক নয়, মানসিক শ্রান্তি।

সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তবু সকালবেলার লড়াইয়ের জের যেন এখনও মেটে নাই, কেবলই মনে হইতেছে, সে যেন সন্ধি করিয়াছে হার মানার ভয়ে। কেমন একটা অনির্দিষ্টভাবে নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছে।

থাক, দোকানের খাবার খেতে হবে না তিষ্টু। আমার বাড়িতে কিছু খাবে চলো।

আপনার বাড়িতে মণীশদা ? খাবারটাবার করার হাঙ্গামা—

হাঙ্গামা আর কীসের ? খাবার তৈরি হয়েই আছে, চাটা শুধু করতে হবে।

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। এসো।

মণীশের বাড়ি বেশি দূরে নয়, দু-চারবার ত্রিষ্টুপ তার বাড়িতে গিয়াছে। আগে কোনোদিন মণীশ তাকে ভিতরে ডাকে নাই, আজ একেবারে দোতলায় তার নিজের ঘরে নিয়া গেল।

বোসো তিষ্টু।

একটা রং-চটা কাঠের চেয়ারে বসিয়া ত্রিষ্টুপ বিস্ময়ের সঙ্গে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এ ঘর যে মণীশের, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। যার মাথায় একটি চুল সে কোনোদিন স্থানভ্রষ্ট দেখে নাই, তার ঘরে এমন বিশৃঙ্খলা, এমন দারিদ্র্যের ছাপ।

টেবিলে আর টেবিলের নীচে বই গাদা করা, এক কোনায় জমা করা কতকগুলি ইংবাজি বাংলা সাময়িক পত্রে ধুলা জমিয়া আছে, ট্রাঙ্ক ও সুটকেসটির রং বিবর্ণ, অনেক দিনের পুরানো খাটের বিছানার চাদরটি ময়লা। নূতন সোফা-টেবিলে জমকালো বাহিরেব ঘব পার হইয়া বাড়ির ভিতরেব গরিবানা, অপরিচ্ছন্ন চেহারা দেখিযাই ত্রিষ্টুপ একটু অবাক হইযা গিয়াছিল, মণীশেব নিজেব ঘব দেখিয়া সে একেবারে থ বনিয়া গেল।

তাকে বসিতে বলিয়াই মণীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটু পবেই সে ফিরিযা আসিল। আরও খানিকক্ষণ পরে দুহাতে দুটি থালায় লুচি আর তরকাবি নিয়া একটি মেয়ে ঘরে আসিল।

মেয়েটিকে ত্রিষ্টুপ কলতলায় বাসন মাজিতে দেখিয়াছিল।

দুই

মণীশের বোনের নাম কুন্তলা। বিবাহ-দেওয়া-দরকারের বয়স হইযাছে—দু-একবছর বেশিই হইযাছে। এই বয়সে সময় হিসাবে দু-একবছর যে কত দীর্ঘ আর অ-তুচ্ছ কে তা না জানে? দাদা যে ত্রিষ্টুপকে বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়াছে কেন সেটুকু বুঝিবার মতো আর বুঝিযা যে জোবালো লজ্জা সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিতে চায়, সেটা জোর করিয়া লুকাইযা রাখাব চেষ্টা করার মতো জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুন্তলার জন্মিয়াছে।

প্রথমটা তাই ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, মেয়েটা বুঝি একটু পাকা। তারপব দু-চাবদিনেই এ ভুল ধারণা তার ঘুচিয়া গিয়াছে। কুন্তলার চালচলন কথাবার্তায় যেটুকু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িয়াছিল, এখনও কিছু কিছু ধবা পড়ে, সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এই বয়সের দেওয়াল-চাপা ভীবু মেয়ের পক্ষে ওটুকু অস্বাভাবিকতাই স্বাভাবিক। তৃতীয়বার কুন্তলা যখন খাবারের থালা হাতে সামনে আসিযা দাঁড়াইয়াছিল, তখন ত্রিষ্টুপের খেয়াল হইয়াছিল যে বেচারি জানে, তাকে পছন্দ করাইতে পারিলে সে তাকে বিবাহ করিলেও করিতে পারে! পঞ্চমবার মণীশের বাড়িতে গেলে কুন্তলা যখন চলনসই কাঁপা গলায় রবিবাবুর একটি গান শুনাইয়াছিল তখন ত্রিষ্টুপের আরেকটা বিষয় খেয়াল হইয়াছিল; তার মন ভুলানোর চেষ্টার মতো কিছু পাছে বলিয়া বা করিয়া বসে এই ভয়ে কুন্তলা বড়োই কাবু হইয়া আছে।

ত্রিষ্টুপ মর্মতা বোধ করে। ভাবে যে মণীশের বাড়িতে আর আসিবে না। এ ভাবে মেয়েটাকে পীড়ন করা, তার মনে মিথ্যা আশা জাগিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কেবল কুন্তলা নয়, মণীশও তো অনেক কিছু আশা করিতেছে। তাকেও এ আশা পোষণ করিয়া চলিতে দেওয়া অন্যায় হইবে বইকী।

আগে হইতে যদি মণীশের বাড়িতে তার যাতায়াত থাকিতে, তবে কোনো কথা ছিল না। চাকরি হওয়ার পর তার কাছে বোনকে গছানোর ইচ্ছা মণীশের জাগিয়াছে টের পাইয়াও ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা বজায় রাখা দোষের হইত না। কিন্তু চাকরি আরম্ভ করার দিন তাকে বাড়িতে ডাকিয়া

1754
51710

নিয়া গিয়া কুন্তলার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার মধ্যে মণীশ তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রাখে নাই। জানিয়া শুনিয়া এখন ঘনঘন মণীশের বাড়ি যাওয়া চলে না।

কিন্তু দু দিন যাওয়া বন্ধ রাখিয়াই ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, কাজটা সহজ নয়। সন্ধ্যার পর মণীশের ছোটো ভাই ক্ষিতীশ আসিল। কুন্তলা নয়, মণীশের মা নিজে পিঠা তৈরি করিয়াছেন, এখনও ত্রিষ্টুপ যায় নাই কেন ? অবিলম্বে ক্ষিতীশের সঙ্গেই সে যেন গিয়া হাজির হয়।

ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে, চলুন শিগগির।

ত্রিষ্টুপের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

ক্ষিতু, তোমাকে কে বলল ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে ?

ক্ষিতীশ একটু ভড়কাইয়া গেল, বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, আমি দেখে এলাম যে ?

ও তুমি দেখে আসছ। দাদা বলতে বলেনি, না ?

ক্ষিতীশ সজোবে মাথা নাড়িয়া বলিল, দাদা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

কেন ?

ক্ষিতীশের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়োরা কী বোকার মতো কথা বলে !

পিঠে খাবার জন্য। ছোড়দি কী বলে জানেন ? আপনি শুধু পিঠে খেতে পারেন, আর আমি পারি। দুটো-তিনটের বেশি খেলেই দাদার অসুখ করে।

এতক্ষণে ত্রিষ্টুপের গাম্ভীর্য কাটিয়া গেল। মনে মনে সে রীতিমতো লজ্জাই বোধ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে কুন্তলাকে সে বিবাহ করিতে পারে ভাবিয়া বোনের সঙ্গে তার মেলামেশার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও তাকে গাঁথিবার জন্য চালবাজি আরম্ভ করিয়া ব্যাপারটাকে কুৎসিত করিয়া তুলিবার মানুষ মণীশ নয। তাব নিজের মনটাই বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তাকে পিঠা খাওয়ানোর জন্য কুন্তলা তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে ; হয়তো পরনেব ছেঁড়া ময়লা শাড়িখানি বদলাইয়া একখানি ফরসা শাড়ি পরিয়াছে—সস্তা সাধারণ শাড়ি, পাছে সে মনে করে যে তার জন্যই সাজগোজ। একবাব ত্রিষ্টুপের মনে হইল, পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণটা রাখিয়া আসে। একেবারে যাওয়া বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে যাওয়াটা কমাইয়া আনাই কি ভালো নয় ? দুদিন যায় নাই, আজ যখন ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিয়াছে, আজ একবার গেলে কী আসিয়া যাইবে ? আবার চার-পাঁচদিন একেবারে না গেলেই চলিবে। তারপর ত্রিষ্টুপ ভাবিল, না, আজ না যাওয়াই ভালো। যাওয়ার ইচ্ছাটা তার নিজেরই আজ বড়ো বেশি জোরালো হইয়া উঠিয়াছে, যাওয়ামাত্র সকলে তার আগ্রহ টের পাইয়া যাইবে। কাল পরশু বরং দশ মিনিটের জন্য গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, কতকটা ভদ্রতা রক্ষার জন্য দেখা করার মতো। আজ নয়।

আমার শরীর তো আজ ভালো নেই ক্ষিতু, কী করে যাব ?

অসুখ করেছে ?

হ্যাঁ, অসুখ করেছে।

ক্ষিতীশ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলে ত্রিষ্টুপ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মিথ্যা অজুহাতে ক্ষিতীশকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নয়, যায় নাই বলিয়া কুন্তলা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াও নয়, মণীশের বাড়ির আকর্ষণ অনুভব করিয়া। এত অল্প সময়ের মধ্যেই কুন্তলা যদি তার মনকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিযা থাকে, নিজের সম্বন্ধে তবে আর আশা ভরসা করিবার কিছু নাই।

আধঘণ্টা পরে মণীশ আসিল।

কী হয়েছে তিষ্টু ?

এমনি শরীরটা একটু—

বিশেষ কিছু নয় তো ? তবে এসো—দুটো-একটা পিঠে তোমায় খেতেই হবে ভাই। কাল থেকে আয়োজন করে পিঠে তৈরি হয়েছে, তুমি চেখে দেখে সার্টিফিকেট না দিলে কেউ খুশি হবে না।

সুতরাং ত্রিষ্টুপ গেল। আগের দিন শহরের অন্য প্রান্ত হইতে স্বামী ও দুটি মেয়েকে নিয়া কুন্তলার দিদি বাপের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছে। পিঠার আয়োজনটা হইয়াছে ওদের জনাই, ত্রিষ্টুপের জন্য নয়।

কুন্তলার দিদি রমলাকে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল। কুন্তলার চেয়ে সে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড়ো, সাত বছর আগে তার বিবাহ হইয়াছে এবং মেয়ে হইয়াছে দুটি ; তবু প্রথমবার তার দিকে তাকাইয়া ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, কুন্তলাই বুঝি শাড়ি গয়না পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বউ সাজিয়াছে। যমজ না হইয়াও যে দুটি বোনের চেহারায় এত মিল থাকিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কেবল বাহিরের নয়, দুজনের ভিতরের মিলটাও যে বিস্ময়কর, প্রথমে ত্রিষ্টুপের কাছে তা ধরা পড়ে নাই। কুন্তলা ভীরু লাজুক নম্র ; রমলা হাসিখুশি, মিশুক, কথা বলিতে পটু। সাত বছরের বিবাহিত জীবন অধিকাংশ মেয়েকেই ভোঁতা করিয়া দেয়, রমলার বেলা ফলটা হইয়াছে যেন ঠিক তার উলটা। তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে, জীবনীশক্তি বাড়িয়াছে, আনন্দ আহরণের ক্ষমতা বাড়িয়াছে। স্ফূর্তি আর উৎসাহের জন্য যেন বিশেষ উপলক্ষ দরকার হয় না ; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উৎসবের প্রেরণা যেন সঞ্চিত আছে, চয়ন করিয়া নিলেই হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে দুজনের এতখানি পার্থক্য সত্ত্বেও মিলটা ত্রিষ্টুপের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, কুন্তলার সঙ্গে রমলার শুধু বিকাশের পার্থক্য—কিশোরীর সঙ্গে যুবতির। যে কথায় কুন্তলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিতেছে, সেই কথাতেই রমলা হাসিয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিতভাবে, যে মমতায় কুন্তলা কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়া সন্তর্পণে তার গালে চুমা দিয়া বলিতেছে, কেঁদো না, সেই মমতাতেই রমলা বড়ো মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া দলিয়া মলিয়া তাকে বুকের সঙ্গে যেন মিশাইয়া দিতে চাহিয়া বলিতেছে, কাঁদে না জাদু, মামাবাড়ি এসে কি কাঁদতে আছে রে দুষ্টু পাজি সোনা ?

যে সুখদুঃখের হিসাব কুন্তলা ভবিষ্যতের কল্পনায় জমা রাখিয়া ভাবিতেছে, কে জানে আমার কপালে কী আছে, সেই সুখদুঃখের স্বাদ নিতে নিতে রমলা ভাবিতেছে কে জানে আমার কপালে এত সুখ টিকিবে কি না ! রমলা সত্যসত্যই সুখী। কেবল নিজে সে সুখী হয় নাই, আরেক জনকেও সুখী করিয়াছে। রমলার স্বামী ধীরেনের শান্ত, পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপের হঠাৎ এক সময় মনে হয় জীবনের হিসাব নিকাশের অঙ্কশাস্ত্রটাই কি তবে তার ভুল ? তিরাশি টাকার একজন কেরানি এমন সুখী হইল কী করিয়া ?

তিন

ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে—এটা সে পছন্দ করিতে পারিতেছে না। মানুষকে দেখিয়া কোথায় সে নিজেও সুখী হইবে, তার বদলে মন তার বিরূপ হইয়া পড়িতেছে—তিরাশি টাকার কেরানির জীবনে সুখশান্তির অস্তিত্ব মানিতে সে রাজি নয়। দেখিয়া যা মনে হইতেছে তা সত্য নয়, আসলে এদের দুজনের জীবন দুঃখময়—এ ধারণা সে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

কদিন এদের কথাই সে ভাবিয়া যায়। চিন্তাধারার প্রতিবাদের মতো, অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমের মতো দুজনে তাকে পীড়ন করিতে থাকে। চারিদি... [illegible] দেখিতে পায় মানুষের মুখে দুঃখের কালো

ছায়া, দেহে ক্ষয়, জীবনে অপচয়, সংকীর্ণ, নিঃস্ব আবেষ্টনীর পেষণ। এই পরিচয়েরই ছাপমারা তাবও বর্তমান। তাই তো সে ভবিষ্যৎ রচনা করিতে চায় ! আজ কিছু নাই, কাল ঐশ্বর্য চাই। এই অবস্থায় ধীরেন ও রমলা আবার কী ধাঁধা সৃষ্টি করিল !

মণীশকে সে জিজ্ঞাসা করে, ধীরেনবাবু বেশ লোক, না ?

হ্যাঁ ও ভালো মানুষ, খাঁটি।

মণীশের কথার মানে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল কয়েক দিন পরে। নিজেদের সংসারে ধীরেন ও রমলাকে দেখিয়া আসিবার ইচ্ছাটা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। রবিবার বিকালে সে শহরের এক প্রান্তে তাদের ছোটো একতলা বাড়িতে গিয়া হাজির হইল।

আগের দিন প্রথম রাত্রে অসময়ের ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড় উঠিলে, ত্রিষ্টুপ গভীর উল্লাস বোধ করে। ঝড়ের বেগে বাড়ির কাছে সিধা তবুণ আমলা গাছটি যত বাঁকা হইয়া যায়, তার বাঁকা মন যেন অনির্বচনীয় পুলকে ততই খাড়া হইয়া ওঠে। এই সতেজ গর্বিত আনন্দ সাপের মতো মনের কোনো অন্ধকার কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে, সাপুড়িয়ার বাঁশির মতো ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়া ফণা উঁচু করে। ঝড় থামিয়া যাওয়ার পবেও এই উত্তেজনার প্রভাব মিলাইয়া যাইতে কয়েক দিন সময় লাগে, ত্রিষ্টুপের অনুভূতি রসে ভিজিয়া সজীব হইয়া থাকে।

ধীরেনের বাড়ির অবস্থানটি ত্রিষ্টুপের ভারী ভালো লাগিল। এ শহরতলি পুরানো, শহরের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনে নূতন সৃষ্টি হয় নাই। পুরানো বাড়িগুলি এলোমেলো ভাবে বসানো, রাস্তা আঁকাবাঁকা। আগাছাভরা বাগানের কয়েকটি টুকরা এখানে ওখানে বসানো আছে। ধীরেনের বাড়ির অদূরে পানার আস্তরণ বিছানো একটি পুকুর। কাছে ও দূরে অনেক নারিকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তায় ছোটো ছেলেদের মার্বেল খেলায়, বাড়ির সামনে রোয়াকে বসিয়া বড়ো ছেলেদের জটলা করায়, উবু হইয়া বসিয়া এক প্রৌঢ়ের হুঁকা হাতে তামাক খাওয়ায়, ছেলে কোলে এক বাড়ির দুয়ার হইতে বাহির হইয়া একটি আধময়লা শাড়ি পরা তরুণীর আরেক বাড়ির দুয়ারে ঢুকিয়া পড়ায়, তার এখনকার শান্ত মানসিক অবস্থার সঙ্গে কেমন একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে।

বাড়ির ভিতরে গৃহসজ্জার মধ্যেও একটি সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতি তার বড়োই তৃপ্তিকর মনে হইল। এ সব সংসাবে বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশি চোখে পড়ে অসঙ্গতি। ভাঙ' চৌকির পাশে মস্ত দামি ড্রেসিং টেবিল, পেবেকমারা কাঠের চেয়ারেব পিঠে রঙিন সুতার কাজ ক' খোল, দামি ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের পাশে আঠা দিয়া দেয়ালে আঁটা মাসিকের ছবি, ময়লা বিছানার চাদরে ধবধবে পরিষ্কার ওয়াড়-পরানো তেল-চটচটে বালিশ, পিঁড়ির সঙ্গে কার্পেটের আসন, সযত্নে সাজানো জিনিসের একটি তাকের নীচেই অযত্নে ছড়ানো জিনিসের আরেকটি তাক। এ বাড়িব গৃহোপকরণে সেই বিসদৃশ বিরোধ নাই, চারিদিক ছড়ানো একটি বিস্ময়কর সাম্যের ভাব দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়।

ত্রিষ্টুপের মনে হয়, এ ঘর যারা সাজাইয়াছে তাদের সত্যই বদ্ধি আছে। অতিরিক্ত ঝকঝকে কিছু তারা চায় নাই বলিয়া একেবারে রংচটা কিছু তাদের রাখিতে হয় নাই। তিনটি ভাঙা চেয়ারের মধ্যে একটি খুব দামি চেয়ারে তাকে বসানোর গৌরব বাতিল করিযা দিয়াছে বলিয়া চারটি সাধারণ শক্ত চেয়ারের যে কোনো একটিতে তাকে নিশ্চিন্ত মনে বসিতে বলিতে পারিয়াছে।

ধীরেন ও রমলা যে রকম আগ্রহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাইল, ত্রিষ্টুপের বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িল যে, তার সবটাই আন্তরিক। তার সঙ্গে এদের পরিচয় শুধু একদিনের। রমলা একবার শুধু তাকে বলিয়াছিল, সে এ বাড়িতে আসিলে তারা খুশি হইবে। ভদ্রতা করিয়া ও কথা কে না বলে ? ওই আহ্বানেই কেউ বাড়িতে আসিলে, ভদ্রতা করিয়া কে না খুশি হয় ? কিন্তু সে আসায় সত্যই এদের যেন আনন্দের সীমা নাই। তার এই অনুগ্রহে তারা যেন কৃতার্থ হইয়াছে।

রমলা বলিল, আপনি একদিন আসবেন জানতাম।

কী করে জানতেন ?

অনেকে বলে যায়, কিন্তু আসে না। দু-চারমাস পরে দেখা হলে বলে, সময় পাইনি, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, এবার একদিন নিশ্চয় যাব। আপনি তাদের মতো নন। সেদিন কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম।

ছোটো মেয়েটিকে কোলে করিয়া রমলা বসিয়াছে, বড়ো মেয়েটি চেয়ার ঘেঁষিয়া মার পিঠে এক হাত রাখিয়া শান্ত কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রমলার ভাব দেখিলে সত্যই মনে হয়, ত্রিষ্টুপ আজ ঠিক এই সময়ে আসিবে জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগে হইতেই সব কাজ, সব হাঙ্গামা চুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তাও সে এখনকার মতো মনের একপাশে সরাইয়া দিয়াছে, তার সবটুকু মনোযোগ এখন অভ্যাগতের প্রাপ্য। সংসারের কোনো কাজ, কোনো দায়িত্ব যাদের নাই, বাড়িতে কেউ আসিলে তাদেরও ত্রিষ্টুপ এমন স্থির শান্ত একাগ্রভাবে কখনও এক মিনিট আলাপ করিতে দেখে নাই, প্রতি মুহূর্তে রমলা যেন তার আত্মমর্যাদা বাড়াইয়া দিতে থাকে। একজনের প্রথম বাড়িতে আসার অপরিহার্য অস্বস্তি ও সংকোচ আপনা হইতে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়।

আজ ত্রিষ্টুপ প্রথম বুঝিতে পারে—অন্যে তুচ্ছ করিলে নিজের কাছে মানুষ কীভাবে তুচ্ছ হইয়া যায়, অন্যে দাম দিলে কীভাবে দাম বাড়ে। জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। ধনীকে নয়, মানীকে নয়, গুণীকে নয়, জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে। তার কাছে থাকিলে ব্যর্থতার ক্ষোভ মানুষের তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ, কিছু না বলিয়াও সে যেন ক্রমাগত বলিতে থাকে, ব্যর্থতা ও সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়ো, যে অবস্থায় জীবনযাপন করুক, মানুষ চিরদিনই মানুষ।

রাত প্রায় আটটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বিদায় নিল। পথে এবং বাড়ি ফিরিয়া রাত্রে ঘুম আসা পর্যন্ত এই নূতন অভিজ্ঞতাই সে মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তিরাশি টাকার এক কেরানির জীবন রমলা সুখে ও শান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। অপূর্ণতা তাকে পীড়ন করে না, রমলা তার আত্মগ্লানি জাগিতে দেয় না। দুঃখের ছোঁয়াচ লাগলে রমলা তাতে নিজের আনন্দের প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। এক বিষয়ে হতাশা জাগিলে অনেক বিষয়ে আশা জাগাইয়া রমলা তাকে সঞ্জীবিত করে। যা আছে, তারই সন্তোষে মন ভরিয়া রাখিয়া, বাঁচিবার প্রয়োজনে মাসে মাসে তিরাশি টাকা দানের জন্য দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিয়া দারিদ্র্যের পেষণ ভুলাইয়া রাখে।

মণীশ বলিয়াছিল, ধীরেন ভালোমানুষ, খাঁটি। তাকে কাঁদাইলে সে কাঁদে, হাসাইলে সে হাসে। তাই কি রমলা তার মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিতে পারিয়াছে ? অন্য কোনো মানুষ হইলে পারিত না ?

এই একটা খটকা ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া থাকে। রমলাই যে ধীরেনকে সুখী করিয়াছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেটা যে ধীরেনের ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য সম্ভব হইয়াছে তাও সে বিশ্বাস করিতে পারে না। ধীরেনের পরিচয়ও সে আজ ভালো করিয়া জানিয়া আসিয়াছে। দুর্বল পরনির্ভরশীল হাবাগোবা মানুষ সে নয়। ত্রিষ্টুপের তাই মনে হয় শুধু ধীরেন নয়, যে কোনো মানুষকে রমলা সুখী করিতে পারিত ; বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানুষ ছাড়া।

তাকেও পারিত।

বিছানায় শুইয়া এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আধাঘুম আধাজাগরণের মধ্যে ত্রিষ্টুপের চিন্তা ও কল্পনা জড়াইয়া যাইতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—তাকে সুখী করার জন্য কুন্তলা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যে রকম একটি ছোটো একতলা বাড়িতে রমলা আর ধীরেন বাস করে, অবিকল সেই রকম একটি বাড়িতে ঠিক রমলার মতো সাজ করিয়া কুন্তলা কাঠের চেয়ারে বসিয়া আছে, তার কোলে একটি শিশু, তার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরেকটি মেয়ে।

মণীশের বাড়ি যাওয়া সে বন্ধ করিয়া দিল। ধীরেনের বাড়িতেও আর গেল না। রমলাকে দেখিলে মনে পড়িবে কুন্তলাও তারই মতো। ধীরেনের পরিতৃপ্ত মুখ দেখিতে হইবে, মনে হইবে কুন্তলাকে নিয়া এমনি সুখের সংসার পাতিতে কোনো বাধা নাই। সে সুখশান্তি চায় না। ধীরেনের মতো আনন্দোজ্জ্বল হাসির বিনিময়েও সংকীর্ণ খাঁচায় সে ঢুকিবে না। আর বিচারবিবেচনা নয়, বসিয়া বসিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব নিয়া মাথা ঘামানো নয়। যা সে ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক। জগৎ চুলোয় যাক।

মণীশ খোঁজ করিতে বাড়ি আসিল না, ক্ষিতীশও আসিল না। দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল, সেই চায়ের দোকান হইতে মণীশ তাকে ডাকিল।

দোকানে এখন ভিড় জমিয়াছে, একটি চেয়ারও খালি ছিল না। দোকানের ছোকরা কোথা হইতে একটা ভাঁজ করা চেয়ার আনিয়া ছোটো একটু ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

একজন আজ একশো টাকা ঠকিয়েছে, তিষ্টু।

কে ?

তুমি চিনবে না। পাল চৌধুরী কোম্পানির পালবাবু।

চিনি। একবার চাকরির খোঁজে দেখা করেছিলাম।

ওর একশো লাখ টাকা আছে। আমার একশোটা টাকা কী করে আদায় করা যায় বসে বসে ভাবছিলাম।

ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া ত্রিষ্টুপ বলিল, ও টাকার আশা ছেড়ে দিন। ভেবে আর কী করবেন ?

মণীশ মৃদু হাসিল—ভেবে আর কী করব, টাকা আদায় করব।

টাকাব জন্য মণীশকে একটু বিচলিত মনে হয় না। পালবাবু টাকাটা না দেওয়ায় সে যেন খুশি হইয়াছে—আদায়ের জন্য লড়াই করিতে পারিবে। মণীশের প্রকৃতির এই দুর্বল দিকটা ত্রিষ্টুপ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করিতে সে যদি ভালোবাসে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য একজনের সঙ্গে শুধু লড়াই না করিয়া অনেক টাকার জন্য অনেকের সঙ্গে লড়াই করে না কেন ? সে কি মনে করে সে যা পায়, তাব বেশি আর কিছু তার পাওনা নাই ? উপার্জন বাড়ানোর জন্য সে তার অসাধারণ শক্তিগুলি কাজে লাগাইতে অবহেলা করে ; কিন্তু কেউ একটি পয়সা ফাঁকি দিলে নির্মম ধৈর্যের সঙ্গে সেই পয়সাটি ছিনাইয়া আনিবার জন্য প্রায় সাধনা শুরু করিয়া দেয়।

কদিন যাওনি কেন, তিষ্টু ?

খুব ব্যস্ত ছিলাম।

মণীশ আর কিছুই বলিল না। তার আগ্রহের অভাবে ত্রিষ্টুপও একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে রাস্তায় নামিয়া হঠাৎ সে বলিল, কুন্তলার যদি বিয়ে দেন—

ত্রিষ্টুপের দুই কান গরম হইয়া উঠিল। কথায় কথায় মণীশের কাছে কুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল বিনা ভূমিকায় এমন ভাবে কথা তুলিবার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। মণীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কুন্তলার বিয়ে দেবেন না ?

দেব বইকী। বিয়ে না দিলে চলবে কেন ?

আমাদের অফিসে একটি ছেলে আছে তার সঙ্গে চেষ্টা করতে পারেন। নরেশ নাম। ছেলেটি বেশ ভালো ; বাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। আপনি যদি বলেন—

মণীশ হাসিমুখে তার একটি হাত ধরিয়া বলিল, কুন্তলার বিয়ের জন্য ভেবো না, ভাই। যার তার হাতে ওকে দিতে পারব না। আমি ছাড়া ওর জন্য কেউ ছেলে খুঁজে বার করতে পারবে না।

এ ছেলেটি—

খুব ভালো ছেলে। কিন্তু কুন্তলার সঙ্গে ওর যে বনবে তার ঠিক কী ? আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি, তিষ্টু। বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো পাত্রটির সঙ্গেও আমি কুন্তলার বিয়ে দেব না। এমন একটি ছেলে খুঁজে আনব, যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে। ছেলের অবস্থা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, চরিত্র কেমন, এ সব দেখার আগে আমি দেখব ছেলের প্রকৃতি কেমন, কুন্তলার সঙ্গে খাপ খাবে কি না।

ত্রিষ্টুপ সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, সেটা দেখা দরকার বটে।

তাড়াতাড়ি কুন্তলার বিবাহ মিটাইয়া দিয়া নিজেকে বাঁচানোর জন্যই সে ভালো একটি ছেলের সন্ধান দিয়াছে, অথচ একটু বিবেচনা পর্যন্ত না করিয়া মণীশ প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া তাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। মণীশের কথা শুনিতে শুনিতে যতই তার মনে হইতে লাগিল কুন্তলার উপযুক্ত ছেলে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, ততই যেন মনটা তার হালকা হইয়া যাইতে লাগিল।

মণীশ বলিল, সব চেয়ে বেশি দরকার। অন্তত আমি তাই মনে করি। তোমাদের হিসাবে ধীরেনের চেয়ে হাজার গুণ ভালো একটি ছেলে রমলার জন্য পাওয়া গিয়েছিল—এখন সে মাসে হাজার টাকা রোজগার করে। আমিই জোর করে ধীরেনের সঙ্গে রমলার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালোই করেছিলাম কী বল ?

আচ্ছা মণিদা, বিয়ের আগে ওদের পরিচয় ছিল ?

মণীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

চার

ঠিক এই অবস্থাতেই ত্রিষ্টুপের দিন কাটিতে লাগিল। জীবনটা মনে হইতে লাগিল একঘেয়ে।

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল, কোনো দিক দিয়া অবস্থার অপ্রত্যাশিত কোনো পরিবর্তন ঘটিল না ; জিভে খারাপ লিভারের স্বাদের মতো ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া রহিল ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বদ গ্লানি। নিজের আলস্য, অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা ও অক্ষমতার জন্য অনুতাপের জ্বালা হইলে তার এতটা কষ্ট হইত না। নিজে সে কিছু করিতেছে না, তা যেন নয়। কিছু করিতে পারিতেছে না, তাও নয়। কিছু হইতেছে না। কোনো এক অজ্ঞাত অকারণে জীবনের কোনো এক অনির্দিষ্ট অনিয়মে, ব্যর্থতা না ঘটিয়াও সার্থকতার অভাবটা স্থায়ী হইয়া যাইতেছে।

আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে বোধ হয় ভালোই হইত—কিছুদিনের জন্য নষ্ট হইলে। আগুনে লোহা পোড়ানোর মতো এ বিপদ ছাড়া মানুষের চলে না। ত্রিষ্টুপ যে জানে একদিন সে সাফল্য লাভ করিবেই করিবে, এই জানাটাই তাকে ঠান্ডা লোহার মতো কঠিন করিয়া রাখিয়াছে, নূতন অবস্থার উপযোগী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চয় করিতে দিতেছে না। আগে নিজেকে নূতন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী করিতে না পারিলে, নিজের চেষ্টায় কে নূতন জীবন সৃষ্টি

করিতে পারিয়াছে ? কিছু ঘটিবে না, এ ভয় ত্রিষ্টুপের নাই। কিছু ঘটিতেছে না বলিয়া ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বিশ্রী অনুভূতিটাই শুধু সে বোধ করিতেছে, পথ খুঁজিবার তাগিদ পাইতেছে না। এ তো মনের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। রাজকন্যা ও রাজকুমারের মিলনে রূপকথার শেষ জানিয়াও কাহিনির মাঝখানে কুমারের বিপদের পর বিপদ ঘটার সময়ে অসহায় ক্ষোভে কাতর হওয়া চলে। নিজের মনের রূপকথায় নিজের এখনকার দুরবস্থায় ত্রিষ্টুপ অনায়াসে উদ্‌বিগ্ন হইতে পারিয়াছে।

বেতনের সমস্ত টাকাই ত্রিষ্টুপ বাপের হাতে তুলিয়া দেয়, অবিনাশ পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া তাকে পঁচিশ টাকা ফেরত দেন। এটা প্রায় নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিষ্টুপের মনটা খুঁতখুঁত করে। হাতখরচের জন্য অবিনাশ তাকে পঁচিশ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু সে জানে ওই টাকাটা কাটিয়া রাখিয়া বাকি বেতনটা সে যদি অবিনাশের হাতে দেয়, একটু তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন। টাকার পরিমাণের জন্য নয়, তার দরকার আছে জানিলে সব টাকাই তিনি অনায়াসে ফিরাইয়া দিবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রথমে তার টাকাগুলি তাঁর হাতে তুলিয়া দেওয়া চাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই ধরনের তুচ্ছ খুঁতগুলি চিরদিন ত্রিষ্টুপকে পীড়া দেয়।

টাকাপয়সা সম্পর্কে আর একটা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা ত্রিষ্টুপ সঞ্চয় করিয়াছে। চাকরি পাওয়ার পর রমেশ বার তিনেক তার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। সাহায্য নয়,—ঋণ, পরে শোধ করিবে। শেষবার সে যখন কুড়িটি টাকা ঋণ চাহিল, ত্রিষ্টুপের হাতে একেবারেই টাকা ছিল না।

বাবার কাছ থেকে চেয়ে দিচ্ছি।

বাবার কাছ থেকে ? তা—আমার নাম কোরো না কিন্তু ভাই।

বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন কী জন্য টাকা চাই ?

বোলো তোমার নিজের দরকার। নয় তো বোলো কোনো বন্ধু ধার চেয়েছে। আমার নাম কোরো না, সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে।

রমেশের বেকার অবস্থার জন্য ত্রিষ্টুপের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। নিজে সে হাতে পাওয়া চাকরি ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবে, সে বিশ্বাস করিত না যে চেষ্টা করিলে কোনো মানুষের পক্ষে দিন চলার মতো সামান্য উপার্জন করা অসম্ভব। রমেশের অবস্থার জন্য রমেশকেই সে দায়ি করিয়া রাখিয়াছে। তবু প্রভার স্বামী টাকা যখন চাহিয়াছে, না দিলে চলিবে না। বিরক্তিতে মন ভরিয়া অবিনাশের কাছে টাকা চাহিতে গেল।

অবিনাশ বলিলেন, কুড়ি টাকা ? কী করবি কুড়ি টাকা দি... ?

ত্রিষ্টুপ বলিল, দরকার আছে।

মা বলিলেন, অত খরচে হোসনে তিষ্টু।

অবিনাশ বলিলেন, দরকার আছে জানি। কী দরকার আছে শুনি না ?

ত্রিষ্টুপ বলিল, কী দরকার না জানলে টাকা দেবে না ?

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। আহত বিস্ময়ে তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মার হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

টাকা দেব না বলিনি তো, তিষ্টু। টাকা দিয়ে কী করবি তাই শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম।

ত্রিষ্টুপও তা জানে। অবিনাশের শুধু জিজ্ঞাসা, আর কিছু নয়। কুড়ি টাকার বদলে কুড়ি পয়সা চাহিলেও অবিনাশ এমনই ভাবে জানিতে চা...তেন পয়সাটা কী কাজে লাগিবে। বাড়ির বাহিরে যাইতে দেখিলে যেমন জিজ্ঞাসা করেন সে কোথায় যাইতেছে, এও তেমনই জিজ্ঞাসা।

তার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ছোটোবড়ো সব খবরই ওরা রাখিয়াছেন ; প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না এমন কিছু তার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, এ ধারণাই ওদের নাই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝতে পারিয়া মনটা ত্রিষ্টুপের বড়ো খারাপ হইয়া গেল। টাকা সে নিক, খরচ সে করুক, সেটা

ভিন্ন কথা। কীসে টাকা খরচ করিবে, এটুকু জানিবার অধিকার তার বাপ-মা দাবি করেন। টাকা যদি সে নষ্ট করিতে চায় তাও সে করুক। কিছু না বলার চেয়ে সে অনেক ভালো। এ গোপনতার মানেই স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা করা যে, এতদিন যা করিয়াছ, বেশ করিয়াছ, এখন হইতে আমার সমস্ত বিষয়ে তোমরা মাথা ঘামাইতে আসিও না। শুধু অবিনাশের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় আজ মতের অমিল, অবাধ্যতা আর কলহের চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

হাতে দেওয়ার বদলে টাকাটা ত্রিষ্টুপ রমেশের সামনে ফেলিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়া নয়, মনে অশ্রদ্ধা থাকিলে, সময় বিশেষে আপনা হইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া যায়।

রমেশ বলিল, শিগগির তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব ভাই, এক মাসের মধ্যে। কত যেন হল সবসুদ্ধ ?

টাকাটা ও ভাবে ছুঁড়িয়া দিয়া ত্রিষ্টুপ একটু অনুতাপ বোধ করিয়াছিল, রমেশের অমায়িকতা দিয়া অপমান চাপা দিবার চেষ্টায় আবার তার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।

তখন উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া রমেশ বলিল, তার মানে ? ও রকম বাঁকা করে কথা বলছ যে ?

বাঁকা করে কী বললাম ?

বুঝি, বুঝি। আমরা ও সব বুঝি। ভাবছ যে ধার বলে নিচ্ছে, তার মানেই তাই। কাজ নেই ভাই তোমার টাকা নিয়ে আমার, বরং কাবলিওয়ালাকে খত লিখে দেব।

দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ি ফেরা মাত্র প্রভা একতাড়া নোট হাতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রিষ্টুপকে দেখাইয়া নোটের তাড়া হইতে পঁচিশ টাকার নোট বাছিয়া সামনে ফেলিয়া দিল।

তোমার টাকা।

সুদ কই ? ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিল। এদের বিকৃত অভিমানেব পরিচয় তো সে জানে, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইল না।

নোটের তাড়াগুলি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে প্রভা নিজেই বলিল, চিরকাল কারও সমান যায় না। দুদিন অবস্থা একটু খারাপ হলে কী রকম যে করে সবাই ! সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেন ফতুর করে দিল। প্রভার চোখ জলে ভরিয়া যায়, মনে থাকবে সব, কত লাথি, ঝাঁটা, অপমান জুটেছে। এতদিন চুপ করে সব সয়েছি, আর তো চুপ করে থাকব না।

লাথি, ঝাঁটা, অপমান ! চুপচাপ সব সহ্য করা ! হাসিবে না কাঁদিবে, ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল না। সারাদিন প্রভা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিল। বাপ-মাকে কাঁদাইল এবং নিজেও কাঁদিল। সকলকে সে আঘাত করিতে চায় না, প্রমাণ করিতে চায় যে, এতদিন সকলের কাছে তার শুধু অনাদর আর অপমানই জুটিয়াছে। রমেশের চাকরি থাকিলে বাপের বাড়িতে দিন কাটানোর সময়ে সকলের যে কথা ও ব্যবহার তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকিত, রমেশের চাকরি ছিল না বলিয়াই সেই কথা ও ব্যবহারের মধ্যেই এতকাল কত কিছু আবিষ্কার করিয়া সে অভিমান করিয়াছে। নিজের এই বিকারকে সে সমর্থন করিতে চায়। সেই চেষ্টায় একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া সে রমেশের সঙ্গে চলিয়া গেল।

রওনা হওয়ার আগে রমেশ অবিনাশকে বলিল, আপনার খুব টাকার টানাটানি চলছে শুনছিলাম ?

অবিনাশ বলিলেন, কই না ? চলে যাচ্ছে এক রকম ! তিষ্টুর চাকরিটা হয়ে—

আমি কিছু টাকা দিলে কি আপনার অপমান হবে ? আমি তো আপনার ছেলের মতো।

অবিনাশের মনে ছিল না ; কিন্তু ত্রিষ্টুপের এখন মনে পড়িয়া গেল, রমেশ টাকা ধার চাহিতে আসিলে, তিনি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ধার দিতে পারব না, বাবা। ধার চাওয়াটাও তোমার উচিত হয়নি। তুমি এমনি টাকা নাও। আমার কাছে টাকা নিতে তোমার অপমান কী ? তুমি তো আমার ছেলের মতো। ছেলের মতো বলিয়া তাকে ধার দেওয়ার বদলে একেবারে দান করিতে চাওয়ায় রমেশের রাগ হইয়াছিল। এতদিন সেই রাগ মনে পুষিয়া রাখিয়াছে, আজ সেই ঝাল মিটাইতে চায়।

ত্রিষ্টুপের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। এক বিষয়ে এত তীক্ষ্ণ মান-অপমান জ্ঞান, এত তেজ, অথচ সবটাই বিকার। কতগুলি বিষয়ে মানুষটা সুস্থ ও স্বাভাবিক, আবার কতকগুলি বিষয়ে এমন খাপছাড়া বলিবার নয়। বেকার জীবন কি এমনই সব মানসিক রোগের সৃষ্টি করে ?

অবিনাশ আনন্দ ও আবেগে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিলেন। —না বাবা, অপমান কীসের ! এখন তো দরকার নেই, দরকার থাকলে তোমার কাছ থেকে নিতাম বইকী। নিজে চেয়ে নিতাম।

খোঁচাটা বিঁধিল না দেখিয়া রমেশ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই চলিয়া গেল।

কোথায় কী কাজ সে পাইয়াছে, এত টাকা হঠাৎ সে কোথা হইতে পাইল, এ সব স্পষ্ট করিয়া কিছুই তার কাছে জানা গেল না। প্রশ্ন করিয়া পাওয়া গেল শুধু ভাসাভাসা জবাব। ঠিক চাকবি নয়, এজেন্সির মতো কী যেন তার একটা জুটিয়াছে।

ত্রিষ্টুপের মনে আঘাত লাগিল বইকী ! স্বামীর ধার কবা পঁচিশটা টাকা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া প্রভা তাকে যেভাবে আঘাত কবিতে চাহিয়াছিল সে ভাবে নয়। রমেশের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনটাই তাকে যেন ঝাঁকি দিয়া গেল। রমেশ অপদার্থ, জীবনে কোনোদিন তার অভাব ঘুচিবে না, এই ছিল মানুষটা সম্বন্ধে তার ধারণা। কেবল পরিবর্তন নয়, নিজের অবস্থায় খুব ভালো রকম পরিবর্তনই সেই রমেশ করিয়াছে। তার কাছে মনে হইতেছে আকস্মিক, কিন্তু এ উন্নতি হয়তো রমেশের অনেক দিনেব চেষ্টার ফল।

স্বামীর সঙ্গে বিদায় হইয়া যাওয়ার তিন-চারদিন পরেই প্রভা একবার এ বাড়িতে আসিয়াছিল, যাওয়ার দিন যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছিল সে জন্য সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে।

কদিনের মধ্যে গায়ে গয়না চাপানোর সুযোগ সে পায় নাই, তবে নূতন যে কাপড়খানা পরিয়া আসিয়াছে তার দাম অনেক। তাকে পৌঁছিয়া দিতে গেল ত্রিষ্টুপ। প্রভাই একরকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। রমেশ একটি সুশ্রী নূতন বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটা আসবাব কিনিয়াছে দামি দামি। এতদিনের পুরানো জিনিসপত্রের গায়ে আঁটা দারিদ্র্যের পরিচয়ের মধ্যে স্বচ্ছলতার আরও অনেক চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভার কপাল ফিরিয়াছে ভাবিয়া এক দিকে ত্রিষ্টুপের বুকটা যেমন হালকা হইয়া গেল,—অন্য দিকে রমেশের মতো মানুষ যা পারিয়াছে নিজে সে তার চেষ্টা পর্যন্ত শুরু করিতে পারিল না ভাবিয়া মন তার ভারী হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, তার দ্বারা বোধ হয় কিছু হইবে না। সে শুধু কল্পনা করিতে জানে, তার শুধু স্বপ্ন দেখা। নিজে যে অক্ষম, অপদার্থ। নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই শুধু তার বড়ো।

আত্মবিশ্বাসে আগুন লাগার তাপে পুড়িতে পুড়িতে তার দিন কাটিতেছিল ; এক সপ্তাহ পরে রমেশকে পুলিশে ধরিয়া নিয়া গেল এবং প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল বাপের বাড়ি। ত্রিষ্টুপের মনে হইল, একটা চোখে যেন এতদিন তার দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ সেই পুরাতন অন্ধ চোখে নূতন দৃষ্টি আসিয়াছে।

পাঁচ

প্রথম কিছুদিন আপিসের কাজ কবিতে ত্রিষ্টুপের ভালোই লাগিল। জীবনে এ তার একটা নূতন অভিজ্ঞতা—অনেকের সঙ্গে কলম পিষিয়া পয়সা উপার্জন করা। নূতন সাথি, নূতন আবেষ্টনী। প্রথম কয়েক দিন সে ঘাড় গুঁজিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটানা কাজ করিয়া যাইত, মনোযোগের ছোটো ছোটো বিরামগুলিতে এই ভাবিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিত, সে কাজ করিতেছে, কাজ ! তার ছোটো ঘরখানাতে বিছানায় চিত হইয়া দেশবিদেশের চিন্তাবিদদের ছাপানো মতামতের চিন্তায় মগজ বোঝাই করার ছলে অমন বেকার জীবনযাপন করার বদলে, নিজের চিন্তা ও কল্পনার জাল বোনার বদলে কিছু একটা কাজ করিতেছে। গৃহের অসুস্থ মন তার যেন আপিসে চেঞ্জে আসিয়াছে। এ যেন প্রায় মুক্তির সমান।

প্রকাণ্ড একটা টেবিল ঘিরিয়া দশজন কর্মী বসে ; তাদের মধ্যে সে স্থান পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে আরও অনেকগুলি ছোটো ছোটো টেবিলে আরও অনেক সহকর্মী আছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ চারিদিকে তাকায়। ঘরের সোঁদাগন্ধি গরম বাতাসের ঘনত্ব যেন অনুভব করা যায়, দুটি ফ্যান পাক খাইতে খাইতে অবিরাম এলোমেলো আলোড়ন বজায় না রাখিলে বাতাস যেন আরও গাঢ় হইয়া জমিয়া যাইত। দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া বসানো প্রায় ছাতের সমান উঁচু কাঠের তাকগুলিতে গাদা করা কাগজপত্র—কত মানুষেব কত দিনকার কত পবিশ্রমেব ফল কে জানে !

আপিসের কয়েক জনের সঙ্গে ত্রিষ্টুপের একটু একটু ঘনিষ্ঠ পবিচয় হইয়াছে।

মুগ্ধবোধ নকল করছেন নাকি মুগ্ধ হযে ?

ত্রিষ্টুপ মুখ তুলিয়া একটু হাসে। টেবিলের অপর দিকে তার মুখোমুখি বসে সত্যেন। বয়স ত্রিষ্টুপের চেয়ে বেশি নয়—অভিজ্ঞতা বেশি। বছর তিনেক কাজ করিতেছে। একমাথা কোঁকড়া চুলে তার সাধারণ চেহারাটিকে একটু অসাধারণ কবিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ত্রিষ্টুপেব মনে হয়—তাব চুলগুলি হঠাৎ ও রকম অসাধারণ হইয়া গেলে লজ্জায় সে কারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

হুঁ হুঁ বাবা, মোহমুদ্গরের গুঁতো তো লাগেনি, টের পাবেন !

ডান পাশের নিকুঞ্জ। বেঁটে, মোটা, মাঝবযসি, ধীর স্থির মানুষ, ছোটো ছোটো চোখ দুটি কেবল সর্বদা পিটপিট করে। সে নাকি নতুন বিবাহ করিয়াছে, দ্বিতীয়বার। আধময়লা জামাকাপড় পরিয়াই কিন্তু সে আপিসে আসে, কেবল তেলে ভেজা চুলে সযত্নে টেবিকাটা আর কামানো মুখে স্নো-পাউডার লাগানো ছাড়া তার আর কোনো বাহার নাই। মাথাব সুগন্ধি তেলেব গন্ধটা সর্বদাই ত্রিষ্টুপেব নাকে লাগে।

অত স্পিডে কাজ করবেন না মশায়, মারা যাবেন শেষে। যত শিগগিব শেস কবে দেবেন, তত কাজ ঘাড়ে চাপাবে। একদম থই পাবেন না।

টাইপিস্ট ধীবেন। একটি ফুলস্ক্যাপ শিটে কয়েক লাইন টাইপ কবিয়া টাইপরাইটার যন্ত্রের চাবিগুলিতে হাত রাখিয়া চুপ কবিযা বসিযা আছে। মাঝে মাঝে চাবিগুলিতে বিদ্যুদ্‌বেগে তাব আঙুলের সঞ্চালন ত্রিষ্টুপ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু ধীরেন একটানা আঙুল চালায না, মিনিট দুই-তিন টাইপ কবিয়া আট-দশমিনিট বসিয়া থাকে, গল্প করে আর ইয়ার্কি দেয়। মাঝে মাঝে দশ-বিশমিনিট দ্রুত একটানা টাইপ করিয়া হাতের কাজ শেষ করিয়া, কাগজগুলি ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখে, তারপর ধীরে সুস্থে কর্তাদেব কাছে পাঠাইয়া দেয়। মন্থর গতিতে সে টাইপ কবিতে পারে না, আঙুল বাগ মানে না।

তিন মাসেব মধ্যে আপিস একঘেয়ে হইয়া উঠিল।

এমনিভাবে এক একটি বৈশিষ্ট্যেব মধ্যে নতুন নতুন মানুষেব পবিচয পাইযা, অবস্থাব সঙ্গে খাপ খাওযানোব জন্য তাদেব সকবুণ অন্তহীন লডাই দেখিযা, নিজেব জীবনে বৈচিত্র্য আসাব আনন্দ ও উৎসাহ ত্রিষ্টুপ অনুভব কবিতে লাগিল। বডো কিছু না হোক, এ ছোটো কাজই বা মন্দ কী ? এ কাজেও তো মানুষ মশগুল হইযা যাইতে পাবে।

প্রথম ত্রিষ্টুপেব কাছে ধবা পডিল—কাজ সহজ, অতি সহজ। মনোযোগ দেওযা অসম্ভব। তাবপব ধবা পডিল—এই সহজ কাজ কবিতে তাব সময লাগে দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত, কোনো কোনো দিন তাব চেযেও বেশি। স্কুলেব ছেলে অনাযাসে যা পাবে, সেই কাজ কবিতে তাব এত সময খবচ হয।

বাহিবে আকাশ ছাওযা মেঘেব বর্ষণ চলিযাছে, দিন দুপুবে ঘবে জ্বালা হইযাছে আলো। পাখা বন্ধ, হালকা ঠান্ডা বাতাসে সোঁদা গন্ধটা ভিজা ভিজা মনে হয। ঘবেব সকলেব মুখে মুখে ত্রিষ্টুপ চোখ বুলায—বন্দীত্বেব অনুভূতি তাকে যে কষ্ট দিতেছে কাবও মুখে কি তাব একটু ছাযা সে দেখিতে পাইবে না ? কুডি পঁচিশ বছব বযসেব যে সাত আটজন আছে, তাদেব মুখে ? মনটা হুহু কবিতে থাকে। সে একা, তাব কেহ নাই, সকলে তাকে ত্যাগ কবিযাছে। পাওযাব মতো কিছুই সে পায নাই, জীবনে কোনোদিন পাইবে না।

নতুন মাসেব গোডায এমনই বাদলাব দিনে বেতন পাওযা গেল। ছুটিব সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন, ধীবেন আব নিকুঞ্জ তাকে ঘিবিযা ধবিল।

কদ্দিন ফেলে বাখবেন ত্রিষ্টুপবাবু ? আজ আব ছাডছি না। বেশ বাদলাব দিনটা আছে।

চাকবি হওযাব জন্য এবা একদিন খাওযা দাবি কবিযাছিল। ত্রিষ্টুপেব মনে ছিল না।

নিশ্চয। বলুন কী খাবেন ?

চাবজনে সিঁডি বাহিযা নীচে নামিতেছে, অবিনাশ পিছন হইতে ডাকিলেন, ত্রিষ্টুপ ?

ত্রিষ্টুপ কাছে গেল।

টাকাগুলো দিযে যা, আমাব একটু দেবি হবে যেতে।

বাডি গিযে দেব। কজন বন্ধু ধবেছে খাওযাতে হবে।

দুটো টাকা বেখে বাকিটা দিযে যা। অতগুলো টাকা নিযে ঘুবে বেডাবি ? যা অসাবধান তুই ! আব শোন—অবিনাশ গলা নামাইযা ফিসফিস কবিযা বলিলেন, সংক্ষেপে সেবে দিস, অমন বন্ধু ঢেব খেতে চায। একটা চপ কি কাটলেট আব এক কাপ চা – ব্যস ! এক টাকাতেই হযে যাবে। তবু দুটো টাকাই ববং বাখ

বাডি গিযে দেবখন !

ত্রিষ্টুপ তবতব কবিযা নামিযা গেল। অবিনাশ আহত বিস্মযেব সঙ্গে ছেলেব দিকে চাহিযা থ বনিযা বহিলেন।

ত্রিষ্টুপ ছাডা তিনজনেই আজ যেন একটু বেশি উত্তেজনাপ্রবণ। নিজেদেব কথা আব হাসি তামাশাব মধ্যেই তিনজনে যেন বসেব অন্ত পাইতেছে না , বিশেষ কবিযা কেবানিবাবুদেব জন্য পবিচালিত এই সস্তা বেস্তোবায চপ-কাটলেট আব চা খাইতে খাইতে জীবনকে উপভোগ কবিতে মশগুল হইযা। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল, হাসিতেও যোগ দিল কিন্তু তিনজন ও একজনেব দুটি দল মিশ খাইতে পাবিল না কোনো বকমেই। এবং ত্রিষ্টুপেব দলে ভেডাব ব্যর্থ চেষ্টায ক্রমে ক্রমে সকলেব উৎফুল্ল ভাবটাও কেমন যেন নিস্তেজ হইযা পডিল।

বাস্তায নামিযা তিনজন কী যেন বলাবলি কবিল নিজেদেব মধ্যে, তাবপব নিকুঞ্জ বলিল, এ তিষ্টুপবাবু, বলি বাডি যাবেন নাকি এখন ?

কোথা আব যাব বলুন ?

আমাদের সঙ্গে আসুন না, একটু ফুর্তিটুর্তি করা যাক ?

ধীরেন বলিল, মাইনে পাবার পর আমরা একদিন একটু জমাই, ত্রিষ্টুপবাবু।

সত্যেন বলিল, কাল ছুটিও আছে।

ত্রিষ্টুপের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। মানুষের সঙ্গে সে মিশিতে পারে না, সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে ! সঙ্গীহীন অসহায়ের দুর্বোধ্য ভয়টাও পীড়ন করিতেছিল। উগ্র অন্ধ হিংসায় বন্ধু তিনজনকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষার অতি অমায়িক রূপ ও ব্যবহার। ওরা ফুর্তি করিতে চায়—ফুর্তি ! আজ কি তা সম্ভব ? তার পক্ষেও ?

নিকুঞ্জ বলিল, আমরা চাঁদা করে খরচ দি। যা খরচ হয়, চারজনে সমান সমান দেব। আসবেন ?

কত লাগবে ?

গোটা দশেক, আর কত ?

দশ টাকা ! এক সন্ধ্যার ফুর্তির জন্য দশ টাকা খরচ !

কিন্তু ওরা যদি পারে, সে কেন পারিবে না ? হাজার হাজাব টাকা সে একদিন উপার্জন কবিবে, দশ টাকা খরচের নামে তার চমক লাগে ? ধিক !

চলুন যাই।

পরদিন অনেক বেলায় ত্রিষ্টুপের ঘুম ভাঙিল একটা অস্থিরতার মধ্যে। রাত প্রায় একটায় সে বাড়ি ফিরিয়াছিল। বাড়ির সকলে জাগিয়াছিল তার প্রতীক্ষায়। দরজা খোলার পর ভিতবে আলোয় আসিয়া দাঁড়াইলে তার চেহারা দেখিয়া মা চাপা সুরে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, ত্রিষ্টুপের মনে আছে। অবিনাশ কী যেন একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দাঁড়ায় নাই, কোনো মতে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর এলোমেলো টানে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে দুহাতে চৌকির প্রান্ত চাপিযা ধরিয়া কিছুক্ষণ চিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। তারপর এতক্ষণে ঘুম ভাঙিয়াছে।

জলকাদায় পিছল সরু গলিতে ঢোকার পব হইতে শুরু হইয়াছিল তার ফুর্তি—দারুণ ভয, উদ্‌বেগ ও প্রত্যাশার উত্তেজনায়। তারপর এক দেয়ালচাপা বাড়ির দোতলায় ছোটো একটি ঘর—আলো আর ঠাসা আসবাবে সাজানো ঝলমল অদ্ভুত একটি ঘর। আর একটি মেয়ে—ঘরের মতোই যার একটি ছোটো দেহে দশটি দেহের গাদা করা সাজসজ্জা। তারপর নেশা—জীবনে প্রথম মদের নেশা। চাপা কষ্ট আর তীব্র উন্মাদনার অদ্ভুত সমাবেশ—মাটির ভয়ংকর টানে অবলম্বনহীন শূন্যে অবিরাম পড়ার মতো। শেষের দিকে নিকুঞ্জ ধেইধেই নাচিয়া ফুর্তি করিয়াছিল—বেঁটে মোটা, ধীর শান্ত নিকুঞ্জ, অল্পদিন আগে যে বিবাহ করিয়াছে দ্বিতীয়বার। কেমন মেয়েকে সে বিবাহ করিয়াছে ? কুন্তলার মতো ?

ঘরের সেই মেয়েটিকেও শেষের দিকে কুন্তলার মতো মনে হইয়াছিল। কতবার সে যে নিজের মাথায় ঝাঁকি দিয়াছে ! কী অদ্ভুত, কী বিচিত্র, কী বীভৎস একটি রাত তার কাটিয়াছে কাল ; একটু মদ খাওয়া ছাড়া কিছুই সে করে নাই, চুপচাপ বসিয়া শুধু চাহিয়া থাকিয়াছে। তবু তার মনে হইয়াছে, মুহূর্তে মুহূর্তে সে যেন উপার্জন করিতেছে এক অক্ষয় অমর সম্পদ। অভিজ্ঞতা নয়, চেতনার জাগরণ নয়, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

মাথা টনটন করিতেছে, সমস্ত শরীরে জ্বর-ছাড়া বিশ্রী অবসন্নতা বোধ করিতেছে। তবু তার আপশোশ নাই। সে ভুলিতে পারিতেছে না যে রহস্যময় জীবনের একটি ধর্ম সে আবিষ্কার করিয়াছে। মৃতপ্রায় মানুষও বিদ্রোহ করে, করিতে পারে। অবস্থার চাপে, শিক্ষা-দীক্ষা-আবেষ্টনীর চাপে, স্বাস্থ্যহীন

শুষ্ক নীরস একঘেয়ে জীবনের চাপে, মানুষ যত প্রাণহীন নিস্তেজ হোক, বিদ্রোহের প্রেরণা তার মরে না। তার সহকর্মী তিনজন তাই বেতন পাওয়ার পর মাসে একদিন ফুর্তি করে। আর কোনো পথ খুঁজিয়া পায় না, তাই এই ভীরু দুর্বল মানুষ তিনটি এইভাবে বিদ্রোহ করে। একঘেয়ে, নিরুপায়, অবসন্ন জীবনযাপনের বিরুদ্ধে, দিনের পর দিন কলের মতো সুবোধ সুশীল ভালো মানুষ হইয়া থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে!

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ানোমাত্র মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, বইয়ের শেলফটা ধরিয়া ত্রিষ্টুপ ভাবে, তা হোক। এ দুর্বলতা কিছু নয়। মন তার সবল হইয়াছে। আর কোনো দিন সে হতাশ হইবে না। হতাশা বোধ করিলেও আসিয়া যাইবে না কিছুই, সে শুধু হইয়া থাকিবে হৃদয় মনের একটা বদ অভ্যাস। যতদিন সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তার লড়াইয়ের ক্ষমতা আর কিছুতেই নষ্ট হইবে না। নিজের সমস্ত পাওনা আদায় করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো লড়াই কোনো দিন ভালোও লাগিবে না।

নীচে নামিতেই সে সামনে পড়িয়া গেল অবিনাশের। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চাহিয়াই নীরবে তিনি সরিয়া গেলেন।

রাণু জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ করেছে, মামা?

প্রভা খোঁটা দিয়া বলিল, তুমিও এমনি করে গোল্লায় যাবে, তা আমি আগেই জানতাম। চাকরি বাকরি করে নিজের ভাগনিকে একটা জামা পর্যন্ত যে কিনে দেয় না, মদ না খেলে সে খাবে কী!

অবিনাশ আড়াল হইতে হুংকার দিয়া উঠিলেন, চুপ কর প্রভা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। পাড়াসুদ্দু লোককে শুনিয়ে চিল্লাচ্ছেন মেয়ে, বোকা বজ্জাত কোথাকার!

উনানে কেটলি চাপাইয়া মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে প্রভাকে বলিলেন, জামাই তো চুনকালি দিয়েছে মুখে, ভাইয়ের একদিনের বদখেয়ালটা চেপেই যা না বাছা? তারপর কাঁদো কাঁদো হইয়া ত্রিষ্টুপকে বলিলেন, না বাবা, তুই লজ্জা করিস নে। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে ওনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি যা। তোর কিছু দোষ ছিল না, পোড়ারমুখো বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে—

অবিনাশ ইতিমধ্যে আড়াল হইতে সামনে আসিয়াছিলেন, বলিলেন, থাক থাক, ও সব কথা বলে আর কী হবে? টাকা যা আছে, দাও তো তিষ্টু। সব উড়িয়ে দাওনি তো?

ত্রিষ্টুপ সমস্ত টাকা আনিয়া অবিনাশের হাতে দিল। মোটে গোটা তেরো টাকা কম দেখিয়া অবিনাশ স্বস্তি বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া পাঁচটি টাকা ত্রিষ্টুপকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, দরকার হলে চেয়ে নিয়ো।

ত্রিষ্টুপ কিছুই বলিল না।

বেলা তিনটার পর জামাকাপড় পরিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কুন্তলার দিদির বাড়িতে গিয়া সে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবে। মনটা কেমন অশান্ত হইয়া আছে, ও বাড়ির শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনী আর দুটি শান্ত ও সুখী মানুষের সঙ্গ হয়তো তার মনটাকেও শান্ত করিয়া দিবে।

বাহিরে যাওয়ার আগে ত্রিষ্টুপ শুনিয়া গেল মা বলিতেছেন, এত বড়ো সোমত্ত রোজগেরে ছেলে, কদ্দিন থেকে বলছি একটা বিয়ে-থা দিয়ে দাও—

আর অবিনাশ বলিতেছেন, মেয়ে তো খুঁজছি—

মেয়ে খুঁজিতেছে, মেয়ে! তার বাপ তার জন্য মেয়ে খুঁজিতেছে! এমন হাস্যকর রকমের অশ্লীল ঠেকিল কথাটা ত্রিষ্টুপের কাছে। তার হইয়াছে বয়সকালের রোগ, সে জন্য এই ঔষধ প্রয়োজন। এর বেশি আর কিছু কি ভাবিয়াছে অবিনাশ? তার মা? মেয়ে খুঁজিয়া আনিয়া দিলে যথানিয়মেই সে প্রিয়া, সাথি, জননী ও গৃহিণী হইবে, এটা জানা কথা। কিন্তু জানা কথাটাও কি মনে পড়িয়াছে ওদের? মেয়ে বলিতে যে মানবজাতীয়া জীব বুঝায়, তাও বোধ হয় খেয়ালে আসে নাই।

এই ভাবে কিছু ভাবিতে গেলেই আগে ত্রিষ্টুপ গভীর জ্বালা বোধ করিত, মনে হইত মানুষ বড়ো হীন, জীবনে শুধু ক্লেদ ! আজ মৃদু আপশোশের সঙ্গে সে শুধু কৌতুক অনুভব করিল। বাড়িতে নাই বলিয়াই যে বাজারে সে মেয়ে ভাড়া করিয়াছে, এ কথা মনে করার জন্য বাড়ির লোকের উপর রাগ করা চলে না। এ রকম করে বইকী মানুষ, বাড়িতে বউ থাকিলে পর্যন্ত করে, নয়তো ভাড়া করার জন্য এত মেয়ে সংসারে থাকিত না। তাকে মহাপুরুষ মনে করিবার কোনো কারণ বাড়ির লোকের নাই। এটা তার ব্যক্তিগত অপমান নয়। সংসারে এ রকম অনুচিত বাস্তবতা থাকাটা মানুষেরই অপমান। একী ভয়ানক কথা যে যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে মানুষকে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়, ধরিয়া রাখিতে হয় যে, গোল্লায় যাওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ! এই ব্যাপারটাই ত্রিষ্টুপের বড়ো খাপছাড়া মনে হয়। এ রকম অভাব মানুষ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে কেন, মানুষের স্বভাব যাতে বিগড়াইয়া যায় ? চরিত্র একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় ? তার জন্মেব অনেক আগেই এ সব মানুষের ঠিক করিয়া রাখা উচিত ছিল। এতকাল মানুষ তবে কী করিয়াছে ?

এটুকু ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে যে এ সব অভাবের ফল, মাসকাবারের পর আপিসের তিন বন্ধুর ফুর্তি করার বিকৃত শখও ওই ধরনের বিকার। কিন্তু তার কতখানি তনুগত আর কতখানি মানসিক অভাববোধের চাপ, ঠিক কী ধরনের সেই অভাব এবং তার কারণ কী, এ সব সে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ত্রিষ্টুপ ভাবে, অবসর মতো দু-চারখানা বই পড়িতে হইবে এ বিষয়ে।

মণীশ বলিল, এমন দিশেহারা হলে কিছু হয় না, তিষ্টু।

দিশেহারা ?

তা ছাড়া কি ? আজ ভাবছ, ব্যাবসা করে বড়োলোক হবে, পরদিন ভাবছ জ্ঞান সঞ্চয় করা বিশেষ প্রয়োজন, আবার শখ চাপছে সমাজের দোষত্রুটি সংশোধন করবে, দেশকে স্বাধীন করবে। একটা মানুষ যদি ব্যবসায়ী, বিদ্বান, সংস্কারক, রাজনৈতিক সব কিছু হতে চায়, তার কিছুই হয় না।

ও রকম বলেছি নাকি ?

একদিন এক কথায় বলনি, নানান দিনের নানা কথাবার্তায় বলেছ।

ত্রিষ্টুপ মৃদু হাসিয়া বলিল, ও কিছু নয়। এ কথা সে কথা মনে হয়েছে বলেছি। কাজের বেলায় যা ধরব তাই করব।

কী ধরবে ? করবে কি করবে না, পারবে কি পারবে না, সে কথা এখন বাদ দিলাম। কী ধরবে ঠিক করেছ, তাই শুনি আগে ?

মণীশের কথায় মৃদু ব্যঙ্গের সুর ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল। আগেও মণীশ এই সুরে কথা বলিত, সে ভাবিত এটা তার স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গি। সে ছেলেমানুষ বলিয়া মণীশ এ ভাবে তার সঙ্গে কথা কয়। আজ তার মনে হইল, মণীশ এইভাবে তার কাছ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থন প্রার্থনা করে। আপিসে তার উপরওয়ালা নিরীহ অসহায় ও একান্ত অনুগত তাকে পিঠ চাপড়াইয়া যে ভাবে মিষ্টি সুরে কথা বলেন, তার সঙ্গে মণীশের কথা বলার বিশেষ পার্থক্য নাই।

ত্রিষ্টুপ বিচলিত হইল না। মনের যে পরিবর্তন মণীশের মৃদু তাচ্ছিল্য অনুভব করার ক্ষমতা তাকে আনিয়া দিয়াছে, সেই পরিবর্তনই অনেক কিছু তুচ্ছ করার ক্ষমতাও তাকে দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে মণীশের এটা দুর্বলতা।

কী ধরব ? আমি যা চাই।

সেটা কী ?

আমার যা নেই, সেই সব।

ও তো এক কথাই হল—তোমার যা নেই, তুমি তাই চাও। কিন্তু অভাবের শেষ নেই মানুষের, চাওয়ারও শেষ নেই। দুটো অভাব বেছে না নিলে, তুমি চাইবেই বা কী ? সব অভাব তো মেটে না মানুষের।

মণীশ ফস করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল।

ত্রিষ্টুপ হাত বাড়াইয়া বলিল, আমায় একটা দিন।

সিগারেট দিয়া মণীশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে চাহিয়া থাকে। ত্রিষ্টুপেব শান্ত নির্বিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটা তার কাছে এতক্ষণে ধরা পড়িয়াছে।

নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলিতেছে এমনিভাবে ত্রিষ্টুপ তারপর বলিতে থাকে, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মণিদা। কিন্তু ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না ঠিক করেছি। ওতে কোনো লাভ হয় না। ও বড়ো গোলমেলে ব্যাপার। ওটা আসলে ভবিষ্যতের হিসাব। কিন্তু একদিন আমি কী চাইব, এখন থেকে সেটা স্থির করে ফেলতে চাই, তাই ধাঁধা লেগে যায়। দশ বছর পরে কী চাইব, আজ কি আমি তা জানি ? কোনো একটা আদর্শ ধরতে পারলেও কথা ছিল। কিন্তু আপনি তো আমাকে জানেন, আদর্শের জন্য বেঁচে থাকার ধাত আমার নয়। আমি তাই ভেবেছি, নিজেকে বাঁধব না। আমি ঠিক করেছি, ভবিষ্যৎকে গড়ে উঠতে দেব। আজ আমার কাছে যা সবচেয়ে দামি, সবচেযে কাম্য, আমি সেটা পাওযাব চেষ্টা করব। সে জন্য যদি ভবিষ্যতের মস্ত কোনো পাওয়া ফসকে যায়, যাবে। বড়ো ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার ভয়ে এতদিন কিছু গ্রহণ করার নামেই আমার আতঙ্ক হয়েছে, যদি বোঝা বেড়ে যায়। এখনও আমি বড়ো হতে চাই, যদিও ঠিক জানি না ভবিষ্যৎটা কী রকম হলে আমি খুশি হব। কিন্তু সব দিক দিয়ে নিজেকে ব্যথিত করার সাধ আমার নেই। এখন থেকেই আমি পাওনা আদায় করতে করতে চলব, মণিদা।

সে তো ভালো কথা ত্রিষ্টুপ।

একটু চিন্তিত ও বিষণ্ণভাবেই যেন মণীশ কথাটা বলিল। আজ প্রভাতের অভিনব উপলব্ধি এখন কথায় প্রকাশ করিবার সময়ে ত্রিষ্টুপ মণীশের কাছে সমর্থন পাওয়ার কথা ভাবে নাই, নিজের মনেই বলিয়া গিয়াছে। এখন সে উৎসুক দৃষ্টিতে মণীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জানালা দিয়া ঘরে একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। মণীশ চাহিয়া দেখিতেছে তার সিগারেটের জ্বলন্ত মুখ হইতে নীলাভ ধোঁয়ার আঁকাবাঁকা ঊর্ধ্বগতি। সে যে কী ভাবিতেছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম, মণিদা।

আমার কাছে ? কী ব্যাপার ত্রিষ্টুপ ?

আমি কুন্তলাকে বিয়ে করতে চাই।

মণীশ এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তা হয় না, তিষ্টু।

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে ত্রিষ্টুপ থতোমতো খাইয়া গেল। অসহায়ের মতো প্রশ্ন করিল, কেন ?

এতদিন তার জানা ছিল, সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে কি করিবে না, সমস্যা শুধু এই। তার খুশি হইলেই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে পারে, কারও আপত্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই ধারণা লইয়াই সে এতদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে যে এখন বিবাহ করিয়া জড়াইয়া পড়িতে তার কোনো মতেই চলিবে না, তা কুন্তলাই হোক আর যেই হোক। আজ খানিক আগে মনস্থির করিয়া ফেলিবার সময়েও সে ভাবিতে পারে নাই, কেন মণীশ অমত করিবে।

বোনের বিয়ে দেওয়া সম্পর্কে তুমি তো আমার মতামত জানো, ত্রিষ্টুপ। যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে, তার সঙ্গেই আমি ওর বিয়ে দেব।

ত্রিষ্টুপের মনে হইল—মণীশ যেন তাকে গাল দিয়াছে। তার সঙ্গে বিবাহ হইলে কুন্তলা সুখী হইবে না। সে যে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে, তাই কি মেয়েটার পরম সৌভাগ্য নয় ? মণীশ কি এমনই মূর্খ যে, এই সহজ কথাটা তার কাছে এখনও ধরা পড়ে নাই, তার সঙ্গে বিবাহ না হইলেই চিরদিনের জন্য কুন্তলা অসুখী হইয়া যাইবে ? তার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে সুখী হওয়ার উপায় এ জীবনে কুন্তলার আর নাই ?

আমার সঙ্গে কুন্তলা সুখী হবে না ?

না ভাই। তোমাদের মিল হবে না। ও তোমার যোগ্য নয়।

মণীশ কি তামাশা করিতেছে তার সঙ্গে ? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ত্রিষ্টুপ তার মুখ দেখিয়া মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলে, আপনি ওর মত জানেন ?

মত জানি না। মন জানি।

তবে ?

মণীশকে আশ্চর্য হইয়া যাইতে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, প্রশ্নটা একটু গোঁয়ারের মতোই করা হইয়াছে। এটা ঠিক প্রশ্ন হয় নাই, হইয়াছে কৈফিয়ত তলব। কুন্তলার মনের ভাব কী, সে বিষয়ে যেন কারও কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না ; সুতরাং কুন্তলার মন জানিয়াও মণীশ অমত করিতেছে কেন ? হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের বুকের একটি স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায়। কুন্তলার মনোভাব সম্পর্কে সে এত নিশ্চিত হইল কীসে ? তার জন্য কুন্তলার হয়তো কোনো মাথাব্যথা নাই, সবটা তার নিজেরই কল্পনা ?

কুন্তীর সঙ্গে কি তোমার কোনো কথা হয়েছে, ত্রিষ্টুপ ?

না।

তবে ?

মণীশের পালটা প্রশ্নে ত্রিষ্টুপ একেবারে নিভিয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিল, আপনাকেই জিজ্ঞেস করছিলাম।

তা করনি ভাই। তোমার কথা শুনে মনে হল আমার চেয়ে কুন্তীর মন তুমিই ভালো জানো। এ তো ভারী মুশকিলে ফেললে তুমি আমাকে !

আমার তাই মনে হয়। অবশ্য আপনি যদি বলেন—

আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হবে ? আমি হলাম ওর দাদা, গুরুজন। তুমি ভাববে, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, কিংবা জানলেও কর্তামি করার জন্য ছেলেমানুষি বলে সব উড়িয়ে দিচ্ছি। তার চেয়ে এক কাজ করি, ওকে ডেকে দি। তুমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।

ত্রিষ্টুপ অভিভূত হইয়া বলিল, ও ছেলেমানুষ—

তবে ওর মনের কথা তুললে কেন ?

মণীশের কণ্ঠের রুক্ষতায় আহত হইয়া ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

সে জন্য ছেলেমানুষ বলিনি। আমি বলছিলাম, আপনার অমত আছে জেনে ও হয়তো মনের কথা বলতে পারবে না।

মণীশ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, জানো তিষ্টু, তোমার মনের এই জটিলতার জন্যই আমি অমত করছি। সহজভাবে কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। আমার মত আছে, কি অমত আছে, কুন্তী জানবে কী করে ? আজ এসে তুমি প্রথম কথা তুললে। এ বিষয়ে আমরা কখনও আলোচনা করিনি।

আমি বুঝতে পারিনি মণিদা।

মুশকিল তো হয়েছে সেইখানে। সব কথাই তুমি নিজের মতো করে বুঝে নাও। যেভাবে তুমি নিজে বুঝতে চাও সেই ভাবে।

এ ঠিক মন্তব্য নয়, সমালোচনা। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও কঠোর সমালোচনা স্বীকার করা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা ত্রিষ্টুপের ছিল না। নিজের সম্বন্ধে নিজেরই তার কত সংশয় আছে, কত প্রশ্ন আছে। কী করিবে স্থির করিয়া ফেলার সঙ্গে ও সব দ্বিধা সন্দেহের মীমাংসা তো আর হইয়া যায় নাই। কতদিক দিয়া কতভাবে নিজেকে তার আবিষ্কার করিতে হইবে, তাও কি এখনও সে জানে ? তার সম্বন্ধে কেউ জোরের সঙ্গে কোনো মত প্রকাশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সত্য কি মিথ্যা, ঠিক করিয়া ফেলিবার মতো ভালো করিয়া এখনও সে নিজেকে চেনে না। মণীশের কথায় তার মধ্যে শুধু তীব্র একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নিজেকে পরাজিত, অক্ষম, অপদার্থ মনে হইতে থাকে। নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা শুরু করিয়া গোড়াতেই সে হার মানিল। তার প্রথম চাওয়া, প্রথম দাবি ব্যর্থ হইয়া গেল। অথচ কত সহজ সে ভাবিয়াছিল কুন্তলাকে পাওয়া !

আমি যাই, মণিদা।

পরিচিত ঘরখানা যেন অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরে যাইবে ভাবিয়া সে আগাইয়া যায় দরজার বদলে জানালার দিকে। জানালার কাছে এক মুহূর্ত বিফলের মতো দাঁড়াইয়া থাকে, যেন ভুলিয়া গিয়াছে এবার সে কী করিবে। তারপর হঠাৎ সচেতন হইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

তিষ্টু, শোনো।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিতে পায় মণীশ চিন্তিত ভাবে তার দিকে তাকাইয়া আছে।

একটু বোসো, তিষ্টু।

ত্রিষ্টুপ নীরবে বসিয়া পড়িল।

আমি কুন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো, ও যদি রাজি থাকে আমি অমত করব না।

আপনিই বরং জিজ্ঞেস করুন।

মণীশ মৃদু একটু হাসিল। সে ত্রিষ্টুপের ক্ষোভকে পরিণত করিয়া দিল ক্রোধে। খেলা করিতেছে, তার সমস্ত জীবন লইয়া মণীশ খেলা করিতেছে !

না, তোমার জিজ্ঞেস করাই ভালো, তিষ্টু। আমি জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেবে আমি জানি। বলবে, আমি কিছু জানি নে দাদা, তোমার যা খুশি কর।

ত্রিষ্টুপ ভাবিল, বটে ! কুন্তলার দাদা-ভক্তি এত গভীর !

তাছাড়া তোমার কথাটাও একটু ভাবতে হবে বইকী। তুমি ইচ্ছে করলে আমি যা বলেছি কুন্তীকে জানিয়ে দিতে পারো, তিষ্টু। ও রাজি হলে আমি অমত করব না।

মণীশ চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কুন্তলা ঘরে আসিল।

বলুন কী ফরমাশ আছে !

বোসো, কুন্তলা।

কুন্তলা বসিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইল রহিল।

মণিদাকে বলছিলাম, তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।

ও ! বলিয়া কুন্তলা তার মুখ হইতে দৃষ্টিটা শুধু মেঝেতে নামাইয়া লইয়া গেল।

তুমি তো জানো আমি তোমাকে—

দাদা কী বললেন ? ত্রিষ্টুপের প্রেম নিবেদনে বাধা দিয়া কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল।

তোমার মত জানতে বললেন।

ত্রিষ্টুপ জবাবের প্রতীক্ষা করে। কুন্তলা চুপ করিয়া থাকে।

মণিদা বললেন, তুমি রাজি থাকলে তিনি মত দেবেন।

আমি কিছু জানি নে।

তুমি রাজি আছ তো ?

দাদা যা বলবেন।

ত্রিষ্টুপ কথা খুঁজিয়া পায় না। কুন্তলাকে তার খাপছাড়া, অদ্ভুত মনে হয়। চোখটি শুধু সে নত করিয়া রাখিয়াছে, কোনো উত্তেজনার চিহ্নই তার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কথা বলিতে গলাটি পর্যন্ত তার একটু কাঁপিয়া যাইতেছে না। অতি তুচ্ছ সাধারণ কথা যেন তারা আলোচনা করিতেছে।

তোমার ইচ্ছেটা আমায বলো। তারপর মণিদাকে জানাব।

আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

তোমার ইচ্ছে নেই !

কুন্তলা চোখ তুলিয়া তার মুখে দৃষ্টি বুলাইয়া দেওয়ালেব দিকে চাহিল।

তা নয। দাদা যা বলবেন তাই হবে। আমায কেন জিজ্ঞেস করছেন ? আমি কিছু জানিনে।

তুমি এ কী কথা বলছ কুন্তলা ?

কেন ?

মণিদা কি তোমার ভালো-লাগা না-লাগা ঠিক কবে দেন ? তোমাব নিজের শখ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই ? পছন্দ নেই ?

তা কেন থাকবে না ?

আমাকে তুমি পছন্দ কর ?

এ পছন্দের কথা নয়।

ভালোবাস ?

তা জানি না।

খানিক আগে ঘরটা যেমন অপরিচিত ঠেকিয়াছিল, কুন্তলাকে এখন ত্রিষ্টুপেব তেমনই অপরিচিত অজানা অচেনা মনে হইতে লাগিল। কুন্তলা যে কোনোদিন তাব কাছে এত সহজে বিনা চেষ্টায় এমন একটা ধাঁধা হইযা উঠিতে পাবে, ত্রিষ্টুপ কোনোদিন কল্পনাও কবিতে পাবে নাই।

আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি খুশি হবে ?

জানি না।

তুমি তবে বাজি নও ?

আমি রাজিও নই, অরাজিও নই। কেন এ সব জিজ্ঞেস করছেন আমাকে ? যা বলবাব দাদাকে বলুন।

এ জবাবের পর আর কোনো কথা চলে না। আর কিছু বলার সুযোগও কুন্তলা তাকে দিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ত্রিষ্টুপ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। কী জানা গেল এতক্ষণ জেরা করিয়া ? কিছুই নয় ? তার সম্বন্ধে কুন্তলার অনুরাগ বা বিরাগ নাই, অন্তত আছে কি নাই, কুন্তলা নিজে সে হিসাব রাখে না, এটা অবশ্য জানা গিয়াছে। কিন্তু ও জানা জানাই নয়। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ত্রিষ্টুপকে পীড়া দিতে লাগিল, সে যেন কী একটা ছেলেমানুষি করিয়াছে—কুন্তলার কাছে করিয়াছে ! তার নিজের স্বপ্নকে বাস্তব প্রমাণ করার জন্য শিশুর সঙ্গে তর্ক করার মতো ছেলেমানুষি।

মণীশ আসিলে সে ঝাঁঝালো গলায় বলিল, মণিদা, এমনি করে আপনি বোনদের মানুষ করেছেন ?

কেমন করে তিষ্টু ?

চারিদিক থেকে মনের আঁটঘাট বেঁধে রেখে ? আপনি বলে দিলে তবে কুন্তলা বুঝতে পারে ওর কী ভালো লাগে, কী ভালো লাগে না !

মণীশ মৃদু হাসিল।—তুমি ভুল করছ তিষ্টু। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। কুন্তলার মন স্বাধীন ভাবেই গড়ে উঠেছে। আমি শুধু ওর মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি হতে দিইনি। ওকে নিয়ে তোমার মনে যে প্রতিক্রিয়া চলছে, ও তা ধারণাও করতে পারবে না।

ত্রিষ্টুপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মণিদা। আমি কুন্তলাকে বিয়ে করব।

বলিয়া মণীশকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

ত্রিষ্টুপের মনে হইল, আবার তার চিন্তাজগতে একটা ওলট পালট ঘটিবাব উপক্রম হইয়াছে, বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন রাত্রে হইচই করার পর যেমন হইয়াছিল। মনের অনেকটা আশ্রয় তার ভাঙিয়া গিয়াছে। বড়ো একটা ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে নতুন দৃষ্টির আলোয় আরও কত ছোটো ভুল যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তার সংখ্যা হয় না। অনেক ধারণা তাকে বদল করিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে ; নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্য যাচাই করিবার জন্য শিখিতে হইবে নূতন হিসাবশাস্ত্র।

সবচেয়ে ভয়ানক কথা, এবারের ধাক্কায় তার আত্মবিশ্বাস যেন একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মনে হইতেছে, এ আত্মবিশ্বাসের মূল্য কী যা নিজের ভুল ধারণাকেই শুধু প্রশ্রয় দেয়, যা অন্ধ একগুঁয়েমির শামিল ?

কয়েকদিন মনের এলোমেলো গতির কোনো হদিস ত্রিষ্টুপ পায় না। কখনও নিজেকে অকথ্য রকমের বিব্রত ও বিপন্ন মনে হয়, কখনও রাগে গা জ্বালা করিতে থাকে, কখনও হৃদয়ের সমস্ত চাপল্য ডুবিয়া যায় গভীর উদাস ভাবের থমথমে ব্যথিত শান্তিতে।

অথচ নিজের মধ্যে যে পরিবর্তনের জন্য সে অপেক্ষা কবিয়া থাকে, সে পরিবর্তন আর আসে না। ভিতরে কেবল তোলপাড়ই চলিতে থাকে। আগের বার পরিবর্তন আসিয়াছিল স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত, কী করিবে, কোন পথে চলিবে নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কী করিবে জানা থাকিলেও, এবার যেন কোনো মতেই খেয়াল হইতেছে না কোন পথে চলা দরকার। দিশেহারা ভাবটা কোনো মতেই কাটিতেছে না।

কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে।

এটা তার করা চাই। মণীশের মত না থাক, কুন্তলা তাকে পছন্দ না করুক, কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে। এটা জিদের কথা নয়, গোয়ার্তুমি নয়। এই তার সংকল্প। প্রেম চুলোয় যাক, সুখের নীড়ের স্বপ্ন আকাশে থাক। সে পুরুষ, সে কুন্তলাকে চায়। তাই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে। কুন্তলা তার কাম্য এবং প্রাপ্য—ওকে সে আদায় করিবে। যে ভাবেই হোক।

এ পর্যন্ত কোনো গোলমাল নাই। প্রশ্ন শুধু এই—কী ভাবে ? নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব তার জোটে না।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাবার প্রক্রিয়া এখনও না জানায় ত্রিষ্টুপ বড়ো মুশকিলে পড়িয়াছে।

মা বলেন, তুই কিছু মনে করিসনে বাবা।

ত্রিষ্টুপ চমকাইয়া ওঠে, কী বলছ তুমি ?

বলছি কী, ওঁর নানারকম বাতিক। উনি কী বলেন, করেন তাতে তুই রাগ করিসনে বাবা।

ও, এই কথা।

ত্রিষ্টুপ স্বস্তি বোধ করে। প্রথমে তার মনে হইয়াছিল মণীশদের বাড়ি হইতে খবরটা বুঝি এ বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং মা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বলিতে আসিয়াছেন, তুই ভাবিসনে বাবা, কুন্তলার চেয়ে লক্ষগুণে সুন্দরী লেখাপড়া গানবাজনা জানা বউ তোর জন্য এনে দেব !

একবার এক মুহূর্তের জন্য ত্রিষ্টুপের মনে হইল, মাকে বলিলে কেমন হয় ? মার কাছে তার মনের কথা জানিয়া বাবা যদি মণীশের কাছে নূতন করিয়া বাঙালি প্রথায় আবার প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন, কোনো ফল হওয়ার আশা আছে কি ?

তারপর মণীশের কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। অত সহজে মণীশের মত বদলায় না। মণীশ শান্ত কিন্তু বড়ো শক্ত। না ভাঙিয়া ওকে মচকানো যাইবে কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে বরং রমলার সঙ্গে পরামর্শ করিলে কাজ দিতে পারে।

বিকালে ত্রিষ্টুপ রমলাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে, পথের মোড়ে মণীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হঠাৎ কী যে খেয়াল চাপিল ত্রিষ্টুপের !

মণিদা ?

কী খবর তিষ্টু।

কেমন একটু লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ হইতেছে, মুখ তুলিয়া মণীশের চোখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল, তারও লজ্জা-সংকোচ আছে !

মা বলছিলেন, কুন্তলাকে একবার দেখতে চান। পাঠিয়ে দেবেন ?

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

তুমি কি মাকে বলেছ ?

না।

তবে হঠাৎ— ?

কুন্তলার কথা মাঝে মাঝে মাকে বলতাম—এমনি কথায় কথায়। সেই জন্য হয়তো দেখতে ইচ্ছে হয়েছে মেয়েটি কেমন। গায়ের জোরে মুখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ সোজা মণীশের চোখের দিকে তাকায়, হয়তো অন্য কথাও ভাবছেন, বলতে পারি না।

আচ্ছা কুন্তলাকে বলব।

আমার কোনো মতলব নেই মণিদা।

তোমার কী মতলব থাকবে।

আপনি যদি কিছু ভাবেন, আপনার যদি ভয় হয় তাই বলছিলাম।

মণীশ শান্তভাবে সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, এখনও তোমার মন শান্ত হয়নি তিষ্টু ? এ তো ভারী দুঃখের কথা হল।

ত্রিষ্টুপ প্রাণপণ চেষ্টায় একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। না না, ভাববেন না। ও সব কিছু নয়।

রমলাদের বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত পথ ত্রিষ্টুপ শুধু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গেল। হঠাৎ এই পাগলামি করার মানে কী ? মণীশকে মিথ্যা বলিয়া কুন্তলাকে দু-একবার বাড়িতে বেড়াইতে আনিয়া তার লাভ কী ?

নিজের মনের কথাটা নিজের কাছেই ত্রিষ্টুপের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, আর কিছু নয়, মাঝে মাঝে বাড়িতে আনিয়া কুন্তলাকে বশ করিবে। যেন সুযোগ পাইলেই মেয়েদের বশ করা যায়, দিনের পর দিন বাহুবন্ধনে পাইয়াও কত স্বামী যে স্ত্রীর মনটা পায় নাই !

তারপর চিন্তাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ও রকম বশ করিয়া কি কোনো লাভ হইবে মণীশের বোনকে ? বশীকরণ সম্পূর্ণ হওয়াব পরেও কি মণীশের বোন বলিবে না : আমি কিছু জানিনে, দাদাকে জিজ্ঞেস করুন ? কুন্তলা যে এখন তাকে ভালোবাসে না তাই বা কে বলিল ! ভালোবাসিয়াও হয়তো সে বলিয়াছে, দাদার কথাতেই তার মরণ-বাঁচন, তার নিজের কোনো পৃথক ইচ্ছা নাই।

মণীশকে ত্রিষ্টুপের রূপকথার দানবের মতো মনে হয—তার রাজকন্যাকে সে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। এমন ঘুম পাড়াইয়াছে যে, রাজপুত্র আসিয়া জাগাইলেও, সে জাগে না—জাগিয়াও তন্দ্রার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু কুন্তলাকে জাগানো চাই, মণীশের মন্ত্রের প্রভাব ব্যর্থ করা চাই।

যদি চাই—তবে দোষ কী ? কী দোষ এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে, যখন তাকে বিবাহ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না, তার সঙ্গে কুন্তলার বিবাহ দেওয়া ছাড়া মণীশেব কোনো উপায় থাকিবে না ?

ভাবিলেও ত্রিষ্টুপের মাথা ঝিমঝিম করে, গলা শুকাইয়া যায। দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সে নির্জন ঘরে, জরাজীর্ণ ট্রামে-বাসে নিজেব সঙ্গে লড়াই করে। না, এতে কোনো দোষ নাই। তার উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়, সে তো বিবাহ কবিবে কুন্তলাকে। আব কোনো উপায যখন নাই, এ উপায়টি বর্জন কবা কাপুরুষতা।

শিশির নামে ত্রিষ্টুপের একজন বন্ধু ছিল, পাড়াতেই বাড়ি। বাড়ির সকলে দেশে গিয়াছে, বাড়িটা খালি। শিশির কেবল বাড়িতে থাকে, খায় মেসে।

শিশিরের আপিস যাওয়াব সময়ে ত্রিষ্টুপ একদিন সদবেব তালার চাবিটা চাহিযা বাখিল।

কেন ?

কাজ আছে।

আচ্ছা ? শিশির হাসিতে হাসিতে আপিস চলিযা গেল।

দুপুরবেলা ত্রিষ্টুপ গেল মণীশদের বাড়ি। মণীশও বাহিরে যাইতেছিল, ত্রিষ্টুপের মুখ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা কবিল, তোমার জ্বর হয়েছে নাকি তিষ্টু ?

ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা কবিয়া বলিল, না—সাবান দিয়েছি, তাই চুল উশকো-খুশকো দেখাচ্ছে।

চুল তোমার বেশ চকচক করছে, টেরি ভাঙেনি। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে তুমি বড়ো অভিমানী, বড়ো একগুঁয়ে, না ?

ছিলাম একটু এখন ভালো ছেলে হয়ে গেছি। কুন্তলাকে নিযে যেতে এসেছি মণিদা।

মণীশ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে। প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টিতেই সে ত্রিষ্টুপেব মুখেব দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু চোখে তার একটু সময়ের জন্য কঠিন প্রশ্ন উঁকি দিয়া যায়।

নিয়ে যাও।

ডাকিলেই কুন্তলা আসিল। তাকে দেখিয়াই ত্রিষ্টুপের মুখ যে একেবারে বিমর্ষ পাংশু হইয়া গেল, কেহ লক্ষ করিল কিনা, জানা গেল না।

তিষ্টু তোমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে কুন্তী।

এখন ?

তাই তো বলছে তিষ্টু।

যাব ?

কুন্তলার এই একটি প্রশ্নে, মণীশের কাছে অনুমতি চাওয়ায়, ত্রিষ্টুপের বিবর্ণ মুখ চোখের পলকে রাঙা হইয়া গেল। কুন্তলার প্রশ্নের জবাব না দিয়া, মণীশ তার মুখেব দিকে চাহিয়া আছে খেয়াল করিয়া, জোরে সে নীচের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল।

মণীশ তখন বলিল, যা।

কুন্তলা বলিল, চলুন যাই।

ত্রিষ্টুপ বলিল, রিকশা ডাকি ?

রিকশা কী হবে ?

কাপড় বদলে এসো তবে। আমি বসছি।

কাপড় বদলাতে হবে না। চলুন।

মণীশ বাহিরে যাইতেছে, সে যদি তাদের সঙ্গ নেয় ? মণীশ চলিয়া যাওয়াব খানিক পরে তাদের বাহির হওয়া দরকার।

এক গ্লাস জল দেবে কুন্তী ?

দিই। কুন্তলা জল আনিতে গেল।

মণিদা, আমি একটু বিশ্রাম করে—

মুখ ফিরাইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিল—মণীশ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে, সে টেরও পায় নাই।

শিশিরদের বাড়ির সদর দরজায় ত্রিষ্টুপ তালা দিয়া যায় নাই, দরজা খোলাই ছিল। কুন্তলা ভিতরে গেলে ত্রিষ্টুপ দরজা বন্ধ করিল। কুন্তলা এ-কথা সে-কথা বলিতেছিল, তার যেন মুখ খুলিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে সায় দিতে গিয়াও ত্রিষ্টুপের গলায় আটকাইয়া যাইতেছিল। সব কেমন অবাস্তব, স্বপ্নের মতো মনে হইতেছে, অথচ বাস্তবতার অনুভূতির চাপে প্রাণটা তার হাঁসফাঁস করিতেছে। নিজেকে কত বার এই পরিস্থিতিতে ধীর স্থির আত্মপ্রতিষ্ঠ বীরের মতো সে কল্পনা কবিয়াছে, কুন্তলাব কাল্পনিক আর্তনাদে পর্যন্ত সে বিচলিত হয় নাই, সংকল্পে অটল থাকিযাছে। কুন্তলাকে সঙ্গে কবিযা বাড়িতে ঢুকিবার আগে হইতেই যে তার হৃদয়-মন এমন অবাধ্যপনা আবম্ভ কবিবে, কে জানিত !

উপরে শিশিরের দাদার শোবার ঘবে সে কুন্তলাকে লইযা গেল। ঘবে বসিবার ব্যবস্থাও ছিল, খাটে বিছানাও পাতা ছিল। পাশাপাশি বালিশ পাতা নবপরিণীত স্বামী-স্ত্রীর সেই শয্যার দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপ যেন চমকিয়া গেল। কুন্তলার পিছু পিছু সবে সে ঘরেব ভিতরে পা দিযাছিল, হঠাৎ নিঃশব্দে বাহির হইয়া বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুন্তলা ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিযা রহিল। ত্রিষ্টুপকে ডাকিল না, কোনো প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না।

কুন্তলার এই নীরবতাই শেষ পর্যন্ত ত্রিষ্টুপকে ভিতবে টানিয়া আনিল।

এটা আমাদের বাড়ি নয় কুন্তী।

জানি।

কুন্তলা আবার বলিল, আপনাদের বাড়ি আমি চিনি।

তবে এলে কেন ?

দাদা আসতে বললেন।

ত্রিষ্টুপ একটা চেয়ার টানিয়া কুন্তলার মুখোমুখি বসিল।

এ বাড়িতে কেউ নেই জানো ?

জানি।

তবে যে এলে ?

বললাম তো দাদা আসতে বললেন।

ত্রিষ্টুপ এবার চটিয়া গেল। দাদা ! দাদা ! দাদা ! তোমার মতো এমন দাদাভক্ত কখনও দেখিনি কুন্তী।

কুন্তলা একটু হাসিল।

ত্রিষ্টুপ আরও চটিয়া গেল।—তোমায় এখানে কেন এনেছি জানো ? বিয়ে কবব বলে। দরকার হলে জোর করে বিয়ে করব বলে। বুঝতে পারছ সেটা কী ?

কুন্তলা মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, দাদা বলছিল, আপনি ভয়ানক একগুঁয়ে।

ত্রিষ্টুপ ক্লিষ্ট জ্বালাভরা হাসি হাসিল।—একগুঁয়ে ? তোমার দাদা তাই জানে। একগুঁয়ে হলে, এত করে তোমাকে এখানে এনে মত বদলাতাম না কুন্তী। আমার এতটুকু মনের জোর নেই। তোমাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।

ছেড়ে না দিলে কী হত ?

আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার কোনো উপায় থাকত না। মণিদাকেও বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে হত।

কুন্তলা মুখ নিচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আপনি দাদাকে জানেন না। ত্রিষ্টুপ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বল কী ! আজ আমাদের আসল বিয়েটা হয়ে গেলেও, তোমার দাদা সামাজিক বিয়ে দিতেন না ? বেশ, বেশ ! তারপর তোমার দাদার পছন্দমতো বরের সঙ্গেই বিয়ের আয়োজন হলে, তুমিও বোধ হয় দাদার আজ্ঞা মাথায় করে রাজি হয়ে যেতে ?

দাদা আপনাকে চেনেন, তাই আমাকে আসতে দিয়েছেন। দেখছেন তো দাদার ভুল হয়নি ?

ত্রিষ্টুপের সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া মণীশের বিরুদ্ধে একটা দুঃসহ ক্রোধে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কুন্তলাব কথায তার মাথা খারাপ হইয়া গেল।

ভুল হয়নি ? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি ভুল হয়েছে কিনা !

কুন্তলার হাত ধরিয়া সে হিড়হিড় কবিয়া বিছানার কাছে টানিয়া লইয়া গেল। নিজে বসিয়া দুহাতে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সে অনুভব করিল, কুন্তলার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা টিপটিপ করিতেছে। এতক্ষণ পরে কুন্তলার মুখ একটু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার চোখে দেখা দিয়াছে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

ভুল হয়নি মণিদার ?

না।

কুন্তলার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে ত্রিষ্টুপের হাতেব বন্ধন আলগা হইযা আসিল। কুন্তলা ইচ্ছা করিলেই সরিয়া যাইতে পারিত ; কিন্তু ত্রিষ্টুপ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত সে নড়িল না।

আমি হার মানলাম কুন্তী, মণিদার ভুল হয়নি।

সংস্কাব কি এত সহজে জয় করা যায় ?

সংস্কার নাকি ?

অসহায়ের ওপর দরদ আপনাব রক্তে মিশে আছে।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিল।

চলো তোমায় দিয়ে আসি কুন্তী !

চলুন।

কিন্তু কেউ উঠিল না, দুজনেই যেমন বসিযাছিল তেমনই বসিয়া রহিল। ত্রিষ্টুপ সহজ সুবে বলিল, আমাকে ক্ষমা করো। জীবনে অনেক কিছু আদায় করব ছকেছিলাম, তার মধ্যে প্রথম ছিলে তুমি। প্রথমটাতেই ব্যর্থ হব ?—ভাবলেই মনে হচ্ছিল সমস্ত জীবনটাই তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোনো উপায় ছিল না, তাই এই খাপছাড়া উপায়টা দিয়ে চরম চেষ্টা করব ভেবেছিলাম। অন্য উপায় থাকলে—

অন্য উপায় তো ছিল !

ছিল কী উপায় ?

আদায়ের যে ছক করেছিলেন সে বদলে ফেলা।

তাতে কী হত ?

দাদা রাজি হতেন। আপনি ঠিক করেছেন বড়ো হবেন। টাকা-পয়সা, মানসম্ভ্রম, এ সব নিয়ে যারা বড়ো হয়, দাদার কাছে তাদের কোনো দাম নেই। আপনি একগুঁয়ে মানুষ, যা ধরবেন তা ছাড়বেন না। একদিন মস্ত লোক হবেন, মোটর হাঁকাবেন, দেশ জুড়ে খ্যাতি লাভ করবেন—এই আপনার প্রতিজ্ঞা। আপনার সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হয় ?

কেন ?

আমাদের ছক আলাদা। আমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করেছি—জীবন দিয়ে কী আদায় করব।

কী আদায় করবে ?

স্বাধীনতা।

ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, ও !

কুন্তলা ব্যগ্রভাবে বলিল, বুঝতে পারছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন অসম্ভব ? আপনি যা চান, সে সব আদায় যারা আদায় করেছে, তারা হল এক জাত ; আর তাদেব পায়ের নীচে যারা চ্যাপটা হয়ে মরছে, তারা হল আর জাত। আমরা ওই জাতের। বেজাতের হাতে দাদা কখনও বোনকে দিতে পারে ?

কেরানিরা তো তোমাদের স্বজাত ? তোমার দিদিকে তো কেরানির হাতে দেওয়া হয়েছে। আমিও কেরানি।

কুন্তলা আঁচল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর হাসিল,—কেরানির কোনো জাত নেই। জামাইবাবু আমাদের জাতের লোক, পেটের জন্য কেরানিগিরি করছেন। জামাইবাবু দু বছর পবে এই সেদিন ফিরেছেন, জানেন না ?

ত্রিষ্টুপ জানিত না। কীই বা সে জানিত ? আশি টাকার কেরানি ও রমলার ঘবে আনন্দের ছড়াছড়ি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মণীশকে সে ভাবিয়াছিল খাপছাড়া রহস্যময় মানুষ। কুন্তলাকে সে ধরিয়া রাখিয়াছিল আত্মচেতনাহীন সৃষ্টিছাড়া পরবশ মেয়ে। জীবনাদর্শ কত সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এ সবের ! ত্রিষ্টুপ খাট ছাড়িয়া কুন্তলার কাছে গিয়া বসিল।

তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব কুন্তী। আমার প্রথম আদায় ফসকে গেল, ছকটাও ওলট পালট হয়ে গেল। আমি যদি নতুন ছক কাটি, যদি তোমাদের জাতে উঠতে চাই। মণিদা রাজি হবেন ?

নিশ্চয়। কিন্তু মত বদলানো বড়ো কঠিন।

সে আমি বুঝব। তুমি রাজি হবে ?

দাদা রাজি হলে—

ত্রিষ্টুপ অসহিষ্ণুর মতো বাধা দিয়া বলিল, তোমার নিজের কথা বলো। মনে করো তোমার আর আমার জীবনের আদর্শের একচুল তফাত রইল না। তখন যদি মণিদাকে বলার আগে তোমাকে বলি, মণিদাকে জিজ্ঞেস না করেই তুমি তোমার মত জানাবে ?

কুন্তলা বলিতে গেল, ও সব যদি-টদির কথা—

ত্রিষ্টুপ প্রায় ধমক দিয়া বলিল, যদির কথাই বলো। রাজি হবে ?

হব।

খতিয়ান

খতিয়ান

সে আটকে গেল এ এলাকার বস্তিতে তার বন্ধুর ঘরে। কাব কাছে হদিস পেয়ে বিশ-পঁচিশজনের একটা দল হইহই করে ছুটে আসছিল তার বক্তেব খোঁজে। টেব পেয়ে বন্ধু তাকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল ঘরের মধ্যে ভাঙা তক্তপোশটার নীচে।

ভেগেছে। আগেই ভেগেছে।

ভেগেছে ? খুনের নেশায় মাতাল মানুষগুলি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষুব্ধ হল, ভাগতে দিলি কেন ? তোকেই মারা উচিত এক ঘা।

এত নিচু তক্তপোশের নীচে শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, বন্ধু ছেঁড়া মাদুর আর চট বিছিয়ে দেয়, একটা তেলচিটে ওয়াড়হীন বালিশও দেয়, বালিশটা পাথরেব মতো শক্ত কিন্তু আস্ত। অন্য একটা তালি মারা খানিকটা নবম বালিশ আছে, কিন্তু তুলো বেরোয একটু নাড়াচাড়া করলেই। সেইখানে বন্ধুর ঘরের নিচু তক্তপোশেব নীচে বেশিব ভাগ সময় গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থেকে তার কাটে পরদিন বাত্রে বস্তিতে আগুন লাগা পর্যন্ত।

সে থাকে বড়ো রাস্তায় পুব এলাকাব বস্তিতে। দুটি বস্তিই অবশ্য বড়ো রাস্তাব খানিকটা তফাতে, দুপাশেই ইটের বাড়িব এলাকা ভেদ কবা পথ অতি নোংরা অতি সংকীর্ণ হয়ে বস্তিতে পৌঁছেছে। বস্তি দুটিকে যোগ দিয়ে লাইন টানলে বড়ো রাস্তার সঙ্গে খানিক তেবচা হবে। বড়ো বাস্তার বড়ো মোড়টার পর থেকে দক্ষিণের বাঁক পর্যন্ত সায়েবপল্লি। রাস্তার দুদিকের এলাকার এই বস্তিগুলি তুলে দিয়ে আধুনিক ধাঁচের ইট কংক্রিটের বাড়ি তুলবাব পবিকল্পনা ও আযোজন চলছে কিছুদিন ধবে।

বিশেষ দরকাব থাকলেও আজ এদিকে আসা বোকামি হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অবস্থা এমন খারাপ হযে দাঁড়াবে, এমন লহমায় লহমায় ভীষণ থেকে ভীষণতব হতে থাকবে চারিদিকে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সে তা ভাবতেও পাবেনি।

তুই শালা একটা আস্ত উল্লু ! তাকে গুম কবে ফেলবাব আয়োজন করতে কবতে বন্ধু বলেছে রাগ করে গাল দিযে।

তুই শালা ভাল্লু ! সে অবশ্য জবাব দিয়েছে সমানে, কিন্তু কেউ তাবা সুখ পাযনি এই দোস্তির আলাপে। আতঙ্কে খিঁচ ধবে গেছে তখন দুজনেরই বুকে। এক কারখানায় খাটবার দোস্তিতে, এই সেদিন কাঁধে কাঁধ মিলিযে ধর্মঘটে জয়ী হবার দোস্তিতে হঠাৎ কেমন যেন চিড় খেয়ে গেছে। দুজনেই তারা কেমন একটা দিশেহারা অসহায় ভাবেব সঙ্গে অনুভব করে যে তাদের মিল আছে, তারা বন্ধু বটে, কিন্তু আর যেন এক নয়,—দুজনে তারা দুদলের হয়ে গেছে দারুণ আক্রোশে হন্যে হয়ে যে দুটি দল চালিয়েছে হানাহানি খুনোখুনি লুটতরাজ আগুন দেওয়া। হইচই হল্লার আওয়াজ এসে অবিরাম ভয় চকিত মনে হানা দিয়ে সচেতন করে রাখছে যে , লে ভাগ হয়ে থেকেও এতদিন তারা অনায়াসে এক সঙ্গে সভা-শোভাযাত্রা ধর্মঘট পিকেটিং পুলিশের সাথে লড়াই সব কিছু করে এসেছে, আজ পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরেছে সেই দল দুটি।

দুজনেরই খারাপ লাগে।

লে বিড়ি লে। চটপট ফুঁকে লে বিড়ি।

বন্ধু আধপোড়া বিড়িটা চালান করে দেয় চৌকির নীচে।

কোলের ছেলেটাকে মাটিতে আছড়ে বসিয়ে কাঁদায় বন্ধুর বউ, কান্নায় কান না দিয়ে চাপা গলাতে বলে, যত আপদ জোটে বাবা। কী হবে এখন !

জোরে রাগ প্রকাশ করার উপায় নেই। নিচু গলায় যতটা পারে ঝাঁঝ ঢেলে বন্ধুর বউ একটানা প্রতিবাদ জানিয়ে চলে তার ঘরে এ ভাবে মানুষটার চড়াও হওয়ার বজ্জাতির। রেশন যা আছে ঘরে টেনেটুনে দুটো দিন নিজেদের মুখে দু মুঠো গোঁজা চলত তাদের, জোয়ান-মদ্দ মুখ একটা বাড়ল। তাছাড়া, মানুষ সব খেপে গেছে, দয়া-মায়া বিচার-বিবেচনা নেই কারও। জানাজানি হয়ে গেলে না জানি কী দশা হবে তাদের। গজর গজর করতে করতে বন্ধুর বউ ভাত রাঁধে, বন্ধুকে বাইরে দাওয়ায় পাহারা রেখে ভেতর থেকে দরজায় হুড়কো দিয়ে তাকে চটপট খাওয়ায় তাগিদের চোটে গিলিয়ে দেওয়ার মতো, তারপর আবার তাকে চৌকির নীচে পাঠিয়ে এঁটো বাসন তুলে দরজা খুলে আগে উঁকি মেরে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে বাইরে আসে। তাকে লুকিয়ে রেখে পাড়ার প্রতিহিংসায় উন্মাদ মানুষগুলির কাছে অপরাধ করার অনুভূতি আর ধরা পড়লে শাস্তির ভয়টা স্বামীর চেয়ে তার অনেক বেশি তীব্র। আপদ বিদায় করে স্বস্তি পাবার সহজ উপায়টাব কথা তবু কিন্তু একবারও তার মুখে শোনা যায় না।

দিনদুপুরেও চৌকির নীচে পাঁশুটে আঁধার। এ সব ঘরের আঁষটে সোঁদা গন্ধ তার অভ্যস্ত, তবে এখানে গন্ধটা বড়ো উগ্র। তার গা বেয়ে আরশোলা চলাফেরা করে, হরদম মশা কামড়ায়, মাঝে মাঝে পোকা। বাইরে যে কাণ্ড হচ্ছে তার বাড়ানো ফাঁপানো বীভৎস বিবরণ আব বীভৎসতব গুজবেব কথা শুনতে শুনতে নিজেকে তার কখনও মনে হয় মরা মানুষ, কখনও জ্বরো রোগী, কখনও বারুদ-ঠাসা বোমা। বুড়ি মা আর বউ-ছেলেমেয়ের ভাবনা গোড়ার দিকে বরফের ছুরির মতো কুরিয়ে কুরিয়ে কাটছিল তার বুকের ভেতরটা—ধীরে ধীরে তার মধ্যেই ফেঁপে গেঁজে উঠে দুর্ভাবনাটা শতগুণ জোরালো এমন একটা যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে থমথম করছে যে সে যেন ধরতে বুঝতে পারছে না কাব জন্য বা কীসের জন্য এই বিষম কষ্ট। আনমনে হঠাৎ গায়ে ঝাঁকি দিয়ে উঠতে গিয়ে নাকটা তার ছেঁচে যায় চৌকির কাঠে, চোখ ফেটে জল আসে সেই চিকন ধাবালো ব্যথায়। এ ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখার লজ্জা দুঃখ অপমানে আরেকবার ফুঁসে ওঠে তার মন। বাইরে থেকে সে যেন শুনতে পায় যে কোনো পথে যখন খুশি যেদিকে খুশি তার চলাফেরা করার অধিকারের ডাক, অনুভব করে ভেতরের জোরালো তাগিদ গটগট করে বাইরে বেরিয়ে যাবার, যা হবার তা হবে। গা থেকে কয়েকটা আরশোলা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে প্রথমে সে টের পায় ঘামে চপচপ করছে তার শরীরটা, তারপর খেয়াল করে গুমোটের গরমে দম তার প্রায় আটকে আসছে। অন্ধ আক্রোশে, অসহ্য বিদ্বেষে দাঁতে দাঁত লেগে যায় তার। দুনিয়া নিপাত যাক, খতম হোক মানুষের চিহ্ন। উঠে গিয়ে এই ঘরে প্রথমে আগুন দিয়ে বঁটি লাঠি চ্যালাকাঠ যে কোনো হাতিয়ার নিয়ে সে বাইরে বেরোবে, যাকে সামনে পাবে তাকেই খুন করতে করতে মরবে নিজে। ওঃ, এত সে গরিব—

গরিব ? আবার খেয়াল হয় তার যে সে গরিব, আরেকবার আশ্চর্য হয়ে সে ভাবে যে এ কথাটা ভুলে গিয়ে এতক্ষণ আবোল-তাবোল কী সব ভাবছিল। গরিব ছাড়া আর কী। সে গরিব, এ বস্তির সবাই গরিব।

পরদিন বস্তিতে আগুন লাগার হট্টগোলের মধ্যে সে মরিয়া হয়ে রওনা হল তার নিজের বস্তির দিকে। বন্ধুর কাছেই শোনা গেল, সে বস্তিতেও নাকি আগুন লেগেছে।

কী করবি এবার ? এ যে মুশকিল হল। বন্ধু বলে আপশোশের সঙ্গে।

ঠিক আছে।

সোজা পথে যাওয়া যাবে না, চেহারা পোশাক দুই-ই তার ছাপমারা ! এদিক দিয়ে ঘুরে সায়েবপাড়া হয়তো সে পৌঁছতেও পারে কোনোরকমে প্রাণটি নিয়ে। না যদি পৌঁছতে পারে, প্রাণটা যদি যায়, যাবে। সে কাউকে মারেনি, কাউকে মারতেও চায় না, তবু যদি তাকে মরতে হয় যতক্ষণ পারে লড়াই করে মরবে, আর সে গ্রাহ্য করে না মরণকে। সায়েবপাড়া থেকে দুটো ঘোরা পথ আছে তার বস্তিতে যাবার, বড়ো রাস্তায় হয়তো এখন সামনাসামনি লড়াই চলছে দুটো বস্তিতে আগুন লাগার জের হিসাবে। সায়েবপাড়া পৌঁছে ঠিক করা যাবে কোন পথে যাওয়া নিরাপদ।

প্রায় আনমনে চলতে থাকে সে। মিছামিছি যারা বোকার মতো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে তাদের সম্বন্ধে একটা গভীর অবজ্ঞার ভাব জেগেছে তাব মধ্যে। ওরা তুচ্ছ, ওরা বাজে, বয়স্ক মানুষ নয়, হিংসুটে বজ্জাত বাচ্চা মাত্র। হাজার দশ হাজার মিলে একসাথে যদি তেড়ে আসে ওরা, সে দুটো ধমক দিলে আর দু চারটে চড়চাপড় কষিয়ে দিলে সব কটা কেঁদে ফেলবে, পালিয়ে যাবে। বস্তির আগুনে লাল হয়ে গেছে আকাশ, নীলতাবা ঝকমক করছে। বস্তি এলাকার পর ইটের বাড়ির এলাকায় জনশূন্য স্তব্ধ পথ, ইটপাটকেল ভাঙা বোতল ছড়ানো, আর কতকগুলি মানুষেব দেহ। পচা গন্ধের তীব্রতায় মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, মনে হয় বন্ধুর বস্তির ঘরে যেন ফুলের সুবাসে ভরপুর ছিল চৌকির তলাটা, সেখান থেকে যেন সে পচা গ্যাসের কারখানায় নেমে এসেছে। বস্তির আগুন থেকে ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে মানুষের মাংসপোড়া গন্ধ আকাশে উঠছে।

সে দাঁড়ায়, দুটি শবের পড়ে থাকাব ভঙ্গি দেখে পাশ কাটিয়ে যেতে না পেরে। পরস্পরকে তারা হয়তো মারেনি, কাউকে তারা একেবারে মারতে চেয়েও ছিল কিনা তাও জানবার উপায় নেই, শুধু পোশাকের তফাতের জন্যই হয়তো শত্রু হিসাবে তাদের মরতে হয়েছে, কিন্তু মরার পর রাস্তায় পড়ে আছে ঠিক বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠভাবে। মাথা এত কাছাকাছি যে মনে হয় যেন ঠেকে আছে, রাস্তার ধুলোয় এলানো একজনের হাতেব ওপর আরেকজনের হাত।

ধীরে ধীবে সে মুখ তুলে তাকায আকাশের দিকে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে, গ্রহ-তারার অনন্ত রহস্যেব আড়ালে যিনি গা ঢাকা দিযে আছেন তাকে শুনিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, মডাপচা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পাবছ কোনটা হিঁদুর, কোনটা মুসলমানের ? মাংসপোড়া গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর কোনটা মুসলমানের ?

কে যায় ?

আমি।

কোথায় যাবে ?

হাসপাতাল।

সায়েবপাড়ার বড়ো রাস্তা পর্যন্ত পথটুকু যেতে বারচারেক প্রাণের আশা ছেড়ে দিতে হয় তাকে। সে একা বলে, এই ভীষণ অবস্থায় এই বিপজ্জনক পথে সে একেবারে একা চলছে বলে, বোধ হয় ভীত-ত্রস্ত উত্তেজিত মানুষগুলি তাকে মারেও না, ধরেও নিয়ে যায় না। তাকে অনেক উপদেশ আর আদেশও শুনতে হয় ফিরে যাবার, বোকামি না করবার। এ মন্তব্যও সে শোনে কয়েকবার, লোকটা পাগল নাকি !

সায়েবপাড়ার বড়ো রাস্তায় পা দিতেই যেন নতুন এক জগতে পৌঁছায় সে। জ্যোৎস্নার মতো মিঠে গ্যাস ও বিদ্যুতের আলোয় পরিচ্ছন্ন চওড়া অ্যাসফল্টের পথটিতে যেন রাশি রাশি শান্তি ও শুচিতা ছড়ানো। দুদিকে বাগান ও লনওয়ালা ছবির মতো বড়ো বড়ো বাড়ি, আলোয় ঝলমল করছে। উচ্ছৃঙ্খল হাসি ও গানবাজনা ফুলবাগিচা ডিঙিয়ে মৃদু ব্যঙ্গ হয়ে ভেসে আসে তার কানে। এগিয়ে

যায় পায়ে পায়ে। রাস্তা-ঘেঁষা একটি বাড়ি থেকে পিয়ানোর অতি মিষ্টি টুংটাং আওয়াজ শুনে ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্তের মতো সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোন হ্যায় ? ক্যা মাংতা ?

গেটের কাছ থেকে খাকি পোশাক পরা অস্ত্রধারী একজনেব হাঁক আসে।

জবাব না দিয়ে সে হাঁটতে আরম্ভ করে। ঘুরপথের কথা ভুলে গিয়ে বড়ো রাস্তা ধরেই সে এগিয়ে চলে—কিছুদূর থেকে এই রাস্তার ওপরেই সংঘর্ষের কোলাহল ভেসে আসছে শুনতে পেয়েও। তার কানে তখনও পিয়ানোর মিষ্টি টুংটুং শব্দ দমকলের ঢংঢং আওয়াজ হয়ে বাজছে, কানে তাব তালা লেগে গিয়েছে।

বাঁক ঘুরে সে দেখতে পায় এলোমেলো আবোল-তাবোল হানাহানির দৃশ্য। লালের আভাস লাগছিল চোখে। ধীরে ধীরে সে চোখ তোলে। তাব বাড়িটা পুড়ছে এ দিকে। তাব বুড়ি মা আর বউ ছেলেমেয়েরাও পুড়ছে কি না কে জানে !

কয়েকদিন পড়ে বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয় কারখানার গেটের সামনে। গেট তখনও খোলেনি, যদিও অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে খোলার।

বিড়ি দে। খপর বল।

খানিক তফাতে মোড়ের বটগাছটার নীচে বেঞ্চে তক্তপোশে শোয়া বসা সৈন্য আর এলোমেলোভাবে জমা করা রাইফেলগুলির দিকে চোখ রেখে দুজনে তাবা খবব বলাবলি করে।

দেখলি তো ? আমরা শালা গরিবরাই মরলাম।

না তো কী ? কে মরবে তবে ?

ওনারা সব ঠিক আছেন বাহাল তবিয়তে।

তা রইবেন না ? বাহাল তবিয়তে রইবার জন্যে তো এত কাণ্ড। বউটা পুড়ে মরেনি। পাত্তা পাইনি কিনা আগুন লাগার দিন থেকে, তাই ভাবছিলাম পুড়েই মরেছে বুঝি। খোঁজ পেলাম কাল।

সচ্ ?

হাসপাতালে আছে। বাঁচবে বুঝি।

মাটা মরেছে পুড়ে।

হাঁঃ ?

আর সব কটা ঠিক আছে। ভুখে মরছে বটে তা সামলে যাবে মালুম হয়, আজ রেশন মিলবে জরুর। মিলবে না ?

গেট খোলা হয়, ঠিক আধহাত। লোহার চেনে ঢিল দিয়ে একবারে একটা মানুষ ঢুকবার মতো ফাঁক রেখে আবার চেনে তালা আঁটা হয়।

শ তিনেক লোক তখন জমা হয়ে গেছে গেটের সামনে। নাম ডেকে ডেকে একজন একজন করে ঢোকানো হয় ভেতরে। বাদ পড়ে জন চল্লিশেকের নাম। সে আর তার বন্ধুর নামও। গেটের ফাঁকটুকু তারপর বন্ধ হয়ে যায়।

তাদের কাজ নেই। ভেতরে যাবার অধিকার বা প্রয়োজনও তাদের নেই। হল্লা না করে সবে পড়ুক তারা, হটে যাক। একদিনে এমন বেপরোয়াভাবে প্রায় চল্লিশ জনকে ছেঁটে ফেলা ! একমাস আগে তিনজনকে ছাঁটাই করার বাহাদুরি যারা হজম করতে পারেনি, বাধ্য হয়েছিল আবার সে তিনজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে, তাদের এত সাহস ! মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সকলে, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সে আর তার বন্ধু।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্দুকধারী পুলিশ আসে, ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে তাদের বোঝাই করা হয় পুলিশের লরিতে।

লরি চলতে আরম্ভ করলে হাত বাড়িয়ে সে বন্ধুর ছেঁড়া শার্টের কলার চেপে ধরে। থু-থু করে রাস্তায় ফেলে দেয় মুখের বিড়িটা।

আজ শালা তোকে খুন করব।

বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দেয়।—কর।

বল শালা তোর কোনো জাত নেই, আমার কোনো জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব। আমরা গরিবের জাত।

বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দেয়।—ঠিক।

ছাঁটাই রহস্য

গিধর অ্যান্ড বাঙনা কোম্পানির এই আপিসটা, রণধীর যেখানে ক বছর কাজ করছে পঁচাত্তরে ঢুকে আশিতে উন্নত হয়ে, সেটার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পঞ্চাশ-ষাটজনের আপিসটাতে লড়ায়ের সময় একশোর ওপর নতুন কর্মচারী নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের একজনের চাকরিও অস্থায়ী নয়, সবাই এখানে পারমানেন্ট। সকলের নিয়োগপত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে নিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ যথেষ্ট বিবেচনা না করলে ম্যানেজার তাকে বরখাস্ত করতে পারবে না। বরখাস্ত করলে এক মাসের নোটিশ অথবা বেতন দেওয়া হবে। ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত অন্যায় মনে করলে বরখাস্ত কর্মচারী স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে লিখিত দরখাস্ত পাঠাতে পারবে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বয়ং বিচার ও বিবেচনা করে রায় দেবে।

রণধীর কাজ করছে চার বছরের বেশি। এই সময়ের মধ্যে ম্যানেজার টি, এল, বাঙনা,—আসল বাঙনার সে ভাইপো, বরখাস্ত করেছিল মোট ন জনকে। প্রথম দুজনেব দরখাস্ত হয়েছিল নিষ্ফল তৃতীয় জন দরখাস্ত করেনি। চতুর্থ জন দরখাস্ত করায় সত্যিই তার চাকরি টিকে গিয়েছিল ম্যানেজারের হুকুম নাকচ হয়ে ! তাই পরে বরখাস্ত অন্য সকলেই দরখাস্ত করেছিল, ফলও পেয়েছিল আরেকজন। সে অষ্টম জন।

দুজনের বেলা হুকুম নাকচ করে দিয়েও কিন্তু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জি. জি. গিধব ম্যানেজাব সায়েবের প্রেস্টিজের ক্ষতি করেনি এতটুকু। কোনো লিখিত বা মৌখিক আদেশ আসেনি তার কাছ থেকে ম্যানেজারের হুকুমের বিরুদ্ধে। বাঙনার মারফতেই সব করা হয়েছে। বাঙনা দুজনকে ডেকে পাঠিয়ে জানিয়েছে যে তাদের দরখাস্ত পড়ে দয়া হয়েছে গিধরের, গিধর তাকে অনুরোধ জানিয়েছে তাদের আরেকটা চান্স দেওয়া যেতে পারে কি না বিবেচনা করতে। সে তাদের তিন মাস টাইম দিচ্ছে। তিন মাস ঠিকমতো কাজ করলে, আর কোনো দোষ না করলে, সে বিবেচনা করবে তাদের রাখা চলবে কি চলবে না। কয়েকজন রিজাইন দিয়ে চলে গেছে,—কেউ স্থায়ী চাকরিতে, কেউ অস্থায়ী চাকরিতেও। মাইনে বড়ো কম এখানে। মাগগিভাতাও কম। এ বিষয়ে কোম্পানি দৃঢ় ও স্পষ্টভাষী : কাল লড়াই থেমে গেলেও কোম্পানি যখন একজনকেও লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা রাখে না, কোম্পানি যখন দিচ্ছে চিরদিনের নিরাপত্তা, নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের গ্যারান্টি, প্রায় সরকারি চাকরির (স্থায়ী) মতোই যখন নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে কোম্পানিব চাকরি, ঠিক যুদ্ধের সময়টুকুর জন্য যখন লোক নিচ্ছে না কোম্পানি, মাইনে মাগগিভাতা গ্রেড প্রভৃতি ঠিক করা সম্পর্কে পৃথিবীতে লড়াই একটা চলছে কি চলছে না সে প্রশ্ন বাদ দেবার অধিকার নিশ্চয় কোম্পানির আছে। কোম্পানির এই পলিসি অবশ্য সরকারিভাবে কোম্পানি ঘোষণা করেনি। কয়েকজন চাকুরে গল্পগুজব-আলোচনা-বিবেচনা-বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কর্মচারী মহলে মাইনেপত্র কম পেয়েও এখানে চাকরি করার পরম সুবিধা ও চরম সৌভাগ্যের কথা প্রচার করেছে—এতটুকু রিস্ক নেই ফ্যাসাদে পড়বার, যাই ঘটুক পৃথিবীতে। তালা-আঁটা সিন্দুকের নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতা এখানে।

আত্মীয়স্বজনের যুক্তি পরামর্শ উপদেশের প্রতিধ্বনি যেন এ সব কথা, তাদের কামনার পরিতৃপ্তি যেন কোম্পানির এই ভরসা দান—বেকার তুমি কখনও হবে না তোমার নিজের দোষ—গুরুতর, অমার্জনীয় দোষ ছাড়া। তবু চারিদিকে সকলের মধ্যে অসন্তোষ, গুমরানো গুমরানো অসন্তোষ, জ্বালা। রণধীর এটা প্রতিদিন টের পেয়ে আসছে চাকরির প্রথম দিন থেকে, অনুভব করছে।

তার নিজের অসন্তোষ এবং জ্বালাও কম নয়। কিন্তু সে ধীর শান্ত ধৈর্যশীল বাপের মতোই বিবেচক বলে সংসারে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তার প্রশংসা। সে ভাবে যে কেরানির জীবনে, চাকুরের জীবনে, দাসের জীবনে, এটাই স্বাভাবিক। শুধু এ আপিসে নয়, সব আপিসেই এটা অনিবার্য। বুদ্ধি দিয়ে হিসাব করে, হতাশা দিয়ে মেনে নিয়ে সে ভাবে যে উপায় কী।

এখানে চাকরি নেবার সময় একটা কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাকে। একশো টাকার আধা-সরকারি অস্থায়ী লড়ায়ের চাকরিটা নেবে, না পঁচাত্তর টাকার এই চাকরিটা নেবে। আত্মীয়স্বজন সবাই ছিল স্থায়ী চাকরির পক্ষে, বউ পর্যন্ত—একটি তার মেয়ে জন্মেছে তখন, আরেকটি ছেলে অথবা মেয়ে কয়েক মাসের মধ্যে জন্মাবে। কিন্তু এ চাকরি যে স্থায়ী হবে তার স্থিরতা কী, এই নিয়ে খটকা বেধেছিল সকলের মনে।

রণধীরের নিজের মনেও।

দোটানায় পড়ে একটা কিছু ঠিক করে ফেলতেই হবে এ অবস্থা হওয়া যেন চড়া জ্বর হওয়ার মতো, ছটফট করতে করতে মরিয়া হয়ে জীবন সরকারকেই সে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, একটা কথা বলব স্যার আপনাকে। ওয়ার টাইম বলে বাড়তি লোক নিচ্ছেন অনেক, লড়াই থেমে গেলে কাজ না থাকলে এত লোককে রাখা চলবে কী করে ?

জীবন সরকার বরাভয় দেওয়া হাসির সঙ্গে বলেছিল, থাকবে না কে বললে তোমায় ? লড়াই শেষ হলে ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে নাকি ? ওয়ার টাইম বলেই আমরা বরং কোণঠাসা হয়ে আছি, বাড়তে পারছি না। লড়াই থামলে কোম্পানি আরও বাড়বে, আরও নতুন লোক নিতে হবে তখন, আমাদের প্ল্যান আছে।

আমরা ! আমাদের ! আড়াইশো টাকা মাইনে দেয় কোম্পানি মাসে মাসে জীবনবাবুকে, তাতেই কোম্পানি নিজস্ব হয়ে গেছে জীবনবাবুর ! থ্যাবড়া মোটা নাকের ওপর ঢালু কপালে চন্দনের ফোঁটার দিকে চেয়ে হঠাৎ হাসি পেয়েছিল রণধীরের, হাতটা নিশপিশ করে উঠেছিল তাড়াতাড়ি পেনসিল দিয়ে কাগজের ওপর এই নিশ্চিন্ত অমায়িক গোলগাল ভোঁতা মুখখানার স্কেচ করে নিয়ে তলায় লিখতে : চালকুমড়োয় কাকের কীর্তি।

শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কাটা এই অমায়িক মুখখানাই খেঁকিয়ে ওঠা পাগলা কুকুরের মুখের মতো কী বীভৎস রকম ক্রুর দেখাতে পারে, তার পরিচয় রণধীর পেয়েছিল পরে। অনেকবার।

বেতন কম খাটুনি বেশি, ব্যবহার হরেদরে অন্য আপিসের মতোই। জিনিসপত্রের দামে আগুন লাগায় সব আপিসেই কিছু কিছু মাগগিভাতা দেবার রীতি চালু হয়েছে, এখানেও বরাদ্দ হয়েছ যৎসামান্য। আর সেই জন্যই বোধ হয় গ্রেড জিনিসটার হয়েছে পক্ষাঘাত, মাইনে আর বাড়ে না কারও, বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। বছরে পাঁচটাকা বাড়ার কথা রণধীরের, তিন বছর লেগেছে একটা পাঁচটাকা বাড়তে—তাও জীবনবাবুর বিশেষ দয়ায়। পাড়ায় থাকে, চেনাশোনা আছে আগে থেকে, রণধীরকে একটু স্নেহ তার করা উচিত, এই জন্য।

মুশকিল কি জানো ? গ্রেড তো অটোমেটিক নয়, ওই যে ক্লজটা আছে কাজের মেরিট সম্বন্ধে, ওটাই আসল। রাখাল আর ভুবন দুটো ইনক্রিমেন্ট পেয়ে গেল এরই মধ্যে দশটাকা আর পঁচিশ টাকার—ওদের কাছে কোম্পানি উপকার পেয়েছে বলেই তো।

মুখ গম্ভীর করে জীবন একটু চিন্তা করেছিল।

আচ্ছা তোমার একটা করে দিচ্ছি। মন দিয়ে কাজ করো, কোম্পানির ইন্টারেস্ট নিজের ইন্টারেস্ট ভাবতে শেখো, গ্রেড নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কোম্পানি নিজে থেকে যেচে গ্রেডের দশগুণ ইনক্রিমেন্ট দেবে।

বাদামি দেয়াল চোখে নোনা, কর্কশ লাগে। ছোটো একটি সংসার আর এই আপিসের সংক্ষিপ্ত জগৎটুকুতে জীবনের রীতিনীতির মধ্যে সামান্য সামঞ্জস্য খুঁজে বার করবার চেষ্টায় এই বয়সেই একেবারে শেষবারের মতো হার মানতে সাধ যায় রণধীরের, নিস্পৃহ বৈরাগ্যে সব একাকাব হয়ে চুলোয় যাক। জীবনটা নিংড়ে দিচ্ছে সংসারকে, সংসার তবু খুশি নয়। খেটে রক্ত জল করছে, আপিস তবু খুশি নয়। হঠাৎ দুশো টাকার একটা চাকরি নিয়ে ভাইটা কোথায় চলে গিয়েছিল, দু বছরে সে সংসারে সাহায্য পাঠিয়েছে তিন কিস্তিতে দেড়শো টাকা আর লিখেছে লম্বা লম্বা কথাভরা চিঠি। কারও পরামর্শ জিজ্ঞেস না করে চাকরি নিয়ে উধাও হওয়ার জন্য তার ওপরে চটে আছে সকলেই, কিন্তু সেই যেন গর্ব আর গৌরব সংসারের—ও কিছু করবে জীবনে। রাখাল ও ভুবনের ফাঁকিব সাগরে কাজের ডিঙি ভাসে না ; ম্যানেজারের পা চেটে, জীবনের খোশামোদ করে আর কোম্পানির গুণকীর্তন করেই সময় কাটে, কোম্পানি বড়ো খুশি ওদের ওপর, ওরা কাজের লোক।

কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে দরকারি ফাইলের মলাটে বাঁদর গড়ে ওঠে একটা, ভেংচি দিয়ে হাসছে। খানিক চেয়ে থেকে আরও কয়েকটা আঁচড়ে হাসিটা কান্নায় পরিণত করে বণধীর, একটু কালি লেপে দেয় বাঁদরটার ওপর।

ফাঁদে পড়ার মনোভাব প্রায় সকলেরই—আশঙ্কা, আপশোশ, নিরুপায় হতাশা। গোড়ার দিকে এই ছিল সব, তারপর কীভাবে যেন ধীরে ধীরে জেগেছে ঘৃণাবোধ, উগ্র তীব্র ঘৃণাবোধ, আব- - রণধীর ঠিক জানে না—বিদ্বেষের জ্বালা অথবা রাগ। তার নিজের মধ্যেও জেগেছে। ভালোরকম সে বোঝে না হৃদয় মনে এই ঘৃণা ও জ্বালা অথবা রাগের সৃষ্টি কাহিনি, একটু শুধু অনুমান করে যে চারিদিকে লড়ায়ের বিপর্যয় যে ধাক্কা মেরে চলেছে ক্রমাগত, ওটা তাবই প্রতিক্রিয়া। সংকীর্ণ জীবনেব সীমাবদ্ধ শান্ত ম্রিয়মাণ জগৎটুকুতে এসে পড়েছে উদ্দাম তাণ্ডব, জগতেব যা কিছুব সঙ্গে হৃদযমনেব সংযোগ তাতেই ঘটছে নিয়মাতীত বেহিসাবি অবিশ্বাস্য ওলটপালট, ধারণা বিশ্বাস সংস্কারের তো কথাই নেই, স্বপ্ন পর্যন্ত রেহাই পায়নি। অলস কল্পনা আজও আকাশে ফুলের চাষ করছে ; রঙিন আকাশ কিন্তু হয়ে গেছে কালো, ফুলগুলি তাতে ঝিলিক মারছে তারার মতো আগুনের ফুলকিব মতো।

কী যে এক অস্থিরতা এসেছে ভেতরে, আগেকার কোনো ব্যাকুলতার সঙ্গে তার মিল নেই। অন্যের মধ্যেও এই অস্থিরতার অস্তিত্ব এত সহজে সে টের পায়। তারই মতো সকলে যেন একটা খাপছাড়া কাজ করতে চায়, হঠাৎ খেপে গিয়ে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে চায় যা কিছু আছে চারিদিকে, প্রিয় বা অপ্রিয়। জীবনের সঙ্গে জড়ানো সব কিছুর প্রতি যে অদম্য মমতা, এই আপিসের তালাচাবি আঁটা সিন্দুকের নিরাপত্তায় অন্ধ বিশ্বাস রেখে নিশ্চিন্ত হবার কামনা থেকে বাঙনা জীবনদের কাছে মাথা নিচু করে সবরকমে আত্মসমর্পণ করার তৃপ্তিকর বাসনার প্রতি পর্যন্ত, সেই মমতাকে পায়ের নীচে ফেলে থেঁতলে থেঁতলে আথালি-পাতালি নাচতে চায়। আগে প্রাণ ব্যাকুল হত রণধীরের, মুড়ানো বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনের ব্যথা বেদনা দুঃখ লজ্জা পরাজয় অপমান পিছনে ফেলে পালিয়ে যেতে আছাড়ি-পিছাড়ি করত প্রাণটা, কাঁটার ব্যথায় দিশেহারা গোরু ছাগলের মতো। আজ বাঘের মতো হুমড়ি দিয়ে পড়ে নখে দাঁতে কাটা গাছটাকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য ছটফটানি।

রোগা দুর্বল নিরীহ নকুল পর্যন্ত বলে, দুত্তেরি আর ভালো লাগে না। ঘরে একটা আর এই আপিসে একটা বোমা পড়ত, বাস চুকে যেত সব। তা শালার জাপানি ব্যাটারা এগোতেই পারল না।

গোকুল ফিরে আসে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে। মিনিটখানেক চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ তাকে ডেকে বলে, শোন। এই গালটা বাঙনার।

আঙুল দিয়ে নিজের ডান গালটা দেখিয়ে জোরে ঠাস করে এক চড় মারে গালে।

এই গালটা জীবন-শালার।

বাঁ গালে চড়টা মারে আরও জোরে।

গোকুলকে বাঙনা বরখাস্ত করেছে। গিধরের কাছে দরখাস্ত দিতে বারণ করেছে জীবন। গোকুল তবু চাপাচাপি করাতে তার হাত থেকে দরখাস্তটি নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছে জীবন, চোখ লাল করে বলেছে, গোলমাল করলে এক মাসের মাইনে পর্যন্ত পাবে না, এই দণ্ডে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।

বিড়বিড় করে বকে যায় গোকুল। নিজের মারা চড়ে দুটি গাল তার লাল হয়ে উঠেছে।

গিধর বাঞ্চোতের গালে তো চড় মারা হল না ? ব্যাটা বেঁচে গেল। গোকুলের হাতের এক চড় খেলে নির্ঘাৎ—বহুত আচ্ছা, লাথি মারব ব্যাটাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে মেঝেতে সে প্রাণপণে লাথি মারে।

গোকুলের পর রঞ্জিত। তাকেও জীবন বারণ করেছিল গিধরের কাছে দরখাস্ত দিতে, তবে জোরজবরদস্তি করেনি। রঞ্জিত বারণ না মানায় দরখাস্ত নিয়ে জীবন বলেছিল, বেশ পাঠিয়ে দেব।

তারপর তিলকের পালা। তার দরখাস্তও নেওয়া হল। একদিন দুদিন পরে পরেই বরখাস্তের নোটিশ পড়তে লাগল এক-একজনের ওপর আকাশের বজ্র পড়ার মতো, রাস্তায় মিলিটারি লরি ঘাড়ে পড়ার মতো। এক মাসে সতেরো জন বরখাস্তের হুকুম পেল। প্রত্যেকে তারা অকর্মণ্য, তা ছাড়া নানা দোষে দোষী।

তারক বড়ো বেশি কামাই করে।

তারক তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল, গত চারমাস ধরে প্রতিমাসে তার পাঁচ-ছদিন করে কামাই।

তারক বলল, স্যার, ঠিক টাইমে এসেও খাতা পাইনি সই করতে। আপনি বললেন কোথায় যেন আছে খাতাটা, আপনি মার্ক করে নেবেন আমি প্রেজেন্ট। ক্রশমার্কের বদলে দুটো লাইন টেনে মার্ক দিয়েছেন আমি প্রেজেন্ট বলে--

জীবন বলল গর্জে, দু লাইন মার্ক কামাইয়ের মার্ক, যারা কামাই করে খবর পাঠায় তাদের মার্ক ক্রশ, যারা কামাই করে খবর দেয় না তাদের মার্ক দুটো লাইন। তুমি আমায় শেখাবে ?

অবনী লেট করে।

অবনী তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল বছরখানেক ধরে প্রতিমাসে সে গড়পড়তা দশ-বারোদিন লেট !

অবনী বলল, স্যার, আপনি তো বলেছিলেন সই করতে হবে না, ঠিক টাইমের বিশ মিনিট আগে যারা আসে তাদের ভি মার্ক দিয়ে রাখেন ভেরি গুড বলে, তাদের একটা প্রাইজ দেওয়া হবে।

জীবন গর্জে বলল, যারা এক ঘণ্টার বেশি লেট করে এল-এর বদলে তাদের ভি মার্ক—ভেরি লেট। শেখাতে এসেছ ?

অনিল আপিসে রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়ে আপিসের কাজে ব্যাঘাত জন্মায় !

অনিল তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। তিনখানা অভিযোগ পত্র তার সামনে ফেলে দেওয়া হল। রাখাল, ভুবন আর শৈলেন নালিশ জানিয়েছে যে অনিল তাদের কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার হবার জন্য সর্বক্ষণ জ্বালাতন করে, কাজকর্ম করতে দেয় না।

অনিল বলল, আমি তো পলিটিকস করি না, কোনো দলে নেই !

জীবন গর্জে বলল, ও সব ন্যাকামি জানি আমি। এমনি সাধু সেজে ন্যাকামি করে তোমরা কাজ চালাও। আমায় শেখাতে এসেছ ?

নারায়ণ পেনসিল নিব আলপিন প্যাড চুরি করে।

নারায়ণ তো অবাক ! গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল গত মাসে সে সাতটা পেনসিল দশ ডজন আলপিন চারটে প্যাড নিয়েছে। একজন কেরানির কখনও এত পেনসিল নিব আল-প্যাড লাগতে পারে এক মাসে ?

নারায়ণ বলল, আপনি তো বললেন আমার সেকশানে পেনসিল টেনসিল নিব এ সব আমি বিলি করব। আমি নিজের নামে নিয়ে গিয়ে যার যেমন দরকার দিয়েছি। মুখে মুখে হিসাব দিচ্ছি শুনুন। রাখালবাবু দুটো পেনসিল তিন ডজন আলপিন নিয়েছে, ভুবনবাবু দুটো পেনসিল দু ডজন আলপিন দুটো প্যাড—

জীবন গর্জে বলল, রসিদ দাও।

রসিদ ? খিলখিল করে হেসে উঠেছিল নারায়ণ, তার অল্প বয়সে সামনের একটা দাঁত পড়ে যাওয়ায় ফাঁকে হুইসলের শব্দ তুলে, রসিদ কী বলছেন স্যার ? কে একটা আলপিন চায়, নিব চায় আপিসের কাজে সে জন্য রসিদ নিয়ে দিতে হবে ? আগে জানলে আমি তো ভার নিতাম না আমাব সেকশানে এ সব বিলি করার।

জীবন গর্জে বলল, চোরেরা এ রকম কৈফিয়ত দেয়। আমায় শেখাতে এসেছ ?

নারায়ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেঁটে রোগা হাসিখুশি রহস্যপ্রবণ নারায়ণ। অন্যেরা চলে যেত, সে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যেরা অনেক কথা বলত, রাগত, কাঁদত নারায়ণ এক পলকে বিদ্যুৎগর্ভ ধাতুর মতো কঠিন হয়ে গেল।

আমি চোর ?

তা ঠিক বলিনি, তবে কথাটা কি জানো নারায়ণ—

নারায়ণের চড়ে গাল ফাটল না বটে জীবনের, কিন্তু বাঁধানো দাঁতে গাল কেটে গিয়ে রক্ত বেরোল মুখ দিয়ে থুতু আর শ্লেষ্মার সঙ্গে। বাঁ হাতে মুঠো করে তখনও নারায়ণ ধরে আছে জীবনের মাথার চুলগুলি। চুল তার কম, তবে বড়ো বড়ো। টাক ঢাকতে জীবন বড়ো চুল রাখে এবং উলটো করে আঁচড়ায়।

আমি চোর ? বলে গর্জন করে নারায়ণ চড়-মারা হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে ঘুষি মারতে যাচ্ছে, রাখাল ভুবন শৈলেন এবং আরও কয়েকজন তার হাত এবং তাকে ধরে ফেলল। আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এসে নারায়ণকে নিয়ে গেল হাজতে।

পরদিন থেকে বরখাস্তদের সামনাসামনি প্রতিবাদ জানানো বারণ হয়ে গেল। যা কিছু বলার আছে তা তারা লিখে জানাবে। মানুষিক দুর্বলতার দরুন এমন একটা অঘটন ঘটে যাওয়ায় কর্তারা বোধ হয় অনুতপ্ত হয়েই অমানুষিক সরলতার সঙ্গে হুকুম জারি করল যে ম্যানেজারের বরখাস্তের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে বিচার প্রার্থনার দরখাস্ত পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিশেষভাবেই সচেতন যে এই দুঃসময়ে একজনের চাকরি যাওয়াটাই কি শোচনীয় ব্যাপার, অতএব তিনি স্থির করেছেন যে বরখাস্তের নোটিশ জারি হবার আগেই তিনি প্রত্যেকটি নোটিশ নিজে স্বাক্ষর করবেন—বরখাস্ত না করে চলে কিনা, আরেকটা চান্স দেওয়া যায় কিনা, ম্যানেজারের অন্যায় হয়েছে কিনা, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এ সব বিবেচনা করার পর।

বাড়ি গিয়ে চা পর্যন্ত না খেয়ে মাদুরে চিত হয়ে, রণধীর বলল তার স্ত্রীকে, তার মানে গিধরের সই করা বরখাস্ত নোটিশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা চলবে না।

ওগো, তুমি বরখাস্ত হয়েছ নাকি ? বলে কেঁদে উঠল সরলা। মেয়েটা আগে থেকে কাঁদছিল, এক বছরের মেয়ে আর তার মায়ের কান্না একই সুরে বাজতে লাগল রণধীরের কানে। রণধীরের হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল, আনন্দে সর্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল। আজকে সকালেই বাজারে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখা হওয়ায় ডাঁটা, ঝিঙা, চিচিঙা, বেগুন কেনার ফাঁকে ফাঁকে ললিত তাকে

শোনাচ্ছিল—বেদের ওংকার কী ভাবে এ যুগে কারখানায় ভোঁ-কার হয়ে গেছে। মেয়ের খিদের কান্না আর তার মায়ের ভয়ের কান্না একাকার হয়ে সেই কথাটাই যেন প্রমাণ করে দিল রণধীরের কাছে।

যুদ্ধ শেষ হবার পর মাস দুই কাটতে একমাসে সতেরো জন বরখাস্ত! শঙ্কার কালো ছায়া নেমে আসে সকলের মুখে। বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। আপিস বসবার আগে, টিফিনের সময় ও ছুটির পর পাঁচ-সাতজনে একত্র হয়ে ছোটো ছোটো ভাগে আলোচনা চালায়, চাপা গুঞ্জনে আপিসটা যেন গমগম করে। সর্বদা হাসি গল্পে মশগুল ফুর্তিবাজ রাখাল ও ভুবন কেমন যেন দমে গেছে, সেই নির্ভয় নিশ্চিন্ত বেপরোয়া ভাব আর নেই। কয়েকজন মিলে যেখানে কথা বলছে তার ধারে কাছে তাদের কেউ একজন এলেই সবাই এমনভাবে চুপ হয়ে যায় যে তাকে দুবার ঢোক গিলতে হয়, তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বার করে ঢং করে বলতে হয়, দেশলাইটা কেউ ছাড়ুন না স্যার! এইভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে সিগারেটটা ধরিয়েই সরে পড়তে হয়। আগে হলে সবাইকে সিগারেট দিত, এখন ভরসা পায় না।

রবিবার সকালে রণধীর যায় জীবনেব বাড়ি। সবিনয়ে প্রশ্ন কবে, ছাঁটাই শুরু হল নাকি স্যার?

তুমি বড়ো বেয়াদব রণধীর, গভীর আপশোশেব সঙ্গে জীবন বলে, বড়ো বোকা তুমি। তোমাকে চাকরি দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল আমার। ছাঁটাই কীসের? কয়েকটা অকেজো ফাঁকিবাজ বাজে লোককে বিদায় করা হচ্ছে। নতুন লোক নেওয়া হবে ওদের জায়গায়। তা ছাড়া—ভ্রুকুটিতে কুটিল রেখায় ছেয়ে যায় জীবনেব গোলগাল মুখ,—সব বিষয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকারটা কী? কাজ কবছ, কাজ করে যাও। আমি তো আছি। কাকে রাখি, কাকে তাড়াই, কাকে আনি, তোমাব তাতে কী এলো গেল? তোমার চাকবি থাকলেই তো হল?

জীবনেব মুখেব মেঘ অদৃশ্য হয়ে যায় হঠাৎ।

বোসো। ওরে, কে আছিস, এক কাপ চা দিয়ে যা বাইরে।

চা খেয়ে এসেছিলাম, স্যার।

বার্নিশ করা চকচকে চেয়াবে বসে রণধীর বলে। জীবন সে কথার জবাব দেয় না, যেন শুনতেই পায়নি। আপন খেয়ালে দার্শনিকের মতো কতগুলি মূল্যবান কথা শুনিয়ে যায় রণধীরকে,—সংসারটা, কি জানো রণধীর, বড়ো কঠিন ঠাঁই। অনেক বিবেচনা করে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষকে টিকে থাকতে হয় সংসারে। আত্মরক্ষাই ধম্মো মানুষের—শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই ধম্মো। যে নিজেকে বাঁচাতে পারে সেই বাঁচে, নইলে ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া আর পথ নেই, উপায় নেই। এই যে দুর্ভিক্ষটা গ্যালো, লাখ লাখ লোক মরল, তুমি আমি বাঁচলাম কী করে? আমরা যে ভাবে হোক খাদ্য জোগাতে পেরেছি, বেঁচেছি। ওরা পারেনি, মরেছে।

চাকর চা এনে দিলে বলে, খাও। আপিসে নাকি গন্ডগোল পাকাচ্ছে? কী বলছে সবাই বলো তো শুনি?

সবাই ভয় পেয়ে গেছে।

কজন নাকি দল বাঁধবার চেষ্টা করছে হাঙ্গামা করার জন্য? সতীশ আর নিবারণ সবাইকে উসকাচ্ছে, না?

গরম চায়ে বিষম লাগে রণধীরের। কাপ থেকে চা উছলে পড়ে তার জামা কাপড়ে। কাপ রেখে নিজেকে রুমাল দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে সে আশ্চর্যরকম শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি তো জানি না।

জানো না? ও!

পরদিন সোমবার। একটু সকাল সকাল আপিসে যায় রণধীর। অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য সকলকে সংঘবদ্ধ করবার একটা চেষ্টা চলছে আপিসে সে জানে। কিন্তু বিশেষ তার শ্রদ্ধা ছিল না এ প্রচেষ্টায়। কেরানি জীবদের সে চেনে। আগে থেকেই আটঘাট বেঁধেই কর্তারা উচ্ছেদ শুরু করেছে। সতেরো জন শুধু ওযার টাইমে নেওয়া নতুন লোক নয়, ওদের মধ্যে তিনজন আছে পুরানো, একজন কাজ করছে তেরো বছরের ওপর। বেছে বেছে অকেজো অপদার্থ কয়েকজনকে তাড়িয়ে বাকি সকলকে রাখা হবে—আপিস তো থাকবে, লোক তো লাগবে আপিস থাকলে এই রকম একটা জোরালো প্রচারও চলছে তলে তলে। অনেকে নিশ্চয় ভাবছে, অন্যের বেলা যাই হোক, আমি হয়তো টিকে যাব। প্রতিবাদের একটু আগুন জ্বালাতে পারলেও তা মিনমিন করে জ্বলবে সমর্থনের অভাবে, গিধর, রাঙনা, জীবনেরা অনায়াসে ফুঁ দিয়ে তা নিভিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু কাল জীবনের সঙ্গে কথা বলে একটু খটকা লেগেছে তার মনে। এত আঁটঘাট বেঁধে ছাঁটাই শুরু করেও তো তেমন নিশ্চিন্ত নয় জীবন, কেরানিদের গোলমাল বাধবার চেষ্টাকে মোটেই সে তুচ্ছ করে দিতে পারছে না। জীবন কেরানিদের কথা এত জানে, অথচ সে নিজে কেরানি হয়ে জানে না অবস্থা ঠিক কী দাঁড়িয়েছে। কিছু হবে না ভেবেই উদাসীন থেকেছে, এড়িয়ে চলেছে সকলের সঙ্গ। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি রণধীরের। আগ্রহ উত্তেজনা কৌতূহলের চাপে ছটফট করেছে।

অবিনাশ ছাড়া কেউ তখন আপিসে আসেনি। অবিনাশ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না। তার মস্তিষ্ক একটু শ্লথ। ঘণ্টাখানেক আগে না এলে কাজ সেরে আপিস থেকে বেরোতে সন্ধ্যা উৎরে যায়। ভালো করে কাজ না করবার সাহসও তার নেই।

অবিনাশ বলে ধীরে ধীরে, তাই ভাবছি দাদা। হ্যাঁ, প্রোটেস্ট একটা করা উচিত। ওদের রাখা হোক সবাই মিলে এ অনুরোধটাও জানানো চলে। কিন্তু ওদের রাখতেই হবে, ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে নইলে সবাই স্ট্রাইক করব, এটা উচিত মনে হয় না। ছাঁটাই তো চলছে না স্পষ্টই বলেছে সে কথা। অনেক লোক নিয়েছে, বাজে লোক ঢুকেছে কয়েকটা তার মধ্যে, তাদের যদি রিপ্রেস করতে চায় –

একটু দমে যায় রণধীর। তবে অবিনাশ লোকটাই আধমরার মতো শ্লথ, নির্জীব। সকলে ওর মতো নয়।

একে দুয়ে অন্যেরা আসতে থাকে। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা কয় রণধীর। অবিনাশের মতো কথা কয় দু-একজন, কিন্তু সকলে অতটা নরম নয়। নিশ্চয় জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে যাদের বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কেস আবার বিবেচনা করা হোক, যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের বহাল রাখা হোক, এ দাবিও জানাতে হবে। তবে দাবি না মানলে তারা স্ট্রাইক করবে, এ ভয় দেখানো সঙ্গত হবে না। সে রকম অবস্থা দাঁড়ায়নি। কয়েকজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে, বড়ো জোর আর দু চারজনকে করবে—তাও করবে কিনা ঠিক নেই। কর্তৃপক্ষ তো স্পষ্টই জানিয়েছে যে এ আপিসে ছাঁটাই চালাবার প্রশ্নই ওঠে না। আবার খুব গরম হয়েও আছে কয়েকজন। তাদের কথা স্পষ্ট—শুধু প্রতিবাদ আর দাবি জানিয়ে হবে কচু।

আপিসের কাজ আরম্ভ হবার পরেও রণধীর বারবার এর টেবিল ওর টেবিলে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে আসে। এই সতেরোটা বরখাস্তের মানে যে অনেকে ধরতে পারেনি এ কথা ভেবে তার অদ্ভুত এক বিস্ময় জাগে, লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘুম খেয়ে খানিকক্ষণ নিজের জায়গায় বসে থাকার পর ধীরে ধীরে লজ্জা ও আপশোশ কেটে গিয়ে বিস্ময় বোধটাই বড়ো হয়ে ওঠে তার মধ্যে। আর কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার আছে বলে তার মনে হয় না। সকলের মন যেন স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস ধোঁয়াচ্ছে সবার মনে, কিন্তু এখনও ওরা বিশ্বাস আঁকড়ে আছে মানুষের ওপর, মানুষের কথায়—গিধর, রাঙনা, জীবনকে ঘৃণা করেও পুরোপুরি প্রত্যয় জন্মাতে পারছে না, ওরা একেবারেই অমানুষ, এতটুকু দাম নেই ওদের কথার, ওরা রক্তচোষা রাক্ষস।

সাড়ে এগারোটার সময় পিয়ন এসে রণধীরকে দিয়ে যায় তার বরখাস্তের নোটিশ। রণধীর আশ্চর্য হয় না। নোটিশের আপিসি ভাষার মধ্যে সে জীবনের ঘরোয়া ডাক শুনতে পায় : আমার কাছে এসে ক্ষমা চাও, অনুগত হও, আমি থাকতে তোমার ভাবনা কী, নোটিশ আমি বাতিল করিয়ে দেব। আরেকটা কথা স্পষ্ট হয় রণধীরের কাছে এই নোটিশ পেয়ে। যারা তেজি গোঁয়ার মানুষ, হঠাৎ বরখাস্ত করলে যারা চুপচাপ তা মেনে না নিয়ে হইচই হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারে মরিয়া হয়ে, তাদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কিছু করতে সাহস পায় না। সতেরো জন নিরীহ মানুষকে ছাঁটাইয়ের কবলে ফেলা হয়েছে অনায়াসে, তাকেও নির্ভয়ে নোটিশ দিয়েছে, কিন্তু সতীশ আর নিবারণকে অবিলম্বে দূর করা জরুরি হয়ে পড়লেও হঠাৎ ওদের নোটিশ দিতে ভরসা পাচ্ছে না কর্তারা, ওদের তাড়াতে হলে বিশেষ বিবেচনা, বিশেষ আয়োজন দরকার।

মনের মধ্যে পুড়তে থাকে। তাকে তবে এমন ভীরু কাপুরুষ, গোবেচারা মনে করে জীবন— জীবনের চোখে মানুষ হিসাবে তার মূল্য এই ! কাকের কীর্তি আঁকা একটা চালকুমড়ো—

একটা সিগারেট ধরিয়ে রণধীর স্থিরদৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে থাকে পার্টিশনের কাঠটার দিকে। দু চোখ তার জ্বলজ্বল করে। পার্টিশন থেকে তার চোখ উঠে যায় ও পাশের দেয়ালে। মনের মধ্যে একে একে চলে যেতে থাকে আপিসের ভিন্ন ভিন্ন দেয়ালগুলি।

তারপর সে রঙের টিন আর তুলি হাতে নিয়ে গিয়ে ঢোকে আপিসের একপ্রান্তে কর্মচারীদেরই স্বকীয় পায়খানাদি ও জলের কলের ঘরটিতে। দরজার পর সরু প্যাসেজ, ডাইনে তিনটে খোপ, প্যাসেজের শেষে টাপ, বাঁয়ে শুধু চুনকাম করা সাদা দেয়াল। বিবর্ণ হয়ে গেছে দেয়ালটা, তবু তাই ভালো। নোংরা দুর্গন্ধ এখানটা— কিন্তু এখানে কেউ তার কাজ ঠেকাতে পারবে না, দরজাটা বন্ধ করে দিলে নির্জনে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যেতে পারবে।

বাধা কিন্তু পড়ে রণধীরের কাজে। কিছুক্ষণ পরে পরেই দরজায় ধাক্কা পড়ে, ডাক আসে : দরজা কে বন্ধ করেছে ? দরজা খুলুন ! রণধীর সাড়া দেয় না, তাড়াতাড়ি দেয়ালে তুলি চালিয়ে যায়।

টিফিনের ঘণ্টা কাবার হতে মিনিট পনেরো বাকি আছে, দরজা খুলে সে বেরিয়ে আসে। বাইরে থেকে জোরে জোরে ধাক্কা পড়েছিল দরজায়। বেরিয়ে এসে সে দেখতে পায় জন পাঁচেক সহকর্মী ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে অবিনাশও আছে।

এ দরজাটা বন্ধ করবার মানে ?

ভেতরে গিয়ে দেখুন।

তাড়াতাড়ি সে সরে যায়। আপিস থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থে চা খেয়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খানিক মানুষ ও গাড়িঘোড়ার চলাচল দেখে টিফিনের ঘণ্টার পর প্রায় আধঘণ্টা দেরি করে ফিরে আসে। মনটা তার অপূর্ব পরিতৃপ্তিতে ভরে গেছে। আপিসে তার ঢুকতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।

নতুন একটা উত্তেজনা ও সাড়া যে পড়ে গেছে চারিদিকে আপিসে পা দিয়েই সে তা টের পায়। একজন উত্তেজিত ভাবে কী বলছে আরেকজনকে, যে শুনেছে তার মুখে ফুটছে বিস্ময়, তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে কর্মচারীদের স্বকীয় পায়খানাদির ঘরের দিকে।

নিজের জায়গায় চুপ করে বসে থাকে রণধীর। অবিনাশ ধীরে ধীরে এসে কাছে দাঁড়ায়। শ্লথ নির্জীব মানুষটি বেশ খানিকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে

—যা এঁকেছো তা কি সত্যি ভাই ? ঠিক জানো তুমি ?

জানি বইকী।

অবিনাশের পর আরও অনেকে আসে। কেউ হেসে তার পিঠ চাপড়ে দেয়, কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে, চমৎকার এঁকেছ, কেউ বলে, বেশ করেছ ভাই। অনেকেই তাকে প্রশ্ন করে। সে প্রশ্ন প্রায় অবিনাশের জিজ্ঞাসার মতোই।

ছুটির পর দু-চারজন ছাড়া কেউ বেরিয়ে যায় না। প্রথমে একত্র হয় আট-দশজন, তারপর কেউ না ডাকলেও সেই ছোটো দলটির চারিপাশে সকলে এসে জমা হয় কয়েক মিনিটের মধ্যে।

অবিলম্বে বরখাস্তের নামে ছাঁটাই বন্ধ করার ও যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদের বরখাস্তের নোটিশ প্রত্যাহার করার দাবি এবং এই দাবি না মানা পর্যন্ত কোনো কর্মচারী কাজ করবে না এই ঘোষণার নীচে প্রায় সকলেই স্বাক্ষর করে বাড়ি যাবার আগে।

ভুবন আসল খবর জানায় জীবনকে। জীবন ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। হাঁ করে সে তাকিয়ে থাকে দেয়ালের পাশাপাশি দুটি মস্ত ছবি ও লেখাগুলির দিকে। বাঁয়ের ছবির উপরে বড়ো বড়ো হরফে লেখা '১৯৪০ সাল—পরামর্শ !' ছবিতে ভুঁড়ির মতো গিধর ও বাঙনা এবং কাকের কীর্তির ছাপ মারা চালকুমড়োর মতো জীবনকে স্পষ্ট চেনা যায়। তাদের পিছনে বোর্ডে লেখা : 'পার্মানেন্ট চাকরি—চলা আও !'

ছোটো হরফে নীচে লেখা : গিধর বলছে—পার্মানেন্ট বলে লোক নিলে কত সুবিধা। গড়পড়তা বিশ রুপেয়া কম দিতে হলে লোক পিছু বছরে দুশো চল্লিশ রুপেয়া মুনাফা।

বাঙনা বলছে—তারপর বরখাস্ত করলেই হল।

জীবন বলছে—ঠিক কথা হুজুর !

পাশের ছবির উপরে লেখা '১৯৪৫—শেষ ভাগ'। ছবিতে একই তিনজন—মুখের বীভৎস হাসি শুধু বীভৎসতর হয়েছে। দেহের তুলনায় হাতগুলি প্রকাণ্ড—সেই হাতে সাপটে তুলে ছোটো ছোটো অনেকগুলি মানুষকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ডাস্টবিনে। কয়েকটা মানুষ পড়েছে ডাস্টবিনে, হাতের মুঠোয় কয়েকজন লড়বড় করে ঝুলছে—লেখা আছে : পার্মানেন্ট কর্মচারী।

আর ডাস্টবিনের গায়ে লেখা : বরখাস্ত।

জীবনের চোখ কপালে উঠে যায়। তখন তার চোখে পড়ে যে সব কিছুর ওপরে আরেকটা লেখা আছে মোটা হরফে : ছাঁটাই রহস্য।

চক্রান্ত

এক মাস আগে পরে দুজনে চাকরি পেয়েছিল। প্রতিমা পেয়েছিল আগে দেড়শো টাকার। মহেশ মাসখানেক পরে শুরু করেছিল একশো টাকায়। তারপর অবশ্য মহেশ তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে গিয়েছিল প্রতিমাকে। যুদ্ধের অস্থায়ী চাকরি বলেই বোধ হয়। প্রতিমার চাকরিটা স্থায়ী হওয়ায় সে দেড়শো টাকাতেই ঠেকে গিয়েছিল কয়েক বছরের জন্য। চাকরি করে একদিন বাড়ির সকলকে মোটরে চাপিয়ে হাওয়া খাওয়াবে বলেই মহেশকে পরীক্ষাগুলি পাশ করানো হয়েছিল। প্রতিমার কাছে অবশ্য ও রকম প্রত্যাশা কেউ করেনি। তাকে পরীক্ষা পাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কম খরচে ভালো জামাই জোটাবার ভরসায়। পড়াবার ঋণ যে এদিক দিয়ে এ ভাবে শোধ করবে সে বাড়ির কেউ ভাবতেও পারেনি।

মা বলেছিলেন মাথা চাপড়ে, চাকরি করবে ? খেঁদি চাকরি করবে ? ও মধুসূদন ! ওগো মাগো ! হায় গো ভগবান !

বাপ বলেছিলেন ধমক দিয়ে, চুপ করো তুমি। দেড়শো টাকা মাইনে—করবে না চাকরি ? কত মেয়ে আজকাল চাকরি করছে, ওতে দোষ নেই।

তারপর বলেছিলেন ঝাঁঝের সঙ্গে, ছেলে ! ছেলে তো রাজা করল তোমায়, বুড়ো বাপের পয়সায় সিগরেট টানছে, লজ্জা নেই ! অমন ছেলের চেয়ে মেয়ে ভালো। ভগবান যদি রাখুকে নিয়ে খেঁদির মতো আরেকটা মেয়ে দ্যান—

এ ভাবে কথাটা বলা অন্যায় হয়েছিল দীনেশের, ছেলের মৃত্যু কামনা করার মতোই শুনিয়েছিল কথাটা। রাখালকে টেনে নিয়ে তার বদলে ভগবান প্রতিমার মতো আরেকটা দেড়শো টাকার চাকুরে মেয়েকে ধপ করে আকাশ থেকে ফেলে দেবেন, প্রার্থনাটা এতখানি খাপছাড়া হওয়া সত্ত্বেও।

প্রতিমাও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, এটা তোমার অন্যায় বাবা। দাদা চাকরি করবে না বলেই তো, নইলে একশো দেড়শোর চাকরি দাদা খুশি হলেই নিতে পারে। আমি যদি মিস্টার ঘোষকে বলি, শ-খানেক টাকার পোস্ট একটা নিশ্চয় দাদা পেয়ে যাবে।

রাখাল ঘরের ভেতরে ছিল না। বাড়ির কয়েকজনের যেখানে একসঙ্গে বসে কথাবার্তা চলে, রাখাল সেখানে কখনও থাকে না। সে তো জানে কী আলোচনা সবাই করে থাকে। পৃথিবী জুড়ে এমন একটা হানাহানি চলছে ভয়াবহ, এলোমেলো উলটাপালটা হয়ে যাচ্ছে সকলের জীবন, কিন্তু এত বড়ো জোয়ান মদ্দ সে, রোজগার করছে না—এ ছাড়া কওয়া বলার কথা কারও কিছু নেই। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছিল, সিগারেটটা সত্যই বাপের পয়সায় কেনা। গলির ওপাশে কলতলার ধারে বস্তির মেয়েদের জল নিয়ে মারামারি করা দেখতে দেখতে সে ঘরের ভেতরের আলোচনা শুনছিল। প্রতিমা তখনও আশ্বাস দিয়ে চলেছে বাপ-মাকে যে দাদাকে সে চাকরি পাইয়ে দেবে, বলে কয়ে রাজি করাবে চাকরি করতে। রাখাল তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকে বয়স্থা চাকুরে বোনের গালে ঠাস করে বসিয়ে দিয়েছিল একটা চড়।

নিজে একেবারে চাকরিতে বহাল হয়ে না এসে প্রতিমা এ সব কথা বললে হয়তো মেজাজটা তার এতখানি খিঁচড়ে যেত না।

দীনেশ প্রায় মারতে উঠেছিল ছেলেকে, হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিল, এই দণ্ডে বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। দূর হয়ে যা—বজ্জাত পাষণ্ড গুন্ডা—এখখুনি বেরো।

বাড়িটা দীনেশের নয়, ভাড়াটে বাড়ি। আস্ত বাড়িটারও সে ভাড়াটে নয়, মাত্র দোতলাটুকু। রাখাল সেই দণ্ডে এক কাপড়ে দীনেশের দোতলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল একতলায়। একতলার ভাড়াটে ফণী চক্রবর্তীর অল্পবয়সি বোকা বউ মাধুরীর কাছ থেকে দশটা টাকা চেয়ে রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। টাকাটা অবশ্য ফণী চক্রবর্তী পরে আদায় করে নিয়েছিল দীনেশের কাছ থেকে। কিন্তু চাওয়া মাত্র রাখালকে টাকা দেবার ব্যাপারটাকে সে যে কতকাল মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে মাধুরীকে ঠেঙাবার ছুতো হিসাবে কাজে লাগিয়েছে তার হিসাব হয় না।

উপর থেকে মাঝে মাঝে প্রতিমাদের কানে এসেছে ফণীর বজ্রগর্জন : গেলেই হত রাখাল চাঁদের সঙ্গে ? গেলি না কেন ?

তারপর রাখালের আর কোনো খবর মেলেনি। বৈশাখের মুহুর্মুহু বাজ ফেলা ঘন কালো আকস্মিক মেঘের মতো যে জ্বালাভরা নিরুপায় হতাশার বিষাদ মহাসমারোহে ঘনিয়ে এসেছিল সেদিন এ বাড়িতে, বাড়ির দুটি তলাতেই, আজও তা একেবারে মিলিয়ে যায়নি, কয়েকটা বর্ষা শীত বসন্ত যদিও ঘুরে গেছে ইতিমধ্যে।

অন্য সকলের বিষাদ কমে এল ক্রমে ক্রমে, প্রতিমার দুঃখ বেদনা গাঢ় ও গভীর হতে লাগল দিনে দিনে। দুরন্ত মর্মজ্বালার বৈশাখী ঝড়ো মেঘ উড়ে মিলিয়ে না গিয়ে পরিণত হয় জীবনের আকাশ-ঢাকা স্থায়ী শান্ত আষাঢ়ের বিষণ্ণ ভিজে মেঘে। রাখাল নিরুদ্দেশ হয়েছিল শুধু এ জন্য নয়, মহেশও চলে গিয়েছিল, এ জন্যও অনেকটা। দুজনে তারা ভালো চাকরি পাওয়ায় তাদের মিলনের বাতিল-যোগ্য বাধাগুলি তুচ্ছ ও অকারণ হয়ে গিয়েছিল, তবু তো মিলন তাদের হল না, মহেশ চাকরি করতে চলে গেল জব্বলপুর।

হাজারবার মনে নাড়াচাড়া করেও প্রতিমা মহেশের যুক্তিটা বুঝতে পারেনি। অস্থায়ী চাকরি, তাতে কী এসে যায় ? যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তো চাকরি থাকবে। কবে যুদ্ধের শেষ কেউ কল্পনা করতেও পারছে না আজ। তাছাড়া, যুদ্ধের সঙ্গে অস্থায়ী চাকরিটা শেষ হলেও অন্য কোনো চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে, এটুকু আত্মবিশ্বাস কি নেই মহেশের ?

অথবা, সে বেশি মাইনের স্থায়ী চাকরি পেয়েছে বলে পুরুষের অভিমানে ঘা লেগেছে মহেশের, এটাই আসল কথা ? প্রতিমা বিশ্বাস করতে চায় না, কথাটা কিন্তু কামড়ে থাকে মনের মধ্যে, তাকে ভাবতে হয়। জ্বালাভরা উদ্‌বেগের মতো চিন্তাটা তাকে পীড়ন করে। মহেশের একটা ছেলেমানুষি অভিমান তাকে বাতিল করে দিয়েছে এটা সে বিশ্বাস করতে চায় না, তবু সময় সময় এমন তুচ্ছ মনে হয় নিজেকে, এমন আঘাত লাগে তার নিজের অভিমানে।

তারপর মাইনের হিসাবে মহেশ তাকে ছাড়িয়ে গেল। তখন এদিকে জ্বালাটা কমল প্রতিমার। কিন্তু চাকরিতে এত উন্নতি করেও মহেশ কেন ইতস্তত করছে, অনেক দূরের ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ভয়কে আঁকড়ে রয়েছে ভেবে, আসল জ্বালাটা তার বেড়েই গেল।

তাদের দুজনকে দূরে সরিয়ে দিলেও দুজনের চাকরি যে দুটি সংসারকে চালু রেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। চলতে চলতে লড়াই তখন প্রচণ্ড জোরে চলা আরম্ভ করেছে। জিনিসপত্রের দাম চড়তে আরম্ভ করেছে হু হু করে, বাজার পরিণত হয়েছে চোরাবাজারে। লক্ষ লক্ষ সংসার হয়ে এসেছে অচল, টলমল। লক্ষ লক্ষ মানুষের না খেয়ে মরবার সম্ভাবনা বাস্তব সত্যে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে পথে ঘাটে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে। মহেশের বাবার পেনশনের টাকায় তাঁর অত বড়ো সংসার তখন

কোনোমতেই চলত না। পেনশন এক পয়সা না বাড়লেও সংসার চালানোর উপকরণের দাম বেড়েছে বহুগুণ, একটা টাকা যেন হয়ে গেছে দুয়ানির শামিল। দীনেশের সংসারও অচল হত। তার সদাগরি আপিসের চাকরির মাইনে বাড়ল না এক পয়সা, আপিসটার আয় প্রায় আড়াই শো গুণ বেড়ে যাওয়ায় কর্তারা তাকে মাগগি ভাতা দিতে আরম্ভ করল সাড়ে তেরো টাকা।

দুজনে তারা মেনে নেয়, মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পায় যে এদিক দিয়ে চাকরি করা তাদের সার্থক হয়েছে। কিন্তু নিজেরা সুখী ও সার্থক হয়েও তো অনায়াসে তারা চাকরি করে চালু রাখতে পারত সংসার দুটিকে। চাকরি পাওয়াতেই যখন বাধা সব বাতিল হয়ে গেল, মহেশ একা না পেয়ে দুজনেই পাওয়াতে আরও বেশিরকম গেল, তখন জাতের তফাত নিয়ে অশান্তি হত না দুটি পরিবারে। প্রতিমার মা বড়ো জোর বলত মাথা কপাল চাপড়ে— জাত ধম্মোও নিলে মধুসূদন ! কিন্তু বরণডালা সাজিয়ে বেজাত জামাইকে সাদরে সাগ্রহে অভ্যর্থনাও যে করত সন্দেহ নেই—তার চাকরে মেয়ের বিনা খরচায় পাওয়া চাকরে জামাই। পাওনা গন্ডার ঘাটতির আপশোশ মহেশের বাবা সামলে উঠত রোজগেরে বউ পেয়ে—যার দেড় দু বছরের রোজগার ছাপিয়ে যাবে একসঙ্গে পাওয়ার প্রত্যাশাকে। মিলনের জন্য উন্মুখ, উদগ্রীবও হয়ে উঠেছিল দুজনেই। তবু পর হয়েই দূরে দূরে তাদের থাকতে হল কেন—এক অনিশ্চিত কালের জন্য, প্রতিমা ভেবে পায় না।

জব্বলপুর রওনা হবার আগের দিন সন্ধ্যায় মহেশ বিদায় নিতে এসে চা খেতে চেয়েছিল—খোলা ছাতে ঘামেভেজা জামা খুলে খালি গায়ে পাটিতে পা ছড়িয়ে পিছনে হেলে দু হাতে ভর দিয়ে বসে। দিনের অবসানে সন্ধ্যার বিচিত্র পরিবর্তনগুলি তখন সবে ঘটতে শুরু করেছে আকাশে ও পৃথিবীতে। পৃথিবীতে আলো জ্বালা নিষেধ, সন্ধ্যাদীপের শিখা বাইরে থেকে নজরে পড়লেই জরিমানা, জেল। চাঁদ ও তারা মানুষের হুকুম না মেনে আলো ছায়ার ঝিকিমিকি খেলা শুরু করছে। মৃদু বাতাস সস্নেহে মুছে নিয়ে যাচ্ছে দুজনের সারাদিনের কাজের শ্রান্তি আর ঘাম। ও বাড়ির কাঁকলাস কিশোরটার বাঁশের বাঁশিতে ছড়িয়ে পড়েছে আথালি পাথালি মাথা কপাল কোটা ব্যথার কাকুতি। ভয়ে তারা অবশ হয়ে গিয়েছিল। কথা জড়িয়ে গিয়েছিল তাদের। নির্বাক স্তব্ধতায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা। কিন্তু নিজের হাত দিয়ে অপরের হাতটি পর্যন্ত ছুঁতে তারা একজনও ভরসা পায়নি, অপরজনের মনে কষ্ট দেবার ভয়ে।

এক বছরের মধ্যে পার্মানেন্ট করে দেবে বলেছে।

ওদের কথা কি— ?

যেদিন পার্মানেন্ট হব, সেদিন ছুটে আসব—ছুটি দিক না দিক। আজ যাই খেঁদি—কেমন যেন খারাপ লাগছে।

বলে মহেশ পালিয়ে গিয়েছিল। তার মুখের ভাষার মানে বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রতিমার। তার নিজেরও অসহ্য লাগছিল প্রতিটি মুহূর্ত। বিদায় নেবার আগের দিন নির্জন ছাতে পরস্পরের সঙ্গ অসহ্য হয়ে ওঠা আর খারাপ লাগা একই কথা।

ঠিকে ঝি আহ্লাদীর ছেলেটা একটানা কেঁদে চলেছে—রোয়াকের কোণে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়ায় চিত হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ছ মাসের ব টাকে সাথে নিয়েই সে কাজ করতে আসে, ঘরে ছেলে ধরবার তার লোক কেউ নেই। কাজে ফাঁকি দেয় না, একপাশে ছেলেটাকে ফেলে রেখে কাজ করে যায়, একটানা কান্না শুনেও ফিরে তাকায় না, শুধু প্রাণপণে চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে। মাঝে মাঝে তফাত থেকেই বাচ্চাটাকে উদ্দেশ করে বলে, এই যে সোনা ! এই যে সোনা ! এই যে সোনা !

প্রতিমা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে বলে, একটু সামলে নাও ছেলেকে আগে।

তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাত ধুয়ে আহ্লাদী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মাই দিতে বসে।

গোড়ায় জানলে ওকে প্রতিমা রাখত না। প্রথম দুদিন বাচ্চাটাকে আহ্লাদী সঙ্গে আনেনি—কোথায় কার কাছে ফেলে এসেছিল কে জানে ! ছেলেটা মেঝেতে পড়ে কাঁদে বলেও আহ্লাদী যেন অপরাধী হয়ে থাকে। অন্য ঝিদের তুলনায় সে তাই আশ্চর্যরকম নরম, ভালোভাবে কাজ করতে উৎসুক।

আপিসের বেলা হয়ে গেছে, স্নানের ঘরে তাড়াতাড়ি গায়ে মুখে একটু সাবান ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে প্রতিমা ভাবে, বিয়েটা যদি তারা সেরেই ফেলত মহেশ জব্বলপুরে যাবার আগে, একটা বাচ্চা যদি তার হত আহ্লাদীর মতো, আর আপিসের মেঝেতে বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে তাকে কাজ করতে হত পেটের দায়ে—

সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে প্রতিমার। পেটের দায়ে মানুষ কী করতে পারে আর মানুষকে কী করতে হয়, ভাবতে গেলেই গত মহাদুর্ভিক্ষের ভয়াবহ স্মৃতি শুধু এই শহরের বুকে যতটা প্রকট হয়েছিল চোখের সামনে তার ছবি নাড়া খায়—আজও তাজা হয়ে আছে মনের মধ্যে। পেটের দায়ের বাস্তব চেহারা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার নিজেরও অভিজ্ঞতায়। চাকরির রোমান্স নিঃশেষে উপে গিয়েছে। এ খুশির চাকরি নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার। নিজের আর আপনজনদের পেটের দায়েই তার চাকরি—নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে। বুড়ো দীনেশ রোগে অশক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে আপিস থেকে এক মাসের ছুটি ও এক মাসের বেতন দিয়ে। কুড়ি বছর বয়সে শুরু করে একত্রিশ বছর একটানা কাজ করে যাওয়ার কি অপূর্ব পুরস্কার ! প্রতিমার রোজগারে আজ সংসার চলছে এক বছরের বেশি। মাইনে বেড়েছে দশ টাকা। তার অনেক পরে কাজ লাগলেও ইতিমধ্যেই দুটো ইনক্রিমেন্টে মীণার বেড়েছে পঞ্চাশ,—তার বেলা দশ টাকা। কী আর করবে, কর্তা ব্যক্তিদেব সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করাটা তার আয়ত্ত হয়নি। তাই তার শুধু কাজের মাইনে। কাজটা সুসম্পন্ন হওয়া আপিসেরই প্রয়োজন, তাকে দিয়ে ভালোভাবেই কাজ চলছে, এইটুকু তার দাম। পুরুষ কাউকে রাখতে হলে অনেক বেশি মাইনে দিতে হত, এও তার একটা রক্ষাকবচ। অন্য দাম না দিয়েই সে তাই রেহাই পেয়েছে। নইলে হয়তো ঘোষ সায়েবের সঙ্গে গাড়িতে যেতে অস্বীকার করার পরদিন থেকেই চাকরি আর তাকে করতে হত না।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মনের ভাব বদলে যায়। মুখে এক কলি গানও গুণগুণিয়ে ওঠে। কাল থেকে সে ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তেজনা বোধ করছে। সবার সঙ্গে তার জীবনকেও এলোমেলো অর্থহীন ব্যর্থতায় ভরে দিয়ে চলেছে যে কুচক্রীরা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ গত ক-বছরে স্থায়ী হয়ে গেছে তার মধ্যে, মহেশ আসছে এ খবরের ক্ষমতা ছিল না সাময়িক ভাবেও তা কাটিয়ে দেয়। মেঘের ফাঁকে রোদ ওঠার মতোই তার উল্লাস জাগছিল আবার ঢেকে যাচ্ছিল।

আজকালের মধ্যে আসবে লিখেছে মহেশ। আর কিছু লেখেনি। চাকরি থেকে সে যে ছাঁটাই হয়েছে, প্রতিমা তা জানে। মহেশ কিন্তু জানায়নি। কেন জানায়নি কে জানে ! কী ভেবেছে মহেশ ? কী স্থির করেছে ? জানবার জন্য ছটফট করে প্রতিমার মন। এতদিন ধরে যত চিঠি লিখেছে মহেশ তাকে, ভবিষ্যতের কথা এড়িয়ে গিয়েছে সবগুলিতে। মাঝে মাঝে শুধু লিখেছে যে অন্য ডিপার্টমেন্টে ট্রানস্ফার হয়ে গিয়ে স্থায়ী চাকরি পাবার আশা আছে।

তাড়াহুড়ো করে স্নান সারতে পারে না প্রতিমা, তাই তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে খাওয়া সারতে হয়। দীনেশের এ সব ছিল টাইম-বাঁধা কাজ। ঘড়ি ধরে নাইতে যেত, মগ গুণে মাথায় জল ঢালত, খেতে সময় লাগত না এক মিনিট বেশি বা কম, রান্নার পদ বেশি হলেও নয়, কম হলেও নয়। এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যেত না দীনেশের, আস্তে চালানো কলের মতো ধীরে সুস্থে নাওয়া-খাওয়া

সেরে, জামা জুতো পরে, ছাতাটি বগলে নিয়ে, ঠিক সময়ে আপিসে রওনা হত। সেও হয়তো ও রকম হতে পারবে, আরও কয়েক বছর চালিয়ে যাবার পর। নাইতে যাবার আগে তার যে অদ্ভুত আলস্যটা আসে, উঠি উঠি করেও উঠতে পারে না, চটপট স্নানটা সেরে নেবে ভেবেও স্নানের যে আরামটা নেশার মতো পেয়ে বসায় কিছুতে স্নান সংক্ষিপ্ত করতে পারে না, সে আলস্য আর আরামের নেশা হয়তো একদিন তার কেটে যাবে। চাকরিতে বাপের মতো হয়ে চেহারাতেও হয়তো বাপের মতো হয়ে যাবে ততদিনে—গোলগাল মোটা।

আগের চেয়ে সে অবশ্য রোগাই হয়ে গেছে এ ক-বছরে, মোটা হবার কোনো সূচনা এখনও দেখা দেয়নি।

প্রতিমা তাড়াতাড়ি আপিসের কাপড় পরছে, মহেশ এসেছে খবর পৌঁছাল। প্রতি মুহূর্তে সে তার আবির্ভাব প্রত্যাশা করছিল, তবু তার মনে হল যেন এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। সর্বাঙ্গ কিছুক্ষণ শিথিল অবশ হয়ে রইল তার রোমাঞ্চের পর। চোখ বুজে ঢোক গিলে মাথায় সে একবার ঝাঁকি দিয়ে নিল। কী বিশ্রী, কী অস্বাভাবিক এই উগ্র কামনা নিয়ে এত দীর্ঘকাল একজন মানুষের অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় দিন গোনা, দেহমন যা এমনভাবে ক্ষয় করে আনে। কাপড় ঠিক করে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে প্রতিমা, আর একটু দেরি করতে হল। হঠাৎ চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল এক পশলা।

মহেশ রোগা হয়নি, আরও শক্ত সমর্থ সুশ্রী হয়েছে চেহারা। গাল ভরে ওঠায় তার মুখের চামড়া একটু রুক্ষ হওয়াতে বেশ জবরদস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ফিরে এলে শেষ পর্যন্ত ?

বিশ্বাস হচ্ছে না ?

সবে তারা কথা শুরু করেছে, দীনেশের ভাঙা গলার আওয়াজ ভেসে আসে, দশটা বাজে খেঁদি। আপিসে লেট হয়ে যাবে।

মহেশের সর্বাঙ্গে ব্যাকুল দৃষ্টি বুলাতে বুলাতেই নিচু গলায় প্রতিমা বলে, চলো বেরিয়ে যাই, কোথাও বসে কথা বলা যাবে নিশ্চিন্ত মনে। আপিস কামাই করেছি জানলে বাড়িতে সবাই খেয়ে ফেলবে প্যানপেনিয়ে, পাছে চাকরি যায়।

আপিস যাবে না ? মহেশ জিজ্ঞেস করে রাস্তায় নেমে।

আজ আপিস যাব ? প্রতিমা বলে ভর্ৎসনার সুরে, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেই সারাদিন কেটে যাবে না ? অনেক ঝগড়া আছে। প্রথমে বলো দিকি, একটিবার ছুটি নিয়ে এলে না কেন ? বারবার লিখলাম, তবু ?

দু-চারদিনের জন্য আসতে ইচ্ছা করত না। সাতদিনের বেশি ছুটি দিল না একসঙ্গে। তাছাড়া—

তা ছাড়া— ?

নাঃ। এমনি।

আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে প্রতিমা মহেশের মুখের দিকে তাকায়। তাকে কিছু বলতে শুরু করে হঠাৎ থেমে গিয়ে মনের কথা মনে রেখে দেবার স্বভাব তো ছিল না মহেশের ! মহেশের মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ তাকে আহত করে। প্রায় চার বছর পরে দেখা—এখনও পাঁচ মিনিট পূর্ণ হয়নি !

চাকরির কথাটাও বলতে গিয়ে বলতে পারছে না মহেশ, প্রতিমা বুঝতে পারে।

মহেশকে এক কাপ চাও দেওয়া হয়নি মনে ছিল প্রতিমার। চায়ের দোকান সামনে পড়ায় সে মহেশকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। সে নিজেও চা খাবে। চাকরিতে ঢুকে চায়ের পিপাসা অদ্ভুত রকম বেড়ে গেছে প্রতিমার। পেলেই খায়, ভাত খাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে খেতেও বাধে না। মাঝে মাঝে অম্বলে

বুক জ্বলে,—তবু। স্কুল কলেজ আপিসের টাইম, দেশি, রেস্টুরেন্টটি প্রায় খালি। চায়ে গুড়ের গন্ধ। মহেশ মুখ বাঁকায়। প্রতিমা নির্বিচারে খেয়ে যায়, তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

এইখানে এতক্ষণ পরে মহেশ চাকরির কথা বলে। তার কথার ঝাঁঝে চমক লাগে প্রতিমার। —কী ভাবে ঠকালো দ্যাখো। দু-বছর আগে পার্মানেন্ট চাকরি পেয়েছিলাম একটা, রিজাইন দিতে চাওয়া মাত্র মাইনে বাড়িয়ে দিল, এক রকম কথা দিল যে নিশ্চয় পার্মানেন্ট করে দেবে। আজ এক কথায় ছাঁটাই। বললে, এখানকার লেবার এক্সচেঞ্জে চাকবিব ব্যবস্থা কবে দেবে। চার-পাঁচদিন ধন্না দেবার পর কাল এই ইউরোপিয়ান ফার্মে পাঠিয়েছিল, ম্যানেজাব বলল, ষাট টাকার একটা চাকরি দিতে পারি। ষাট টাকা !—

চার-পাঁচদিন— ? প্রতিমা সংশয়ভরে প্রশ্ন করে।

আমি এসেছি দিন সাতেক। ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক কবে নিয়ে তারপব—

টেবিলের সস্তা শ্বেতপাথরে কনুই রেখে দুজনে মুখোমুখি বসে থাকে চুপ করে। মহেশের তীব্র আতঙ্ক সে টের পায়, ছোঁয়াচ লেগে কেঁপে কেঁপে যায় তারও বুক। এ তো সহজ কথা নয় ! এমনভাবে হতাশ, দিশেহাবা হয়ে গেছে মহেশ ! মহেশ ছাঁটাই হয়েছে এ কথা আগে জানলেও তাব তো বিশেষ ভাবনা হয়নি। সে ধরে নিয়েছিল, যুদ্ধের চাকরি গেছে তো গেছে, মহেশ আবেকটা চাকবি জুটিয়ে নেবে, নয়তো অন্য কিছু করবে। এই কদিনের চেষ্টায় চাকরি জোটেনি বলেই এমন ভয় পেয়ে গেছে মহেশ, এমন উতলা হয়ে উঠেছে ! এমনভাবে ভেঙে পড়েছে তাব আত্মবিশ্বাস ! এতকাল পবে বাড়ি ফিরে দুটো দিন বিশ্রাম করেনি, একটা কিছু ঠিক করে না নিয়ে তাকে মুখ দেখাতে চায়নি সাতদিনের মধ্যে !

প্রতিমা খুব দমে যায়। সহানুভূতিতে বুক তার ভরে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত গর্ব আর উল্লাস সে অনুভব করে অনেকদিন পরে, চার বছরেব প্রতীক্ষাক্লিষ্ট ঝিমানো হৃদয় নতুন সুখ ও গৌরবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার জন্য, তারই জন্য মহেশের এই বিব্রত, বিপন্ন অবস্থা। চাকরি স্থায়ী নয় বলে চারবছর তাকে কষ্ট দিয়ে চাকরি হারিয়ে এসে দিশেহারা হয়ে গেছে মহেশ, পাগলেব মতো একটা কিছু ঠিক করার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে চারিদিকে। কিন্তু সাতদিনেব বেশি দূবে থাকতে পারেনি। ব্যর্থ হয়ে, হতাশ হয়ে তাবই কাছে ছুটে এসেছে সান্ত্বনার জন্য, দরদের জন্য। মমতায় অবশ বুকটা টনটন করে প্রতিমার, কিন্তু সে কি করে ঠেকাবে পুলকেব রোমাঞ্চ, যদি গরম চায়েব দোকানে যদি বাস্তব হয়ে ওঠে তার মানস বাসর, ট্রামবাসের আওয়াজ যদি গান হয়ে ওঠে তার কানে।

কেন ভাবছ তুমি ? প্রতিমা বলে দবদের অনুযোগে, একটা কিছু হবেই। দুটো মাস নয় ঘরেই বসে রইলে কী এসে এসে যায় ? এত ব্যস্ত হবার কী হয়েছে ?

কী হয়েছে ? এতক্ষণ পবে এই প্রথম বিশ্রী একটু হাসি ফোটে মহেশের ঠোঁটে, দু মাস ঘরে বসে থাকলে—না-খেয়ে মরবে না সবাই ?

প্রতিমা মরে যায়। সবাই মরে যাবে না খেয়ে, এই আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে মহেশ – তার জন্য নয় ! ক্ষীণস্বরে কোনোমতে বলে, তোমার বাবা তো পেনশন পান ?

মহেশ দু চোখে অবিশ্বাস্য বিস্ময় নিয়ে তাকায় প্রতিমাব দিকে।—বাবা ? প্রায় একবছব হল বাবা মারা গেছেন, জানো না তুমি ?

প্রতিমা জানত না। মহেশ কোনো চিঠিতে এ খবরটা তাকে জানায়নি। মহেশ চলে যাবার পর প্রথম দিকে ন-মাসে ছ-মাসে দু-চারবার অল্পসময়ের জন্য প্রতিমা তাদের বাড়ি গিয়েছিল, তাবপর নিজের জীবনচক্রে পাক খাওয়ার ধাক্কা সামলে চলতেই এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে আর যাওয়াও হয়নি, খোঁজখবরও নেওয়া হয়নি। প্রতিমাকে মানতে হয় নিজের মনে, খোঁজ নেবার তাগিদও সে অনুভব করেনি বিশেষ। আপনজনকে আপন ভাবা হয়ে ওঠেনি তার, তারা মরল কী

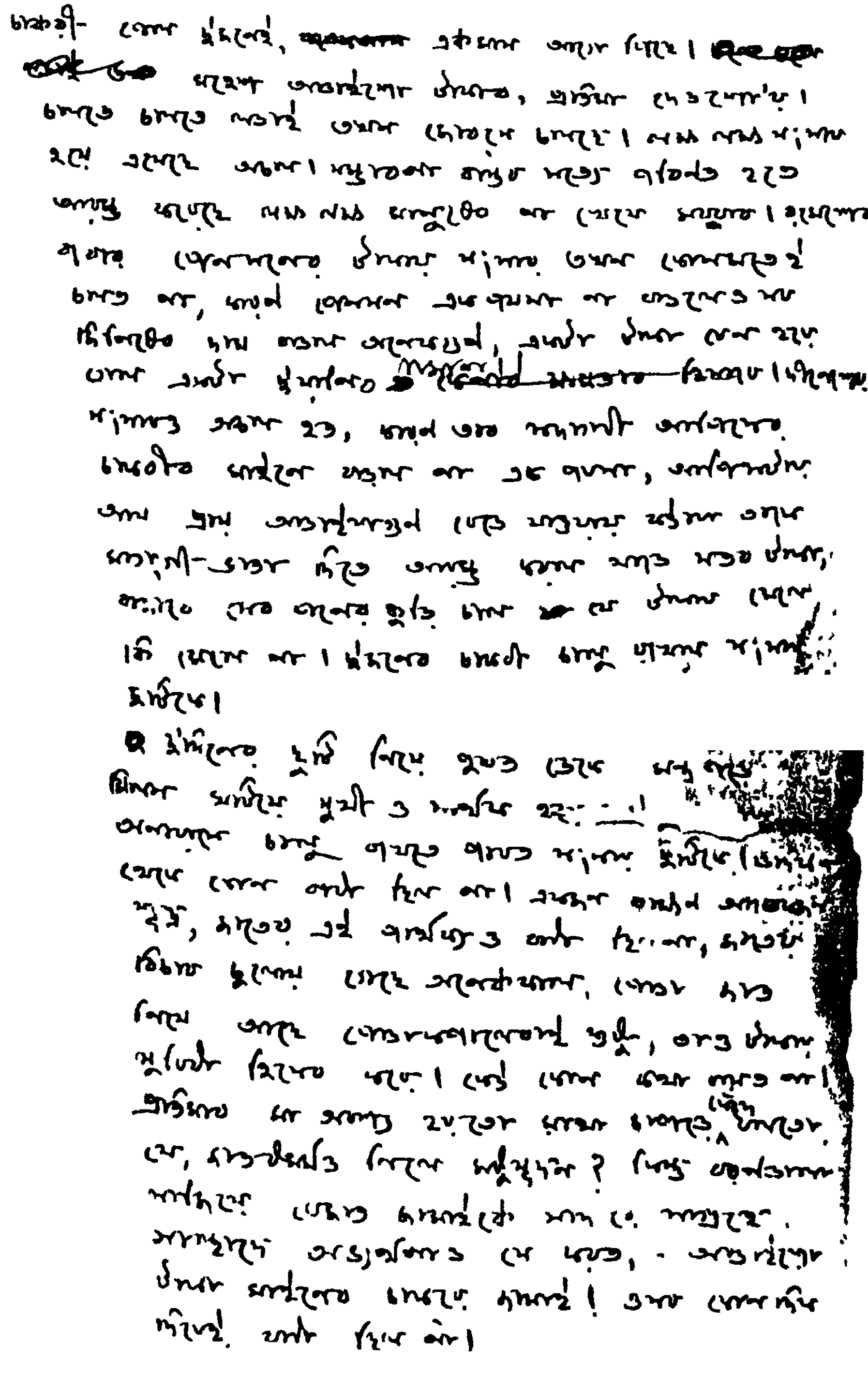

চক্রান্ত গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

বাঁচল ভাববার অবসরও হয়নি। মহেশই তার মন জুড়ে ছিল কিন্তু তার বাড়ির লোকেরা এতটুকু স্থান পায়নি সেখানে। এমন স্বার্থপর সে ? কান দুটি গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে প্রতিমার, লজ্জায়—ক্ষোভে।

তুমি তো লেখোনি কিছু। প্রতিমা বলে মরিয়া হয়ে, সরল ভাবে। বাবার অসুখ হল, বিছানা নিলেন, চাকরি গেল। সেই থেকে আমি একা সংসার চালাচ্ছি। সোজা ঝঞ্ঝাট ! এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। মামাতো বোনের বিয়ে হল, সে বিয়েতে পর্যন্ত যেতে পারলাম না—আমি যে কী অবস্থায় আছি।

প্রতিমার চোখ ছলছল করে এসেছে দেখে মহেশ বিব্রত, শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাকে বিব্রত, শঙ্কিত হতে দেখে প্রতিমা আত্মসংবরণ করে। প্রশ্ন করে—বাস্তব, যুক্তিসঙ্গত।

তিনশো টাকা মাইনে পাচ্ছিলে। কিছু জমাওনি ?

জমাইনি ? সাতশো টাকা ধার জমিয়েছি ! আমি একবার রাগ করে বাবাকে লিখেছিলাম, বড়ো বেশি খরচ হচ্ছে। বাবা তার জবাবে একমাসের খরচের হিসেব পাঠিয়েছিলেন। সাতজনের দু-বেলার মাছ—একপোয়া ! ছোটকুর জন্য একপোয়া দুধ, পেট ভরে না বলে আদ্দেকের বেশি বার্লি মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। আফিম খান বলে বাবা আগে দেড় সের দুধ খেতেন, সেটা কমিয়ে দেড় পোয়া করেছেন। আর—

মহেশ সজোরে মাথায় ঝাঁকি দেয়, পরের মাস থেকে আরও পঁচিশ টাকা বেশি পাঠাতাম—অবশ্য নিজের খরচ কমিয়ে।

কথা যেন শেষ হয়ে যায় তাদের। আপিস কামাই করে সারাদিন মহেশের সঙ্গে কথা বলবে ভেবেছিল প্রতিমা, সাড়ে দশটায় সময় সে আর বলার কথা খুঁজে পায় না। ট্রাম মোটরেব শব্দকে তলিয়ে দিয়ে কিছুদূর থেকে এক মিছিলের আওয়াজ ভেসে আসে। চায়ের দাম মিটিয়ে তারা ফুটপাথে নেমে দাঁড়ায়। প্রৌঢ় যুবা কিশোরের সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা এগিয়ে এসে সামনে দিয়ে চলে যায়, গায়ে তাদের ব্যাজ আঁটা। এরা সবাই শিক্ষক, দেশের সবচেয়ে নিরীহ গোবেচারি অল্পে-সন্তুষ্ট শান্তশিষ্ট মানুষ। তারা আজ মরিয়া হয়ে দল বেঁধে শহরের পথে মিছিল করেছেন। ঠিক সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে রিকশার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ঘর্মাক্ত রিকশাওয়ালা। পান বিড়ি সিগ্রেটের দোকানে অল্প একটু জায়গায় পাঁচজন লোক ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে হাতে বিড়ি বানাতে বানাতে, চোখ তুলে তুলে মিছিল দেখছে। ঝাঁটা হাতে যে তিনটি মেথরানি উপর তলার ব্যাঙ্কের ফুটপাথ-ঢাকা অলিন্দের থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উদাস উপেক্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিছিলের দিকে, বারবার তাদের দিকেই তাকায় প্রতিমা। তিন জনেই যে ওরা জননী সে টের পায়—কমবয়সি ছিপছিপে মেয়েটা পর্যন্ত !

হঠাৎ প্রতিমা ব্যগ্রভাবে নিচু গলায় বলে, আমি দেড়শো পাই, তুমি যদি ষাট টাকার ওই চাকরিটা নাও—গলা বন্ধ হয়ে যায় তার। ঠোঁট কামড়ে সে মাথা নামায়। মহেশের কাছে থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মুখ তুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে ভাবে, ভাগ্যে তার কথা মহেশ শুনতে পায়নি !

আমি আজ যাই খেঁদি ?

আচ্ছা।

পরশু আসব। কাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দেখি কী হয়।

পরশুই এসো ! বিকেলে এসো—ছটার সময়।

আচ্ছা।

মিছিলের পিছনের ট্রামে উঠে মহেশ যেন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ফুটবোর্ডে—দরজার মাঝখানের রডটা আঁকড়ে ধরে, অন্য মানুষের শরীরগুলির সঙ্গে সেঁটে গিয়ে। ফিরে সে তাকায় না, একবারও না।

প্রতিমা চায়ের দোকানে ঢুকে আর এক কাপ চা খায়। হাত ঘড়িতে সময় দ্যাখে—এগারোটা প্রায় বাজে। পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা হবে। মিছামিছি আপিস কামাই করে কোনো লাভ আছে কি ? তার চেয়ে নয় লেট হবে। মীণা তো প্রায়ই লেট করে আসে, সে নয় একদিন লেট হবে। আপিস যদি সে না যায়, কী করার আছে তার, কোথায় সে যাবে, সারাটা দিন কাটাবে কোথায়, কী নিয়ে ?

চায়ের দাম দিয়ে প্রতিমা বাসে ওঠে। বাসে যত ভিড় হোক, বসতে পাওয়া যায়। প্রায় সবগুলি আসনের উপরে লেডিজ সিট লেখা থাকে—লেডি কেউ উঠলেই কন্ডাক্টর পুরুষদের উঠিয়ে দিয়ে লেডিকে বসিয়ে দেয়। দেহে ভীরু কাপুরুষ হস্তার্পণ থেকে বাঁচা যায় বসতে পেলে।

আপিসের কাছে গিয়ে কিন্তু সে বাস থেকে নামে না। একটা দারুণ অনিচ্ছা, কঠোর প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। জীবনে আর সব কিছু তার বাতিল হয়ে যাবে, শুধু থাকবে আপিস ? দুজনের কথা তার মনে পড়েছে, আপিসে দিন কাটাবার অভ্যাস যখন হয়নি তখন যাদের যে কোনো একজন সঙ্গে থাকলে দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরও পেত না—শুধু গল্প আর কথায়। কতকাল দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে। আজ আপিসে না গিয়ে মিনতি আর সুধার বাড়িতেই ভাগাভাগি করে কাটিয়ে দেবে দিনটা।

গলির মধ্যে মিনতিদের বাড়ি। ভেতরে ঢুকেই প্রতিমার চোখে পড়ে, মিনতির বড়ো ভাই মাখন বারান্দায় খেতে বসেছে। এতদিন পরে প্রতিমাকে দেখে সে নির্জীবের মতো বলে, অনেকদিন পরে এলেন।

আপিস যাননি ?

আপিস ? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আবার আপিস কীসের ?

কেন, আপনার তো যুদ্ধের চাকরি ছিল না ?

সোজাসুজি না হোক, তাই ছিল বইকী। যুদ্ধের জন্য কাজ বেড়েছিল, বেশি লোক নিয়েছিল। এখন কাজ কমেছে, ছাড়িয়ে দিয়েছে।

মাখনের বউ আসছিল, কন্ট্রোলের মোটা ছেঁড়া ছোটো কাপড় পরা। পাতের সমস্ত ভাত মাখন ডাল দিয়ে মাখছে, থালায় আর শুধু একটু ঝিঙে কুমড়োর তরকারি। বাটি .থকে জলের মতো পাতলা আর একটু ডাল মাখনের বউ তার পাতে ঢেলে দেয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নির্জীবের মতো প্রতিমাকে বলে, ভালো আছেন ?

ম্লান বিষণ্ণ তার মুখ।

ঘরে থেকে মাখনের মা কথা শুনছিলেন, বেরিয়ে এসে প্রতিমাকে বলেন, আর বোলো না মা, চারিদিক থেকে লেগেছে। জামাইকেও নাকি ছাড়িয়ে দেবে দু-একমাসের মধ্যে।

মিনতিও ওই কথাই বলে যায় আগাগোড়া। এতদিন পরে সখীর সঙ্গে দেখা, বলার যেন তার আর কথা নেই।

এবারেই গেছি আমি, মিনতি বলে, সেই অজপাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি, সেখানে পাঠিয়ে দেবে বলছে। অ্যাদ্দিন চাকরি ছিল, মাসে মাসে খরচ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থাকতে লজ্জা করেনি—চাকরি গেলে একদিনও থাকতে পারবে না, অপমান বোধ হবে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে নিজে মেসে হোটেলে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। আমি যত বলি, তুমি হোটেলে থাকতে চাও থাক, আমি এখানে থাকলে দোষ কী ? তা রাখবে না। বেশি বলতে গেলে চটে যায়। এমন বিশ্রী মেজাজ হয়েছে আজকাল—

প্রতিমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সমস্ত বাড়িতে থমথম করছে জমজমাট বিষাদ। মিনতির কথায় শুধু হতাশা, দুর্ভাবনা, ভয়। বেলা তিনটে চারটে পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকবে ভেবেছিল, প্রতিমা, আধঘণ্টার মধ্যে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে সে হাঁপ ছাড়ে।

সুধার কাছে যাবার ইচ্ছাটা অনেকখানি উপে গিয়েছে। সেখানে গিয়েও যদি একটু হাসি আনন্দের বদলে এমনি বিব্রত সংকটাপন্ন মানুষের হতাশার কাহিনি শুনতে হয় ? শুনতে হবে কি হবে না জানবার তাগিদটাই যেন তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ট্রামে উঠিয়ে দেয়। সুধা থাকে শহরের আরও উত্তরে, স্বামীর সঙ্গে ভাড়াটে বাড়িতে। মিনতির অনেক আগেই সুধার বিয়ে হয়েছিল, তার তিনটি ছেলেমেয়ে, গত বছরখানেকের মধ্যে সংখ্যাটা যদি আর না বেড়ে থাকে।

ধীরেন নিজেই দরজা খুলে দেয়। বাড়িটা শূন্য, নিঝুম মনে হয় প্রতিমার।

সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি ও মাসে।

হঠাৎ ?

ধীরেন এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। বোধ হয় তার মনে পড়ে এই মেয়েটি সুধার প্রিয়তমা সখী, তার সঙ্গেও এর পরিচয় আত্মীয়তার মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপার হল কী, একটা বড়ো বিপদে পড়ে গেলাম। আপিসে হঠাৎ ডিগ্রেড করে দিলে, মাইনে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। আমার কাজের দোষ দেখালে কতগুলি, কিন্তু আসল কথা হল লড়াই থেমে গেছে, একটা ছুতো করে মাইনে কমিয়ে দিল। রিজাইন দিই তো দেব, ওই মাইনেতে অন্য লোক নেবে। ভেবেছিলাম রিজাইন দেব, কিন্তু—

ধীরেন একটু হাসে। করুণ নয়, মর্মান্তিক জ্বালা ভরা হাসি।

দেখলাম, ও টাকায় বাসা করে থাকা যায় না, অগত্যা সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম দেশে। আগাম ভাড়া দেওয়া আছে বাড়িটার, নিজে তাই এ মাসটা আছি।

আপিস যাননি ?

আজ ছুটি। বড়ো মালিক মশায় কাল নরকে গেলেন, তাঁর সম্মানে ছোটো মালিক মশায় আজ ছুটি দিয়েছেন।

মাথা ঘুরছিল প্রতিমার ! আপিসে পার্টিশনের ছোটো ঘুপচিটির মধ্যে নিজের অভ্যস্ত চেয়ারটির জন্য মন তার উতলা হয়ে ওঠে, ওইখানে সে যেন আড়াল হতে পারবে জগৎ থেকে, কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

প্রতিমা সোজা আপিসে চলে যায়। বাড়িতে দীনেশের অসুখের জন্য দেড়টার সময় আপিসে আসার কৈফিয়ত উপরওলা বিশ্বাস করে, আপিস ফাঁকি দেবার স্বভাব প্রতিমার নয়।

সারাদিনের শ্রান্তি প্রতিমাকে কাবু করতে পারে না, আপিস থেকে ফিরবার সময় শ্রান্তিতে বরং তার দেহমন শান্ত হয়ে যায়। উদার ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে মনটা। ক্ষমা অবশ্য সে করে না চক্রীদের, যাদের চক্রান্ত জীবনটা তার দুঃখের তাণ্ডবে পরিণত করেছে, কিন্তু নিজের মর্মের শিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে অর্থহীন ভাবপ্রবণতার আত্মরতিকে এখন সে প্রশ্রয় দেয় না। তার নিজের জীবনের সমস্যা ও ব্যর্থতা বৃহৎ ও ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে যায় অসংখ্য জীবনে, নিজেকে ভুলে সে ভাবতে থাকে অন্য সংখ্যাহীন মানুষের কথা।

বাড়ির সদরের চৌকাঠ পার হবার সময় আহ্লাদীর ছেলের কান্না শুনতে পায় না আজ। প্রতিমা আশ্চর্য হয়, ভাবনায় পড়ে যায়। আহ্লাদী তাহলে আজ কামাই করেছে, কাজে ফাঁকি দিয়েছে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানোর কাজগুলি হয়তো এখনও স্থগিত রেখেছে বাড়ির লোক আহ্লাদীর

আসবার আশায়, সারাদিন খেটেখুটে এসে এই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে এখন তাকে আবার ওই সব কাজে হাত লাগাতে হবে।

কলতলা থেকে বাসনের পাঁজা নিয়ে আহ্লাদী রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে প্রতিমা দেখতে পায় ভেতরে ঢুকেই, তারপর তার চোখ পড়ে বারান্দার কোণে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শোয়ানো ঘুমন্ত শিশুটার দিকে।

বাসন রেখে এসে আহ্লাদী বলে, জ্বর হয়েছে দিদিমণি, গা-পোড়া জ্বর। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কাজ করতে এলি কেন তুই ? ধমক দিয়ে বলে প্রতিমা।

না এলে তো মাইনে কাটবে। খাব কী ? আহ্লাদী বলে দাঁতে দাঁত কামড়ে।

প্রতিমা বারকয়েক তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নেয়।

তোর স্বামী কী কাজ করে ?

এতদিন এখানে কাজ করছে, প্রতিমা কোনোদিন তার ঘরের খবর একটিও জিজ্ঞেস করেনি। আহ্লাদী চোখ নামায়। মুখের তীব্র আক্রোশের ভঙ্গিটা তার নরম হয়ে আসে।

কলে খাটে। একটু থেমে যোগ দেয়, একজনের রোজগারে চলে না দিদিমণি।

এ কথা যেন বলার দরকার ছিল, কামাই করলে মাইনে কাটা যাবে বলে জ্বরে কাহিল শিশুটাকে নিয়ে সে কাজ করতে এসেছে, তার পরেও ! অথবা দরকার ছিল ? দিন চালানোর দায়ে আহ্লাদী ছেলে নিয়ে বাসন মাজতে আসে তার ঘরে এ তো চিরদিন সে জানত, কিন্তু সে যে কেমন দায় আজকের মতো এমন মর্মে মর্মে কি জানতে পেরেছিল সে কোনোদিন ? জাঁতাকলে নিজের জীবনটা পিষে যাচ্ছে জেনেছে বলে, মহেশ, মিনতি, তার স্বামী, মাখন, তার মা, বউ, সুধা, ধীরেন এদের জগতের জীবনগুলি পিষে যাচ্ছে অনুভব করেছে বলে, তবেই না আজ তার মনে পড়েছে এমন কত আহ্লাদী আর তার স্বামী আছে—যারা গুঁড়ো হচ্ছে এই পেষণে ? অন্ধকারে ছোটো মেয়ের ভয় পাওয়ার মতো অদ্ভুত এক অন্ধ আতঙ্ক জাগে প্রতিমার। কোলের ছেলে মাটিতে ফেলে আহ্লাদীকে তার বাসন মাজতে হয়, তবু একবেলা কামাই করলে সে তার মাইনে কাটে, এই পাপের ফল কী ফলছে তার জীবনে ? আহ্লাদীদের অভিশাপ কি লেগেছে মিনতিদের, সুধাদের, মাখনের মা-বউদের জীবনে ?

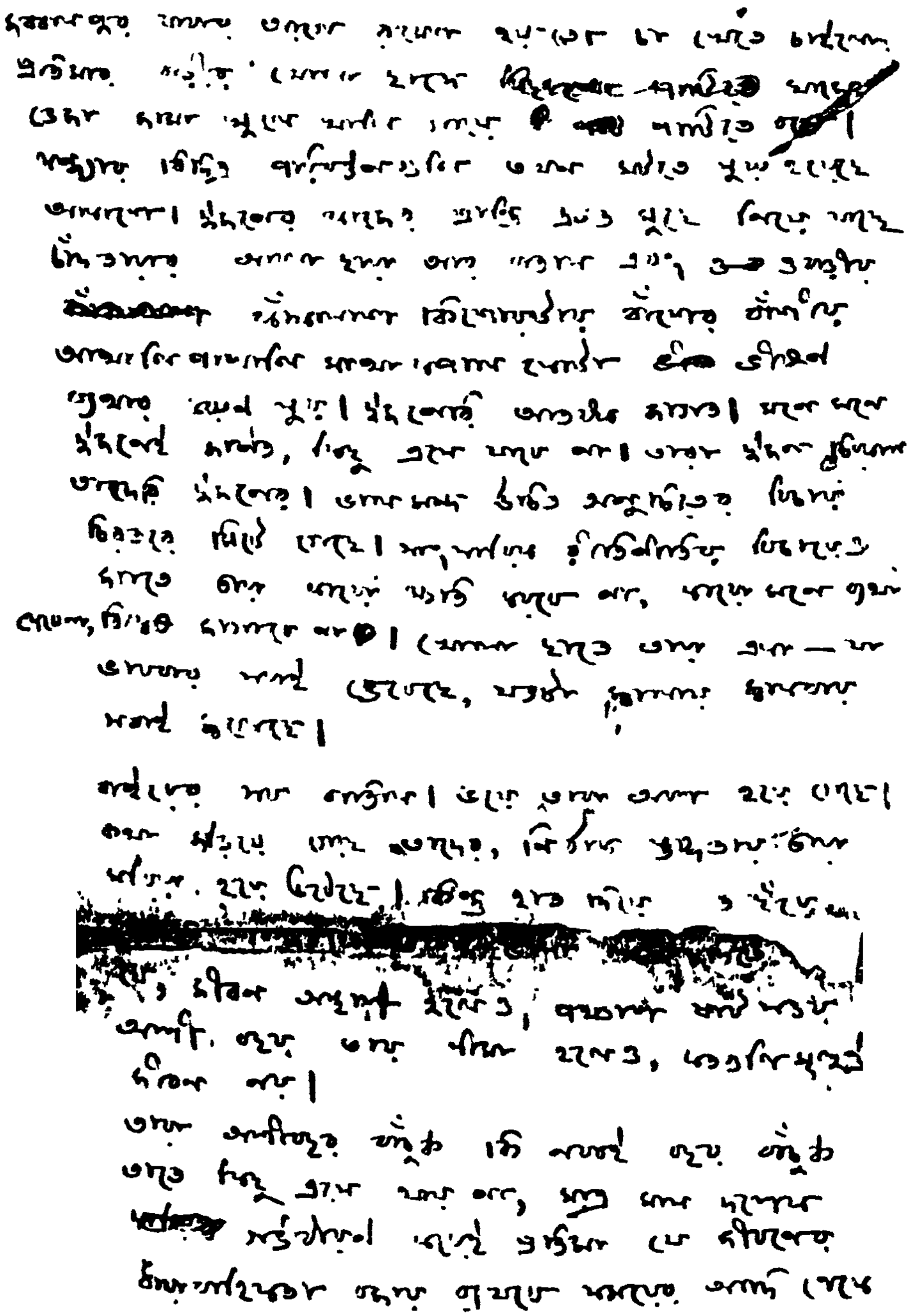

চক্রান্ত গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

গুন্ডামি

ট্রাম এলো মানুষ বোঝাই। গাড়ি দাঁড়াবার আগেই শাস্তা লক্ষ করেছে, লেডিজ সিট খালি নেই একটিও। ঠেলে ঠুলে উঠে কোনো রকমে দাঁড়াবার একটু স্থান হতে পারে। তবু শাস্তা এই ট্রামেই উঠে পড়ল। এ সময় এখানে আজকাল লেডিজ সিট প্রায় খালি থাকেই না, সে আশায় থাকলে কটা ট্রাম ছেড়ে দিতে হবে ঠিক নেই। তার চেয়ে উঠে পড়াই ভালো। মেয়েরা কেউ হয়তো কিছুদূর গিয়ে নেমে যেতে পারে। পুরুষেরা হয়তো কেউ সিট ছেড়ে দিতে পারে। দুজনের বেঞ্চের একজনের এ সুমতি হলে অন্যজনের মনে যাই থাক আর যাই মনে হোক, তারও আসন ছেড়ে উঠে না দাঁড়িয়ে উপায় থাকে না। শাস্তা তখন প্রথমে ভিতরের দিকে জানালা ঘেঁষে বসবে। তারপর এ ভদ্রতা যিনি করেছেন তাকে ডেকে পাশের জায়গা দেখিয়ে বলবে, আপনি বসুন।

যদি কেউ ভদ্রতা করে।

মেয়েদের জন্য রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা হবার পর থেকে কী যেন হয়েছে পুরুষদের, কদাচিৎ এ ভদ্রতা পাওয়া যায়। ভদ্রঘরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে টের পেয়েও একান্ত উদাসীনের মতো মুখ করে ঠায় বসে থাকে' ও রকম ভাব করে বলেই বিশ্রী লাগে শাস্তার। যদি একেবারে গ্রাহ্য না করত, সচেতন হয়ে না উঠত, কিছুই মনে করত না সে। তবু, এবা শুধু ভদ্রতা না করেই ক্ষান্ত, কত লোক যে বিশ্রী অভদ্রতাও করে ভিড়েব সুযোগে। মেয়েদের কাছে সেই অভদ্রতার এমন বিবরণ শাস্তা শুনেছে যে রক্তে তাব আগুন ধরে গেছে। ব্যাপারটা কল্পনা করতে গিয়ে চুপচাপ বিনা প্রতিবাদে সে অপমান ওবা কী করে সহ্য করে গিয়েছে, শাস্তা ভেবে পায়নি। ভিড়ে অত লোকের মধ্যে বিচ্ছিরি ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা কবতে ওদের নাকি লজ্জা করে। লজ্জা ! মানুষের কুৎসিত নির্লজ্জতা সয়ে-যাওয়া মেনে-নেওয়া লজ্জাবতী লতা সব। ধিক্ !

মাঝে মাঝে ট্রামে মানুষের অসভ্যতার পরিচয় শাস্তাও অবশ্য পেয়েছে। কিন্তু সে সব খুব সামান্য, তুচ্ছ ব্যাপার। অন্যায়টুকু ইচ্ছাকৃত কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেছে। ভদ্রবেশধারী মানুষগুলির মধ্যে কে দোষী তাও সব সময় সে ঠিক কর'' পারেনি।

মাধবী, অনুপমা আর শোভার মতো অপমান যদি তার জুটত একদিন ! একজন হোক আর পাঁচ জন হোক তৎক্ষণাৎ সে বুঝিয়ে দিত সেই বজ্জাত গুন্ডাদের যে সব বাঙালি মেয়ে নিরীহ গোবেচারি নয়, হাঙ্গামা বাধাতে, মজা টের পাইয়ে দিতে ভয পায় না, দ্বিধা করে না, এমন মেয়েও আছে। ট্রামেবাসে মেয়েদের প্রতি এক শ্রেণির লোকের পশুর মতো আচরণের বিরুদ্ধে শাস্তার মনের তীব্র প্রতিবাদ প্রায় এই আপশোশের রূপ নিয়েছে যে অন্তত একটা পশুকেও উপযুক্ত শাস্তি দেবার সুযোগ তার জুটল না !

সব দিন সমান যায় না। এতদিন পরে সুযোগ তার সে আজ। ট্রামে উঠবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, লেডিজ সিটের কাছাকাছি গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছে। ভিড়ের জন্য যে নয় তাতে এতটুকু সংশয়ের অবকাশ থাকে না। এ ইচ্ছাকৃত কুৎসিত হস্তক্ষেপ।

ফুঁসে উঠে শাস্তা ঘুরে দাঁড়ায়। দোষী হবে একজন, সম্ভবপর দুজনের মধ্যে। একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক, গায়ে চাদর, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো। মাথার ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুলে সিঁথি প্রায়

নেই বললেই চলে, কিন্তু সযত্নে আঁচড়ানো। গোঁফদাড়ি চাঁছা মুখে গম্ভীর বিষাদ, চোখ হয় রাত জাগার জন্য নয় অসুখের জন্য নিষ্প্রভ। তার পাশে দামি গরম কোট গায়ে এক যুবক, মাথার রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে, চোখে চশমা, মুখে ব্রণের দাগ আর ভদ্র জীবনযাপনে ভদ্রমানুষের মুখে যে একটা মৃদু বা কমনীয়তার আবরণ পড়ে তার বদলে দুর্দান্ত বিশৃঙ্খল জীবনের ছাপ। তাকানিটাও স্পষ্ট আর উদ্ধত। রোগাটে গড়ন হলেও গায়ে বেশ জোর আছে মনে হয়—ভদ্রজীবন যাপনে যেমন হয় না শরীরটাও সে রকম শক্ত। বাঁ হাতে কাগজে মোড়া একটা বোতল ধরে আছে, মদের কিনা কে জানে ! ডান হাতটা কোটের পকেটে ঢোকানো। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখে বোতল ধরা বাঁ হাতের কব্জি দিয়ে রডটা চেপে ট্রামের দোল সামলাচ্ছে, খালি হাতে রডটা ধরেনি কেন অনুমান করতে যেন কষ্ট হবে শান্তার ! ক্রুদ্ধ হয়ে শান্তাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই যে সে হাতটা পকেটে ঢুকিয়েছে দোষ গোপন করার চেষ্টায়, বোকাও তা বুঝতে পারে।

ডান হাতে ছেলেটির বাঁ গালে শান্তা সজোরে চড় কষিয়ে দেয়। তার চশমাটা ছিটকে পড়ে, পরক্ষণে শোনা যায় কার পায়ের চাপে চশমার কাঁচ ভাঙার শব্দ।

বজ্জাত গুন্ডা কোথাকার ! শান্তা গর্জন করে বলে, তোমাদের জন্য মেয়েরা ট্রামে চলাফেরা করতে পারবে না ?

আরোহীদের দিকে সে মুখ ফেরায়।—ভিড়ে ঠেলাঠেলি হয়, কিছু মনে করি না। কিন্তু ইচ্ছে করে মেয়েদের গায়ে হাত দেবে, বজ্জাতি করবে, আপনারা তা সয়ে যাবেন চুপচাপ ?

খুব একচোট মারধোর চলে। হইচই হাঙ্গামার হদিস পেয়েই ড্রাইভার ট্রাম থামিয়ে দেয়। লোকটির হাত থেকে কাগজ মোড়া বোতলটা পড়ে ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে অ্যান্টিসেপটিক ওষুধের তীব্র গন্ধ। বাঁ হাত দিয়ে সে আঘাত ঠেকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, ডান হাতটি কোটের পকেট থেকে বার করে না। পাশ ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে পকেটে ভরা ডান হাতটা মেয়েদের প্রথম বেঞ্চ আর ট্রামের সাইডের কোণের দিকে আড়াল করে রেখে এক হাতে যতটুকু পারে ঠেকিয়ে মার খাবার ইচ্ছাটা তার অদ্ভুত মনে হয়। মুখে সে প্রতিবাদ করে যায় অবিরাম। নাক আর মুখ থেকে যখন রক্ত বার হতে থাকে তখনও। কাছে গিয়ে তাকে মারতে না পেরে একটি ছেলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হাতের লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথায় বসিয়ে দেয়, কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসে।

মারমুখো মানুষগুলিকে তখন শান্তাই থামিয়ে দেয়। আর মারতে সে বারণ করে সবাইকে, চেঁচিয়ে বলে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ছেড়ে দিন। কিন্তু কথা তার কানে তোলে না কেউ। লোকটাকে একবার মেয়েদের বেঞ্চের ওপর পড়ে যাবার উপক্রম করতে দেখে শান্তা জোর করে কয়েকজনকে ঠেলে দিয়ে তাকে খানিকটা আড়াল করে দাঁড়ায়। তখন মার বন্ধ হয়।

ট্রাম আবার চলতে আরম্ভ করে। দেখা যায়, মেয়েদের দুটি বেঞ্চিই খালি, হাঙ্গামার সূত্রপাতে চারজন ভদ্রমহিলাই ভয় পেয়ে নেমে গেছেন। চাদর গায়ে মাঝবয়সি সেই ভদ্রলোকটিকেও গাড়িতে দেখা যায় না। তার অন্তর্ধান অবশ্য কারও খেয়ালে আসে না। শান্তা বসে। অন্য বেঞ্চে বসে দুজন পুরুষ। অপরাধী লোকটি সেইখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে রুমাল বার করে মুখের রক্ত মুছতে থাকে, এদিক ওদিক থেকে তার কাছে ছিটকে আসে টিটকারি আর মন্তব্য। সামনের সিট থেকে অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়, শান্তাকেও দেখে নেয়। তিনটি বন্ধু, এক আপিসেরই কেরানি হবে তারা তিনজন, আড়চোখে শান্তার দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন বলাবলি আর হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে।

ট্রাম চলে। দু-চারজন নামে, দু-চারজন ওঠে। দাঁড়িয়ে যারা বসবার জন্য ওত পেতে ছিল তারা সুযোগ পাওয়া মাত্র ঠেলেঠুলে বসে পড়ে—হয়তো শুধু দু-তিন মিনিটের জন্যই, আপিস-ক্লান্ত দেহে একটু বসেই যেন টিকিটের দাম উশুল করে আর ন্যায্য অধিকার আদায় করে আনন্দ লাভ করতে

চায়। তারপর লোক নামে বেশি, ওঠে কম। গাড়িতে ভিড় কমতে কমতে শেষে বসবার লোকের অভাবে দু-চারটে সিট খালি পড়ে থাকে। একটা পার্ক পেরিয়ে যায়। মঠ এগিয়ে আসে। শান্তা উঠে ঘণ্টা বাজাতে হাত বাড়িয়ে অভাবনীয় আঘাত পেয়ে থ বনে যায়।

এত মার খেয়ে আর এত লজ্জা পেয়েও লোকটা এ গাড়ি থেকে প্রথম সুযোগেই নেমে পালিয়ে যায়নি। পিছনের লম্বা বেঞ্চের শেষ প্রান্তে বসে সে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। ডান হাতটা বার করেছে পকেট থেকে, হাতের কব্জি থেকে আঙুল পর্যন্ত মোটা ব্যান্ডেজে মোড়া। ওর বাঁ হাতে ওষুধের বোতল ছিল, হাতটা ছিল রডে ঠেকানো। ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতটা ছিল কোটের পকেটে। কী সর্বনাশ !

শান্তার হয়ে কন্ডাক্টর ঘণ্টা মারে। কলের পুতুলের মতো শান্তা নেমে যায়। মনে তার পড়ে যায় তারই সেজোমামার কথা, সাত-আটবছর যার কোনো খোঁজখবর সে রাখে না। ট্রামের সেই চাদর গায়ে বিষণ্ণ-গম্ভীর মাঝবয়সি ভদ্রলোকের মতো ছিল তার সেজোমামার বাইরের রূপ। ধীর স্থির ভদ্র, জীবনসংগ্রামে আহত শান্ত যোদ্ধার মতো। কিন্তু কী বিকৃত ছিল তার মন, কী বজ্জাত সে ছিল।

মাটির সঙ্গেই শান্তা মিশিয়ে যেত, যদি অবশ্য মার খাবার পর একগাড়ি লোকের সামনে নিজের নির্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করে মানুষটা শান্তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত। কেন সে তা করেনি শান্তা ভেবে পায় না। হয়তো খেয়াল হয়নি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। হয়তো ভেবেছিল, ওই অন্ধ উচ্ছ্বসিত উত্তেজনার সময় মানুষের সামনে যুক্তিতর্ক হাজির করা বৃথা। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা প্রমাণস্বরূপ সামনে ধরলে কেউ ধরে মুচড়ে দিতে পারে, এ ভয়টাও হয়তো ছিল। কারণ যাই থাক, ও রকম বিপদ ঘটেনি বলে, সকলের কাছে তাকে মরতে হয়নি বলে, লজ্জা আর অনুশোচনার সঙ্গে (মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার মতো না হোক লজ্জা তার খুব তীব্রই হয়েছে) পরিত্রাণের বেঁচে যাবার, স্বস্তিও সে অনুভব করে।

সব শুনে অনুপমা বলে, মাগো। কী গোঁয়ার মেয়েই তুই ছিলি ! আমি হলে—

গতকালও এ প্রশংসায় শান্তা গর্ব বোধ করত। তার কাণ্ড কল্পনা করেই অনুপমার মুখে মেয়েলিপনার সঞ্চার দেখে মনটা তার বিরক্তিতে ভরে যায়।

শোভা বলে, ছিছি ! ছেলেটার জন্যে এমন মায়া হচ্ছে ভাই !

মায়া ? তার কি মায়া হয়নি ? ভুল করেছে বুঝার আগেই তো মায়া হয়েছিল তার, সেই তো থামিয়ে দিয়েছিল সকলকে, নইলে আরও মার খেয়ে মরে যেত না লোকটা ? এরা তাকে মায়া করতে শেখাচ্ছে !

মাধবী বলে, ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল তোর, যখন জানতে পারলি ও বেচারার কোনো দোষ ছিল না।

ক্ষমা ? ক্ষমা কি চাওয়া যেত ? উচিত হত ক্ষমা চাওয়া ? আগেও সে ক্ষমা চাওয়ার কথা ভেবেছে, বাড়ি ফিরে আবার কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে। বন্ধুদের ব্যাপারটা বলে, ওদের সঙ্গে আলোচনা করে মনটা হালকা করার জন্য আপিসের কাপড় বদলেই অধীর আগ্রহে সে ছুটে গিয়েছিল ওদের কাছে। কিন্তু ওরা যেন আরও বিগড়ে দিয়েছে তার মনটা, তার ভুলটাকে তালগোল পাকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছে মস্ত বড়ো অমার্জনীয় অপরাধে। ভুল সে করেছে বিশ্রী, অতি শোচনীয় হয়েছে তার ভুলটা, তা কি সে অস্বীকার করছে ? তবু ভুল তো ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভুল যখন হয়ে গেছে, উপায় কী। ওদের কাছে না গিয়ে সুধীর বা অশোকের সঙ্গে আলোচনা করলে

ভালো হত। ওরা পুরুষ মানুষ, ব্যাপারটা ঠিকভাবে নিতে পারত ওরা, এমন করে তাকে দমিয়ে দিত না।

মাধবীর শখের চাকরি, অনু আর শোভা কিছুই করে না, দরকারও নেই। তার চাকরি প্রয়োজনের খাতিরে, বাপের আয়ে সংসার চলে না, ওরা তাকে মনে মনে অবজ্ঞা করে। মাধবীর চাকরি করায় আদর্শ, গর্ব গৌরব সব আছে, কিন্তু তার চাকরি করার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, দরকারের জন্য, অভাবের জন্য বাধ্য হয়ে চাকরি করাতে বাহাদুরি কি আছে কোনো মেয়ের ? মেয়েদের সম্মান রক্ষার রোখটাও তার নিছক গোয়ার্তুমি, পাগলামি।

কিন্তু ক্ষমা চাওয়া ? দোষ করে ক্ষমা চাইতে শান্তা কখনও দ্বিধা করেনি। এ ক্ষেত্রে কি সে নিয়ম খাটে ? অত কাণ্ডের পর অজানা অচেনা একটা মানুষকে কি বলা যেত আমায় ক্ষমা করুন, আমি ভুল করেছি ? সেটা কি ব্যঙ্গের মতো শোনাত না ? ন্যাকামির মতো ? তা ছাড়া, যে রকম রুক্ষ কঠোর উদ্ধত চেহারা ছেলেটার, মনের অবস্থাও যে রকম থাকা খুব স্বাভাবিক ছিল তার পক্ষে, ক্ষমা চাইলে রাগের মাথায় যদি কিছু বলে বসত, করে বসত ? বিনা দোষে অত মার খেয়ে, ও রকম লাঞ্ছনা আর অপমান পেয়ে, ক্ষমা চাইলেই সব ভুলে ক্ষমা করা কি কারও পক্ষে সম্ভব ?

রাত্রে ঘুমিয়ে শান্তা স্বপ্ন দেখে, হু হু করে ট্রাম চলেছে মাঠের মধ্যে, ট্রামের ভেতরে বাইরে অন্ধকার। মাধবী, অনু আর শোভা ছাড়া আর কেউ নেই গাড়িতে। তার সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা, নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। তাকে নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ট্রামের ঝাঁকুনিতে গড়িয়ে গড়িয়ে সে দরজার দিকে চলতে থাকে, চিৎকার করে ওদের ডাকতে গিয়ে গলায় আওয়াজ হয় না, সরতে সরতে দরজা দিয়ে গড়িয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে সে পড়ে যাবার উপক্রম করে। একটা উৎকট আতঙ্কে তার ঘুম ভেঙে যায়।

রাত্রে ভালো ঘুম না হওয়ার জন্য পরদিন হৃদয় মন একটু ভোঁতা থাকায় ঘটনাটা পিছিয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশি দূর অতীতে, গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। বাপ-মা ভাইবোনের টানাটানির সংসারের বাস্তবতা আজ তার বড়ো ভালো লাগে। আপিসে যেতে পথে সাথী পায় পছন্দসই পুরানো একজন চেনা মানুষকে, অনেকদিন যার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপিসে সময়টা কাটে ভালো। আপিসের একটি মেয়ে বলা মাত্র রাজি হয়ে তার সঙ্গে সিনেমা দেখে রাত করে বাড়ি ফেরে—বেশ ঘুম হয় রাত্রে।

এমনই সাধারণভাবে দিনগুলি তাব কেটে যেতে থাকলে ট্রামের ঘটনাটা অল্পদিনের মধ্যেই তার স্মৃতির যাদুঘরে চলে যেত, একটা বিশেষ স্থান পেত, এইমাত্র। কিন্তু পরদিন থেকে ঘটনাটির জের চলতে থাকে দিনের পর দিন—জের টেনে চলতে থাকে দেহ-মনে আহত ও লাঞ্ছিত অপর পক্ষ।

বিকালে আপিস থেকে বেরিয়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, যে ট্রামটা আসছে, তাতে লেডিজ সিট একটা খালি থাকবে কিনা ভাবছে, কোথ থেকে সে এসে দু-হাত তফাতে দাঁড়াল প্রতীক্ষারত কয়েকজনের মধ্যে, তার দিকে না তাকিয়ে। ডান হাতটি তেমনই ভাবে পকেটে ঢোকানো। মাথায় সরু এক ফালি বাড়তি ব্যান্ডেজ ! সেদিন ট্রামে মার খাবার চিহ্ন !

ট্রামে একটা লেডিজ সিট খালি ছিল, শান্তা উঠল না। দাঁড়াবার জায়গা ছিল, সেও উঠল না। পরের ট্রামে শান্তার সঙ্গে সেও উঠল, শান্তার পর আরও দুজন পুরুষ যাত্রীর পিছনে। একটি অ্যাংলো

মেয়ে নেমে যাওয়া পর্যন্ত শান্তা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, দু-তিনজন যাত্রীর ব্যবধান সে কমাবার চেষ্টা করল না, শান্তাকে আশ্চর্য ও খানিকটা নিশ্চিন্ত করে। প্রতি মুহূর্তে শান্তা অপেক্ষা করছিল সে তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াবে আর কোনো রকম একটা প্রতিশোধ নেবে সেদিনকার লাঞ্ছনার। এ রকম কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই যে লোকটি ট্রাম স্টপেজে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, শান্তার তাতে সন্দেহ ছিল না। ওর মতলবটা কী না জানা থাকায় অজানা আতঙ্কে তার বুকটা টিপটিপ করছিল। কিন্তু সে কিছুই করল না। গাড়ির ভিড় কমে গেলে সামনের সিটে বসা, ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটি বার করে জানালায় রাখা আর শান্তার পিছু পিছু ট্রাম থেকে নামাকে যদি কিছু না করা বলা যায়।

পিছু পিছু বাড়ি পর্যন্ত যাবে সন্দেহ নেই। এবার শান্তা ওর মতলবটা টের পায়। তার বাড়িটা চিনবার জন্য ও আজ তার সঙ্গে নিয়েছে। ট্রামে এত লোকের মধ্যে কিছু করা তো সম্ভব নয়, আজ বাড়ি চিনে রাখছে, সুযোগ সুবিধামতো একদিন শোধ নেবে। একটু এগিয়েই বাঁয়ে শান্তার বাড়ির রাস্তার মোড়। মোড় ঘুরবার সময় মুখ ফিরিয়ে সে দেখতে পায়, লোকটি তার পিছু নেয়নি, ট্রাম স্টপেজেই দাঁড়িয়ে আছে। ভয় ভাবনা অস্বস্তি নিয়ে শান্তা বাড়ি ঢোকে, সেদিন আর বাইরে যায় না। বাড়িতে কিছু বলবে কি বলবে না ঠিক করতে করতে আর বলা হয় না। বাড়ির লোক বড়ো হইচই করে সামান্য বিষয় নিয়ে।

পরদিন আপিস যাওয়ার সময় দেখা যায়, যুবকটি ট্রাম স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সে একা নয়, সঙ্গে একজন সমবয়সি যুবক, সুশ্রী চেহারা, পরিচ্ছন্ন বেশ, কাঁধে দামি শাল। আপিস টাইমে এখানেও ভিড় হয়, যদিও ডিপোটা হাতের কাছেই। শান্তার পিছনে ওরা ওঠে, শান্তার লেডিজ সিট পেরিয়ে সামনের দুটো বেঞ্চ পরে বসে। মাথা নিচু করে দুজনে তারা কথা বলে, ছেলেটির সঙ্গী মুখ ফিরিয়ে প্রায় বিস্ফারিত চোখে শান্তার দিকে তাকায়, আবার গভীর আগ্রহে তার কথা শোনে, আবার তাকায়। শান্তার সর্বাঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে বিছা আর আরশোলা।

ফিরবাব সময় সে একাই সঙ্গে আসে। পরদিনও সঙ্গে যায় এবং আসে একাই। পরদিন যাবার সময় লোকটির সঙ্গে থাকে সুন্দরী এক তরুণী। সামনের শেষ বেঞ্চে দুজনে বসে, তরুণী কথা শোনে লোকটির, কথা বলতে বলতে আঙুল দিয়ে লোকটি শান্তাকে দেখিয়ে দেয়—অকারণেই দেয়, কারণ গাড়িতে তখনও আব কোনো মেয়ে ওঠেনি—তরুণী বিস্ফারিত চোখে তাকায় শান্তার দিকে, লোকটির কথা শোনে, আবার তাকায়। একটা আর্তনাদ ঠেকে শান্তার গলায়, ঢোক গিলতে পারে না। মাথা ঝিমঝিম করে।

এমনই চলতে থাকে দিনের পর দিন। লোকটির মাথার ব্যান্ডেজ অদৃশ্য হয়, ডান হাতে ব্যান্ডেজের বদলে আসে পাতলা চামড়ার তেলতেলা দস্তানা। কখনও একা, কোনোদিন একজন, কোনোদিন দু-তিনজন সঙ্গী নিয়ে সে শান্তার সঙ্গে ট্রামে যাতায়াত করে। সঙ্গী থাকলে তারা গল্প শোনে আর শান্তাকে দেখে। ট্রামে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে তাকেও সে গল্প শোনায়, সেও তাকায়। বাদ যায় দু-একবেলা, দু-একদিন। শান্তার যে জ্বর ছাড়ে। তার আশা জাগে, এবার হয়তো লোকটির সাধ মিটেছে, বিরক্তি জেগেছে এই একঘেয়ে নিষ্ঠুর খেলায়, মন গিয়েছে নিজের কাজে, এবার সে রেহাই পেল। কিন্তু আশা তার টেঁকে না।

ট্রাম ছেড়ে শান্তা বাস ধরে—খানিক হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হয়। ঠিক দুদিন পরে বাসে তাকে দেখা যায়। আগে বোধ হয় সে বাসেই যাতায়াত করত, কারণ একা শান্তার সঙ্গে বাসে উঠলেও চার পাঁচজন পরিচিত লোককে সে শান্তাকে দেখিয়ে গল্প শোনায়।

ওর নামটা শান্তা জেনেছে—অমূল্য। ট্রামে পরিচিত লোক ওকে দেখে ডেকে বলেছে : আরে অমূল্য যে ! অনেক তফাত থেকেই হয়তো বলেছে কিন্তু খানিক পরেই অমূল্য ভিড় ঠেলে হাজির হয়েছে তার কাছে, কানে কানে বলেছে তার চিরন্তন কাহিনি।

কিছু বলার নেই, কিছু করার নেই। কোনো অভদ্রতাই সে করে না। তার চেনাশোনা লোক, যাদের সে শান্তার বাহাদুরির গল্প শোনায়, তারা ছাড়া ট্রামের অন্য কোনো আরোহী বোধ হয় টেরও পায় না কী ভয়ংকর ভাবেই সে উৎপীড়ন করছে গাড়ির একটি অসহায় মেয়েকে।

শান্তা প্রাণপণে চেষ্টা করে অমূল্যকে তুচ্ছ করতে, অগ্রাহ্য করতে। ধার করে ভালো শাড়ি পরে, প্রসাধনে বেশি মন দেয়, ট্রামে হয় বই পড়ায় ডুবে থাকার নয় নির্বিকার ভাবে বাইরে তাকানোর ভান করে। কিন্তু অমূল্যর আক্রমণ তো বাইরে নয়, একেবারে মনের ওপর ! এ আক্রমণের বিরুদ্ধে সে কেন আত্মরক্ষা করতে পারবে। তার নিজের ভুল, তার নিজের অন্যায়ের গুরুত্ব অমূল্য তার কাছেই দিনের পর দিন বাড়িয়ে দিতে থাকে।

এমন সৃষ্টিছাড়া রাগ আর প্রতিহিংসা সহজে জাগে কারও মধ্যে ? নিজের শত অসুবিধা তুচ্ছ করে এতকাল কেউ কি এমনভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে যেতে পারে সামান্য কারণে ? কত বড়ো ঘা খেলে মানুষের মন এ ভাবে বিগড়ে যায়, জীবন পণ করে এ ভাবে চালিয়ে যায় প্রতিশোধের সাধনা, ভাবলেও মাথা ঘুরে যায় শান্তার। একদিনের খেয়ালে, একদিনের গোয়ার্তুমিতে একটা মানুষকে সে খেপিয়ে দিয়েছে। এত বড়ো অপকাজকে ভুল বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন ? সব দোষ তার। অমূল্য যদি আজ প্রকাশ্যে তার গালে চড় কষিয়ে দিয়ে তার অমার্জনীয় অপরাধের কথা সকলকে শোনায়, মুখ বুজে তাকে সে শাস্তি মেনে নিতে হবে। প্রসাধন ভেদ করে শান্তার মুখের বিবর্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বারবার বইয়ের পাতা থেকে বা বাইরের রাজপথ থেকে তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি অমূল্যের দিকে গিয়ে পড়ে। মাথা তার ঝিমঝিম করে আসে।

সপ্তাহ পাঁচেক পরে একদিন তারা দুজন সামনে পিছনে জানালা ঘেঁষে বসে ট্রামে চলেছে, দ্বিতীয়বার ট্রাম থামতে উঠলেন ডাক্তারি কালো ব্যাগ হাতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আঁটা প্যান্ট ও ঢিলে কোট পরা। শান্তাকে পেরিয়ে যেতে গিয়ে থামলেন, পিছনের তিনজন অগ্রগামী যাত্রীকে ঠেকিয়ে রেখে।

আপিস যাচ্ছিস বুঝি ?

হ্যাঁ জ্যাঠামশাই। আপনি ট্রামে ?

পেট্রোল নেই। তোর জেঠিমা কাল সকাল থেকে দুটো পর্যন্ত কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর করে বেড়াল। কী করি, ট্রামে চেপেই রোগী দেখছি। তোর চেহারা এত খারাপ কেনরে ? অসুখ নাকি ?

না। এমনই।

পিছনের যাত্রীর তাগিদে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকই অমূল্যের পাশে বসেন।

বলেন, অমূল্য যে ! কী খবর ? কেমন আছ ?

শান্তার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ডাক্তার জ্যাঠামশাই অমূল্যর চেনা মানুষ ?

অমূল্য বলে, ভালোই আছি।

শান্তা পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এই মানুষটি চিরদিন তাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে এসেছেন। অমূল্যর কাছে তার বীভৎস আচরণের বর্ণনা শুনে না জানি কী মনে করবেন ! অমূল্যর কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার জ্যাঠামশায়ের মাথাটা তার দিকে ঝুঁকে গেলে শান্তার চোখ ফেটে জল আসে। ডাক্তার জ্যাঠামশায় মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালে সে দু-হাতে মুখ ঢেকে সামনের সিটের ওপর মুখ নামিয়ে রাখে।

সন্ধ্যার পর কেদার ডাক্তার তাদের বাড়ি আসেন, তেমনই আঁটো প্যান্ট আর ঢিলে কোট পরে। তিনি ব্যস্ত মানুষ, কদাচিৎ বাড়িতে তাঁর এ রকম অযাচিত পদার্পণ ঘটে। বাড়িতে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। শান্তা জানে ডাক্তার জ্যাঠা কেন এসেছেন, বাড়ির সবাইকে তার অপকর্মের কথা শোনাতে আর তাকে তিরস্কার করতে। শোবার ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। টেবিলের কোণ ধরে

দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার ভেতরটা কেমন উলটে পালটে পাক খেয়ে বেড়াতে থাকে। কেদার ডাক্তার ডাকতেই দরজা খুলে দেয়, কেদারের পায়ে তার হাত যেন আর্তনাদ করে ওঠে, আব কখ্‌খনো আমি এমন করব না ডাক্তার জ্যাঠা, কখ্‌খনো করব না।

কেদার বলেন, হুঁ। তা ও রকম কর না কর সেটা তোমার খুশি। আমি শুনতে এলাম, ও ছোঁড়াটা কী গুন্ডামি করছে। কী সব বলল ভালো বুঝতে পারলাম না।

পরদিন থেকে অমূল্য আর জ্বালাতন করে না শান্তাকে। তার জীবন থেকে সে একেবারে সরে যায় চিরদিনের জন্য। কয়েকদিন পরে স্বাক্ষবহীন একটা চিঠি পায় শান্তা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। ছেলেবেলা থেকে আমি একবোখা গোঁয়ার। কোনো রকম অন্যায় আমার সয় না। কিন্তু আপনার ভুলটা যে অন্যায নয়, এটা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। ট্রামে একজন আপনাকে অপমান কবেছিল সত্যই, আপনি ভুল করে ভেবেছিলেন আমিই সেই পাষণ্ড। আমি আগে বুঝিনি, এ রকম শত শত ভুল হওয়া ভালো, মেয়েরা যদি নিজেদের সম্মান বাঁচাতে আপনার মতো রুখে দাঁড়ান। আপনার কাজ ভুলই বা বলি কি করে। আমিও দোষী বইকী। গুন্ডারা মেয়েদের পথে-ঘাটে অপমান করছে জানি, তবু যদি আমি আমাব দু-একহাতের মধ্যে আমাব কোনো মা-বোনের লাঞ্ছনা জুটছে কিনা খেয়াল না বাখি, আমিও দোষী হব বইকী। আপনি ঠিকই করেছিলেন, আমিই ভুল কবেছি। মেয়েদের সম্মান রাখার দায়িত্ব আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

অনেক অসভ্যতা করেছি। ক্ষমা কববেন।—

শান্তাব উৎসুক চোখ ট্রামেব এদিক ওদিক অমূল্যকে খোঁজে আজও। দেখা হলে একবাব সে তাকে জানিয়ে দিত, মেয়েদেব মান মেয়েবাই বাখতে জানে। পথে-ঘাটে দু-দশটা রুগ্‌ণ বিকারগ্রস্ত ইয়ার্কি টিটকারি দিয়ে বা ভিড়েব মধ্যে থাবলা দিয়ে মেয়েদেব মান কেড়ে নিতে পারে না। মানটা মেয়েদের গায়েব গয়না নয়, শুধু গায়েই থাকে না।

কানাই তাঁতি

বিয়ের জন্য অনেক কষ্টে অনেকদিনের চেষ্টায় কানাই তাঁতি দু-কুড়ি তিনটাকা জমিয়েছিল। পিছনে ছিল বুড়ি মায়ের তাগিদ। রাঁধাবাড়া মাজাঘষা ঘরকন্নার অবসরে কাঁচাপাকা রুক্ষু জটবাঁধা চুলের অরণ্য থেকে উকুন বেছে বেছে নখে নখে পিষে টুক্‌টুক্ মারতে মারতে বুড়ি রোজ তাকে খুঁচিয়ে এসেছে বিয়ের জন্য টাকা জমাতে। জোয়ান ছেলে এমনি যদি টাকার মায়া নাও করে, বিয়ের জন্য সে টাকা জমায় উৎসাহের সঙ্গে, কষ্ট সয়, ধৈর্য ধরে। ছেলে বিয়ে করে বউ ঘরে আনলে সে আবাগির বেটি হয়তো উড়ে এসে জুড়ে বসবে ঘর-দোর, কানাই হয়তো তখন আর নজর দেবে না মায়ের দিকে, ফেলনা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে তাকে অনাদর অবহেলার অন্ন খেয়ে। তবু যত তাড়াতাড়ি পারে ছেলেটাকে বিয়ে করাতে বুড়ি পাগল। রাঁধতে বাড়তে বাসন মাজতে জল তুলতে মাড় জোগাতে আর সে পারে না। কোমর ভেঙে আসে তার। বড়োসড়ো বউ এসে রাজত্বি করুক তার সংসারে, তাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিক—হারু তাঁতির বউটা যেমন দেয় তার শাউড়িকে, ঘরকন্নার সব কাজ সে করবে, তাঁতের কাজের হাজার খুঁটিনাটি সাহায্য যা দরকার হয় তাঁত সাজিয়ে বোনা আরম্ভ করা পর্যন্ত কানাইয়ের, সে সব সাহায্যও করবে। বড়োসড়ো বউ আনতে টাকা লাগে বেশি। কানাই টাকা জমাক। প্রাণপণে টাকা জমাক।

গোবরার মেয়েটা, উই যে ফুলি গো, এক কুড়িতে নাকি গোবরা রাজি আছে শুনলাম, যে দেয় সে দেয়।

রামো ! থুঃ ! বুড়ি নাক সিটকায়, বয়সডা কি মেয়ার ? কাইল না ন্যাংটা হইয়া ঘুরছে ? বিয়া কইরা থুবি, চার-পাঁচসন ঘর করব না। কাম কি অমন বউ দিয়া ? কচি বউ তাগো পোষায়, ঘরে যাগো দুইটা একটা জুয়ান মাইয়ালোক·আছে। তর নি এই বুড়া মাডা সম্বল, এক বেলা রাঁইধা না দিলে খাওন জোটে না। নারে সোনা নারে মানিক, ওই কাম কইরো না। ডাগর বউ আনবা।

ডাগর বউ দরকার কানাইয়ের, বড়োসড়ো সমর্থ বউ, যে খাটতে পারবে, বুড়িকে রেহাই দেবে।

বুড়ি উকুন বাছে, উকুন মারে। বলে, গেঁয়াতি ভোজ দিয়া কণ্ঠিবদল কর না ক্যান মাতির লগে ? যা করুক তা করুক, মাইয়াডা ভালো, খাটুইনা মাইয়া।

তিনকুড়ি টাকা চায় মাতির বাপ। কানাই বলে ঝাঁঝের সঙ্গে, আপশোশের সঙ্গে। তাব রাগ দেখে বুড়ি মা ভাবে, ব্যাপারখানা কী ? একটা মেয়ের বাপ বেশি টাকা পণ চায় বলে এত বেশি গোসা করে তার ছেলে, এর মধ্যে কিছু আছে গোলমাল। সে কথা তোলে না বুড়ি, মুখে শুধু বলে, মরে না বুড়া, অপঘাতে মরে না ?

দু-কুড়ি তিনটাকা, কতদিনে তিনকুড়ি করতে পারবে জানে না কানাই। সবগুলি রূপার টাকা, টুং টুং মধুর আওয়াজ দেয়। মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায় সে আওয়াজে। বউ-কেনা টাকা, একলা একলা খেটে খেটে মরে যাওয়ার বিচ্ছিরি লাগা দিনগুলি শেষ করার টাকা। খাড়ুর লম্বা থলিতে ভরে এক আনায় কেনা টিনের কৌটাটার মধ্যে রেখে বিছানার নীচে মাটির গর্তে লুকিয়ে রাখা রূপার রূপ ধরা অনেকদিনের তপস্যা। মাতিকে পেতে হলে তার কতগুলি টাকা দরকার ? পুরো এক কুড়িও নয়। তিন কম এককুড়ি। কিন্তু আরও কতকাল না জানি কেটে যাবে তার ও টাকাটা জমাতে। তাতেও কি হবে শেষ পর্যন্ত ? জ্ঞাতিভোজের টাকা চাই, এটা ওটা কেনাকাটায় টাকা চাই আরও

কয়েকটা। ততদিন কি আর তার জন্য বসে থাকবে মাতি ? রসিক কি মেয়েকে ধরে রাখবে কবে সে কণ্ঠিবদলের জোগাড় করে উঠতে পারবে সেই ভরসায় ? একটানা একটা ভয় বুকে পুষে রেখেছে কানাই, কে জানে কবে কে ছিনিয়ে নিয়ে যায় মাতিকে, রসিককে তিন কুড়ি টাকা দিয়ে, জ্ঞাতিভোজন করিয়ে, কণ্ঠিবদল করে। বোঁচাকেই তার ভয় বেশি। বজ্জাত বোঁচা। তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে পয়সা রোজগারের চেষ্টায় শহরে দাঁও মেরে এসে এবার তার মাতিকে দাঁও মারবার চেষ্টায় আছে। তাঁত বুনে কানাইয়ের সঙ্গে তো পাল্লা দিতে পারবে না, শহর থেকে চুরি-চামারি করে পয়সা এনেছে।

শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ আকাশে ভেসে যায় অজানা দেশের দিকে, খটাখট তাঁত চালিয়ে যায় কানাই, ছুটোছুটি করে এধার থেকে ওধারে, সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটেছে এই স্নিগ্ধ শীতল মধুর বিকালে। পড়তা রাখতেই প্রাণান্ত। আট মাসে আর একটা টাকাও জমা হয়নি কানাইয়ের টিনের কৌটায় খাড়ুর থলির দু-কুড়ি তিন টাকার ভান্ডারে। দিনের আলো যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাঁত চালাতে পারবে কানাই। তারপর সব অন্ধকার। দীপটি জ্বালা বেআইনি, বলে গেছে কেষ্ট চৌকিদার। সারাদিন উর্ধ্বশ্বাসে খেটে কে আর তাঁত চালায় সন্ধ্যার পর ? ক্ষমতায় কুলোবে কার ? তবু আপশোশ জাগে কানাইয়ের মনে। খুশি যদি হয় তার সে কেন পারবে না আলো জ্বেলে রাতে তাঁত চালাতে, মুখে রক্ত যদি ওঠে, তবু ?

কাঁসার এক আফফোরা হাতে নিয়ে আসে মাতি।

বাবা কইল্যা, বাঁধা বাইখা তিনডা টাকা দিবা ?

পোয়া মাপা আফফোরা, এক টাকা কি বড়ো জোর পাঁচসিকের বেশি দাম হবে না।

কাপড়টা ছেঁড়া মাতির, মিলের মোটা কাপড়। তাঁতির মেয়ের গায়ে মিলের কাপড় ! কোমরের বাঁক স্পষ্ট, বুকের ভাঁজ উদলা। তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

তিন টাকা দেওন যায় না।

ক্যান ? অন্যে তো দিচ্ছে।

বোঁচা বুঝি দেয় ? এক টাকা পাঁচসিকের আফফোরা বাঁধা রেখে তিনটা টাকা আনতে মেয়েকে পাঠিয়েছে রসিক তার কাছে, যে মেয়ের জন্য সে জমাচ্ছে তিনকুড়ি টাকা, যদ্দিন চন্দ্রসূর্য উঠছে তদ্দিন।

দেয়। শহরে গেছে না ?

শহরে গিয়া আন গা, আমি দিমু না। কই পামু টাকা ? আমি নি মহাজন ?

দিবা। তুমিই দিবা। মাতি বলে মুখ উঁচু করে তাঁতঘরের ফুটো চালার দিকে চেয়ে। অনেকগুলি ফুটো দিয়ে আলো আসছিল পড়ন্ত সূর্যের।

তাঁত থেকে উঠে আসে কানাই। মাতির হাত ধরে।

বিয়া করবা ? কও বিয়া করবা ? তাঁতঘরের নির্জনতায় মাতি যেন নাগিনির মতো ফুঁসে ফুঁসে কাঁদে।

বিয়া করুম। তরেই আমি বিয়া করুম মাতি। কানাই বলে বেপরোয়া হয়ে। মাতির বাপকেই যে করকরে নগদ তিনকুড়ি টাকা দিতে হবে, তার মধ্যে মোটে দুকুড়ি তিনটাকা তার সম্বল, এ সব কথা সে ভুলে যায়।

পরদিন মাতি আবার আসে দুপুরবেলা, ঘর্মাক্ত কলেবরে কানাই যখন তাঁত চালাচ্ছে। বুড়ির সঙ্গে আগে সে কথা বলে সুখ-দুঃখের—সে যেন এ বাড়িরই একজন সে আপন মানুষ এমনি ভাবে। তাঁতঘরে কাল অযথা অনেকক্ষণ ছিল বুড়ির ছেলের সঙ্গে—বুড়ি তা জানে বইকী, নিশ্চয় জানে। জানবে না কেন, জানুক। এতে তো আর ফাঁকি কিছু নেই, চালবাজি নেই। যা সত্য, যা যথার্থ,—

আজ নয় কাল নয় শুধু, যা জীবনের আগামী বছরগুলির জন্য নিশ্চয় বলে মানা হয়েছে মরণ পর্যন্ত তা নিয়ে দাবাচালি কাণ্ড করুক বুদ্ধির দাস ভদ্দরলোকেরা, সে বাবা অতশত প্যাঁচের ধার ধারে না। তার দরকার কী। আপন যাদের মানা হল তারা আপন।

গলায় দড়ি দিছে যদুর বউডা।

সইবার পারল না করব কি কও ?

সইবার পারল না ক্যান ? জুয়ান মাগি তো, নাকি ব্যারামে বুড়াইছে ? মরন য্যান সস্তা, গলায় দড়ি দিছে। ভদ্দরঘরের মাইয়া যেন হারামজাদি, ভদ্দরঘরের বউ। বাঁইচা থাইকা প্রাণভয়ে বাঁচনের লাইগা মরনে দোষ তা কী ? মরণ মরণই না আর কিছু। না মইরা বাঁচে কেডা ? মরুম যদি মরণ যখন তখন মরুম, বাঁচুম যখন ক্যান মরুম, গলায় দড়ি দিয়া, নিজেরে খুন কইরা ? জুয়ান মাইয়া, পুরুষকে যৈবন দিয়া নয় বাঁচত !

রামো রামো, থুঃ। বুড়ি শিউরে ওঠে।

ক্যান ? ফুঁসে ওঠে মাতি, ভাবী শাশুড়ির অবজ্ঞায়, য্যামনে পারি বাঁচনটা তুচ্ছ না ? কষ্ট পাইলাম, গলায় দড়ি দিলাম, সেইডা ভালো না ?

রগে রগে টান লাগে বুড়ির, গা অস্থির অস্থির করে। কথাটার এ দিকটা সে এড়িয়ে যেতে চায়, একেবারে নতুন কথা বলে,—কিন্তু তার নতুন কথাতেও বাজে সেই পুরানো একটানা বাঁচন-মরণের সমস্যা। বুড়ি বলে, আমি কই কী, ভাতারে ভাত দিব। ভাতারের যদি মরণ নিয্যস বউরে ভাত দিবার লাইগা, বউ কইব ভাত চাই না। গলায় দড়ি দিব বউ।

না গলায় দড়ি দিব না। ক্যান দিব ? বউরে ভাত দিবার লাইগা মরণ নিয্যস করল যে ভাতার, তারে বাঁচানের লাইগা বউ বাঁইচা থাকব। ভাত আইনা বাঁচাইব ভাতাররে।

রাগে বুড়ির দম আটকে আসে। বেহুলা সোয়ামিরে বাঁচিয়েছিল সাপের বিষ থেকে, দু দণ্ড একটু ঝাড়ফুঁক করে, সামান্য একটা পেশাদার ওস্তাদ যা পারে। বিযার যুগ্যি এই জুয়ান মাগি বিযার আগে কয় যে না খেয়ে উপোস দিয়ে ভাতারকে বউ মারতে দেবে না, নিজেও মরবে না। খুশি যেন নিজের !

তিনকুড়ি ট্যাহা দিয়া তবে না বেচবো তরে বাপ ? যারে পায় তারে ?

বেচবো। যারে পায় তারে না। আমি যারে চাই তারে। বেচবো, নিশ্চয় বেচবো। খাওয়াইছে, পরাইছে, বড়ো করছে—

তাঁত ফেলে উঠে এসে কিছুক্ষণ থেকে কানাই দুজনের ঝগড়া শুনছিল অবাক হয়ে, এবার সে কথা বলে।

কাক চিল তাড়াইছ দুজনায়। অখন থামবা ?

যাবার আগে তাঁতঘরে মাতি কানাইকে জিজ্ঞেস করে, বিয়ের জন্যই মোট কত টাকা সে জমিয়েছে। সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞেস করে, তার যেন জানবার অধিকারও আছে, প্রয়োজন আছে। কানাইয়ের জবাব শুনে সে খুশি হয়ে ওঠে।

দুকুড়ি তিন টাকা ! কও কী ?

মুখখানা তার হাসিতে ভরে যায়।

কথাটা শুধিয়েই যাবে ভেবেছিল মাতি, এবার উবু হয়ে বসে হিসাব-নিকাশ পরামর্শ করে কানাইয়ের সঙ্গে যে আর কতদিনে তা হলে কীসে কী হওয়া সম্ভব ! কানাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে যেন কথার উচ্চারণে চালিয়ে যায় নিজের মনের জল্পনাকল্পনা।—বেশি দিন লাগবো না। লড়াই বাঁধছে, কাপড়ের দাম চড়তেছে।

সুতার দামও চড়তেছে।

মাতি কী যেন ভাবে খানিকক্ষণ আপন মনে। তারপর জোর দিয়ে বলে, এক কাম কর। ফেইলা রাইখো না টাহাটা, সুতা কিন্যা থোও।

জমান টাকায় সুতা কিনা থুমু ? কানাই বলে আশ্চর্য হয়ে।

হ সুতা কেনো। সুতার দব বাড়বো, কাপড়ের দরও চড়বো। কাপড় বুইনা বেশি দামে বেচবো। হাতের টাকা খাটিয়ে মূলধন বাড়াবার এই মূল নীতি আঁচ কবে ফেলে বেশ যেন গর্ব বোধ করে মাতি।

দর যদি পইড়া যায় ? কানাই বলে দুর্ভাবনায় ভুরু কুঁচকে।

তা বটে, একটা ভাবনার কথা। দর বাড়তে পারলে, কমতেও পারে বইকী। সুতো কেনে, তাঁত বোনে, কাপড় বেচে, সুতো কেনার পয়সা রেখে বাড়তি পয়সা খায়, পারলে খাড়ুর থলির জমানো টাকা আর একটা বাড়াবার চেষ্টা করে, তাঁতির কী মাথা আছে না সাহস আছে গায়ের রক্ত জল-কবা সর্বস্ব পণ করে উঠতি পড়তি বাজার দর নিয়ে খেলা করার ! কথাটা কিন্তু ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় কানাইয়ের মাথায়, এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না মাতিব প্রস্তাবটা। যে ভাবে চলছে এ ভাবে চললে কতদিনে পুরো টাকাটা তার জমবে, বুক বেঁধে মাতির পরামর্শ মতো যদি লাগিয়েই দেয় টাকাগুলো যা থাকে কপালে, কিছুদিনেব মধ্যেই হয়তো স্বপ্ন তার সফল হবে। থলি খুলে টাকাগুলি যে সস্নেহে নাড়াচাড়া করে, তার বুক কেঁপে যায়। একদিন সে পরামর্শ চাইতে যায় বুড়ো রঘু তাঁতির। তার মতলব শুনেই বঘুব চোখ কপালে উঠে যায়।

ভূত চা-[illegible] [illegible], না ? অমন কাম করিস না, খপর্দার।

শিবু তার সাঙাত। সে কিন্তু মাথা চুলকে বলে, মন্দডা কী ? দেখলে পাবস।

ভাবতে ভাবতে মহিমগঞ্জের দুটো হাট চলে যায়। সুতোব দাম বাড়ে—অনেক বাড়ে। হাটে সুতো আসে কম অনেক কম। পবেব হাটবারে কানাই এক কুড়ি টাকা নিয়ে হাটে যায়। ভেবে-চিন্তে সে ঠিক করেছে, সব টাকাটা না লাগিয়ে কুড়ি টাকা লাগাবে অদৃষ্ট পরীক্ষায়। টাকাগুলি নিয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়, সুতো কেনার টাকা আর বোনা কাপড়খানা বেচবার টাকা নিয়ে। হাটে পৌঁছতে তার কিছু দেরি হয়েছিল। সামান্য যে সুতো এসেছিল হাটে সে পৌঁছবার আগেই তা বিক্রি হয়ে গেছে চড়া দামে। তবে কাপড়খানাব দাম সে পেয়েছে আশাতীত। অদ্ভুতরকম বেড়ে গেছে কাপড়ের দাম, তিনকড়ি সা ঠিক দর দেয়নি তাকে, তবু একখানা কাপড় বেচে যে দেড় [illegible] টাকা লাভ থাকে সে কি ভাবতে পেরেছিল কোনোদিন ? আগেই সব টাকার সুতো না কেনার জন্য আপশোশ করতে করতে সে বাড়ি ফিরল।

পরেব হাটে গেল শেষ কড়িটি আর শিবুকে সঙ্গে নিয়ে। যোগজীবন হাটে সুতো এনেছে কিছু কিন্তু তার দর অসম্ভব। সুতো মিলছে না, সামনের হাটে আরও চড়ে যাবে দব—হয়তো মিলবেই না।

মিলবে না ? হতভম্ব হয়ে যায় কানাই আর শিবু।

তারপর বাস্তব হল যা ছিল ভয়ার্ত রাত্রের দম আটকানো বীভৎস দুঃস্বপ্ন। এত দুঃখের জীবনেও স্বপ্ন ছিল কানাইয়ের, পেট খিদেয় মোচড় দিতে থাকলে পান্তার মধুর গন্ধে জাগা স্বপ্ন, হৃদয় টনটন করতে থাকলে সঞ্চিত টাকার স্পর্শে জাগা আগামী কোনো একদিন মাতিকে ঘরে আনার স্বপ্ন। সব স্বপ্ন গুঁড়ো হয়ে গেল কাঁচের মতো মহাকালের বুট-পরা পায়ের চাপে, মৃত্যু ঘনিয়ে এল দুর্ভিক্ষের রূপে চাষি তাঁতি কামার কুমার তেলি জেলের ঘরে। সব বেচে দিল অসহায় মানুষ বাঁচাবার চেষ্টায়, ঘটি-বাটি হাল-বলদ ভিটে-মাটি, হাঁপর, হাতুড়ি, তাঁত- মেয়ে-বউ পর্যন্ত। তবু ঠেকানো গেল না মৃত্যুকে। গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ মরল দলে দলে, বাঁচবার চেষ্টায় দলে দলে দিশেহারা মানুষ পালিয়ে গেল গাঁ ছেড়ে।

দাওয়ায় বসে ঝিমোয় কানাই। তাঁত না চালিয়ে বাত ধরে গেছে খিদেয় অবসন্ন ক্ষীণ শরীরে। কেবল ভাবছে, বিছানার নীচে মাটির গর্তে লুকানো টিনের কৌটায় খাড়ুর থলিতে রাখা টাকাগুলির কথা। সব গেছে কানাইয়ের, তাঁতটাও সে বাঁধা দিয়েছে, কিন্তু এ টাকায় হাত দেয়নি। শুধু ওই বুড়ি মা আর তার দুটো পেট বলেই এতদিন চলছে এ ভাবে, এখন আর উপায় নেই। তাঁতটা একেবারে বেচে দিলে আরও কিছুদিন চলবে। তাই ভাবছে কানাই। তাঁতটা বেচে দেবে।

বুড়ি শাপছে তাকে, অবিরাম শাপছে : অখনো বিয়ার শখ, পিরিতের নেশা ! মায়েরে মাইরা নিজে মইরা নরকে গিয়া বিয়া করবি, পিরিত করবি ?

মাথা ঝিম করে কানাইয়ের।—বিয়া ! পিরিত !

জগৎ সংসারে যেন বিয়ে পিরিত এ সব আছে, এখনও ও সব ভাববার যেন তার আছে ক্ষমতা আর অবসর ! মা কি বুঝবে ওই টাকাগুলিই তার টিকে থাকবার, বেঁচে যাবার শেষ ভরসা। কী কাণ্ড ঘটছে চারিদিকে চোখ মেলে কান পেতে সে তো দেখছে শুনছে সব। প্রতিদিন সে প্রত্যাশা করছে, একটা কিছু কি ঘটবে না, হঠাৎ কি বদলে যাবে না চারিদিকের অবস্থা ? ওই টাকা সম্বল করে বাঁচতে হবে তখন তার। আজ যদি টাকাগুলি সে খরচ করে দেয় এখনকার উপোসে কাবু হয়ে, শাকপাতা কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা না করে, কাল যদি খাবাপ দিন শেষ হয়ে সুদিন আসে, তবু সে তখন তলিয়ে যাবে। দুঃখের রাতে মরে না মানুষ, মরে দুঃখের রাতে সুখ চেয়ে সব খুইয়ে সুখের দিনে বাঁচবার উপায় না পেয়ে।

সর্বাঙ্গে একটা আড়ষ্টতার কষ্ট। পেটে ভোঁতা একটা যন্ত্রণা। মাথার মধ্যে পোকা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে মগজটা। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ভাবে কানাই। ভালো দিন আসবার আগেই যদি সে মরে যায় ? না, মরবে না। তাঁতটা বেচবে।

কোনোমতে টিকিয়ে রাখবে নিজেকে।

মাতি আসে সন্ধ্যাবেলা।

কয়টা টাকা দিবা ?

কই পামু ?

সেই টাকার থেইকা দেও। পায় ধরি তোমার। আমারে বিযা করনের টাকা, কয়ডা দেও, দুই গন্ডা দেও। না ত বিয়া করো আমারে। এই দণ্ডে বিয়া করো। বিয়ার টাকায় বিয়া করো। বাপটা মরুক। মাইয়ারে উপাস দিয়া রাখে, কীসের বাপ।

সেই টাকা কই ? ভাইঙ্গা খাইছি সব !

ভাইঙ্গা খাইছ ? অনাহারে ক্ষীণ দুর্বল মাতির ঝিমানো ভোঁতা গলা শান দেওয়া তীক্ষ্ণতায় ঝন ঝন করে বেজে ওঠে, আমারে বিয়া করনের টাকা ভাইঙ্গা খাইছ ? তুমি চোর ! আমারে না দিয়া খাইছ ? তুমি ডাকাইত।...

আর্তনাদ করার মতো মাতি গাল দিয়ে শাপ দিয়ে চিরে দিতে থাকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অন্ধকার।

চোরাই

ভোরে ধরা পড়ল, রাত্রে কোনো এক সময়ে রান্নাঘরে চুরি হয়ে গেছে।

ধরা পড়ল পঙ্কজিনীর কাছে। রোজ শেষ রাত্রে তার ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুম আসে না। সে ঘুমকাতুরে, প্রথম রাত্রে, দশটা বাজতে হাই উঠতে আরম্ভ হয়, চোখ জড়িয়ে আসে। কেদারের কিন্তু প্রথম রাত্রে দারুণ অনিদ্রা, বারোটা-একটার আগে ঘুমের জন্য শোয়ার কোনো বালাই নেই তার কাছে, শুয়ে শুয়ে শুধু ছটফট করা আর পঙ্কজিনীকে জাগিয়ে জাগিয়ে রাগিয়ে দেওয়া। তবে ঘুম কেদার পুষিয়ে নেয়, বেলা নটা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে। শেষ রাত্রে এ পাশ ও পাশ করতে পঙ্কজিনী তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে সে ভীষণ রেগে যায়, পাশ ফিরে তৎক্ষণাৎ আবার ঘুমিয়ে পড়ে রাগের মধ্যেই। পঙ্কজিনীর তাই জাগলে আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না, খুব ভোরে ঝি এসে কড়া নাড়লেই উঠে পড়ে। ঝিকে দরজা খুলে দেবার জন্য অবশ্য তার বিছানা ছেড়ে উঠে নীচে যাবার কোনো দরকার নেই। নীচে বৈঠকখানায় শোয় সতীশ, পাশের ঘরে রাজেন শোয় তার নতুন বউ নিয়ে, রান্নাঘরের লাগাও ছোটো খুপচি কুঠরিটাতে শোয় বিশ্বম্ভর ঠাকুর। ওরা যে-কেউ দরজা খুলে দিতে পারে। পঙ্কজিনী ওঠে নিজের গরজেই। আর ওঠে বলে রান্নাঘরের তালার চাবিটাও রাখে নিজের কাছে। রান্নাঘরের তালা খুলে দাঁত মাজার জন্য উনানের তল থেকে ঘুঁটের ছাই নেয়।

সেদিন তালা খুলতে গিয়ে দ্যাখে, শিকলটার গোড়া উপড়ানো। যা কিছু ছিল ঘরে সব চুরি হয়ে গেছে।

বিশেষ কিছু ছিল না রান্নাঘরে, দামি জিনিস একটিও নয়। বাসনপত্র সব রাত্রে রাজেনদের ঘরে জমা থাকে। রান্নাঘরের দরজাটা কমজোরি, টেপা তালাটা বাজে। একান্ত অবহেলার সঙ্গে রান্নাঘরে শুধু ফেলে রাখা হয় দৈনিক ব্যবহারের তেলের পাত্র, চিনির বৈয়ম, ডালের হাঁড়ি, মশলাপাতির ছোটো ছোটো টিন, তরকারির টুকরি, হাতাটা খুন্তিটা ফুটো অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা, টুকিটাকি জিনিস। হাতা খুন্তি ফুটো বাটি বাদে চোর সব ঝেড়ে পুঁছে নিয়ে গেছে। কোণে পিঁড়িটার ওপর পোয়াটাক পেঁয়াজ রাখা হয়েছিল, তাও বাদ দেয়নি। অথচ আশ্চর্য এই, একটা সত্যিকারের দামি জিনিস ফেলে গেছে। কাল বেড়াতে এসেছিল কয়েকজন, আলমারি থেকে বার করা হয়েছিল দামি চায়ের সেটটা, ভুলে সেটা রান্নাঘরেই থেকে গিয়েছিল। চিনি রাখা সস্তা ফাটল ধরা বৈয়মটা চোর নিয়ে গেছে কিন্তু চায়ের সেটটা স্পর্শ করেনি !

দামি কিছু না যাক, দরজা ভেঙে চুরি হয়েছে বাড়িতে। কেদারের ঘুম ভাঙাবার এ রকম আইন সঙ্গত সুযোগ ছাড়া যায় না।

সবাইকে ডেকে তোল তো দুগগা।

ঝিকে এই নির্দেশ দিয়ে পঙ্কজিনী তরতর করে ওপরে উঠে যায় কেদারকে উঠতে হয় বিছানা ছেড়ে কিন্তু বড়োই সে অসুখী ও অসন্তুষ্ট হয়। চোর এলে, চুরি চলতে থাকলে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে তুললে তার একটা মানে ছিল, চুরি যখন হয়েই গেছে, খবরটা দু-ঘণ্টা পরে তাকে জানালে কী আসত যেত কার !

কেদার হাই তোলে, তার শীর্ণ মুখে এঁটে থাকে স্নায়বিক পেটের গোলমালের তেলচিটে ক্লেদাক্ত ছাপ, চোখে চেতনা হারিয়ে গাঢ় স্বস্তিতে তলিয়ে থাকার মরাটে কামনা।

আমায় কেউ চুরি করে নিয়ে গেলে তুমি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবে, বলে পঙ্কজিনী ঝঙ্কার দেয়।

পেটটা ব্যথা করে উঠেছিল শোয়ার আগে, কত ডাকলাম, উঠেছিলে ? কেদার জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে সতীশ উঠেছে, রাজেন আর তার নতুন বউও উঠেছে। চুরির বৈশিষ্ট্য বিচার করে সতীশ আর রাজেন চোরের জাত নির্ণয় করছে—ছ্যাঁচড়া চোর নিশ্চয়। সেটা যেন প্রত্যক্ষ নয়, মাথা ঘামিয়ে আবিষ্কার করা দরকার ছিল। দুগগা চেঁচিয়ে চলেছে, এ কী কাণ্ড রে বাবা, আঁ ! নতুন বউ থেকে থেকে আহ্লাদি ভয়ের সুরে আবৃত্তি করছে, চোর এসেছিল, মাগো ! কেদার নেমে এলে সে ঘোমটা একটু টেনে দেয়, গলা নামিয়ে নেয় ফিসফিসানিতে, অবশ্য তা কানে যায় সকলেরই।

সবাই উঠেছে, শুধু দেখা নেই বিশ্বম্ভর ঠাকুরের। ঘুপচি ঘরের মধ্যে সে ঘুমিয়েই চলেছে নিশ্চিন্ত মনে, ঠিক কেদারের মতো নাক ডাকিয়ে মৃদু সরু সুরে ! রোজ সকালে তাকে ডেকে তুলতে হয় এমনই সে নবাব, কিন্তু সেটা পঙ্কজিনী মেনে নিয়েছে, নিরুপায় হয়ে, বাধ্য হয়ে। কিছু বলতে গেলেই ঠাকুর চাকর আবার গটগট করে বেরিয়ে যায়, যা দিনকাল পড়েছে। ঠাকুরেব পর্যন্ত মন জুগিয়ে চলতে হবে বাড়ির গিন্নির। আজ কিন্তু বড়ো রাগ হয়ে গেল পঙ্কজিনীর। ঘরেব সামনে বাড়িসুদ্ধ লোক হইচই করছে তবু বাবুর ঘুম ভাঙে না ! দরজাটা যেন ভেঙে ফেলবে এমনিভাবে ধাক্কা দিতে দিতে সে ডাক, ঠাকুর ! এই ঠাকুর ! বাড়িতে চুরি হয়ে গেল, কুম্ভকর্ণের মতো তুমি ঘুমোচ্ছ !

বিশ্বম্ভর উঠে আসে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে। মুখে তার রাত জাগার স্পষ্ট ছাপ।

চুরি হইছি ? তেমন আশ্চর্য হয় না বিশ্বম্ভর, একটু যেন থতোমতো খেয়ে যায়। রান্নাঘরটা দেখতে যায়, কিন্তু সে রকম ব্যগ্রভাবে যেন নয়। কেদারের মতোই ভাব যেন তার খানিকটা, চুরি যখন হয়েই গেছে, উপায় কী !

তোমার কী হয়েছে ঠাকুর ?

জ্বরভাব হইছি। মোটে ঘুম হয়নি রাতে।

ঘুম হয়নি ? ঘুম হয়নি তো পাশের ঘরে সব চুরি হয়ে গেল টের পেলে না ? শিকল ভাঙাব আওয়াজ শুনলে না ?

মু কিছু শুনিনি তো ?

একটু কেমন ভাব বিশ্বম্ভরের। কী ভাববে কেউ ভেবে পায না। এ চুরির জন্য তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। পুরানো বিশ্বাসী লোক, চুরি ছ্যাচড়ামির স্বভাব নেই, ভালো রাঁধে, পরিষ্কাব পবিচ্ছন্ন থাকে, উড়িয়া, বাংলা বই পর্যন্ত পড়তে পারে কিছু কিছু। তাছাড়া, এত কিছু চুবি করার সুযোগ থাকতে গুড় তেল মশলা ডাল তরকারি এ সব সে চুরি করতেই বা যাবে কেন ! এ বাড়িতে থাকে খায়, নিজের লোকও কেউ এখানে নেই তার যে চুরি করে ও সব তাদের দেবে। জ্বরভাব হয়েছে, হয়তো ঘুমিয়েছিল চুরির সময়টা। আর চাড় দিয়ে রান্নাঘরের ঢিলে শিকলের গোড়াটা তুলতে কতটুকুই বা শব্দ হয়েছিল !

কিন্তু চোর এল, গেল কোথা দিয়ে ? পাশের গলির দিকের খিড়কির দরজাটা বন্ধই ছিল, পঙ্কজিনী নিজে দুগগা ঝিকে খিল খুলে দিয়েছে। ও ছাড়া আর তো পথ নেই বাড়িতে ঢুকবার। বাইরের ফাঁক দিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে চোরের পক্ষে খিলটা খোলা সম্ভব, কিন্তু তারপর ভেতর থেকে খিলটা আবার লাগালো কে !

এ যেন রীতিমতো গোয়েন্দা কাহিনির ধাঁধা !

নতুন বউ জোর গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, দিদি পাশের বাড়ির ওই ধুমসো চেহারার চাকরটা ছাত দিয়ে—

তুমি থামো ভাই, পঙ্কজিনী বলে, মুখ বাঁকিয়ে, ছাতের সিঁড়ির দরজা আমি নিজে বন্ধ করেছি।

নতুন বউ তবু থামে না, বলে আলসেতে দড়ির সিঁড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে আসতে পারে তো ? ভীষণ সিরিজের একটা বইয়ে পড়েছিলাম—

পঙ্কজিনী কান দেয় না। বিশ্বম্ভর ঘরে ঢুকে শোয়ার আয়োজন করছে।

তুমি যে শুলে ঠাকুর ?

মু ঘুমাব। মতে টিকে চা দিঅ।

চা করবে কে শুনি ?

মু পারিব না।

কেদার এমনিতেই ভয়ানক রগচটা মানুষ, তার ওপর অকালে ঘুম ভাঙার মেজাজ এমন বিগড়ে ছিল বা মাথা খারাপ হয়ে যাবার শামিল বলা চলে। দরজার কাছে তেড়ে যায়, গর্জে ওঠে।

ব্যাটা এত বড়ো বজ্জাত, মুখের ওপর জবাব দেয় ! উড়িষ্যার নবাব এসেছেন ! ওঠ বলছি হারামজাদা, কান ধরে তুলে দেব নইলে।

তুমি চুপ করো না ? পঙ্কজিনী বলে।

গাল দিলি মু থাকিব না।

বিশ্বম্ভর উঠে হাই তোলে। তারপর সাবান-কাচা শার্টটি গায়ে দিতে আরম্ভ করে। কথায় আর কাজে ব্যবধান রাখার পক্ষপাতী সে যেন নয়, এখুনি বেরিয়ে চলে যাবে।

পঙ্কজিনী ভাবে, সর্বনাশ করেছে ! এ বাজারে ঠাকুর পাওয়াই যে বিষম ব্যাপার সে তো হাড়ে হাড়ে তা জা... বিশেষত শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করা এমন পাকাপোক্ত ঠাকুর, একবার শুধু বললে ঠিকমতো সব রান্না করে দেয়, কষ্ট করে গা তুলে রান্না ঘরে গিয়ে একবার দেখিয়ে পর্যন্ত দিতে হয় না। নির্ভর নিশ্চিন্ত মনে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো চলে। রাখালবাবুর বউ আঁতুড়ে, কদিন খুঁজে খুঁজে একটা আনাড়ি লোকও পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। ভূষণবাবু তিনটে ঠাকুর আনলেন পরপর, দু-চারদিন কাজ করেই দুজন চলে গেল রেস্টুরেন্টে কাটলেট ভাজতে, আর একজন পান-বিড়ির দোকান দিয়ে বসল গলির মোড়ে। বাঙালি উড়িয়া হিন্দুস্থানি নির্বিচারে ভূষণবাবুর গিন্নি দুবেলা রাঁধুনি বামুনের জাতটাকেই অভিশাপ দেয়। এ বেলা চলে গেলে এ বেলাই অন্য বাড়ি কাজ পাবে বিশ্বম্ভর, যার বাড়ি যাবে সেই লুফে নেবে, মরন হবে তার। হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে হাড়কালি। নতুন বউ সাতদিনের মধ্যে অসুখের ছুতায় বাপের বাড়ি পালাবে, যদ্দিন না জানবে ঠাকুরের স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে তদ্দিন আর এ মুখো হবে না।

অগত্যা মিষ্টি কথা বলে তাকেই ঠান্ডা করতে হয় বিশ্বম্ভরকে।

বলে, কে আবার তোমায় গাল দিলে শুনি ?

বিশ্বম্ভর বলে, মু বামুনের ছেলে, খাটি খাইছি, মু গাল সহিব না।

পঙ্কজিনী আরও মিষ্টি সুরে বলে, কী পাগলামি কর ঠাকুর। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে নাও, কেউ তোমায় গাল দেবে না। শরীর খারাপ হয়েছে, শুয়ে থাক, কে বারণ করছে ? চা দেব এখন।

তারপর অবশ্য চা তৈরি করে বিশ্বম্ভর নিজেই, আপিসের রান্নাও চাপায়। কয়লা দুর্লভ বস্তু, কিন্তু আজ বড়ো দেরি হয়ে গেছে, পঙ্কজিনীর অনুমতি নিয়ে আরেকটা উনুনও সে ধরিয়ে ফেলে ! এক উনানে চাল আর অন্যটায় ডাল চাপিয়ে তাগিদ দেয়, বাজার যাব না ?

লোকটা কাজের মানুষ। সাধে কী পঙ্কজিনী ওকে এত খাতির করে।

জ্বরভাবের চিহ্ন বিশেষ দেখা যায় না, শুধু ঘুমকাতুরে মনে হয় তাকে।

আর মনে হয়, আজ যেমন সে আশ্চর্যরকম শান্ত, তেমনই বেশি রকম সজীব।

রাস্তার কলে গিয়ে কাপড়কাচা-সাবান গায়ে ঘষে চান করে আসে বিশ্বম্ভর, জানালা দিয়ে পঙ্কজিনী তাকিয়ে দ্যাখে' রান্না চড়াবার আগে চান করে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে নেবার প্রথা এ বাড়িতে

চালু নেই, অন্যদিন বিশ্বম্ভর নাইতে যায় রান্না শেষ করে। জ্বরভাব হলে বোধ হয় চান করাটা নিয়ম উড়িয়াদের। নেয়ে আসার পর বেশ চাঙ্গা দেখায় বিশ্বম্ভরকে। অন্যদিনের চেয়ে বেশি উৎসাহের সঙ্গে সে কাজে লেগে যায়। কেমন যেন আনমনা খুশি খুশি ভাব তার। ডালে কাঁটা দিতে দিতে গুণ গুণ করে গান গাইতেও শোনে পঙ্কজিনী, 'নটবরো' কথাটা কানে আসে অনেকবার। তার তামাটে মুখখানা একটু যেন সুশ্রীই মনে হয় আজ পঙ্কজিনীর। উড়িয়া ঠাকুর, সে তো একটা রান্না করা নোংরা জীব, পাজি আর বজ্জাত, চোর আর কামুক। সে যেন নিজেকে বাতিল করে খানিকটা মানুষ হয়ে উঠতে চাইছে পঙ্কজিনীর বিচারেও !

সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমায় বিশ্বম্ভর। বিকালে দিনের ঘুমে থমথম করে তার মুখ, কিন্তু একটু চঞ্চল, উৎসুক মনে হয় তাকে। কিছু বুঝতে উঠতে পারে না পঙ্কজিনী। তিন বছর আছে লোকটা, এমন ভাব কখনও সে দেখেনি তার। কেবল গোড়ার দিকে দেশ থেকে সবে এসে যখন কাজে ঢোকে রান্নার বিদ্যায় চরম আনাড়িত্ব নিয়ে, তখন কিছুদিন এ রকম ছটফটানি ছিল। দেশের জন্য মন কেমন করত নিশ্চয়। দেশে যাবার মতলব করেছে নাকি ? সে বার দেশ থেকে এসে ছটফট করেছিল মনমরা হয়ে, এ বার দেশে যাবার ছটফটানিতে এমন স্ফূর্তির ভাব ?

ছুটি চাইলে দিতেই হবে ছুটি, তিন বছর একটানা কাজ করে আসছে। লম্বা ছুটিই দিতে হবে। তবেই সেরেছে !—প্রথমে ভাবে পঙ্কজিনী। তারপর জোর করে দুর্ভাবনাটা ঠেলে দিয়ে ভাবে, তা হোক। তারা নয় কষ্ট করে নিজেরাই রাঁধবে পনেরো দিন, এক মাস। আহা, দেশে আপনজনেরা আছে, তিন বছর বেচারি তাদের মুখ দেখেনি। বিয়ে থা করার সাধ হয়েছে হয়তো। দেশে টাকা পাঠাতে হয়, নিজে কত কষ্ট করে থেকে কিছু কিছু করে টাকা জমিয়েছে, যাতায়াতের খরচটা পর্যন্ত বাঁচাবার জন্য তিন বছর দেশে যাবার কথা মুখে আনেনি। আহা, এই জোয়ান বয়স, এখন না করলে কবে আর বিয়ে করবে, ঘরসংসার পাতবে। নাঃ, চাওয়ামাত্র পঙ্কজিনী ওকে ছুটি দেবে, দেড়মাস দুমাসের ছুটি দেবে পুরো মাইনে সুদ্ধু, আগাম দেবে মাইনেটা। বিয়ে করে বউয়ের সাথে কাটিয়ে আসুক কিছুদিন। উড়িয়া বলে কি মানুষ নয় লোকটা ?

তিন বছর পরে আজ প্রথম এ সব কথা ভাবে পঙ্কজিনী !

কাল বড়ো চুরিটাতেও বিশ্বম্ভরকে সন্দেহ করতে পারেনি, আজকের টুকিটাকি চুরির জন্যও তাকে সন্দেহ করা যায় না। তবু তাকে বাজারে পাঠিয়ে তাব ঘুপচি ঘরটা একবার খুঁজে দেখে আসতে গিয়েছিল পঙ্কজিনী। চোরাই জিনিস কিছু খুঁজে পায়নি, কিন্তু বিশ্বম্ভরের ভাঙা টিনের সুটকেসটিতে আবিষ্কার করেছিল একখানা নতুন তাঁতের শাড়ি, সস্তা এবং একটু জ্যালজেলে কিন্তু রঙিন। পঙ্কজিনী মুচকে হেসেছিল।

দুপুরে মেঘ করে আসে আকাশে। গুমোটের ঘামে যেন নিজের গা থেকেই পচা ফুলের গন্ধ মেলে। মনটা অস্থির অস্থির করে পঙ্কজিনীর, কেমন একটা কষ্টকর বিষাদ ঘনিয়ে আসে। ছুটির দিন হলে, কেদার বাড়ি থাকলে, আজ হয়তো তাকে একটু আদর করত। মাঝে মাঝে করে।

ঘরে মন টেঁকে না, পঙ্কজিনী ছাতে যায়। আলসেয় ভর দিয়ে তাকিয়ে থাকে বস্তির গা ঘেঁষা দুটি বাড়ির দিকে। মাঝে মাঝে এ সময় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ওঠে দুবাড়ির ছাতে, কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে দু-চারমিনিট কথা বলেই চট করে নেমে যায়। আজ ওরা ছাতে উঠবে কিনা কে জানে। বস্তির খোঁড়া মেয়েটা ঘুঁটের টুকরি মাথায় নিয়ে আসছে গলি দিয়ে। ওর ঘুঁটেগুলি ছোটো ছোটো বিশ্রী, দামও বেশি চায়, কোনোদিন ওর কাছে ঘুঁটে রাখে না পঙ্কজিনী। তাই, বিশ্বম্ভরের ব্যাপার দেখে ছাতে দাঁড়িয়ে থ মেরে যায় পঙ্কজিনী। দূরের থেকে ঘুঁটে চাই গো ডাক শুনেই বিশ্বম্ভর যেন লাফিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খোলে খিড়কির, এই ডাক শোনার জন্য যেন কান পেতে ছিল। একেবারে সে ভেতরে নিয়ে আসে মেয়েটাকে। আগে দুবার বিশ্বম্ভর ঘুঁটের পয়সা চেয়ে নিয়েছে

তার কাছে, কখন ঘুঁটে রেখেছে পঙ্কজিনী টের পায়নি। তাকে লুকিয়ে ওর কাছে ঘুঁটে রাখে বিশ্বম্ভর ! রান্নাঘরের বারান্দার কোণে কেরাসিন কাঠের ঘুঁটের বাকসো, সেখানে চোখের আড়াল হয়ে যায় দুজন। ঘুঁটে গুনে রাখতে গিয়ে নোংরা হয়ে যাবে ধোয়া মাজা রান্নাঘরের বারান্দা। তা নয় গেল, ধুয়ে দিলেই আবার সাফ হয়ে যাবে বারান্দাটা, কিন্তু এতক্ষণ লাগে ও কটা ঘুঁটে গুনতে ? পা টিপে টিপে নেমে যায় পঙ্কজিনী। কলঘরে চৌবাচ্চায় উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় উঁচুতে বসানো ছোটো ফোকরের ঘষা-কাঁচের শার্সি একটু ফাঁক করে। রাগে নয়, কৌতূহলে নয়, অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বুক তার টিপ টিপ করে।

দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজনে। ঘুঁটের দরদস্তুর নয়, অন্য। সব ঘুঁটে এখনও খোঁড়া মেয়েটার টুকরিতেই রয়েছে।

হুঁ, হুঁ, কাপড় আনিছি। কতবার বলিব ?

এনেছ ? দাও না এখন ?

উঁহু, রাত্রে দিব।

মেয়েটার গাল টিপে দেয় বিশ্বম্ভর, চোখ তুলে চেয়ে মেয়েটা হাসে। সর্বাঙ্গে শিহরন বয়ে যায় পঙ্কজিনীর। ঘুঁটে আর গোনা হয় না, টুকরিসুদ্ধ ঘুঁটের বাকসে ঢেলে দেয় বিশ্বম্ভর।

বিকেলে বিশ্বম্ভর পয়সা চায় ঘুঁটের।

ঘুঁটে রেখেছ নাকি ? কত ? পঞ্চাশ মোটে ! কেন বেশি রাখতে পারলে না ?

আউ ছিল না।

না, বাড়িয়ে বলেনি বিশ্বম্ভর, পঞ্চাশটার মতোই ঘুঁটে ছিল টুকরিতে।

কার কাছে রেখেছ ? হাসি চেপে শুধায় পঙ্কজিনী।

ঘুঁটেওলা আসিথিল।

কখন আসিথিল ?

দুপুরে আসিথিল, আপুনি ঘুমাচ্ছিলে।

রাত এগারোটা বাজে, পঙ্কজিনী ঘুমায় না। কেবলই উশখুশ করে, বলে বড্ড গরম আজ, ঘরে টেঁকা যায় না। থেকে থেকে সে বাইরে যায়। এত রাতে একা অন্ধকার ছাতে গিয়ে ঘুরে আসে, সিঁড়ির কাছে যেতে যে পঙ্কজিনীর গায়ে কাঁটা দেওয়ার কথা।

কেদার বলে, কী হল তোমার আজ ?

কী আবার হবে ? শোবে না তুমি, ঘুমোবে না ? শুয়ে পড়ো, একদিন দিন ঘুমোও সকাল সকাল।

গোমড়া মুখে কেদার বলে, ঘুমোতে চাইলেই কত ঘুম আসে।

চেষ্টা করো না ? সেই ঘুমের ওষুধটা খাবে ?

কী ভেবে আজ ঘুমের ওষুধ না খেয়েই কেদার শুয়ে পড়ে, ঘুমোবার চেষ্টা করে। একটু যেন তন্দ্রার ভাব এসেও যায় তার পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায় পঙ্কজিনী। খিড়কির দরজার খিলটা খুলবার ও লাগাবার সময় ক্যাঁচ করে একটু আওয়াজ হয়। একটু আগে দুটো শব্দই সে শুনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হয় শরীরটা যেন হালকা হয়ে গেছে। মনে কিন্তু উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার সীমা নেই, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত তোলপাড় শুরু হয়েছে, বস্তির একটা খোঁড়া মেয়ে আর বাড়ির উড়িয়া ঠাকুরের বাসরঘরে আড়ি পাততে যাবার বদলে সে নিজেই যেন চলেছে অভিসারে। কত বছরের বদ্ধ পচা একঘেয়ে নিস্তেজ জীবনে হঠাৎ এসেছে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা, সে যেন ফিরে গেছে দশ বছর আগেকার তার বিয়ের প্রথম দিনগুলিতে, কেদারের পেটে যখন স্নায়বিক বদহজম আর জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়নি, ঘুমের জন্য তপস্যা করার বদলে না ঘুমিয়েই সে যখন ছিল খুশি।

দরজা জানালা বন্ধ করে বিশ্বম্ভর আলো জ্বেলেছে। ফুটো আছে চোখ পাতার। ঘরের ভেতরটা পঙ্কজিনী দেখতেও পায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রঙিন শাড়িখানা দেখতে দেখতে আনন্দে যেন ফেটে পড়বার উপক্রম করছে মেয়েটা, থেকে থেকে অস্ফুট শব্দ করে উঠছে। বিশ্বম্ভর সাবধান করে দিচ্ছে তাকে, তার মুখে তৃপ্তি আর আনন্দের হাসি। এত সুখ, এত আনন্দ, এত তৃপ্তি ওদের ওই একটা সস্তা শাড়ি দেওয়া নেওয়া নিয়ে ? কত দামি দামি শাড়ি তাকে এনে দিয়েছে কেদার, কখনও তো এমন আত্মহারা তারা হতে পারেনি।

সিঁড়িতে অনভ্যস্ত মানুষের পা টিপে টিপে নামার শব্দ আসে, হঠাৎ জ্বলে বারান্দার আলো। কেদার নেমে এসেছে। পঙ্কজিনী ছিটকে সরে যায় তার কাছে। মুখে আঙুল দিয়ে মানা করে কথা কইতে, ইশারা করে ডেকে নিয়ে যায় ওপরে নীচের বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে।

কেদার বলে, কী করছিলে তুমি ওখানে ?

কেদারের মুখ দেখে গা জ্বলে যায় পঙ্কজিনীর। মানুষটাকে কামড়ে দিতে ইচ্ছা হয়।

যাই করি, তোমার কি ? চাপা গলায় ফোঁস করে ওঠে পঙ্কজিনী, পিছু পিছু ধাওয়া করেছ কেন ?

ভেঙে গলে কাদা হয়ে যায় কেদার তার মূর্তি দেখে, বলে, আহা রাগছ কেন ? আমি কি কিছু বলছি ! শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে।

ঝগড়া করার সময় নেই, সময় বয়ে চলেছে। পঙ্কজিনী সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানায়।

বটে ! ব্যাটা এমন পাজি ? কেদার বলে আগুন হয়ে, হারামজাদাকে জুতো মারতে মারতে-

চুপ ! চেঁচিয়ো না। কিছু করতে পারবে না তুমি। এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। যদি কিছু হাঙ্গামা কর, আমি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব বলে রাখছি।

কেদার ভড়কে যায়।—কিছু করব না ? বাড়িতে এ নোংরা ব্যাপারকে তুমি প্রশ্রয় দেবে ?

কীসের নোংরা ব্যাপাব ? ওদের যদি ভালোবাসা হয়ে থাকে। ওকি তোমার ছেলে না ভাই যে শাসন করতেই হবে তোমাকে ? তোমার তো কোনো ক্ষতি করছে না। তুমি চুপচাপ শুয়ে ঘুমোও। পিছু পিছু যেয়ো না কিন্তু আমার, ভালো হবে না।

তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

একটু আড়ি পাতব।—এবার মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে চলে যায় পঙ্কজিনী। কেদার স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

রঙিন শাড়িটা পরেছে মেয়েটা। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে নিজেকে। তার ঘবের মানুষ-সমান আয়নাটা যদি থাকত, এমন করে বেচারিকে দেখবার চেষ্টা করতে হত না নতুন শাড়ি পবে কেমন দেখাচ্ছে নিজেকে।

বিশ্বম্ভর বলে, শুনিছ ? জিনিস চুরি আর হব না। একগোটা আলু না, বেগুন না, কিছু না।

পঙ্কজিনী উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বিশ্বম্ভর বোঝায় মেয়েটাকে কেন সে তরকারি চাল ডাল কিছু কিছু সরিয়ে তাকে আর দিতে পারবে না। বাড়ির গিন্নিটা বড়ো ভালো মানুষ, বোকা, কিন্তু তার মনে সন্দেহ জেগেছে। এরপর ও ভাবে টুকিটাকি চুরি চালাতে গেলে হয়তো ধরা পড়ে যাবে। শুনতে শুনতে সব চুরির রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় পঙ্কজিনীর কাছে। রাগ একটু হয় কিন্তু উদারভাবে সে মনে মনে ক্ষমা করে চুরির অপরাধটা বিশ্বম্ভরের। শুধু খাবার জিনিস চুরি করেছে বিশ্বম্ভর। প্রিয়া খেতে পায় না জেনে প্রেমিক যদি তরিতরকারি চাল ডাল চুরি করে তাকে দেয়, সেটা বোধ হয় অন্যায় হয় না তেমন !

মেয়েটা বলে, কাল তো দুটো আলু, পুঁচকে একটা বেগুন আর এতটুকু আটা দিলে, তাও টের পেল ?

বিশ্বম্ভর বলে, হঁ, মতে বলিল কি, পাঁচ গোটা আলু ছিল, দুটা গেল কাঁইকি ?

ওমা ! গালে হাত দিয়ে মেয়েটা বলে, মুটকো মাগিটা তো কম কেপ্পন নয় !

যেন চাবুক খেয়ে চমকে ওঠে পঙ্কজিনী।

বিশ্বম্ভর হাসে, কেতে শখ বুড়ি মাগির, কেতে ঢং। হাসি পায়, মু হাসি না।

পঙ্কজিনীর চিৎকারে ঘুম ভেঙে ছুটে আসে সবাই। সকলের আগে আসে কেদার। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। আশেপাশের বাড়িতে পর্যন্ত। হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করে প্রতিবেশীরা, কী হয়েছে ? চোর ধরা পড়েছে শুনে কয়েকজন ছুটে আসে আশেপাশের বাড়ি থেকে। পুলিশ ডাকতে ছুটে যায় পাড়ার সব কাজে উৎসাহী যুবক সতীশ।

ঘর থেকে একজন টেনে বার করে আনে মেয়েটাকে। ভয়ে সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার কেঁদে ওঠে।

তখন বিশ্বম্ভর বলে অনুনয় করে, উয়ার দোষ নাই, মু চুরি করিথিল। মু সব মানি নিব, জেল খাটিব। উয়াকে ছাড়ি দিঅ।

পঙ্কজিনী ঝেঁঝে ওঠে, ওই ছুঁড়ি আসল চোব।

বিশ্বম্ভর বলে, উয়ার দোষ নাই, মতে চুবি করিথিল।

পঙ্কজিনী বলে, ওই ছুঁড়ি আসল চোব। ওকে আমি জেলে দেব। তোকেও জেলে দেব। তুইও চোর।

চালক

দোতলা বাস রাস্তা কাঁপিয়ে চলে, দু হাতে স্টিয়ারিং ধরে থাকে অজিত। গাড়ির ঝাঁকানি, স্টিয়ারিংয়ের কাঁপুনি, ইঞ্জিনের গর্জন তার মধ্যে অপূর্ব আনন্দের আলোড়ন তোলে, নারীসঙ্গের জীবন্ত পুলকের মতো যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে পৌরুষের সার্থকতা। আজ কদিন ধরে সে বাসটা চালাচ্ছে, কিন্তু এত বড়ো একটা দৈত্যকে আয়ত্তে পাবার গর্ব, হাত ও পায়ের ইঙ্গিতে খুশিমতো একে থামানো, আস্তে বা জোরে যেমন ইচ্ছা চালানো এ সবের রোমাঞ্চ এতটুকু কমেনি, পুরানো হয়নি।

দাঁড়ানো গাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনটার একটানা দাবড়ানিতে, গিয়ার বদলাতে, স্টিয়ারিং ধরে থাকতে আর ব্রেক কষতে গিয়ে সে টের পায়, আগে সে যে ছোটো বাসটা চালাত, তার চেয়ে এ ইঞ্জিনের জোর কত বেশি, কত বড়ো আর ভারী এ বাসটা। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার কম হলে অজিতের মনটা খুঁতখুঁত করে, প্রায় খালি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার মনে হয় বিরাট একটা ক্ষমতার যেন অপচয় ঘটছে, ছোটো ছেলের কাজ করতে হচ্ছে জোয়ান-মদ্দ জবরদস্ত মানুষকে। ওপরে-নীচে গাদাগাদি করে প্যাসেঞ্জার উঠলে গাড়ি চালানোর উল্লাস তার বেড়ে যায়। একতলা বাসগুলির দিকে সে তাকায় অনুকম্পার দৃষ্টিতে। নিজেও সে যে কয়েক বছর ধরে একতলা বাস চালিয়ে এসেছে, মাত্র কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, ও রকম একটা ভাঙা পুরানো নড়বড়ে বাস নিয়ে সে পাড়ি দিত শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা, তা যেন সে ভুলেই গেছে একেবারে। মন তার চিরদিন ছিল দোতলা বাসের দিকে, এক দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার উসকানিতে দোতলা বাস হাঁকাবার স্বপ্নই সে দেখে এসেছে বরাবর! স্বপ্ন সফল হওয়ামাত্র একতলা বাসের দিনগুলি তুচ্ছ নগণ্য হয়ে গেছে তার কাছে, একতলা বাসের ড্রাইভারি পাবার পর যেমন গিয়েছিল ক্লিনার থাকার দিনগুলি।

সিনেমার স্টপে অনেক হবু প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়েছিল দূর থেকেই। আজ ঠিক টাইম মতো পৌঁছানো গেছে, সিনেমার দুপুরের শোটা সবে ভেঙেছে। এই জন্যই সে এতক্ষণ থামিয়ে থামিয়ে আস্তে চালিয়ে নিয়ে এসেছে গাড়ি, এখানে প্যাসেঞ্জার তুলে এবার জোরে চালিয়ে টাইম পুষিয়ে নেবে। এখানেই গাড়ি প্রায় ভরে যাবে তার, ট্রিপটার প্রথম দিকে! সারা ট্রিপটা চলবে বোঝাই গাড়ি, ওপরে নীচে ঠেসে ভরে গিয়ে বাইরে পর্যন্ত বাদুড় ঝুলবে প্যাসেঞ্জার—ছুটির দিন বলে, অফিস-ফেরতারা নেই বলে, ভাবনার কিছু নেই।

খানিক দূর থেকে সিনেমার সামনে জমানো প্যাসেঞ্জার দেখেই অজিত হুস করে স্পিড বাড়িয়েছিল, স্পিডের মাথায় পিছু হেলে প্রাণপণে ব্রেক কষে গাড়ি থামার। অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাবার জন্য ছাড়া এ রকম বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় খেয়ালের খাতিরে, গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা হুমড়ি খেয়ে ব্যথা পায়, গাড়িরও ক্ষতি হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বাহাদুরি করার ঝোঁক সে সামলাতে পারে না। কন্ডাক্টর কেদার খিঁচিয়ে উঠে গাল দেয়। সে পুরানো লোক, নিয়মভঙ্গে বিরক্ত হয়। তার সহকারী ছোঁড়া উল্লাসে চেঁচিয়ে তারিফ জানায়। হবু প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দাদা-বউদি আর তাদের বড়ো দুটি মেয়েকে দেখে অজিতের খুশির সীমা থাকে না।

মীনা! খুকু! বায়স্কোপ দেখতে এইছিস? উঠে পড়ে! উঠে পড়! বিনা পয়সায় আজ মজাসে বাস চড়বি!

মীনা ভুরু কুচকে ঠোঁট বাঁকায়, তার বয়স প্রায় ষোলো। খুকু সবে দশে পা দিয়েছে, সে আগে আড়চোখে মা-বাবার ভাবটা দেখে নিয়ে হুট করার ভঙ্গিতে মুখ তুলে ঝাঁকি দয়ে অবজ্ঞা জানায়

স্পষ্টভাবে। অসিত চেয়ে থাকে রাস্তার অপর দিকের ফুটপাথে, বেলারাণী হাতে দলা পাকানো ছোট্ট লেডিজ রুমালটি তিনবার নাকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে তিনবার নাক সিঁটকোয়।

অজিত হাই তোলে। প্যাঁক প্যাঁক করে হর্নটা বাজায়, পা টিপে টিপে ইঞ্জিনকে গর্জে গর্জে তোলে। আর তাকায়ও না দাদা-বউদি ভাইপো-ভাইঝিদের দিকে, সোজা সামনে রাস্তায় চোখ পেতে রাখে। কন্ডাক্টরের ইঙ্গিত পেয়েই গাড়ি ছেড়ে দেয়।

দোতলা বাসের ড্রাইভারের এই আসনে বসে না থাকলে এ ভুলটা সে নিশ্চয় করত না। পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে হঠাৎ ওদের দেখলে, এমন কী, একতলা বাস চালাবার সময়ও ওদের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, আকার-ইঙ্গিতেও সে প্রকাশ পেতে দিত না যে ওদের সে দেখেছে, ওরা তার আত্মীয়। দোতলা বাস চালানোর গর্বে আর আনন্দে সে ভুলেই গিয়েছিল ওদের কাছে সে ভদ্রলোক নয়, সে নিছক বাস ড্রাইভার, শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কলঙ্ক। খুশিতে আত্মহারা হয়ে নইলে কী সে রাস্তায় এত লোকের সামনে আত্মীয়তা ঘোষণা করে ওদের এমন লজ্জা দেয়—বাড়িতেও যে চেষ্টা করার ফলাফলের কথা দোতলা বাস চালাতে শুরু করার পরেও সে ভুলতে পারেনি, নিজেকে অপমান কবতে চায়নি। সত্যি কথা বলতে কী, অজিত স্বীকার করে নিজের কাছে ওদের কাছে সে ছোটোলোক। ভাবনার মধ্যেই মাঝবয়সি হাবা ভদ্রলোকটাকে ব্রেক-কষা স্টিয়ারিং ঘোরানোর কৌশলে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়। সে ভেবেছিল তাকে এমন একটা বিরাট বাস চালাতে দেখে অবজ্ঞা করার বদলে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে, সম্মান করবে তাকে। ভেবেছিল মানে আর কী, ওদের দেখে হঠাৎ-জাগা উল্লাসে কথাটা চিড় খেয়ে গিয়েছিল মনের ভিটেয়।

যাক গে। মরুক গে। চুলোয় যাক। দোতলা বাসে উন্নতি হয়েছে শুনেও নিজের বউ যার নাক সিঁটকোয়, তার আবার দাদা-বউদি-ভাইঝিদের কাছ থেকে খাতিরের প্রত্যাশা!

সেটাই তার লাস্ট ট্রিপ। হিসাবমতো আগেব ট্রিপটাতেই তার ডিউটি শেষ হত, ইন্দ্রজিৎ সিং সময়মতো না আসায় আরেকবার ঘুরে আসতে হয়েছে শহরের অপর প্রান্ত থেকে। সে জন্য কিছু আসে যায় না। কাল দরকার হলে ইন্দ্রজিৎ তার হয়ে একটা বেশি ট্রিপ দেবে। এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে তারা কামড়াকামড়ি করে না।

ইন্দ্রজিৎ হাসিমুখে স্টিয়ারিং ছেড়ে পাশে সরে বসে। বাড়ির গলিটার মুখ পর্যন্ত বাস চালিয়ে নিয়ে গিয়ে অজিত নেমে পড়ে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা। বিড়িওলা রহমত তার জন্য বেছে-রাখা কড়া শেঁকা বিড়ির প্যাকেটটি হাতে তুলে দিয়ে পয়সা গুনে নিয়ে হেসে বলে, কটা চাপা দিলে?

এক শালাকে দিচ্ছিলাম। বাবুর হাতে রেশমের শাড়ি দেখে মায়া হল, সামলে নিলাম। বউটা বুক চাপড়াবে!

একসঙ্গে আটজন হাসে এ রসিকতায়, ছজন যারা বিড়ি পাকাচ্ছিল তারা এবং রহমত ও অজিত। টাটকা একটা বিড়ি ধরিয়ে অজিত এগোয়—আস্তে আস্তে। বাড়ি পৌঁছতে যেন তার অনিচ্ছা আছে। দোতলা বাস চালাবার পরিশ্রম সহজ নয়, হাড়ে-মাসে সে টের পাচ্ছে শ্রান্তি, তবু যেন মন চায় না বাড়ি পৌঁছতে। বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত যেন তার আসল জীবনের, বাঁচার আনন্দের সীমা: তারপর শুধু কষ্ট—ভদ্র পরিবারে ভদ্রভাবে আত্মগোপন করে থাকার বিশ্রী কষ্ট। দি গ্রেট ক্যালকাটা লন্ড্রি অ্যান্ড টেলারিং শপের কানাইয়ের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে। ট্যাক্সিচালক হরণামের ঘরের সামনে এক হাত রোয়াকটুকুতে বসে জিজ্ঞাসা করে তার ছেলেটার অসুখের খবর। বাড়ি পৌঁছানো যেন পিছিয়ে দিচ্ছে, যতক্ষণ পারে ঠেকাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বলছে, তবু!

বাড়ির চৌকাট ডিঙোলেই সে আর মানুষ থাকবে না, হয়ে যাবে হালদার পরিবারের লজ্জা, আপশোশ, কলঙ্ক, জন্ম-বয়াটে, ম্যাট্রিক পাশে অক্ষম, বিড়ি ফোঁকা, দেশি খাওয়া, কাঠখোট্টা ভূত— এককালীন মোটর ক্লিনার, অধুনা বাস ড্রাইভার।

সদর পেরিয়েই অজিত সামনে পড়ে বুড়ো বাপের। স্যাঁতসেঁতে উঠানের চেয়ে আধহাত উঁচু বারান্দায় সেকেলে বেঢপ শক্ত কাঠের চেয়ারে বসেছিল রসিক হালদার, হাতে গড়গড়ার নল। অজিতের মা মোক্ষদা দু-তিনদিন অন্তর কলকে ভাঙে—টানাটানির সংসারে তামাক খেয়ে গয়াবিষ্টুপুর মেশানো দু টাকা সের তামাক খেয়ে, পয়সা নষ্ট করা তার সয় না। গড়গড়া বা নলটা মোক্ষদা ভাঙে না। এই জন্য ভাঙে না যে, ও সব নতুন কিনতে পয়সা লাগে অনেক এবং কেনা যে হবেই পৃথিবী চুলোয় গেলেও সেও তো জানা কথা।

অজিত, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রসিক বলে গম্ভীরভাবে, কথার আগে ও পরে গড়গড়ার নলে জোরে জোরে টান দিয়ে।

অজিত আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে কথা বলার জন্যই কি রসিক আজ এখানে ঘাঁটি আগলে বসে আছে ? নতুন কী দোষ করেছে, নতুন কী কলঙ্ক এনেছে হালদার পরিবারে, অজিত ভেবে পায় না। দাদা-বউদি-ভাইঝিরা এসে কি নালিশ করেছে প্রকাশ্য রাজপথে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ায় অমার্জনীয় স্পর্ধার বিরুদ্ধে ? রসিক কি তাকে সতর্ক করে দেবে যে ভবিষ্যতে আর কখনও যেন সে এ রকম কাজ না করে ?

বলুন।

অজিত বলে বিস্ফোরণ-আটকানো বোমার মতো মৃদু সুরে। বাবা ! চার ছেলের বাবা ? দুটি চাকুরে আর একটি এম এ পড়া ছেলের জন্যই যার পিতৃত্বের পরম সার্থকতা, মোটর সাফ করা আর বাস চালানো অভদ্র ছোটোলোক ছেলেটা তিন ছেলের ভদ্রজীবনে কলঙ্কের আমদানি না করে এই যার ভয়—সে যে ভাই, এই কলঙ্ক সয়ে যাওয়াই ওদের পক্ষে যথেষ্ট, অসীম উদারতা—এই যার বিশ্বাস এবং এ জন্য তিনটি উপযুক্ত ছেলের কাছে সে রীতিমতো কৃতজ্ঞ। অজিত জানে মুশকিল ওইখানে। তার জন্য, অপদার্থ অপাঙ্‌ক্তেয় তারই জন্য, বড়ো প্রাণ কাঁদে বুড়ো বাপটার। তার কামনা ভাই তিনজনের কাছে নিজের অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব লোপ করে, চোখকান মুখ বুজে, মাথা নিচু করে, সে এই বাড়িতেই সুখে বাস করুক বউ আর ছেলেটা নিয়ে !

সংসারে সে খরচ দেয়—কিছু বেশিই দেয় দুটি রোজগেরে ভাইয়ের চেয়ে। ওদের অন্য খরচ বেশি। ভদ্রভাবে খাওয়াপরা চলাফেরার খরচ, তাই তার চেয়ে অনেক বেশি দেবার কথা স্থির করা থাকলেও কয়েক বছরের মধ্যে দু-একমাস ছাড়া কোনোবারেই বেশি দিতে পারেনি। দিতে পারে, অজিত জানে, দিতে পারে। ব্যাঙ্কে টাকা জমানোটা একটু কমালেই অনায়াসে দিতে পারে।

কিন্তু আজ যেন কেমন একটা ভাবান্তর ঘটেছে রসিকের সে অনুভব করে। তাকে সমালোচনা ও উপদেশ শোনানো রসিকের অভ্যাস নয়।

মুখ হাত ধুয়ে চ-টা খেয়ে আয়।

চ-টা খেয়েছি। চান করে ভাত খাব একেবারে। কী বলছিলেন ?

তুমি বড়ো ব্যস্তবাগীশ। গড়গড়াটা টানতে টানতে রসিক বলে, গুরুতর কথা শান্ত মনে বিচার করতে হয়।

আমার মন বেশ শান্ত আছে, অজিত শান্তকণ্ঠে বলে, সারাদিন খেটেখুটে এসে চানটান করে খেয়ে বিশ্রাম না করে, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। কী বলছেন বলুন। নয়তো কাল বলবেন।

এই তো দোষ তোমার ! রসিক বলে, আপশোশের সুরে, কিন্তু বেশি চটে না গিয়ে, সেটা আরও আশ্চর্য করে দেয় অজিতকে ! বিষয়ের গুরুত্ব বোঝো না তুমি। কথাটা হল কী, তুমি বরাবর অসিত সুজিতের সমান সংসার খরচ দিয়ে এসেছ। ওদের ডবল দেওয়া উচিত ছিল। যাকগে, অসিতের মেয়ের বিয়ের ভাবনা আছে, সুজিতের বউটা নিত্য রোগী, এক মেয়ে বিয়োতে ওর হাজার টাকা খরচ—ভবিষ্যতে কী যে করবে ভগবান জানেন। আমি বলি কী, ওদের সঙ্গে তোমার কোনো মিল নেই, ওরা এক রকম, তুমি অন্য রকম। কী দরকার তোমাদের একসাথে থাকবার ? আমার জন্যে আমার ভয়ে একসাথে থেকেছে, নয়তো করে তোমায় ওরা ভিন্ন করে দিত। এ অবস্থায়, আমার মতে, তোমার ভিন্ন হওয়া উচিত। ওই বাড়তি ভাঁড়ার ঘরটা তুমি রান্নাঘর করতে পার—কাল থেকে তাই হবে। কাল পয়লা না ? হ্যাঁ, কালকেই পয়লা।

বেশ তো তাই হবে।

অজিতের সংক্ষিপ্ত গা ছাড়া জবাব বড়োই ক্ষুণ্ণ করে রসিককে।

একবার ভাবলে না, বউমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না, বলে বসলে, তাই হবে ? তোমার এই মতিগতির জন্য—

উদাসীন ভাবটা ত্যাগ করে এবার অজিত জোর দিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, সংসারের ব্যবস্থায় আমার মতিগতির প্রশ্ন কী ? আমি কিছু করতে গেলে বলতে গেলেই আপনিও রাগ করবেন, আপনার বউমাও খেপে যান। আপনারা পরামর্শ করে যা ভালো বোঝেন তাই করুন।

একি একটা কথা হল অজিত ? রসিক বলে কাতরভাবে, তোমার দুশোর ওপর আয় বেড়েছে শুনে থেকে ভাবছি এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। এদিকে সুজিতের চাকরিটাও গেল। অনেক আগেই তোমায় ভিন্ন হতে বলা বোধ হয় উচিত ছিল, ভুল করেছি মনে হয়। লেখাপড়া শিখলে না, মানুষ হলে না, ভেবেছিলাম ভাইদের সঙ্গে থাকলে সময়ে অসময়ে তবু—

নলটা ঠোঁটের কাছে আলগোছে ঠেকে থাকে, চিন্তার অনেকগুলি রেখা ফুটে থাকে চামড়ার কুঁচকানিতে।

বউমাও যেন কেমন। ওরা পছন্দ করে না, আমল দেয় না, তবু বেহায়ার মতো লেপ্টে থাকবেন। নাঃ, কাল থেকেই তুমি ভিন্ন হয়ে যাও।

তাই হবে।

কাল থেকে ভিন্ন রান্নাঘরে ভিন্নভাবে লক্ষ্মী তার আর খোকার জন্য রান্না করবে, এটা তার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। বাড়িতে সে একবেলা খায়। দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে খাওয়া তার অভ্যাস। সেটা বাইরে হোটেলে সম্ভব হয়, বাড়িতে ভাইরা তার সঙ্গে খায় না। সময়মতো দু-একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে আসন পেতে সবার সাথে খেতে বসে গিয়ে সে দেখেছে, খাওয়া যেন মাটি হয়ে গেল ভাইদের, পরিবেশন উল্টো হয়ে গেল মেয়েদের, লক্ষ্মীর পর্যন্ত ! পরে লক্ষ্মী ঘরে গিয়ে কেঁদে বলেছে, কেন তুমি বসতে গেলে ওনাদের সঙ্গে ? আমি গলায় দড়ি দেব।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সামনে পড়ে সুজিতের বউ সুমনা। পাশে সরে দেয়াল ঠেলে সরিয়ে দশ-বিশহাত ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টাটা সুষমা এমন কুৎসিত ভাবে করে যেন গুন্ডার হাতে মান বাঁচাতে ভদ্রমেয়ে সতী বউ ইটের কবর চাইছে। আবার চাকরি গেছে সুজিতের। সুমনার স্নায়ুগত ব্যারামটা মাসখানেক হল আবার বেড়ে গেছে শুনেছিল লক্ষ্মীর কাছে, বোধ হয় মাসখানেক সুজিতের চাকরির মেয়াদ আছে এটা টের পাওয়ার পর। আগের বার যখন বেকার ছিল সুজিত, সুমনাকে দিয়ে সে মাঝে মাঝে টাকা চেয়ে পাঠাত তার কাছে। পাঠাত লক্ষ্মীর কাছেই কিন্তু সুমনা টাকার দরকারটা জানাত

তাকে, বলত, দাদা, দশটা টাকা চাইতে এসেছি। মেলামেশা ছিল তখন তাদের মধ্যে। সুজিতের চাকরি হবার পর সে আর সুজিত দুজনেই কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। আবার বেকার হয়েছে সুজিত। কিন্তু এমন করে কেন সুমনা তা হলে ? হিসাব মতো আবার তো সুমনার এখন দাদা বলে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করা উচিত ! অনেক টাকা কি ব্যাঙ্কে জমিয়ে ফেলেছে সুজিত ? রক্তে আগুন ধরে যায় অজিতের, হাসি পায়। মেয়েটার পরিচয়হীন পেট মোটা কোমরে একটা লাথি কষিয়ে দেবার সাধটা সে দমন করে।

বলে, ভীষণ মদ খেয়ে এসেছি। ভয়ানক খুন চেপেছে।

মাগো ! সুমনা আর্তনাদ করে, আর্ত মৃদু অস্ফুটস্বরে, সে নিজে আর সামনের খুনেটা ছাড়া কেউ যাতে না শুনতে পায় !

এক মুহূর্তে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যায় অজিত। এইসব বিকারের বস্তা, খাপছাড়া দুঃখী জীব—এদের ওপর সে রাগ করে !

অজিত বলে, বউমা, ওষুধ খাওনি ?

সুমনা বলে, খেয়েছি তো ?

অজিত বলে, না খাওনি। এখুনি ওষুধ খাবে যাও। বোনটি আমার, মা-টি আমার, ওষুধটা রোজ খেতে হবে।

সুমনা কেঁদে ফেলে, জলকাচা মোটা শাড়িব মতো, মোচা কাটা কলাগাছেব মতো, অঝোর ঝরে কেঁদে ফেলে, দাদা ওষুধ খেলে ঘুম পায় যে ? রাগ করে যে ঘুমোলে ?

অজিত সটান ওপরে চলে যায়। এ সমস্যা তার ধরাছোঁয়ার এলাকার সমস্যা নয়। সমস্যাটা স্পষ্ট হতে দিয়ে বরং বোকামিই করে ফেলেছে সে। যার শোচনীয় দুঃখে হঠাৎ মনটা মায়ায় ভিজে গিয়েছিল, কাঠখোট্টা বাস ড্রাইভার হলেও ভদ্র হালদার পরিবারের ছেলে বলেই হয়তো—সে হয়তো সিঁড়ি কটা বেয়ে নামতে নামতেই সুর পালটাবে। সরু গলার চিকণ আওয়াজে চিরে দেবে স্যাঁতসেঁতে উঠানের গুমটো নিশ্চল বাতাসকে, বলবে, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় মেজো ভাসুর গায়ে তাব হাত দিয়েছিল, ইস্, মদের কী গন্ধ তার মুখে !

এ সব ভদ্রঘরের মেয়ে বউকে বিশ্বাস নেই।

জামা ছাড়ে অজিত। লক্ষ্মী সামনে এসে হেসে বলে, ওমা, আজ যে এত সকাল সকাল এলে ?

অজিত আরেকবার অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়। শুধু আশ্চর্য নয়, অবাকও হয়। লক্ষ্মী তার সঙ্গে হাসিমুখে ঘরোয়া অর্থহীন কথা বলেছে, শাড়ি গয়না ক্রিম পাউডার কিছু তার আজ আনবাব কথা নয়, আনেওনি জানে লক্ষ্মী।

ইস ! মুখটা শুকিয়ে গেছে তোমার। জামাকাপড় খুলে লুঙ্গিটা পরে এসে বোসো। একটু হাওয়া করি। ঘেমে নেয়ে গেছ একেবারে।

বাড়ি এসে জামাকাপড় ছেড়ে রোজ সে লুঙ্গি পরে। এ প্রক্রিয়া লক্ষ্মী তাকিয়েও দ্যাখে না। আজ লক্ষ্মী অনুমোদনের হাসি হেসে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে বসে হাত নাড়ে, পা নাচায়, মাথা ঝাঁকায়।

কী বলছ ? জিগগেস করে অজিত, আপশোশের সুরে।

ওমা ! ন্যাকা যেন ! মিষ্টি কথায় গরম বাড়ে। কেন, কী অপরাধ করেছি আমি ? ভেসে এসেছি নাকি ?

লক্ষ্মী কাঁদে। ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে, বাইশ টাকার তাঁতের শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে, বাঁকা হয়ে বসে লক্ষ্মী কাঁদে। অজিত মনে মনে বিবেচনা করে যে ফুলবিবির রেশনের সস্তা ছাপা শাড়ি পরে পরে খুলে খুলে তাকে ভুলাবার চেষ্টাটা এর চেয়ে অনেক ভদ্র ছিল।

খোকা ঘুমিয়েছে। সারাদিন দুষ্টুমি করে এইমাত্র ঘুমোলো। এত দুষ্টু হয়েছে কী বলব। খেটে খেটে মরলাম। তুমিও তাকাও না আমার দিকে।

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে মগভরা জল নিয়ে বারান্দায় মুখ হাত ধুয়ে অজিত গম্ভীর মুখে বিছানায় এসে বসে একটা বিড়ি ধরায়। তোমার নাকি দুশো টাকা মাইনে হয়েছে দোতলা বাসে ? লক্ষ্মী শুধোয় পাশে বসে, তার বাঁ হাতে বিড়ির আগুন জ্বলছে বলে ডান হাতটা টেনে বুকে রেখে।

তার মাইনে নেই, কমিশন ব্যবস্থা। কিন্তু মাসকাবারি বাঁধা মাইনের হিসাব ছাড়া এরা বোঝে না। অজিত বলে, মাসে তিনশো চারশো দাঁড়াবে সবসুদ্ধ।

ওমা ! কোথায় যাব ! লক্ষ্মী যেন মূর্ছা যাবে। মূর্ছা যাবার বদলে সে খানিকক্ষণ নেতিয়ে পড়ে থাকে অজিতের বুকে। তারপর বলে, ঠাকুরপোর চাকরি গেছে জানো ?

তাই নাকি ?

চেপে রেখেছিল কথাটা, তা এ কি আর লুকোনো যায় ? সুমির রকমসকম দেখেই আমার সন্দ হচ্ছিল।

অজিত নীরবে হাই তোলে। একটা বিড়ি ধরায়।

এসো না। শোও না দু দণ্ড। খেটেখুটে এসে কি বিশ্রাম করতেও শখ যায় না একটু ? আস্তে আস্তে ঘামাচি মেরে দি, কী ঘামাচি হয়েছে মাগো। ইস ! মাগো ! আর শুনেছ ? বাবা বলছিলেন, ভাসুর ঠাকুর সংসারে পঁচিশ টাকা কম দেবেন বলেছেন। ওঁর নাকি নিজের খরচ বেড়েছে। ঠাকুরপো তো ছাঁটাই। বাবার কাছে নাকি দু হাজার টাকা চেয়েছে, ব্যাবসা করার জন্যে। ঠাকুরপো করবে ব্যাবসা ! বউ যার রোজ কাঁদে যে এর চেয়ে একটা হিজড়ের সঙ্গে বিয়ে হলে—

বিদ্যুতের আলোয় ঘর স্পষ্ট, আসবাব স্পষ্ট, মানুষ স্পষ্ট, দৈন্য অভাব অভদ্রতা সব কিছুই স্পষ্ট।

অজিত বলে, খিদে পেয়েছে।

ওমা ! মাগো ! খিদে পাবে না ?

খাওয়ার আয়োজন করতে করতে লক্ষ্মী বলে, বাবা বলছিলেন, যাই হোক তাই হোক, আমার এই ছেলেটাই ভালো। সংসারে ঠিকমতো টাকা দেয়, নিজের আর বউয়ের বাবুগিরিতে সব উড়িয়ে দেয় না।

বারান্দায় কেউ নেই, আশেপাশে কেউ নেই, তাদের ঘরোয়া আলাপ শুনবার মাথাব্যথা কারও আছে কিনা সন্দেহ, তবু অজিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে লক্ষ্মী ফিসফিসিয়ে বলে, বাবা আমায় বললেন, ছেলেদের মধ্যে তুমিই শুধু বিশ্বাসী। ও সব বাবুদের ওপর মোটে ভরসা নেই বাবার। বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরবেন ওদের ভরসায় থাকলে। তোমাকে ভিন্ন করিয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে চান বাবা। যা করা উচিত, তা তো তুমি করবে অন্তত, মুখ্যু হও আর যাই হও।.....তিন চারশো টাকা। ভাসুর ঠাকুর আড়াইশো মাইনে পান, তাতেই দিদির এত গর্ব। তোমার চেয়ে বিশ বছরের বড়ো তো ভাসুর ঠাকুর !

টিচার

রাজমাতা হাইস্কুলের সেক্রেটারি রায় বাহাদুর অবিনাশ তরফদার ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত টিচারদের কিছু সদুপদেশ দেওয়া স্থির করল। বুড়ো বয়সে এমনিতেই তার ঘুম হয় কম, তার ওপর এই সব যাচ্ছেতাই খাপছাড়া ব্যাপারে মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় কদিন আরও ঘুম হয়নি। টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকি থাকে বলে, এটা-সেটা হরেক রকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে ! বাপের জন্মে রায় বাহাদুর এমন কথা শোনেনি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙড় যে ধর্মঘট করবে ?

শুধু তার স্কুলে এ সব গোলমালের সম্ভাবনা ঘটলে সে অবশ্য ব্যাপারটা গ্রাহ্য করত না। দুটো ধমক দিয়ে একটা মিষ্টিকথা বলে, সকলকে খেপাচ্ছে কোন মাথা-পাগল ইয়ং টিচারটি সন্ধান নিয়ে তাকে একচোট মজা দেখিয়ে সব ঠিক করে দিতেন অনায়াসে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের সব স্কুলের টিচাররা জোট বাঁধছে, সম্মেলন করছে। খেতে পায় না লেখা ব্যাজ পরছে। করুক, পরুক। যা খুশি করুক অন্য স্কুলের টিচাররা, তার স্কুলে সে ও-সব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেবে না, ও সব হীনতা স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকতে পারবে না তার পবিত্র শিক্ষায়তনে।

স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসি মুখে বহন করে, বিদ্যাদানের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দেবে, শিক্ষাদীক্ষাহীন অসভ্য মজুর-ধাঙড়ের মতো হাঙ্গামা করবে, তা কখনও হতে পারে না, রায় বাহাদুর তা বিশ্বাস করে না। মোটামুটি এই ধরনের সদুপদেশ রায় বাহাদুর তা শোনাল শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর। অবশ্য অনেক ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে, দমক-গমক-মূর্চ্ছনা আমদানি করে, গুরুগম্ভীর চালে।

আপনারা কী বলেন ?

কে কী বলবে ? সকলে চুপ করে থাকে। রায় বাহাদুরের ধৈর্য বড়ো কম, বিশেষত এখন এত লম্বা বক্তৃতা দেবার পর এই গরম এক ফোঁটাও আছে কি না সন্দেহ, কেউ কিছু বলতে গেলে হয় তো গালাগালি দিয়ে বসবেন, গালে চড় বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়। কিছু বলার দরকারও ছিল না। টিচারদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে এটা অফিসিয়াল মিটিং নয়, রায় বাহাদুরের নিজস্ব সদুপদেশ দানের সভা। চুপচাপ বসে শোনাই এখানে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় হেডমাস্টার শশাঙ্ক কেবল একবার মাথা চুলকিয়ে বলে, আজ্ঞে, তা বইকী। শিক্ষক-জীবনের মহান আদর্শের কথা কি তারা ভুলতে পারে।

সভার শেষে শশাঙ্ক একান্তে আবার বলে, গতমাসের বাকি মাইনেটার জন্য একটু, যে রকম দিনকাল, সংসার চালানোই—

কে উসকানি দিচ্ছে জানেন ?

ক বছর আগে হলে শশাঙ্ক হয়তো দু-একটা নাম উচ্চারণ করে ফেলত। কিন্তু শশাঙ্কবাবুও আর সে শশাঙ্কবাবু নেই, অনেক বদলে গেছে।

আজ্ঞে, উসকানি কে দেবে। একজন দুজনের উসকানির ব্যাপার নয়, আপনি তো জানেন, দেশ জুড়ে এ রকম চলছে।

স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে থেকে রায় বাহাদুর বলে, গিরীন খুব পলিটিকস করে বেড়ায় না কি ?

বুকটা ধড়াস করে ওঠে শশাঙ্কের গিবীন তার জামাই। মনে মনে আরেকবার গিরীনকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, পলিটিকস করে না। মিটিং-ফিটিং হলে হয়তো কখনও শুনতে যায়। আর স্কুলে পলিটিকস নিয়ে কিছুই হয় না।

হয় না ? সেদিন স্ট্রাইক করে ছেলেরা স্কুলেব মাঠে যে মিটিং করল ?

আজ্ঞে সেটা ঠিক পলিটিক্যাল মিটিং নয়। প্রোটেস্ট মিটিং মাত্র। কলকাতায় স্টুডেন্টদের ওপর গুলি চালান হল, তারই প্রোটেস্টে—

কলার কাঁদিটা বাততি হয়েছে না ? এবাব কেটে ঝুলিযে রাখলে পেকে যাবে দু-একদিনের মধ্যে, কী বলেন ?

কাল মালিকে বলব।

বাতারাতি যেন চুরি হয়ে যায় না, দেখবেন ! রায বাহাদুর হাসল।

সন্ধ্যাব পব গিরীন বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে বায় বাহাদুর আশ্চর্য হল না। গিরীনের সম্পর্কে তার প্রশ্নে ভড়কে গিয়ে শশাঙ্ক নিশ্চয তাকে পাঠিযে দিয়েছে দোষ কাটাতে, কথায় কথায় তাকে জানিযে দিতে যেতে যে ভুলচুক যদি সে কবেই থাকে তিনি যেন ক্ষমা করে নেন, এবার থেকে সে সাবধান হবে। তাই যদি হয, তবে ভালোই।

গিবীন কিন্তু ও সব কথার ধাব দিযেও যায না। খুব বিনীত ও নম্রভাবে পরদিন তার ছোটো ছেলেব অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন জানায। বায বাহাদুর অবশ্য বুঝতে পাবে, তার মানেও তাই। খানিকটা স্পষ্টভাবে জানানোর বদলে ইঙ্গিতে জানানো যে সে অনুগতই, রায় বাহাদুর যা অপছন্দ করেন তা থেকে সে তফাতে থাকবে, তাকে চটাবে না।

অন্নপ্রাশন ? ছোটো ছেলেব ? তা বেশ। কিন্তু আমি নেমন্তন্নে যাই না, বুড়ো শরীরে সয় না ও সব। বায বাহাদুব অমাযিকভাবে হসে।

আপনাকে পায়েব ধুলো দিতেই হবে।—গিরীন বলে নাছোড়বান্দার জোরালো অনুনয়ের সুরে, সকাল সকাল গিযে আশীর্বাদ কবে আসবেন শুধু, একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড়োই আঘাত পাব না গেলে।

রায় বাহাদুব যেতে রাজি হযেছে ধরে নিয়েই যেন একটু ইতস্তত কবে গিরীন আবার বলে, একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা উপহার কিছু নিযে আসবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের রীতি আছে, কোনো কাজে বক্তেব সম্পর্ক ছাড়া কারও কাছে সামান্য উপহারও নেওয়া চলবে না। ঠাকুরদা না তার বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন, একগাছি তৃণ নিলে নাকি বংশের সর্বনাশ হবে।

বলো কী হে ?

একটা দুশ্চিন্তা কেটে যায়, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গেলে কিছু দিতে হবে ? চিন্তাটা ছিল রায় বাহাদুরের। এবার একটু ভেবে, গিরীনের একান্ত আগ্রহ দেখে, রাজি হয়ে বলল, এত করে যখন বলছ—

সে কিছু খাবে না, কিন্তু এই সুযোগে মিষ্টি প্রভৃতি তার সঙ্গে কি দেবে না গিরীন ? রায় বাহাদুর ভাবে। অনেকেই দেয় !

প্রায় দশটায় রায় বাহাদুর গিরীনের বাড়ি পৌঁছল। বাড়ি দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, ছোটো ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসবের চিহ্ন না দেখে আরও বেশি এত ছোটো এত পুরানো এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ি হয়, রায় বাহাদুর জানত না, কারণ, এর চেয়েও খারাপ বাড়ি চারিদিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও সে কোনওটার দিকে কখনও তাকিয়ে দ্যাখেনি—এ ধরনের বাড়ির অধিবাসী কস্মিনকালেও তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায়নি ! ছেলের অন্নপ্রাশন রীতিমতো একটা উৎসবের ব্যাপার। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্যান্ড বেজেছিল, মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে সে অন্তত শানাই বাজায়। লোক গিজগিজ করে তার বাড়িতে, ছেলের বেলা বেশি হোক, মেয়ের ছেলের বেলা বেশি হোক, মেয়ের ছেলের বেলা কম হোক, গিজগিজ করে। গিরীনের বাড়িতে লোক আছে বলেই মনে হয় না, ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসে ছোটো একটা ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্না।

গাড়ির আওয়াজে বেরিয়ে এসে গিরীন তাকে অভ্যর্থনা জানায়, যথাসাধ্য আয়োজন করেছি, দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন।

যথাসাধ্য আয়োজন ? বৈঠকখানার ভাঙা তক্তপোশে বিছানো ছেঁড়া ময়লা শতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী-পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবুথবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোমওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তপোশ ছাড়া বসবার আসন আছে আরেকটি, কেরাসিন কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটা কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত হয় তার প্রমাণ, গুটানো কাঁথা মশারির বান্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে, তক্তাপোশের নীচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধিটা বোধ হয় কারও মাথায় আসেনি।

ইনি আমার বাবা, গিরীন পরিচয় করিয়ে দেয়, দু বছর ভুগছেন। আর বছর ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে, পেরে উঠিনি, সাত-আটশো টাকার ব্যাপার।

জবুথবু বৃদ্ধ কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। দুটি হাত একত্র করে নমস্কার জানাবার মতোই যেন চেষ্টা করে মনে হয়। ক্ষীণকণ্ঠে কী বলে ভালো বোঝা যায় না।

আসুন। ভেতরে চলুন।

রায় বাহাদুরকে গিরীন বাড়ির মধ্যে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। উঠান পেরিয়ে যাবার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে রায় বাহাদুর যথাসাধ্য আয়োজনের কোনো চিহ্নই দেখতে পায় না। রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়িতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ির ঝিয়ের মতোই, তবে রায় বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়িরই কোনো বউ-ঝি। ও পাশে রান্নাঘরে খুন্তি দিয়ে কড়ায়ে ব্যানুন নাড়ায় রত বউটির শাঁখাপরা হাতটি শুধু চোখের একপলকে দেখেই কী করে যেন রায় বাহাদুর টের পেয়ে যায় যে সে গিরীনের বউ।

চার ভিটেয় চারখানা ঘর তোলার সুযোগ থাকলেও, বৈঠকখানাটি বাদ দিলে ভেতরে ঘর মোটে দুখানা—রান্নাঘরের চালাটি ছাড়া। গিরীনের শোবার ঘরখানার নমুনা দেখেই রায় বাহাদুর বুঝতে পারে অন্য ঘরখানা কেমন, ন ়াচড়ার স্থান কতটা, কী রকম আলো বাতাস আসে।

জলচৌকিতে পাতা পুরনো কার্পেটের আসনে বসে রায় বাহাদুরের দম আটকে আসে। ছোটোছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্নাটা এখন খুব কাছে মনে হয়।

কে কাঁদে ?

ছেলেটা কাঁদছে, ছোটো ছেলেটা। যার মুখে ভাত। জ্বর আসছে বোধ হয়, জ্বর আসবার সময় এমনি করে কাঁদে। জ্বর এসে গেলে চুপ করে যাবে।

রায় বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করে, এদিক ওদিক তাকায়, একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে মনে হয় তার ! গিরীন নীরবে তাকে লক্ষ করে, ফাঁদে পড়া সিংহ জন্তুর দিকে শিকারি ব্যাধের মতো শান্ত নির্বিকারভাবে, মুখ তার থমথম করে মনের আপসহীন মনোভাবে।

আপনি তো ভালো হোমিওপ্যাথি জানেন। সবাই বলে যে ডাক্তারি পাশ করেননি বটে, কিন্তু আপনার ওষুধ একেবারে অব্যর্থ।—সে বলে ব্যঙ্গ ও তোষামোদের সুরে।—ছেলেটাকে দেখে দিন না একটু ওষুধ ? বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে ছেলেটা।

রায় বাহাদুর যেন রাজি হয়েছে তার ছেলেকে দেখে ওষুধ দিতে এমনিভাবে দরজার কাছে গিয়ে গিরীন ডাকে, শুনছো ? খোকাকে নিয়ে এসো শিগগির। আঃ, এসো না নিয়ে ? দেরি করছ কেন ?

নিজের অতিরিক্ত অধৈর্যের কৈফিয়ত দেবার জন্যই যেন রায় বাহাদুরের কাছে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না এদের সঙ্গে। আপনার সামনে আসবে যা পরে আছে তাই পরে, তাতেও লজ্জা ! সম্বল তো সেই বিয়ের একখানা শাড়ি, এক-ঘণ্টা লাগাবে এখন সেখানা বার করে পরতে। আর পারি না সত্যি !

সে এসে কৈফিয়তের বিবক্তি জানানো শুরু করতে না করতেই ছোটো একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাঁশুটে রঙের রোগা একটি বউ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, এক নজর তাকিয়েই রায় বাহাদুর টের পায় পরনের কাপড় বদলে বিয়ের সময়কার একমাত্র শাড়িটি সে পরে আসেনি। এটাও সে টের পায় যে ওকে আসতে দেখেই গিরীন তার কাছে এসে শোনাচ্ছে তার বউয়ের মানুষের সমানে বার হবার উপযুক্ত কাপড়ের অভাবের কথা। তার প্রায় পিছু পিছুই বউটি ঘরে ঢুকেছে। মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে রায় বাহাদুরের। তার ভয় করে।

ও, তুমি এসেছ, গিরীন বলে নির্বিকার ভাবে, এইখানে শুইয়ে দাও।

রায় বাহাদুরের উলের মোজা আর পালিশ-করা দামি চকচকে জুতো পরা পায়ের কাছে মেঝেটা সে দেখিয়ে দেয়। বউ তার ইতস্তত করে, বড়ো বড়ো জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তার মুখের দিকে। এত শীর্ণ বউটি, এমন শুকনো বিবর্ণ তার রক্তশূন্য মুখ, কিন্তু তার রূপ দেখে ভেতরে ভেতরে মুচড়ে যায় রায় বাহাদুর। তার বাড়ির মেয়েরা, ফুলি ঝিটা পর্যন্ত, যেন শুধু মেদ আর মাংস। গিন্নির কথা ধর্তব্যই নয়, তিনি প্রায় গোলাকার। তার মেজো মেয়ে আর মেজো ছেলের বউ রোগা ছিপছিপে, বড়ো ছেলের বউটাও ছিপছিপে ছিল বিয়ের সময়, আজকাল মুটোচ্ছে। গিরীনের ক্ষীণাঙ্গী বউটির সঙ্গে মিলিয়ে রায় বাহাদুর বুঝতে পারে, তার মেয়ে-বউদের গড়নটাই শুধু ছিপছিপে, অতি বেশি মেদ-মাংসেই তারা গড়া, প্রত্যেকে তারা তার গিন্নিরই সূচনা। সত্যিকারের রোগা ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে দেখতে এত ভালো লাগে রায় বাহাদুরের, এত তাঁর ইচ্ছা করে টিপে-টুপে ছেনে-ছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে!

কি করছ ?—গিরীন বলে বউকে অনুযোগ দিয়ে, ওখানে শুইয়ে দাও। উনি পায়ের ধুলো ছোঁয়াবেন, আশীর্বাদ করবেন, ওষুধ দেবেন।

না ! না ! রায় বাহাদুর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, আমি ওকে ওষুধ দিতে পারব না। ওর ভালো চিকিৎসা দরকার। ওকে তুমি ডাক্তার দেখাও, ভালো ডাক্তার দেখাও।

বিনা ফি-তে কোন ডাক্তার দেখবে বলুন ? গিরীন যেন আমোদ পেয়ে মুচকে মুচকে হাসে।

ভয় করে রায় বাহাদুরের। মাথাটা আবার ঝিম-ঝিম করে ওঠে। কতক্ষণ খেলা করবে গিরীন তার সঙ্গে কে জানে, তারপর এই বর্বর নিষ্ঠুর খেলার শেষে কী করবে তাই বা কে জানে। এরা বিপ্লবী, এরা খুনে, এরা সব পারে। শশাঙ্কর জামাই বলে, তার স্কুলের একজন টিচার বলে বিশ্বাস করে একা একা এই ছদ্মবেশী গিরীনের খপ্পরে এসে পড়ে কী বোকামিটাই সে করেছে।

সব অবস্থাতেই যে ভাবেই হোক নিজেকে বাঁচানোর কৌশল খুঁজে বার করে কাজে লাগানোর চেষ্টা রায় বাহাদুরের মজ্জাগত। রায় বাহাদুর মাথা হেঁট করে থাকে কয়েক মুহূর্ত, সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করে। হাতের তালুতে মুছে নেয় নিজের কপাল। তারপর মুখ তুলে বলে।—

মা, খোকাকে শুইয়ে দাওগে। কিছু তুমি ভেবো না মা। বউমাই বলি তোমাকে, গিরীন আমার ছেলের মতো। তোমার কোনো ভাবনা নেই বউমা, ছেলে তোমার ভালো হয়ে যাবে, আমি তোমার ছেলের চিকিৎসার ভার নিলাম। আমি এখুনি গিয়ে বোস ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

এখুনি যাবেন ? তা হবে না, ফল-টল একটু মুখে না দিয়ে গেলে বড়ো কষ্ট হবে আমাদের মনে। অকল্যাণ হবে আমাদের। আপনার মতো মানুষ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—

গিরীনের বিনয়ে বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে রায় বাহাদুরের। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পায়ের চকচকে জুতোর দিকে। অতি কষ্টে বলে, বেলা মন্দ হয়নি। নিমন্ত্রিতেরা আর কেউ—?

আজ্ঞে বলিনি আর কাউকে। ইচ্ছা ছিল বলবার, ভেবেছিলাম ওনার হাতের যে দুগাছা চুড়ি আছে তার একটা বেচে দিয়ে কয়েক জনকে বলব, স্কুল-মাস্টারের স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলেই ঢের। তারপর ভাবলাম, ছেলের মুখে ভাতে শেষ সম্বলটুকু খোয়াবো, তার চেয়ে বরং সম্বলটা থাক, ও-মাসেও পুরো মাইনে না পেলে উপোসটা ঠেকানো যাবে।

বুড়ো হলেও বুদ্ধির ধার একেবারে পড়ে যায়নি রায় বাহাদুরের। জীবনে উঠতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছে অনেকবাব, নিজে বুদ্ধি খাটিয়েই নিজের মুশকিল আসান করেছে। আজকের বিপদের ধরনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এটাই হয়েছে ফ্যাসাদ। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছেন না গিরীনের। নিজের দুর্দশা চোখে দেখিয়ে তার দয়া জাগাবার সাধ থাকলে চোখে এ ভাবে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি কেউ তা দেখায়, পাগল ছাড়া ? তাকে বিরক্ত করে, চটিয়ে, এমন টিট্‌কারি দেওযার ভঙ্গিতে দেখায়, এমন উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে ? কাল টিচারদের সভায় কিছু না বলে গিরীন যেন ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি টেনে এনে বাস্তব প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার বক্তৃতাব, ব্যঙ্গ করছে তাকে। কিন্তু কেন করছে সেটা তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রায় বাহাদুরের ! তার স্কুলের একজন টিচার কী এত বড়ো গাধা যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না এ ভাবে তার কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ আদায় করা যায় না, এতে বরং তারই বিপদ, সমূহ বিপদ ?

মুখের ভাবে গলার সুরে সহানুভূতি আনবার চেষ্টা করে রায় বাহাদুব বলে, তোমাব অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশন দিয়ো, ও মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। তুমি ভালো পড়াও শুনেছি। আর বাকি মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।

গিরীন ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলে, তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের মুখেভাতের ছলে আপনাকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার !

চোখের পলক পড়া আটকে যায় রায় বাহাদুরের, ঢোঁক গিলতে গিয়ে দেখে সেটাও আটকে গেছে। ঘরের যে অসীম দৈন্য ভিখারির সকরুণ আবেদনের মতো এতক্ষণ তাকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা দাবিদারের শাসানির মতো ফুঁসে উঠেছে। উঠানে তিনটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে খেলা করছে ধুলামাটি নিয়ে, খেলা যেন ছল ওদের, রায় বাহাদুরকে ওরা অবজ্ঞা জানাচ্ছে। ও ঘরে জ্বরো ছেলেটার কান্না ঝিমিয়ে এসেছে কিন্তু সেও যেন দেখাল রায় বাহাদুরকে, কান্না নিস্তেজ হয়ে আসা যেন ঘোষণা বাচ্চাটার যে কান্না সে চিরতরে থামিয়ে দেবে, সে মরবে, মরে দায়ি করে রেখে যাবে তাকে !

তাকে আরও শাসানো দরকার বলেই যেন গিরীনের পরিবারের আরও দুজন এবার আসরে নামে। প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একটি কুমারী মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে।

দ্যাখ গিরীন দ্যাখ, ধেড়ে মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ। ডাল ধুতে দিয়েছি, লুকিয়ে কাঁচা ডাল চিবোচ্ছে !

গিরীনের মা থেমে যান, জিভ কাটেন। মেয়েটি পালিয়ে যায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে। এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মা-ও সরে যান।

আমি এবার উঠি গিরীন।

একটু বসুন।

গিরীন বেরিয়ে যায়। গিরীন ফিরে আসবার একটু পরে সেই চুপি-চুপি ডাল-খাওয়া মেয়েটি একটি রেকাবিতে দুটি সন্দেশ, একটি কলা, কয়েক টুকরা আপেল ও শশা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে আসে। বাঙালি গেরস্ত ঘরের হিসাবে বিয়ের বয়স তার পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। মেয়েটি রোগা, পুষ্টি অভাবে সত্যিকারের রোগা। সত্যিকারের রোগা মেয়ের দিকে তাকাবার মোহ্ কিন্তু তখনকার মতো কেটে গিয়েছিল রায় বাহাদুরের। নীরবে সে দু-এক টুকরা ফল মুখে দিতে থাকে।

বৈঠকখানা দিয়ে যাবাব সময় চৌকির প্রান্তের জরাজীর্ণ মানুষটি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। রায় বাহাদুর এক নজর দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যায় বাইরে।

সোমবার গিরীন নোটিশ পায় বরখাস্তের। নোটিশ সে প্রত্যাশা করছিল। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিত রায় বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায় বাহাদুর ভুলতে পারবে না, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা। দয়া-মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।

ছিনিয়ে খায়নি কেন

দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি। কেন জানেন বাবু ?

একজন নয়, দশজন নয় শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বরবাদ হয়ে গেছে। ভিক্ষের জন্য হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কুত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই কবে ময়লার ভুর হাতড়েছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্য, কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়নি। অথচ হাত বাড়ালেই পায়। দোকানে থরেথরে সাজানো রয়েছে খাবার, সামনে বাস্তায় ধন্না দিয়েছে ফেলে দেওয়া ঠোঙার রসটুকু, খাবারের কণাটুকু চাটবার জন্যে। হাটবাজারে রয়েছে ফলমূল তরিতরকারি, দোকানে আড়তে চাল-ডাল তেল-নুন, লুকানো গুদোমে চালের পাহাড়, বড়োলোকের ভাঁড়ারে দশ-বিশবছরেব ফুড-ফুড কথাটা চালু হয়েছে বাবু আপনাদের কল্যাণে, ভোঁৎকা গায়ের হোঁৎকা তাঁতিও জানে কথাটা আর কথাটার মানে। গরিবের মুখে না উঠে যে চাল-ডাল তেল-নুন গুদোম থেকে গুদোমে কেনাবেচা হয়ে চালান যায়, তাকে বলে ফুড। হাঁ, মাছ-মাংস, দুধ-ঘিও ফুড বটে। দশটা জিনিসেব দশটা নাম বলতে লিখতে কষ্ট বলে আপনারা ফুড চালিয়েছেন, চেঁচিয়েছেন, ফুড সমস্যার বিধান চাই। তা, অত কষ্টে কাজ কী ছিল। ফুড না বলে চাল বললেই হত। শুধু চাল—কাঁড়া, আকাঁড়া, পোকায় ধরা, যেমন হোক চাল। মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, তেল-নুন এ সব দশটা জিনিস তো চায়নি যারা না খেয়ে মবেছে ' শুধু দুটি চাল দিলে হত তাদের, ফুডের জন্য মাথা না ঘামিয়ে। গাছে পাতা আছে, জঙ্গলে কচু আছে। তারা মরত না। রোজ দুটি আসেদ্ধ শুকনো চাল চিবিয়ে খেলেও মানুষ মরে না। আপনি মানবেন না, কিন্তু সত্যি মরে না বাবু। যত কেলিয়ে যাক, ধুকধুক প্রাণডা নিয়ে জীয়ন্ত থাকে।

চালার বাইরে খেতখামার আম-জাম-কাঁঠাল ঘেরা খড়ো ঘরগুলিতে বেলা শেষের ছায়া গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যায়। উবু হয়ে বসে আনমনে যোগী জোর টানে তামাকের ধোঁয়ায় বুক ভবে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা বার করে দিতে থাকে। সামনেই টানছে তামাক, আড়াল খোঁজেনি, একটু পিছু ফিরে বা একটু ঘুরেও বসেনি। এটা লক্ষ করবার বিষয়। তামাক সেজে আগে অবশ্য আমাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাতে থেলো হুঁকোটা ধরে, বাঁ হাতে সেই হাতের কনুই ছুঁয়ে থেকে। জলহীন হুঁকোয় অত কড়া তামাকের তপ্ত ধোঁয়া টানবার ক্ষমতা প্রথম বয়সে ছিল, এখন আর পারি না। সিগারেট ধরিয়ে যোগীকেও একটা অফার করেছিলাম। মৃদু হেসে সিগারেটটা নিয়ে সে গুঁজেছিল কানে।

শুনেছিলাম সে নাকি নামকরা ডাকাত, তার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। যে বকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারাটা মোটেই মেলেনি তার সঙ্গে। বেঁটে-খাটো লোকটা, শরীরটা খুব শক্তই হবে, আর কিছুই নয়। বাবরি-ছাঁটা ঝাঁকড়া চুল পর্যন্ত নেই। জেলে হয়তো ছেঁটে দিয়ে থাকবে কদমছাঁটা করে, এখনও বড়ো হবার সময় পায়নি। এ দেশের রণ-পা চড়া, লাঠি ঘুরিয়ে বুলেট ঠেকানো, নোটিশ দিয়ে ধনী জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করতে যাওয়া বড়োলোকের ওপর ভীষণ নিষ্ঠুর, গরিবের ওপর পরম দয়ালু, খেয়ালি, ধূর্ত, উদার বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনিতে তাদের বিবাট দেহ আর অদ্ভুত অমানুষিক শক্তির কথা পড়েছি। যাদেব ভীষণ আকৃতি দেখলেই লোকের দাঁতকপাটি লাগত, হুঙ্কার শুনলে কয়েক মাইল তফাতে গর্ভপাত হত স্ত্রীলোকের। বড়োলোকের টাকা লুট করে তারা গরিবকে বিলিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথেঘাটে মুমূর্ষুর, সুযোগমতো চুরি ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে শোনা যায়। সাতকোশী খালে সরকারি চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু বছর জেল হয় তার।

যোগী কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে বুঝে মনে করিয়ে দিলাম, মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি কেন—যে কথা বলছিলে।

ও, হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ। আমি জানি কেন ছিনিয়ে খায়নি, শুধু আমি, এক মাত্তর আমিই জানি। কেউ জানে না আর। আপনার মতো অনেক বাবুকে শুধিয়েছি, তারা সবাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এটা সেটা বলেন, বড়ো বড়ো কথা। আবোল তাবোল লম্বা চওড়া কথা। আসল ব্যাপারে সেরেফ ফাঁক। বোঝেন না কিছু, জানেন না কিছু বলবেন কী। এক বাবু বললেন, বেশির ভাগ তো গরিব চাষি, নিরীহ গোবেচারা লোক, কোনো কালে বেআইনি কাজ করেনি। লুট করে কেড়ে নিয়ে খাবার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। শুনলে গা জ্বলে না বাবু ? সাধ যায় না চাঁছা গালে একটা থাপড় দিয়ে কানড়া মলে দিতে ? বেআইনি কাজ, বেআইনি ! যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেব করেছে কাজটা আইনি না বেআইনি, ছিনিয়ে খেলে তাকে পুলিশ ধরবে, তার জেল হবে। জেলে যেতে পারলে তো ভাগ্যি ছিল তার। মেয়ে বউকে ভাড়া দিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, সুযোগ পেলে তার চেয়ে কমজোরি মরো মরো সাথির গলা টিপে মেরে ফেলছে যদি একমুঠো খুদ জোটে, তার কাছে আইন ! আরেক বাবু বললেন, ওটা কী জান যোগী, ওরা সব মুখ্যু গরিব, চাষাভুসো মানুষ, অদেষ্ট মানে। না খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান, উপায় কী- এই ভেবে মরেছে না খেয়ে, লুটেপুটে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেনি। শুনেছেন বাবু কথা, হাড় জ্বালানি পণ্ডিতি কথা ? সাপে কাটে, রোগে ধরে, আগুন লাগে, বন্যা হয়, আকাল আসে সব অদেষ্ট বটেই তো, কে না জানে সেটা ? তাই বলে সাপে কাটলে বাঁধন আঁটে না, ওঝা ডাকে না ? রোগে বদ্যি পাঁচন, শিকড়-পাতা খায় না, মানত করে না ? ঘরে আগুন লাগলে দাওয়ায় বসে তামুক টানে ? ফসল বাঁচাতে যায় না বন্যা এলে ? আকাল অদেষ্ট বলে কেউ ঘরে বসে হাত পা গুটিয়ে মরেছে একজন কেউ ওদের ? যা কিছু আছে বেচে দেয়নি বাঁচার জন্যে, ছেলেমেয়ে, বউ, বোন শুদ্ধ ? ছুটে যায়নি শহরে, বাবুদের বিলিফখানায় ? অদেষ্ট মানে, হ্যাঁ, অদেষ্টে মরণ থাকলে মরবে জানে, হ্যাঁ তাই বলে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারলে চেষ্টা করে দেখবে না একবারটি ? আরেক বাবু বললেন—

বাবুরা কী বলেন জানি যোগী। তোমার কথা বলো।

শোনেন না বাবু মজার কথা, হাসি পাবে শুনলে। বললেন কী ? না, আধপেটা খাওয়া, উপোস দেয়া ওদের চিরকেলে অভ্যাস। ঘটিবাটি, জমিজমা সে চিরজন্মোই বেচ আসছে পেটের জন্যে। আকাল তো ওদের লেগেই আছে বছর বছর। বলতে বলতে গলা স া ধরে এসেছিল তেনার, দুঃখীর তরে দরদ ছিল বাবুর। নাক ঝেড়ে, গলা খাঁকরে তারপর বললেন, বড়ো আকাল এল, ওরাও এইভাবে লড়াই করল বাঁচতে, চিরকাল যেমন করে এসেছে, ঘরে ভাত না থাকলে যা করা ওদের অভ্যেস। আমি বললাম, তা নয় বুঝলাম বাবু, না খাওয়াটা ওদের অভ্যেস ছিল। কিন্তু মরাটাও কি অভ্যেস ছিল বাবু ?

যোগী হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে। বুঝতে পারি অনেকবার অনেককে শোনালেও এই পুরানো মর্মান্তিক রসিকতার রস তার কাছে জলো হয়নি।

বললাম, ধরুন একটা দোকান, তাতে কিছু চাল আছে। লোক মোটে দুটো কী তিনটে দোকানে। সাতদিন উপোস দিয়ে আছে এক কুড়ি দেড় কুড়ি লোক, জানে যে চাল কটা পেলে বাঁচবে নয় তো মিত্যু নির্যাস। অত সব নয় নাই জানলো, পেটে তো খিদে ডাকছে। হানা দিয়ে চাল কটা ছিনিয়ে নিলে ঠেকাবার কেউ নেই। তা না করে ফেউ ফেউ করে শুধু ভিক্ষে চাইল কেন ওরা ? দোকানি দূর দূর করে খেদিয়ে দিতে আবার গেল কেন অন্য জায়গায় ভিক্ষে চাইতে ? এমন কত দেখেছি, সহজে ছিনিয়ে নেবার খাসা সুযোগ কিন্তু ছিনিয়ে না নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে দয়া চেয়েছে, না পেয়ে মরেছে। বাবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দিলেন। সেই অভ্যেসের কথা, দশজনে মিলে দল বেঁধে লুট

করতে কি ওরা জানত, না কথাটা ভাবতে পেরেছে, খুদকুড়ো নিয়ে বরং মারামারিই করছে নিজেদের মধ্যে। আসল কথাটার জবাব নেই। জানলে তো বলবেন ? জবাবটা জানি আমি। শুধু আমি। আর কেউ জানে না। তবে বলি শুনুন।

ডাকতেছ ?

ঘরের ভিতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটি প্রদীপ জ্বলতে সেদিকে নজর পড়েছিল। প্রদীপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল কালাপেড়ে কোরা শাড়ি পরা ঢ্যাঙা একটি যুবতি। মনে হল, যোগীব উদ্ধার করা মেয়েদের একজন নয় তো ? তার পরেই খেয়াল হল, যোগী প্রায় দু বছর জেলে কাটিয়ে মোটে মাস তিন চারেক আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

তামাক দে।

প্রদীপটা চৌকাটে বসিয়ে দিয়ে সে তামাক সাজতে গেল।

আমার পরিবার, যোগী বল্‌ল, হারিয়ে গেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এক মাস দেড়মাস ধরে খুঁজে খুঁজে বার করেছি সদরে।

ব্যাপারটার ইঙ্গিত বুঝে চুপ রইলাম। বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে প্রায় গোটা চাঁদটার জ্যোৎস্না তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যা বলছিলাম বাবু। সর্বোনাশা দিনগুলির কথা জানেন তো সব, নিজের চোখে দেখেছেন সব। আপনাকে বলতে হবে না বন্ননা করে। আমি তখন হকচকিয়ে গেছি। না খেয়ে লোক পথেঘাটে মরছে দেখে মনে বড়ো কষ্ট। আর গায়ে বড়ো জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, সা জোতদার, নন্দ আড়তদার, সবকাবি কত্তা করিম সায়েব, পুলিনবাবু এদের কাণ্ডকারখানা দেখে এলাম। কোলকাতা গিয়ে পর্যন্ত কাটিয়ে এলাম সাতদিন, সাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। বুঝি না ব্যাপারটা কিছু, যত ভাবি মাথা গুলিয়ে যায়, অন্নের তো অভাব কিছু নেই, এত লোক মরে কেন ছিনিয়ে না খেয়ে ? গোরু ছাগল তো মাঠে ঘাস না পেলে খেতে ঢোকে, মার খেয়ে নড়তে চায় না সহজে, বাগানে ফুলগাছ খায়, ঘরের চালা থেকে খড় টেনে নেয়। এগুলো মানুষ হয়ে করছে কী ? ধানচাল লুট করি দু-এক জায়গা, বিলিয়ে দি এদিক ওদিক, মন মানে না। একা আমি দু-চারজনকে নিয়ে নিয়ে লুটেপুটে কটাকে খাওয়াব ? বাঁধা দল আমার ছিল না বাবু কোনোকালে, পেশাদার ডাকাত আমি নইকো, যাই বলুক লোকে আর পুলিশে আমার নামে অকথা-কুকথা। আপনার কাছে লুকোব না, মাঝে মাঝে দল গড়ে হানা দিয়ে লুট করেছি টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি, মারধোর করেছি, কিন্তু মানুষ একটা মারিনি বাপের জন্মে, বাপ বাপ যদি জন্মো দিয়ে থাকে মোকে। কাজ ফতে করে দল ভেঙে দিয়েছি ফের। টাকা পয়সার বদলিতে ধানচাল লুটের জন্য দল একটা গড়তে চাইলাম, স্যাঙাতেরা কেউ স্বীকার পেল না দুজন ছাড়া। ডাকাতি করব সোনাদানার বদলে ধানচালের জন্যে, তাও আবার বিলিয়ে দেব, শুনে ওরা ভাবল হয় মাথাটা মোর বিগড়ে গেছে একদম, নয় তামাশা করছি ওদের সাথে। দুজন যারা এল, তারা ছোকরা বয়সি, ওস্তাদ বলে মোকে মানত। দুজনকে নিয়ে মোটা দাঁও কী মারব বলুন, ছুঁকছাঁক দু-দশ মন আলতো পেলে কেড়েনি, বিলোতে গিয়ে শুরু করতে না করতে ফুরিয়ে যায়। দেশ জুড়ে সবার পেটের চামড়া চামচিকে, ক জনকে দেব আমি ? ভাবলাম দুত্তোর ! এ শখের কের্দানি দেখিয়ে আর কাজ নেই। মোর দু মুঠো বালির বাঁধে কি এই মড়কের বন্যা ঠেকানো যাবে ? তার চেয়ে এক কাজ যদি করি তবে হয়তো ফল হবে কিছুটা। না খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে। নিজের পেট ভরাবার ব্যবস্থা নিজে যদি না ওরা করতে পারে, আমার গরজ ! না, কি বলেন বাবু ?

সদরের মন্দ বস্তি থেকে খুঁজে উদ্ধার করে আনা যোগীর পরিবার ফুঁ দিতে দিতে কল্কে এনে দেয়। কল্কের আগুনে লালিয়ে লালিয়ে ওঠা তার ভোঁতা লম্বাটে মুখে মন্দ মেয়ের বস্তির জীবনের কোনো ছাপ চোখে পড়ে না, বরং শান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভর খুঁজে পাই।

সেই থেকে বসে আছেন, যোগী বলে কল্কেটা হুঁকোয় বসিয়ে তার পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে কথা শেষ হবার অপেক্ষায়, একটু চা দিয়ে যে ভদ্রস্থতা করব তার ব্যবস্থা নেই গরিবের ঘরে। দুটো চিড়ের মোয়া খাবেন বাবু, নতুন গুড়ের টাটকা মোয়া ?

ভদ্র অতিথিকে নিয়ে তার বিপন্ন ভাব অনুভব করে বলি, খাব না ? এতক্ষণ বলতে হয় ! জোর খিদে পেয়েছে, আমি ভাবছি কি ব্যাপার, মুড়ি-চিড়ে কিছু কি ঘরে নেই যোগীর, খেতে বলছে না। যোগীর পরিবারের হাসিটা আধা আধা দেখতে পাই প্রদীপের আলোয়।

সদরে রিলিফখানা খুলেছে, খিচুড়ি বিলি করে। সটান গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। সেজেগুজে গেলাম, ছেঁড়া নেংটি পরে, উদলা গায়ে, মোচদাড়ি না কামিয়ে। তবু অন্নের অভাব তো ভোগ করিনি একটা দিন দু-চারবছরেব মধ্যে, ও সব কাঁকলাসের সাথে কি মিশ খায় মোর ! আড়চোখে আড়চোখে তাকায় সবাই, ভাবে যে এ আবাব কোত্থেকে এল। ঝোলের মতো ট্যাকটেকে পাতলা খিচুড়ি যে বিলোয় সে ব্যাটাচ্ছেলে মোকে দেখলেই বলে হারামজাদা তুই এখানে কেন, খেটে খাবি যা ! মেয়েছেলে দু একটা দেখেশুনে ভাব জমাতে চেষ্টা করে মোব সাথে, ভাবে যে মোর বুঝি সঙ্গতি আছে অন্তত দু-চারবেলা খাবার—চুপিচুপি শার্ট গায়ে দিয়ে ধুতি পরে শহর ঢুঁড়তে বেরুবার সময় হয়তো বা দেখে ফেলতে পাবে। কান্না পেত বাবু মেয়েছেলে কটাব রকম দেখে। মেয়েছেলে ! হাড়ে জড়ানো সিঁটে চামড়া, তাতে ঘা-প্যাঁচড়া। আধওঠা চুলের জট খ্যাপার মতো চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গর মতো শুকনো বোঁটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মতো খোঁচানো হাড্ডি। আর কী দুর্গন্ধ গায়ে, পচা ইঁদুর, মরা সাপের মতো। তাদের চেষ্টা পুরুষের মন ভুলিয়ে একটা বেলা একটু খাওয়া জোগাড় করা পেট ভবে !

যোগী গুম খেয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পরিবার ডালায় আট-দশটা চিড়ার মোয়া আর ছোটো-খাটো নৈবিদ্যের মতো নারকেল নাড়ু সাজিয়ে এনে আমার সামনে ধরে। পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাঙা ছিপছিপে—তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাঁজে ছোটো নিটোল মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।

মারাত্মক গুম খাওয়া ভাবটা কেটে যায় যোগীর ওর দিকে তাকিয়েই।

বলে, বাবুকে কি বাক্ষস ঠাওরালি নাকি, আঁ ? দুটো মোয়া, দুটো নাড়ু রেখে তুলে নিয়ে যা সব। গেলাস নেই তো কী হবে, ঘটিটা মাজা আছে, টিউবওয়েলের জলের কলসি থেকে জল এনে দে ঘটিতে। একটু থেমে বিনয়ের সুবে হঠাৎ অন্য একটা কৈফিয়ত সে বলে তার পরিবারকে, মাছ আর আজ আনা হল না, বিন্দি।

মাছের তরে মরছি ! বিন্দি এতক্ষণে এবার প্রথম মুখ খোলে ঝংকার দিয়ে।

সবাইকে বলি, ছিনিয়ে নিয়ে খাও না ? এসো আমরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়ে খাই। ব্যাপার বুঝছো তো, মোদের খিচুড়ি ভোগের জন্যে যে চাল-ডাল আসে তাও বেশির ভাগ চোরাগোপ্তা হয়ে যায়, নইলে খিচুড়ি এমন নুনজলের মতো লাগে ? এমনিও মরব, ওমনিও মরব, এসো বাঁচার তরে লড়াই করে মরি। কত্তারা ভোজ খাবেন, মোরা না খেয়ে মরব ! কেড়ে খাই এসো। এমনি ভাবে কত করে কত রকমে বুঝিয়ে বলি, কেউ যেন কান দেয় না কথায়। কান দেয় না ঠিক নয়, কানে যেন যায় না কথা। ঝিমোতে ঝিমোতে বলে, আঁ, আঁ, কি বলছিলে ? বলে আবার ঝিমোয়। জলো খিচুড়ি এক চুমুক খাবার খানিক পরে যদি বা কেউ কেউ একটু উৎসাহ দেখায়, একটু জ্বালা জানায় যে সত্যি এত অন্ন থাকতে তারা না খেয়ে মরবে এ ভারী অন্যায়—বিকালে তারা নিঝুম হয়ে যায়। রিলিফখানায় সারি দিতে আগুপিছু নিয়ে কামড়াকামড়ি করে, ছোটো এক মগ সেদ্ধ চাল-ডালের ঝোলের জন্যে—ছিনিয়ে নিয়ে পেট ভরে ডালভাত খাবার জন্যে কারও উৎসাহ দেখি না।

একদিন খপর পেলাম, রিলিফখানার জন্যে মোটা মতো সরকারি চালান আরেকটা এয়েছে অ্যাদ্দিন পরে, সাতদিন কেন পুরো আধ মাস সত্যিকারের ঘন খিচুড়ি বিলোনো চলবে। কিন্তু দেখে শুনে তখন অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে বাবু। যত চালান আসুক, একটা দিনের বিলানো খিচুড়িও সত্যিকারের খিচুড়ি হবে না, চাল-ডাল বেশির ভাগ চলে যাবে চোরাবাজারে। সদরে জানা চেনা লোক ছিল কটা। মানে আর কী, আপনার কাছে ঢাকঢাক গুড়গুড় করব না, শহরের চোর, ছ্যাঁচড়, গুন্ডা, বজ্জাত, চোর-গোপ্তা ছোরা মারা গোছের লোকের সর্দার কজন আর কী। ওপরওলাদের সাথে খাতির ছিল ওদের, ওদের ছাড়া চলে না সরকারি বেসরকারি বড়ো কত্তাদের চোরাকারবার। ওদের একজন একটা ব্যাপারে সাথে ছিল মোর কবছব আগে, বড়ো বাঁচান বাঁচিয়েছিলাম দু-দশবছরের জেল থেকে। একটু খাতির করল, খানিকটা মাত্তর। ওর মারফতে আব দু চারজনকে জড়ো করে, তারাও চিনত জানত মোকে, চাল চেলে, ভাঁওতা মেরে কাণ্ড কবিয়ে দিলাম একটা বেলের ইস্টিশানে। চাদ্দিকে হইচই পড়ে গেল। চালানি চাল-ডাল সব গেল রিলিফখানার গুদামে, শেষ বস্তাটি !

বলে না পিত্যয় যাবেন বাবু, পুরো চারটে দিন ঘন খিচুড়িব সাথে একটা করে আলুসেদ্ধ খেল ভিখিরির দলকে দল সবাই ! আদ্দেক লোককে দিতে না দিতে ফুরিয়ে গেল না খিচুড়ি, কেউ বলল না ধমক দিয়ে, ও বেলা আসিস, এখন ভাগ্ শালার ব্যাটা শালা। আর—এটাই আসল কথা মন দিয়ে শোনেন বাবু। ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কানে তোলেনি, দুটো দিন দুবেলা এক মগ ঘন চাল-ডাল আর একটা কবে আলুসেদ্ধ খেয়ে সকলে কান পেতে শুনতে লাগল আমাব কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। মুখেব গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বজ্জাতরা, কেড়ে নিতে হবে সব, পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে হবে দুবেলা। আমি যা বলি, সবাই সায় দিয়ে তাই বলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যায়। পরদিন যেন উৎসাহ আবও বেড়ে যায়। পরের দিন তাদেরই কজন নিজে থেকে আমার কাছে এসে বলে যে তারা গুদোম থেকে চাল-ডাল ছিনিয়ে নিতে রাজি, নিজেরা রেঁধে-বেড়ে খাবে। আমি অ্যাদ্দিন জপাচ্ছি তাদেব, আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে হবে কখন কী ভাবে কোথায় কী করতে হবে গুদোম থেকে মালপত্তর সব লুটপাট করে নিতে হলে।

কী বোকামিটাই করলাম সেদিন বাবু। ভাবলাম কী, এমন আবোল-তাবোল ভাবে নয়, মাঝে মাঝে তিন বন্দুকওলা জমিদারের বাড়ি হানা দেবার আগে যেমন ভাবে দল গড়েছি শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে, তেমনিভাবে এদেব গড়ে তুলব টাকা-পয়সা লুটতে নয়, ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কায়দা। এই না ভেবে পিছিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে দেওয়াটা কদিনের জন্যে। রাতারাতি মিলিটারি লরিতে চালান হয়ে গেল রিলিফখানার গুদোমের আদ্দেক মাল। পরদিন সেই রং কবা জলো খিচুড়ি।

তাতে যেন জোর বেড়েছে মনে হল সকলের দল বেঁধে ছিনিয়ে খাওয়ার সাধটার। মোকে ঘিবে ধরে শ দেড়েক মাগিমদ্দ বলতে লাগল, চলো না যাই, ছিনিয়ে আনি ধানচাল। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তড়পাতে লাগল।

বৈকুণ্ঠ সার গুদোমে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম। চালান দেবার ব্যাপারে কত্তাদের সাথে ভাগ-বাঁটোয়ারায় মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদোমে মাল শুধু জমছিল মাসখানেক। গুদোমটার হদিস-টদিস নিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দুটো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কীভাবে কী মতলব করেছি সার গুদোমের জমানো অন্ন ছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এলো না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদ্দিকের কম করে হাজারটা ভুখা মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চাকাচ্চাদের বাঁচবার উপায় হবে বললাম, সায় এলো কেমন মন-মরা ঝিমোনো মতোন।

পরদিন কেউ যেন কান দিল না আমার কথায়। জলো খিচুড়ি বাগাবার ভাবনায় সবাই যেন ফের আবার মশগুল হয়ে গেছে, আর কিছু ভাববার ক্ষেমতা নেই, মন নেই !

সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন। একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু চারদিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু দিন খেতে না পেলেই সেটা ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চয্যি কী। এ তো সহজ সোজা কথা। কেউ বোঝে না কেন তাই ভাবি। শাস্তরে বলেনি বাবু, অন্ন হল প্রাণ ? খেতে না পেলে গোরু দুধ দেয় না বলদ জমি চষে ? কয়লা না খেয়ে ইঞ্জিন গাড়ি টানে ? মহাভারতে সেই মুনির কথা আছে। না খেয়ে না খেয়ে তপ করেন, একদিন দ্যাখেন কী, গর্তের মুখে পুতুল মত জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ঝুলছে ঘাসের শিকড় ধরে, শিকড়গুলি দাঁতে কাটছে ইঁদুর। মুনি বললে, করছ কা তোমরা সব, ইঁদুরে শিকড় কাটছে দেখছ না, গর্তে পড়বে যে ধপাস করে ? খুদে খুদে লোকগুলি বললে, বাপু মোরা তোমার পূর্বপুরুষ। বংশ শুধু তুমি আছ। তুমি হলে এই শিকড়টা, যা ধরে মোরা ঝুলছি, হা দ্যাখো—নীচে নরক। শিকড় যিনি কাটছেন চোখা ধারাল দাঁত দিয়ে, তিনি হলেন ধম্মো মশায়। বিয়ে করো, পত্তুর জন্মাও, মোদের বাঁচাও নরক থেকে। মুনি ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে এক রাজার মেয়েকে, রাজভোগ খেয়ে পুষ্ট মেয়ে, চটপট ছেলে হবে, পূর্বপুরুষ উদ্ধার পাবে। বছর কাটে দুটো তিনটে, গব্‌ভো হয় না রাজার মেয়ের। মুনি চটে বলে, একী কাণ্ড বল তো বউ, তুমি বাঁজা নাকি ? রাজার মেয়ে বলে ঝংকার দিয়ে, নজ্জা করে না বলতে ? উপোস করে শুকনো কাঠি হয়ে উনি বনে গিয়ে তপস্যা করবেন, একরাত্তির খেতে শুতে বসবাস করতে পারবেন না বিয়ে করা বউয়ের সাথে যের বলবেন যে ছেলে হয় না কেন, বউ তুমি বাজা নাকি ? নজ্জা করে না ? না খেয়ে না খেয়ে নিজে বাঁজা হয়েছ, শক্তি নেই, খোমতা নেই, বউকে বাঁজা বলতে নজ্জা করে না ? কথার মানে বুঝে, তপস্যা করে যে সোজা কথা বোঝে নিয়ে মুনি ঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বিত্তি চায় রাজার কাছে। দুধ ঘি, লুচি মাংস, পোলাও কালিয়া খায় পেট ভরে যত খেতে পারে। বললে না পিত্যয যাবেন বাবু, এক বছরে ছেলে বিয়োয় মুনির বউ—

রাত হয়নি ? যেতে হবে না বাবুকে দেড়কোশ পথ ? যোগী ডাকাতের পরিবার এসে বলে।

মনে হয়, সত্য কী মিথ্যা জানি না মেয়েটার গড়ন এমন রোগাটে ছিপছিপে বলেই বোধ হয় আগামী মাতৃত্ব এতখানি স্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় তিন চারমাসের মধ্যে যোগী ডাকাতকে সে ছেলে বা মেয়ের বাপ করবেই। জ্যোৎস্নায় গেঁয়ো পথে চার মাইল দূরের স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, যোগী কী এতই বোকা, সে এত জানে আর এই সহজ সত্যটা জানে না খুব কম করেও কটা মাস অন্তত লাগে মেয়েমানুষের মা হয়ে ছেলে বা মেয়ে বিয়োতে।

আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর সাথে। আলের বাঁকে হোঁচট খাই, কাটা ধানের গোড়ার খোঁচায় ব্যথা পাই, কাঁচামাটির রাস্তায় উঠতে দেড় হাত নালায় পড়তে যাই। যোগী সামলে সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাবনিকাশ বিশ্লেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। স্বর্গ-নরক তার কল্পনায় আছে কী নেই সন্দেহ। বংশরক্ষায় সে মোটেই ব্যগ্র নয়। ইংরেজের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে খুঁজে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বউকে ফিরিয়ে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুশি হতে নারাজ যে বউ তার যে ছেলে বা মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের বাচ্চার, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা। আজেবাজে খেয়ালে—যে সব খেয়াল তাদেরই মানায়, তাদেরই ফ্যাশান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা বাপ ছেলে মেয়ে,—অনর্থক অখুশি হতে রাজি নয় মানুষ।

তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো ? যে ভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো। তারপর আর কোনো কথা আছে ?

একান্নবর্তী

চার ভাই, বীরেন, ধীরেন, হীরেণ ও নীরেন। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজো ভাই হীরেণ। সে কেরানি। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশো টাকার শুরুর গ্রেডে সরকারি চাকুরি পেয়েছে আর বছর। হীরেণ সাতান্ন টাকার কেরানি, যুদ্ধের দরুন পাঁচ-দশটাকা বোনাস এলাউন্স বুঝি পায়। হীরেণকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু শরম লাগে ভাইদের। চার ভাই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তবু।

বাপের তৈরি বাড়িটাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাজার করে রেঁধে বেড়ে, ঝি ঠাকুর রেখে, শুধু নিজেদের ভালোমন্দ সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে, তিনটি অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো তারা বাস করে। হঠাৎ টান পড়লে একটু চিনি, দু পলা তেল বা এক খাবলা নুন ধার নেওয়া হয়, এ সংসার থেকে ও সংসারে দান হিসাবে নয়। দু-চারদিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রেশনের বা কালোবাজারেব মাল আনা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত মাপে তা ফিরিয়ে দেওযা হয়। বড়ো দু ভাইয়ের বউদের তরফের কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিশেষ কোনো উপলক্ষে খাবার টাবার মাছটাছ এমন কোনো জিনিস যদি এত বেশি পরিমাণে আসে যে নিজেরা খেয়ে শেষ করবার আগেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়তিটা ভাগ করে দেওয়া হয়। হীরেণদেরও দিতে হয়। কেরানি বলে তার বউ এসেছে গরিব পরিবার থেকে, তার বাপের বাড়ির দিক থেকে কখনও কিছু আসে না পাঁচজনকে দেবার মতো, কখনও কিছু আসে না পাঁচজনকে দেখানোর মতো, কখনও আসবেও না, তবু উপায কী। এটাই আসল কথা তাকে নিয়ে লজ্জা পাবার। একেবারে অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো বাস করুক, বাস তো একই বাড়িতে, সবাই তো জানে সে তাদের ভাই, আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শি সকলে। সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কোনোমতেই।

বিশেষত বুড়ি মা আছেন হীরেণের দলে। প্রায়ই তিনি অসুখে ভোগেন, সর্বদা জপতপ নিয়ে থাকেন। খান তিনি নিজের খরচে, কিন্তু তাঁর দুধটুকু জ্বাল দেওয়া, দইটুকু পেতে রাখা, চাল ডাল তরকারিটুকু সিদ্ধ করে দেওয়া, এ সব করতে হয় হীরেণের বউকে। অসুখে বিসুখে ব্রতপার্বণে বাড়তি দরকারে অন্য বউদের ডেকে হুকুম দেন কিন্তু রোজকার খুঁটিনাটি সেবা গ্রহণ করেন শুধু হীরেণের বউয়ের কাছ থেকে। তাঁর রেশন কার্ডের মাল হীরেণ পায, মাসে দেড় মন দু মন কয়লার দাম তিনি দ্যান, ঠিকা ঝির আট টাকা বেতনের দু টাকা দ্যান আর সাধারণভাবে সংসাব খরচের হিঁসাবে দেন দশ টাকা।

হীরেণ ছাড়া সব ছেলের কাছে তিনি ভরণপোষণের মাসিক খরচও নিয়মমতো আদায় করেন কড়াকড়িভাবে। বীরেনের পশার বেশি, সে দেয় তিরিশ টাকা। ধীরেনের পশার হচ্ছে, সে দেয় কুড়ি টাকা। চাকরি হবার পর নীরেন বিশ বা পঞ্চাশ মা যা চাইতেন তাই দিত, আজকাল বড়ো বউয়ের পরামর্শে দায়টা মাসিক পাঁচিশ টাকায় বেঁধে দিয়েছে। নীরেনের বউ নেই। এখনও বিয়ে করেনি।

ভাইরা যখন ভাগ হয়, এক বাড়িতে উনান জ্বালাবার আয়োজন করে তিনটে, চটে লাল হয়ে গিয়েছিল নীরেন, লজ্জায় দুঃখে দাপাদাপি করে গালাগালি দিয়েছিল দাদাদের, বিশেষভাবে বড়ো দু জনকে। তখনও তার চাকরি হয়নি। তার খাওয়া পরা, পড়াশোনার খরচ দেওয়ার দায়িত্ব এড়াতে বিশেষ করে ভাইরা ভিন্ন হচ্ছে মনে করে আঁতে তার ঘা লেগেছিল। আরও তার পড়বার ইচ্ছা ছিল, বিলাত যাওয়ার কথাটাও নাড়াচাড়া করছিল মনে মনে। এ সময় এ রকম পারিবারিক বিপর্যয় ঘটাতে তার আঁতকে ওঠার কথাই।

হীরেণ তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, কেন, এ তো ভালোই হল ? রোজ বিশ্রী খিটিমিটি, ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। একটু দুধ, একটু করে মাছ, এই নিয়ে কী মন কষাকষি বলো তো ? দাদার আয় বেশি, তিনি ভালোভাবে থাকতে চান। মেজদার ভালো উপার্জন হচ্ছে তিনিও খানিকটা ভালোভাবে থাকতে চান। আমি সংসারে মোটে চল্লিশটা টাকা দিয়ে মজা করব, ওঁরা কষ্ট করবেন সেটা উচিত নয়। ভাই বলে কি কেউ কারও মাথা কিনেছে নাকি যে খাওয়া খাওয়ি কামড়া কামড়ি করেও একসাথে থাকতে হবে ভাই সেজে ? তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে সদ্ভাবে ভায়ের বদলে ভদ্রলোকের মতো থাকাই ভালো।

তোমার চলবে ?

চলবে না ? কষ্ট করে চলবে। তবে অন্যদিকে লাভ হবে। মাথা সেঁট করে থাকতে হবে না, যাই খাই খুঁদকুড়ো হজম হবে।

নিজে ভিন্ন হলেই পারতে তবে এতদিন।

অ্যাঁ ? হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে বিনা কথাটা হল এই যে– দুঃখী অসহায় গরিব কেরানি ভাইকে দয়া বা শ্রদ্ধা করে নয়, বড়ো দু ভাইয়ের ওপর নিদারুণ অভিমানের জ্বালায় নীরেন আরও পড়েশুনে আরও পরীক্ষা পাশ করে বড়ো কিছু হবার কল্পনা ছেড়ে চাকরির চেষ্টায় নেমেছিল। মার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হীরেণের সংসারে।

চাকরি হবার পরেও, দুশো টাকার শুরুর গ্রেডের সরকারি চাকরি হবার পরেও, প্রায় দু মাস হীরেণের সংসারে ছিল।

তিন সংসারের পার্থক্য ততদিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বড়োবউ পুলকময়ী আর মেজোবউ কৃষ্ণপ্রিয়া চটপট অদল বদল করে নিজের নিজের সংসার সেজে ঢেলে গুছিয়ে নিয়েছে। আগেকার সার্বজনীন ভাঁড়ার ঘরটা ভেঙে চুরে নতুন জানালা দরজা তাক বসিয়ে পুলক করে নিয়েছে ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো আলোবাতাস ভরা বড়ো আধুনিক রান্নাঘর। দেখে বুক ফেটে গেছে কৃষ্ণপ্রিয়ার আপশোশে। সে যদি চেয়ে নিত ভাঁড়ার ঘরটা রান্নাঘর করার জন্য। উনান টুনান বসানো নতুন তৈরি রান্নাঘরটা পেয়ে সে ভেবেছিল, খুব জেতা জিতে গেছে, ভাবতেও পারেনি দিন কয়েক বারান্দায় তোলা উনানে রান্নার কষ্ট সহ্য করে ভাঁড়ার ঘরটাকে এমন সুন্দর রান্নাঘর করা চলে। সেজোবউ লক্ষ্মীও তাকে ঠকিয়ে জিতে গেছে পুরানো নোংরা ঘরটা পেয়ে। মেঝেতে ফাটল আর গর্ত, কালি ঝুলি মাখা চুন বালি খসা দেয়াল, একটু অন্ধকার কিন্তু ঘরটা মস্ত বড়ো, মিস্ত্রি লাগিয়ে কিছু পয়সা খরচ করলে ওই ঘরখানা দিয়েই বড়ো বউকে হারানো যেত।

চাকর বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, পুলকময়ী ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে আর ছেলেমেয়েকে সাজায়, পাড়া বেড়ায়, নিন্দে করে কেরানি দেওর আর তার বউয়ের। ধীরেন বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, কৃষ্ণপ্রিয়া সস্তা চটকদার আসবাব ও শাড়ি কেনে বড়ো বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টায়, নিজের ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে, মেয়েটাকে সাজায়, অর্গ্যান বাজিয়ে গান করে, কেঁদেকেটে চিঠি লিখে ঘনঘন বড়োলোক মামা-মামি মামাতো ভাইবোনদের দামি মোটরে চাপিয়ে বাড়ি আনায় পাড়ার লোকের কাছে নিজেকে বাড়াবার জন্য, ফরসা রং আর থলথলে মাংসল যৌবনের গর্বে মাস্টারনির মতো পাড়ার মেয়েদের কাছে বর্ণনা করে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে বউয়ের শোচনীয় রূপের অভাব, বানিয়ে বানিয়ে যা মুখে আসে বলে যায় শাশুড়ি ননদ জা দেওরদের বিরুদ্ধে।

তবু, পুলকময়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না বলে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। যুদ্ধের বাজারে বীরেনের পশার বড়ো বেশি বেড়েছে, দু টাকার বদলে আট টাকা ফি করেও গাদা গাদা কল পাচ্ছে, ঘরে এনেছে দামি আসবাব, পুলককে দিয়েছে শাড়ি গয়না, মোটর কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড, জমি

কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড, জমি কিনে আয়োজন করছে বাড়ি করবার। ধীরেনেরও ওকালতিতে পশার বেড়েছে বেশ, তবে বীরেনের ডাক্তারি পশারের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

ভেবে চিন্তে কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়াল নীরেনের দিকে। মাসে চারশো পাঁচশো টাকা আনছে ছেলেটা মাইনে আর উপরিতে, বিয়ে করেনি, বউ নেই।

নীরেনও যেন তার হাত বাড়ানোর জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিল। হীরেণের সংসারের অশান্তি, উদ্‌বেগ আর অভাবের সঙ্গে একটানা লড়াই, মার গুমখাওয়া একগুঁয়ে সেকেলে ভাব, জীবনে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। প্রায়ই তাকে বাজার করতে হয়, প্রায়ই তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় রেশনের লাইনে, মার আবদার আর হুকুম সমানে চলেছে তারই ওপরে, আর যেন তার ছেলে নেই। তাছাড়া, সব বড়ো ভোঁতা, বড়ো নোংরা। বড়ো বউ আর মেজো বউয়ের প্রায় চার বছর পরে বউ হয়ে এসেছে লক্ষ্মী, তার ছেলে মেয়ের সংখ্যা ওদের দু জনের ছেলেমেয়ের সমান। সারাদিন সে শুধু রাঁধছে বাড়ছে ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, বুড়ি শাশুড়ির সেবা করছে, গাদা গাদা জামা কাপড় সিদ্ধ করছে, কপালকে দোষ দিচ্ছে, সর্বদা বলছে : মরলে জুড়োবো, তার আগে নয়। ঘর সংসার সে সাজায় গোছায় অতি যত্নে, পুরানো বাক্‌সো পেঁটরা, রংচটা খাটচেয়ার, ছেঁড়া কাপড়জামা, ময়লা কাঁথাকানি নিয়ে যতটা সাজাতে গোছাতে পারে। রান্নাঘর ধোঁয়ায় দু বেলা—নোংরা রান্নাঘর, এ ঘরে রান্না করা ডাল ভাত মাছ তরকারি খেতে ঘেন্না করে নীরেনের। খেতে বসলে আবার প্রায়ই পুলক বা কৃষ্ণপ্রিয়ার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে ঘি মাংস পেঁয়াজ এলাচের গন্ধ !

ঠাকুরপো, কাল তোমার নেমন্তন্ন। নিজে রেঁধে খাওযাব।

কৃষ্ণপ্রিয়া বললে একদিন হাসি মুখে। সহজে সে হাসে না, তার দাঁতগুলি খারাপ।

এমন অগোছাল কী করে থাক ঠাকুরপো ? ছি ছি, চারদিকে ঝুল, খাটের নীচে নরক হয়েছে ধুলো জমে। কী ছড়িয়ে ভাড়িয়ে রেখেছ সব। এতগুলো টাকা ঢালছ মাসে, ঘরটাও কি কেউ একটু সাফসুরুত করে দিতে পারে না তোমার ?

তখন তখন নিজের ঝিকে নিয়ে ঝুল ঝেড়ে ধুয়ে মুছে সাফ করে কৃষ্ণপ্রিয়া, ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আগে থেকেই সে ঠিক করে এসেছিল এটা সে করবে, নীরেন বুঝতে পাবে। স্নান করতে যাওয়ার ঠিক আগে এসেছে পরদিন খেতে বলতে। ধুলো ঘেঁটে ঝুল মেখে ঘর সাফ করে সাবান মেখে স্নান করবে। খুশিই হয় নীরেন টের পেয়ে। খাতির পেয়ে অসুখী হবার কী আছে !

খেয়ে আরও খুশি হয় নীরেন। সব রান্নাই প্রায় ঠাকুরের, দুটি বিশেষ জিনিস শুধু কৃষ্ণপ্রিয়া রেঁধেছে। লক্ষ্মীর কোনোমতে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দায়সারা একঘেয়ে রান্না নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেমেয়ের নোংরামি ঘাঁটা কোনো মানুষের রান্না নয়, অপরিষ্কার স্যাঁতসেঁতে ঘরে পুরানো মলিন পাত্রে মোটকাহীন মরচে-ধরা টিনের কৌটার মশলায় রান্না নয়। পরিবেশনে বারবার ব্যাঘাত নেই অন্য ঝামেলার, পরিবেশকের ভাবভঙ্গিতে নেই খাইয়ে দিয়ে আরেকটা হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার অধীরতা, পরিবেশক মাইনে করা ঠাকুর। বসে বসে ধীরে সুস্থে হাসিগল্পের সঙ্গে এক সাথে খাওয়া।

কৃষ্ণপ্রিয়া চালিয়ে যায় টানার আয়োজন, ও দিকে এতদিন পরে হীরেণ আর লক্ষ্মীর সঙ্গে নীরেনের বাধতে থাকে খিটিমিটি।

মাসের শেষে আরও কয়েকটা টাকা সংসারে দরকার হলে নীরেন বলে, আমি টাকা দিতে পারব না ! যা দিয়েছি আমার একার জন্য তার সিকিও লাগে না।

হীরেণ বলে, তা লাগে না। কিন্তু তুই একা মানুষ কী করবি অত টাকা দিয়ে ?

যাই করি না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে বাধে অন্যভাবে, অনেক ভাবে।

ছুটির দিন একটু দেরি করেও খেতে পারব না খুশিমতো ?

ঠাকুর রেখে দাও, যত খুশি দেরি করে খেও। চোখ নেই তোমার ঠাকুরপো ? দেখতে পাও না সেই কোন ভোরে উঠে জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছি ? দেড়টা বাজে, এখনও বলছ রান্নাঘর আগলে বসে থাকতে ?

আমি যে টাকা দিই—

টাকা দাও বলে বাঁদি কিনেছ আমায় ?

এই দোষ লক্ষ্মীর, খাতির করে না, এতগুলি করে টাকা নীরেন ঢালে তার সংসারে, তবু। হীরেণও যেন কেমন ভাব দেখায়, ঠিক ছোটো ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে তার সঙ্গে ! মাসে মাসে এতগুলি টাকা সাহায্য করে ওর সংসার সে চালু রেখেছে, একটু যে বিশেষ নম্রতার সঙ্গে একটু বিশেষ মিষ্টিসুরে কথা বলবে তার সঙ্গে সে চেষ্টাও নেই। মোটেই যেন কৃতজ্ঞ নয়, অনুগত নয় দু জনে। হাড়ভাঙা খাটুনি আছে, অভাব অনটন চিন্তাভাবনা আছে, ঝঞ্ঝাট আছে অঢেল, কিন্তু সেই জন্যেই তো তাকে বেশি করে খাতির করা উচিত। তার সাহায্য বন্ধ হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে ওরা কি ভাবে না ? এত ভাবে, এ কথাটা ভাবে না। নীরেন নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় ভেবে।

পরের মাসের পয়লা থেকে নীরেন ভিড়ে গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার সংসারে। হীরেণকে কিছু কিছু সাহায্য করবার ইচ্ছা তার ছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে সে ইচ্ছাকে ফাঁসিয়ে দিল। বুড়ি মাকে মাসে মাসে সে চল্লিশ টাকা দেবে ঠিক হয়েছে। বুড়ি কি খাবে ও টাকাটা ? হীরেণকেই দেবে। ও চল্লিশ টাকা এক রকম সে হীরেণকেই দিচ্ছে ! সোজাসুজি আরও দেবার কি দরকার আছে কিছু ? না সেটা উচিত ? ওরা তো যত পাবে ততই নেবে, কিছুতেই কিছু হবে না ওদের !

তলে তলে টাকা জমাচ্ছে ! বাইরে গরিবানা। বুঝলে না ঠাকুরপো ?

কৃষ্ণপ্রিয়াকে নিজের জন্য খরচের টাকা দিয়ে প্রতিদানে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা পেয়ে পুলক বোধ করে নীরেন। মাসে মাসে লক্ষ্মীর হাতে খরচের টাকা দিয়েছে, খরচ করে যা বেঁচেছে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছে, লক্ষ্মী নির্বিকারভাবে আঁচলে বেঁধেছে নোটগুলি, ব্যাঙ্কের লোকেরা যেন তাকে গ্রাহ্যও করেনি। কৃষ্ণপ্রিয়ার হাতে নোটগুলি দিতেই আনন্দে সে এমন বিহ্বল হয়ে যায় ! কথা বলতে গিয়ে এমন করে তোতলায় !

হেস্তনেস্ত যা হবার তা হল, পৃথিবী জোড়া মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে তাদের পারিবারিক যুদ্ধের পর্যন্ত। যার যা দখল সে তা নিয়েছে, যে যেভাবে যার সাথে বাঁচতে চায়, সে সেইভাবে তার সাথে বাঁচবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেনা জমিটাতে এবার বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবে ভাবছে বীরেন। ইট বালি চুন সুরকি পাওয়া যাচ্ছে, লোহা এবং সিমেন্টও পাওয়া যাচ্ছে তলায় তলায়, কিছু বাড়তি খরচ আর ধরাধরি করার বিশেষ চেষ্টায়। কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ে খুঁজছে নীরেনের জন্যে, বাংলা দেশে একটিও মেয়ে মিলছে না পছন্দমতো, মেয়েদের যেন মেয়ে রেখে যায়নি যুদ্ধটা। মা জপতপ কমিয়েছেন। ভাবছেন তীর্থে যাবার কথা। ডাক্তার জোর দিয়ে বলেছে, গাড়ির কষ্ট আর বিদেশের অনিয়ম তাঁর সইবে না, মরে যাবেন।

মরতেও পাব না আমি। এ হতভাগার জন্য মরবারও জো নেই আমার ! দুর্বল ক্ষীণস্বরে বুড়ি মা কাতরিয়ে আপশোশ করেন, হঠাৎ গুম খেয়ে আশ্চর্যরকম শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, আমি মরলে তো না খেয়ে মরবি তোরা, গুষ্টিসুদ্ধ ?

হীরেণ বাহাদুরি দেখায় না, ক্ষীণসুরে বলে, কেন অত ভাবছ বলো তো মা ? অত সহজে কি মানুষ মরে ? দুর্ভিক্ষে দ্যাখোনি, একটু খুদ একটু ফ্যান খেতে পেয়ে কত লোক বেঁচে গেছে ? তুমি

এখন মরলে যেটুকু ভদ্রভাবে বাঁচছি তা থাকবে না বটে, ভদ্রত্ব ছাড়লে কি মানুষ বাঁচে না তাই বলে ? চারটে ছেলেমেয়ের জন্য রোজ একপো দুধ, হপ্তায় দুদিন একপো মাছ, তাও নয় বন্ধ করব, রেশনের চাল আর চার পয়সার পুঁইশাক রেঁধে খাব। আমি বাঁচব, তোমার বউটা বাঁচবে, ছেলেমেয়ে কটাও বাঁচবে দেখো। তবে হ্যাঁ, এ কথা সত্যি, এ ভাবে বাঁচার কোনো মানে হয় না।

কী বললি ?

বললাম বাঁচা কষ্ট বলে কি সাহেবের গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরব ? সাহেবের টুঁটিটা কামড়ে ধরে মরব। অত ভাবছ কেন ? মরব না। কেউ আমরা মরব না।

বুড়ি মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, তীর্থে যাবার ছুতো করে এবার মরলে কেমন হয় ? ভাবতে ভাবতে সামান্য একটা অসুখ হয়ে চার ছেলের চেষ্টা বিফল করে, চৌষট্টি টাকা ফি-র ডাক্তারের ওষুধকে তুচ্ছ করে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি মারা গেলেন। তখন আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল হীরেণের অবস্থা।

পুলকময়ীর ও কৃষ্ণপ্রিয়ার শাড়ি গয়না ঠাকুর চাকর, নিশ্চিন্ত নির্ভর চালচলন, অবসর শৌখিনতা, ভালো ভালো জিনিস খাওয়া, হাসি আহ্লাদ করা সব কিছু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশা হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে লক্ষ্মীর মন। মনে সে এই ভাবনার মলম দিয়ে সামলে থেকেছে যে বেশ্যারা ও রকম সুখেই থাকে। স্বামী পুত্র বুড়ি শাশুড়ির জন্যে জীবনপাত করে খাটা, শাকপাতা ডাল ভাত পেটে গুঁজে কাজ করা, এ গৌরব ওরা কোথায় পাবে। নিজের মনে সে গজর গজর করছে, মরণ কামনা করছে শুধু গোপনে নিজেকে শুনিয়ে, হীরেণের ওপর ঝাঁঝ ঝেড়েছে শুধু স্বামীস্ত্রীর মধ্যে চিরদিনের চলিত দাম্পত্য কলহের মধ্যে।

কিন্তু এবার আর সইল না।

চারটি ছেলেমেয়ের দুটি বড়ো হয়েছে, তারা শাকপাতা ডাল-ভাত খেতে পারে, অন্য দুটিকেও তাই খাওয়ানো যায় কিছু কিছু, কিন্তু একটু তো দুধ চাই ? একপো দুধ আসত, সেটা বন্ধ হল। সপ্তাহে দুদিন মাছের আঁসটে গন্ধ নাকেমুখে লাগত, তা আর লাগে না। শেষ শায়াটা ন্যাকড়ার কাজে লাগাতে হয়েছে, কৃষ্ণপ্রিয়ার মতো থলথলে যৌবন না থাক সেও তো যুবতি, বয়স তো তার মোটে সাতাশ বছর, শায়াহীন ছেঁড়া কাপড়ে দেহ ঢেকে তাকে চলতে ফিবতে হচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই। কী এক কলকৌশল জেনেছে হীরেণ, অভয় দিয়ে বলছে যে ভয় নেই, আব ছেলে মেয়ে হবে না। এ সব কি সত্যি ? কখনও হতে পারে সত্যি মানুষের জীবনে ? এ সব ফাঁকি, এ সব যুদ্ধের বোমা, এ সব ভূমিকম্পের দিশেহারা পাগলামি, বাঁচতে হলে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে হবে, নইলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। ছাতের আলসের উঠবার সময় হীরেণ তাকে আটকায়। এত এলোমেলো কথার পর এত রাত্রে তাকে ছাতে যেতে দেখে আগেই সে খানিকটা অনুমান করেছিল।

আমি যদি মরি তোমার তাতে কী ? লক্ষ্মী বলে ঝাঁঝের সঙ্গে ছাড়া পাবার জন্য লড়তে লড়তে হীরেণের বাহুমূলে কামড় বসিয়ে দিয়ে। হীরেণ জানে লক্ষ্মীকে, ভালোভাবেই জানে, সে তার চারটি সন্তানের মা।

কাঁদো কাঁদো হয়ে সে বলে, তুমি খালি নিজের কথাই ভাবছ লক্ষ্মী।

চমকে থমকে যায় লক্ষ্মী। নিজের কথা ভাবছি ? আমি মরলেই তো তোমার ভালো।

ভালো ? তুমি মবলে আমি বাঁচবো ?

বাঁচবে না ? আমি মরলে তুমি বাঁচবে না ? দাঁড়াও বাবু, ভাবতে দাও।

বাঁচবে না ? সে হার মেনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরলে হীরেণও মরবে অন্য কোনো রকমে। তাই হবে বোধ হয়। যে কষ্ট আর তার সইছে না সেই কষ্ট তো লোকটা তারই সঙ্গে

সমানভাবে সয়ে আসছে আজ দশ এগারো বছর। তাই বটে। লোকটা অন্য সব দিকে অপদার্থ হোক, এই এক দিকে খাঁটি আছে।

আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে। কতকাল জেগে আছি বলতো ! একটু ঘুমবো আমি।

ঘরে ফিরে গিয়ে চাদরহীন তুলো গিজগিজ করা ছেঁড়া তোষকে হীরেণের বুকে মাথা রেখে সে জেগে থাকে। হীরেণের কথা শোনে।

সাতটা দিন সময় দেবে আমাকে লক্ষ্মী ? আমি বুঝেও বুঝিনি। যা করা দরকার করেও করিনি। মাছিমারা কেরানি তো। এই রকম স্বভাব আমাদের। যাই হোক, তুমি আমায় সাতটা দিন সময় দাও।

ওমা, কীসের সময় ?

তুমি কিছু করবে না, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়তে যাবে না—

আমি গিয়েছিলাম নাকি লাফিয়ে পড়তে ? লক্ষ্মী রাগ করে বলে, আমি যাইনি। কীসে যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।

সাতদিন সময় চেয়ে নেয় হীরেণ, কিন্তু ব্যবস্থা সে করে ফেলে একদিনের মধ্যে। লজ্জায় লাল হয়ে, দুঃখে ম্লান হয়ে লক্ষ্মী শুধু ভাবে যে, এত দুঃখের মধ্যে একটা খাপছাড়া পাগলামি করে বসে না জানি মনে কত দুঃখ বাড়িয়েছে সে লোকটার।

রাত নটায় হীরেণ বাড়ি ফেরে। কচু সিদ্ধ আর ঝিঙে চচ্চড়ি দিয়ে দুজনে এক সাথে বসে ভাত খেয়ে ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রাত এগারোটার সময়। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, কোথায় ছিলে ?

পাড়াতেই ছিলাম। রমেশ, ভূপেন আর কানাই আমারই মতো কেরানি, চেন তো ওদের ? ওদের বাড়িতে। ভালো কথা, কাল ভোরে ওদের বউরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

লক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।—বুঝেছি। তোমার তিন বন্ধুর তিন বউ আমাকে কাল বোঝাতে আসবে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়া কত অন্যায়।

না, ওরা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে আসবে, ওদেরও যাতে তেতালার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বার দরকার না হয়।

মোরগ-ডাকা ভোরে এল লতিকা, মাধবী আর অলকা। সঙ্গে এল এগারোটি কাচ্চাবাচ্চা। আর বাজারের থলিতে ভরা চাল ডাল তরিতরকারি, বোতলে ভরা সরষের তেল, ভাঙা টি-পটে নুন, বস্তায় ভরা আধমন কি পৌনে এক মন কয়লা। কচিদের মাই দিয়ে ছড়া গেয়ে গা চুলকে থাপড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রাখা হল হীরেণের শোবার ঘরে। বাড়তি ছোটো ঘুপছি ঘরখানা সাফ করে রাখা হল চাল ডাল তেল নুন তরিতরকারি। লতিকা উনানে আঁচ দিল, হীরেণদের রাত্রের এঁটো বাসন মাজতে গেল কলতলায়।

উনানে প্রথমে কেটলিটা চাপিয়ে সেটা নামিয়ে নিয়ে মাধবী চাপাল বড়ো স্যাসপেনটা।

আমাদেরই কম পড়ত এক কেটলি চায়ে, দুজন ভাগীদার বেড়েছে। তুমি চা খাও তো ভাই লক্ষ্মী ? জানি খাও। কে না খায় চা ?

লক্ষ্মী জিভ কামড়ায়, জোরে কামড়ায়। ঘুমিয়ে না হয় স্বপ্ন দ্যাখে আবোল-তাবোল অনেক কিছু, জেগেও স্বপ্ন দেখবে ? কিন্তু কোনো প্রশ্ন সে করে না। দুর্বোধ্য যা তা কথার ব্যাখ্যা শুনে বুঝতে তার ইচ্ছা হয় না। এরা সবাই তার চেনা। আশেপাশে থাকে। তার মতো গরিব কেরানির বউ। চা রুটি খাওয়া থেকে ডাল ভাত খাওয়ার সব ব্যবস্থা এরা নিয়ে এসেছে। তার চিনিটুকু চালটুকু কালকের বাড়তি তরকারিটুকু, তেল নুনটুকু নিয়ে বাড়তি ছোটো ঘরটায় জমা করেছে নিজেদের সঙ্গে আনা জিনিসের সঙ্গে। লতিকা বলে, বাঁচলাম ভাই। তিন বাড়ির খাওয়ার জিনিস বাসনপত্র রাখবার

জায়গা পাই না, সব ছড়িয়ে থাকে, এ ঘরটা ছোটো হোক ঘুপচি হোক, খাসা ভাঁড়ার ঘরের কাজ দেবে।

মাধবী বলে, মস্ত রান্নাঘর। দুশো লোকের রান্না হয়। বাঁচা গেল।

অলকা বলে, ভালোই হল, তুমিও দলে এলে ভাই লক্ষ্মী। তিনজনে মিলে খরচ কমিয়েছিলাম, এবার আরও কমবে। পালা করে রাঁধব বাড়ব তারও একটা জায়গা নেই ভালোমতো, না ভাঁড়াব না রান্নাঘর, কী যন্ত্রণা বল দিকি !

অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে লক্ষ্মীর। সারাদিন চুপচাপ থেকে রাত্রে সে হীরেণের কাছে জবাব চায়।

ওদের ভালো লাগবে ?

লাগবে না ? চারবাড়ির চারটে উনানে কয়লা পোড়ার বদলে একটা উনানে পুড়ছে। চারবাড়িব একদিনের কয়লা খরচে চারদিন না চলুক, তিনদিন তো চলবে ? চারটের বদলে একটা ঝিতে চলবে। চারজনের বাজার যাওয়ার বদলে পালা করে একজনের গেলেই চলবে। চারজনের রাঁধার বদলে একজনের রাঁধলেই চলবে—চার দিনে তিনদিন ছুটি। এমন তো নয় যে অনেক দূব থেকে চা খেতে ভাত খেতে আসতে হবে কাউকে ? চার-পাঁচহাত উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা ভাত খাওয়ার বদলে দশ-বিশহাত রাস্তা পেরিয়ে এসে খাওয়া এইটুকু তফাত। তার তুলনায় সুবিধা কত ।

লতিকা আজ রাঁধবে। একা যখন ছিল, নিজের বাড়িতে রোজ রাঁধতে হত, এখন একদিন বেঁধে সে তিনদিন ছুটি পায়। একদিন মানুষের খাওয়ার মতো কিছু যদি রাঁধতো তো দুদিন কী রাঁধবে, কার পাতে কী দেবে ভেবে পেত না,—আজ সে ভালো মাছ তরকারি রাঁধতে পেরেছে কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই।

তিনদিন পরে এই চারটি আনাত্মীয় পাড়াপড়শি একান্নবর্তী পরিবারের জন্য রান্না করার ভার পায় লক্ষ্মী। বিয়ের পর একটানা তিনদিন বিশ্রাম ভোগ করা তার জীবনে এই প্রথম জুটেছে। ছেলে বিয়োতে আঁতুড়ে গিয়ে রান্নাবাড়া না করতে হওয়াটা ছুটি নয়, ছেলে বিয়োনোব খাটুনি ঢের বেশি রান্নাবাড়ার চেয়ে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, লতিকা, মাধবী, অলকা তোরাই আমায় বাঁচালি। লতিকার ছেলে, মাধবীর মেয়ে, অলকার ভাই, এই তিনজনের সঙ্গে নিজের বাচ্চা দুটোকে সে দুধ খাওয়ায়। ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনির মতো বাঁচতে শুধু সে রাজি নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।

ছোটোবড়ো

ছোটোবড়ো গল্পগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের হাফটাইটেল

ভালোবাসা

দুপুরটা নিদারুণ, অসহ্য। মন কেমন করার চোটে শরীরটাও অস্থির অস্থির করে মালতীর। একটা অবাস্তব গর্ব, পরস্মৈপদী অহংকার শুধু আঁকড়ে থাকে যে পরের জন্য মন-কেমন করার নামই ভালোবাসা। বিপিনের জন্য কী কেমনটাই করে তার মন !

মনে হয়, ভালোবাসতে পারার ক্ষমতার তার শেষ নেই, তুলনাও নেই। জগৎকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়, আমার দিকে চেয়ে দেখ। এমন ভালোবাসা দেখেছ কখনও ? এমন ভালো কখনও বেসেছ ? দেখবে কোথায়, বাসবে কাকে !

বিপিন তাব স্বামী, এই যা। বিয়ে তাদের হয়েছে মোটে বছরখানেক। লোকে শুনলে মুচকে হাসবে, ভাববে যে তাই বল, বাপের কিনে দেওয়া ববটি এখনও আনকোরা। কেউ মানবে না যে তার ভালোবাসা এমন একটা বিশেষ কিছু। তার মন কেমন করার পরিমাণটা কে জানবে !

অনেকের মধ্যে দিন কাটে, ঘরে এবং বাইরেও, তবু মালতীর একেবারে একা হয়ে থাকার মারাত্মক অনুভূতি ঘোচে না। তারই ভালোবাসার অসাধারণত্বে তার হৃদয়-মন যেন অস্পৃশ্য হয়ে গেছে ; জগতের জমজমাট জীবনের বিপুল আলোড়নেব ছোঁয়াচ পায় না। বিপিনের কাছে থেকেও, বুকের সঙ্গে লেগে থেকেও তার যে হৃদয়টি অপূর্ণতা অনাশ্বাসেব ব্যথায় টনটনিয়ে থাকে, নিজেব সেই হৃদয়টিব জন্য তার এমনই মমতা যে অন্য হৃদয়গুলির ব্যথা-বেদনা থেকে সেটাকে সে সর্বদা সযত্নে বাঁচিয়ে চলে।

পাশের বাড়ির বউ। চিন্তিত মুখখানা কাতবতায় থমথম করছে। সাজা পানটি মুখে তুলতে ভুলে গিয়ে ধরে আছে হাতে।

প্রাণ হাতে যাওয়া, প্রাণ হাতে ফেরা। দুকুরটা কাটে না ভাই।

শুধু দুকুরটা কাটে না ? তাতেই এত ! মালতীর শুধু দুপুর নয়, বুকের ধুকধুকানির কখনও তাব বিরাম নেই। বাড়ি ফিরলেও কি শান্তি আছে ? আজকের মতো নয় নিশ্চিন্ত, কাল ? কাল তো আবার যেতে হবে, ফিরতে হবে ? সব সময়েই মনটা আকুলি-বিকুলি করে মালতীর।

দুপুর গমগম করে অভিশপ্ত স্তব্ধতায়, তার মধ্যে হঠাৎ ভেসে আসে মবণাহত উন্মত্ত শহবের হিংস্র আস্ফালন, আত্মনাশা আর্তনাদের কলরব।

ঘরেই কি স্বস্তি আছে ? কখন কী হয়, কখন কী হয়। এ বস্তিতে আগুন, ও বস্তিতে আগুন, এ পাড়ায় হানা, ও পাড়ায় হানা—বাপ্‌বে। আমাদের মেয়েদেরই যত জ্বালা—ভয়েও মরি, ভাবনাতেও মরি। কাগজে পড়ি এতগুলো মরেছে ; এতগুলো হাসপাতালে গেছে—ওদের মা বউয়ের কথা ভাবলে বুক ফেটে যায় ভাই, ঘোমটা দিক আর বোরখা পরুক, যে আবাগির সর্বনাশ হয়...

বুকটা যেন ফেটে যাবে মালতীরও অজানা অচেনা ওই আবাগিগুলির মতো। বিপিন যদি না ফেরে আজ ! কী করবে সে, পাগল হয়ে যাবে, না গলায় দড়ি দেবে ! নিজেকে ওই আবাগিদের দলে কল্পনা করতে গিয়ে বিশ্বসংসার তার চোখে মিথ্যা হয়ে যায়। না, আর সে সইবে না বিপিনের পাগলামি। এমনিই কখন কী হয় ঠিক নেই, ওর আবার দাঙ্গা থামাবার কাজে মাথা গলানো চাই, শান্তিসেনায় যোগ দেওয়া চাই, ইচ্ছা করে বিপদে ঝাঁপ দেওয়া চাই।

আজ বাড়ি ফিরুক, আর বেরোতে দেবে না। কাজে পর্যন্ত যেতে দেবে না, ছুটি নেওয়াবে। যায় তো যাবে কাজ। বিপিনকে ঘরের কোণে আটকে রাখবে। আড়াল করে রাখবে বুক দিয়ে।

ফেরার সময় পার হয়ে যায় বিপিন ফেরে না। সতীনাথকে একা আসতে দেখা যায়। মালতীর চোখ পথে পাতাই ছিল। কাজের পর বাড়ি ফিরলে ওর সঙ্গেই আসে বিপিন, কী গল্প করতে করতে আসে তাও তার জানা। বিপিন তাকে একসময় শোনাবেই প্রতিদিন, সতীনাথ কী বলছিল জানো ?...

বাইরের ধুলো-পড়া রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ায় মালতী। অদূরে গলির ওপাশে ছোটো বস্তিটি আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে। বর্ষা হয়ে যেদিন রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেছিল তারপর অনেকদিন পোড়া ঘর ধোয়া কালিমাতে রাস্তাটা কালচে দেখিয়েছে। প্রায় বছর ঘুরে এল বইকী। এমনি ভুলে থাকে মালতী বিপিনের চিন্তায় মশগুল হয়ে, কিন্তু ওই ভস্মস্তূপের দিকে চোখ পড়লেই তার মনে পড়ে যায় দিনদুপুরে সেই বীভৎস কোলাহল, আগুনের রক্তিম শিখা আর মন-প্রাণ চিরে চিরে দেওয়া অবর্ণনীয় আর্তনাদ। কেন তাকে দেখতে হয়েছিল সে দৃশ্য, শুনতে হয়েছিল সে আওয়াজ ! জগতে কত সুন্দর দৃশ্য আছে, কত মধুর ধ্বনি আছে, সে সবও তো সে দেখতে চায়নি, শুনতে চায়নি।

কী ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে হেঁটে আসছে সতীনাথ। তাকে রোয়াকে দেখেই মাথা নিচু করে চোখে পেতে রেখেছে পথে।

কাছে এসে চোখ তুলে তাকায় সতীনাথ। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কী হয়েছে বলুন। শিগগির বলুন।

সতীনাথ বলে, মালতী শোনে। মালতী আর্তনাদ করে ওঠে না, কাঁদে না, শব্দ করে না। সে নিজেই মিথ্যা অকারণ হয়ে গেছে, সব ফুরিয়ে গেছে তাব। সে ঘর করত স্বামী আর এই আতঙ্ক নিয়ে, এই ছিল বিয়ের পর একবছর তার জীবনের অবলম্বন, তার বেঁচে থাকার মানে। এখন বিপিনও নেই, তার আতঙ্কও নেই।

চলুন যাই। দেখে আসি।

কী আর দেখবেন ? সতীনাথ ইতস্তত করে, ও না দেখাই ভালো।

আপনি চলুন তো। ও সব পরে বলবেন।

ভেতরে তবে একটা খবর দিয়ে আসি।

কে সঙ্গে যায়, কে যায় না, কে কাঁদে, কে কী বলে কিছুই খেয়াল থাকে না। কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছে তাও বুঝি তার মনে থাকে না। রাজপথের মানুষ তার মন হরণ করেছে। এই শহরের, এই বিষণ্ণ অভিশপ্ত শহরের পথেও এত মানুষ চলে, এ ব্যস্ততা দেখা যায় ! ডাইনের ওই গলির ভিতরটা যদি বা জনহীন শ্মশানের মতো বাঁয়ের গলিতে মানুষের চলাচল। এই রাজপথ জনমুখর, চোখেমুখে এত শঙ্কা নিয়ে কেন মানুষ বেরিয়েছে পথে ? কী এমন কাজ এদের যা করতেই হবে, যে জন্য বিপদকে মানতে পারছে না, প্রাণের ভয়কে অগ্রাহ্য করছে ? এদের ঘরে যে আবাগিরা আছে—

ওরা কী বলছে ? কীসের মিছিল ?

কে যেন জবাব দেয়, ওরা দাঙ্গা করতে মানা করছে। শান্তি প্রচারে বেরিয়েছে।

মালতী চেয়ে থাকে তফাতের গতিশীল ছেলেমেয়েদের দিকে, কান পেতে আওয়াজ শোনে। এগোতে এগোতে ক্রমে তারা কাছে আসে, আওয়াজ স্পষ্ট হয়, কথাগুলি তার মনের মধ্যে শত ধ্বনি সহস্র প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। এরা তার দুর্ভাগ্য ঠেকাতে বেরিয়েছে ? এরা বন্ধ করতে বেরিয়েছে তার সর্বনাশ ? এরা তার কাছে আবেদন জানাচ্ছে মরণ-যজ্ঞের আগুন নেভাতে এগিয়ে আসতে !

সঙ্গী ছাড়া হয়ে পায়ে পায়ে মালতী এগিয়ে যায়। ঠিক এই জন্য যেন সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এমনি ভাবে শোভাযাত্রায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ! মেয়েদের মধ্যে মিশে সে একাকার হয়ে যায় পর মুহূর্তে।

তথাকথিত

আধা সরকারি হাসপাতালের এল এম এফ ডাক্তার মতিলাল কুরিয়ে কুরিয়ে বাঁকা চোখে তাকায় সমবেত আরোগ্যপ্রার্থীদের দিকে। কী যেন ভেবেছে তাকে দশ গাঁয়ের লোকগুলি। বিনে মাইনেয় কেনা চাকর। সবাই ভিড় করে আসে হাসপাতালে, যার সর্দিকাশি, কাল যে মরবে—সবাই। বিছানা থেকে টেনে ওঠানোর জন্যই যে রোগীটার মরার সম্ভাবনা, তাকে পর্যন্ত তুলে আনে—বিনা পয়সায় তাকে দেখাতে, আর ফিকে রঙের জোলো ওষুধ নিতে। বেতন যা পায় যেন এরাই দেয় তাকে, দশগুণ উশুল করে নেবার দায়িত্বও যেন এরাই গ্রহণ করেছে কর্তব্য হিসাবে। কত সামান্য তার ফি, এরা মরণাপন্ন রোগীকে পর্যন্ত এক ক্রোশ পথ বয়ে আনবে সেই ফি ফাঁকি দিতে।

কথায় কথায় ধমকে ওঠে মতিলাল, পেটের পিলেটা একটু গুঁতিয়ে, জিভটা এক নজর দেখে, একটা কথা শুধিয়ে, ফসফস করে প্রেসক্রিপশন লেখে হাসপাতালের স্ট্যাম্প মারা ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোয়। এ টিকিট একবার হারালে আর রক্ষা নেই। একদিন দু-চারঘন্টা ধন্না দিইয়ে ফিরিয়ে দেবে পরদিন আসতে বলে—পরদিন এলে অন্য সকলকে দেখবার পর তার দিকে বিরক্তিভরা নজর পড়বে। কম শাস্তি দিয়ে গায়ের জ্বালা যদিও মতি ডাক্তারের এতটুকু কমে না, ওতে পয়সা নেই।

বাঁধা টাইমের এক মিনিট দেরি করে রোগী এলে সেদিন আর তার ভাগ্যে ওষুধ জোটে না।

দেড় কোশ হেঁটে এইছি বাবা!

দেড় কোশ হেঁটে, বাবাকে বলো গে।

কম্পাউন্ডার অবিনাশ মুচকে হাসে।

রোগী বেছে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে মতি ডাক্তার, সযত্নে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে। গম্ভীর মুখে যতদূর সম্ভব ভড়কে দেয় রোগীকে আর তার সাথি যদি কেউ থাকে, গাল দেবার বদলে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই বকুনি দেয় হাসপাতালে না আনার জন্য।

দিনরাত শুয়ে থাকবে। ওঠা একদম বারণ।

আজ্ঞে।

ঠিকমতো ওষুধ পড়া চাই আজ। কাল আবার দেখে ওষুধ পালটাতে হবে। বুঝলে তো? নড়াচড়া করলে বিপদ হবে—শুয়ে থাকবে, বিছানা ছেড়ে উঠবে না—খপর্দার। নাড়ি কাল দেখে নতুন ওষুধ দেব।

আজ্ঞে।

কিন্তু হায়রে! পরদিন হয় গোরুর গাড়িতে শুইয়ে রোগীকে হাসপাতালেই আনা হয়, নয় তো আত্মীয়স্বজন কেউ আসে রোগীর অবস্থার বিবরণ জানিয়ে ওষুধ নিতে।

না দেখে ওষুধ দেব কী করে?

আজ্ঞে যা হোক দিয়ে দ্যান।

যা হোক দিয়ে দেব? একি খেলা নাকি? তেমন ব্যারাম নয়, নিজে পরীক্ষা না করে ওষুধ দেওয়া যায় না। এক টাকা ভিজিট লাগবে, আট আনা সাইকেল।

আজ্ঞে, শুধিয়ে আসি তবে।

সেই যে যায়, আর ফিরে আসে না। তাকে দেড়টা টাকা দিয়ে বাড়িতে ডেকে দেখিয়ে ওষুধ না খাইয়েই কি বেঁচে যাবে রোগীটা, সেরে উঠবে? রোগী দেখা সাঙ্গ করে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে

জানালার ফাঁকে ওষুধের প্রত্যাশায় শিশি হাতে সারি বাঁধা অর্ধ উলঙ্গ মানুষগুলির দিকে শ্রান্ত চোখে তাকিয়ে মতি ডাক্তার ভাবে। একটু ভয়ও করে তার, এ সব কথা কর্তাব্যক্তিদের কানে গেলে আবার মুশকিল আছে। মানুষটা একটু ভীরুও বটে সে।

দুর্ভিক্ষেরা নিপীড়নে ভাঙাচোরা রুগ্‌ণ মানুষগুলি যেন তার জীবনের ব্যর্থতা আর হতাশার দায়িক—কী আছে ওদের যে সে আশা করবে কোনোদিন ওরা তাকে কিছু দেবে। হতভাগ্য দেশের হতভাগ্যদের মধ্যে পড়ে তারও বর্তমান ভবিষ্যৎ আঁধার হয়ে রইল। তাকে বাড়িতে ডেকে ফি দেবার ক্ষমতা আছে যে ভদ্রলোকদের, তারাও অল্পজ্বরে হাঁচি-কাশি পেট খারাপের ওষুধ নিতে হাসপাতালে আসবে, রোগ একটু কঠিন হলে ডাক্তার আনবে সদর থেকে। কদাচিৎ রাতবিরেতে হঠাৎ কিছু হলে অগত্যা তাকে ডাকা।

সেদিন সকালে ডাক এল চাটুজ্যে বাড়ি থেকে। বড়ো ছেলে ত্র্যম্বক এসেছে কলকাতা থেকে, তার পেটে ব্যথা। এখুনি একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবুকে।

তা জানে মতিলাল। জরুরি না হলে দরকার কী তাকে হয় ' তবু চাটুজ্যেদের অবস্থা ভালো, গাঁয়ে প্রতিপত্তি আছে। হয়তো আজ তার চিকিৎসা দেখে এমন আস্থা আসবে যে ভবিষ্যতে ছোটো বড়ো সব রোগে তাকে একবার না ডাকলে মনটা খুঁতখুঁত করবে বাড়ির লোকের। আগ্রহ চেপে মতি ডাক্তার বলে, এত রোগী ফেলে—

তাড়াতাড়ি একবার আসতে হচ্ছে ডাক্তারবাবু !

হুকুমের মতো শোনায়। কিন্তু উপায় কী। চাটুজ্যেরা বড়োলোক, তাদের প্রতিপত্তি আছে।

ত্র্যম্বক ছিল কলকাতায়। মনোহর সুঠাম চেহারার দায়ে জীবনটা অপচয় করার উৎসাহে বেসামাল হয়ে ত্রিশে পা দেবার আগেই তার সব ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন শুধু জের টেনে চলার ব্যর্থ চেষ্টার নেশা। শুধু কল্পনা করা তাদেব, যাদের চোখের আয়নায় তাকে দেখার প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে দেখে মনে হত, আর কী চাই ! একনজর দেখলেই আজ বোঝা যায় দেহটাই শুধু ধ্বংস হয়ে যায় নি, জীবনের স্বাদগন্ধও কিছু অবশিষ্ট নেই। বছর ত্রিশেক বয়সে।

কী রেটে নিজেকে সে খরচ করেছে মতি ডাক্তার তা আন্দাজ করতে পারে।

আরেকটা রোগ হওয়ায় কী ভেবে চলে এসেছে দেশের বাড়িতে। রোগটা বিশ্রী, লিভার বিগড়ে গিয়ে পৃথিবীর সব কিছু হলদে করে দেয়, চোখের আলো পর্যন্ত। চামড়া হলদে হয়ে যায় হলুদবাটা কোমল হাতগুলির মতো।

কড়া একটা ইনজেকশন দিন—ওপিয়াম টোপিয়াম যা আছে।

ইনজেকশন দরকার নেই। একটা বড়ি দিচ্ছি, খান।

বড়ি টড়ি রাখুন—ডবল ডোজ ইনজেকশন দিন। ইনজেকশন দেবার— ? সংশয় ভরে তাকায় ত্র্যম্বক।

সব আছে মশাই, সব আছে। মতি ডাক্তারের এখন সীমাছাড়ানো গাম্ভীর্যপূর্ণ নাটকীয় আত্মবিশ্বাস, যেন দ্বিতীয় বি সি রায়,—ইনজেকশনের চেয়ে বড়িতে তাড়াতাড়ি কাজ দেবে। আমি ডাক্তার, আমি বলছি, কথা শুনুন। ব্যথাটা আপনার পেটে—কলিকও নয়। ইনজেকশন দিয়ে নার্ভ অবশ করে ব্যথা কমাতে যত সময় লাগবে, ওষুধটা পেটে গেলে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

ব্যথাতুর হয়ে ত্র্যম্বক সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বলে, বলেন কী !

তা ছাড়া, আপনার এই কন্ডিশনে ইনজেকশন আমি দিতে পারব না। সদর থেকে বড়ো ডাক্তার ডাকুন।

দিন যা দেবেন।

দুটো বড়ি জলে গুলে তাকে খাইয়ে দিল মতিলাল। ব্যথা-বেদনার প্রতিকাররূপে এই বিষাক্ত বড়িগুলি বিখ্যাত, ত্র্যম্বকও নাম জানে, ব্যবহার করেছে। মতিলালের রকমসকমে মনে হল, এগুলি যেন তারই বিশেষ আবিষ্কার। ত্র্যম্বকের অবস্থা বিবেচনায় একটা বড়ির বেশি এ বিষ দেবার সাহস অন্য ডাক্তারের হত না। মতিলালেরও বুকটা একটু কাঁপছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ত্র্যম্বক ঘুমিয়ে পড়ল। বিকালে আবার এল মতি ডাক্তার।

কলকাতায় থাকাই আপনার উচিত ছিল, মতি ডাক্তার জানাল, শুধু জন্ডিসের চিকিৎসা নয়, অনেকদিন ধরে আপনার চিকিৎসা দরকার।

চিকিৎসায় কিছু হবে না। ব্যথাটা একটু কমিয়ে দিন, তাতেই হবে এখনকার মতো।

এ মরা মানুষের কথা। মতিলাল সবিনয়ে হাসল। মনে তার গড়ে উঠেছিল পরিকল্পনা, অসাধ্য সাধনের চেষ্টার আর মোটা কিছু উপার্জনের।

আজ্ঞে, তা বলবেন না। কোনো কোনো রোগ আছে, যার চিকিৎসা নেই,—সাধারণ স্বাস্থ্যহানি সব অবস্থায় সারিয়ে দেওয়া যায়।

স্বাস্থ্যহানিটা সাধারণ দেখলেন নাকি ? বিষণ্ণভাবে হাসে ত্র্যম্বক, কিছু বুঝি বাগাতে চান ? কিন্তু আমায় ভোলাতে পারবেন না। কলকাতার বড়ো বড়ো ডাক্তাব পাবেনি।

মতি ডাক্তার ব্যথিত কণ্ঠে বলল, ডাক্তাবকে ফি নিতে হয় বাঁচাব জন্যে, ডাক্তার চিকিৎসা বেচে না মশায়। আমি কলকাতার ডাক্তার নই। ফি-র কথা আমি ভাবিনি। ভাবছিলাম, আমি গাঁয়ের ডাক্তার, আমার চিকিৎসায় কি আপনাদের বিশ্বাস হবে ?

ত্যাবচা মন অকারণে খোঁচা দিতে পারে অনায়াসেই, কিন্তু আঘাত করা হয়েছে টের পেলেই, অস্বস্তিতে নেতিয়ে যায়। ত্র্যম্বক ব্যস্ত হয়ে বলে, না না তা নয়, তা নয়। বিশ্বাস হবে না কেন ?

সেদিন ওই পর্যন্ত। পরদিন মতি ডাক্তার আবাব কথাটা তুলল। অনেক ভণিতা করে জানাল যে ত্র্যম্বক যদি তাকে সুযোগ দেয়, সে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল কবে তোলার দায়িত্ব নিতে রাজি আছে। ফি সে এক পয়সা এখন নেবে না, ত্র্যম্বক ভালো হয়ে ওঠার পর সে প্রশ্ন উঠবে।

আগের মতো হব ?

না। মতিলাল জোর দিয়ে বলল, না। যে বয়স যায়, যে তেজ যায়, তা কি ফেবে ? তবে শরীরে আপনার গ্লানিবোধ থাকবে না, দুর্বলতা থাকবে না। লোকে দেখে টের পাবে না দেহটা আপনাব ভেঙে পড়েছিল।

খানিকটা খেলাব ছলেই যেন রাজি হয় ত্র্যম্বক।

করুন চিকিৎসা। যদি পারেন, আপনাকে হাজার টাকা দেব।

একটু যদি লিখে দ্যান, মতি ডাক্তার সবিনয়ে ভিক্ষা চাওযার মতো বলে, এক বছব দু বছব লাগবে, একটা লিখিত কন্ট্রাক্ট থাকলে মন্দ হয় না। এও নয় লিখে দিন যে, আপনাব খুশি হলে দেবেন, খুশি না হলে দেবেন না, আমার কোনো দাবি থাকবে না। কথাটা বললেন, একটু শুধু লিখে দিন, ভুলে টুলে গেলে মনে পড়বে এই আর কী !

মিছেমিছি কষ্ট করবেন ডাক্তারবাবু। কিছু হবে না।

আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

এই না বলে মতি ডাক্তার কোমর বেঁধে লেগে গেল ত্র্যম্বককে ভালো করতে, একটা মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে। রোজ সে আসে চাটুজ্যে বাড়িতে, রোগ সে ব্যবস্থা দেয় এটা করুন ওটা করুন, এটা খান ওটা খান, এ থেকে বিরত হোন, ও সব স্থগিত রাখুন। কিছু মানে ত্র্যম্বক, কিছু মানে না। মতি ডাক্তার অসহ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। সেটা টের পেয়ে মতিলাল দু-চারদিন ধারে কাছে ভেড়ে না, অদৃশ্য হয়ে থাকে।

দু-চারদিন ধারে কাছে না ঘেঁষলে একটু যেন ত্র্যম্বক মতি ডাক্তারের সঙ্গ চায়, তার ফেনানো ফাঁপানো মিথ্যা আশা আশ্বাস ভরসার কথাগুলি শোনার প্রয়োজন বোধ করে, বেশির ভাগ না মানলেও তার নির্দেশ উপদেশ ব্যবস্থার কথা শুনতে বেশ একটু ইচ্ছা জাগে ! ভাঙা মানুষ মরা মানুষ তো এতখানি হতাশ হতে পারে না যে, কেউ তাকে জোড়া দেবার বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেনেও চুপচাপ মুখ গুঁজে মরবে ! নির্ভীক বেপরোয়া আশ্বাসের মতো সঞ্জীবনী আর কিছু নেই। তাই না জগতের ডাক্তাররা মুমূর্ষুর দেহে সুনিশ্চিত মরণকে প্রত্যক্ষ দেখেও বলে, ভয় কী, সেরে উঠবেন।

একটা সুবিধা হয়েছে মতি ডাক্তারের। জন্ডিস কাবু করেছে বটে ত্র্যম্বককে, আবার সেই সঙ্গে বিস্বাদ বিশ্রী করে দিয়েছে সিগারেট থেকে তার সব নেশা। নতুন বিষ শরীরে আনা ঠেকানো গেছে সহজেই।

একজনকে আশা আশ্বাস দিতে দিতে একটি ঝলসানো জীবনকে পাপমুক্ত করার সাধনায় টাকা আর পশারের লোভেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে আশ্চর্য এক আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতে থাকে মতি ডাক্তারের মধ্যে, এতদিনের শ্রান্ত হতাশ জীবনের রূপ বদলে যেতে থাকে অদ্ভুতরকম।

অন্তর যেন নতুন এক ভাষায় গুঞ্জন করে বলে যে, টাকা তো আসবেই, পশার তো হবেই, কিন্তু কী হবে সে টাকা আর পশার যদি না—

যদি না কী ? সেটা কোনোমতেই স্পষ্ট হয় না গাঁয়ের আধা সরকারি হাসপাতালের এল এম এফ ডাক্তার মতিলালের কাছে ! শুধু মনে হয় আরও কতগুলি কিছু না হলে, যেখানে যাদের মধ্যে যা কিছু নিয়ে বসবাস ও জীবনযাপন তার মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য কিছু সার্থকতা না এলে, শুধু নিজের টাকা আর পশার নিয়ে বুঝি সে রকম খুশি হওয়া যাবে না !

বাঁধা টাইমের পরে যে রোগী আসে তাকে আজও ধমক দেয় মতি ডাক্তার কিন্তু কেন যেন ব্যঙ্গাত্মক গালটা আসে না।

বলে, বাপু তুমি কি চাকর রেখেছ হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে ? যখন খুশি আসবে আর হুকুম দেবে ওষুধ দিতে ?

দেড় কোশ হেঁটে এইছি বাবা !

দেড় কোশ হেঁটে যাও। কাল ফের দেড় কোশ হেঁটে এসো সময়মতো। তোদের জন্য মরব নাকি আমি ? আয় ইদিকে, চটপট আয়। ব্যাটার নড়তে লাগে দশ ঘণ্টা। জিভ বার কর।

সে বেচারা কাতর হয়ে বলে, কর্তা, মরণ ভালো ছিল মোর।

মতি ডাক্তার গ্রাহ্য করে না, বলে, জ্বর কদ্দিন ?

আজ্ঞে চলছে ঘুষঘুস ঢের দিন থে।

কাশি আছে নাকি ?

আছে।

রক্ত পড়ে ?

একটু একটু পড়ে আজ্ঞে।

তার দিকে চেয়ে থাকে মতি ডাক্তার। ছেঁড়া লুঙ্গি পরা খালি গা একটা জ্যান্ত ভূত, পেট ভরে দুবেলা ভাত জোটে না, তার এই রাজকীয় রোগের এখন কী চিকিৎসার ব্যবস্থা সে করে, কী ওষুধ দেয়। রাজা-টাজা হলে নয় বলে দেওয়া যেত মাসখানেক দুধ ঘি মাছ মাংস আঙুর বেদানা খেয়ে এস ওষুধ নিতে।

খাটো কোথা ?

সদরের কাপড় কলে। শরীরে বয় না তাই দেশের ঘরে এলাম যে জ্বরটা যদি ছাড়ে, দেহটা যদি সারে।

বেশ করেছ। দেশে ঘরে মরেও সুখ আছে।

চোখে যেন জল এসে যায় মতি ডাক্তারের। তিন ছেলের মা তার বউ, মেয়েলি রক্তপাতের রোগে সে মরোমরো। একটা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সে, নিজের স্ত্রীর চিকিৎসার উপায় জানে, ব্যবস্থা জানে না। তবু ওষুধ খাওয়ায় স্ত্রীকে, হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধ। একেও ওষুধ লিখে দিতে হবে তাকে, এও শিশি ভরে নিয়ে গিয়ে খাবে হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধ। সবাই যদি এমনি ভাবে ভোগে, কী করবে সে ত্র্যম্বককে ভালো করে তুলে ?

ত্র্যম্বকের রক্ত পরীক্ষা হতে যায় কলকাতায়, ওষুধ আসে কলকাতা থেকে, দুষ্প্রাপ্য ফুড, দামি ফল। মতিলাল রুগ্ণা স্ত্রীর শিয়রে বসে আবার ডাক্তারি বই ঘাটে, ত্র্যম্বকের দেহ থেকে পুরানো রোগের দুর্ধর্ষ জীবাণু তাড়াবার চেষ্টা কতদূর এগোল সযত্নে হিসাব করে, ছোট্ট খাতাটিতে লিখে রাখে করে ইনজেকশন দেওয়া হল, কটা হল। হাসপাতালের স্টকে এ সব ওষুধ নেই, যুদ্ধ কিন্তু এই গাঁয়ে পর্যন্ত এনে দিয়েছে ওই রোগের অভিশাপ। অন্য অসুখের চিকিৎসা করাতে আসে, চেপে ধরলে, আশ্বাস দিলে, বুঝিয়ে বললে, অনেক টালবাহানার পর স্বীকার করে। পুরানো দিনের দীর্ঘ ক্লান্তিকর চিকিৎসার ব্যবস্থা ওদের জন্য—সে ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ নেই হাসপাতালে, জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হয়। ত্র্যম্বকের চিকিৎসা করতে আনন্দ পায় মতি ডাক্তার। সে যেন ভুলে যায় সে পাড়াগাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত এল এম এফ ডাক্তার, মনে হয় সে যদি সব সরঞ্জাম পেত, ওষুধ আর পথ্য, রোগ সে নির্মূল করে দিতে পারত দেশ থেকে !

আশার সঞ্চারে জীবনের প্রতি প্রকাশ্য মমতা লক্ষ করা যায় ত্র্যম্বকের মধ্যে, তীব্র অভিমানী অবহেলার ভাব কেটে যাচ্ছে। চিকিৎসা সম্পর্কে তার আগ্রহ এসেছে। আশা করতে আরম্ভ করায় এদিকে আবার আশঙ্কাও তুচ্ছ হয়ে নেই যে সত্যসত্যই কি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যাবে ?

বলে, কলকাতার কাউকে কনসাল্ট করা দরকার মনে করেন কি ?

আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না না, তা নয়। আপনি দরকার মনে করেন নাকি জিজ্ঞেস করছিলাম।

বলে, ফি'র কিছুটা আপনি নিন ডাক্তারবাবু। অনেক খাটছেন।

আপনার খুশি !

দুশো টাকার নোট ত্র্যম্বক মতি ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়, সে সত্যই কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। রাত-দুপুরে মতি ডাক্তার বিছানা ছেড়ে ওঠে। আলো জ্বেলে বাক্সো খুলে নোটের তাড়াটা আরেকবার হাতে নেয়। এগারো বছর সে ডাক্তারি করছে, আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো রোগীর কাছ থেকে এক সাথে পাঁচটা টাকা ফি পায়নি। জীবিকার জন্য ডাক্তারি শেখার এই প্রথম বাস্তব অর্থ, রূপ ধরা সার্থকতা। কিন্তু তেমন সুখ হচ্ছে কই, আহ্লাদ ?

হাসপাতালের বিনা পয়সার ডাক্তার হিসাবে ছাড়া তার আসল রোগীদের মধ্যে এতটুকু পশার তার বাড়েনি, ওদের কাছ থেকে মাসে পনেরোটা টাকাও আসে না। ওদের দেওয়ার ক্ষমতা না বাড়লে কোনোদিন যে তা আসবে সে ভরসাও নেই, সবার অবস্থা বরং আরও শোচনীয় হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। তার চেনা অখিল প্র্যাকটিস করে সদরে, যুদ্ধের বিপর্যয় ত.ক কোনো রকমে দিন চলার অবস্থা থেকে 'কল'-এর চাপে নাওয়া খাওয়ার সময় না পাওয়ার অবস্থায় এনে দিয়েছে, ফি ডবল করা সত্ত্বেও ! কারণ ? দেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে শহরের মানুষের ! আর সে যাদের ডাক্তার, যারা তার আসল পশারের একমাত্র আশা ভরসা, তারা দলে দলে উৎখাত হচ্ছে জমি থেকে, একটা টাকা এমনি নিত্যকার বেঁচে থাকার জরুরি দরকারে না লাগিয়ে তাকে দিয়ে বাঁচার চেষ্টার মানেই খুঁজে পাচ্ছে না।

স্ত্রী বলে, কী হল ?

মতি ডাক্তার বলে, না কিছু না। ভাবছিলাম ফি আরও কমিয়ে দেব নাকি।

রাত দুপুরে মতি ডাক্তার ফি কমিয়ে পশার বাড়াবার কথা ভাবছে, ফি-র দুশো নগদ টাকা হাতে নিয়ে !

স্বাস্থ্যের পরিবর্তন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে ত্র্যম্বকের, সেই সঙ্গে মনেরও। বছর খানেক পরে সত্যসত্যই তাকে মানুষের মতো দেখায়, মানুষের মতোই মনে হয় তার কথাবার্তা চালচলন ব্যবহার। ঘোলাটে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এসেছে, জোর বেড়েছে মনের। তবে তখনও বাকি থাকে মেরামতের কাজ, এক যুগ ধরে উদ্দাম উল্লাসে যা চুরমার করা হয়েছে ভেঙে ভেঙে, একটা বছরে তা কি সম্পূর্ণ মেরামত হয় ? বর্ষা উন্নতি ব্যাহত করে, একটু তাকে কাবু করে রেখে যায়। বর্ষার সময়টা পশ্চিমে কোথাও চেঞ্জে যাবার কথা তোলে মতি ডাক্তার, ত্র্যম্বক রাজি হয় না। বেশি দিনের জন্য মতি ডাক্তারকে ছেড়ে দূরে থাকার মতো মনের জোর তখনও তার আসেনি।

সমাজ সংসার অল্পে অল্পে মনটা আকর্ষণ করছে ত্র্যম্বকের। পারিবারিক ব্যাপারে বিদ্বেষী উদাসীনতা নেই, ফাল্গুনে বোনের বিয়ের নামেই কলকাতা পালানোর বদলে দায়িত্ব নিয়ে খেটে খুটে অনেকটা রেহাই দিল বুড়ো দেবেন চাটুজ্যেকে। জোতজমি বিষয়কর্মও সে দেখা শোনা আরম্ভ করেছে, অবাধ্য প্রজাকে নাকে খত দেওয়াতে কান মলাতে উৎসাহ বোধ করছে।

দেবেন চাটুজ্যে সদয় ব্যবহার করছে মতি ডাক্তারের সঙ্গে। কল টিপে তার দশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে, পাল-পার্বণে তাকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ায়, মাঝে মধ্যে মাছটা ফলমূলটা পাঠিয়ে দেয় তার বাড়িতে। বিশেষ কৃতজ্ঞ সে অবশ্য নয়, হাসপাতালের ডাক্তার চিকিৎসা করেছে ছেলের তাতে কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন কী থাকতে পারে। একেবারে হাজার টাকা ফি দেবার কথাটা বরং তাকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করে রেখেছে। কাণ্ডজ্ঞান কোনোদিনই ত্র্যম্বকের ছিল না, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করারই যার কথা, তাকে একেবারে হাজার টাকা কবুল করার কোনো মানে হয় ? গোড়ায়, ছেলের সম্পর্কে যখন কোনো আশা-ভরসাই ছিল না, তখন কেন প্রতিবাদ করেনি সে কথা কেউ অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসা করে না।

বৈশাখে ছেলের বিয়ে দেব ভাবছিলাম মতিলাল। একটি বড়ো-সড়ো সুন্দরী মেয়ে পেয়েছি, ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে আই এ পড়ছে। বত্রিশ চলছে ছেলের, বয়স হয়ে গেল—

আজ্ঞে সে তো ভালো কথা। তবে কি না, আরও মাস ছয়েক—

তাই ভালো। বৈশাখে থাক, অগ্রানেই শুভকর্ম সারা যাবে।

ত্র্যম্বক সম্পর্কে মতি ডাক্তারের কথা অগ্রাহ্য করার ভরসা দেবেনের নেই, ত্র্যম্বকের নিজেরও নেই—এখন পর্যন্ত !

মতিলাল সগর্বে লক্ষ করে তার মৃত রোগীটির মুখে চোখে নতুন স্বাস্থ্যের জ্যোতি, তার অর্থহীন জীবনে নব নব উদ্দেশ্য উপচারের সমাবেশ। টাকা সে আরও দেড়শো পেয়েছে দু দফায়, একবার একশো, পরের বার পঞ্চাশ। চাইতে হয়েছে দুবারই। শেষবার একটু বিব্রত, একটু অসন্তুষ্ট মনে হয়েছে ত্র্যম্বক আর দেবেন দুজনকেই।

অন্য প্রসঙ্গে কথাচ্ছলে দেবেন জানিয়েছে, মাইনে তোমার দশ টাকা বাড়ল হে, আমি না উঠে পড়ে লাগলে আর কারও সাধ্যি হত না বোর্ডকে রাজি করায়।

হাজার টাকার আর কতটা আদায় করা যাবে, একটু খটকা জেগেছে মতি ডাক্তারের মনে ! জীবনে অনেক পাওনাই আদায় হয় না মানুষের।

এদিকে ফি সে কমিয়ে দিয়েছে গরিবদের জন্য। সাইকেলের জন্য চার আনা বাঁধা, ওটা দিতেই হবে সকলকে, তার ওপর চার আনা আট আনা যে যা পারে দেবে। আরও গরম হয়েছে তার ব্যবহার রোগীদের সঙ্গে—শত্রুভাবে নয়, বন্ধুভাবে, আত্মীয়তাবোধের তাপে। ধমক আর বকুনি তার চলে অনর্গল, রোগীরা যেন খুশি হয়, স্বস্তি বোধ করে।

বাপকে মেরেছ রক্ত বমি করিয়ে, কাঁথা জড়ানো নুরুলের জ্বর দেখে পেটের পিলেটা টিপতে টিপতে বলে, চার জ্বর নিয়ে তুমি এসেছ পিলে ঠাসা দশ মাসের গভ্ভো দেখাতে। ফের যদি জ্বর গায়ে হাসপাতালে আসবি হারামজাদা, তোর পিলে আমি অপারেশন করে কাটব।

ধুঁকতে ধুঁকতে নুরুল মরার মতো হাসে।

আট গন্ডা পয়সা জোগাড় রাখবি, আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে, চার আনা সাইকেল, চার আনা ফি। কাল জ্বর ছাড়লে গিয়ে গা ফুঁড়ে ওষুধ দিয়ে আসব।

অঘ্রানে বিয়ের সাতদিন আগে থেকে সানাই পোঁ ধরেছে দেবেনের বাড়িতে। মাঠে বিবাদ বেধেছে ধানের ভাগ নিয়ে, ধান কেটে চাষির ঘরে তোলা নিয়ে চাষি আর জোতদারে। আহত লেঠেল কজন জড়ো হয়েছে দেবেনের বাড়িতে, ঘন ঘন লোক যাচ্ছে হাসপাতালে মতি ডাক্তারকে ডেকে আনতে। ত্র্যম্বকেব হাতেও একটু চোট লেগেছে। মানুষ তাকে সত্যই করে দিয়েছে মতি ডাক্তার চিকিৎসা করে, এমনই বেড়েছে তার তেজবীর্য যে নিজে লাঠি ধরে সে লোকজনের সঙ্গে গিয়েছিল বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে, তারই লাঠি আচমকা প্রথম আঘাত হানে, ঘায়েল করে ফেলে দেয় নুরুলকে।

মতি ডাক্তারের পাত্তা নেই। আহত চাষিদের ব্যান্ডেজ বাঁধতে ওষুধ দিতে সে ব্যস্ত— হাসপাতালের ব্যান্ডেজ হাসপাতালের ওষুধ, যে হাসপাতাল আধা-সরকারি, যে হাসপাতালের বোর্ডে আছে দেবেন চাটুজ্যে নিজে !

কাতরাতে কাতরাতে চোখ মেলে মতি ডাক্তারকে চিনতে পেরে নুরুল দাঁত বের করে একটু হাসে। তার হাড়-পাঁজরা খানিকটা ঢাকা, পেটের পিলেটা ছোটো হয়ে গেছে। ত্র্যম্বকের মতো তাকেও একরকম মানুষ করেছে মতি ডাক্তার, দামি দামি ওষুধপত্র ছাড়াই, শুধু গা ফুঁড়ে কুইনিন দিয়ে আর কুইনিন খাইয়ে।

তোকে কে লাঠি মারলে রে ? দেবেনবাবুর ছেলে ? বেশ ! বেশ ! সকৌতুকে সায় দিয়ে দিয়ে মতিলাল মাথা নাড়ে, দেখলি তো মতি ডাক্তারের হাতযশ ? কলকাতাব ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছিল, এই মতি ডাক্তার ভালো করেছে দেবেনবাবুর ছেলেকে। লাঠির ঘায়ে তোকে আজ কাবু করে !

হাসপাতালে ফিরতেই দেবেনের লোক বলল, কোথা গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু ? শিগগির আসুন, কর্তা ডাকছেন।

দাঁড়াও বাপু দাঁড়াও। একটু জিরিয়ে নিই।

যেতে হবে। হাজার টাকার সাতশো টাকাই এখনও বাকি !

কিন্তু না গিয়ে যদি চলত ? যদি মরতে দেওয়া যেত ওদের সব কটাকে বিনা চিকিৎসায় ? তার হাতযশ ত্র্যম্বককে পর্যন্ত ?

ছেলেমানুষি

ব্যবধান টেকেনি। হাত দুই চওড়া সরু একটা বন্ধ প্যাসেজ বাড়ির সামনের দিকটা তফাত করে রেখেছে, দু বাড়ির মুখোমুখি সদর দরজাও এই প্যাসেজটুকুব মধ্যে। পিছনে দু বাড়িব ছাদ এক, মাঝখানে দেয়াল উঠে ভাগ হয়েছে, মানুষ-সমান উঁচু। টুল বা চেয়ার পেতে দাঁড়ালে বড়োদেব মাথা দেয়াল ছাড়িয়ে ওঠে।

ব্যবধান টেকেনি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবনযাপনের, সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-আনন্দের, ঘৃণা-ভালোবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন, অপরাহ্ণে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন উৎসুক কল্পনা দিন দিন জমে ওঠে একই ধরনের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দী জীবন,—রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে স্বপ্ন দেখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুব সংসারের। ইন্দিরার কোলে একদিন আসে গীতা। পরের বছর অবিকল তারই বেদনাকে নকল করে হালিমা পৃথিবীতে আনে হাবিবকে।

যদিবা টিকতে পারত খানিক ব্যবধান, দুরন্ত দুটি ছেলেমেয়ে মানুষের তৈরি কোনো কৃত্রিম দূরত্ব মানতে অস্বীকার করে তাও ভেঙে দেয়। কাছে আনে পরিবার দুটিকে। অন্তরঙ্গ কবে দেয় ইন্দিরা আর হালিমাকে।

একদিন একটি শুভলগ্নে দুটি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় পাড়ায়। গীতা পায় নতুন খেলা। মাব শাড়ি ভাঁজ করে সে পরে, সিঁদুরের টিপ আর চন্দনের এলোমেলো ফোঁটা আঁকে কপালে আর গালে, পাড় দিয়ে বাবার লাল টুথব্রাশটির মুকুট এঁটে সে কনে সাজে হাবিবের। কপালে চন্দন লেপে গলায় গামছা পাকানো উড়ুনি ঝুলিয়ে দিয়ে হাবিবকে বরবেশে সেই সাজিয়ে দেয়। শাশুড়ির অভিনয় করতে হয় ইন্দিরা আর হালিমা দুজনকেই। উলু দিয়ে বরণ করতে হয় জামাইকে ইন্দিরাব, বউকে হালিমার। খাবার আনিয়ে জামাই-আদরে বউ-আদরে দুজনকে খাওয়াতে হয় মুখে খাবার তুলে দিয়ে। নইলে নাকি খায় না নতুন বর-বউ। থেকে থেকে দুজনে তারা ফেটে পড়ে কৌতুকের হাসিতে। তাতে রাগতে রাগতে হঠাৎ বিয়ের কনের লজ্জা-শরম ভুলে গিয়ে মেঝেতে হাত পা ছুঁড়ে কান্না শুরু করে গীতা। তারপর থেকে তাদের হাসতে হয় মুখে আঁচল গুঁজে।

মাকে নকল করে গীতা হাবিবকে ডাকে, ওগো ? ওগো শুনছ ? জামাই। এই জামাই। ডাকছি যে ?

হাবিব বলে, অ্যাঁ ?

অ্যাঁ কি ? অ্যাঁ না। বলো, কিগো ?

হালিমা আর ইন্দিরা ঢলে পড়ে পরস্পরের গায়ে।

মুখ ভার করে থাকে পিসি। হালিমা বাড়ি ফিরে যাওয়ামাত্র বলে, এ সব কী কাণ্ড বউমা ?

কেন পিসিমা ?

চা খাওয়ালে, বেশ করলে। তা চা যে খেয়ে গেল কাপে মুখ ঠেকিয়ে কাপটা শুধু ধুয়ে তুলে রাখলে সব বাসনের সাথে ? গঙ্গা জলের ছিটেও দিতে পারলে না ? ভিন্ন একটা কাপ রাখলেই হয় ওর জন্যে। জাতধম্মো রইল না আর।

গঙ্গা জলে ধুয়েছি। —ইন্দিরা অনায়াসে বানিয়ে বলে।

এ বাড়িতে নাসিরুদ্দীনের মায়েরও মুখ ভার।

ও বাড়ি থাকলেই পারতে ? এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ওরা পছন্দ করে কিনা কে তা জানে।

হালিমাও হাসি মুখেই বলে, চা না খাইয়ে ছাড়লে না। দেরি হয়ে গেল।

তুমি তো খেয়ে এলে চা খুশি মনে। তুমি দিয়ো তো একদিন কেমন খায় ?

চা তো খায় !

সব কাজ পড়ে আছে সংসারের, সময় মতো শুবু হয়নি। নাসিরের মার আসল রাগ কেন হালিমা জানে, তাই জবাব দিতে দিতে সে চটপট কাজে লেগে যায়। বিশেষ কিছুই আর শুনতে হয় না তাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যায় ছোটো নাতনিকে কোলে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীনের মা আর ছোটো নাতি কোলে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তারাপদর পিসি গল্প জুড়েছে সুখদুঃখের !

ব্যবধান টেকেনি।

কাজ সেরে দুপুরে হালিমা যেদিন একটু অপরাধিনীর মতোই এসে বসে, সেদিনও নয়। মৃদু অস্বস্তির সঙ্গে বলে হালিমা, একটা কাণ্ড হয়েছে ভাই।

ওমা, কী হয়েছে?

তোমার মেয়ে একটু গোস্ত খেয়ে ফেলেছে। আজ আমাদের খেতে হয় জানো। হাবিব খেতে বসেছে, আমি কিছুতে দেব না, বেটি এমন নাছোড়। হঠাৎ পাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

কিছু হবে না তো ? ইন্দিরা বলে চমকে গিয়ে।

হালিমার মুখ দেখে তারপর ইন্দিরা হাসে, বলে, কী যে বলি আমি বোকার মতো। হাবিবের কিছু হবে না, ওব হবে ! খেয়েছে তো কী আর হবে, ওইটুকু মেয়ে। কাউকে বোলো না কিন্তু ভাই।

তাই কি বলি ? হালিমা স্বস্তি পায়— বাব্বা ; আমি জানি না ? ও রোজ আলি সাব আব তার বিবি এসে কী দাবড়ানি দিয়ে গেল। হাবিব তোমাদের সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, প্রসাদ খেযেছে, এ সব কে যেন কানে তুলে দিয়েছিল।

শোনো বলি তবে তোমায় কাণ্ডখানা।—ঘরে কেউ নেই, তবু ইন্দিরা কাছে সরে নিচু গলায় বলে, হাবিব অঞ্জলি দিয়েছে বলে পিসির কী বাগ ! উনি শেষে পঞ্জিকা খুলে আবোল-তাবোল খানিকটা সংস্কৃত আউড়ে পিসিকে বললেন, সরস্বতী পুজোয় দোষ হয় না, শাস্ত্রে লিখেছে। তখন পিসি ঠান্ডা হয়ে বললে, তাই নাকি !

শান্ত দুপুর। ফিরিওলা গলিতে হেঁকে যাচ্ছে, শাড়ি-শায়া-শেমিজ চাই। দুজনে তারা খড়ি নিয়ে মেঝেতে কাটাকাটি খেলতে বসে। হাই ওঠে, বুজে আসে চোখ। চোখে চোখে চেয়ে ক্ষীণ শ্রান্ত হাসি ফোটে দুজনের মুখে। আঁচল বিছিয়ে পাশাপাশি একটু শোয় তারা দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনি, দুটি দাসী।

ঘুমোয় না। সে আরামের খানিক সুযোগ জোটে বেলা যখন আরও অনেক বড়ো হয় গরমের দিনে। আজকাল শুধু একটু ঝিমিয়ে নেবার অবসর মেলে। ঝিমানো চেতনায় ঘা মারে স্তব্ধ দুপুরের ছাড়াছাড়া শব্দগুলি। তার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট হতে থাকে ছাতে হাবিব আর গীতার দাপাদাপির শব্দ।

ব্যবধান টেকেনি। কেন যে সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আচমকা এমন ভয়ানক এমন বীভৎস রূপ নিয়ে, কেন এত হানাহানি খুনোখুনি চারিদিকে বোঝে না তারা, থতোমতো খেয়ে ভড়কে যায়, দুরদুর করে বুক। সেবার মাঝে মাঝে বুক কেঁপেছিল সাইরেনের আওয়াজে জাপানি বোমার দিনগুলিতে, দূর থেকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসা অনিশ্চিত বিদেশি বিপদের ভয়ে। তার চেয়ে ব্যাপক, ভয়ানক সর্বনাশ আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের বুকে, শহর জুড়ে, পাড়ায়, ঘরের দুয়ারে। বুকের জোরালো ধড়ফড়ানি থামবার অবকাশ পায় না আজ, বাড়ে আর কমে, কমে আর বাড়ে।

তবে কথা এই যে, এটা মেশাল পাড়া। নিজেরাই বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে যতটা নিরুপায় নয় তার চেয়ে অনেক বেশি মরিয়ার মতো। এতেই অনেকটা ভরসা খাড়া আছে মারাত্মক আতঙ্ক গুজব আর উসকানির সোজাসুজি প্যাঁচালো আর চোরাগোপ্তা আঘাত সয়ে, যে আঘাত চলছেই। বাস্তব একটা অবলম্বনও পাওয়া গেছে সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটিতে, বিভ্রান্ত না করে যার জন্মলাভের প্রক্রিয়াটাও জাগিয়েছে আস্থা। কারণ, বড়ো বড়ো কথা উথলায়নি সভায় আদর্শমূলক ভাবোচ্ছ্বাসে, মিলনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা হয়নি শুধু মিলনের জয়গান গেয়ে, এই খাঁটি বাস্তব সত্যটার উপরেই বেশি জোর পড়েছে যে এ পাড়ায় হাঙ্গামা হলে সবার সমান বিপদ, এটা মেশাল পাড়া।

হয়তো এ পাড়ায় শুরু হবে না সে তাণ্ডব, কে জানে। চারিদিকে যে আগুন জ্বলেছে। তার হলকাতে ছ্যাঁকা লেগে লেগেই মনে কী কম জ্বালা। সবহারা শোকাতুর দিশেহারা আপনজনেরা এসে অভিশাপ দিচ্ছে, বলছে মারো, কাটো, জবাই করো, শেষ করে ফ্যালো। এ এসে ও এসে বুঝিয়ে যাচ্ছে মারা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

অনেককালের মেশামেশি পাশাপাশি বসবাস। হয়তো তেমন ঘনিষ্ঠ নয় মেলামেশা সবার মধ্যে, সেটা আসলে কিন্তু এটা শহর বলেই। পাখা সবারই পঙ্গু, মানুষকে হাঁস-মুরগি করে রাখা মর্জি মালিকের। পাখা ঝাটিয়ে চলতে হয় জীবনের পথে।

তাই তো বলি পাখি নাকি আমরা, হালিমা বলে মুখোমুখি জানলায় দাঁড়িয়ে, তাড়া খেয়ে খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব ? গাছের ডালে বাসা বানাব ?

আর বোলো না ভাই, ইন্দিরা বলে, মাথা ঘুরচে কদিন থেকে। এ সব কী কাণ্ড। অ্যাঁ ! কী রাঁধলে ?

তেমন প্রাণখোলা আলাপ কিন্তু নয়, কদিন আগের মতো। গলায় মৃদু অস্বস্তির সুর দুজনেরই, চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে জানালা দুটির একটি করে পাট খুলে কথা কইছে, কাজটা যেন অনুচিত ; আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। দুজনের বাড়িতেই আচমকা আশ্রয় নিতে আত্মীয়স্বজনের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই নয় শুধু, বাড়ির মানুষ বারণ করে দিয়েছে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা—অন্তত সাময়িক ভাবে।

কী যে হবে ভাবছি।

দুধে নাকি বিষ মেশাচ্ছে গয়লারা। দুধ জ্বাল দিয়ে আগে বেড়ালটাকে খানিকটা খাওয়াতে হয়, ছেলেপিলেরা খিদেয় কাঁদে, দেওয়া বারণ। আধঘণ্টা বেড়ালটা কেমন থাকে দেখে তবে ওবা পায়।

রুটি আনা বন্ধ করেছেন। রুটি যারা বানায় তাদের মধ্যে তোমরাই নাকি বেশি। এক টুকরো রুটি আর চা জুটত সকালে, এখন শুধু একটু গুড়ের চা খেয়ে থাকো সেই একটা দুটো পর্যন্ত।

এত লোক বেড়েছে, ডাল-তরকারি ছিটেফোঁটা একরোজ থাকে, আর একরোজ একদম সাফ। ভাতেও টান পড়ে।

আজ চিড়ে খেয়েছি নুন দিয়ে। গুড়ও নেই।

চোখে চোখে চেয়ে খানিক মাথা নিচু করে থাকে দুজন। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় জানালার পাটদুটি।

ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেছে দু বাড়িতে। অন্য অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তারা বড়োদের সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুখ চেনাচিনিও হয়নি বড়োদের মধ্যে কিন্তু ছেলেমেয়েদের কে ঠেকিয়ে রাখবে ? তাদের মেলামেশার দাবি রাজনীতির ধার ধারে না, আপস অনুমতির তোয়াক্কা রাখে না, জাতধর্মের বালাই মানে না। স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই, বেড়ানো নেই, বাড়ির এলাকার বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বারণ। বড়োদের মুখ অন্ধকার, বাড়িতে থমথমে ভাব, মুমূর্ষু রোগী থাকলে ঘনঘন ডাক্তার আসবার সময় যেমন হয়। ওরা তাই করে কী, হাবিব আর গীতার নেতৃত্বে নিজেরাই আয়োজন করে

কি ছেলেমানুষি করো

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

ছেলেমানুষি গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

মিলেমিশে খেলাধুলো করার। বাড়িতে ঠাঁই নেই, নিজেরাই তৈরি করে নেয় খেলাঘর। হাঙ্গামা করতে হয় না বেশি, বাইরের প্যাসেজে দুপাশের দেয়ালে দুটো পেরেক পুতে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিতেই প্যাসেজের শেষের অংশটুকু পরিণত হয়ে যায় চারিপাশ ঘেরা ছোটোখাটো একটি ঘরে। কিছু চাল ডাল ডাঁটাপাতা জোগাড় হয়েছে। গীতা এনে দিয়েছে ছোটো তোলা উনুনটি আর তেলমশলা ! তরকারির অনটনে সবার মন খুঁতখুঁত করতে থাকায় হাবিব এক ফাঁকে বাড়ির ভেতর থেকে সরিয়ে এনেছে কিছু আলু পেঁয়াজ আর একটা আস্ত বেগুন। জোরালো পরামর্শ চলছে, সব কিছু দিয়ে এক কড়া খিচুড়ি রাঁধা অথবা খিচুড়ি ভাজা তরকারি সবই রাঁধা হবে। রান্নার ভার নিয়েছে মেহের, তার বয়স ন-দশবছর, এই বয়সেই বড়োদের আসল রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করতে হয় বলে তার অভিজ্ঞতার দাবি সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু উনুনে তাদের আঁচও পড়ে না, রান্নাও শুরু হতে পায় না। টের পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে দু বাড়ির বড়োরা। মেহেরের বাপের নিকা বউ নুরুন্নেসা মেয়ের বেণি ধরে মাথা টেনে গালে চড় বসায়। পুষ্পর মাসিমা এক ঠোনায় রক্ত বার করে দেয় ভাগনির ঠোঁটে। কান ছাড়াতে হাত পা ছোঁড়ে গীতা, লাথি লাগে তারাপদর পেটে। হাবিব কামড় বসিয়ে দেয় নাসিরুদ্দীনের হাতে। বাচ্চাদের কাঁদাকাটা বড়োদের হইচই মিলে সৃষ্টি হয় আওয়াজ। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কী হয়েছে জানতে চেয়ে বাধিয়ে নেয় রীতিমতো হুল্লোড়, প্যাসেজের মুখে গলিতে জমে ওঠে লাঠি রড ইট হাতে ছোটোখাটো ভিড়।

কয়েক মুহূর্ত, আর কয়েক মুহূর্তে স্থির হয়ে যাবে মেশাল পাড়াব ভাগা—জিইয়ে রাখা শান্তি অথবা অকারণে ডেকে আনা সর্বনাশ। কান্না ভুলে বড়ো বড়ো চোখ মেলে ছেলেমেয়েরা চেয়ে দেখে বড়োদের অর্থহীন কাণ্ড।

ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে পিস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক দুজন ছুটে আসায় অল্পের জন্য হাঙ্গামা ঠেকে যায়। সম্পাদক দুজন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন।

ভিড়ে ভাঙন ধরে। দু-চারমিনিটের মধ্যে ভলান্টিয়াররা ভিড় সাফ করে দেয়।

তখন যুগ্ম-সম্পাদক দুজন পরামর্শ করে ভলান্টিয়ারদের পাঠান পাড়ায় পাড়ায় সত্য ঘটনা প্রচার করতে। এমন স্পর্শকাতর হয়ে আছে মানুষের মন যে এ রকম তুচ্ছ ঘটনাও দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে পারে মারাত্মক গুজব হয়ে।

বিকালে একটা লরি আসে পুলিশ ও সৈন্যের ছোটো একটি দল নিয়ে। চারিদিক তখন শান্ত। বুটের আওয়াজ তুলে কিছুক্ষণ তারা এদিক ওদিক টহল দেয়। এ বাড়ি ও বাড়ির দরজায় ঘা মেরে এর ওর দোকানে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় গোলমাল হয়েছিল। জবাব শোনে আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য, যে কোথাও গোলমাল হয়নি। ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট মনে হয় তাদের, আগমন কি তাদের অনর্থক হবে ? গলির মোড়ে নিতাইয়ের দোকানের একপাশে তক্তপোশ পেতে চারজন সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে লরি ফিরে যায় বাকি সকলকে নিয়ে। নতুন এক সশঙ্ক অস্বস্তিবোধ ছড়িয়ে পড়ে মেশাল পাড়ায়। সাঁঝবাতির আগেই বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট, মানুষ গিয়ে ঢোকে কোটরে, শূন্য হয়ে যায় পথ।

এ বাড়ি থেকে কথা শোনা যায় ও বাড়ির। কিন্তু কথার আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। চুপিচুপি দু-এক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি জানালার পাটও একটু ফাঁক হয় না। এ বাড়ি ভাবে ও বাড়ির জন্য মিলিটারি এসে পাড়ায় গেড়ে বসেচে কী জানি কখন কী হয়। ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ। ঘরের জেলে তারা কয়েদ।

ছাত ভাগ করা দেয়ালের এ পাশ থেকে গীতা বলে, আসবি হাবিব ?

মারবে যে ?

না পিসির ঘরে চুপিচুপি খেলব।

পিসি বকবে তো ?

দুর। রান্না করে নেয়ে আসতে পিসির বিকেল বেজে যাবে।

ছাতের সিঁড়ির মাঝে বাঁকের নিচু লম্বাটে কোটরটি পিসি বহুদিন দখল করে আছে, তার নীচে দোতলার কলঘর। লম্বা মানুষ এ ঘরে দাঁড়ালে ছাতে মাথা ঠেকবে। পিসির নিজস্ব হাঁড়িকুঁড়ি কাঠের বাক্সো কাঁথা বিছানায় কোটরটি ভরা। কুশের আসন পেতে এ ঘরে পিসি আহ্নিক করে। আমিষ-রান্নাঘরে একবার ঢুকলে স্নান করে শুদ্ধ হবার আগে পিসি আর এ ঘরে আসে না।

ঘরের মধ্যে এ ভাবে লুকিয়ে চুপিচুপি কী খেলা করবে, হাবিবকে নিয়ে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দেবার উপায় নেই, ওদেরও ডাকা যায় না এখানে। তাই নতুন খেলা আবিষ্কার করে নিতে হয়।

দাঙ্গা দাঙ্গা খেলবি ? গীতা বলে।

লাঠি কই ? ছোরা কই ? প্রশ্ন করে হাবিব।

গীতা বলে, দাঁড়া।

গীতা চুপিচুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারাপদর খুর আর ছুরি। খুরটি পুরানো, কামানো হয় না, কাগজ পেন্সিল দড়ি কাটার কাজেই লাগে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে গীতা ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি এটে দেয়। হাবিবের চেয়ে সে একটু ঢ্যাঙা।

তুই আকবর আমি পদ্মিনী। আয় !

খেলা, ছেলেখেলা। অসাবধানে কখন যে সামান্য কেটে যায় একজনের গা অপরের অস্ত্রে।

মারলি ?

ব্যথা পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে প্রতিশোধ নেয় অপরের গায়ে। জেদি দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুজন, ব্যথায় রাগে অভিমানে দিশেহারা হয়ে কাটাকাটি হানাহানি শুরু করে ভোতা খুর আর ভোতা ছুরি দিয়ে। সেই সঙ্গে চলে গলা ফাটিয়ে আর্তকান্না। ইন্দিরা পিসিমারা ছুটে আসে কলরব করে। ছুটে আসে ও বাড়ির হালিমা নুরুন্নেসারা। তারা সিঁড়িতে উঠে পিসির কোটরের দরজার সামনে ভিড় করে থাকায় তারাপদ ও বাড়ির অন্য পুরুষদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিঁড়ির নীচে।

সদর দরজায় বাড়ির অন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীন হাঁকে, তারাপদ !

দুটি মাত্র শিক বসানো ছোট্ট একটি খোপ আছে পিসির ঘরে, এক সময় একজনের বেশি দেখতে পারে না ভেতরের কাণ্ড। এক নজর ভেতরে তাকিয়ে ইন্দিরা আর্তনাদ করে উঠে, মেরে ফেলল ! মেয়েটাকে মেরে ফেলল গো।

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায় : খোল ! খোল ! দরজা খোল ! খুনে ছোঁড়া দরজা বন্ধ করে খুন করছে মেয়েটাকে। দরজা খোল !

হালিমাও এক নজর তাকিয়ে অবিকল তেমনি সুরে আর্তনাদ করে ওঠে, মেরে ফেলল ! ছেলেটাকে মেরে ফেলল !

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায়। খোল ! খোল ! দরজা খোল ! খুনে ছুঁড়ি দরজা বন্ধ করে খুন করছে ছেলেটাকে। দরজা খোল।

পিসি চেঁচায়, হায় হায় হায়, সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলে গো !

নীচে থেকে নাসিরুদ্দীন হাঁকে, তারাপদ ! আমরা অন্দরে ঢুকব বলে দিচ্ছি !

পিসিকে ঠেলে সরিয়ে ইন্দিরা আর হালিমা একসঙ্গে পাগলিনির মতো খোপের ফোকর দিয়ে ভেতরে তাকাতে চায়, মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হয়ে যায় দুজনের। আক্রমণে উদ্যত বাঘিনির মতো হিংস্র চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

ভেতরে ততক্ষণে গীতা আর হাবিবের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। বাইরের হট্টগোলে চুপ হয়ে গেছে তারা। কিন্তু লড়াই থামায়নি, আগে কে হার মানবে অপরের কাছে ! নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ে জড়াজড়ি কামড়াকামড়ি করে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় পিসির হাঁড়িকুঁড়ি।

হায়, হায় ! সব গেল গো, সব গেল !

নাসিরুদ্দীনকে ওপরে ডেকে আনে তারাপদ।

সেই লাথি মেরে দরজা ভাঙে। দরজাটা ঠিক ভাঙে না, ছিটকিনিটা খসে যায়।

ওপর ওপর চামড়া কাটাকুটি হয়েছে খানিকটা, কিছু রক্তপাত ঘটেছে। নিজের নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ ইন্দিরা আর হালিমা ব্যাকুল দৃষ্টি বুলিয়ে যায় তাদের সর্বাঙ্গে। তারপর প্রায় একই সময় দুজনে মুখ তোলে চোখে অকথ্য হিংসার আগুন নিয়ে। দুজনেই যেন অবাক হয়ে যায় অপর কোলে আহত নির্জীব অপরের সন্তানটিকে দেখে, বহুকাল ভুলে থাকার পর দুজনেই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে অন্যজনও মা, তার সন্তানের গায়েও রক্ত।

বাইরে আবার ভিড় জমেছিল। আবার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সংঘর্ষ। তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন দু বাড়ির এই দুই কর্তাকে পাশাপাশি সামনে হাজির করতে না পারলে পিস কমিটি এবার কোনোমতেই ঠেকাতে পারত না সর্বনাশ।

আইডিন লাগিয়ে নাইয়ে খাইয়ে দু বাড়িতে শুইয়ে রাখা হয় হাবিব আর গীতাকে। ছুটির দিন, ঢিমেতালে সংসারের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে এমনিই দুপুর গড়িয়ে যেত আগে, এখন আবার বাড়তি লোকের ভিড়। বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ আগে পরে দু বাড়িতে খোঁজ পড়ে ছেলেমেয়ে দুটির।

খোঁজ মেলে না একজনেরও।

আবার তন্নতন্ন করে খোঁজা হয় বাড়ি, আনাচ-কানাচ, চৌকির তলা। গীতা বাড়িতে নেই। হাবিব বাড়িতে নেই।

শঙ্কায় কালো হয়ে যায় দু বাড়ির মুখ। কিছুক্ষণ গমগম করে স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে মুখর গুঞ্জন।

এ বাড়ি বলে বুক চাপড়ে : শোধ নিয়েছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয় গুম করে রেখেছে, নয়—

ও বাড়ি প্রতিধ্বনি তোলে মাথা কপাল কুটে।

তারাপদ বলে, গীতা নিশ্চয় আছে তোমার বাড়িতে নাসির।

নাসিরুদ্দীন বলে, হাবিবকে তোমরা নিশ্চয় গুম করেছ তারাপদ।

এবার আর রোখা যায় না, আগুনের মতো গুজব আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও উসকানিদাতারা এ মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি, এমনই একটি সুযোগের জন্য তারা যেন ওত পেতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে বাড়ি দুটির সামনে জড়ো হয় দু দল উন্মাদ মানুষ। এরা এ বাড়িতে চড়াও হবে, ওরা ও বাড়িতে। কিন্তু দল যখন দুটি তখন আগে বাইরে রাস্তায় লড়াই করে অন্য দলকে হটিয়ে জয়ী হতে না পারলে কোনো দলের পক্ষেই বাড়ি চড়াও হওয়া সম্ভব নয়।

মারামারি হবেই। সেটা জানা কথা। আগেই বেধে যেত, পিস কমিটির চেষ্টায় শুধু দু-দশ মিনিটের জন্য ঠেকে আছে।

যুগ্ম-সম্পাদক বলেন, আমরা তল্লাশ করাচ্ছি বাড়ি।

জনতা সে কথা কানে তোলে না। তাদের শান্ত রাখতে গিয়ে গালাগালি শোনে, মারও খায় কয়েকজন ভলান্টিয়ার। তবু তারা চেষ্টা করে যায়। গলির মোড়ের সৈন্য চারজন চুপচাপ বসে আছে।

এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, ওই যে হাবিব ! ওই যে।

আরেকজন চেঁচায়, ওই তো গীতা !

সকলের দৃষ্টিই ছিল নীচের দিকে, এ অবস্থায় কে চোখ তুলে তাকাবে ওপরে। কারও নজরে পড়েনি যে, নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়ির চিলেকুঠির ছাত থেকে কিছুক্ষণ ধরে পাশাপাশি একটি ছেলে ও মেয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে। ছাত ভাগ করা দেয়ালের দু পাশে দু বাড়ির ছাতের সিঁড়ির চিলেকুঠি একটাই। কখন যে তারা দুজন চুপিচুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল ! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন কলরব করে ওঠে : পাওয়া গেছে ! দুজনকেই পাওয়া গেছে !

সবার চোখের সামনে হারানো ছেলেমেয়ে দুটোর অকাট্য জলজ্যান্ত আবির্ভাব হল বলেই যে মারামারি ঠেকানো যেত তা নয়। হিংসায় উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে যারা খুনোখুনি করতে এসেছে অনেকে তারা জানেও না ওদের দুটিকে নিয়েই আজকের যত গন্ডগোলের সূত্রপাত। হঠাৎ এই খাপছাড়া ঘটনায়, দু দলেই কিছু লোক চঞ্চল হয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠায়, ব্যাপারটি কী জানবার জন্য যে কৌতূহল জাগল জনতার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে পিস কমিটির সম্পাদক দুজন সেটা কাজে লাগিয়ে ফেলায় ঘটনার মোড় ঘুরে গেল।

জনতা সাফ হয়ে যাবার অনেক পরে আবার লরি বোঝাই মিলিটারি এল।

বহুক্ষণ সার্চ চলে নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়িতে, গুম করা ছেলেমেয়ে দুটির সন্ধানে। হালিমা আর ইন্দিরার গা ঠেসে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাই দেখতে থাকে গীতা আর হাবিব।

স্থানে ও স্তানে

চেনা লোক বলে, পালাচ্ছেন তো !

বুক যার ছোটো হয়ে গেছে ভয়ে. উপায় থাকলে আজকেই সপরিবারে পালাত নিজেই, তার প্রশ্নটা ঝাঁঝালো, মন্তব্য যা যোগ হয় প্রশ্নের সঙ্গে তার ঝাঁঝ আরও বেশি।

পালাব কেন ? নরহরি বলে, স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।

দু-একজন তাকে যারা ভালো করে চেনে, বিশ্বাস করে।—সেকী, এখন আনবেন ? পনেরোই আগস্ট যাক ? দু-একমাস দেখুন কী দাঁড়ায়। নিজে থাকেন আলাদা কথা, এ সময় মেয়েছেলেদের আনাটা—

পেটের দায়ে থাকতেই যখন হবে, দেরি করে লাভ কী। কিছু হবে না ধরে নেওয়াই ভালো তাতে মনের জোর বাড়ে।—নরহরি জবাব দেয়।

স্টিমারে অসম্ভব ভিড়। পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ স্টিমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গোবুছাগলের মতোই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল। নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা উদারতা। আজ সকলের চোখেমুখে নড়াচড়ায় কথা বলার ভঙ্গিতে সমবেত গুঞ্জনে একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্‌বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সীমাসংখ্যাহীন অচেতন আদান প্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতোই মানুষ। মনে হয়, বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনায় যেন আবর্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

ট্রেনে এক দুর্ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে একটা অসম্পূর্ণ ডাকাতি হয়ে গেল মেয়েদের কামরায়। দশ-বারোজন ডাকাত সকলেই অস্ত্রধারী, দুজনের অস্ত্র আগ্নেয়। গাড়িতে সেপাই পুলিশ ছিল কিনা টের পাওয়া গেল না ডাকাতেরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে। আগের স্টেশন থেকে ছাড়ার পর গাড়ির গতি যখন একবার মন্থর হয়ে আসে লোকগুলি তখন কামরায় ওঠে। ঠিক ওখানে দুটি স্টেশনের মাঝামাঝি ওই নির্জন জায়গায়, গাড়ির গতি এ রকম কমে যাওয়ার কৈফিয়ত পরে দিতে হবে, এটুকু ভাবনাও নেই গাড়ি যারা চালায় তাদের। গয়নাগাটি সব সংগ্রহ করে একটি তরুণীকে সাথি করে নির্দিষ্ট স্থানে চেন টেনে নেমে পালাবার ব্যবস্থাই বোধ হয় তাদের ছিল। কিন্তু উঁচানো ছোরা বন্দুক গ্রাহ্য না করে মেয়েটির মা আগেই চেন টেনে বসায় তাকে আহত করে অসমাপ্ত রেখেই লোকগুলি নেমে পালায় ! একদল যাত্রী হইহই করে নেমে এসে তাড়া করে। বন্দুকের গুলি তাদের ঠেকাতে পারেনি, ঠেকিয়েছিল অজানা মাঠ জঙ্গল অন্ধকার।

এটা জানা ছিল না নরহরির, সে শুনেছিল অন্যকথা। এ সব নিত্যকার ঘটনা আর এ রকম হামলা হলে নাকি যাত্রীরা সাড়া দেয় না, মটকা মেরে পড়ে থাকে বা বসে ঝিমোয়। শেষটা তা হলে সত্যি নয় !

শিয়ালদার গাড়ি পৌঁছল দেরিতে, এটাও নিত্যকার ব্যাপার। বিছানা বগলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে নরহরি একবার তাকিয়ে দেখল এই অতি পরিচিত শহরের স্টেশনের বাইরের অংশটুকুকে। সম্প্রতি যে বিজাতীয় আক্রোশ তার জন্মেছে এই শহরটির প্রতি তাই যেন উথলে উঠে নিরস্ত করেছে তার পদক্ষেপ। ছাত্রজীবনের আনন্দ উত্তেজনা স্বপ্নের সমারোহে বিয়েবাড়ির আলো আর সানাইয়ের তানে,

সুমিত্রাকে বাপের বাড়ি আনা নেওয়ার বিরহ-মিলনের মাধুর্যে কী প্রিয় ছিল এ শহর তার কাছে। কদিন আগেও ছিল। প্রিয় আর বোমাঞ্চকর তারই জমজমাট গৌরব। ঢাকায় বসে সে কাগজে খবর পড়েছে আর খুশি হয়ে অনুভব করেছে তার নিজের চঞ্চল রক্তের তাপ। ছাত্র অভিযানের জয়, লাখ নাগরিকের মিলন-অভিযানের জয়, ধর্মঘটের জয়, মিলিটারি অত্যাচার, পুড়িয়ে মারার জয়, জয়ের পর জয়। তারপর যে একটানা দীর্ঘ বীভৎসতায় মেতেছে কলকাতার লোক, তাও নবহরির কাছে শহরটিকে অপ্রিয় ঘৃণ্য কবে তুলতে পারেনি। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে শুধু মুষড়ে গিয়েছে, কাতর হয়েছে।

আজ সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে কলকাতাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে অন্তত পক্ষে নিজের নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে মারামারি করে এ শহরের হিন্দু-মুসলমানবা। তার সে ভুল ভেঙে গেছে। এ শহরে হিন্দুও থাকে না, মুসলমানও থাকে না। এটা বজ্জাতদের আস্তানা !

সুমিত্রার বাপের বাড়ি পর্যন্ত হয়তো পৌঁছবে না, পথেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সে আতঙ্ক আছে। কিন্তু যদি মরে, মরবে সে বিষাক্ত সাপের ছোবলে। কলকাতা সাপভোজী সাপের আস্তানা। হিন্দু সাপ মুসলমান সাপ বলে তো কিছু থাকতে পারে না, নিছক সাপ।

অতুলবাবুই অভ্যর্থনা করল জামাইকে, এসো বাবা এসো। ভয়ে ভাবনায় ছিলাম তারটা পেয়ে থেকে। বেয়ান ভালো আছেন ? কবরেজের ওষুধ খেয়ে কমেছে একটু ?

মা পুরী গেছেন ও মাসে।

ওঃ ! তা ভালো আছেন তো ? পুরীও নিরাপদ নয় মোটে। কাগজে যা পড়ছি বাবাজি, মাথা ঘুরে যায়। উড়িস্যার ছোঁড়াগুলি নাকি দল বেঁধে বাঙালি মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে।

মার বয়েস তো প্রায় সত্তর হল।

বড়ো শালা পরিমল বলল, ওনার ভয় নেই। কিন্তু যুবতি বাঙালি মেয়ে তো অনেক আছে উড়িষ্যায়। এদিকে গুন্ডারা খাবলা দিচ্ছে বাঙালি মেয়ের ওপর, ওদিকে উড়িয়ারা অত্যাচার শুরু করেছে, কী বিপদ ভাব তো !

মেজো শালা শ্যামল বলল, দুটো উড়িয়াকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়েছি আজ জন্মে ভুলবে না। মুড়িমুড়কির দোকানেব ওই অর্জুন আব সতীশবাবুর চাকরটাকে। সুধীনবাবুব ঝি আব অর্জুনের বউটাকে ছেলেরা ধরেছিল। তা আমরা ভেবে দেখলাম কী, যতই হোক আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া উচিত হবে না। ভেবেচিন্তে তাই ছেড়ে দিলাম। জানো নরহরি, ভদ্র হয়েই আমরা আজ বিপদে পড়েছি। ওদের মেয়েছেলের ওপব যদি অত্যাচার চালাতে পারতাম, ওরা ঠান্ডা হয়ে যেত।

নরহরির খিদে পেয়েছিল। বমিও পেতে থাকে।

আদর অভ্যর্থনা হয় নিখুঁত। বড়োলোক নয় নরহরির শ্বশুর, অথচ ভেজিটেবিল ঘিয়ে ভাজা লুচির সঙ্গে সন্দেশ দেওয়া হয় তাকে জলখাবার। ঘরে তৈবি মিষ্টি ছানা নয়, দোকানের দামি সন্দেশ। খাবারের দোকান সব বন্ধ, তবু।

কার ছেলে কাঁদছে গলা ফাটিয়ে, তার বাচ্চাটার আওয়াজের মতোই যেন মনে হয়। শালি সুষমা তাকে শান্ত করছে, চুপ, চুপ, শিগগির চুপ,—মুসলমান ধরে নেবে !

পালটা ছড়াও শুনেছে নরহরি—চুপ, চুপ, শিখ আসছে !

তা, দুমুখী ক্রিয়ার দুমুখী প্রতিক্রিয়া হবেই।

অতুল সাবধান করে দেয়, কাজ না থাকলে বেরিয়ে কাজ নেই।

শ্যামল ব্যাখ্যা করে বলে, বেরোনো মানেই প্রাণ হাতে করে যাওয়া। এখানে হাঙ্গামা নেই, যেখানে যাবে সেখানেও নেই, কিন্তু যেতে হয়তো হবে এমন এলাকা দিয়ে—

মুশকিল ওইখানে, পরিমল বলে সায় দিয়ে, কোনো এলাকাটা সেফ নয়, জানাটানা থাকলেও বরং খানিকটা—

নরহরির মুখ দেখে ছোটো শালা অমল বলে, আচ্ছা, অত বলতে হবে না, জামাইবাবুর প্রাণের মায়া আছে। দরকার থাকলে বেরোবেন, যেদিক সেদিক ঘুরবেন না, ব্যাস্।

তুই তো বলেই খালাস—পরিমল চটে বলে, জামাইবাবু জানবে কী করে ? ব্যাটারা ট্রাম চালু রেখেছে চাদ্দিকে। নরহরির মনে হতে পারে না ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই ? ব্যাটাদের এরিয়ায় ভুল করে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নামিয়ে—

ভুল করে তোমাদের এরিয়ায় ঢুকলে তোমরা সন্দেশ খাইয়ে দাও না ?

গম্ভীর হয়ে যায় বাপদাদাদের মুখ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো ছোঁড়ার বিশ্রী গা-জ্বালানো কথাবার্তা।

নরহরি সবিনয়ে বলে, বেরোব আর কোথায়, দু-একটা জিনিসপত্র কেনা। কারও সাথে দেখা করার সময় হবে না। গোছগাছ করে দিনে দিনেই স্টেশনে চলে যাব সবাইকে নিয়ে।

সত্যি সুমিকে নিয়ে যাবে বলছ নাকি ? পরিমল বলে।

চিঠি পাননি ?

চিঠি তো পেয়েছি। মানে বাপু বুঝতে পারিনি চিঠিব তোমার। মাথা খারাপ না হলে কেউ—

থাক, থাক। অতুল বলে হবেখন ও সব কথা। নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, ওবেলা বসে পরামর্শ করা যাবে। আজ তোমাদের যাওয়া হয় না।

নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, আমার মেয়ের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া কর, মাথা তোমাব ঠান্ডা হোক, ওবেলা আমরা তোমায় ছেঁকে ধরব ! এ রাজনীতি নরহরি জানে।

আরও ঠান্ডা হয়ে, আরও সবিনয়ে নরহরি বলে, আজকেই রওনা দিতে হবে। চিঠি লেখাব সময় ভেবেছিলাম দু-একদিন থাকতে পারব। সে উপায় নেই। বোঝেন তো অবস্থা।

স্টেশনেও ঠিক করেনি আজকেই ফিরে যাবে। কাল থেকে পরশু রওনা দেবে ভাবা ছিল। রাজপথে শহরের সন্ত্রস্ত চেহারা, বাস থেকে ক্ষণকালের দেখা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসা কতগুলি লোকের নির্ভয়ে নির্বিকার চিত্তে একজন পথচারীকে, একক পথচারীকে কুৎসিত মৃত্যুদানেব ঘটনা, এ বাড়ির হিংস্র বদ্ধ আবহাওয়া, তার দম আটকে আনছে। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব আত্মীয়কে মনে হচ্ছে শত্রু।

ব্যাপারটা কী বল তো ? আলোচনা পিছিয়ে দেবার আশা ছেড়ে অতুল বলে, যে পারে পালিয়ে আসছে, যে না পারে সে অন্তত মেয়েছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ সুমিকে নিয়ে যাবে !

যে পারে সেই পালিয়ে আসছে না। এমন ঢের লোক আছে যারা অনায়াসে চলে আসতে পারে, তারা ওখানে থাকা ঠিক করেছে।

সে আর কদ্দিন থাকবে ! শ্যামল হেসে বলে, তোমার তাড়াহুড়োটা পড়ল কীসে ? টিকতে যদি ওরা দেয়, তখন নয় নিয়ে যেও সুমিকে, এখন কেন ?

কাজ বজায় রাখার জন্য নিতে হচ্ছে। ওলট-পালট হচ্ছে তো চারিদিকে, কতক লোক থাকবে, কতক নতুন লোক আসবে, কিছু লোকের কাজ যাবে ! এদের না নিয়ে গেলে কাজটা যেতে পাবে আমার।

সে কী !

তাই তো স্বাভাবিক। ঘরসংসার পেতে যারা আছে, যারা থাকতে চায়, তারা নিশ্চয় প্রেফারেন্স পাবে। আমি বউ ছেলে পাঠিয়ে দেব কলকাতায়, পালাবার জন্য এক পা বাড়িয়ে থাকব, আমায় খাতির করবে কেন ?

বলেছে নাকি ? তোমার তো হিন্দু আপিস ! হিন্দু হয়ে কর্তা তোমায় এ কথা বলল ?

নরহরি শ্রান্ত চোখে তাকায়।—কর্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ও দেশের লোক হয়ে ? যখন খুশি ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরি থাকব, তবু কর্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে ? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে ?

যায় যাবে অমন কাজ ! শ্যামল বলে বীরের মতো, চাকরির জন্য বউটাকে অমন বিপদের মধ্যে নেওয়া যায় না। অল্পবয়সি মেয়ে বউ একটিকে ওরা ছাড়বে না।

কয়েক লাখ অল্পবয়সি মেয়ে বউকে ওখানে থাকতেই হবে শ্যামল। তোমার বোন যদি যান, আর একটি মোটে বাড়বে।

ও সব কথা রাখো, বিচক্ষণ অতুল বলে, ভয় তো আছে। কাজ যদি যায় অগত্যা যাবে, উপায় কী ! কলকাতায় চলে আসবে, একটা কিছু খুঁজে পেতে নেবে।

ঘরবাড়ি ফেলে চলে আসব ? আপনাদের তো হাজার হাজার লোকের চাকরি যাচ্ছে, চাকরি দেবে কে আমায় ?

সে যা হয় হবে, উপায় কী ! তাই বলে---

আপনি তো বলে খালাস !

সুমির মতো অনেককেই যে থাকতে হবে পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে, এ কথাটা গায়েও মাখল না কেউ, তুচ্ছ হয়ে উড়ে গেল। বোধ হয় ধারণায় আসে না। অন্য সকলের যা হয় হোক, এর মেয়ে আর ওদের বোন সুমিত্রা নিরাপদ থাকলেই হল। সুমিত্রা তার বউ বটে, শত শত বউয়ের কী হবে না হবে এ কথাটা সে কেন টেনে আনছে তার নিজের বউয়ের প্রসঙ্গে, বুঝে উঠতে পারছে না এরা। একটু স্তম্ভিত হয়ে গেছে তার কথাবার্তায়।

তোমার মতলব ভালো নয় নরহরি, শ্যামল সক্রোধে বলে, স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে তুমি চাকরি রাখতে চাও !

অতুল অতিকষ্টে বিবাদ সামলায় স্ত্রীর সাহায্য পেয়ে. সৌভাগ্যক্রমে চড়া গলার আওয়াজ পেয়েই নরহরির শাশুড়ি হলুদ-লংকা মাখা হাতেই ছুটে এসেছিল। মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছিল দরজার আশেপাশে, আলোচনার গুরুত্ব বুঝে সাহস করে ঘরে ঢোকেনি, এবার ঘরে ঢুকেও তফাতে দাঁড়িয়ে এবং বসে রইল। সুমিত্রা ঝনাৎ ঝনাৎ চাবির রিঙের আওয়াজ করল তিন-চারবার পিঠে আছড়ে আছড়ে।

তবু, গুম খেয়ে যাবার আগে নরহরি ঘোষণা করল, হাজার হাজার স্ত্রীর যদি বিপদ থাকে, আমার স্ত্রীরও থাকবে।

চুপ করে থাকা উচিত জেনে পরিমলও তবু বলে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে ডুমড় এ তো জানা কথাই !

গুম খেয়ে যাবে ঠিক করেও নরহরি বলে, আমরা যদি ডুমড় হই, আপনাদের জন্য হব। আপনারাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

অমল আগাগোড়া চুপ করে ছিল। সে মুখ খুললেই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের কথার চেয়ে তার কথার বেশি জ্বালা ধরে বাড়ির লোকের গায়ে।

পার্কসার্কাসের আমার একটি চেনা লোক বলছিল, এবার সে ধীরে ধীরে বলে এবং এমনই আশ্চর্য যে তার কথা শেষ পর্যন্ত শুনলে গায়ে জ্বালা ধরবে জেনেও সবাই যেন ধৈর্য ধরে মন দিয়ে তার কথা শোনে,—অ্যাদ্দিন হিন্দুদের শত্রু ভাবতাম, এবার দেখছি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতভাইরাই আমাদের দফা সারবে !

তুই চুপ কর। কথা শোনার পর অতুল তাকে ধমকায়।

সুমিত্রা সুমিষ্টই আছে। অনেকদিন দেখা না হওয়ার সে মিষ্টতা ঘন হয়ে প্রায় দানা বেঁধেছে। আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, রাঁধাবাড়া খাওয়াদাওয়া ঢিমে তালে চলেছে। আজকের গাড়িতেই সুমিত্রাকে নিয়ে নরহরি রওনা দিলে অবশ্য একটা তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বাড়ির লোক জানে শেষ পর্যন্ত নরহরিকে পাগলামি ছাড়তেই হবে, সুমিত্রাকে সে রেখেই যাবে এখানে এবং দু-একটা দিন সে নিজে এখানে থাকবে। তবু, সংশয় আছে সবার মনে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে সবাই জানে সমস্যা সহজ নয়, মোটেই তারা আয়ত্ত করতে পারেনি সমস্যার আগামাথা। নরহরি যেমন হোক একটা সিদ্ধান্ত করেছে। হৃদয়াবেগ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে নিজের ভালোমন্দ হিসাব করেই সিদ্ধান্ত করেছে। সহজ হবে না ওকে টলানো।

চিরদিন একটু জেদি আর একগুঁয়েও বটে সে—বাঙাল তো। সেবার ওর বড়োখোকার চিকিৎসা করছিল এ পরিবারের বিশ্বস্ত কবিরাজ, ও সবার মত উড়িয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ডেকে এনেছিল চারটাকা ভিজিটের অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার—শ্বশুরবাড়িতে পা দেবার দু ঘণ্টার মধ্যে।

বলেছিল, আমার ছেলে যদি মরে, আমি যে চিকিৎসায় বিশ্বাস করি সেই চিকিৎসায় মরুক।

কী কাটা কাটা কথা। ছেলেটা অবশ্য বেঁচে গেছে ভগবানের দয়ায়, কিন্তু ভগবান না করুন কিছু যদি ভালোমন্দ হত ছেলেটার, আজ কোথায় মুখ থাকত নরহরির ? কী আপশোশটাই তাকে করতে হত গুরুজনের কথা না শোনার জন্য, গুরুজনকে অবজ্ঞা করা জন্য !

তাই, তাড়া না থাকলেও বারোটার মধ্যে খাইয়ে দেওয়া হল নরহরিকে। ঘর ও বিছানা দেওয়া হল শুতে। একটার মধ্যে সুমিত্রা ঘরে গেল। তার ছেলেটা ও বাচ্চা মেয়েটা জিম্মা রইল দিদি ও বউদিদিদের হেফাজতে।

ঘণ্টাখানেক জীবনমরণ সমস্যার কথা ওঠাই উচিত ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু সুমিত্রা ভাবল কী, বিরহে একেবারে চরমে চড়ে আছে মানুষটা, খাঁ খাঁ করছে, গুরুতর ব্যাপারটার মীমাংসার এ সুবিধাটুকু না ছাড়াই ভালো। আগে বোঝাপড়া হোক, নরহরি স্বীকার করুক এখনকার মতো বাপের বাড়িতেই সে তাকে রাখবে, তারপর হাসিমুখে নিজেকে সে সঁপে দেবে। ব্যাকুল হয়ে পাগল হয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। ব্যাকুল সেও কি হয়নি ? কিন্তু মাথাগরম পুরুষমানুষের পাগলামি সামলে চলতে একটু সংযত না হলে চলবে কেন মেয়েমানুসের !

এসেই ঝগড়া শুরু করলে ? বেশ তুমি। পান চিবানো বন্ধ রেখে পানরাঙা ঠোঁটে হাসে সুমিত্রা, একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আধভেজা চুল শুকনো তোয়ালেয় ঝাড়বার আয়োজন করে।

আমি ঝগড়া করলাম ? আশ্চর্য হয়ে বলে নরহরি, চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে তোমায় নিতে এলাম, এখন বলছেন যেতে দেবেন না। তোমায় আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাই, তাতে ওদের কী ?

মনে মনে একটু চটে যায় বইকী সুমিত্রা।

ওরা আমার বাপ মা ভাই বোন যে গো। ভাবনা হবে না ?

হুঁ। আমি তোমার কেউ নই।

বাঃ বাঃ, কী যে বলে। তোমার হাতে সঁপে দিলেন আমায়, তুমি বুঝি রাস্তার লোক ? বাপভাই বুঝি রাস্তার লোককে ঘরে ডেকে শুতে দেয় ? আমি বুঝি রাস্তার লোকের—

জমে না, সুবিধা হয় না। অনেক হিংসা অনেক বিবাদ অনেক ভয়ংকর মৃত্যুর বাস্তবতা সব যেন ওলট-পালট করে দিয়েছে, খিল দেওয়া ঘরের নির্জন নিরিবিলি মাধুর্যের ভূমিকা পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছে কোটি জীবনের গুরুভার সমস্যার।

আমি তো আজকেই যাব ভাবছিলাম।

আমাকে নিয়ে ?

তবে কী ? তোমাকে নিতেই তো এলাম।

ক্রমে কলহ এবং কান্না। এ সব আগে হয়েছে অনেক, আজ যেন কী বিষে বিষাক্ত করেছে কলহ কান্নাকে। এ অস্ত্রও তেমন ফলপ্রদ নয় দেখে আবার মিষ্টি হয়ে উঠে নরহরির বুকে আশ্রয় করল সুমিত্রা। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা কত নিবিড় কত ঘাতসহ হয়েছে সন্তানের পিতামাতার ভালোবাসা হয়ে। তবু যেন ফাটল ধরল, ভেঙে যাবার উপক্রম করল আজকের আঘাতে।

তুমি যদি বল, নরহরি যেন দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নেবার মতো করে বলল, আজ না গিয়ে পরশু যেতে রাজি আছি। কিন্তু তোমায় যেতে হবে।

আমি মরতে যেতে পারব না।

আমি যে মরব ?

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

এ ছেলেখেলা নয়, নরহরি বলে, রাগ-অভিমানের কথা নয়। যদি না যাও আমার সঙ্গে এখন, বাকি জীবনটা বাপের বাড়িতে কাটাতে হবে তোমার—বিধবার মতো।

আমায় নয় মেরে ফেলে তুমি—আর্তনাদ করে ওঠে সুমিত্রা, রাতবিরেতে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমাকে, যা খুশি করবে আমায় নিয়ে তার চেয়ে তুমিই আমায় মেরে ফেলো নিজের হাতে !

শ্রান্ত ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকে নরহরি। বিষণ্ণ বিপন্ন ভাবে। কোথায় যেন ছোটো একটা ছেলে কাঁদছে। এ বাড়িতেই বোধ হয়, তার ছেলেটার মতো গলা। অন্যের কাছে থাকতে না চেয়ে মার জন্যই বোধ হয় কাঁদছে।

স্টেশন রোড

শহরের বাজার অঞ্চলের রাস্তা থেকে যেন খানিকটা মাইল তুলে এনে বসিয়ে দেওযা হয়েছে একটা মাথা স্টেশনে ঠেকিয়ে। ফাঁকা মাঠ আর খেতের মধ্যে দু মাইল দূরের শহরটার একটুকবো একটা খাস্তা নমুনার মতো। দু মাইল দূরেও শুধু আরম্ভ শহরের, ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে স্টেশন রোড সেখানে আপিস আদালত এলাকায় পৌঁছে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে গেছে এদিক ওদিক। স্টেশনেব কাছের নমুনাটা শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলের, যেখানে দোকানপাট বাজারহাট।

স্টেশন ঘেঁষে স্টেশন রোডের এই নোংরা ঘিঞ্জি সমৃদ্ধির সেটাই আসল কারণ। চারিদিকে ছড়িয়ে পাতা আছে আইনি মামলার জাল, এ শহরটা তার জেলা কেন্দ্র। প্রতিদিন বহুলোক আসে চাবিদিক থেকে, ট্রেনে এবং বাসে, পায়ে হেঁটে প্রদেশ থেকে প্রদেশে টানা সুদীর্ঘ সরকারি পথটা দিয়ে বাস চলাচল করে মহকুমা থেকে মহকুমা শহরে, লাইনের ওপারে স্টেশন। সামনে দাঁড়িয়ে জল নিযে জিরিয়ে আবাব রওনা দেয়। বাসের যাত্রীদেরও শহরে যাবার পথ এই স্টেশন বোড। মামলা ছাড়া নানা কাজে অকাজেও মানুষ শহবে আসে। ফেরার তাগিদে অনেকে সময় পায় না শহরেব অতদূর বাজাবে গিয়ে কেনাকাটা করতে। এমন মানুষও থাকে অনেক যারা কেনাকাটার কথা ভুলে থাকে সামনে দোকানপাট নজবে পড়া পর্যন্ত ! দোকান দেখে আচমকা কিছু কেনার শখও জাগে কারও কারও, সঙ্গেব পয়সাব কামড়ানিতে। তা ছাড়া প্রতিদিনই থাকে কমবেশি একদল অসময়ের যাত্রী, একটা ট্রেন আসে বাত সাড়ে বারোটায় অরেকটা তিনটেয়। ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়ে একটা। এ সব যাত্রীরাও তো বসবে খাবে শোবে ঘুমোবে জিনিস কিনবে, দরকাবি বা শখের। কেউ নেশাও চাইবে, কেউ মেয়েলোক। শ্রান্ত ক্লান্ত মর্মাহত দিশেহারা গেঁয়ো চাষি অন্তত এক ভাঁড় চা তো চাইবে মবিয়া হযে। তা ছাড়া, লাইনেরই ওপারে আছে কয়েকটা শালকাঠ আর শালপাতা চালানের কাবখানা-গুদাম। এ জেলায় এ ব্যাবসাটা খুব ফলাও। মালিকেরা এবং বাবুরা শহর থেকে গাড়ি সাইকেলে, যাতায়াত করেন। যারা খাটে তারা পাশেই থাকে বেশির ভাগ। শহরের বাজার অনেক দূর হয় তাদের পক্ষে।

শহরের খাস বাজারের প্রায় সব কিছু কেনাবেচার ব্যবস্থাই তাই আছে স্টেশন রোডের এই ছোট্ট নকল শহরে, বড়ো বড়ো দালান আড়ত আর দোকান ছাড়া। পান বিড়ি সিগারেট, চা শরবত, মিষ্টান্ন, চিড়ামুড়ি, পবিত্র হিন্দু হোটেল, সামসুদ্দীনের নামহীন খানাপিনা বাস-বসতেব আস্তানা, মুদি আর মনোহারি, পবিত্র হোটেলটার পিছনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত করালীচরণের দেশি মদ, নুরুলেব কাচ এনামেল এলুমিনিয়মের বাসন, রসিক সা-র জামা কাপড় চাদব গামছা, নুরুল ও বসিকের দোকানেব মাঝখানের তিন হাত ফাঁক দিয়ে গিয়ে পিছনের ন্যাড়া বটগাছটার তলে সকালে বিকালে মাছ তরকারি, কয়েকটা টিনের চালাঘরে দেহ-বেচা স্ত্রীলোক, ঘনশ্যামের চপ কাটলেট বেচা 'বাবুজ রেস্টুয়ারেন', কানাই কম্পাউন্ডারের নিউ কিউর ডিসপেনসারি, ধীরেন কবিরাজের মহামায়া ঔষধালয়, তরফদারের জলচিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথি—কী নেই !

পাল্লায় অবশ্য হার মানে শহরের সঙ্গে স্টেশন রোড, সে কথা বলাই বাহুল্য, শহরের বাজাবে আসল কারবার পয়সাওয়ালাদের, এখানে মাতব্বরি গেঁয়ো চাষি আর কাঠকাটা পাতা-বোনা খাটুয়ের, দোকানের চাকর মুনশি পান বিড়িওলার, দু-একজন ইঞ্জিনের ড্রাইভার ও খালাসির, টিকিটবাবু ও কুলিদের। তবু আরেক পাল্লায় পুষিয়ে নেয়। যতই ধুমধাম সমারোহ থাক শান্ত রাত্রে শহরের বাজার এলাকায়, স্টেশন রোডের এ জিনিস নেই, এমন জীবন্ত বৈচিত্র্য। দিনের শেষে স্টেশন রোড ঘুমের

দেশে যায় না, কর্মব্যস্ততার অবসানে শুরু করে অবসর যাপন, আত্মপ্রকাশ, চেনা-অচেনা প্রাণের যোগাযোগ। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্য নতুন মানুষ এসে ঠেকে যায় এখানে রাত্রির জন্য। যাত্রার দল, কবিওয়ালা, সাধু বৈষ্ণব ফকির। মাঝে মাঝে অনেক রাতে জমে ওঠে বাছা বাছা পালার বাছা বাছা গানওয়ালা অংশ, কবি গাওন, একতারা বা তিনতারার সাথে গান, ছড়া বা পাঁচালি। গণেশ অপেরা যাবে পাটসাহীর জমিদারবাবুর মেয়ের বিয়েতে দু রাত্রি পালা গাইতে, ভোর ভোর রওনা দেবে গোরুর গাড়িতে, রাতটা কাটাবে এখানে। স্টেশন রোডের মানুষরা খুশি। খাওয়া শোওয়ার খাসা ব্যবস্থা করে দেয় সবাই মিলে চাঁদা করে।

গানটান শোনাও দু-চারখানা ?

অধিকারী দিনকাল বোঝে, হালচাল জানে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির কালেও বুঝত, হরিশ্চন্দ্রের পালায় ঢুকিয়ে দিত ফাঁসির গান, আজ আরও বেশি বোঝে। পুরাণ আছে, রাধাকৃষ্ণের বিরহ প্রেমও আছে, কিন্তু আরও বেশি করে ফলাও হয়ে বজায় আছে ওই ফাঁসির গানের ধারা। সে বলে, মতি ? এই ছোঁড়া শুনছিস ? সেই গানটা শোনা দিকি। পয়সা না পাই পুণ্যি আছে। ইস্টিশানে রাত কাটাতে এত আদর এত দরদ বাপেব জন্মে পেইছিস শালা কোথাও ? গা ব্যাটা, গা। প্রাণ খুলে গা।

নিজে সুর করে গেয়ে অধিকারী ধরিয়ে দেয়—

রোদে জলে খাটি খাটি
আপন দেহ করে মাটি,
মাগো মাটি সোনা খাঁটি
তোমার বুকে ফসল ফলায়।
রক্ত মাসের সার দিয়ে মা,
গরিব চাষি ফসল ফলায়॥

ইংরেজ রাজাব ছানা
জোত জমিদার দৈত্য দানা
সেই ফসলে দিয়ে হানা,
চাষির মাথায় ডান্ডা চালায়।
পুলিশ চালায় গুলি মাগো,
পাক পিয়াদা ডান্ডা চালায়॥

বাইরের গাইয়ে মানুষ বা দল কেউ না থাকলে নিজেরাই আসর জমায়, গান হয় পুরানো হারমনিয়ম বাজিয়ে। সামসুদ্দীন আর ময়রা দোকানের বনমালী গাইতে জানে। সামসুদ্দীনের জবর গলা, সে গান ধরলে চারদিক গমগম করতে থাকে। বিনা আহ্বানে বিনা আয়োজনে মাঝে মাঝে জমায়েত হয় অন্যরকম, টিকিটবাবু, মনোহর বা নিতাই কম্পাউন্ডার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথকতা করে যায়, চারিদিক থেকে বাঘ কুমির কেউটের মতো দাঁত খিঁচিয়ে ফোঁসফোঁসিয়ে মরণ কী ভাবে করছে তার চরম অভিযান আর চিরদিনের মৃত্যুমুখী জীবন কী ভাবে লড়ছে তাদের দাঁত ভাঙতে, ফোঁসফোঁসানি থামাতে। সব চেয়ে জমে এই জমায়েত। দুরকম ভাবে জমে দুজনের এই কথকতায়। মনোহরের গুরুগম্ভীর বর্ণনায় গা ছমছম করে শ্রোতার, কথার আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে হৃদয়, তীব্রতায় আগুন ধরে যায় রক্তে, দাঁতে দাঁতে চেপে হাত মুঠো করে ফেলে অনেকে। নিতাই আবার অন্যরকম, সে থেকে থেকে সকলকে হাসায়, বুকে জ্বালা ধরিয়ে শুধু মুখে হাসায়। আগাগোড়া তার কথা ও সুর হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার কিন্তু তারই ঝাঁঝে আঁতে যেন ছ্যাঁকা লাগে সকলের। তারা হাসে যেন সায় দিয়ে যে ঠিক ঠিক, ও সব দলন পেষণ নিছক রসিকতা প্রজার সাথে রাজার, গরিবের সাথে বড়োলোকের, আমরা আমরা বুঝি ও রসিকতা, আমরাও জানি রসিকতা করতে !

কিছুই ওলটপালট করতে পারে না স্টেশন রোডের নৈশ জীবনের স্বকীয়তা। চেষ্টা করে কেউ এটা গড়ে তোলেনি, বিপর্যয় বিক্ষোভ নির্যাতন মন্বন্তরের মধ্যে আপনা থেকে সৃষ্টি হয়ে গেছে এখানকার পথাশ্রয়ী জীবনের এই আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটা। দীর্ঘ ব্যবধানে মাঝে মাঝে জোরে নাড়া খেয়েছে, যার মধ্যে সব চেয়ে জোরালো ছিল একুশ আর ত্রিশ সালের সেই আলোড়ন, বিশ-পঁচিশহাজার মানুষ যখন এখানে ভিড় করত নেতাকে দর্শন করতে, অভ্যর্থনা করে শহরে নিয়ে যেতে! দুবার গভীর রাত্রে আর একবার ভোরে পুলিশ আচমকা ঘিরে ফেলেছে স্টেশন আর স্টেশন রোড,—সন্ত্রাসী যুগের বিপ্লবী ধরতে। তিনবারই শিকার ফসকে যাওয়ায় তন্নতন্ন খুঁজে লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে স্টেশন রোডের আনাচ-কানাচ। আবার ঝিমিয়ে শান্ত হয়ে একভাবে চলতে শুরু করেছে জীবন, প্ল্যাটফর্মের কাঁকরে পথের ধুলায় যাত্রীর পদক্ষেপ, গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া, দোকানে দোকানে দরাদরি কেনাবেচা, হোটেলের সামনে কুকুরের কামড়া-কামড়ি, অপরাহ্ণে শ্রান্ত অবসন্ন যাত্রীর প্রত্যাবর্তন, সন্ধ্যার পর নকল করা সদর বাজারের মাতালের হল্লা, স্ত্রীলোকের চিৎকার, একে একে বন্ধ করা দোকানের ঝাঁপ কপাট, স্টেশনের পাকা মেঝেতে আর হোটেলে তক্তপোশের মাদুরে চাদর জড়িয়ে যাত্রীদের শুয়ে বসে ঝিমিয়ে আসা, তার মধ্যে এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজনের জেগে থাকা তাস জুয়া খেলে অশ্লীল গান গেয়ে। সাড়ে বারোটার গাড়ির যাত্রী জানালায় কপাট কুটে টিকিটবাবুকে জাগিয়ে শেষ মুহূর্তে টিকিট পায়, গাড়ি থেকে যাত্রী নেমে দেখতে পায় একটু যে সাড়া জাগিয়েছিল স্টেশনে গাড়িটা এসে, গাড়ি চলে যাবার পর দেখতে দেখতে তা ঝিমিয়ে গেল। সে সব বদলে দিয়ে গেছে গত বছরগুলি। আলোহীন অন্ধকার স্টেশন রোডে দূর গাঁয়ের যাত্রী তার গাঁয়ের স্বাধীন হবার কাহিনি বয়ে নিয়ে এসেছে, সঙিন বুলেটের বেড়াজালে ঘেরা গাঁয়ের পুড়ে ছাই হবার বিবরণ। আহত শোকাতুর সর্বস্বান্ত মানুষ ছিটকে এসে আছড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কেঁদেছে এখানে, অভিশাপ দিয়ে দিয়ে ফুঁসছে। ভিড় করে এসেছে খাদ্যের সন্ধানে বুভুক্ষু নরনারী, স্টেশনে স্টেশন রোডে মাথা গুঁজে মরেছে! ওদের খিচুড়ি দিয়ে ওষুধ দিয়ে বাঁচাতে এসেছে একদল ছেলেমেয়ে, স্টেশন রোড চেয়ে চেয়ে দেখেছে কতটুকু উপকরণ নিয়ে ওদের কতবড়ো অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রাণপণ চেষ্টা। লাইনের ওপারে বাস চলার পথ ধরে হাজার অর্ধ উলঙ্গ মানুষের শোভাযাত্রা এসে এই স্টেশন রোড বেয়ে এগিয়ে গেছে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো ঘেরাও করে বস্ত্রের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে। পাটগড়ের চাষি-বিদ্রোহের নমুনা স্বরূপ চালান এসেছে এগারোটি আহত ও পাঁচটি মৃতদেহ, রাত সাড়ে বারোটা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি শুয়ে থেকেছে শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থার অভাবে। এখানকার বলাই দেখে এসেছে কলকাতার ছাত্রদের শুধু হাতে গুলির বাধা ভেদ করে এগোনো। এই সেদিন সামসুদ্দীন দেখে এসেছে উনত্রিশে জুলাই সারা কলকাতার হরতাল, কাক চিলটি পর্যন্ত আকাশে ওড়েনি!

চারিদিকের মানুষের পদার্পণ ঘটে স্টেশন রোডে। চারিদিকের আলোড়ন এখানে ঢেউ তোলে।

নিতাই ছিল শহরে সুরেশ ডাক্তারের মস্ত ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার সেলসম্যান। বড়ো দরকারটার সময় ডাক্তারখানার আলমারি থেকে আড়ালে চলে গিয়েছিল দরকারি ওষুধের মোটা স্টক। ওষুধের অভাবে মানুষ মরছিল স্টেশন রোডের রিলিফ হাসপাতালে। একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যায় সুরেশ ডাক্তারের চোরা বিক্রির হিসাবে অন্তত দশ হাজার টাকার সেই ওষুধ—সারা শহরে পোস্টার দেখা দেয় সুরেশ ডাক্তারের বদান্যতার, স্টেশন রোডের রিলিফ হাসপাতালে তিনি এগারোশো টাকার ওষুধ দান করেছেন, নিজের কম্পাউন্ডারকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পুরা বেতনে ছুটি দিয়েছেন রিলিফ হাসপাতালে কাজ করার জন্য! সুরেশ ডাক্তারের দু-পাটি দাঁতই বাঁধানো, নিজের হাত পা কামড়ে নতুন দাঁত কিনতে হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

সে ওষুধ শেষ হয়ে গেছে কবে। রিলিফ হাসপাতালও উঠে গেছে। এখানে ছোটো ডিসপেনসারিটি খুলে বসেছে নিতাই, বিক্রি খুব, কিছু খয়রাতও যায়।

মনোহর বলে নিতাইকে, এ বদনাম তোমার ঘুচল না, সুরেশ ডাক্তারেব দানের ওষুধ গাপ করে দোকান দিয়েছ। সারদা উকিল টিকিট কাটতে কাটতে বলছিল কী, বেশ তো উন্নতি হয়েছে নিতায়েব ডাক্তারখানার, এ যুগে চোরেরই কপাল খোলে !

চোর আর বাটপাড়ের, নিতাই হাসে, বদনাম ঘুচবে কি, আজও কি ভুলতে পেরেছে ডাক্তারবাবু গায়ের জ্বালা ? এখনও বলে বেড়ায়। মেয়ে চোরকে মাফ করেছে, আমায় ভুলতে পারে !

নিতাইয়ের জায়গায় নতুন যে কম্পাউন্ডার এসেছিল, সুরেশ ডাক্তারের একটি মেয়ে তার সঙ্গে পালিয়েছিল পিরিতের স্বাধীনতা প্রকাশ করতে।

সামসুদ্দীন খবর জানতে আসে, গাড়ি লেট হবে নাকি ?

বেশি না, আধঘন্টা।

কলকাতার গাড়ির জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে কয়েকদিন ধরে সকলেই। টাটকা খবর পাওয়া যাবে সেখানে অবস্থা কী বকম।

নিতাই বলে, খপর আর কী, সেই খুনোখুনি। বাবা এম্পায়ারেব সেকেন্ড সিটি, আগে স্বাধীনতা না বাগালে মান থাকে ?

ইস, আপশোশ কবে মনোহর, সব ভেস্তে যাবে।

খোদা নারাজ, জানা গেল খোদা নারাজ ! সামসুদ্দীন সায় দেয়।

গাড়ি আসে, অনেক গুজব ও টাটকা খবব নিয়ে। খবর শুনে ম্লান হয়ে যায় উৎসুক মুখগুলি, উদ্‌বেগের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

গাড়ি ছেড়ে যাবার পব মনোহর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে, পদ্মলোচনকে নামতে দেখলাম মেয়ে নিয়ে।

চলে গেল নাকি ?

ওই যে হোথা।

একপাশে ঝুলিঝোলা ঠিকঠাক করে পদ্মলোচন তারের যন্ত্রটার কাপড়ের ওয়াড় খুলছিল। বেঁটে খাটো এস্রাজের মতো আকার যন্ত্রটার। সরু মোটা দুটি মোটে তার, মীড় বাঁধা নেই, বেহালার মতো ছড় টেনে বাজাতে হয়। এগারো-বারোবছরের মেয়েকে সাথে নিয়ে পদ্মলোচন এই যন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। মেয়েটিব গলা আশ্চর্যরকম মিষ্টি। পদ্মলোচনের মোটা গলা আর তারের মিহি বাজনাব সঙ্গে সুব মিলিয়ে তার চিকন কচিগলার গান আবেশ ও আরাম এনে দেয় কানে। লোকে দাঁড়িয়ে গান শোনে তাদের, যেচে পয়সা দেয়। রোজগার মন্দ হয না। আগে তারা দুবার স্টেশন বোডের নৈশ আসরে গান গেয়ে গেছে।

চললে নাকি ? মনোহর বলে, থেকে যাও না আজ ? চাঁদা তুলে দেব।

আজ না বাবু, মনোহর বলে সবিনয়ে, ফেরার দিন থেকে শুনিয়ে যাব। শহরে চলি আজ। হাঙ্গামা নেই তো বাবু শহরে ?

না ! হাঙ্গামা কীসের ?

খুব জোবের সঙ্গে ভরসা দিয়ে বলতে পারে না মনোহর যে কিছু হবে না। চারিদিকে গুজব আর উসকানি। এসে ছুঁয়েছে স্টেশন রোডকেও, আমল পায়নি। এসেছে শহর থেকে।

এ শহরে এলে পদ্মলোচন অন্তত আট-দশদিন কাটিয়ে যায়। কিন্তু পরদিন বেলাবেলি সে ফিরে আসে স্টেশনে মেয়ের হাত ধরে হন্তদন্ত হয়ে। ছোটোখাটো একটা হাঙ্গামা বেধেছিল বাজার এলাকায়

সামান্য একটা উপলক্ষ নিয়ে, গুজবে ফেঁপে সেটা চারিদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অনিশ্চিত ভয় ও অবিশ্বাস ছায়ার মতো আগে থেকেই ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। হাঙ্গামা শেষ হয়ে গিয়েছিল অল্পেই। গুজবও ফেঁসে যেত আপনা থেকে বাস্তব আশ্রয় না পেয়ে, আতঙ্কও অনিশ্চিত হালকা ছায়ার মতো শুধু বাতাসেই ঘুরে বেড়াত। একশো চুয়াল্লিশ আর সাঁঝবাতি জারি হওয়ায় গুজব আর আতঙ্ক দুটোই সত্য হয়ে উঠেছে। খাদ্য ও বস্ত্র কমিটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার উদ্দেশ্যে বড়ো একটা সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল আজ, সেটা বাতিল হয়ে গেল।

পদ্মলোচন একা নয়, অসময়ে স্টেশন আর স্টেশন রোড ভরে যায় সাড়ে পাঁচটা ও সওয়া সাতটার গাড়ির যাত্রীর ভিড়ে। অবসাদের ছাপ নেই, শুধু ভয় ও ভ্রান্তির বিহ্বলতা ! আপশোশ ও বিরক্তি। গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ে ফিরে যেতে ব্যাকুল। এ জেলার মফস্‌সল অঞ্চলে কোনো কোনো গাঁয়ে সাম্প্রদায়িক কলহের সুদূর সম্ভাবনাও নেই, একসাথে গাঁয়ের লোক অন্য এক ভয়ংকর লড়াই লড়েছে, এত সহজে তার স্মৃতি ভুলবার নয়, অনেক ভিটেতে ছাই সরিয়ে আজও ঘর ওঠেনি। এই শহরকে শুধু খানিকটা উর্বরা করেছে রাজনৈতিক আবর্জনার পচা সার, আত্মহত্যার বিষের চারা যাতে গজাতে পারে, বৃক্ষ হয়ে উঠবার আগেই শুকিয়ে মরে যাবার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে।

টিকিট ? মনোহর বলে প্রায় ধমক দিয়ে, টিকিট কেন পদ্মলোচন ? ফেরাব দিন গেয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে !

কিন্তু টিকিটবাবু—

ভয় নেই। স্টেশনে থাকবে। পাঁচ টাকা চাঁদা তুলে দেব।

অমৃত আর সামসুদ্দীন ঘুরছিল চারিদিকে যাত্রীদের মধ্যে, তারাও পদ্মলোচনকে ভরসা দিয়ে বলে, স্টেশনে ভয় কী তোমার ?

সওয়া সাতটার গাড়ি চলে যাবার পর স্টেশন প্রায় ফাঁকা হয়ে আসে, পড়ে থাকে শুধু দশটা আর সাড়ে বারোটার গাড়ির কিছু যাত্রী। দুটি ভদ্র পরিবার ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের আগেই এরা দু-একটা ব্যাগ পুঁটলি সুটকেস নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় স্টেশনে ছুটে এসেছিল প্রথম যে গাড়ি পাবে তাতেই পশ্চিমে রওনা দেবে বলে। এখানে এসে একটু ধাতস্থ হয়েছে। উকিল সারদাবাবুর ভাই বরদা এককালে মনোহরের ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। মনোহরের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বরদা নিজের ও অন্য পরিবারের লোকগুলির সঙ্গে কথা বলার পর বিশেষভাবে দিশেহারা ভাবটা কেটেছে তাদের। মালপত্র ছাড়া বিদেশে গেলে সত্যই বড়ো কষ্ট হবে, খালি বাড়িতে জিনিসপত্রও তছনছ হয়ে যাবে হয়তো। স্টেশনে ভয় নেই। একটু দেখা ভালো। কাল গাড়িতে উঠলেই হবে দরকার যদি হয়।

স্টেশন ও স্টেশন রোডে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা এসে গিয়েছে সন্ধ্যার আগেই। টহল থামিয়ে তারা ঘাঁটি আগলে বসে সা-র দোকানের রোয়াকে আর স্টেশনের সাধারণ লোকের চারিদিক খোলা সাধারণ বিশ্রামাগারে—স্টেশনে ঢুকবার পথও সেটা। ধাক্কা সামলে দ্রুত আত্মস্থ হতে থাকে স্টেশন রোড। মুখে মুখে জানাজানি হয়ে যায় যে পদ্মলোচন আর তার মেয়ে উপস্থিত আছে, নতুন নতুন গান বেঁধেছে পদ্মলোচন। নতুন গান ?

ভোর হল, গোঠে চল, ও ভাই বলাই।
খেলায় কাল হারিয়েছি বলে রাগ করিতে নাই।
—এই বলে গান শুরু করে গতবার পদ্মলোচন গেয়েছিল।—

ভাবছ কেন কলির কথা,
(যখন) প্রজায় রাজায় নাই মমতা,
বলি শোনো সে বারতা,
তোমারে বলাই।

ভোর হল, গোঠে চলো যাই।
আজকে যারা পুণ্যবলে,
রাজা হয়ে প্রজা পালে,
(তারাই) কংস হয়ে কলিকালে,
জন্মাবে ঠাঁই ঠাঁই।
মর্ত্যভূমে জন্ম নেবার
দুঃখ শেষ হবে আমার,
প্রজারূপে শেষ অবতার
হবে আমার তাই।
ভোর হল, বেলা হল, গোঠে চলো ভাই।.

পদ্মলোচন নতুন গান বেঁধেছে। কে জানে কী গান ? অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ স্টেশন রোডের। ভাড়া-খাটা স্ত্রীলোক কটি পর্যন্ত বলে তাদের দেহের ভাড়াটেকে, তা হবে না বাবু, শুনতে আমি যাবই, টিকিটবাবু কম্পাউন্ডারবাবু কইবে আব পদ্মলোচন মেয়ের সাথে গাইবে, ও না শুনে পারব না। না পোষায়, পয়সা ফিরে নাও, অন্য ঘরে যাও !

সামসুদ্দীন তাগিদ দেয় তার নামহীন সরাইখানাব খাটুয়েদের, চটপট সারো, একটা দুটো গাইতে হবে আজ।

খাইয়েদেব বলে, না, না, যাব, আল্লা রসুল, জান কবুল। হেথা ও সব কিছু নেই, একদম নেই। চলেন দেখবেন, মালুম হবে।

প্রত্যাশা উৎসাহ আগ্রহ আয়োজন দেখে মনে হয় আজ বোধ হয় আরও বেশি জমজমাট হবে স্টেশন রোডেব নৈশ আসর অন্যদিনেব চেয়ে। গাড়ি-তলাউ-এ লোক জমে আজ অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু পদ্মলোচন সবে তাব তারের যন্ত্রের কান মোচড়াতে আরম্ভ করেছে, বাধা আসে।

এ সব চলবে না। একশো চুয়াল্লিশ, সাঁঝবাতি জাবি হয়েছে। এত লোকের ভিড় চলবে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে সকলকে ফিরে যেতে হবে যার যার এলাকায়। নইলে—

থমথম গমগম করে চারিদিক। পদ্মলোচনের মেয়ে দুবার কাশে, মুখে আঁচল চাপা দেয়। মনোহর হঠাৎ উঠে বলতে শুরু করে, ভাইসব আমরা এ অন্যায় হুকুম মানব না, আমরা—

নিতাই কম্পাউন্ডার বাঁ হাতটা চেপে ধরে তার মুখে, ডান হাতে কাছা ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে বসিয়ে দেয়।

যাত্রাদলের সং-এর ঢং-এ বলে, এই তো ব্যাপার ! কিন্তু একটু গান বাজনাও কি বারণ ?

জবাব আসে গর্জনে।

বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা নিতাই বলে সং-এরই ঢং-এ গর্জনের মিড়ে গলা চড়িয়ে, তাই হবে। মোরা আইন মানব। টাউন এলাকার আইন মোরা টাউন এলাকায় আলবত মানব। চলো ভাই, মোরা টাউন ছেড়ে যাই। লাইনের ওপারে টাউন নাই। চলো সবাই, আইনও বাঁচাই, গানটানও গাই।

সকলের দ্বিধা দেখে জীবনে বোধ হয় এই প্রথম রসিকতা ভুলে নিতাই ধমকে ওঠে, গোরু-ছাগল নাকি ? কথা বোঝো না মানে বোঝো না, না? চটপট চলো—রেল লাইনের ওপারে।

প্রদেশ থেকে প্রদেশে টানা সরকারি রাস্তার গায়ে লাগা টাউন এলাকার বাইরের গ্রাম চিলজলা। কাদা শুকিয়ে গেছে বর্ষান্তের মাঠের। তাছাড়া, কে এখন মানছে শুকনো কাদা না ধুলো না ঘোড়ার নাদিতে অপরিচ্ছন্ন গাড়ি-তলাউ। সামসুদ্দীন তার নামহীন সরাইখানা থেকে ডে-লাইটটা এনে টাঙিয়ে দেয় মরা গাবগাছটার ডালে। হারমনিয়ম বাজিয়ে সেই শুরু করে একশো চুয়াল্লিশ আর

সাঁঝবাতি আইন এলাকাব একশো গজ দূবে স্টেশন বোডেব নিস্তব্ধ গান, আজ আমাদেব শুধু বে ভাই

তাবপব পদ্মলোচন গান ধবে তাব তাবেব যন্ত্র বাজিয়ে
তুমি যে দুখীব ভগবান,
এতদিনেও মিলবে কি প্রমাণ—
তাব মেয়ে গায মিষ্টি চিকন চড়া মিহি গলায
বাঁচন মবণ তোমাব বিধান,
হে ভগবান,
নিজেব বিধান মানো নইলে হয বেমানান—

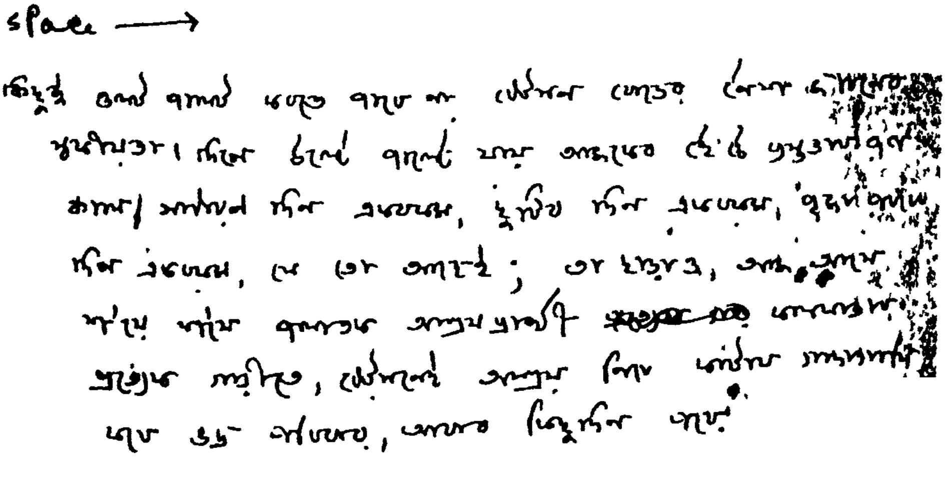

স্টেশন বে ড গল্পেব পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

পেরানটা

বঁধুর লেগে পেরানটা যে কাঁদে, আহা কাঁদে।

তেপান্তরের মাথাভাঙা মাঠে গলা ছেড়ে দিয়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গান গাওয়ার কী যে আরাম। গতি তার মন্থর হয়ে আসে। অবেলায় অঘ্রানের পড়ন্ত রোদ, শান্ত ফাঁকা মাঠে একা একা বোধ করছিল সাধু শেখ। তাই গুনগুন করে গান ধরে ফেলেছিল নিজেরই অজান্তে। দেখতে দেখতে গলা খুলে সুর চড়েছে। তা মদ্দ মানুষের কি গুনগুনিয়ে গাওয়া পোষায় মেয়েলোকের প্যানপ্যানানির মতো ?

শক্ত মাটি মাঠের, লাঙল দিলে ফলা ঢুকবে না, তবু এ মাটি আঁকড়ে কামড়ে দূর্বা ঘাস ছেয়ে আছে চারিদিক, যদিও তাবা রুক্ষ জীর্ণ কমতেজি। এ মাটিতে বুঝি শিশিরও শোষে না। বৃষ্টির জলও ভেতরে পশে না, ওপর ওপর মাটি ভিজিয়ে পশ্চিম দিকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে কাঁসাই নদীতে বন্যা ডাকায়। এমনিভাবে যদি ধান গজাত, এই দূর্বাঘাসেব মতো, যেখানে মাটি সেইখানেই ! সরেস মাটিতে তেজি সবুজ ঘন হয়ে, শক্ত পতিত জমিতেও না হোক যা হোক এই মাঠের ঘাসের মতো ! কোনো শালার তা হলে আর শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে চষতে হত না পাজি বজ্জাত নিমকহারাম পরের খেত, হাজতখানায় বসবাস হত না ফসল নিয়ে কামড়াকামড়ি কবে ! মাঠে ঘাটে খেতে আলে বনবাদাড়ে আপনি গজানো অজস্র ধানগাছে থইথই করত চারিদিক ? কাটো, মাড়াও, ঢেঁকিতে নয় কলেছাঁটাও, দুবেলা পেট ভরে যার যত খুশি ভাত খাও সারা বছর, গোরু-ছাগলকে খাওয়াও !

গলা তার আবও চড়ে যায়, আরও কাঁপে।—বঁধুর লেগে পেরানটা মোর কাঁদে, পরান বঁধুরে '

এ গান সে জানে এক লাইন, সুর জানে এক লাইনের। অন্য গানও জানে, এমনি এক লাইন দু লাইন। একা না হলে তাই সে গান গায় না, এমনি ফাঁকা মাঠ না পেলে গলা ছাড়তে পাবে না। ধানের ভাগ নিয়ে লড়াই করে জেল খেটে গাঁয়ে ফেবার পথে এই মাথাভাঙা মাঠে তার দরকার ছিল গলা ছেড়ে গান ধরার।

দূরে দূবে গাছ-ঢাকা গাঁ। মাঠে এখানে ওখানে থোকা থোকা নিচু ঝোপ, বুনো কুল, কুকুরশোঁকা, ঝাঁকাটি গাছের। দক্ষিণে নদীর ওপারে ঘন শালবন। শুকনো ঠান্ডা বাতাস বইছে ওদিকে হাতে মুখে খসখসে ছোঁয়াচ লাগিয়ে। নদী শুকিয়ে গেছে এব মধ্যেই, চওড়া বালির বুকে এখন ঝিরঝির বইছে আধমরা ক্ষীণ ঝরনা।

আল্লা, আজ নমাজ পড়ার সময় নাই ! ধুলায় ধূসর গা হাত পা নদীতে গিয়ে অজু করে নমাজ পড়তে গেলে এই জনহীন ফাঁকা মাঠে তাকে ঘিরে আঁধার রাত নেমে আসবে, চারিদিকে তাকে ঘিরে শুরু হবে বিপথের ইশারা আব হাতছানি, তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথের দিশা সে হারিয়ে ফেলবে বেমালুম।

আঁধারকে সে ভয় করে না। এক বছর আগে যখন দিনান্তের নমাজ পড়ার জন্য আল্লার এই জগৎটাকে বরবাদ করে দিতে পারত, তখন ভয় করত এই জগতের আঁধারকে। বনবাদাড়ে কত আঁধার রাত কাটিয়েছে ফসলের লড়াইয়ে নেমে, কত নমাজ পড়া তার বাদ গেছে তারপর। আঁধারের ভয় কেটে গেছে। তবে ওই সূর্য অস্ত গেলে এ মাঠে সে দিক হারিয়ে ফেলবে, চেনা চেনা চিহ্নগুলি দেখতে পাবে না, কোনোদিকে এগোলে তার গাঁ ঠাহর পাবে না। দিনের আলোয় পথ চিনে তাকে পৌঁছতে হবেই গাঁয়ের কাছাকাছি।

গানের অজুহাতে ক্লান্ত ব্যথিত পায়ে ঢিল পড়েছিল। বেলার দিকে চেয়ে আবার সে জোরে চলা শুরু করে। সূর্য শালবনে ডুবুডুবু। যেখানে তারার আলোতেও তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথ খুঁজে নেওয়া যায় সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে কি সময়মতো ?

অঘ্রানের সন্ধ্যায় গা ঘেমে যায় সাধু সেখের, তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে ভারী মনে হয় দেহটা। আজ গাঁয়ে ঘরে পৌঁছতে না পারলে গাঁয়ে ফেরা হয় তো তার মিছেই হবে, একটা রাত ঘরে থাকতে পাববে না, গাঁয়ের লোকের সাথে আলাপ করতে পারবে না, ওয়ারেন্ট এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতেই সময় যাবে।

হাজতবাসের দিনগুলিতে কী ঘটেছে গাঁয়ে, কেমন আছে তার গাঁয়ের লোক আপনজন, কী করছে তার ফুলবানু, দেখে শুনে জেনে বুঝে না নিলে তো চলবে না তার !

চলতে চলতে রাত ঘনিয়ে আসে, অস্পষ্ট হয়ে আসে দিবা আর দিকচিহ্ন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সাধু সেখ। দূরে, অনেক দূরে, ও কীসের আলো ? তারার চেয়ে স্পষ্ট হযে আকাশে ঝুলে আছে ?

আল্লা, রাজবাড়ির স্বাধীনতা উৎসবের ফানুস বাতিটাই শেষে তাকে গাঁয়ের পথ দেখাল ! আজও ওরা ওই বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেছে ?

ওরা পারে। রাজবাড়িতে স্বাধীনতা উৎসবেব ফানুস বাতি দু-তিনমাস জ্বালিয়ে যেতে পাবে ! গাঁয়ে গিয়ে ঘরে গিয়ে সাধু দেখতে চায় ডিবরি পিদিম জ্বলছে কিনা তাদের ঘবে।

কুয়াশা ঘুঁটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গন্ধময় ঘন রাত নেমেছে হাতিয়াদলে। সবার আশায ভবা উৎসুক দিনটা শেষ হয়েছে হতাশায়। আজ আর তবে এল না মহীন শ্রীপতি সাধু সেখ। এস্তেআলি মিছেই তাদের ফাঁকা খবর দিযে দিয়ে ভুলিয়েছে যে ওরা তিনজনই ছাড়া পেযেছে, গাঁযে ফিবছে। সকালে ওদের নিয়ে সদর শহরে সভা শোভাযাত্রাব পালা, তারপব বওনা দিয়ে বিকেল নাগাদ তিনজনে পৌঁছবে। বিকেল ফুরিয়ে এলে মাথা নেড়েছে হাতিয়াদলের মানুষ। এত সহজেই যেন হাজত থেকে মানুষ খালাস পায় ডাকাতির দায়ে কযেদ হয়ে ! ডাকাতি করেছে না করেনি, মানুষ ওরা ভালো কী মন্দ সে তো আইনের প্যাঁচ বাবা, দায়ে তো ফেলেছে ডাকাতির। সাধুখাঁব আড়ত লুটে জেলে গিয়েছিল সুদাস ঘোষেরা। আজ ছ-সাত সাল কাটল, তারা ফিরেছে কি ? এমন আজগুবি খবব দেয কেন এস্তেআলি ? ঘরেবাইরে এস্তেআলির মুশকিল।

সে যত বলে কোনো কারণে হয়তো তাবা আটকে গেছে কাল নিশ্চয় ফিববে, গাঁযেব লোক বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে।

বলে, খপর দিত। তোমার মতো মোদের অত হেলাছদ্দা করে না, না এলে খপর দিত আজ এলোনি, কাল এসবে।

কিছুদিন আগেও সচ্ছল অবস্থা ছিল এস্তেআলির, ধানের সচ্ছলতা। তখন যা ছিল মানুষটার কঠিন একগুঁয়ে স্বভাব, আজ সবার কাছে তা হয়েছে হেলাছদ্দা, অবজ্ঞা ! মানুষটা সব কিছুতে যুক্তি খোঁজে, সোজাসুজি বিশ্বাস করা না করার চেষ্টা তার কাছে বিরক্তিকর অথচ তাকে আজ আগেব চেয়ে সমান মনে হয়।

নতুন চিন্তাচেতনা মত, তাকে নিয়ে তাই বিব্রত বোধ করে হাতিয়াদলের চাষি সমাজ।

তার নিকা বউয়ের তোতলামি আজ বেড়ে গেছে। ধৈর্য ধরে তার কথা শোনা আর মানে-বোঝা হয়েছে কঠিন ব্যাপার। তবে দু-চারবার শোনার পর টের পাওয়া গেছে জিজ্ঞাসা তার একটাই। সাধু সেখের সম্বন্ধে। উত্তেজনা আর তোতলামি বাড়ার কারণটাও তাই।

সাধু সেখের সে ভাতিজা, মেয়ের মতো তাকে মানুষ করেছে লোকটা। নিকার পরেও তোতলা ফুলবানু মশগুল হয়ে আছে মানুষটার বাপের বাড়ির দরদে। অনেক ভেবেচিন্তে এস্তেআলির সাথে

মেয়েটার নিকে বিয়েই স্থির করেছিল সাধু সেখ। বোকা হাবা তোতলা মেয়ে ফুলবানু, এস্তেং সাথেই তার বনবে ভালো। রূপযৌবনের কাঙাল এস্তেআলি, একদম পাগল বলা চলে। সাদি বউটা তার চালাক-চতুর কাজেকর্মে পটু, কিন্তু দেখতে মোটে তেমন নয়। অনেক বছর এস্তেআলিকে জমিয়ে রাখবে ফুলবানু। ততদিনে ছেলে হবে মেয়ে হবে, ঘরসংসার জমাট বেঁধে উঠবে। পাগলামিও কমে যাবে এস্তেআলির।

ফুলবানু ঘর করতে এসেছিল কেঁদেকেটে সর্দিভরা নাকের নোলক ছিঁড়ে রক্তপাত করে। তার আহ্লাদ আবদার সমানই বজায় আছে। চোত-ফাল্গুনে তার বাচ্চা হবে।

সাথে করে না এলে কীসের জন্য ?—এই হল মোট জিজ্ঞাসা ফুলবানুর। তার পেরানের আসল জিজ্ঞাসাটা বুঝতে সাঁঝ পেরিয়ে গেছে এস্তেআলির। আগে একা না চলে এসে এস্তেআলি যদি সাধু সেখকে ফুলবানুর দোহাই দিয়ে সাথে নিয়ে আসত, ফের কিছু একটা কাণ্ড করে বসার সুযোগ পেতনা সাধু সেখ। নিশ্চয় সে ফের হাজতে গেছে, নয় গুলি খেয়ে জখম হয়েছে, নইলে এল না কেন ? এত দূর থেকে প্রাণের টানে ফুলবানু টের পেয়েছে। সাধু সেখের জন্য মুরগি যে রেঁধেছে ফুলবানু, এখন তা খাবে কে ?

এটা আন্দাজ করে ভড়কে যায় এস্তেআলি। কল্কের গুলপোড়া তামাকের ধোঁয়া টেনে নিয়ম মাফিক ছাড়তে ভুলে একচোট সে কাশে। বড়োবিবিকে শুধোয় কাশি সামলে, কোন মুরগি ?

ছোটো মোরগটা।

কল্কের আগুনে ফুলবানুর গোবর-মেশানো রাঙামাটি লেপা ঘরের ভিতের মতো মসৃণ চামড়ায় ছেঁকা দিয়ে ফোসকা পেড়ে প্রায় ফেলেছিল এস্তেআলি, পেটের মধ্যে উদ্ভূত একটা খিদের আগুন চাড়া দিয়ে ওঠায় দাঁতে দাঁত কড়মড় করে ক্ষান্ত হয়। মুরগির ! মুরগির ঝোল আর ভাত ! বাড়ি ফিরতে ফিরতে তেপান্তরের মাথাভাঙা সারা মাঠটা সে হিসাব করতে করতে এসেছিল, বড়ো মোরগটা বেচে দেবে পাঁচসিকে দেড়টাকায়। তাছাড়া আর দিন চলার, একটা দিনও চলার উপায় নেই। সদর বাজারে ওটার দাম ন-সিকে আড়াইটাকা, গগনবাবু নিত্য ওর চেয়ে বেশি দরে সায়েব পাড়ায়, ইস্টিশনের সাহেবি খানাপিনার হোটেলে, বাজারের ধারে মাগিপাড়ায় কত মুরগি বেচেছে। হাতিয়াদলে রাজবাড়ি আছে, ইস্কুল আছে, থানা আছে, চাখানা, রেস্তুরখানা আছে, সবই রাজবাড়ির কাছে পাকা রাস্তায়। পুলিশের লোকের তাঁবু পড়েছে রাজবাড়ির দিঘির পাশে মাঠ জুড়ে। ওখানে হয়তো বা বড়ো মোরগটার দাম সাতসিকে দুটাকা মিলে যেতে পারে !

তবে সে সাহস না করাই উচিত হবে। হয়তো কেড়েই নেবে চুরি করা মুরগি বলে, তার চেয়ে—

বড়ো মোরগটা গেলে, ছোটো মোরগ আর দুটো মুরগি থাকবে। ছোটো মোরগটা থেকে মুরগি দুটো আর ডিম পাড়বে কিনা জানা নেই।

এত জটিল হিসাব ছিল এস্তেআলির। গাঁটে একটা আধলা নেই, সদর ইস্টিশনে মাল বয়ে আর রেলগাড়ির সিঁড়িতে বসে ভোলাঘাট ইস্টিশন তক পাঁচ-দশসের চোরা চাল পৌঁছে দিয়ে কিছু রোজগারের ফিকিরে কাল সদরে গিয়েছিল। সাধু সেখের পাল্লায় পড়ে আজকেই গাঁয়ে ফিরতে হল।

মুরগি আন, ভাত আন, হারামজাদিরা !

একা মাংস ভাত সাবাড় করে না, দুই বিবির সাথে বসেই মুরগির ঝোল আর ভাত ভাগাভাগি করে খায় এস্তেআলি। ভাঙা ফতুর কুঁড়েতে যেন ভোজবাজি ! বড়োবিবির দিকে আড় চোখে চেয়ে চোখ টিপে সে মুরগির একটা ঠ্যাং ফুলবানুর ভাঙা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের থালায় তুলে দেয়।

মরণ মোর ! ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। মুরগি মারার জন্য যে এ গঞ্জনা সে তা বোঝে।

ফুলবানু মুষড়ে গেছে। খেয়ে উঠে তামুক না পেয়ে মুষড়ে যায় এস্তেআলি। আবার সে তাই গঞ্জনা দেয়, একটুক তামুক আনতে নারে, মুরগি কেটে খায় !

পেরানটা কেমন করে বাপটার লেগে বোঝ না তুমি ? বলে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করে ফুলবানু।

বড়োবিবি ধোয়ামোছা করছিল, কয়েক লহমা ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁদন শুনল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ফুলবানুর গালে। মা যেমন মেয়েকে মারে।

এন্তেআলি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দেয়, মেয়ের ভালোর জন্য মা তাকে শাসন করলে স্নেহশীল বাপ যেমন সমর্থন করে কাজটা। বলে, একটুকু তামুক খাওয়াতে পারিস কাল্লুর মা ? পাবিস যদি তো তোতে মোতে আজ বড়ো খাতির !

দিই তামুক, দিই !

তাড়াতাড়ি ফোঁস করে ওঠে ফুলবানু বড়োবিবি কিছু বলার সুযোগ পাবার আগেই। বলে সে বাপের বাড়ি থেকে তামাক চেয়ে আনতে বেবিয়ে যায়। কাছাকাছিই বাড়ি সাধু সেখেব। তবু সাঁঝের পর কমবয়সি পোয়াতি বউয়ের পক্ষে সেটাও বেশ কিছু দূর বইকী !

হারামজাদির সাথে পারি না। এন্তেআলি বলে।

বড়োবিবি কিছু বলে না। এন্তেআলির কথাটা সে ভাবছিল, মানুষটা সত্যই কি তাব সাথে শোবে আজ রাতে ? বড়োবিবির বয়স গড়িয়ে যায়নি, মনে মেয়েমানুষের সাধ-আস্বাদ আছে, ফুলবানু আসার পর এটা একরকম ভুলেই গেছে এন্তেআলি।

সেই যে যায় ফুলবানু আব তার দেখা নাই।

হারামজাদির সাথে পারি না।—এন্তেআলি আবার বলে উঠে লাঠিটা বাগায বেবোবাব জন্য। বহুদিন পরে মাংস ভাত খেয়ে তার ঘুম আসছিল। যদিও টানাটানিব ভাত কটা ভাগাভাগি কবে খেয়ে মোটেই পেট ভরেনি।

সাধু সেখের বাড়িতে ভিড় জমেছে।

সাধু বলে, বেটি বলল, খবর দি, ডেকে আনি ? মোর মজা লাগল গবজ দেখে। বোস না তুই, বসে থাক চুপ মেরে। এন্তেআলি হাজির হবে ঠিক।

সবার মুখে হাসি ফুটে মিলিয়ে যায়।

গজেন বলে, মেয়ার নালিশের কথাটা বলো ? তোমার তরে মুরগি রাঁধলে, সাত তাড়াতাড়ি মেরে দিয়ে বসে আছে। সে কথাটা বলো !

এ তামাশা নয়, যদিও বলা হয়েছে তামাশা কবার সুরে। এ স্রেফ খোঁচা দেওয়া, নিন্দা করা। হারু যে গলা খাঁকরি দেয় সেটাও আসলে গজেনের খোঁচায় সায় দেওয়া।

তোরাফের পিসি মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলেই বসে, নোলা বটে বাবা !

অপমানের গরমে গোমড়া হয়ে উঠেছে এন্তেআলির মুখ। সে ঝেঁঝে বলে, রাত হয়ে গেল তুমি এলে নাকো, খাব না তো করব কী ? বাঁধা জিনিসটা ফেলে দেব ?

ধপ করে সে বসে। আবার বলে, যত শালার ঝকমারি। আর মুরগি নাই ? কাল বেঁধে খাওয়াতে মানা কার ? কাঁদাকাটা নালিশ পস্তাতি, হাঃ !

চাল কুথা পাব কাল ? আড়াল থেকে ফুলবানু শোনায়, চাচা কাল রইবেনি।

রইবেনি ? এন্তেআলি অবাক হয়ে শুধায় সাধু সেখকে।

সবার এত বদমেজাজের, সাধু সেখের জন্য রাঁধা ভাতমাংস খেয়ে ফেলার খুঁতটা এত বড়ো করে ধরার কারণটা তখন সে টের পায়। ছেড়ে দেবার দু ঘণ্টা পরে শ্রীপতি আর মহীনকে ফের ধরেছে নতুন ওয়ারেন্টে। সাধুকেও ধরত, সে চালাক মানুষ, ব্যাপার আঁচ করে আগেই কেটে পড়েছে।

পেরানটা চাইল না বাবা আর আটক রইতে। কিছুকাল ফেরার থাকি, গা ঢাকা দিয়ে। ও সরকারি শ্বশুরঘরে মোটে মন বসে না। দাড়ির ফাঁকে সাধু সেখ হাসে, ইংরেজ ভেগে গেছে কবে, আইনকানুন পালটে যাবে সব, আজ না তো কাল। না যাবে না ? জমিদার জোতদার রইবে না, দারোগা পুলিশ মোদের পিটতে এসবে না ওদের হয়ে। দেশের মানুষ রাজা হয়েছে, চাষিপেরজা মোদের কথা মানবে তো বটে, আজ না তো কাল ? না মানবে না ? তাই মন করলাম কটা দিন ডুব মেরে কাটিয়ে দিলে আর ভয়টা কী!

শ্রীপতির ভাই ভূপতি বলে, ওরা সরে পড়তে পারল না ?

ছেড়ে দিয়ে আবার ওদের ধরার বিবরণ দেয় সাধু। জেলের দরজাতেই ফের নাকি ধরত তাদের, পরোয়ানা এসে পৌঁছতে দু ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল। এদিকে তাদের ঘরে বসিয়ে রেখে সবাই ছুটোছুটি করছে তাড়াতাড়ি শোভাযাত্রা বার করে দিতে, তারা তিনজনে বসে ফুঁকছে বিড়ি। আল্লার কী মর্জি, বিড়ি ফুঁকতে সুখ পেল না, তাদের ইচ্ছে হল তামুক খাবে। একবাবু পয়সা দিল আর সাধু গেল দোকান থেকে তামুক আনতে। বাবুদের ঘরের মিঠে তামুক তো মুখে রুচবে না। দোকান আর কদ্দুর, এই সাধুর বাড়ি থেকে শিবমন্দির যতটা ততটা হয় কী না হয়, যেতে আসতে কতটুকু বা সময়। তারই মধ্যে ঝপ করে পুলিশ এসে খপ করে ফের ওদের দুজনকে ধরে ফেলল। দূর থেকে লালপাগড়ি দেখে—

পেরানটা বানি: যে কী ওলট-পালট করল কী বলি তুমাদের। ভাবলাম কী যে দুত্তেরি মোর মন্দ মতি, একলাটি পেলিয়ে যাব, একসাথে হাজত থেকে বেরুলাম তিনজনায় ? যেচে যাই, ধরা পড়ি, একসাথে ফের হাজত যাব। তা মোদের ওই নকুল মাইতি, ইস্কুলে পড়ছে ফাস্টো কেলাশে, ঘরে একটি পাশে সে মস্ত মস্ত হরফে লিখতে ছিল শোভাযাত্রার নুটিশ। দু পা এগিয়েছি ধরা দেব বলে, দেখি কি নকুল এসছে এদিক উদিক চাইতে চাইতে। সেই মোকে ভাগিয়ে দিলে। বললে, ডুব মেরে থাকবে যাও, সবার সাথে উপোস করবে যাও, অত জেলের ভাত খায় না !

পেরানটা, ভূপতি বলে, জানো সাধু পুড়তিছে ভাইটার লেগে। নিরেট কথা বলি, মন করে কী, জেলের ভাত খাক। ঘরে ফিরে ভাত পাবে না, জেলের ভাত খাক। জানো সাধু, ওর বউটা মরেছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। খপরটা চেপে গেছি।

ভূপতির চেহারাটাই জ্বর আর উপোসের চরম প্রমাণ। অত প্রব না হোক প্রমাণের ছাপটা আছে সবার চেহারাতেই। কেউ তাই কথা কয় না !

লোক বেড়েই চলে সাধু সেখের দাওয়ায়। দেখা যায় এ গাঁয়ের লোক শুধু নয়, আশেপাশের গাঁ থেকেও লোক আসছে। পুরুষ চাষি নয় সবাই। অনেক মেয়েলোক, নানা বয়সের।

এসো মোরা দিঘির পাড়ে বসি।

অশোক রাজার আমলের দিঘি শুকিয়ে বুজে পুকুর হয়ে গেছে। তারও পাড়ে দূর্বাঘাসের আসন। শীতের রাত্রে নিরুপায় হয়ে তারা সেইখানে গিয়ে বসে। কী ঘন আঁধার রাত, কী ঘন কুয়াশা। তার মধ্যে রাজবাড়ির ফানুস আকাশপ্রদীপ ঝাপসা দেখা যায়।

সাধু সেখ বলে, ওই ফানুসটা ভেঙে চুরে দিয়ে আসতে পার তোমরা কেউ ? ও দেখলে বিগড়ে যায় পেরানটা।

দিঘি

সন্ধ্যার কুয়াশা নামছে।

ছাড়া ছাড়া কুয়াশা আলতো ভাবে দিঘির জল ছুঁয়ে থাকে। আস্তে আস্তে পাক দিয়ে ওঠে, নড়ে চড়ে বেড়ায়, বাতাসে ভেসে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে জল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এপাড়ে জমিদারের গোয়াল থেকে গাঢ় ঘুঁটের ধোঁয়া মন্থর গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, অদূরে গাঁয়ের চেহারা সন্ধ্যার ছায়া, কুয়াশা আর ঘুঁটের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে এসেছে।

দিঘল লম্বাটে দিঘি, চওড়া যে নেহাত কম এমনি তা নয়, লম্বার তুলনায় কম। দক্ষিণের পাড় বাঁধের মতো উঁচু, ওদিকে খুঁড়ে যেতে যেতে নাকি এক সারিতে তফাতে তফাতে তিনটি দেবমূর্তিতে ঠেকে কোদালে বাধা পড়েছিল। সেই লাইনে সীমা হয়েছিল দক্ষিণ তীরের। বিশালতর চৌকোনা না হয়ে দিঘি তাই এ রকম লম্বাটে হয়ে আছে। পাঁচপুরুষ আগে খোঁড়া দিঘি। জলজ উদ্ভিদে ভরে গেছে দিঘির বুক জলের নীচে, সকালে বেলা বেড়ে আর বিকালে বেলা পড়ে এসে সূর্যের আলো যখন খানিক ত্যারচা ভাবে পড়ে, টলটলে স্বচ্ছ জলের নীচে যেন এক অদ্ভুত গাঢ় সবুজ রহস্যপুরীর আবরণ খুলে যায়। উত্তর বা দক্ষিণ তীরে দাঁড়ালে এটা হয়। পুব পশ্চিম তীরে দাঁড়ালে ঝলমলে আলোয় চোখে শুধু ধাঁধা লাগে।

তিন তীরে ঘাট, দক্ষিণ ছাড়া। প্রকাণ্ড বাঁধানো ঘাট, চওড়া সিঁড়ি। আজ ভেঙেচুরে গেছে, বড়ো বড়ো ফাটল ধরেছে, ইট খসে পড়েছে। তবু অনেকের শোয়াবসার মতো অটুট সমতল ঠাঁই আজও মিলবে অনেক ঘাটের চত্বরে।

হাসিতুল্লা চুপ করে বসে থাকে ঘাটে। শূন্য নির্জন চারিদিক, নির্জনতাই যেন ঘন হয়েছে ছায়া আর কুয়াশার রূপে। অজু করে গামছা বিছিয়ে নামাজ পড়েছিল হাসিতুল্লা, তারপর থেকে বসে আছে। অল্প বেলা থাকতে যখন সে পৌঁছেছিল এখানে তখনও জনমানুষহীন ছিল ঘাট, দিঘির আশে পাশে মানুষ চোখে পড়েনি। শিং ভাঙা বুড়ো একটা গোরু শুধু চরছিল দক্ষিণের উঁচু বাঁধে। গাঁয়ের দিকে দু-চারজন মানুষকে দেখা গিয়েছিল এদিক ওদিক চলাফেরা করতে, তারাও যেন লুকোচুরি খেলছিল আপন মনে, এ ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে খানিক দৃশ্যমান থেকে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল গাছপালা ঝোপঝাড় বা অন্য বাড়ির পিছনে। দিঘির পানে কেউ এগিয়ে আসেনি। নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে একজনও নয় !

বেশি তফাত নয় গাঁয়ের এদিককার ঘর ক-খানা। মুখহাত ধুতে জল নিতেও আসেনি মেয়েপুরুষ একজন। দিঘির জল কি খারাপ হয়ে গেছে ? বিষাক্ত বলে বর্জন করেছে সকলে ? কী স্পর্ধা !

দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে হাসিতুল্লা, অনেক দূরের গাঁ থেকে। জমিদার ডাক দিয়েছে, জরুরি হুকুম, আজের মধ্যে এসে পৌঁছানো চাই যেমন করে হোক, কোনো অজুহাত চলবে না ! এমনি আহ্বানের জন্য বাপের আমল থেকে প্রস্তুত হয়েই থাকে হাসিতুল্লারা। আরও আগে দিনে দিনে পৌঁছতে পারত হাসিতুল্লা, রওনা দিতে দেরি হয়ে গেল বিবির জন্য। তার বিবির জ্বর খুব বেড়েছে।

জোরে জোরে একটানা হেঁটেছে বিশ্রামের জন্য না দাঁড়িয়ে, বসে থাকতে আরাম লাগছে বেশ। খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছে চারিদিকের অদ্ভুত স্তব্ধতা আর নির্জনতায়। যতবার সে এসেছে এ গাঁয়ে, সকালে বিকালে যখন তাকিয়েছে দিঘির দিকে, আশেপাশে মানুষ দেখে এসেছে চিরদিন, শুনে এসেছে মানুষের গলার আওয়াজ। গাঁয়ের লোক দিঘির জলে স্নান করে, ঘাটে বসে জটলা পাকায়,

দিঘি ঘেঁষে চলাচল করে, পাশের মাঠে গোরু বাঁধে ছেলে ছোকরারা, খেলাধুলো হইচই করে। সুদীর্ঘ দিঘিটি ও পাড়ের জমিদার বাড়িকে তফাত করে রাখে গাঁয়ের জীবন থেকে। গাঁয়ের জীবন দিঘির এ তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হতে জমিদার কখনও বারণ করেনি।

কী ব্যাপার তবে ? একটা লোক নেই আশেপাশে যে তাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে হাসিতুল্লা।

জমিদার বাড়িও কেমন যেন নিঝুম, আঁধার আঁধার। দু-একটা আলো জ্বলেছে, গোয়াল থেকে ঘুঁটের ধোঁয়া উঠছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। উঠি উঠি করেও হাসিতুল্লা বসে থাকে। কান খাড়া করে রাখে পূজার বাজনার আওয়াজের জন্য। পুঁটলিটা পাশে পড়ে আছে, পাকা বাঁশের মোটা লাঠিটা সে শক্ত করে ধরে থাকে। লাঠি ধরা মুঠির মতো কঠিন তার মুখ। দু-পুরুষ তাদের লাঠির মালিক জমিদার, জমিদারের মান রাখার জন্য এই লাঠি।

অনেক দেরিতে পূজার বাজনা বাজে জমিদারের গৃহমন্দিরে। বাজনায় যেন তেমন জোর নেই, জমকালো আওয়াজ নেই। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় হাসিতুল্লার।

যখন সে ওঠে তখন রাত্রি হয়ে গেছে। কুয়াশার জন্য আজ ঠান্ডা কম। ঠান্ডাকে ডরায় না হাসিতুল্লা, মাঘের ঠান্ডাকেও নয়, এ তো অঘ্রানের হিম। জগতে কাউকে ডরায় না হাসিতুল্লা, কিছুকে ডরায় না তার লাঠিখানা হাতে থাকতে। তবে কিনা সন্ধ্যাবেলা জনহীন দিঘির ঘাটে গা ছমছম করে সেই সবকিছুর ভয়ে যা জগৎ ছাড়া, তার জানা চেনা মাটির পৃথিবীর যা নয়।

অমনি একটা কিছুর মতোই ছায়াটা কাছে আসে।

একটু শিউরে ওঠে দেহটা হাসিতুল্লার। করার সে তাড়াতাড়ি পলক ফেলে চোখের।

ছালাম।

মানুষের গলায় আওয়াজ। হাসিতুল্লা স্বস্তি বোধ করতে থাকে।

কন থে আইলা মিয়া ? আরে, হাসিতুল্লা নাকি !

চিনবার নারলাম তুমারে।

বোজেনালিরে চিন ?

অ তুমি বোজেনালির চাচা। চিনছি। ইস্টিমারে তুমি পিটাইছিলা ফিরিঙ্গিটারে, হাজত গেছিলা। ছাড়া পাইলা কবে ?

রও মিয়া, হাসাইও না। কোন সালের কথা কও জাননি ? ছাড়া পাইলাম, নিকা করলাম, ব্যাটা বেটি পয়দা করলাম দু-গা, তুমি আইজ জিগাও ছাড়া পাইলাম কবে। ঘুমাইয়া নি ছিলা দুই-দশসাল ?

আরও তিনটে ছায়া এসে যোগ দেয় বোজেনালির চাচার সঙ্গে। এবার অন্য ভয় জাগে হাসিতুল্লার, কে জানে কী মতলব এদের। লাঠিটা সে শক্ত করে ধরে।

পথ ছাড়। পথ ছাইড়া দাও।

পথ ছাড়াই আছে।—নবাগত একজন বলে।

পথ ঠেকাইছে কেডা ? বোজেনালির চাচা বলে ভোঁতা সুরে, মন চায যাওগা, ঠেকামু ক্যান ? জিগাইলাম কী, আইছ ক্যান ? না আইলে ভালো করতা, বদ কাজে আইছ। ধানের পাওনা ভাগ মোরা নিমু। মরুম বাঁচুম খোদারে জানাইয়া থুইছি। কয়ডারে মাররা তুমি, কয়জনারে ঠেকাইবা ? মিছা আইছ রাই, বদ কামে আইছ। ফিরা যাও, ঘরে ফিরা যাও।

আরেকটা ছায়া বলে, খাতির পাইবা না, মিছা আইছ। কত বন্দুক পুলিশ আনছে, তোমারে পাত্তা দিব ?

দিঘির ঘাটে চারজন কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝখানে একেবারেই যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, আচমকা মহাসমারোহে পূজার বাজনা বেজে উঠে জমিদার বাড়িতে ঢোল, কাঁসি, ঘণ্টা।

হাসিতুল্লা যেন বুকে জোর পায় খানিকটা। বলে, নিমকহারামি করুম না।

কার নিমক খাইছ তুমি ? কীসেব নিমকহারামি ?

হাসিতুল্লা নীরবে এগিয়ে যেতে চাইলে —তামুক খাইয়া যাও। যা মন চায় কইরো তুমি, তামুক খাইয়া যাও।

পথ ছাড়, পথ ছাইড়া দাও !—চিৎকার করে ওঠে হাসিতুল্লা, বাঁশের লাঠিটা বেকায়দায় ঘুরিয়ে দেয় মাথার ওপর দিয়ে, তারপর ছুট দেয় দিঘির উত্তর-পুব কোনায় জমিদারের গোয়ালঘরের দিকে।

এরা খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। ধিক্কারজনক একটা আওয়াজ করে নটবর বলে, কই নাই হালার পুত বুঝবো না ? পাগড়ি বাইন্ধা চৌকিদারি কইরা খায় আর একখান লাঠি দিয়া বউরে পিটায়, মস্ত মরদ ! বলতে বলতে তার মাথা বিগড়ে যায়, ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, ফালডা দিয়া বিঁধলা না ক্যান হারামজাদারে ? জাতভাই বইলা ? নামাজ করে বইলা ?

একটা লোহার রড, ঘষে ঘষে একটা ডগা ছুঁচালো করে বর্শার মতো মারাত্মক অস্ত্র কবা হয়েছে, সেটা ছিল দরগা সেখের হেফাজতে। এ খোঁচা সয় না দরগা সেখেব, হাতের ওই অস্ত্রটা দিয়েই সে ঘায়েল করতে যায় নটবরকে। রোজেনালির চাচা বাঁ হাতে বাগিয়ে নেয় ডান্ডাটা, ডান হাতে একটা চড় কষিয়ে দেয় দরগা সেখের গালে।

বলে, ইয়ের পুত, তোরে কইছিলাম কী ?

দরগা চুপ করে থাকে। তার বয়স মোটে বাইশ তেইশ।

কইছিলাম না বউয়ের বুকে সেক দিবি মালসায় আগুন জ্বাইলা কামের কামে মন নাই, বিবাদ করে। তোমারে কই নটু বাই, যা তা কও ক্যান ? জাতবাই ! লাঠি দিয়া মাথা ভাঙবো, জাতবাই !

খানিক চুপ করে থেকে বলে, আল্লা !

লেঠেল যত জমা হয়েছে কাছারি বাড়ির পিছন দিকে পুরানো মণ্ডপ-চত্বরে তার বহব দেখে বিশেষ আশ্চর্য হয় না হাসিতুল্লা। ব্যাপার সে খানিক আন্দাজ করেছিল দিঘির ঘাটেই। কে না আন্দাজ কবতে পারে আজকের দিনে। চারিদিকে অনেক ঘটনা ঘটছে। একবকম ঘটনা।

এখানে আসর বসে যাত্রাগান কবি কীর্তনের, মস্ত চৌকো পাকা ভিত, গোল গোল মোটা থাম, নিচু ছাদ, চারিদিক খোলা। বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে চারিদিক তাদের থাকার জন্য। ইস্টিমাবের ডেকের মতো কাঁথা-কানির বিছানা পড়েছে সারা মেঝে জুড়ে। একবাতের হানাদাবি লাঠিবাজিব ব্যাপার নয়। চারিদিকে কাছে দূবে গাঁয়ে গাঁয়ে বজ্জাতি জুড়েছে চাষি-প্রজারা, ব্যাপাব সোজাও নয়, সহজে মিটবারও নয়।

লণ্ঠনের আলোয় চেনা চেনা মুখ খোঁজে হাসিতুল্লার চোখ, তার রক্তে সাড়া লেগেছে স্বধর্মী এতগুলি মানুষের কথাবার্তাব গুঞ্জনে, এরা ছাড়া কে বুঝবে লাঠি খেলতে জানা লাঠিয়ালদের, লড়ায়ে সৈন্যদের প্রাণের আত্মীয়তা।

তারপর কয়েকটা চেনা মুখ, কয়েকজন জানা মানুষ মেলে কিন্তু একটু দমিয়ে দেয় হাসিতুল্লার প্রথম উৎসাহ। এরা কেন তাদের দলে ? এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয় ! পিছন থেকে একলা মানুষের মাথায় লাঠি মেরে কাদের ফেরার হয়ে আছে, সোণা জেল খেটেছে চুরির দায়ে। খুন জখম চুরি ডাকাতি মেয়ে লুটের লেঠেল এরা, এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয় ! ব্যগ্র হয়ে হাসিতুল্লা অন্য চেনা মুখ খোঁজে, অন্য জানা মানুষের সন্ধান করে। যারা তার নিজের জাতের লেঠেল, মনিব হুকুম দিলে মরবে জেনেও একা পঞ্চাশ জনের মহড়া নেয়, কিন্তু দুর্বল অসহায়ের উপর, আঁধার রাতে চুপিচুপি পিছন থেকে শত্রুকে মারার হুকুম মনিব দিলেও সে হুকুম অমান্য করে।

নাজু ওস্তাদেরে দেহি না ?

আসে নাই।

বড়ো আলি ?

তেনাও আসে নাই।

লালপুরের গোপেন ?

আইছিল, চুপে চুপে ভাগছে। ডরাইছে বুঝি ব্যাপার দেইখা।

মনে মনে বলে হাসিতুল্লা ডরাইছে। লালপুরের গোপেন ডরাইছে, তুমি মস্ত বীরপুরুষ।

মুখ গোমড়া করে বসে থাকে হাসিতুল্লা। যে জমায়েতকে গোড়ায় আপন মনে হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ হয়ে আর তাদের আত্মীয় ভাবতে পারছে না। সকলের যে সমবেত গুঞ্জন উল্লসিত করেছিল, কী কথা আর কেমন হাসিঠাট্টা দিয়ে তা তৈরি জেনে মনটা বিগড়ে গেছে। কাল এরা পুলিশ দলের সাথে হানা দিয়েছিল কোদপুর গাঁয়ে। একটা মোটে মেয়ে ছিল গাঁয়ে, একটু হাবাটে পাগলা মতো, তবে কচি বয়েস, খাপসুরত চেহারা। হাসিতুল্লার কানের কাছে কজন বলাবলি করে মেয়েটাকে নিয়ে অন্যের মজা করার গল্প, তারা ভাগ পায়নি। শূন্য গাঁয়ে হঠাৎ কোথা থেকে এসে মেয়েটা ছেনুদ্দীন মণ্ডলের ঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কী রকম হাবার মতো তাকিয়ে ছিল, কে প্রথম টেনে নিয়ে গিয়েছিল শেষে কে ঘর থেকে বেরিয়ে কী রকম ভঙ্গিতে আপশোশ করে বলেছিল, মরে গেছে।

দাড়িতে হাত বুলায় হাসিতুল্লা, মাথাটা এদিক ফেরায় ওদিক ফেরায়, যেন ফাঁদে পড়েছে। এদের সে জানে। ভালো করে জানে। মগজে এদের শয়তানের বাসা, শত্রুর ভয়ে আঁধারে লুকিয়ে থাকে, খুঁজে বেড়ায় একা অসহায় মেয়েছেলে, এমনি করে কষ্ট দিয়ে মেরে সুখ পায়। বাইরে যদি পরের মেয়ে না মেলে, নিজের বাড়িতে উলঙ্গ করে খুঁটিতে বেঁধে মারে বাড়ির মেয়ে বউকে।

কুর্তা পরা গগন আসে ক্রুদ্ধমূর্তিতে, ধমকে বলে ফের হল্লা শুরু করছ ? আস্তে আস্তে কথা কও কইলাম।

গোমস্তার চোখরাঙানিতে চুপ মেরে যায় এতগুলি মরদ লাঠিয়াল। হাসিতুল্লার প্রাণটা জ্বালা করে।

এ কাদের সাথে ভিড়েছে সে। চাপা গলায় কথা শুরু হয় গগন চলে যেতেই। গগনের বিরুদ্ধেই নালিশের কথা। তার ধমকানির বিরুদ্ধে নয় তাদের পাওনা টাকায় সে যে মোটা ভাগ বসায় তাদের খাওয়া দাওয়া পান তামুকের বরাদ্দে ভাগ বসায়, তারই বিরুদ্ধে।

কত্তারে কও না গিয়া ? না তো নায়েব বাবুরে ? হাসিতুল্লা বলে তাদের।

তুমি কও না গিয়া ? কানমলা খাইয়া আসবা।

হাসিতুল্লা এদিক ওদিক খোঁজে গগনকে, কর্তাবাবু নয় তো নায়েববাবুকে সে সেলাম জানাবে। দু পুরুষ এ সেলাম জানাবার সম্মান তারা ভোগ করে এসেছে। গতবার যখন সিথুয়ার চরে বিবাদে পুলিশের সাথে লড়তে এসেছিল সে আর বড়ো আলি, গোপেনরা, জমিদারবাড়ি বেশি রাতে পৌঁছেও তাকে খবর পাঠাতে হয়নি, কর্তাবাবু নিজে নেমে এসে সেলাম নিয়েছিল, বলেছিল, আইছ হাসিতুল্লা ? ওই হালারা চরে পুলিশ আনছে, হাত করছে পুলিশেরে, আমার মান রাখনের ভার তোমার।

আজ গগন তাকে দেখেও দেখল না।

জমিদারবাড়ির অদূরে কলাবাগানের পাশে পুলিশের তাঁবু পড়েছে। এগারো বিঘা জমি নিয়ে জমিদারের নাম করা কলাবাগান, বাবুর খোঁড়া ছোটো ছেলেটার শখের বাগান, কত রকম কলা যে কাঁদির পর কাঁদি ফলে যায়। গাঁয়ের মানুষ দেখতে পারে চেয়ে চেয়ে, কোনোদিন চাখতে পারে না, পূজাপার্বণে প্রসাদ বিতরণের সময় যদি দু-একটুকরা জুটে যায়।

বৈঠকখানায় দারোগা, কয়েকজন জোতদার, ছোটো জমিদার নিয়ে কর্তার বৈঠক। কর্তার হাতে গড়গড়ার নল, দারোগাবাবুর মুখে সিগারেট। কাচের গেলাসে রঙিন পানীয়। পর্দা ঠেলে থমকে দাঁড়ায় হাসিতুল্লা।

কে রে তুই !

সেলাম কর্তা। ডাক দিছেন, আইছি।

আরে ব্যাটা হারামজাদা—

দারোগাবাবুর হুংকার থামিয়ে কর্তা বলে, হাসিতুল্লা, গগনের কাছে যাও ! এখানে কী ?

একজন পুলিশ তাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে দেয় বারান্দার নীচে।

এদিক ওদিক চেয়ে কাছারিবাড়ির নির্জনতম দিকে গিয়ে একা একটু বসতে চায় হাসিতুল্লা। রুদ্ধঘরের ভিতরে সে চাপা কান্না শোনে মেয়েছেলের।

রাত্রির গাঢ় কুয়াশার দিকে চেয়ে হাসিতুল্লা বলে, আল্লা।

হারাণের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ-সুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাঁট বেঁধে বসবার কোনো চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে গিরে ফেলল ছোটো হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আঁটঘাঁট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে ! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে ? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালী বলে, দেইখা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখা লমু।

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনো গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে ? তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা !

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপদপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশি বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়িটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারাণ দাসের কোন বাড়ি ?

তার পাশের বাড়ির হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গন্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পালটা প্রশ্ন করে, আজ্ঞা কোন হারাণ দাসের কথা কন ?

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয় একেবারে তুখোর হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে।

এদিকে হারাণ বলে, হায় ভগবান।

ময়নার মা বলে, তুমি উঠলা কেন কও দিকি ?

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কী হয়েছে ভালো বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গন্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোনো কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব !

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়া বাপটার তরে ভাবনা !

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপশোশে ফুঁসে ওঠে, আঃ ! ভালো শাড়িখান পরতে পারলি না ?

বলছ নাকি ? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙিন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙিন শাড়িটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভালো কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিনাড়া থানা গৌবপুব

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কী রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কী, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই!

ভুবন বলে, তবেই সারছে। দশনিশটা খুনজখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।

থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কী হয়।

শ দেড়েক চাষি চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষিদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা

রীতিমতো নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতি পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তল্লাশ করতে। তল্লাশ করে আসামি না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বেআইনি কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তল্লাশ করতি দিমু না।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমু না !

এমনই যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণগলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোনো আসামি নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামি রাখুম ? বিকালে জামাই আইছে শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাশ করতে চান, তাল্লাশ করেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।

ময়নার মা বলে, দ্যাখেন আইসা, তাল্লাশ করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা ? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রুপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কী দারোগাবাবু, মাইযাটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা।— মন্মথ বলে, ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিয়ো।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা ?

গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, সদর দিয়া আইছে ! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে !

গৌর আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙিন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে যায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি এ পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোবাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আপশোশ হয় যে জোয়ান মর্দ মাঝবয়সি চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ !

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে শনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না ! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারি সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মতো। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনির বর ?

হারাণ বলে, হায় ভগবান !

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না বদ্ধ কালা।

অ ! মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মরো মরো তখন যায় এখন যায়।

তুমি অমনি ছুটে এলে ?

আসুম না ? রতিভরি সোনারুপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু ?

ওঃ ! তাই ছুটে এসেছ ? তুমি হিসেবি লোক বটে। মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তল্লাশ ও তছনছ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু-পা পিছু হটে এখনও চাষির দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তল্লাশ চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথাকানি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়িতেই। অল্প নেশায় রঙিন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য,—চোখ তার রঙিন শাড়িজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি-বাইশবছরের জোয়ান ভাইটা, উশখুশ করে ক্রমাগত। ভুবনেব চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না !

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো না গিয়া বাছা ? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে,—ময়নার মার গলা ধরে যায়, আপনারে কী কমু দারোগাবাবু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোনো, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কী করবা ? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই ? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপটা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ্‌দিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড়ো থানার বড়ো দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে ! এমন তামাশা কেউ কখনও করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা ! সে যে এমন রসিকতাও জানে কে তা ভাবতে পেরেছিল ?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভবা এমন যে ভয়ংকর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা ময়নার মা, তোর মদ্যি এত ?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কী লো ময়না, জামাই কী কইলো ? দিছে কী ?

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল

আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা শার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি ? কখন আইলা ?

নন্দ বলে, আরে শোনো, শোনো, তামুক খাইয়া যাও।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কী কাণ্ড বুঝলা নি ?

কেমনে কমু ?

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনেব হাতে খোঁটা-সুদ্ধ গোরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, বাড়িত নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান ?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে ?

তা ভয় নেই জগমোহনেব, তারা আশ্বাস দেয়, হাতেব সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনও ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটিকুটি কবে ফেলাব আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মাব জামাই, তার দাবি সবাব আগে !

শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখান !

নিজের হইলে বুঝতা। জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওযি করে অবাক হয়ে !

আচমকা জামাই এল, মুখে তাব ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্তসমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীর শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তাব যেন আশা ছিল জানা ছিল এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, আস বাবা আস। ও ময়না, পিঁড়া দে। ভালো নি আছে বেবাকে ? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া ?

আছে।

আরেকটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটাছাঁটা এই এক কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভালো ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদাফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির পণ করেছে জগমোহন ! লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, আসে নাই ? হারামজাদা আসে নাই ? হায় ভগবান !

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন দ্যাখে না, কী হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন কিন্তু কোনো খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

খাড়াইয়া রইলা ক্যান ? বস বাবা, বস।

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না যামু গিয়া অখনি।

অখনি যাইবা ?

হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে ?

শুইছিল ? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব ?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শাশুড়ি জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠান্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা ! অন্যে তো কয় না ?

অন্যের কী ? অন্যের বউ হইলে কইতো।

বড়ো ছোটো মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা জুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে। তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দোপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি ? আইছে হারামজাদা ? হায় ভগবান, আইছে ? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বউ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কী হইছে গো ময়নার মা ? নিতাই পালের বউ শুধায়, মাইয়া কাঁদে ক্যান ?

তাদের দেখে সংবিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, কাঁদে ক্যান ? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব নাই?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া ?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও জিরাইতে দাও।

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারও নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কী ?

বাপ নাকি ? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কী কইব ?

জামায়ের অভাব কী। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারী। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে শুধু শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গটগট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনও বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে

চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু জোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামাইয়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা তো ?

না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী !

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, আসে নাই ? ছোঁড়া আসে নাই ? হায় ভগবান !

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া জোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারিগাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই !

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, আসে নাই ? মোর মরণটা আসে নাই ? হায় ভগবান !

জগমোহন চুপ করেছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—উয়ারে ধরছে ক্যান ?

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।

ক্যান ধরছে ?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কী ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা ? থাইকা যাও।

থাকনের জো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও ? আখা ধরাই ? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরানডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

আবার কবে আইবা ?

দেখি।

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যাবাতেই পুলিশ হানার সেই রকম শোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশি। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ি।

কী গো মণ্ডলের শাশুড়ি, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা ?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে ?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর তো মাগি ভাগ্যি ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে ! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন !

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড়ো হচ্ছে। মথুরের ঘর পার হয়ে পানা-পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আটগুণ বেশি লোক পথ আটকায়। রাত বেশি হয়নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে ! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই ? কই গেল ? হায় ভগবান !

ধান

অন্ধকার উৎকর্ণ হয়ে আছে ধানের গোলাটা ঘিরে, মাঝরাত্রির চাঁদ-ডোবা অন্ধকার। সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে গাঢ়তর ছায়ায় মিশে যাবার চেষ্টা করছে অর্ধউলঙ্গ মূর্তিটা, শ্বাসরোধ করে দু চোখে অন্ধকার ভেদ করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে প্রহরীর গোপন উপস্থিতি। অত্যন্ত ভয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে অর্ধউলঙ্গ দেহটা।

পাহারা নেই ? এ দিনে ধানের গোলা, প্রাণের গুদাম, পাহারাশূন্য ? এটা ধাঁধার মতো লাগে পাঁচুর কাছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে পাহারাদার অন্তরালে আরামের ব্যবস্থা করে, নয় কর্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে স্ফূর্তির জন্য কোথাও গিয়ে। মানুষ যখন ধানের জন্য উন্মাদ, গা-ঘেঁষা মরণ ঠেকাতে দিশেহারা, মরিয়া, গোলাভরা ধান তখন অরক্ষিত রেখে দিতে পারে শরৎ হালদার ?

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখে পাঁচু, ঝোলা থেকে বার করে চকচকে দা, তারার আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে তার ধার। গোলার যেটা পিছন দিক, দু-তিনহাত তফাতেই এক ইটের দেওয়াল, সেইখানে স্যাঁতসেঁতে শেওলায় জমানো আবর্জনায় দাঁড়িয়ে সিমেন্টের ভিত্তির আধহাত উঁচুতে গোলার মাটি লেপা চাঁচের বেড়া কাটতে শুরু করে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, আওয়াজ বাঁচিয়ে, ধীরে ধীরে সিঁদ দেয় সঞ্চিত জীবনের ভান্ডারে। ছোটোখাটো গর্ত হলেই যথেষ্ট, সেই ফুটো দিয়েই শস্যকণা ঝুরঝুর করে বেরিয়ে আসবে। তার থলি ভরে যাবে। উপোস-জ্বরের শান্তি ঘটিয়ে কাল অন্নপথ্য করবে সে আর বুঁচি।

দেয়াল ভেদ হয়। ধান গড়িয়ে আসে না। ডান হাতটা পাঁচু সবখানি ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে, ছড়ে যায় কেটে যায় হাতের চামড়া। গোলার মধ্যে হাতড়ে ধান খোঁজে। দু-চারটে ধান পড়ে আছে মেঝেতে, গোলা ধানশূন্য !

হাত বার করে এনে হতভম্ব পাঁচু ভাবে, এ কেমন ধাঁধা, কীসের পরিহাস ! কালও ধান ছিল গোলায়, কী করে উধাও হয়ে গেল ধান ? পাপী সে, চোরছ্যাঁচড়, তার স্পর্শেই কি শূন্য হয়ে গেল ধানের গোলা ?

মণ্ডল সাঁতরা ভৌমিকরা ভোর ভোর গাঁ-সুদ্ধ লোক জুটিয়ে এনে শরৎ হালদারের ধানের গোলায় চড়াও হবে, টেনে বার করবে তার মজুত, সবার সামনে ওজন করে ন্যায্য দামে বেচে দেবে গাঁয়ের উপোসি মানুষদের—এ পরামর্শ চুপে চুপে শুনেছিল পাঁচু। খিদেয় খ্যাপা মানুষগুলি হানা দেবার আগে নিজের ঝুলিটা ভরে নেবার ফিকিরে এসেছিল ! সব মিথ্যে হয় গেল !

নিজের কপালে জোরে চাপড় মারে পাঁচু। দু চোখ তার ফেটে যায় জল আসার তাগিদে। তার ঝুলি নয় ভরল না তার দুরদৃষ্ট, শ-দেড়শো মানুষ যে হাঁ করে আছে কাল কিছু ধান পাবার আশায়, কাকে তারা অভিশাপ দেবে !

সোনা মণ্ডল আপশোশ করে বলে, রাতারাতি পাঁচশো মন ধান সরিয়ে ফেলল, কেউ টের পেলে না ? শুধু পরামর্শই হল, কেউ নজর রাখলে না ? আমি নয় গেছিলাম কুটুমবাড়ি—

ঋষি পাঞ্জা বলে, কেন গেলে ? নিশ্চিন্দি হয়ে তুমি কুটুমবাড়ি যেতে পার, মোরা ঘুমোতে পারি না নিশ্চিন্দি হয়ে ?

ঋষি তোকে আমি— আগুন বর্ষণ করে সোনা মণ্ডলের চোখ।

পরাণ ভৌমিক বলে, কেন ? কেন ধমকাবে ওকে ? দায়িক মোরা সবাই নই ? রাতারাতি পাঁচশো মন ধান সরাবে কুথা দিয়ে কেমন করে তুমি ভাবলে। মোরা ভাবতে পারি না রাতারাতি কুথা দিয়ে কেমন করে পাঁচশো মন ধান সরাবে ?

তা বটে, হক কথা।—চোখের নিমেষে শান্ত অনুতপ্ত হয়ে যায় সোনা মণ্ডল, মোদের সবার খেয়াল করা উচিত ছিল হালদার মশায় মস্ত ঘুঘু। কিন্তুক কী ব্যাপারটা বল দিকি, অ্যাঁ ! কুথা সরালো, কেমন করে সরালো ধান ?

এই কথাই ভাবে সবাই। ছেলে বুড়ো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাঁধা যাই হোক, ভুল যাই হয়ে থাক, শরৎ হালদারকে টেনে এনে ছিঁড়ে ফেলা যায়। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলা যায় বুড়ি কচি মেয়েপুরুষ যে আছে তার বাড়িতে—আগুন দিয়ে ছাই করে দেওয়া যায় তার বাড়ি। পাকা দালান তো তার একটা ভিটের তিনখানা ঘর, বাকি বাঁশ কাঠ খড়ের মহাল আগুন দিলেই দাউদাউ করে জ্বলবে। সেই আগুনের আঁচে পুড়ে না যাক গলে যাবে পাকা দালানের লোহার সিন্দুকের সোনা।

কিন্তু তাতে তো আর ধান মিলবে না। সে হবে শুধু প্রতিহিংসা।

ফিরে চলে যাচ্ছিল সবাই আপশোশ বুকে নিয়ে মিছামিছি হাঙ্গামা করাব স্বভাব তাদের নয়, বাংলা দেশের মানুষ কখনও প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয় না। শরৎ হালদারেব কী দুর্মতি হল, কী খেয়াল চেপে গেল একটু বাহাদুরি করার, গোমস্তা নারায়ণকে সে পাঠিয়ে দিল তার প্রতিনিধি হিসাবে বজ্জাত লোকগুলিকে দু-চারটে ধমক ধামক দিতে !

ধান পেলে সোনা মণ্ডল ? উল্লাসে উত্তেজনায় বিকৃত ব্যঙ্গের সুরে চেঁচিয়ে বলল নাবায়ণ তার ফতুয়ার বোতাম আঁটতে আঁটতে, বলি ধান পেলে গোলায় ?

ফিরে যাচ্ছিল, ফিরে যেত সবাই, এই উৎকট ধিক্কারে গুম খেয়ে গেল গাঁয়ের শ দেড়েক পুরুষ। অসহ্য বিস্ময়ে তাকাল দু চোখে জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে।

গোমস্তা নারায়ণের কি অত খেয়াল আছে, চিরকাল মানুষ ঠেঙিয়ে সে তিরস্কার দূরে থাক, পেয়েছে পুরস্কার।

আবার সে চেঁচায়, বলি গোলার ধান ন্যায্য দরে বাঁটোয়ারা করলে না সোনা মণ্ডল ?

ধান কোথা গেল নারাণ ? সোনা মণ্ডল প্রশ্ন করল জোরালো গলায়। এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে সে চুল মুঠো করে ধরল নারায়ণের, ডান হাতে মুঠো করে ধরল তার বুকের ফতুয়া, টেনে আনল সবার মধ্যে।

ধান কোথা গেল ?

আমি—আমি—হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল নারায়ণ। দম আটকে শ্বাস টেনে বিহ্বল হয়ে ভয়ার্ত কান্না।

এক ধাক্কায় তাকে উঠানে ফেলে দিল সোনা মণ্ডল। মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলল তার মুখে। ধারালো দা বাগিয়ে কোপ দিতে ছুটে যাচ্ছিল জোয়ান মজিদ, বাঁ হাতে সাপটে ধরে তাকে ও আটকাল।

বলল, দুৎ ! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।

সুবল মশাল জ্বেলেছে। এগিয়ে গেছে হালদারের গোয়ালঘরের চালায় আগুনের ছোঁয়াচ দিতে। সোনা মণ্ডল ছুটে গিয়ে মশাল কেড়ে নিল।

কী পোড়াবি ? ঘরবাড়ি ? ঘরবাড়ি কী শত্তুতা করেছে মোদের সাথে ? ঘর পুড়বে মিছিমিছি, শত্তুর পালাবে, কাল মিলিটারি এনে গুলির চোটে ভুলিয়ে দেবে রাইকিশোরীর নামটা !

সোনা মণ্ডলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় নগেন কুণ্ডু, তার আশাভরসা, টাকা খরচ ব্যর্থ হয়েছে। মুকুলের দিকে তাকিয়েই তার জ্ঞান ফিরে আসে, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, এঁদো ডোবার পাশ দিয়ে পড়িমরি ভাবে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় আমবাগানে। মুকুল আর বটুক তার পিছু তিনবার হাঁক দেয় সোনা মণ্ডল গলা চড়িয়ে চড়িয়ে, মুকুল আর বটুক অনিচ্ছায় থেমে ফিরে আসে।

সোনালি তাজা রোদ উঠে গেছে ততক্ষণে। খানিক দূরে সরকারি সড়ক দিয়ে আওয়াজ তুলে ধুলো উড়িয়ে নন্দীপুরের বোঝাই বাসটা চলে গেল। আজ দেরি করেছে, সদর থেকে ভোর চারটায় ছেড়ে আরও আগে গাঁ ঘেঁষে বাসটা বেরিয়ে যায়, ওঠানামার যাত্রী না থাকলে থামেও না।

বাসটা যেন থেমেছিল এদিকে, রাস্তাটা যেখানে বড়োপাড়ার ঘরবাড়ির আড়ালে। টিনের ছোটো বাক্সোটি হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে আসতে দেখা যায়। মামলাবাজি ব্যাবসা উল্লাসের, অনেক উকিল মোক্তারের চেয়ে তার অনেক বেশি উপার্জন ! সম্প্রতি এগারো জন চাষির নামে একদিনে হালদার সতেরোটা মামলা শুরু করেছে, তাই নিয়ে বড়োই ব্যস্ত হয়ে আছে, গাঁ আর সদর করে বেড়াচ্ছে হরদম।

জমায়েত দেখে সে তফাতেই থমকে দাঁড়ায়। হালদারের বাড়ির সামনে ভিড় জমাটা শুভচিহ্ন নয়। দিনকাল সুবিধে নয়।

কুক্ষণে অসময়ে বাস থেকে নেমেছিল উল্লাস, ক্ষুব্ধ ব্যাহত মানুষগুলির সামনে এসে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাদের বুকে বহুদিনের জমা করা পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণার আগুন ! সোনা মণ্ডলের গায়ে চড় মেরেও কুণ্ডু ছুটে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছে, কারণ মানুষটা সে যেমন হোক সে তাদেরই মানুষ, সাথে এসেছিল একই উদ্দেশ্যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল না যে হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একটা দোষ করলেই বারুদের মতো ফেটে পড়বে। সবাই জানে, ও বেলাই হয়তো দেখা যাবে সোনা মণ্ডলের দাওয়ায় বসে সে কলকে ফুঁকছে, মাপ চেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা।

কিন্তু উল্লাসের ওপর বড়ো রাগ তাদের, বহুদিন ধরে মনগুলি জর্জরিত অভিশাপ হয়ে আছে। হঠাৎ গর্জন করে ওঠে আড়াই শো লোক, তাতে তলিয়ে যায় সোনা মণ্ডল আর অন্য কয়েকজন ঠান্ডা মাথা মানুষের প্রতিবাদ। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় ফন্দিফিকিরের জাল বোনা, মানুষের পর মানুষকে পথে নামানোর অধ্যবসায়, শিশির ভেজা ঘাসে চিত হয়ে উল্লাসের দৃষ্টিহীন পলকহীন চোখ মেলা থাকে আকাশের দিকে। বাতাসে উড়ে যায় ছিঁড়ে কুটিকুটি করা দলিলপত্র, নোটের তাড়াটা পর্যন্ত কেউ ছোঁয় না, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায় শরৎ হালদারের, বন্দুক ধরা হাতটা পর্যন্ত থরথর কাঁপতে থাকে।

ফুঁপিয়ে কাঁদে মেয়ে বিনু, ছেলের বউ রাধা গা থেকে গয়না খোলার ব্যস্ততায় আলগা অনন্তটা টানাটানি করে যেন খুলতে পারে না, হালদার গিন্নি মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে সিঁদুরমাখা লক্ষ্মীর পটটার সামনে, দাঁতে দাঁত চেপে মূক হয়ে থাকে হালদারের দুই জোয়ান ছেলে।

খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে কখন লোক গেছে থানায় খবর দিতে, এখনও এল না নৃপেন দারোগা দলবল নিয়ে। এমনই বিপদে দয়া করে ছুটে আসার অগ্রিম মূল্য নিয়ে রেখেছে, তবু।

হালদারের জন্য জীবন দেয় উল্লাস, এই তার শেষ কাজ। কিন্তু জীবন দিয়েও যেন অপকার করে যায় শেষবারের মতো। শূন্য গোলা দেখে ক্রোধে, ক্ষোভে ফুসতে ফুসতে ফিরেই যেত ধৈর্যহারা মরিয়া মানুষগুলি, হালদারের বাড়ি চড়াও হত না। ধান তারা লুটতে আসেনি কিনতে এসেছিল গায়ের জোরে—তার বেশি আর কিছু করার কথা মাথায় ছিল না। উল্লাসের অনেক দিনের পুরানো পাওনা ঝোঁকের মাথায় মিটিয়ে দিয়ে মনের গতি যেন ঘুরে গেছে তাদের। গোলার ধান কোথায় গেল এ প্রশ্নের জবাব হালদারের কাছেই আদায় করার সাধ জেগেছে।

জবাব চাই, ধান কী হল। জবাব দিতে হবে হালদারকে !

উঠানে দালানের সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়ায়। ডাকে, হালদার মশায়, হালদার মশায় !

দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ কারও সাড়াশব্দ মেলে না। তারপর ধীরে ধীরে জানালার একটা পাট খুলে গিয়ে শিকের ফাঁকে দেখা যায় বড়ো মেয়ে বিনুর ভয়ার্ত মুখ।

বাবা বাড়ি নেই।

বাড়ি আছে, লুকিয়ে আছে, গর্জন করে ওঠে তারা, আসতে বলো হালদার মশায়কে, নইলে দরজা ভেঙে ফেলব।

বন্দুক তোলে হালদার, বড়ো ছেলে ঠেকিয়ে রাখে। বলে, একটা বন্দুকে কী হবে ? আরও খেপে যাবে সবাই।

বোনকে সরিয়ে সে জানালায় দাঁড়ায়। বলে, কী চাই সোনা মণ্ডল ?

গোলার ধান কোথা গেল ? মোরা কিনতে এয়েছি ধান।

ধান নেই, বেচে দিয়েছি।

কাকে বেচলে ? কখন বেচলে ?

জগৎ কুণ্ডুকে বেচে দিয়েছি। রাত্রে ধান নিয়ে গেছে।

বেচে দিয়েছ ! গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরছে, তুমি ধান বেচে দিয়েছ !

জানালার পাট ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয় বড়োছেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জানালা নয়, দরজাই খুলে দিতে হয় পরাণ ভৌমিক আর সোনা মণ্ডলকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। রাতারাতি পাঁচশো মন ধান সরিয়ে নিয়ে গেছে সাতকুঁড়ার জগৎ কুণ্ডু, কিন্তু গাঁয়ের লোক কেউ টের পায়নি, এটা সহজে বিশ্বাস করতে চায়নি তারা। দালানের তিনটে কোঠা খুঁজে দেখার দাবি করেছে।

শুধু দুজন ভেতরে আসবে এই শর্তে দরজা খুলেও দিতে হয়েছে।

ঘরে ফিরে পাঁচু কাপড়ে বাঁধা আধসেদ্ধ ভেজা চালগুলি টুকরিতে ঢেলে রাখে। বুঁচি খুশি হয়ে বলে, আ মর ! কোথাকার কুড়োনো চাল ?

পাঁচু হাসে। উনান থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দালানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হালদারের বড়োবউ, হাঁড়ি থেকে আধসিদ্ধ চালগুলি পাঁচু ছেঁকে কোঁচরে বেঁধে এনেছে।

গভীর রাত্রে লরি এসেছিল জগৎ কুণ্ডুর, দশজন লোক নিয়ে। সরকারি রাস্তায় থেমেছিল লরি।

ইঞ্জিন না চালিয়ে নিঃশব্দে লরিটা ঠেলে আনা হয়েছিল হালদারের বাড়ির কাছে, হাতে হাতে গোলার ধান কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে এসেছিল লরিতে, আবার ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড়ো রাস্তায়।

দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কতবার এসেছে লরিটা, ধানচাল নিয়ে গেছে গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে দিয়ে, তখনও মরিয়া হয়ে ওঠেনি গাঁয়ের লোক পেটের জ্বালায়। লরির চাকার অনেক দাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছে গতরাত্রির আনাগোনার নতুন দাগ।

জগৎ কুণ্ডুর তিনটে আড়ত, একটা গাঁয়ে, একটা নন্দীপুরে, একটা সদরে। তার কোনোটাতেই যায়নি ধান নিয়ে লরিটা, বড়ো সড়ক ধরে ক্রোশ দুই নন্দীপুরের দিকে গিয়ে বাঁয়ে মোড় ঘুরেছিল অন্য রাস্তায়, হাজির হয়েছিল তিন ক্রোশ তফাতে নদীর ধারে পলাশডাঙায়।

ধানচাল চোরা চালানের এখানে একটা ঘাঁটি আছে কুণ্ডুর।

জানে অনেকেই, এক রকম প্রকাশ্যভাবেই চোরাচালান চলে। গোপনতা শুধু এতটুকু যে সরকারিভাবে ব্যাপারটা স্বীকৃত হয় না।

টিনের চালা, সিমেন্ট করা মেঝে। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ধানগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে ঢেলে ফেলা হয়। এক কোণে অল্প কিছু চাল পড়েছিল মেঝেতে চাল ও তুষের গুঁড়ো। বোঝা যায় গুদামে চাল জমা হয়েছিল, সম্প্রতি সরানো হয়েছে, এখনও মেঝে ঝাঁট দেওয়াও হয়নি। অলস স্তিমিত চোখে তাকায় নারায়ণ, শস্যের গন্ধ তার নাকে লাগে না, নাক ভোঁতা হয়ে গেছে। ছোটো ঝাঁটাটি হাতে নিয়ে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বাজু, মা ও মেয়ে। ধান গুদামঘরে তুলতে যে কটি দানা পথে মাটিতে ঝরে পড়বে, ঝেঁটিয়ে ওরা কুড়িয়ে নেবে। খেয়ে বাঁচবে।

ধান যারা আগে গুদামে তুলেছিল তাদের একজন বোঝা থেকে কিছু ধান হাত বাড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আড়চোখে চেয়ে হাসে। বাজু তার শীর্ণ মুখে খুশির ভাব ফোটাতে চেষ্টা করে। মাটিতে ঝরে পড়া শস্যকণা কুড়িয়ে নেবার একচেটিয়া অধিকার দিয়েই তাকে কিনতে পেরেছে নারায়ণ। তার ওপর এই দয়া, খেলার ছলে আরও দুটি বেশি শস্য ছিটিয়ে দেওয়া।

ছোটো ঘাট, খেয়া পারাপার হয়, কয়েকটি নৌকা আসে যায়, কয়েকটি ঘাটে বাঁধা থাকে, মেয়েপুরুষ নাইতে বা জল নিতে আসে। সকালে ধানচালের গুদামটির গায়ে লাগানো কেরোসিনের দোকানের বারান্দায় চেয়ারে বসে নারায়ণ ঝিমোয়, বান্দা মেপে মেপে কেরোসিন বেচে। তেল দিতে যেন হাত ওঠে না। ...র, পয়সা নিয়ে দুফোঁটা তেলও যেন দেয় অনিচ্ছায়। সবাই পায় না তেল, পাওনা তেলের দশভাগের এক ভাগও পাবে না, তেল ফুরিয়ে যায়। এটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান দশ টিনে দু টিন এমনিভাবে বাঁধা দরে বেচে ঠাট বজায় রাখতে হয়। বাকিটা নির্বিবাদে বেচা যায় চোরা দরে।

নৌকার মাঝি এসে দাঁড়ায়। হাই তুলে নারায়ণ বলে, দেশপুরের কলে পৌঁছে দিবি ধন।

মাঝি বলে, দিনে বোঝাই দিতে বাবু বারণ করেছে না।

দুত্তেরি বারণ করেছে, নারায়ণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই বলে, তোল তুই। কী হবে? কোন শালা কী করবে?

তা ঠিক কিছুই হয় না, কেউ কিছু বলে না সবার চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে চোরাই ধানচাল চালান দেওয়া যায়।

কিন্তু চিরদিন কি যায়? চিরদিন কি মানুষ মুখ বুজে থাকে কিছু বলে না।

ওরা কারা আসছে দল বেঁধে? কেরোসিনের খদ্দের? কেরোসিনের খদ্দের তো এমন দল বেঁধে আসে না। সুধীর, কানাই জৈনুদ্দীনদের দেখা যাচ্ছে। একটা কিছু হাঙ্গামা করতে আসছে। নারায়ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

তোমার গুদামে চোরাই ধান আছে।

তুমি কে হে বাবু? আমার গুদামে কী আছে না আছে তোমার তাতে কী?

সুধীরের মেজাজ বিগড়েই ছিল, সে চিৎকার করে বলে, আবার চোখ রাঙায়। বাঁধো ব্যাটাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলো থানায়।

সুধীর বলে, থামো, থামো। দারোগাবাবু আসুক। ধান রয়েছে, আসামি রয়েছে, এ তো আর চাপা দেওয়া চলবে না।

থানার দারোগা বিধুভূষণ এসে পৌঁছতে পৌঁছতে খবর ছড়িয়ে প্রকাণ্ড ভিড় জমে যায়। উৎসুক, উত্তেজিত হয়ে জনতা প্রতীক্ষা করে কী ঘটে দেখবার জন্য। এতকাল ধরে এমন খোলাখুলিভাবে এখান দিয়ে ধানচালের বেআইনি চালান চলে আসছে যে লোক প্রায় খেয়াল করতেই ভুলে গিয়েছিল কারবারটা আইনসঙ্গত নয়। নারায়ণের মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ তার পিটপিট করে।

এ অঘটন তার কল্পনায় ছিল না। সুধীর কানাইরা যে দল বেঁধে এসেছিল সেটা সে গ্রাহ্যই করেনি, থানায় খবর গেছে শুনে মনে মনে একটু হেসেই ছিল বরং। কিন্তু দেখতে দেখতে যেভাবে চারিদিক ভেঙে এসে জমা হয়েছে মানুষ, খুশির উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিশ এসে তাকে কী ভাবে বেঁধে নিয়ে যাবে দেখবার জন্য, তাতে ভড়কে গিয়েছে নারায়ণ। কিছু তার হবে না শেষ পর্যন্ত সে জানে। তবু একটা অদ্ভুত আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, দম যেন আটকে আসবে। জনতার এই ভয়ংকর বিরোধী মূর্তি সে জীবনে কখনও দেখেনি।

বিধুভূষণও ভড়কে যায় ব্যাপার দেখে।

বলে, কী ব্যাপার, কী ব্যাপার, হয়েছে কী ! ভিড় কীসের !

বলে, ধান ? চোরাই ধান ধরা পড়েছে ? তাই নাকি ! তা এত ভিড় কেন ?

বলে, কী হে পরাণ, ব্যাপারটা কী ?

আমি কী জানি, নারায়ণ বলে, কর্তা ধান পাঠাল—

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। শুনছি সব। প্রায় ধমক দিয়ে বলে বিধুভূষণ, লোকটার মূর্খতায় সে চটে যায় ! কর্তাকে আবার টানবার চেষ্টা কেন এর মধ্যে ? বিধুভূষণ যেন জানে না কে তার কর্তা, কে ধান পাঠিয়েছে !

সুধীর কানাইদের বলে বিধুভূষণ, ওহে তোমরা ভিড় ভাগাও, তোমরাও যাও। ধরিয়ে দিয়েছ, এবার যা করার আমায় করতে দাও।

সুধীর কানাইরা নড়ে না। ভিড় এক পা পিছু হটে না।

সুধীর বলে, সবার সামনে ধান দেখুন, সাক্ষীদের নামটাম লিখুন—

ব্যাটাকে গারদে পুরুন !—একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরায় বিধুভূষণ, সুধীরদের দিকে, পিছনের জনতার দিকে দু চার বার তাকায়, তারপর নারায়ণকে বলে, গুদামটা খোলো তো হে। কত ধান আছে ?

দরজা খুলে একবার উঁকি দিয়ে দেখেই বাইরে থেকে তালা এঁটে সিল করে দেওয়া হয়, লেখালেখি হয় বিবরণাদি সাক্ষীর নামধাম, তারপর একজন পুলিশকে গুদামের সামনে মোতায়েন রেখে নারায়ণকে নিয়ে বিধুভূষণ চলে যায়।

ভিড়ের মানুষ তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরে।

সেই দিন জগৎ কুণ্ডু যায় সদরে, হাজিরা দেয় জোনসের বাংলোয়। জোনস একা থাকে, তার মেম থাকে কলকাতায়। শহর ছেড়ে সে নড়ে না, টাকা চেয়ে পাগল করে তোলে জোনসকে। না দিয়ে উপায় থাকে না, বড়ো মুশকিল হয় টাকার ব্যাপারে কড়াকড়ি করলে।

পরদিন দেখা যায় কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে নারায়ণ। পুলিশের তত্ত্বাবধানে গুদামের ধানগুলি থানার কাছে এক চালা ঘরে চালান হয়ে যায়, স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে জমা হয়। খড়ের চালার অনেকগুলি ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে মেঘম্লান আকাশের আলো।

সুধীর কানাইরা কয়েকজন দেখা করতে যায় বিধুভূষণের সঙ্গে, জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার হল ?

বিধুভূষণ বলে, খোঁজখবর রাখবে না কিছু, হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসবে। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে তোমাদের ? লাইসেন্স আছে নারায়ণের, জগৎবাবু ওর নামে পারমিট করিয়ে রেখেছিলেন। নারাণেরও বুদ্ধি বেশি, আরে বাবা তুই লেজিটিমেট এজেন্ট সরকারের, জগৎবাবু তোর লাইসেন্স পারমিট সব করে রেখেছেন না রাখেননি, সে খবরটাও তুই জানিস না ?

ধানটা তা হলে সরান হল কেন ?

তোমাদের জন্য, বিধুভূষণ অনুযোগের সুরে বলে, এ ধানটা নিয়ে হাঙ্গামা করলে তোমরা, ফের যদি হানা দাও নারাণের গুদামে, গোলমাল কর। আমার হেফাজতে রাখার হুকুম হয়েছে।

এ যুক্তি ভালো। দারুণ অসন্তোষ বুকে নিয়ে ফিরে যায় সুধীরেরা। মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশ কালো করে। বৃষ্টি নামে অজস্র ধারে। আবার রোদ ওঠে, আবার বৃষ্টি হয়। রাত্রে শেয়াল ঘুরে যায় ধান রাখা চালাটার চারপাশে। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে সে গন্ধ। তারপর একদিন সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা হলে চালাটার দরজা খুলে দেখা যায়, ধানগুলি পচে গেছে।

সাথি

আবার মারে গগন, আরও জোরে মারে। এবার বাখারির ভোঁতা ধারেও পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। মরা ঘামাচিতে চামড়া কর্কশ সোহাগীর, স্থানে স্থানে দাদের চাপড়া।

নিষ্ঠুরতার নেশায় উন্মত্ততা এসেছে, থরথর করে সর্বাঙ্গ কাঁপে গগনের, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি চলে অবিরাম, আরক্ত চোখে ঝাপসা দেখায় জগৎ। আরও মারবে, আরও ! মারতে মারতে কখন তৃপ্তি আসবে গগন জানে না, মরে যাবে কিনা সোহাগী তাও জানে না, মেরে মেরে আজ সে ওকে টের পাইয়ে দেবে রোজগেরে স্বামীর কত জোর খাটে।

পরনের কাপড়খানা খুলেই খুঁটির সঙ্গে সোহাগীকে বেঁধেছে মারার সুবিধার জন্য সামনের দিকটা খুঁটিতে লাগিয়ে। মুখ দেখতে না পাওয়ায় শুধু কান্না আর কাতরানি শুনে তেমন যেন জুত হচ্ছে না। কান্না একটু ঝিমিয়ে আসায় প্রাণপণ শক্তিতে পাছায় আঘাত করে রক্ত ঝরিয়ে গগন সামনে যায় সোহাগীর মুখখানা দেখতে।

ঘাড় কাত করে দাঁত দিয়ে খুঁটির বাঁশটা কামড়ে ধরেছে সোহাগী। তাই তার এখন কান্না নেই, গলা থেকে শুধু একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

যন্ত্রণায় বিকৃত ভয়ার্ত বিহ্বল মুখ দেখে রাগ আরও চড়ে যায় গগনের। কড়া-পড়া চাষাড়ে হাতের প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয় সোহাগীর গালে।

আর খাবি ? আর খাবি চুরি কইরা ?

বড়ো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তখন। কেঁদে ককিয়ে সোহাগী আবার মাপ চায় না, জানায় না আর সে মরে গেলেও চুরি করে খাবে না স্বামীর ভাগের অন্ন, বরং কাতরানি থামিয়ে আকাশে গলা চড়িয়ে ঘোষণা করে :

খামু ! চুরি কইরা খামু ! খুন কইরা খামু !

তার বেপরোয়া বিদ্রোহে একটু ভড়কে যায় গগন, থতোমতো লাগে।

খাবি ?

খামু। ক্যান খামু না ? ভাত না পাই দাও দিয়া তোমারে কাইটা ব্যানুন রাঁইধা খামু।

এমন খিদে সোহাগীর এমন বিদ্রোহ ! ভাত না পেলে স্বামীকে কেটে মাংস রেঁধে খাবে ! তারপর সোহাগী হাউহাউ করে কাঁদে। এতক্ষণ পায়ে ভর ছিল, এবার একেবারে গা এলিয়ে দেওয়ায় মরমর করে ওঠে ঘুণ-ধরা বাঁশের খুঁটি। সুতরাং বাঁধনের কাপড়টা খুলে তাকে মুক্তি দেয় গগন। সোহাগী গায়ে কাপড় জড়াবার চেষ্টা করে না, হুড়মুড় করে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে মুখ গুঁজে থাকে।

চাঁচের বেড়ায় অসংখ্য ফুটো দিয়ে সকালের রোদ আর আলো সরু মোটা দিঘল হাত বাড়িয়েছে ঘরের ছায়াচ্ছন্ন গোপনতায়। এ যেন গভীর শোকাবহ অবস্থায় আনন্দ-ভরা উৎসাহী প্রকৃতির মিতালির সংকেত। সারারাত মাঠে ধান পাহারা দিয়েছে গগন। ভোরে ধান কাটতে কাটতে উৎসুক চোখে বারবার তাকিয়েছে গাঁয়ের পথের দিকে, উপোসি রাতের জমাট খিদেয় টং ধরে আছে সমস্ত শরীর, কাস্তে চালাতে হাত আড়ষ্ট হয়ে আসছে—তবু যে কলের মতো খেটে চলেছে সে শুধু এই ভরসায়—ভাত রুটি নিয়ে এখুনি সোহাগী এসে পড়বে।

বেলা বেড়েছে, সোহাগী আসেনি। রাগ বাড়তে বাড়তে মাথা ঘুরে গেছে গগনের। কাস্তে দীনুর কাছে জমা রেখে ঘরে এসেছে ব্যাপার জানতে।

কাস্তেটা যে আনেনি হাতে করে সেটা পরম ভাগ্য দুজনেরই। রাগের মাথায় গোড়াতে সোহাগীর গলায় বসিয়ে দিতে পারত চকচকে কাস্তেটা, যে গলা দিয়ে তার ভাগের ভাত পেটে তল করেছে সোহাগী !

এবার দ্রুত ঝিমিয়ে আসে গগন, রাগের জ্বালা ক্ষোভের জ্বালা নিষ্ঠুরতার উত্তেজনা সব জুড়িয়ে আসে। ঝিমঝিম করে মাথা। এক অকথ্য দুঃখের চাপ ঠেলে উঠতে চায় বুকের ভেতর থেকে, গলা ছেড়ে হাউমাউ করে একচোট কাঁদতে পারলে সে বেঁচে যেত।

মাঠে ফিরে যাবে ? পারবে খেটে যেতে পেটে শুধু জল বোঝাই নিয়ে ? মাঠে যেতেই হবে। খাটতে পারবে কী পারবে না, কতটুকু পারবে, মাঠে গিয়েই তা যাচাই করতে হবে। ধান কেটে তুলতেই হবে তাড়াতাড়ি। হয়তো সময় আছে শুধু আজকের দিনটি, আবার হানা দিয়ে ধান কেড়ে নেবার মতো দলবল সংগ্রহ করতে তার বেশি সময় হয়তো লাগবে না জোতদার ভূপতির। ভূপতি হানা দেবার আগে ধান নিরাপদ করা চাই। লেঠেলকে ঠেকাতে প্রাণ যদি দিতে হয় তো দেবে, কিন্তু মিছামিছি প্রাণ দিয়ে সুখ নেই, প্রাণটা স্থায়ীভাবে বাঁচাবার উপায় ধানগুলি বাঁচানোর ব্যবস্থা করে নিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত মনে মরা চলবে, তার আগে নয়।

এদিকে কী ফ্যাকড়া বাঁধল দ্যাখো। এমন করে মেরে এখন বউটাকে ফেলে সে কেমন করে মাঠে যায় ? ঘাটে গিয়ে যদি ডুবে মরে সোহাগী ? যদি গলায় দড়ি দেয় ! যেদিকে দুচোখ যাবে চলে যদি যায় মনের ঘেন্নায় ! কার জন্য তখন তাহলে সে ধান কাটবে মাঠের ?

নে যা বেশ করছস। ওঠ।

উদাসভাবে বলে গগন ! সোহাগীর সব অপরাধ মাপ করে ব্যাপারটা শেষ করে দেবার ভঙ্গিতে। সোহাগী নড়ে না, তার সাড়া মেলে না।

মাঠে যামু। কাপড়টা পর। ঝাঁপ খুলুম না ?

সোহাগী নড়ে না।

এক ঘটি জল দে। জল দিয়া পেট ভরাইয়া খাটি গা যাই, করুম কী।

বড়ো অসহায় মনে হয় নিজেকে গগনের। সোহাগীর নরম হবার শান্ত হবার জন্য যথেষ্ট সময় দেবার উপায় নেই, গরিব বেচারার জীবনে তাড়াহুড়ো তাগিদ পড়ে গেছে চারিদিক থেকে। তাড়াতাড়ি ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে চড়া সুদে দুটি চারটি ধানচাল কর্জ করো নইলে, উপোসি ধড়টা ছেড়ে যাবে প্রাণপাখি। দিনরাত চোখ পেতে রাখো চারিদিকে, সতর্ক প্রস্তুত হয়ে থাকো, ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যাবার দাখিল হয়েও তাড়াতাড়ি ধান কেটে তুলে সামলাও, কখন হানা দিয়ে কেড়ে নিয়ে যাবে জোতদার। মারধোর করার জন্য তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করো বউকে, উপোসের জ্বালার সঙ্গে শাসনের ঘেন্নায় সে পাছে কিছু করে বসে। একটা বেলা স্থগিত রাখার উপায় নেই কাজটা, সব কিছু ঝটপট চটপট একসাথে করা চাই, কোনোটার সবুর সইবে না ! এতও কি মানুষের সয় ?

মরণ তো আছেই—গগন বলে খেদের সঙ্গে, এমনেও মরুম ওমনেও মরুম। লাইঠাল পুলিশ নিয়ে আইবো, ধান তো ছারুম না। লাঠির ঘায় মাথা ফাটব না তো গুলি বিধবো বুকের মদ্যি। মরুম ঠিকই, তুই এমন কইরা মারিস না !

মাথা একবার উঁচু করে আবার সোহাগী মুখ গোঁজে।

তাই কর তুই, ঝড়ের মতো নিশ্বাস ফেলে গগন, দাও দিয়া কাইটা ব্যানুন রাঁইধা খা আমারে, মাঠে মইরা পচুম ক্যান শ্যাল শকুনে ছিড়া খাইবো, তর পেট ভরুক !

যা তা কইও না কইলাম ! সবেগে উঠে বসে সোহাগী, মারছ ধরছ সইয়া গেছি, যা তা কইলে সমু না কইলাম !

খানিক পরে সোহাগীই জল এনে দেয় টিনের মগে। এক ঘটি জল যে চেয়েছিল গগন সেটা নিছক অভ্যাস, ঘটি গেছে অনেকদিন আগেই।

যাবার জন্য গগন পা বাড়িয়েছে, সোহাগী বলে, ভাত নিয়া যামুনে।

পাবি কই ?

পামু। চাল জোগার করুম। মার খেতে খেতে যে ভাবে সোহাগী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল যে শুধু চুরি করে স্বামীর ভাগের ভাত খাওয়া নয়, ভাত না জুটলে গগনকেই দা দিয়ে কেটে ব্যানুন রেঁধে খাবে তেমনই বিদ্রোহের ভঙ্গিতে সে ঘোষণা করে, চুরি কইরা পারি ডাকাতি কইরা পারি চাল জোগার করুম। নন্দীগো ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি চাল—

দিব না। মাথা নাড়ে গগন।

দিব না ? না দিলে খুন করুম, দাও দিয়া গলা কাটুম।

আমগাছটার পাশ দিয়ে রোদ পড়েছে শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখে, কী যেন জ্বলজ্বলে সে মুখেই, কীসের পণ। শেষরাত্রে কাঁপিয়েছিল, শীত এখন মিঠে। নতুন করে আজ একবার মুগ্ধ হয় গগন নতুনভাবে তার বউয়ের চোখে চোখে চেয়ে। এদিক ওদিক থেকে সাড়া মিলছে মানুষের, রোগা গোরুটির গলার দড়ি ধরে নিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছে কাটু সেখের বউ গোরুটিকে পথে-পড়া নতুন খড় মুখে তুলে নেবার সুযোগ দিতে, তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

আস্তে আস্তে আবার ঘরে ঢুকে গগন ডাকে, শুইনা যাও।

সোহাগী কাছে এলে তার একখানা হাত ধরে গগন, জন্ম জন্মের দোষ ত্রুটি অপরাধ পাপের জন্য মার্জনা চাওয়ার মতো এক অদ্ভুত আবেগের সঙ্গে বলে, শোনো তোমারে কই। আর মারুম না ! গায়ে তোমার হাত দিমু না যা কর তুমি, কোনোদিন যদি তর গায়ে হাত তুলি সোহাগী—

গায়েন

গান গেয়ে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষকে এতকাল কাঁদিয়ে আসছে যে লোকটা, তার ফোকলা মুখে গালভরা হাসি দেখলে জগৎ যেন বদলে যায়। পাকা টুলটুলে খুশির ফলটি ফেটে গেছে হঠাৎ, এখন থেকে পৃথিবীতে আর আনন্দের অভাব হবে না। এই বুড়ো বয়সে গায়ের চামড়ার রংটাতেও যেন তার পালিশ আছে ঘন পুলকরসের।

সম্প্রতি কিছুকাল জের চলেছে বিষণ্ণতার, মন খারাপের।

শিংমাছের ঝোল দিয়ে ভাত বেড়ে দেয় আমোদ, বলে, কাঁদছ কেন? হেথা হোথা গাইতে যাও, ফিরে এসে মুখটা হাঁড়ি। মারে নাকি ধরে ধরে?

মুখে হাসি ভাঙে। হাতের গরাস নামিয়ে রাজেন সুর করে বলে,

সাধে কি কেঁদে মরি, ছিঁড়ে দাড়ি,
মেয়্যার হয় না শ্বশুরবাড়ি,
জগৎজনা দেয় টিটকারি,
বুড়ো রাজেনের গলায় দড়ি—

মুখ ছোটো হয়ে আসে আমোদের, চোখ হয় বড়ো বড়ো। এতদিনে তবে জানা গেল গায়ন সেরে ফিরে এসে রাজেন দাসের মন গুমরিয়ে থাকার কারণ! আর কোনো খুঁত পায়নি, বড়ো মেয়ে ঘরে রাখার ছুতোয় এবার সবাই টিটকারি জুড়েছে, অপদস্থ করতে চাইছে রাজেনকে। কে করছে, কারা উদ্যোগী, জানে আমোদ। এখনও এই বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যারা মাথা তুলতে পারে না, এই বুড়োর আসরে লোক ভেঙে পড়ে কিন্তু যাদের আসর খাঁ খাঁ করে শ্রোতার অভাবে!

বিদেয় করো। মোকে বিদেয় করো শিগগির! বলে আমোদ মনের দুঃখে কাঁদে।

কী যন্ত্রনা, সে কথা নয়! রাজেন বলে ভড়কে গিয়ে, মনে কথা এল, গেয়ে দিলাম, একটু তামাশা হল নিজের সাথে—তোর কথা মোটে নয়। তবে কিনা চিন্তা একটা জেগেছে। ভাবি কী, এবার বুঝি মোর বিদেয় নেবার পালা ক্ষমতা কমে আসছে।

ইস!

হ্যাঁ। আসর তেমন জমাতে পারি না, উশখুশ করে লোকে, ইদিক উদিক চায়, খুকখুক কাশে, সিকনি ঝাড়ে। না বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন, চোখে দেখি টের পাই।

দু-চারগ্রাস ভাত খায় রাজেন। —মোর হয়ে এয়েছে নাকি কে জানে!

বলোনি ও কথা!

না বললে চলছে কীসে? তিন কুড়ি তো হয়ে এল বয়েস।

শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলছে রাজেন দাস, কী ভয়ানক কথা এটা! জগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে শুনতে চায় এটা কী ব্যাপার, অরণ্য নাকি খুঁজে পাচ্ছে না বাতাস, সাড়া তুলতে পারছে না মর্মরধ্বনির? রাজেন দাসের গানে সাড়া দিচ্ছে না মানুষ? যতই অসম্ভব হোক, কিছুদিন থেকে আসর সত্যই জমাট বাঁধছে না রাজেনের। গোলার হাটে হাজার মানুষ, গঞ্জের মেলার অগুণতি লোক, নন্দী বসুর উৎসবে সদর ঝাঁটিয়ে জড়ো করা ছেলেবুড়ো, মূক হয়ে শুনে গেছে আগাগোড়া, শুধু শুনে গেছে। অভিভূত হয়ে থমথম করে নির্জনতা, আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠেনি, বিনা শর্তে সমবেতভাবে তার হাতে তুলে দেয়নি অশ্রু নিয়ন্ত্রণের শেষ ক্ষমতা। একবার নয়, একদিনের একটি আসরে নয়, এমনই ঘটে আসছে আজকাল।

রাজেন টের পায়। এই করেই তার জীবন কাটল, পাতলা কটা হয়ে এল ঘন কালো চুল, ভাটা ধরল দেহের শক্তিতে। জনতা তার চিরদিনের প্রেয়সী, কাঁধে ঘুরিয়ে উড়ুনি কোমরে বেঁধে কোঁচা ঝুলিয়ে বরবেশে সবার মধ্যে দাঁড়ালেই যে বক্ষলগ্না প্রিয়ার মতো অনুভব করে সমাবেশের হৃৎস্পন্দন, শুনতে পায় মনোরঞ্জনের ফরমাশ, জানতে পারে হাসিকান্নার আবেগ, আবেশ, বিহ্বলতার গভীরতা। কবে গায়নে শুধু একঘেয়ে পচা নোংরামির রস পরিবেশন বন্ধ করেছিল গুরুর সঙ্গে বিদ্রোহ করে, গাইতে শুরু করেছিল পুরাণকথা নিজের মতো লিখে নিয়ে, মাঝে মাঝে তারই মধ্যে স্বদেশিয়ানার বুকনি ঢুকিয়ে দিতে দিতে কবে পুরাণকথা ছেড়ে চলে এসেছিল দেশের কথায়, সব তার স্মৃতিতে জড়িয়ে গেছে। কত রাত কত চোখের কত জলে সে বসুমতী ভিজিয়েছে দেশমায়ের দুঃখের কাহিনি গেয়ে। পুলিশ ধরে জেলে দিয়েছে তাকে জরিমানা করেছে।

কবি জীবন তার সার্থক হয়েছে এই বুড়ো বয়সে, ধন্য হয়েছে চরম রূপে, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের গায়ন করে। প্রথম বন্যা নিয়ে গেয়েছিল গোলার হাটে, ভয়ে ভয়ে। একেবারে চলতি ব্যাপার, তখনও মুছে যায়নি বন্যার চিহ্ন দেশ থেকে বা মানুষের মন থেকে, জের থামেনি সর্বনাশের, একেবারে কাঁচা ঘা জমবে কী গান ? মানুষ তো চটবে না তাদের মারাত্মক দুর্ভাগ্য নিয়ে ছড়া গাঁথার বাহাদুরিতে, কাঁচা ক্ষতে খোঁচা দিয়ে আসর জমানোর চেষ্টার পাগলামিতে ? গান শুরু করার পরেই কোথায় ভেসে গিয়েছিল ভয়ভাবনা, দ্বিধা-সংকোচ, পাগল হয়ে মানুষ শুনেছিল মাঝরাত্রি পার করে, কেঁদেছিল মানুষ শিশু ভেসে যাওয়া মানুষ মায়ের সজল চোখে বাছুর-মরা গাভীর গলায় হাতবুলানোর বর্ণনায়, হেসেছিল মানুষ ভুঁড়িওলা নায়েববাবুর তৃতীয় পক্ষের আদরিণী বউয়ের ধাক্কায় খাট থেকে মেঝের বন্যার জলে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার কল্পনায়, ক্ষোভে নিশ্বাস ফেলেছিল মানুষ সবকারি বিলিফের নির্লজ্জ অব্যবস্থায়। সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে।

গঞ্জের মেলায় প্রথম গেয়েছিল দুর্ভিক্ষ ধরে, বিরাট আসরে, জনসমুদ্রে। মাঠের ধান কোথায় গেল, মানুষের খাবার কে সরাল, অসহায় মানুষ কী ভাবে কেঁদে ককিয়ে উপোস দিয়ে উজার হল, মায়ের বুকে শিশু মল, বাপ মেয়ে বেচল, স্বামী বউ বেচল, সাদা বাজার রাজ্য কেমন ছেয়ে গেল সাদা কঙ্কালে। রাত ভোর করে এনেছে রাজেন দাস, পাঁচ-সাতহাজার মানুষের হৃদয়ে যেন ঝড় বইয়ে নিয়ে গেছে দুঃখের, হতাশার—চোখ শুকনো থাকতে দেয়নি একজনেরও।

তিরিশ বত্রিশ বছরের গায়ন-সাধনার চরম পুরস্কার, পরম সিদ্ধি। বড়ো সে ছিল, সেরা সে ছিল কবির মধ্যে—একমাত্র, অদ্বিতীয় কবি বলে তারপর লোকে মেনে নিল তাকে। আর কেউ নেই, অন্য সবাই তুচ্ছ, প্রসাদ পাবার যোগ্য নয় রাজেন দাসের। সাফল্যের নেশায় নিজেও যেন কেমন মাতাল হয়ে গেল রাজেন। সেরা কবিগায়ক হয়েও দুঃখ তার ঘোচেনি কোনোদিন, অনটন কাটিয়ে স্বচ্ছলতার স্বপ্নই শুধু দেখেছে সে চিরকাল : এমনই অদ্ভুত কল্পনাতীত জনপ্রিয়তার মধ্যেই দারিদ্র্য দূর করার স্বপ্ন। তা জনপ্রিয়তার স্বপ্নটা সফল হল, খেয়াল হল না কিছু টাকা পয়সা করার কথাটা। যে যা দেয় যখন যা পায় তাই নিয়ে খুশি হয়ে আসর মাতিয়ে বেড়াতে লাগল দুর্ভিক্ষের কথায়, চাষির দুঃখে।

এমনি রাজেন দাসের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়েছে একজন। হরিখালির নরহরি। শিষ্য সে হলেও হতে পারত রাজেন দাসের, সবে সে প্রৌঢ় বয়সে পা দিয়েছে, কিন্তু শিষ্য সে নয়। গুরু তার কালিগঞ্জের ভূতনাথকেও বলা যায়, গাংপোতামার ভূষণকে বললেও অন্যায় হবে না, আটৌনার বিভূতির সঙ্গেও নাকি তাকে দেখা গেছে দু-একবছর।

বাপের ঠিক নাই, গুরুর ঠিক থাকে ?

রাজেন বলে দাওয়ায় সমাগত বন্ধু, ভক্ত আর শিষ্যদের। বলে ছড়া কেটে দেয় ছ-আটলাইন বেঠিক বাপের ছেলের কেন বারবার গুরু ধরে গুরু ছাড়ার ব্যারাম হয়, তারই ব্যাখ্যায়। অনায়াসে

গড়গড় করে ছড়া বলে যায় রসালো এবং ঝাঁঝালো, দ্রুততালের সুর আর ছন্দ ঠিক রেখে, শেষ দু লাইন দুলে দুলে রয়ে রয়ে রসায় :

যখনই বলে গুরুকে বাপ
তখনই ভাবে কে মোর বাপ !

গাইছে কিন্তু বেশ, পুরানো ভক্ত শশী বলে বাপঘটিত গুরুমারা রসিকতার রসটা মরে এলে, বেশ একটু তোলপাড় করছে। বড়ো ছেলেটা শুনে এল সেদিন হাটতলার পয়লা বোশেখের সভাটায়—সুতোকলের লোকেরা করেছিল। বলল কী যে, বেশ গাইছে। তেজে গাইছে। জোরদার গান, বলছে নাকি যে ফের মন্বন্তর এলে কেউ মোরো না, কাঁদাকাটা কোরো না, ফ্যান চেয়ো না, কদম কদম বাড়িয়ে গিয়ে যার গুদামে চাল আছে তাকে গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে—

রসকষ নেই, বাজে ! সজনী বলে। তার শীর্ণ মুখে বার্ধ্যক্যের ছাপ পড়বার আগে নেমে এসেছে রোগের মরণের আবির্ভাব ঘোষণার মতো কালিমা। ধুঁকে ধুঁকে সে বলে, আমি শুনে এয়েছি পরশু। সদর থেকে ফিরছি সাঁঝের বেলা, মামলাটার তারিখ ছিল, তা দিনভর টালবাহানা করে শুনানি হল কচু, ফের তারিখ পড়ল সাতাশে, হাকিমগুলো মরে না ? ধলাঘাটে নেমেছি ফেরি ইস্টিমার থেকে সাঁঝ পেরিয়ে, ভাবছি যে তিন কোশ পাড়ি দেব না রাতটা কাটিয়ে দেব মাথা গুঁজে হেথা হোথা যেথা পারি, দেখি যে লোকে লোকারণ্য ঘাটের পাশে গুয়ারবাগান মাঠটা। কী ব্যাপার ? না, নরহরির কবিগান। বাইরে চাঁদ অস্ত যাওয়া তক, চারটে ঢোলক, দুটো ব্যায়লা, একটা বাঁশি, সাগরেদ বুঝি জন আষ্টেক—গাইলে বেশ। তা রসকষ নেই। শুধু ওই এক কথা, যে মরে সে মরে, তার পাত্তা মেলে না, চুপচাপ মরা পাপ ! মোরো না, মারো ! যে মারতে চায় তোমায়, তুমি তাকে মারো !

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সজনী, রোগ যন্ত্রণা দুর্বলতা সব ভুলে যেন গায়ন শুরু করে দিয়েছে। চারিদিক চেয়ে সে লজ্জিত হয়ে থেমে যায়।

গোঁয়ার।—অসন্তুষ্ট রাজেন বলে, গোঁয়ার গোবিন্দ। গায়নের বোঝে ছাই। এ তো বাবু বক্তিমে নয়, হইহই রইরই করে গালগলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে গেলেই হল ! এ রসের ব্যাপার।

তবু ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বুকটা। মনে মনে সে ভালো করেই জানে, দশজনে যা চায় তাই আসল, আর সব মিছে। তার ভালো বোঝা মন্দ বোঝায় কিছু আসে যায় না। চালার জীর্ণ টিনে এক ঝাঁক পাখি উড়ে এসে বসে, নখের আঁচড়ের সঙ্গে কিচির মিচির আওয়াজ তুলে ঘরের বিষণ্ণ আবহাওয়া মুখরিত করার চেষ্টাই যেন শুরু করে দেয়। হঠাৎ উড়ে যায় কোথায়। ঘরে বসে সে কি বুঝে আসেনি শুনতে পায় না অসংখ্য মানুষের অস্ফুট গুঞ্জন, চিরদিন কি সহজে বুঝে আসেনি সে· ভাষা ? কোথা থেকে কী নতুন মানে আসতে পারে তার দেশের লোকের প্রাণের ভাষায় সে যার মানে বুঝতে পারে না ?

কদমপুরে বায়না আছে কাল। রাজেন বলে আচমকা।

কী ধরবে ? আমোদ শুধায় সাগ্রহে।

ভাবছি কী, রাজেন যেন পরামর্শ চায় মেয়ের কাছে, মন্বন্তরের পুরাণ গায়নটা ধরি। টাকা সের চাল হয়েছে, উপোস শুরু হয়েছে, ফের দুর্ভিক্ষ লাগবে বলছে সবাই ! দুটো চারটে কথা অদলবদল করে নিলে লাগসই হবে মনে করি—নাকি ?

আমোদ উৎসাহ বোধ করে। দীপ জ্বেলে টিনের পুরানো বাক্সোটি খোলে। খাতার কাগজে বাক্সোটি ঠাসা। রাজেন দাসের সারা জীবনের গানের ভাণ্ডার—জীর্ণ হয়ে হয়ে ছিঁড়ে গলে যাবার উপক্রম করেছে, কিছু কাগজ পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে।

হাতে তৈরি মোটা হলদে কাগজের খাতায় মন্বন্তরের গানের খসড়া রাজেনের হাতের গোটা গোটা হরফে লেখা। এটা অবলম্বন করে গান চলে, আসরে গাইতে গাইতে আসে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত

কথা, অনেক নতুন মিল নতুন পদ—সেইখানেই বাহাদুরি কবি-গায়কের। আমোদ পড়ে পড়ে শোনায়, মাথা নেড়ে নেড়ে রাজেন শোনে মশগুল হয়ে, তাকে ঘিরে সত্য হয়ে উঠতে থাকে বিরাট জনসমাবেশ, অদলবদল নতুন কথা আর পদযোজনা চলতে থাকে মনের মধ্যে, গত দুর্ভিক্ষের এই মর্মান্তিক রূপ আজকের শ্রোতাদের সামনে ধরার মোট কৌশলটা ঠিক হয়ে যায়। নতুন একটি প্রস্তাবনা জুড়ে দেবে। তাতে থাকবে আবার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ছায়াপাতের কথা। তারপর এ গানে যা কিছু ঘটেছে বলে বর্ণনা আছে সে সব ঘটবে বলে সামনে ধরা। লাখ মানুষ কীভাবে মরছে সে বর্ণনা আছে এ গানে, তাকে বদল করে লাখ মানুষ কীভাবে মরতে যাচ্ছে সেই বর্ণনায় পরিণত করা। হৃদয় মুচড়ে যাবে মানুষের। আসর কাঁদবে !

চোখ জ্বলজ্বল করে রাজেনের, উৎসাহে সে সিধে হয়ে বসে।

আসর কিন্তু কাঁদে না। মন দিয়ে শোনে। শুধু শোনে।

রাজেনের নামে পাঁচ ক্রোশ দূরের গাঁ থেকে লোকে এসেছে কবিগান শুনতে, কদমপুরের হাইস্কুলের লাগাও মাঠ ভরে গিয়েছে। এখনও গলার যে জোর আছে রাজেনের, আসরের শেষ প্রান্তের লোকটিও শুনতে পাচ্ছে তার প্রতিটি কথা। শোনার যে অসীম আগ্রহ নিয়ে মানুষ আসে তা যেন আশীর্বাদের মতো, গোড়াতে অল্পেই জমে যায় আসর—নিজের আগ্রহ আর প্রত্যাশা দিয়েই নিজেদের মুগ্ধ করে ফেলে শ্রোতারা। প্রথমে জমজমাট হয়ে উঠেছিল অসহায় মানুষেব নিরুপায় মরণের সকরুণ ভূমিকা আর মানুষরূপী দানবের খেলার ছলে সেই মাবণযজ্ঞ আরম্ভের বর্ণনা, সুরে ও কথার বাঁধুনিতে আরও মুগ্ধ করেছিল সমবেত হৃদয়মন, সভা গমগম করছিল ঔৎসুক্যে, নড়ে চড়ে ভালো করে জেঁকে বসেছিল সবাই। খুশি হয়েছিল রাজেন, পুরোমাত্রায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল, এ তার চেনা লক্ষণ। আসরকে সে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এখন খুশিমতো হাসাতে কাঁদাতে যা খুশি করতে পারে। সভার এই ঘন দানাবাঁধা ঔৎসুক্য আরও নিবিড়ভাবে এ রস পাবার জন্য, যার স্বাদ সে দিয়েছে।

কিন্তু কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায় হিসাবনিকাশ, ধীরে ধীরে বিগড়ে যেতে থাকে সভার মতিগতি। অস্থিরতা বাড়ে, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে মানুষ, যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে রাজেনের মর্মান্তিক বর্ণনা। আধবুড়ো একজন উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ, মুখে তার খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, বিস্ফারিত চোখ, সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে সে বলে, রাজেন দাস ! বলি ও রাজেন দাস ! তা তো বুঝলাম, সর্বনাশ তো হচ্ছে, কী করি তার উপায় বলো ! বাঁচি কীসে বাতলে দাও !

এ এক হিসাবে জয় রাজেনের তার শক্তির পরিচয়। কিন্তু এ তো চায়নি রাজেন দাস। মানুষকে আবেগে পাগল করার শক্তি তার চিরদিনই আছে—অন্য কবিওয়ালারও কমবেশি আছে। তাতেই তো রাজেন দাসের আসল সার্থকতা নয়। আবেগে পাগল হবে, হৃদয়মন ভরেও যাবে, তবে না যথার্থ আসর জমল। এ আসরের তৃপ্তি নেই যা চায় তা পায়নি আসরের লোক, তাদের প্রাণ ভরেনি। আরও কিছু চায় তারা রাজেন দাসের কাছে। কী চায় ?

হইচই ওঠে চারিদিকে। কেউ বলে হাঁ হাঁ, কেউ বলে, বসে পড়ো, বসে পড়ো। ধীরে ধীরে যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে এদিক ওদিক তাকায় লোকটি, তারপর বসে পড়ে। রাজেনের মনে পড়ে তার ঘরের দাওয়ায় পুরানো ভক্ত শশীর ব্যবহারের কথা। নরহরির গায়নের কথা বলতে সেও এমনই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যেন চেতন ফেরায় এদিক ওদিক চাইতে চাইতে লজ্জা পেয়ে এমনই ভাবে বসে পড়েছিল।

আসর আর তেমন জমে না। যে জমাবে আসর প্রাণের ছোঁয়াচ দিয়ে তার প্রাণেই উদ্‌বেগের আলোড়ন।

সকালে ম্লান মুখে বাড়ি ফেরে রাজেন, জ্বরের রোগীর মতো চেহারা করে। একরাত্রে পায়ের তলা থেকে তার যেন মাটি সরে গেছে। অসম্মান করেনি কেউ, তার কবিত্ব শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েই আছে চারিদিক, আবার তায় গায়ন থাকলে এমনই দূর থেকে লোক এসে ভিড় করবে আসরে, তবু বিস্বাদ হয়ে গেছে জীবন রাজেনের। চরম পরাজয়ে হিম হয়ে গেছে বুক !

ভেবো না বাবা, মনে কষ্ট কোরো না। নতুন গান বাঁধ।

কী গান বাঁধব ?

নরহরিটরি পারে তোমার সাথে ? অন্যভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আমোদ, ভারী খ্যেমতা ! করুক যত পারে শত্তুরতা, নিন্দে করে বেড়াক। তোমার কাছে কলকে পেতে দেরি আছে। নতুন গান বাঁধো—

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচড়ে ওঠে রাজেন, নতুন গান বাঁধো ! নতুন গান বাঁধো ! এ তোর ভাত বেনুন রাঁধা কিনা, বাধলেই হল। ভেতর থেকে গান না এলে বাঁধব কী ?

বোবা বউ বিছানা নিয়েছে ক-বছর, মেয়ে ছাড়া গায়ের ঝাল ঝাড়বার আর কেউ নেই। সেই কবে অতল দয়ার রূপে প্রেম এসেছিল কবির খেয়ালে, নটবরের বোবা মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল রাজেন, দুটি ছেলে দুটি মেয়ের সংসার। বড়ো ছেলে কিছু লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে বিদেশে, খবর করে না। আরেক ছেলে গোল্লায় গেছে। এক মেয়ে গঞ্জনা খেয়ে মরছে শ্বশুরবাড়ি। এমন দেশজোড়া নাম তার কবি বাপের, সে তুলনায় অনেক প্রত্যাশা করে কিছুই তারা পেল না। আরেক মেয়ে ঘাড়ে ঝুলছে। দু বিঘে জমিজমা হল না, দুটো পয়সা জমল না, পুরানো জীর্ণ রয়ে গেল ঘরবাড়ি। কী হল ? কী হল রাজেন দাসের জীবনে ? কিছুই সে করতে পারল না কোনোদিকে।

তেমন জমেনি শুনলাম মদনপুরে ? শশী বলে আপশোশ জানিয়ে। শুনে বুক পুড়ে যায় রাজেনের।

বয়স তো হল।—আপশোশ জানিয়ে বলে সজনী।

রাজেন উঠে যায়।

সেদিন খবর আসে, গোলার হাটে নরহরির গান। কদিন ছটফট করছিল রাজেন, খবর শুনে গুম খেয়ে যায়। গানের খসড়ার টিনের তোরঙ্গটি খুলে চুপচাপ বসে থাকে বেলা দুপুর তক। তারপর হঠাৎ উঠে তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে নেয়, ফোকলা মুখে পান চিবুতে চিবুতে জামা গায়ে দিয়ে পায়ে আঁটতে থাকে ক্যাম্বিসের জুতো।

বোবা বউ হাতের ইশারায় কাছে ডাকে, ইশারায় কী যেন বলে।

আচমকা হাসি ভাঙে রাজেনের মুখে।

আনব গো আনব। তোমার তামাক পাতা আনব।

যাচ্ছ কোথা ? আমোদ শুধায়।

যাচ্ছি কোথা ? নরহরির গান শুনতে যাচ্ছি।

তুমি যেচে যাচ্ছ ওর আসরে !

শুনে আসি। দেখে আসি।

নরহরির আসরে আচমকা রাজেনের আবির্ভাব সত্যিই অঘটন, চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। সাধারণ একজন শ্রোতার মতোই দশজনের মধ্যে বসে পড়তে যাচ্ছিল, কর্তা ব্যক্তি কজন এগিয়ে এসে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে সম্মানের স্থানে বসিয়ে দিল। একজন তখন হারমনিয়মে সাধারণ গান ধরেছে।

নরহরি মাটি পর্যন্ত মাথা নামিয়ে ভূতপূর্ব গুরুকে প্রণাম জানায়, কিন্তু কাছে আসে না, কথা বলে না। গুরুশিষ্য সম্পর্ক হলেও তারা প্রতিদ্বন্দ্বী। আসরে আসরে তারা পরস্পরের নামে টিটকারি

দেয়, পরস্পরকে ছোটো করে। তবে গুরু গুরুই, গাল দিতে হলেও তাকে প্রণাম জানিয়েই গাল দিতে হবে !

গানের শুরুতে নরহরি প্রণাম জানাল ছড়ায়—

হাতে ধরে গান শেখালে,
গুরু তুমি বাপ,
গুরুমারা বিদ্যা দেখে
দিয়ো না অভিশাপ !
দুটি পায়ে প্রণাম জানাই,
যে গুরু সে বাপ।

কবিগানের মন্থরগতি, ধীরে ধীরে নানা আঁকাবাঁকা পথে নানা বিপথে নানা বাহুল্য বৈচিত্র্য সংগ্রহ করতে করতে এগিয়ে চলে, আস্তে আস্তে আসর জমে। নরহরি প্রথমে আরম্ভ করে দুর্দিন ঘনিয়ে আসার গান—মনে মনে রাজেন বলে, চোর ! গুরুমারা বিদ্যাই শিখেছ বটে তুমি ! দুঃখের দিনের ছবি ভয়াবহ হয়ে উঠতে না উঠতে পাশ কাটিয়ে নরহরি গায় : কোমর বাঁধো ভাই !

একটু থতোমতো খেয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে রাজেন।

করুণ হয়ে ওঠে নরহরির মরণের গান, হৃদয়ে মোচড় দেয় তার রসালো, ঝাঁঝালো পদগুলি, কিন্তু চোখে জল আনে না, কাঁদায় না। অসহায় হতাশায় ফেটে যাবার উপক্রম করে না বুক। ক্রোধে, ক্ষোভে তপ্ত হয়ে ওঠে নিশ্বাস, হাতগুলি যেন এগিয়ে যেতে চায় নরহরির ডাকেই সায় দিয়ে শিশুখেকো মেয়েখেকো মানুষখেকো রাক্ষসগুলির টুঁটি ধরে টেনে এনে ফাঁসি লটকে দিতে--

ছাড়ো মিছে আশ
রাজার সেপাই দেয় কীরে ভাই
(মুখে) তুলে ভাতের গ্রাস

বারংবার উন্মাদনা ফেটে পড়ে সভায়। মুখ টানটান। চোখে চোখে আগুনের ঝিলিক।

সহকারীকে সুর ধরিয়ে দম নিতে বসতে যাবে নরহরি, রাজেন তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে। বলে, নরহরি তুই মোর গুরু ! তোকে প্রণাম করি ! তুই মোর গুরু !

হাত বাড়িয়ে সে পা ছুঁতে যায় নরহরির। নরহরি ঠেকিয়ে রাখে। ওরে বাপ রে, অপরাধ হবে, পা ছুঁয়ো না বাপ। মরে যাব !

তবে বল মোর মেয়াকে লিবি ! তোকে ছাড়া আর কারও হাতে মেয়া দেব না !

দু আঙুল কানে ঢুকিয়ে নরহরি বলে, বোলো না বাপ। শুনতে নাই তোমার মেয়া আমার বুন !

নব আলপনা

শ্রীমতী ছিপছিপে কিন্তু কী সুকোমল। রোগা থেকেছে তবু চর্বি জমিয়েছে। দেহচর্চার বিশেষ প্রতিভায় এটা সম্ভব। খাদ্য কন্ট্রোলের বিশেষ কায়দায় না মুটিয়েও মেদবহুলতায় স্নিগ্ধ লাবণ্য ধরে রাখা যায়। কাজটা, কঠিন সাধনাসাপেক্ষ হলেও, থিয়োরিটা সোজা। যে মোটায় তার শরীরে শুধু চর্বিই গাদা হয় না, হাড়মাংসও বাড়ে। সুতরাং হাড় সরু রেখে মাংস কম বাড়িয়ে কিঞ্চিৎ চর্বির সমাবেশ ঘটিয়ে একটা সামঞ্জস্য সাধন করতে পারলে রোগা ছিপছিপে থেকেও সিঁটিকে যাবার দরকার হয় না, শুকনো দেখাবার কারণ ঘটে না, স্নিগ্ধ মোলায়েম লাবণ্য বজায় থাকে।

তবে, ঠিকমতো খাদ্য চাই, বাছাবাছা বিশেষ খাদ্য, যা সময়মতো পরিমাণমতো খেলে হাড় মাস চর্বি কোনোটাই যে প্রায় শুধু বাড়বে না তা নয়, কমবেও না এবং তিনেরই পরিমাণগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন থাকবে। নইলে রোগা হবে, কর্কশ দেখাবে। অথবা ঠাম হারাবে।

যেমন চুণো আর শ্রীমতীর মেজোবউদি। চলতে ফিরতে ললিতার সর্বাঙ্গে লাবণ্য দোল খায় আর সেই গর্বে যে টৈ পড়া ওর চলনে মেয়ে মাত্রের গা জ্বলে। শ্রীমতীর মেজদাও নির্লজ্জের মতো ওকে নিয়ে আত্মহারা !

চুণো পাড়ার বস্তির মেয়ে। হ্যাঁ, শ্রীমতীদের পাড়াতেও বস্তি আছে। চুণো রোগা, ক্যাংটা। নিছক খেতে না পেয়ে রোগা, ইচ্ছে করে কম খেয়ে নয়। তাই দেহের গঠনের লাইন যদিও তার অদ্ভুত, শ্রীমতীর লাইনগুলিকেও হার মানাতে পারে, ধুলোমাখা ছিবড়ের মলিন বস্তির দারিদ্র্যজাত রুক্ষতা সব নষ্ট করে দিয়েছে !

শ্রীমতী ভাবে, লাবণ্য দিয়ে ও মেয়েটা করবে কী, কী কাজে লাগবে !

চুণোর স্বপ্ন অদ্ভুত, এলোমেলো কিন্তু জমজমাট—ভিড়ের মতো জমজমাট, রাস্তার ভিড়, পূজা মণ্ডপের ভিড়, মহরমের ভিড়, মেলার ভিড়, শোভাযাত্রার ভিড়। চলে ফেরে জমাট বাঁধে তবু তারই মধ্যে উলটে-পালটে ভাঙে ও গড়ে ইতস্তত সঞ্চালিত হয়। গোবর মাটিতে নিকানো মেঝে শুকিয়ে শুকিয়ে এসে যখন ছোটো বড়ো অনেক ভাগ হয়ে যায় শুকনো ভিজে মেটে রঙের ছোপে, ন্যাতার টানে আঁকা রেখাগুলির সাথে যেন তৈরি হয় ক-টি সাদামাটা ছবি, কুঞ্জর ঝাঁকড়া চুলের নীচে চিবুকটা ব্যাতালো হয়ে মনে হয় যেন চোখ টিপে তাকে তামাশা করে ভ্যাংচাচ্ছে—মজা লাগতে লাগতে চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ঘিরে ধরে আসে অসংখ্য অসম্পূর্ণ মূর্তি। কুমোরবাড়ির পোড়ানো মাটির পুতুলে আসল মানুষ দেখার অভ্যাস চুণোর। মূর্তি প্রতিমূর্তি ছাড়া সে স্বপ্ন ভাবতে পারে না।

বাজারের বড়ো মোড়টার পাশে কয়লার টুকরি সাজিয়ে বস্তির মেয়েরা বসে থাকে। চুণো গিরির পাশে তার গা ঘেঁষে বসে। উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে চশমা পরা বেঁটে বাবুটা কখন এসে দাম না শুধিয়েই থলে বাড়িয়ে বলবে, চার ঝুড়িই ঢেলে দে। আজ কত নিবি ?

দু-চারআনা বেশি দিয়েই চলে যায়। লোকটা একনম্বর বোকা আর একনম্বর বজ্জাত। চুণো জানে, বস্তির কোনো মেয়ের কাছেই এদের চালচলন অজানা থাকে না। মনটা তার ভিজিয়ে রাখছে, দরকার মতো ইশারা করবে। মনে মনে লোকটা ভাবছে সে কত যে ভালো ভাববে বাবুকে, গলে জল হয়ে থাকবে বঁড়শি ছাড়া আলগা টোপ গিলে গিলেই।

চড়া দাম হয়েছে কয়লার টুকরির, ভারী চড়া। আট-নআনা টুকরি— ওপরের টুকরিতে দুটি কয়লা বেশি আছে, এক টুকরি যে কিনবে তার ওটা মিলবে না। তলার কম কয়লায় টুকরি একটা নিতে হবে। অনেকেই কয়লা কিনতে চায়, দর শুধিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হতাশভাবে, চলে যেতে পারে না শুধু এই জন্য যে ঘরে এক টুকরো কয়লা নেই, আজ যদি বা চলে যায় কোনোরকমে, কাল ভোরে আঁচ পড়বে না উনানে, ভাত চড়বে না।

কিনতেও পারে না, চলে যেতেও পারে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসাব করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই দুমুখো সমস্যার হিসাব—আট আনার কয়লায় যে দুবেলার বেশি তিনবেলা চলবে না অথচ এদিকে আবার, কয়লা ছাড়া যে ভাত সিদ্ধ হবে না, কয়লা না কিনলে আটআনা দিয়েই ! মীমাংসা কী ?

আড়তদার নন্দীবাবু বলেছে : লেবে লেবে, আটআনা কি বারোআনা দিয়ে লেবে ! শহরে কয়লা নেই। গলিতে ঢুকে বাঁয়ে দরজা-বন্ধ আড়ত। পিছনের খিড়কি দিয়ে খুঁজি পথে টুকরি ভরে আনে তারা, উঠানে বসে কয়লার বড়ো চাপ ভেঙে টুকরো করে। খুঁজি পথে তাদের আনাগোনা দেখা যায়, বাবুরা দ্যাখে, পুলিশ দ্যাখে, সবাই দ্যাখে !

সামনে টুকরি সাজিয়ে, ক্রেতা যে আসছে খেয়াল রেখে চুণো স্বপ্ন দ্যাখে সামনের ওই খাবারের দোকান, দুটো দোকান বাদে মুড়িমুড়কি গুড় বাতাসার দোকান, পাশ দিয়ে বস্তিতে ঢোকার গলি। ঘিঞ্জি করা ঘরগুলির মধ্যে তাদের একখানি ঘর, আবছা আঁধারে চুণো একলাটি বসে। তার মা গেছে ঝিয়ের কাজে, ভাই গেছে কারখানায়। কুঞ্জ যদি আসে কাগজের ঠোঙায় তেলেভাজা চপ আর পাঁপর নিয়ে, নোনতা রুটি বিস্কুট নিয়ে। ঘরে ঘরে গাদা মানুষ, দাওযায় উঠানে বসে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ কিন্তু না, কুঞ্জকে কেউ দ্যাখেনি। সবার চোখের সামনে দিয়ে কুঞ্জ ঘরে ঢুকল তবু কেউ দ্যাখেনি, দেখেছে তবু দ্যাখেনি, কী যেন অবাক রকম ম্যাজিক। একহাতে ঠোঙাটা তুলে দিতে দিতে আরেক হাতে যদি কুঞ্জ ধরে তাকে, সে যদি বলে, থামো, আগে খেয়ে নিই, বড্ড আমার খিদে, ঘর আর দাওয়ায় মানুষ যদি ভান করে যে কেউ আসেনি চুণোর ঘরে, শুধু কুঞ্জ এসেছে খাবার নিয়ে, আহা মেয়েটা খাবার খাক কুঞ্জের দেওয়া খাবার খাক, ভালো মানুষ যদি হয়ে যায় সবাই গিরির মা, নকুড়ের বউ, আন্দি, মালতী, সতীশ, ভূষণেরা, চুণোর খিদে পেয়েছে বলে মমতায় চোখ মুখ কান বন্ধ রাখে --

না, চুণোর স্বপ্ন দেখা হয় না সব ভিড় হয়ে যায়। কোথায় যায় কুঞ্জ আর তার খাবারের ঠোঙা, ফাঁকা ঘরের নিরালা অবসর, চেঁচামেচি বকাবকি মারপিট শুরু হয়ে যায় তার জাগ্রত স্বপ্নে—সারা শরীরটা মেলে ধরে সবার চোখের সামনে স্নান পর্যন্ত যাকে করতে হয়, কথা ঠেলাঠেলি ঝগড়া করে সে ভাববে কী করে নিভৃত অন্তরালের কথা ! যা নিরাপদ, দু দণ্ড টেকসই !

মিথ্যা স্বপ্ন ভেঙে যায়, শুরু হয় চুণোর আসল স্বপ্ন। ওই হাটবাজার শাসন গালাগালি হট্টগোল জড়ানো কল্পনাই যেন তার জমে, নিত্যকার ঘটনাই যাত্রা থিয়েটারের মতো রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। কুঞ্জ এসেছে বইকী তার কাছে, মস্ত এক ঠোঙা খাবার নিয়েই এসেছে। সকলে দেখেছে, জেনেছে—হইচই করে উঠেছে। কী এসে যায় তাতে ? কুঞ্জর গায়ে জোর নেই ! কুঞ্জ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে। কুঞ্জ দাঁতে দাঁত ঘষছে রাগে, ভাইকে ঠেলে দিয়েছে উঠোনের নর্দমায়, এক ধাক্কায় হটিয়ে দিয়েছে মাকে। চকচকে ছোরা বার করে কুঞ্জ বলছে, আয় শালা, আয় শালি, কে আছিস আয় !

চুণো হাত ধরেছে কুঞ্জর। চকচকে ছোরা-ধরা হাতটা ধরে সামলাবার চেষ্টা করছে কুঞ্জকে !

উঃ ! যদি হত !

চশমা-পরা বেঁটে বাবুটি মন্থর পদে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।

কীরে, কয়লা দিবি নাকি ?

নে যাও।

আজ থলি আনতে ভুলে গেলাম। এক কাজ করবি, পৌঁছে দিয়ে আসবি ? কাছেই বাড়ি, বেশি দূর নয়। চুণো নির্বোধের মতো চেয়ে থাকে। মনে মনে বলে, বাড়ির মানুষ বুঝি তোমার কোথাও গেছে আজ, খালি বাড়ি পড়ে আছে।

পয়সা বেশি নিস না হয় ! কিন্তু চুণো তো উঠতে পারবে না আজ এখান থেকে। আরেক দিন দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে আসবে, আজ নয়।

একটা ছেঁড়া বস্তায় বেঁধে দি ?

থাক, আজ কয়লা নেব না।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা।

নটুক যখন গাড়ি চাপা পড়ল সরকারি রেশন শপের সামনে গুরুভার গাড়িটা তরুণ বটগাছটার তলায় শিবলিঙ্গ ভেঙে ছিটকে ফেলে দুশো গজ দূরে সামনে মানুষের বাধা পেয়ে বাঁয়ে মসজিদের রেলিং ভেঙে থামল। ভিড় বলা যায় না মানুষের বাধাকে, পঁচিশ-ত্রিশজনের বেশি ছিল না।

তাকেই দুর্ভেদ্য বলে মেনে না নিলে অনায়াসে বাধা ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে যেতে পারত গাড়িটা। পরে কী হত সে পরের কথা। তবে স্টিয়ারিং ছিল কালো আব্বাসের হাতে, মার্কিন সোলজারটার হাতে ছিল স্টেনগান। আব্বাস কালো মানুষের দেয়াল ভেদ করে ট্রাক চালাতে শেখেনি। জনতা আগুন দেয় গাড়িতে, ধরে নামায় ইউনিফর্ম পরা ঢ্যাঙা সাদা মার্কিনি সৈনিক আর উর্দিপরা আব্বাসকে।

আব্বাস খাঁ নীরবে বিনা প্রতিবাদে নিজেকে জনতার হাতে সঁপে দেয়, চোখের পলকে মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ছোট্ট জনতার পায়ের নীচে আর অন্যজন উগ্র মার্কিনি স্ল্যাং আউড়ে ভড়কে দেবার চেষ্টা করে ভীরু নেটিভগুলোকে। বড়ো একটা কয়লার চাপ এসে লেগে মাথাটা একটু ছেঁচে দেয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে (তেতলা ও একতলা মোটা ভারী ভাড়ায় আজকালের মধ্যে বেদখল হয়েছে শ্রীমতীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও) শ্রীমতী এ দৃশ্য দ্যাখে, ঘটনার প্রায় গা-ঘেঁষা ডাইনের গলিপথটায় কণ্ঠায় বসানো ডাস্টবিনের ধারে হোটেলখানার ছাইগাদা ঘেঁটে ঘেঁটে পোড়া কয়লা খোঁজা বন্ধ রেখে চুণো দ্যাখে সোজা চোখের সামনে।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপে শ্রীমতী, কোমল হাতের তালুতে, রেলিংটা আগুনের মতো গরম লাগে এত জোরে সে আঁকড়ে ধরে রেলিংটা। চুণো শুধু চেয়ে থাকে বিস্ফারিত চোখে।

হোটেলখানায় সাজানো শিককাবাব, পাশে রুটির স্তূপ, একটা ছোকরা পেঁয়াজ কেটে কুচো করে জমিয়েছে মাটিতে, মাংসের গরম ডেকচি থেকে উঠছে সাদা বাষ্প। হইচই হাঙ্গামা শুরু হয়েছে, খাবলা মারা যায় না মাংস রুটিতে ?

নটুক চুণোর ভাই। মায়ের পেটের ভাই, তবে এক বাপের ব্যাটা কিনা তা নিয়ে ঘোঁট আছে বস্তিতে। নটুক ফরসা, প্রায় মেমের বাচ্চার মতো সাদা। আঁতুরে তাকে প্রথম কাঁদন কাঁদাতে গিয়ে চুণোর পিসি এক আছাড়ে একটা পা তার ভেঙে দিয়েছিল। আরেক আছাড়ে কী হত কে জানে। বিয়োনোর ব্যথা-বেদনা ভুলে নটুকের মা সেঁক-তাপের আগুনের মালসাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল পিসির গায়ে।

জন্ম-কাঁদনের আছাড়ে খোঁড়া না হলে হয়তো আজ গাড়ি চাপা পড়ত না নটুক।

চুণো বড়ো ভালোবেসেছিল ভাইটাকে। রাঙা সুন্দর ভাই, তাতে খোঁড়া অসহায়। চাপা যে পড়েছে সে তারই ভাই চুণো এটা টের পেতে পেতে মিলিটারি এসে গেছে। একদল মার্কিন সৈন্য,

দীর্ঘ উদ্ধত, তকতকে পোশাক, চকচকে বুট, বেঁটে বেঁটে বন্দুক। সঙ্গে আরেক লরি গুর্খা। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই, দুয়ারে দুয়ারে আগল পড়েছিল, রাস্তাও সাফ হয়ে যাচ্ছিল মিলিটারি আবির্ভাবের পর দেখতে দেখতে—সামরিক শক্তির প্রতি, বজ্রধারীদের প্রতি নিরস্ত্র ক্ষুব্ধ মানুষের কত বড়ো সম্মান দেখানো ! শিবমন্দির চূর্ণ করা, মসজিদেব দেযাল ভাঙা কেউ ধরেনি, অকারণে একটা জীবননাশের বিনিময়ে শুধু অজ্ঞান করেছে হত্যাকারীকে আব পুড়িয়েছে একটা গাড়ি—তাদেবই দেশের সম্পত্তি। শুধু এইটুকু, সামান্য বচসায় হাতাহাতি থেকে ঘবে আগুন লাগে, তার তুলনায় কত সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার। তবু সকলে তাদের পথ ছেড়ে চলাফেরার অধিকার খর্ব কবে স্বেচ্ছায় মিলিটারিকে সম্মান দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতেই চেষ্টা করেছে। কেন যে এই অনুকূল সংবর্ধনা, এই প্রত্যক্ষ সক্রিয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে মন ওঠে না সৈন্যের ! পলায়নপরদের নিয়েই তাণ্ডব সৃষ্টি না কবে, ফটফট গুলি ছুড়ে কয়েকজনকে ছিটকে ছিটকে রাস্তায না শুইয়ে দিয়ে, দোকানে বাড়িতে দবজা ভেঙে ঢুকে লন্ডভন্ড না করে, যাকে সামনে পায় তাকেই আথালিপাথালি না মেরে সাধ মেটে না ! ওরা কী জানে যে ওই সম্মান দেখানো টিটকারি, পালানোটা ব্যঙ্গ ? জানে কি যে রাইফেল স্টেনগানধাবী তাদের মর্যাদাই যদি এরা জানত, সম্মানবোধ থাকত, ট্রাক বোঝাই হয়ে তারা আসবে জেনেও তা হলে কখনও ট্রাক পুড়িয়ে দিত না। এতদিনেও কি নিবস্ত্র জনতাব চালচলন আচাব ব্যবহারের মানে স্পষ্ট হতে বাকি আছে ! ছত্রভঙ্গ হয়ে সবাব ছুটে পালানো তাদের ভয়ে নয, যাদের হাত খালি তাদের মধ্যে যে উৎকট তামাশা বোধ আছে, হাস্যকর বীভৎসতা আছে, অস্ত্রধারী তাদেবই শোচনীয ভীরুতা আর আতঙ্কের প্রমাণ আছে, সেটা স্পষ্ট কবে তোলাব জন্যই জনতা পালায়। পাগলা কুকুব, খ্যাপা হাতি দেখেও এমনই পালানোর ব্যঙ্গই তারা করে।

তা, এটা চুণোও জানে বোঝে !

বীরপুবুষরা এয়েছে,—রুক্ষ এলোচুল মাথায খোপার মতো প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে চেয়ে চুণো মুখ বাঁকিয়ে বলে, মরদরা এয়েছে ! মরে না ব্যাটারা !

বস্তির হিজিবিজি গলিঘুজি দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে সে এগিয়ে যায় অন্য মোড়েব দিকে, যেখানে রাস্তায় পড়ে আছে নটুকের রক্তাক্ত ছ্যাঁচা দেহটা, মলিন পিচে রক্তেব দাগ, ছিটকানো রক্তের ফোঁট ফোঁট চিহ্ন। আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখতে হয় চুণোকে। খাঁ খাঁ করছে রাতের শ্মশানের মতো মেঘলা সকালের রাজপথ। ভাঙা শিবলিঙ্গের বটগাছটার তলে শুধু কয়েকজন সৈন্য পরামর্শ কবছে। লোহালক্কড়ের দোকান বুঝি বন্ধ কবার সময় পায়নি, তারপর বুঝি আর বন্ধ করতেও দেয়নি, তক্তপোশটা দোকানের সামনের দিকে টেনে এনে তারা বসল।

টিপিটিপি বিষ্টি নেমেছে।

বাড়ি যা, অন্ধকার ঘবে সন্তর্পণে কানে কানে কুঞ্জ বলে চুণোকে, এরপর যেতে পারবি নে।

চুণো মাথা নাড়ে, কথা কয় না। মোড়ের মাথায় কুঞ্জর শুখো এবং বিড়িপাতা বেচার ছোটো ঘর, সামনের কপাট বলতে টিনের ঝোলানো ঝাঁপ, ভেতর থেকে টেনে টুনে বন্ধ করেছে। টিনে ফাঁক আছে ছোটো ছোটো তার একটাতে একটা মোটে চোখ রেখে রাস্তায় শোয়া নটুককে দেখা যায়। পাশের এই ঘুপচি জানালাটার পাট একটু ফাঁক করে তাকালে দুচোখেই পড়ে নটুককে, আরও স্পষ্টভাবে। যদিও তাকাতে হয় চোখ একটু বাঁকিয়ে।

কুঞ্জ ভাবে বন্ধ দোকানের জানালা দিয়ে কেউ চুপিচুপি উঁকি মারছে এটা যদি নজরে পড়ে যায় ফাঁকা রাস্তা আর নটুকের দেহটার পাহারায় রত ওদের। যদি দোকান ভেঙে বা পাশের খিড়কির দুয়াব ভেঙে ভেতরে আসে চুণো আর অন্য যে মেয়েছেলে আছে বাড়িটার বসবাসের অংশটাতে তাদের গন্ধ পেয়ে ! কুত্তার মতো ওদের নাক, বাতাসে গন্ধ খোঁজে লুটের যোগ্য মেয়েছেলের।

পিঠে হাত রাখে চুণোর, বলে, কী করবি ? বন্ধ করে দে জানলা। ঘর যা বরং।

চুণো আবার মাথা নাড়ে। তার রুক্ষ চুল আলগা বাঁধন খুলে এলিয়ে পড়েছে।

ঘরের আবছা আঁধারেও টের পাওয়া যায় চোখে তার জল নেই, জানালার ফাঁকটুকু দিয়ে যে আলো আসছে, মেঘলা সকালের ম্লান আলো, তাতে জ্বলজ্বল করছে তার দুটি চোখ।

এ ভারী অন্যায় ! ছি !—শ্রীমতী ক্রুদ্ধ স্বরে প্রতিবাদ ঘোষণা করে, মিশনের সঙ্গে বৈঠক চলছে ওদিকে, এদিকে এমন সব কাণ্ড, এমন অত্যাচার !

তারপর সে বলে, যাক গে, মিলিটারি এসে গেছে, এবার যাওয়া যাবে, চল যাই।

সে আর তার সঙ্গীকে নিয়ে মোটরটা যখন সামনে দিয়ে যায়, এক মুহূর্তের জন্য নটুকের দেহটা আড়াল হয়ে যায় চুণোর চোখ থেকে।

ইস ! শ্রীমতী তার সঙ্গীকে বলে নটুককে এক পলক দেখে।

ব্রিজ

শ্রাবণের শেষ বেলা।

যে ট্রেনটি ধীরে ধীরে হাওড়া স্টেশনে ঢুকে থেমে দাঁড়িয়ে সশব্দে বুদ্ধবাষ্প ত্যাগ করল, তার আগমন ভারতের অপর প্রান্ত থেকে। তেরোশো মাইলের বেশি পাড়ি দিয়েছে ঘর্মাক্ত উলঙ্গ কালা মানুষের হাতে পাতা লোহার লাইনে চাকা গড়িয়ে।

দশ ঘণ্টার বেশি লেট। এ রকম হচ্ছে ছেচল্লিশের অব্যবস্থা, অরাজকতায়। এ ট্রেনটির এত বেশি লেট হবার বিশেষ কারণ ছিল। মাঝপথে মধ্যভারতের বিখ্যাত এক শিল্পকেন্দ্র শহরের স্টেশনে গাড়িটা অনেকক্ষণ আটকে ছিল।

সে এক কাণ্ড বটে।

শহরে সাদা সৈন্য লাগিয়ে কুলি বিদ্রোহ দমনের হাঙ্গামা চলছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কিছু কিছু শুরু হয়েছিল এই সঙ্গে। শহরের প্রান্ত-ঘেঁষা স্টেশন, হাঙ্গামার এলাকা থেকে টাঙাতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ। স্টেশনে গোলমাল ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল ডজন খানেক বিদেশি সৈনিক, নিরিবিলি কিঞ্চিৎ মদ্যপান করছিল—স্ত্রীলোক ছাড়াই। আশেপাশে কাছাকাছি সাধারণ লোক, রেলকর্মচারী আর কুলিমজুরের সপরিবারে বসবাস, রেলওয়ে কোয়ার্টারে, ভাড়াটে বাড়িতে, বস্তিতে। সুতরাং স্ত্রীলোক কম ছিল না চারিদিকে, রুজিরোজগারিদের মা বউ মেয়ে বোন। বিদেশি সাদা সৈনিক, এ দেশে মহাপুরুষাধিক। যুদ্ধের সময় রুটির টুকরো দিয়ে তারা দেশি মেয়ে কিনেছে চিরদুর্ভিক্ষের দেশে, তাদের জন্য গোরুছাগল হাঁসমুরগি রসদ সরবরাহের মতো গড়ে উঠেছে উপোসি উচ্ছন্ন গাঁয়ের মেয়ে বউ সরবরাহের ব্যাবসা। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক, তাদের দাবি তাদেব অধিকারের জের তারা টেনে চলতে চায় সমানে। তারা খাবে নিরামিষ মদ আর শত শত উপভোগ্যা স্ত্রী জাতীয়া জীব আশেপাশে কালা বাপ ভাই স্বামীর আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবে—এ অসহ্য অন্যায়, নিদারুণ অসঙ্গতি।

অতএব তারা স্ত্রীলোক চেয়েছিল। বেশি নয়, দু-চারজন। একজন হলেও তাদের দশ-বারো জনের চলে যায়—যুদ্ধের সময় অমন অনেকবার তারা চালিয়ে নিয়েছে। তাদের ট্রেইনিং আছে, মত্ত অবস্থাতেও কিউ দেওয়ার নিয়ম মেনে নিজের পালার জন্য ধৈর্য করে অপেক্ষা করতে পারে। দুঃখেব বিষয় মেয়েটা হয়তো মরে যায়। তা দেহ যতক্ষণ পচে গলে না যায়, উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তা দেহই থাকে। তাজা রক্তে সিঞ্চিত দেহ।

কিন্তু এদিকে ইতিমধ্যে কী যেন হয়েছে এ দেশের অহিংস মানুষের।

নিরস্ত্র বাপভাই স্বামীপুত্রগুলি হয়ে উঠেছে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য। সশস্ত্র দেবতাদের পর্যন্ত মেয়েদের গায়ে হাত দিতে দেয় না, বাধা দেয় মরণপণ করে, মরেও !

গাড়িটা গিয়ে পড়েছিল স্টেশনের এই মারামারির মধ্যে ! গাড়ির অর্ধেক যাত্রী ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাঙ্গামায়। তারপর যথা নিয়মে চলে গ্যাসবোমা ও গুলি। বেশির ভাগ আহত যাত্রী গাড়িতেই এসেছে। কিছু হতাহত পড়ে আছে সেই স্টেশনে অথবা হাসপাতালে।

কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর এগিয়ে গিয়ে ট্রেনটির নাগাল ধরেছে। ভোরের দিকের স্টেশন থেকে যাত্রীরা কুড়িয়েছে শুধু গুজব—খানিক বেলায় স্টেশনে পাওয়া গিয়েছে খবরের কাগজ।

জগতে কি শুধু দাঙ্গাহাঙ্গামাই চলছে চারিদিকে ? অথবা সেই মধ্যভারতের স্টেশনের হাঙ্গামাই শূন্যে উড়ে এসে ছড়িয়েছে কলকাতায় !

আহত যাত্রীদের উত্তেজনাই সব চেয়ে কম দেখা যায়। এমনভাবে ক্লিষ্ট হাসি হেসে তারা কথা বলে মাথা নাড়ে যেন বলতে চায়, জগতের অবস্থা যে কী তারাই তো তার জীবন্ত প্রমাণ। ভিড়ের গাদাগাদি আর অনবরত ঝাঁকুনিতে যাদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হবার কথা তাদের সহ্যশক্তি যেমন সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অভ্যাস আর অভিজ্ঞতার ফলে, একটা হাঙ্গামায় আহত হয়ে এদের সব রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে অবজ্ঞা জন্মে গেছে।

নতুবা শহরের বিবরণ যেমন ভয়ংকর তাতে গাড়ির কামরায় কামরায় ভয়ার্ত কলরব শুরু হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু বহুরূপী আতঙ্ক আর কত উত্তেজনা জোগাবে, কত ভীত করবে মানুষকে ? বেশি বাড়াবাড়ি করলে শিশুও চিনে ফেলে ভয়ংকরকে। একটানা রূপান্তর খেলার শামিল হয়ে গেছে, রোগ দুর্ভিক্ষের নিত্যলীলার মতো। অন্তত এ গাড়ির একজন মাঝবয়সি মানুষ তো আর কোনোদিন শঙ্কিত হবে না, স্থায়ী রেখায় কপালের চামড়া ভেঁজে কোনোদিন আলোচনা করবে না দেশের আজ দুর্দিন। তার দেহযন্ত্রটি বুঝি ট্রেনের সকলের চেয়ে দুর্বল ছিল, শিশু আর বুড়োদের চেয়েও। শুধু ভিড়ের চাপে গরমে তৃষ্ণায় আর বাতাসের ঘাটতিতে সে শেষ হয়ে গিয়েছে। মরে গিয়েও পড়ে থাকার স্থান জুটেছে প্রায় লাগেজেরই দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকার মতো। হাত-পা ছড়িয়ে মরার জায়গারও অভাব !

হাওড়ার ন;ু' ব্রিজ সে আর দেখবে না। তার সাথি ক্লিষ্ট আরক্ত চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ব্রিজটি দেখে মুহূর্তের জন্য তার এসেছিল বিস্ময়বণ। হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সাথিকে জানালা দিয়ে ব্রিজটি দেখার কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে ঝাঁকি খেয়ে আধ-নোয়ানো মাথাটা তার থমকে গিয়েছিল।

ব্রিজ পার হয়ে শহর।

ব্রিজের ঝকঝকে পেন্ট-মাখা বিরাট কাঠামো থেকে শেষ বেলার পড়ন্ত রোদ ঠিকরে পড়ছে অসংখ্য চোখে। গুলুর চোখে বিনয়হীন শক্ত বিস্ময়। ধুত্তেরি এটা কী কাণ্ড করেছে ! কী জন্যে কে জানে বাবা ! কত লোক খেটেছে ? ইস আগে যদি শিখত লোহালক্করের কাজ তো নির্ঘাত এটা তৈরির কাজে লেগে যেত চড়া মজুরিতে। চড়া মজুরি দিত কিনা সেটা জানা নাই বটে। দিত না। উঁহুঁ, দিত না। এ তো পুল বটে একটা, হোক যত মস্ত আর অবাক মতো, আকাশছোঁয়া, আকাশটার মতো চকচকে। সোন নদীর যে পুল হল সেটাও পুল। বলটু এঁটে বলটু এঁটে কী মজুরি মিলেছে ? এ শালার পুল বানাতে পয়সা যদি দুটো বেশি মিলত তো শালার শহরে চড়া দরে ভাত খেতে তা পুষিয়ে যেত হা, পুল বানিয়েছে দ্যাখো !

দ্যাখো, বিমীর চোখ এদিক পর্যন্ত শানায়, চুড়ি ক-টা বেচে এলাম, হাবাতেরা রুপো দিয়ে পুল বানিয়েছে দ্যাখো !

অনাথের আনাড়ি চোখ থেকে ব্রিজের ঝলমলে আলোর জোয়ার রাস্তা মাটি সবুজ বনের ছোপ যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে, ঘুমিয়ে স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না কখনও, রূপকথায় রাজপুরী আর ময়দানবের তৈরি সভা মিলেমিশেও হয়ে থাকে ধানের মরাই ঘেঁষা কোঠাবাড়ি আর ওই ইস্টিশন। এটা হবে বুঝি বিলেত দেশটার সদর গেট, না কী বল ? কানুর মা যে ফিরে গিয়ে গল্প করছিল কালীঘাটে ধন্না দিতে এয়ে সে গপ্পের সদর গেট হবে বুঝি। কত্তাবাড়ির গেট কতটুকু, তাতে হাতি বাঁধা রয় ! আয়গো বড়োকত্তাবাড়ির বেটাছেলে পরি-সাজা মাগিরা, এয়ে চোখ চেয়ে দেখে যা গেট কাকে বলে !

লক্ষ্মীর চোখে সব সওয়ার পুরু পর্দা, কিছুই তাতে চমক লাগায় না। মস্ত বড়ো পুল, চকচকে পুল। মরণ জানে কার কী কাজে লাগে। রাজরাজড়ার শখ হবে বুঝি। হোক গে যাক বাবা, যার শখ সে পুল বানাক, তার সগগে ওঠার সিঁড়ি তো লয় !

সুদর্শনের অনেকদিনের বিরহী চোখে অনেক সায় আর অনেক সমর্থন। হাঁ, একেই বলে ব্রিজ। নির্ঘাত। ইস্পাতের আশ্চর্য অদ্ভুত সংগঠন, সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীর উপযোগী তোরণদ্বার। নতুন সভ্যতার জয় ঘোষণা ! এতদিনে দেশটা যে একটু এগিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বেনামি স্পর্ধায় জমকালো এ সৃষ্টি কী প্রখরতর হয়েছে ঝকঝকে সাদা রঙে—সত্যই উদার ক্ষমাশীল এ দেশ। এত ক্ষমা ভালো নয়। দেশটা থাকবে ভাঙা বাঁশেব সাঁকোয় আটকে, সে দেশের বুকে বিজ্ঞানের এমন আধুনিকতম কীর্তি সৃষ্টি করবে খেয়ালের বশে ! চরকার সঙ্গে সাঁকো মানায়, বেশ মানায়। এ ব্রিজ মানায় কী ? সুদর্শন বারবার শহরে আসে, প্রতিবার ট্রামে বাসে ব্রিজ পার হতে গেলেই সে সমস্ত চাকার শব্দে অবিরাম ধ্বনি শোনে, হায় এ দেশ !

সত্যি, এটা কী দেশ ? বুকের শিশুটাকে সুদর্শনের হাতে তুলে দিয়ে ব্লাউজের নীচেকার আঁটো জামাটার বোতাম খুলতে খুলতে সুন্দরী জলভরা চোখে ব্রিজের চোখ ঝলসানো রূপকে ঝাপসা করে নিতে থাকে, এ দেশের কিছু হবে না। অমন ব্রিজ বানিয়েছে, এককোঁটা দুধের ব্যবস্থা রাখেনি। মায়েরা যদি সবার সামনে বুক খুলে বাচ্চাকে দুধ দেয়, সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে, এমন ব্রিজেব দরকাব ! দ্যাখনা বাপু, অমন ব্রিজটা বয়েছে সবাই দ্যাখ না বাপু ব্রিজটা, সবাই মিলে আমাব দিকে তাকিয়ে আছিস কেন ? ব্রিজ দেখে কি চোখ ভরে না—অমন সুন্দর ব্রিজ !

শুধু ট্রাম চলছে ? বাব্বা, ভাগ্যে ট্রাম ছিল ? সেবারেও সব বন্ধ ছিল, ভাগ্যে ট্রাম চলছিল তাই কোনোমতে বাড়ি পৌঁছলাম।—কাঁধেব আঁচলটা কৃষ্ণা কোমবে জড়িয়ে বাঁধে, মুকুলেব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়। আবাব সেই আগের বারের মতো ট্রামে যেতে হবে, শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা। সেবাব ট্রামে যাওয়া মনে আছে। চারিদিক থেকে সর্বাঙ্গে পুরুষের চাপ কিন্তু কী সুন্দর চওড়া ব্রিজ !

আগেও ব্রিজ ছিল, মুকুল ব্যথিত চোখে চওড়া উঁচু নতুন ব্রিজের উজ্জ্বল স্থবিরতা দ্যাখে।

আগের ব্রিজটার চিহ্নও কি রাখতে নেই ? ছিঃ ! চোখের ভর্ৎসনায় নতুন ব্রিজের বিবাটত্বকে উড়িয়ে দিতে না পেরে কলেজে ছেলে পড়ানোর ব্যবসায়ে ক্লান্ত নৃতত্ত্ববিদ ডাক্তার দে মাথা হেঁট করে।

চওড়া ব্রিজ, বুক বেয়ে বিরামহীন মানুষ আর যানবাহনের দুমুখী স্রোত, মাঝখানে ডবল ট্রাম লাইন, দুপ্রান্তে চওড়া ফুটপাথ। চলাচলের নতুন ঐশ্বর্যে এর মধ্যে মানুষ ভুলে গেছে ভারতেব সেই অন্যতম দ্রষ্টব্য বিস্ময়—ভাসমান ব্রিজটিকে। দুদিন আগেও যা ছিল পারাপারের সম্বল। মফস্‌সলের মানুষ হাঁ করে দেখত গঙ্গায় অনড় অচল সেতুটিকে। গাড়ি আস্তে চলতে বলে মিসেস দে তাকাত নদীর দিকে। সত্যই কি নেই সেই বহু পরিচিত কর্দমাক্ত পুরানো পুলটি ? সেই পুবানো নোংরা নিচু পুল ?

পাশে থাকলে সেদিকে চেয়ে চেয়ে এই ব্রিজ দিয়ে চলা কত সার্থক হত ! তাদের নয় সাধ্য ছিল না নতুন জমি কেনার, পুরানো ভাঙাচোরা বাড়িটা ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তুলতে হয়েছে, একখানা ইটও রাখতে পারেনি ভাঙা বাড়িটার। এ তো গবর্নমেন্টের ব্যাপার, অভাব কীসের ? পাশের দিকে পুরানো পুলটা নয় পড়েই থাকত। যে বোটগুলি বুকে ধরে রাখত পুরানো পুলটি তার দুটি পড়ে আছে পুরানো জঞ্জালের মতো নদীর এক প্রান্তে। এখন সমস্যা জাগে। সংশয় !

ওয়াজেদের চোখে ঐতিহাসিক বিদ্যার পুরু চশমা, বাইফোকাল। ব্রিজে ঝলসানো আলো যেন ধাঁধা লাগায়। পুরানো দিনের জীর্ণ সেতু বাতিল হয়ে গেছে মানুষের মনে উন্নত আধুনিক নতুনকে পেয়ে ভাবলে বিস্ময় জাগে, গর্বে রোমাঞ্চ হয় ! পুরানো পিছিয়ে-পড়া ধর্মোন্মাদ এই দেশ কত সহজে

আধুনিকতম সভ্য দেশের মতোই মাত্র দুদিনের একটু বিস্ময় বোধ করে কত সহজে কী অনায়াসে গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানের রূপধরা বিরাট প্রগতিকে।

বাংলার রাজধানী। বিদেশির পররাজ্য হোক, তবু তো তার রাজধানী থাকে। ষোলো শো নব্বুই খ্রিষ্টাব্দে জব চার্নকের ভিত্তিপত্তন। হুগলির ফৌজদার শায়েস্তা খাঁর দাপটে সদলবলে পলাতক জব চার্নকের কেন যে পছন্দ হয়েছিল তুচ্ছ নগণ্য সুতানুটি গ্রামটিকে ইতিহাস তা জানে কিন্তু বলে না। বলে না বোধ হয় দিল্লির বাদশা ফারুক শার খাতিরে, জব চার্নকের পছন্দের ভবিষ্যৎ যার অজানা ছিল। ইতিহাস শুধু জানাব ভান করে সতেরো শো চোদ্দো খ্রিষ্টাব্দে ১৩ই মে ইংরেজ বণিকরা ফারুক শার কাছে ত্রিশটি গ্রামের ইজারা প্রার্থনা করে দরখাস্ত দাখিল করেছিল। ত্রিশটি গ্রাম ! ইজারা ! দরখাস্ত !

জাহানারার কাজলা চোখে সাদা ব্রিজে ঠিকরানো পড়ন্ত রোদের চেয়ে ঝলমলো আলো খেলতে পারে।—ছোড়দো তুমারা হিস্টিরি ঔর লেকচার। হিস্টিরিয়া হোগি।

পিটার রবসনের কটা স্থির চোখে সব আলো সব রক্ত বিয়ারের সাদা ফেনা আর সোনালি স্বচ্ছতা। ইয়েস, ইয়েস। এ তার কল্পনা তারই পরিকল্পনা। এ দেশের পরম পরিণতির সিম্বল। জানো বিল্লীদাস, হোয়াইট ক্লাবে আমার ঘরের জানালা দিয়ে ব্রিজটা গড়ে উঠতে দেখেছি আর ভেবেছি This is no competition with Tajmahal, it's the fulfilment ! জানো ডিয়ার বেটি, এ দেশে. .

ডিয়ার বেটির পাতলা চোখে শুধু আমেরিকার আকাশেই সূর্য উঠে ও আমেরিকার ব্রিজেই আলো ঝলসায়, সে বলে, তুমি যদি ওয়াশিংটনে যেতে—

যাওয়া ভালো, আসা ভালো, তাতে দিল খুশ থাকে ! বুপেয়াসে নফা, বাস। হাতে হাত মিলাও, আসল ওই। বিল্লীদাস সত্যসত্যই বেটির মার্কিনি হাতে হাত মেলায়, রবসনের ইংরেজি হাতও বাদ দেয় না। এ ব্রিজ কুছু না। আমেরিকার প্রোডাকশন কত ! প্রোডাকশন চালু রইলে এমন কত ব্রিজ আপনাসে গজাবে।

ব্রিজ পারাপারে ভয় নেই। ব্রিজের এ মাথা ও মাথা চলাচল করার তো মানে নেই, ব্রিজটারও সে মানে নয়। পেরিয়ে কোথাও যেতে হবে, এ পারে ও পারে কোথাও যাওয়া আসার জন্য ব্রিজ। ও পারে শহরটাতে ভয়, বিপদ। তাই এমন মস্ত ঝকঝকে নিরাপদ ব্রিজ থাকতেও হাজার হাজার মানুষ ও পারে না গিয়ে স্টেশন কামড়ে পড়ে আছে, কম্বল শতরঞ্চি বিছিয়ে গাদাগাদি করে। অসংখ্য মুখর কণ্ঠ মিলে আটকানো ঝড়ের আওয়াজ। মিশ্র ভাপসা একটা দুর্গন্ধ, বাতাসকে পর্যন্ত ভারী করেছে। ট্রেনের কামবার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের, স্টেশন এলাকার কোনো পার্থক্য নেই। নবাগত ট্রেনের উগড়ে দেওয়া যাত্রীবা ঘোলা জলে কাদা জল মেশার মতো স্টেশনের ভিড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হবে। ব্রিজের ওপারেই ঘরবাড়ি আশ্রয় সংসার জীবন। প্রাণ হাতে করে নিয়ে যাওয়ার খানিক আশা আছে যাদের তাদের অন্তত যেতে হবে। যাদের তাও নেই তারাই পড়ে থাক।

ঝকঝকে প্রাইভেট গাড়িগুলি যায় সবার আগে। গাড়ির পেন্টে আঁচড়ের দাগ পড়েনি।

তোমাদের ভয় কী ? বিল্লীদাস রবসন বেটিকে অভয় দেয়, একদম দাঙ্গার মাঝে হেঁটে যাও কেউ কুছু বলবে না। তোমাদের সাথে ঝগড়া কার ?

জাহানারার চোখ ঝলসে ওঠে, ছোড়দো তুমারা হিস্টিরি, উজবুক। ভলান্টিয়ারকো পুছো কেইস্যা যানা হ্যায়। তুম কোন হো বাতাও।

ওয়াজেদ মাথা নামিয়ে সায় দেয়। তাই ভালো ! এই ব্রিজের কোনো ঐতিহাসিক মানে হয় না।

কৃষ্ণা বলে, আমায় যদি গাউন পরাতে তবে ঠিক হত, অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত ! তুমি একা হলে তোমার সায়েবি পোশাক কাজে লাগত, আমাব সঙ্গে দেখে সবাই চিনে ফেলবে না ? একটু কায়দা করে কাপড়টা পরে নেব যাতে চেনা না যায় আমি ঠিক—?

মুকুল ক্ষোভের সঙ্গে বলে, মানুষ সত্যি আর মানুষ নেই।

সুন্দরীর কাঁদো কাঁদো গলায় একটু ঝাঁঝ এসেছে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে দ্যাকো না বাবু ভলান্টিয়ারদের খোঁজ করে ? যদি কোনো উপায় হয় ?

সুদর্শন মাথার ঝাঁকি দিয়ে বলে, কাবা সত্যি ভলান্টিযাব, কারা ডাকাত তাই যদি জানতাম—

অনাথের হাত ধরে টানতে টানতে লক্ষ্মী বলে, আ মব ছোঁড়া, আয না চট কবে। বাবুবা লবি করে পৌঁছে দেবে বলছে, লবি যে বোঝাই হল, জায়গা পাবি নে যে, ছুটে চল। সগ্‌গে যাবাব জ্বালা ঢের কম বাপু, তা মোর মরণ নেই।

পোঁটলাটা ঘাড়ে তুলে গুলু বলে, চ যাই, পা চালাই।

পুটুলিটা বগলে নিয়ে বিমী বলে, চ।

মাটির মাশুল

মাটির মাশুল প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

মাটির মাশুল

ভোরে আজ চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। অল্প দূরেও নজর চলে না। এমনই কুয়াশায় রাত্রি শেষ হয় আজকাল, সারাদিন রোদ ভোগের পর আবার হিমহিম কুয়াশার যেন আভাস মেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। ভোরের কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে চারিদিকে মাটি ঢেকে গেছে আগামী ফসলের তরুণ সবুজ চারায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলোমেলোভাবে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষি। সারাদিন কাঁচা সবুজ শিষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনও খেয়ালি, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বায়ু বয় পুব থেকে, তা-ও আবার হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে বসতে শুরু করে দখিনা হয়ে ! ধানের শিষ টিপলে এখন দুধ বেরোয়, উপোসি মানুষ-মাদের স্তনের দুধের চেয়ে ঘন, বুঝি বা মিষ্টিও। চাষিরা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি-মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই।

বাপ রে, কী কুয়াশা। ভুঁই ফুঁড়ে মেঘ উঠেছে মন করে যেন।

ভূষণ বলে রসিক আর তোরাব আলিকে। দাওয়ায় বসে চেনা যায় না বিশ-পঁচিশ হাত দূরে মাটির রাস্তায় কে হেঁটে যাচ্ছে, এদিকের ডোবা থেকে উঠে আসছে কোনো বাড়ির বউ।

রসিক বলে, ধরণী ব্যাটা ঘুমোবে বেলা তক্। একটু দেরি করেই রওনা দি মোরা, না কি বলো মিয়া ?

রসিক ভূষণের বোনাই, পাড়াতেই খানিক তফাতে তার ঘর। তোরাব এক রকম প্রতিবেশী ভূষণের, দুজনের বাড়ির মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা বাঁশঝাড় আর কয়েকটা কুলগাছের।

দেরি হয়ে যাবে না ? কোনও একটা ছুতা করে আজ যদি কর্জা না দেয় ধর ?

তোরাব বলে উদ্‌বেগের সঙ্গে। ধরণী তরফদার ধান কর্জা না দিলে কাল পরশু ওদের দুজনের ঘরেও উপোস শুরু হয়ে যাবে কিন্তু তোরাব আলির ঘরে গতকাল থেকেই এক দানা চাল নেই। উপোস চলছে।

ভূষণ বলে, দেবার মতলব না থাকলে রাত থাকতে গিয়ে ধন্না দিলেও দেবে না। মতলব থাকলে যখনই যাও মিলবে।

সে কথা ঠিক।

আগেকার দিনে ধরণীর কাছে কর্জা চাইতে যাবার দরকার হলে এরাই হয়তো একজন চুপিচুপি আরেক জনের আগে গিয়ে নিজের জন্য কর্জটা আগে ভাগে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ চাষিরা প্রায় সকলেই টের পেয়েছে ওতে কোনো ফল নেই, কে আগে এল তোষামুদে কথা কইল বা কান্নাকাটি করল সে সব বিচার করে না ধরণী তরফদার। যাকে না দেবার তাকে কিছুতেই দেয় না, যাকে দেবার তাকে দেয়, সমান বাঁধনে বাঁধে। ভান্ডারও তার অফুরন্ত, তার কাছে কর্জ বাগানো মন্বন্তরের রিলিফখানার খয়রাত পাওয়া নয় যে আগে গিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি না করলে ফুরিয়ে যাবার ভয়। তবে কি না আজও না খেয়ে থাকতে হলে তোরাবের বিশেষ মুশকিল আছে। বউটা তোরাবের আসন্ন-প্রসবা, বড়ো কমজোরি হয়ে পড়েছে শরীরটা তার এমনিতেই। সব জেনে বুঝেও উদ্‌বিগ্ন মনটা তাই ধৈর্য মানে না, সাধ যায় ছুটে গিয়ে অন্তত যাচাই করে আসতে যে বউটা আজ একটু ভাত পাবে কী পাবে না।

দেড় ভাগি চাপাবে ঠিক। না তো কর্জা দেবে না মন করে।

তা মানবো না মোরা।

না, তা মানবো না, আল্লার কিরে !

এক মুহূর্তে তোরাব যেন ভয়-ভাবনা-উদ্‌বেগ সব ভুলে যায়, হাঁটুতে জোর চাপড় মেরে বলে, পোরা সুদের এক কুনো বাড়তি মানব না, না দেয় কর্জ না দেবে।

গতবছর ফসল কাটার দশ-বারোদিন আগে বিপদে পড়ে দেড় ভাগি শর্তে তোরাবকে ফজলু মিয়ার কাছে, ধান নিতে হয়েছিল সে জ্বালা আজও সে ভোলেনি। বর্ষাকালে ধান কর্জ মেলে দেড ভাগিতে, ফসল ঘরে উঠলে দেড় গুণ শোধ, দেবার সময় তবু ভাবা চলে যে এতগুলি মাস ঋণটা ভোগ করা গেছে। এখন ফসল কাটতে আর মাসকানেকও বাকি নেই আজ ও শর্ত চাপাতে চাওয়া তো দিনে ডাকাতির শামিল।

চলো মিয়া দেখি অদেষ্টে কী আছে। গরজ তো মোদের, ও ব্যাটার কী ? কলকেতে সুপাবিব মতো ছোটো একগুলি তামাক দিয়ে হাতের তালুতে নারকেল ছোবলা পাকাতে পাকাতে রসিক বলে।

বটে না কি ? তাই ভাবলে তুমি ? ভূষণ বলে ব্যঙ্গের সুরে, ও ব্যাটার কী ? কর্জ না দিলে ওর ঘরের ধান ঘরে রইবে, বাড়বে এক দানা ? উয়ার কারবার এই, মোদের চেয়ে উয়াব কর্জ দেবার গরজ বেশি ছাড়া কিছু কম নাই।

ঠিক। গুঁটি মেরে বসে থাকে মোদের খেলাতে, তোরাব বলে, মোরা হার মানি, নয় তো--

কুয়াশা নড়ে না, হালকা হয় না। চালা থেকে টপটপ জল পড়ছে। হাত বদল কবে তাবা কলকেতে কয়েকটা ছোটো-ছোটো আর একটিমাত্র বড়ো টান দিয়ে তামাক খায়, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। বাসনে ঘা দিয়ে বাজাবাব আওযাজ আসে অন্দব থেকে, এইভাবে চিবদিন ভেতরের ডাক আসে ভূষণের। ছেলেটার জ্বর এসেছিল পরশু, কাল রাত্রে খুব বেড়েছিল জ্বরটা, গা যেন তপ্ত খোলার মতো পুড়ে যাচ্ছিল। এখন খুব ঘাম দিয়ে তাড়াতাড়ি জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে, ছেলেটা ছটফট করছে গোঙিয়ে গোঙিয়ে। ছেলের কাছে একটু বসে ভূষণ উঠে আসে। তাব মুখ আবও কালো আর গম্ভীর দেখায়।

হাসপাতালে যাবে না একবার ? তার বঁউ শুধায়।

হাঁ, হাসপাতাল হয়ে ফিরব।

সে ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই ভূষণের, পাঁচটি শুধু স্ত্রীলোক। সব ঝঞ্ঝাট সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয় একা।

বাইরে এসে সেই এবার গরজ করে বলে, চলো রওনা দি, বসে থেকে কী লাভ ?

এই সোনামাটি গাঁয়েরই দীঘিপাড়ায় ধরণী তরফদারের টিনের ঘর আর দালান-কোঠায় মেশানো বাড়ি। ভূষণের বাড়ি থেকে প্রায় আধ ক্রোশ তফাতে। রাস্তায় তারা নাগাল ধরে পিনাক সামন্তের, সেও কুয়াশা ভেদ করে গুটিগুটি হেঁটে চলেছে তরফদারের বাড়ির উদ্দেশে। এমনি অভাব চারিদিকে যে সবারই যেন গতি ওই একদিকে যেখানে একজনের খামারে গুদামে ধান গাদা হয়ে জমে আছে। মানুষটার বয়স যে খুব বেশি তা নয়, অকালে বুড়িয়ে জীর্ণ আর বাঁকা হয়ে গেছে সত্তর বছরের বুড়োর মতো। শোনা গেল, তরফদারের কাছে তার প্রয়োজন ধান কর্জ নেওয়া নয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এক চোরাগোপ্তা এক তরফা মামলায় জমি নিলামের নোটিশের প্রতিবাদে কাকুতি-মিনতি করা যদি কিছু সুরাহা হয়। তার ছেলে কৈলাস গেছে বিদেশে খাটতে, ফসল কাটার সময় আরও নিকট হলে ফিরবে, এ সময় আচমকা এই বিপদ ঘটায় কী করবে ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পিনাক সামন্ত।

বলে, মরণ হলে হাড় জুড়াত, অদেষ্টে মরণ নাই। না ভাই, অদেষ্টে মরণ লেখেনি মোর। সেই যে গোল বাধালে কৈলেস, নাথুর হয়ে সাক্ষী দিলে ঘর জ্বালানোর মামলায়, সে রাগটা ঝাড়লে তরফদার।

বলে, মোর খেমতায় কুলোয় ? ছুটোছুটির শক্তি আছে ? মরে মরে বেঁচে রই শুধু মন্দ অদেষ্ট বলে।

সবাই জানে সব, বোঝেও সব। আস্তে পা ফেলে পিনাকের সাথে গতি মিলিয়ে তারা হাঁটে। ধরণীকে গিয়ে ধরে পড়লে যে কিছু হবে না এ জানা কথা। ভাঙা জীর্ণ শরীর নিয়ে ছুটোছুটি করে পিনাককেই ঠেকাতে হবে নিলাম, লড়তে হবে মিথ্যে মামলা ফাঁস করতে, অবশ্য যদি সে লড়ে, লড়তে পারে। কৈলাস এসে কেঁদে-কেটে মাপ চেয়ে নাকে খত দিলে বড়োজোর আপস হবে একটা, দয়া করে কিছু কমে সমে রেহাই দেবে ধরণী। নয়তো যাবে জমি নিলাম হয়ে। এ তো জগতে হরদম ঘটছে।

ভূষণ শুধায়, কৈলাসের শ্বশুর না মরো-মরো হয়েছিল ?

মরল কই ? পিনাক বলে দারুণ হতাশায়, যে মরলে ভালো সে কি মরে ? উয়ার মরণ নাই, মোর মরণ নাই, মোরা চিরজীবী হয়ে রইব ?

কৈলাসের শ্বশুরের দুটি মাত্র মেয়ে, সে মরলে তার জমিজমা ঘর-দুয়ার ভাগাভাগি করে মেয়েরা পাবে। তার অসুখ-বিসুখের খবর পেলেই জামাই দুজন দেখতে ছুটে যায়, এমনিও যায়। পূজার পর ও;রে কঠিন রোগে পেড়ে ফেলেছিল, সকলেই আশা করেছিল এবার তার ভব যন্ত্রণাব পালা শেষ হবে। কিন্তু বুড়ো আবার বেঁচে উঠেছে।

পিনাকের সঙ্গে হেঁটে দীঘিপাড়ায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে কুয়াশা খানিকটা হালকা হয়ে আসে, এবার তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। দীঘিপাড়ায় ঘনবসতি, টিন বা ঘড়ের চালার বাড়িই বেশি, দালানও এখানে ওখানে চোখে পড়ে। সোনামাটির এই দীঘিপাড়া ও কুয়াতলাতেই গাঁয়ের সচ্ছল সম্পন্ন এবং গরিব অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের বাস। দীঘিপাড়াতে বড়ো জোতদার আছে আরও দুজন, তবে ধরণীর মতো বড়ো কেউ নয়, ওদেব দুজনের মিলিয়ে যত হবে তার চেয়ে বেশি মাটি ও বেশি চাষির সে ভাগ্যবিধাতা। পশ্চিমে কিছু তফাতে বুড়ো বটগাছটার খানিক আড়ালে ইন্দু শাসমলের বাড়িব সামনেও কর্জপ্রার্থী চাষি কয়েকজন জমা হয়েছে দেখা যায়। অন্য জোতদার আশু পট্টনায়কের বাড়িটা আড়ালে।

ধরণী তখনও দর্শন দান করেনি, তবে আর খুব বেশি দেরি যে তার হবে না অন্দর থেকে সদরে আসতে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তক্তপোশের ফরাশ.ঝেড়ে বাঁধানো হুঁকোটা রেখে গেছে কানাই, বুড়ো লোচন সরকার চোখে চশমা এঁটে খেরো বাঁধানো খাতা খুলে বসেছে, ধরণীর ভাগনে আচমকা এসে উঁকি দিয়ে গেছে।

অনেকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল, প্রায় তাদের সাথে সাথেই ভিন গাঁয়ের আরও দুজন এল। তাদের মধ্যে রাজেন দাসকে দেখে একটু অবাক লাগে সকলের, তার অবস্থা ভালো বলেই জানত সকলে, বছরের কোনো সময়ে ভাতের অভাব হয় না। ধান কর্জ চাইতে এসেছে রাজেন দাস, না টাকা ? যেমন বিপন্ন ভাব তার, কারও দিকে না তাকিয়ে যে ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পেতে রেখেছে কদমগাছটার, দেখে মনে হয় অনুগ্রহই বুঝি চাইতে এসেছে যে কাজটা তার মোটে অভ্যস্ত নয়। কালু আর ফকিরই বা কেন এসেছে কে জানে ? নিঃস্ব পথের ভিখারি হয়ে গেছে দুজনেই ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে, এক কাহন খড়ও নেই যে ওদের কোনো দয়া করে ধরণী সুদে আসলে ফিরে পাবার প্রত্যাশা করতে পারবে।

পরস্পরের মধ্যে কথা চলতে থাকে ধীরে ধীরে, নতুন কিছু জানার বা বলার থাকলে জিজ্ঞাসা ও জবাব, দু একটি শব্দে আপশোশ বা সমবেদনা প্রকাশ। প্রাণখোলা কুশল প্রশ্নের পালায় মন্দা

এসেছে। চিরকালের স্থায়ী দুঃখ দুর্দশার কথা কেউ বলাবলি কবে না, কারণ কারও অজানা নেই কার দুর্ভোগের জের চলছে তো চলছেই, সে হিসাবে সবাই তারা সমান দুর্ভাগা, কমবেশি যদি হয়তো সেটা সাময়িক, জোয়ার-ভাটার খেলা মাত্র। আজ যে দুদিনের অন্নসংস্থান করেছে, দুদিন বাদেই তার উপোস। রাজেন দাস পোড় খায়নি, তার লজ্জা করতে পারে। ঘরে অন্ন না থাকাটা দশজনের জেনে ফেলার মধ্যে যে লজ্জার কিছু থাকতে পারে, অপৌরুষের বা অপদার্থতার প্রমাণ সেটা, অন্যেরা তা বহুকাল আগেই ভুলে গেছে !

ভূষণের জিজ্ঞাসার জবাবে রাজেন দাস একটু কাঁচুমাচু হয়েই বলে, একটু কাজে এয়েছি। দরকার আছে একটা।

দরকার ছাড়া কেউ যেন এখানে আসে !

শ্রীনাথ মাইতি বলে, আর দাদা, কপাল ! মলজোড়া ফের বাঁধা দিতে এয়েছি, ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বলাবলি যা হয় সব চাষাড়ে কথা। হাটে হাটে ধান-চালের লাটসাহেবি দর, কেমন হবে এবারের ফসল, ভাগ, আবোয়াব আদায়, জুলুম ইত্যাদির কথা। আর সেদিন রামপুরে পত্তনিদার মদন শাসমলের লোকেব সঙ্গে চাষিদের যে মারামারিটা হয়ে গেল সেই আলোচনা। রাখাল একটা নতুন খবর দিয়েছে আজ, মদন শাসমলের ভাইপো না কি জখম হয়েছিল দাঙ্গায়, হাসপাতালে মারা গেছে। তার চেয়েও জবর একটা খবর শুনে এসেছে তিনু, সত্য কি মিথ্যা জানে না। হাঙ্গামার পর পুলিশ এসে রামপুরে ধর-পাকড়-জুলুম চালাচ্ছিল, হঠাৎ না কি পুলিশ চলে গেছে গাঁ ছেড়ে। একেবারে হঠাৎ, সকালেও দলাকে দল পুলিশ হাজিব ছিল, বেলা খানিক বাড়তে না বাড়তে মার্চ করে চলে গেল স্টেশন রোডের দিকে। তিনুর এই অদ্ভুত কাহিনি নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। সবাই যে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবে তার সময় পাওযা গেল না। ধরণী এল বেঠকখানায়।

বলল, বেশ, বেশ। তোমরা এযেছ দেখছি। তা বেশ, তা বেশ। জয় দুর্গা শ্রীহবি। তামাক আনতে বুড়ো হলি শালার পুত ?

ঘরের মধ্যেই ভেতরেব দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কানাই কলকেতে ফুঁ দিচ্ছিল, নজর পড়ায় ধবণী বলল, এই যে এনেছিস !

একেবারে যে মোটা গোলগাল তা নয়, নাদুস-নুদুস চেহাবা ধবণী তরফদারেব, বেঁটে বলে মোটা দেখায় বেশি। টানা চোখ, মুখখানা থ্যাবড়া না হলে অপরূপ মানাত, আর যদি ভুরু না হত দামাল মোচের মতো ঘন। টানা চোখে একবার সে তাকিয়ে নেয সবার দিকে, কে কে এসেছে, কেন এসেছে, মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে। দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে, একদিন সকালে বৈঠকখানায় নেমে যদি দ্যাখে যে এক দল আধিয়ার হাতিয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছে, মোটেই সে আশ্চর্য হবে না। ব্যবস্থা অবশ্য সে করে রেখেছে আত্মরক্ষার। দু নলা বন্দুকে ছর্‌রা টোটা ভরে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দরজার ওপাশে, রামদা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে রঘু আর বিষ্ণু। তাছাড়া, লোকজন সকলকে বলাই আছে যে, বৈঠকখানায় একটু হট্টগোল শোনামাত্র যে যেখানে থাকে ছুটে আসবে দা লাঠি যা পায় হাতের কাছে তাই নিয়ে।

তবু, বলা যায় না। সব সময় মনে একটা আতঙ্ক জেগে থাকে। যা দিনকাল পড়েছে।

রাজেন যে ? খবর কী ? রাজেনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হুঁকো টেনে লোকটা যে কে চিনবার যথাসাধ্য চেষ্টার পর আচমকা ধরণী প্রশ্নটা করে বসে। ধরণী তার জন্ম থেকে চেনা।

একটু দরকার ছিল।

বোসো। জয় দুর্গা শ্রীহরি। হাই তুলে তুড়ি দেয় ধরণী, শরীরটা ভালো নেই।

হুঁকে টেনে যায় ধরণী, অর্ধেক চোখ বুজে, চুপচাপ। বিষয়কর্মে তার যেন মন নেই, এতগুলি লোক কেন তার কাছে এসেছে সে যেন জানতেও চায় না, পরম গভীর কোনো এক অপার্থিব চিন্তায় সে যেন ডুবে গেছে।

নিজে থেকে সে কিছু বলবে না, তার গরজ নেই, এ জানা কথা। তোরাব একটু সামনে এগিয়ে বলে, মোরা কর্জের জন্য এয়েছিলাম কত্তা।

কর্জ ? তা বেশ। ফজলু মিয়ার খবর কী ?

তেনা ভালো আছেন। তা, তেনা কাত্তিকে দেড় ভাগি আপস চান তাই আপনার কাছে এয়েছি।

বটে ? তা বেশ। কাত্তিকে দেড় ভাগি অন্যায় জুলুম বটে।—ধরণী যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছে হঠাৎ, মুখটা দেখায় গম্ভীর।—লোচন, ধান কি আছে কর্জ দেবার মতো ?

কিছু আছে। অল্প-স্বল্প দেয়া যায়।

তখন ধরণী বলে, শোনো বলি, কাত্তিকে দেড় ভাগি চাইব না আমি, আমার বাপু বিবেক আছে। ও সব গোলমালে কাজ নেই। ধানের বাজার দরে ধান দেব, টাকায় সুদ ধরব—ধরণী গলা খাঁকরায়, সুদখোর মহাজন হলে চার আনা ধরত, আমায় দু আনা দিয়ো, তাই ঢের।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় উপস্থিত সকলে। সকলে মরিয়া হয়ে প্রাণপণে নাড়াচাড়া করে প্রস্তাবটা মনে মনে। বোকা চাষাভুসো মানুষ, মানে বুঝেও ভাববার চেষ্টা করে কথাটার যে মানে বুঝেছে তা হয়তো ভুল, অন্য মানে আছে।

তোরাব বলে, কত্তা ?

রাজেন দাস বলে, এটা কী বলছেন ?

কেন ? ধরণী যেন আশ্চর্য হয়ে যায়, দেড় ভাগিতে মনে আধ মন সুদ দিতে হতো তোমাদের, টাকায় আট আনা। আমি কি চামার, মাসে আট আনা সুদ চাইব ? চলতি দরের হিসেবে টাকার খতে ধান নাও, দু আনা সুদ দেবে, টাকায় বা ধানে যা তোমাদের খুশি।

ধানে শোধ দিলে—? সংশয়ভরে প্রশ্ন করে এক জন।

ধানেই দিয়ো, নির্বিকার ভাবে বলে ধরণী, টাকায় দু আনা সুদ ধরে দর হিসেবে ধানেই দিয়ো।

এবার জ্বালা বোধ করে, সকলে। এতই বোকা ঠাউরেছে তাদের ধরণী তরফদার ? আজ ধানের দর কোথায় ফসল ওঠার আগে, ফসল উঠলে তা কোথায় নেমে যাবে। দু আনা সুদ !—বিনা সুদে এই কড়ারে ধান কর্জ না নিলে দেড় ভাগি হিসাবেরও অনেক গুণ বেশি ফিরিয়ে দিতে হবে ধরণীকে। ব্যাটা ধড়িবাজ ডাকাত !

ভূষণ বলে, আজকের চোরাবাজারি দরে মোরা ধান নিতে পারি কত্তা ?

তবে দেড় ভাগি হিসেবে নাও।

পুলিন জানা যেন হাঁফ ছাড়ে, ধরণীর চলতি দরের হিসাবে কর্জ দেবার প্রস্তাব শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

তাই দেন কত্তা, তাই দেন।

রও দাদা, রও। তড়ফিয়ো না অত।—তোরাব বলে ধমক দিয়ে, দেড়া ভাগির কর্জ মোরা ছোঁব না কেউ।

২

শীত পড়ছে অল্পে অল্পে। সকাল-সাঁঝে গায়ে কাঁটা দেয়, কাপড়ের খুঁট বা আঁচল বা গামছাখানি ভালো করে গায়ে জড়াবার তাগিদ আসে। রুক্ষ চামড়ায় খড়ি ওঠার সূচনা দেখা দিয়েছে সকলের, কারও

কারও খুব স্পষ্ট, গা চুলকোবার ফলে। চাষির চামড়ায় স্নেহ এক রকম না থাকার মধ্যেই চিরকাল, ক-বছর তাতেও বিষম ঘাটতি পড়ে চলেছে। স্নানের ঘাটে অল্পবয়সি মেয়ে-বউরা গা ঘষতে ঘষতে বলে অসন্তোষের সুরে, দুৎ, কী সুবুৎ হতেছে দিন দিন, মরে যাই। বেশি রাতে শীত পড়ে বেশি। সকাল-সাঁঝে বাতাস বয় না, কুয়াশা হয়, শীতের বাড় ঠেকে থাকে। সাঁঝের কুয়াশা হালকা, দূরের আলোও দেখা যায়, উজ্জ্বল বিন্দুর বদলে ঝাপসা আলোয় ঢাকার মতো। দু-একটা চোখে পড়ে এদিকে ওদিকে, আলো বেশি জ্বলে না গাঁয়ে। বোমার ভয়ের আইন নেই, কিন্তু তেলের অভাব।

দাওয়ায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে ভূষণ, এতগুলি লোকের আসরে একটু আলো ছাড়া চলে না। সরু সলতের ডগার ক্ষীণ মুমূর্ষু শিখাটি জ্বলছে, সতর্ক নজর রেখেছে ভূষণ, মাঝে মাঝে একটু উসকে দিচ্ছে সলতেটা। সে আলো যেন ছায়াপাত করেনি মাটির দেয়ালে চাটাইয়ে বসা জ্যান্ত মানুষগুলির, কোনো মতে শুধু চিনিয়ে দিতে পারছে চেনা মুখগুলি। অন্দরের আঁধার থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের ছাড়া ছাড়া কথার আওয়াজ আর থেমে থেমে সুরবালার বিনিয়ে কাঁদার সুর। সেই বুঝি একা একটু শোক করছে ছেলের জন্য, ভূষণের বাড়িতে যদিও স্ত্রীলোক মোট পাঁচটি। সুরবালার তবে তীক্ষ্ণ গলাও ঝিমিয়ে মিইয়ে অস্ফুট হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। পুত্রশোকও ভোলো হয়ে গেছে মানুষের শোকে শোকে, এমনি তো বছর প্রায় ঘুরত না মড়াকান্না না কেঁদে, তার ওপর লাঠিগুলি বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারি যদি জোট বেঁধে এসে কাঁদাতে চায় অবিরাম, একটার বদলে এক সাথে দশটা মরণের ঘায়ে বুক ফাটিয়ে, কাঁহাতক শোক করতে পারে মানুষ। তা ছাড়া আছে যত কিছু সয় না তার সব সয়ে বাঁচা। পাথর নয় বলেই বুক ফাটেনি সত্যি কিন্তু তাই বলে পাথর হতে তো বারণ নেই বুকের।

মোহন গিয়েছিল একটু তামাক চাইতে প্রতিবেশী বটুকের কাছে। ফিরে এসে বলে, বটুক খুড়োর তামাক নেই।

এক ছিলুম নেই ? এক ছিলুম দিলে না ? হতাশায় রাগে গলা চড়ে যায় ভূষণের।

বললে তো কাল থেকে তামাক ফাঁক। তামাক টানতে টানতে বলল।

অ। ব্যাটা কঞ্জুস !

আর বললে কী শুনবে দাদা, উপোস পেটে তামুক খেলে বক্তবমি হয়, বলগে যা মোহন তোর ভাইকে ঠেসে গাঁজা টানুক, সিদ্ধি পাবে। হাসি কী, ঠিক ধ্যান শ্যালের গলায় কাশি ঠেকছে।

ওটা বেজন্মা, বজ্জাত। ছেলের বউটাকে ঘর ছাড়ালে।

ইন্দ্র ফুসলেছে না ?

ফুসলেছে, অমন ফুসলায়। কে কোথায় ফুসলায় আর ওমনি ঘর ছাড়ে ঘরের বউ না কি বটে ? কারও ঘরে মেয়ে-বউ রইত না তালি। খেতে দিত না তো কী করবে ঘর না ছেড়ে ?

তা ফের ভাতের ঘাটা নেই বটুকের।

তামুক ছাড়া জমে না।—আরেকবার আপশোশ করে ভূষণ। ছেলের মরণে সে যেন তেমন কাতর নয়, তামাকের জন্য আপশোশটা বেশি। বিশেষ করে রাজেন দাস আজ যেচে এসে তার দাওয়ায় বসেছে বলে। মাননীয় ব্যক্তির পদার্পণে ধন্য হয়ে তাকে খাতির করার সাধ মেটানো গেল না বলে নয়, মানে তারা সমানই হবে, বয়সেও প্রায় সমান। সাপ-বেজির সম্পর্ক ছিল তাদের অনেক কাল। রাজেনের বোন সুখদা, ছেলেপিলে নিয়ে আজ সে সাত বছর ঘর করছে শিয়াপোলের অনন্তের, তাকে ভূষণ বিয়ে করেনি কথাবার্তা পাকা হবার পর, এই ছিল ঘটনা। ঘাটের পথে সাঁঝের বেলা একলা সুখদাকে নিমাই ছোঁড়ার সাথে কথা কইতে দেখেছিল, হেসে হাত নেড়ে কথা কইতে দেখেছিল ভূষণ নিজের চোখে—এই ছিল কারণ। সেও কথা কইতেই গিয়েছিল নিজে, দুটো মিষ্টি মিষ্টি প্রাণের কথা। কথা আর বলা হয়নি। খটকা একটা এমনিই ছিল ভূষণের মনে যে তার সাথে

লুকিয়ে ভাব করতে পারে যে মেয়েটা সে কি আর অন্যের সাথে পারে না ? এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাবটা হয়েছে তারই সাথে, কিন্তু কথা হল, স্বভাব ভালো যে মেয়ের সে তো এ রকম ভাবসাবের ব্যাপাব করে না কারও সাথেই ! যে খুঁতখুঁতানি মনে ছিল সেটা প্রত্যয় হল হেসে হেসে নিমাইয়ের সাথে হাত নেড়ে কথা বলা দেখে, বাঁশঝাড় গাছপালায় ঘেরা যে নির্জন স্থানটিতে শুধু তারই সাথে কথা বলার কথা সুখদার। বিয়ে তাই ভেঙে দিল ভূষণ, নিজে নিজে যেচে বরণ কবা যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে রটিয়েও দিল মেয়েটার নামে মনগড়া কলঙ্ক। ঘটনা রটনা গালাগালি হাতাহাতি পুরানো হয়ে তলিয়ে গেল অতীতে, জিদ বজায় রইল মুখ দেখাদেখি বন্ধ রাখার, শত্রুতা করার। বিয়াল্লিশ সালে ব্যাপার হল একটা। বন্দুক উঁচিয়ে সৈন্য পুলিশ এসে অন্য ক-টা ঘরবাড়ির সাথে পুড়িয়ে দিল রাজেনের ঘরটা, আর এমনি মজার যোগাযোগ অদেষ্টের যে দু কোশ তফাতে কেঁদা গাঁয়ে ভূষণের মামা জগন্নাথের বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে দুটো রাত কাটাতে হল রাজেনকে সপরিবার ভূষণেব সাথেই। রাজেন ভেবেছিল, মামাকে বলে ভূষণ তাদের খেদিয়েই দেবে বেহদ্দ মারধোর খুন-জখম বলাৎকার ঘর পোড়ানোর তাণ্ডবের মধ্যে। তা শোধ নেবার কথাটা ভূষণও ভেবেছিল একবার, এত কালের শত্রুকে জব্দ করাব সুযোগ আর আসবে না জীবনে ! কিন্তু তাব পরিবর্তে দু-একটা কথা বলতে হয়েছে তাদের পরস্পরের সাথে। অবস্থা এমনই ছিল। সেই থেকে বিদ্বেষ ঘুচে গেছে তাদের, পথে-ঘাটে দেখা হলে দুটো একটা কথা তাবা কয়ে এসেছে পবস্পরে, কিন্তু শুধু ওই শত্রুতার অবসান ঘটা ছাড়া বেশি আর এগোয়নি তাদের সম্পর্ক। কেউ এতকাল পা দেয়নি কারও বাড়ি, ক্রিয়াকর্মে আপদে-বিপদে কেউ ডাকেনি অন্যকে। এত কাল পরে রাজেন আজ নিজে থেকে এসেছে তার বাড়ি। ওকে দু টান তামাক না টানতে দিতে পারলে কেমন লাগে মানুষেব ?

একবারটি ঝেড়েপুঁছে দেখে এসবে না কি রসিক ? ভূষণ আবেদন জানায়।

নেই তো জানি। বলছো যদি দেখে আসি।

তিনটে বিড়ি নিয়ে আসে রসিক। তারই একটা বাজনকে দেয ভূষণ, পিদিম থেকে ধরাতে গিযে নিবে যায় শিখাটুকু পিদিমের। ফের হাঙ্গামা করতে হয় পাথর ঠুকে সলুই জ্বালিয়ে আগুন সৃষ্টি করার। দু-একটান টেনে বিড়িটা রাজেন বাড়িয়ে দেয় তোরাব আলিকে।

আনমনা ছিল তোরাব। এনতার তাকে ডেকে বলে, বিড়ি ধবো মিয়া।

এ বড়ো আশ্চর্য কথা যে এতগুলি মানুষ তারা বসে আছে প্রায় চুপচাপ। কথার কামাই নেই বটে কিন্তু একসাথে কথা বলছে না একজনের বেশি, কথার আওয়াজে মোটে সরগরম নয় চোদ্দো জন চাষির আসব। কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া সাধারণ চলতি আলাপ এটা-ওটা নিয়ে, তাই মন দিয়ে শুনছে সকলে যে যখন মুখ খুলছে। বিশেষ কিছু একটা শুনবাব জন্য যেন উগ্র প্রত্যাশা সকলের, কিন্তু বিশেষ কথাটা উঠছে না বলে আগ্রহ চেপে যেন অপেক্ষা কবার অসীম ধৈর্যও আছে সকলেরই। সবাব মনেব কথা কে আগে তুলবে, কী ভাবে তুলবে তাও জানা নেই কারও। বেশি উৎসুক এনতার, কেবলই উশখুশ করছে আর বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে চুলকিয়ে চলেছে ঘন রুক্ষ দাড়ি-ঢাকা চিবুক।

খাবা না তুমরা ? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের পিসি দয়া।

খাগা যা মোহন।

খাবো পরে।

একটা লণ্ঠন চলে যায় সামনের পথ দিয়ে, ঝকঝকে নতুন লণ্ঠন, সযত্নে কাটা পলতের উজ্জ্বল তেজি শিখা। কনস্টেবল শশী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে দারোগা মৃণালবাবুকে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্ত কেউ কেউ চিৎকারে বাতাস চিরতে চিরতে পথ ছেড়ে ছুটে পালায় রসিকের বাড়ির কুকুরটা। কে জানে দারোগাবাবুর চলার রাস্তায় পুঁটি কী খুঁজছিল বাড়িতে চালার কোণে তার এক গন্ডা বাচ্চা ফেলে রেখে।

বলি কী, রাজেন দাস বলে, উপায় একটা না হলি তো নয়। সব দিকে দেখি মরার জোগাড়।

অ্যাদ্দিনে জানলে সেটা ! তিনু বলে খোঁচা দিয়ে।

আঃ হাঃ ! বড়োই বিরক্ত হয় তোরাব, ছেঁদো কথা রাখো না এখন, ঘরে গিয়ে চাটনি খেয়ো।

বলি কী, রাজেন দাস বলে, একটা উপায় চাই। এত নিরুপায় জম্মে হইনি কোনোকালে। অজম্মা এল তো বুঝি, না তো এও বুঝি শালা একদম মন্বন্তর ঘটেছে, ও সব যা করেন তা ভগবান করেন, তেনার নিলা-খেলা আর মোদের অদেষ্ট। কিন্তু ই কী রে বাবা, অজম্মা না, দুর্ভিক্ষ না, খাসা ফলন, তবু হাঁড়ি চড়বে না, ছেলেপিলে খিদেয় কাঁদবে ?

শুধু কাঁদে না কি ? তিনু বলে, মরে না ?

শ্রীনাথ বলে, বিন্দাবনের বড়ো ছেলেটা মরেছে, ছোটোটা মরবে। ওই যে মণিবাবু, জ্ঞানবাবুর ভাগনে, তেনা ছুটে শুধোতে এল—

আঃ হাঃ ! তোরাব বিরক্ত হয়ে বলে।

কিন্তু এবার তার বিরক্তি ও আপত্তি খণ্ডন করে রাজেন বলে, না না, শুনি ব্যাপার।

শ্রীনাথ বলে যায়, কলকাতায় কাগজে লিখবে কি না যে না খেয়ে মরেছে, তাই শুধোতে এল জ্ঞানবাবুর ভাগনে, মোদের ওই মণিবাবু। তা ইদিকে মিনালবাবু শাসিয়ে গেছে, উপোসে মরছে তা বলতে পাবে না, বলবে যদি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে, কয়েদ করবে। বিন্দাবন কী করে, মণিবাবুকে বলল, না বাবু, না খেয়ে মরেনি ছেলে, ব্যারামে মরেছে। তা, ব্যারামটা কী হয়েছিল ? তা কী বুঝি বাবু, চাষাভুসো মানুষ ও, কী জানি কী পেটের ব্যারাম। তোমার ভয় নেই বিন্দাবন, যে যেথা আছে তোমার ছেলের মৃত্যুর শোধ নেবে। না, ব্যারামে মরেছে ছেলেটা বাবু। ব্যারামেই মরেছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে থুতু ফেলে শ্রীনাথ কথার শেষে।

রাখাল বলে আস্তে আস্তে, মণিবাবু এক পসারি চাল দেছে বিন্দাবনকে। আব দুটো কমলা দেছে বিন্দাবনকে ছেলেটার তরে। বলল কী, মামা কত খায়, এট্টু এট্টু রস করে ছেলেটাকে দিয়ো বিন্দাবন। মণিবাবু এমনি কমলা দিয়ে এমনি করে বলতে বিন্দাবন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। স্বীকার করলে না বাবু, ছেলেটা ব্যারামে মরেনি, না খেয়ে মরেছে। কলক্যাতার কাগজে বেরুবে খপর।

বলি কী, রাজেন বলে, খানিকক্ষণ নিজে আর অন্য সকলে চুপ করে থাকার পর, কী কবা যায়। আর তো সয় না। মোদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না কি শালার ব্যাটা শালা ধরণী শালা ? ই কি রে বাবা, গাঁ পিতিবেশি চাইলে মানুষ ধান দেয় যে হাঁ আজ বাদে কাল ফিরিয়ে দেবে ! মোরা তোর গাঁয়ের মানুষ, একটা মাসের তরে দুটো ধান দিবি, কর্জ দিবি, তাতেও তোর দেড়ভাগি চাই ? বলি, মাগ যে তোর বছর-বিয়ানি, দু-তিনমাস ছুঁতে পাস না ফি-বছর, তা ভাত-কাপড় কি বন্ধ বাখিস মাগের ? না, কুব্জা জেলেনির পিছে যা খরচ করিস তার সুদ কষিস ?

খিলখিল করে হেসে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে থেমে যায় অল্পবয়সি জোয়ান মোহন। ভূষণ মুখ ভার করে তাকায়। যেন পিদিমের মৃদু আলোয় ভাইটা তার মুখের ভাব দেখতে পাবে। অন্যেরা বিরক্ত হয় না, তবে বুঝেও উঠতে পারে না এমন কী রসিকতা আছে। গুরুতর কথাগুলির মধ্যে রাজেনের যে হাসি সামলাতে পারল না মোহন। রাজেন স্পষ্ট করে জমাট করে প্রকাশ করেছে সবার মনের এলোমেলো অশান্ত খেদ। এ তো সত্যি কথাই যে ধরণী যেন রাজা-বাদশা, ঘরের বউ পরের মেয়েছেলেকে খুশিমতো ভোগ করবে, টাকা নাড়াচাড়া করবে যেন পয়সা হাতের ময়লা মাত্র, নতুন ফসল ওঠার আগেও ধান ভরা থাকবে পাঁচটা খামারের দুটোতে আর হেথা-হোথা ছড়ানো—এদিকে নিজের নিজের একটি পরিবারকে তারা যে ছোঁবে সে সামর্থ্য কই, ছোঁয়াছুঁয়ি সইবার শক্তি কই সে বেচারার, গর্ভবতী বউগুলির কথা তো আলাদাই, তারা বাঁচে কি না বাঁচে নিত্য এ ভয় ভরামাস হবার আগেই। টাকা আর ধান শুধু তাদের ঋণের খত। জমি যার আছে দু বিঘে তারও, এক মুঠো মাটিতে যার স্বত্ব নেই তারও। ঠিক কথাই তো বলেছে রাজেন।

খাবা না ? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের বিধবা পিসি দয়াব বিধবা মেয়ে হারাণি।

দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর খাওয়ার, রেগে তেড়ে-মেড়ে ওঠে ভূষণ, দিবি তো দুধ পোয়া মাপে আলুনি ফ্যান-ভাত, ডাকের কামাই নেই, লুচি-পোলাউ ভোজ খেতে ডাকছে যেন হারামজাদি।

ভোঁ করে কেঁদে ওঠে হারাণি কলের দড়ি-টানা বাঁশির মতো, যুবতি মেয়ের মনটা যেন চড় খেয়ে কেঁদে-ওঠা শিশুই আছে এখনও, আর নাক দিয়েও তার সিকনি নামে সেই ছেলেবেলার মতো, নাক টেনে টেনেও সামলাতে পারে না। মরণ ঠেকাবার উপায় খোঁজার জন্য জড়ো এই চাষির আসরে যেন ছেঁড়াতালি কাপাসে আধঢাকা রোগা রুগ্ণা মূর্তিমতী বিঘ্ন। পুরাণে নজির আছে, পিনাক সামন্ত, ভাবে খুশি হয়ে, অর্জুনের তপস্যা ভাঙতে এমনি ভাবে এয়েছিল উর্বশী—মেয়েগুলো মরে না, এই যুবতি মেয়েগুলো ?

আমি ডেকেছি ? মা বলল না ডাকতে ? নিজে যদি এসে ডেকে থাকি তো—নাকের জল চোখের জল খেতে খেতে কথা বলতে গিয়ে বিষম লাগে হারাণির। আচমকা অন্দরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঠাস করে গালে তাব একটা চড় বসিয়ে দয়া তাকে ভেতবে টেনে নিয়ে যায়।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে ভূষণ বলে, শহরে ছিল বছর দেড়েক দুযেক। দুর্ভিক্ষের ফলে পুষতে পারিনি, মোর যে দাদা দুকান করে শহবে, তার ঠেঁয়ে পাঠিয়েছিনু মরতে। এমনি দশা হয়ে ফেরত এয়েছে মেয়ে। কী ·াকি ব্যারাম হয়েছিল— শহুরে ব্যারাম।

কি দুকান করে হে নয়ন শহরে ? একজন শুধায়।

চুপ করে থাকে ভূষণ।

শুনি তো কত কাল নয়ন না কি দুকান করে, তা দুকানটা কীসের ?

কী জানি কীসের দুকান। এবাব রেগে বলে ভূষণ।

আঃ হাঃ, তোরাব বলে জোর দিয়ে, দুকানেব কথা যাক। ধবণীর দুটো খামারের ধানের কথা বলাবলি, উয়ার মদ্যি দুকান ! কী দুকান, কীসেব দুকান। কাজের কথা কও। সাতনালার খামারে লোকজন বেশি রয় না।

শুনে সবাই আবাব ধাতস্থ হয়ে গুম খায়। ধরণীর একটা খামার আছে সাতনালায়। ধান বোঝাই খামার। তা সে খামার তো আগেও ছিল, এখনও আছে, কী তাতে। সবাই জানে আজ এই মরিয়া বেপরোয়া মানুষগুলির আসরে ধরণীর ওই ধান বোঝাই খামারের কথা ওঠার মানে কী, খামারে লোকজন বেশি থাকে না এ কথা বলারও মানে কী। তবে কি না, যার যাব মনে মনে বোঝা কথাও সবার মিলেমিশে একসাথে একভাবে বোঝা তো দরকার।

তা বটে, রাজেন বলে, উয়ার খামাব-ভরা ধান, মোদের দুর্দশা।

ধানে উয়ার স্বত্ব কী ?

লুঠের ধান না ?

আসলে মোদেরই ধান তো, না কি বলো ?

গায়ের জোরে কেড়ে নেছে বই ত না ?

এ তো একই কথা, ঘুরিয়ে বলা। এত দূর এগিয়েও পরের কথাটা জিবের ডগায় এসে আটকে আছে অনেকের। ধীর, অতি ধীর জীবন এদের—অকালে বুড়িয়ে ঝরে যায়, তবু ধীর। ঘুম ভাঙে হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে, সন্দ করে যে সত্যি রাত শেষ না চাঁদের আলোর আভা বাইরে—না, ভোরই হচ্ছে, কাকের ডাক শোনা যায়। মাঠে গিয়ে লাঙলের ফলা মাটিতে ডারায়, ফসলের আশা তার কাল নয়, পরশু নয়, মাসকাবারে নয়, সেই ফসল ফলাবার পর। ধৈর্য ছাড়া তার কি চলে, ধীর না হয়ে উপায় আছে ?

শেষে মোহন বলে, ধান যদি মোদের, কেড়ে নিতে, লুঠে নিতে পারি না মোরা ? না, ওটা ধরণীদের একচেটে কারবার ?

বলি কী, রাজেন তখন বলে, কথাটা বিবেচনা করি এসো মোরা। লুটে আনতে চাও যদি তো চলো যাই আজ রাতেই হানা দি সাতনালার খামারে। তবে কি না হাঙ্গামা হবে তা বলে রাখি, বিষম হাঙ্গামা হবে। তখন দুষো না মোকে।

সেই যেন এতক্ষণ ধরণীর সাতনালার ধানের খামার লুঠ করার প্ররোচনা দিচ্ছিল সকলকে, পরামর্শটা গ্রাহ্য হওয়ায় সাফাই গেয়ে রাখছে হুঁশিয়ারির। ঘরে কাটা চরকার সুতোয় মদন তাঁতিকে দিয়ে বোনানো খদ্দরের কাপড় আর কামিজ গায়ে সতেরো দিন হাজত খেটেছিল রাজেন। বিয়াল্লিশে ঘোষণা করেছিল, গান্ধীজি স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে, স্বরাজ এসে গিয়েছে। আর ভয় নেই।

এনতার খুশি হয়ে বলে, হাঙ্গামার কমতি কোথা ? হাঙ্গামা ছাড়া কদিন কাটে ? ঘর তো করি হাঙ্গামা নিয়ে। রামপুরে মোর চাচা থাকে এ গোস্তাকির মাপ নেই, পরশু রোজ তাই হানা দেয়নি মোর ঘরে ? হাঙ্গামার কথা বলো না দাদা, ওটা খোদার নজরানা।

কী আর হবে হাঙ্গামায় ?

কচু করবে মোদের, যা করার করেছে।

মারবে তো ? মারুক। মরেই আছি।

হাঃ, মরে আছি। কেন বাবা মরে রইবো ? খালি খালি মরে রইবো ? মারতে জানি না দুঘা দিয়ে।

বলি কী, রাজেন বড়ো গম্ভীর, গলার আওয়াজ গমগমে, চলো তবে আজ রাতেই যাই। কথা তবে শুনে রাখো কিন্তু, লুঠবো গিয়ে একসাথে, তার পর যা ঘটবে সবই মোরা একসাথে তার দায়িক। ধান নিয়ে চটপট সরে পড়বে। ঘরে রাখবে না ধান।

কোথা রাখব ? একজন শুধায়।

তাও জানো না ? রাজেন বলে হতাশায় অবজ্ঞায়, ধান ফেলে রাখবে বন-বাদাড়ে, ডোবার ধারে। খানিক বরবাদ যাবেই, উপায় কী !

বক্তা

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায় আকাশে। জোরালো শব্দ তুলে ঠিক যেন তেড়েমেড়ে এসেছিল এক পশলা বিষ্টি, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। আকাশ জুড়ে শুধু আছে গর্জন আর আলোর চমক।

ঘুঁটেগুলি ঘরে তুলতে সাহায্য করেনি তাই কাসা গর্জে গর্জে গাল দিয়ে যায় একটানা আকাশে জলহীন ভাঙা ভাঙা ভাসা ভাসা মেঘের গজরানির মতো। একটানা অফুরন্ত। দোংড়া হাসি মুখে দাদ চুলকায় বসে। কথা বলাই তার নেশা আর পেশা। কিন্তু বউ গজরাতে শুরু করলে সে চুপ মেরে যায়, তার এই বস্তির পৃথিবী যেন তাকে রাজা করেছে সে বোবা বলে ! শুধু দাদ চুলকোয়। দু হাতের আঙুলগুলি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হয় পিঠ থেকে পেটে, পেট থেকে উরুতে, উরু থেকে পায়ের গোছায় পাছায় ঘাড়ে, পায়ের আঙুলের চিপায়। পায়ের আঙুলের চিপায় দাদ নেই, অন্য চুলকানি।

সুব্বা বোতল নিয়ে এলে সে এতক্ষণ পরে ঝকঝকে দাঁতগুলি বার করে ঠোঁট ফাঁক করে একরাশি খুশিব হাসিতে। বোতলটা আয়ত্ত করে বেড়া ঘেঁষে শুইয়ে রেখে কাঁচা বদগন্ধি চামড়াটা চাপা দিয়ে আড়াল করে বলে, শালিকে চুপ করা দিকি, মরদ বুঝব।

মারব টেনে এক—? সুব্বা শুধায় নেশার ঝোঁকে। আজ তার ভীষণ পরীক্ষার রাত্রি। বোতল এনেছে, ভোগও এনেছে, তবু টেনে এসেছে নিজে নিজে।

গৌঁড়িকে চিরকালের জন্য বশ করার কায়দা-কানুন দাওয়াই সালাই বাতলে দেবে দোংড়া, বাঘিনির সঙ্গে সাত বছর বসবাস ঘর সংসার করেছিল যে সিংজতকা তার একটু করে হাড়ও তাকে দেবে।

মারলে হাঙ্গামা হবে।

বেশ তো। আচ্ছা তো ঠিক করে দিব।

কাঁচা বয়সের জোয়ান, গোঁ কত। হাসি আসে দোংড়ার পিছুপিছু গিয়ে সে বেড়ার ফাঁকে চোখকান পেতে দ্যাখে শোনে কাসাকে ঠান্ডা করার তার ছেলেমানুষি কায়দা কতটা সফল হয়। গোড়ায় তেজ কত সুব্বার জোর কত !

অত গোসা কেনে গো মাসি !

মরনা কেনে ? মর গা যা।

রয়ে সয়ে মাসি, যা বলতে আলাম শোন আগে, তারপর নয় কেমড়ে দিযো। তবে কিনা হাঁ, গোসা করলে খাসা দেখায় বটে তুমায় মাসি, মন করে কী তুমায় বাগিয়ে নিয়ে বনে পালাই।

হাঁ বটে ? তা বনে পালিয়ে কাজ কী। নে না মোকে, এখনি নে না বাগিয়ে।

মস্ত জোয়ান চেহারা কাসার, দু হাতে সাপটে নিয়ে সে পিষে চেপে ধরে সুব্বাকে, হাঁসফাঁস করে ওঠে সুব্বারও প্রাণ পাঁজরা দুই-ই।

মাল টেনেছে ছোঁড়া ! কাসা বলে মুখ বাঁকিয়ে। রাগত মাসির বাড়তি জোর কিন্তু যেন খানিকটা ঢিল হয়ে আসে তার হাতে, বুকে পিষে চ্যাপটা করে দেবার মতো জোরে সে আর চেপে ধরে রাখে না কাঁচায় পাকা রোগা ছোঁড়াটাকে।

মোকে কী বলবি যে ?

মাল এনেছি। একটো মুরগি !

হাত দুটো গলায় জড়াতে গেলে কাসা একটু অবাক হয়ে মুচকে হেসে ঠেলে তাকে সরিয়ে দেয় তিন হাত পিছনে।

গৌঁড়িকে বাগাতে মাল এনাছে মুর্গি এনাছে, মোর সাথে পিরিত করতে চায়। যা, মরগা যা গৌঁড়ির কাছে।

বলে সে খলখল করে হাসে।

দোংড়া গা চুলকায় আর হাসে, বলে, দেখলি ?

কেনে, চুপ মারাইনি উয়াকে ?

তা নয়। গায় জোর দেখলি হাতির মতো ? বিড়ি ধরানো বন্ধ রেখে খ্যা খ্যা করে দোংড়া হাসে শেয়ালের আওয়াজে।

সুব্বা তাকায় সন্দিগ্ধ চোখে, তার ভয় হয়, অবাক লাগে।

তু জানলি কিবা ?

চোখ মুদে দেখলাম। দোংড়া বলে অবজ্ঞার সুরে। চোখ মুদে ভুঁয়ে এমনি লাগাবো আঙুল, গায়ের গন্ধ যার জানি সে যেথা থাক ভুঁয়ে দেড়িয়ে, নজরে এসবে। আব জলে যদি রয় তো জল ছোব চোখ মুদে, সমুদ্দুরে ডুবে থাক নজরে এসবে।

চোখ পিটপিট করে দোংড়া যেন দ্রুত মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে যাচ্ছে চোখের পাতা নেড়ে।—সাপে কাটল গুরুকে। আগে হুকুম দিল গুরু, নয় তো তাকে কাটবে এমন সাপ কুথা আছে জগতে ? বাঁচা দোংড়া, কালসাপে কেটেছে, গুরু বললে মোকে। মোকে যাচাই করবে আর কী, না তো দশ-বিশটা কালসাপে কাটলে কী হবে তার, বিষ বেরিয়ে যাবে ঘামে। কালসাপ কাটলে যেমন যেমনটি করন আর যেমন যেমনটি না করন সব করলাম আর না করলাম ঠিক ঠিক, একটুকু খুঁত হল নাই, ভুলচুক। গুরু বললে মোকে বাঁচালি দোংড়া, বড়ো বিদ্যা দিব তোকে। এই বিদ্যাটা শিখাই দিলে। মাটিতে আঙুল ছুঁয়ে দূরের মানুষ নজরে আনা।

বিড়িটা ধরিয়ে উদাসভাবে দোংরা টান দেয়, ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ে।

যা যা বলেছিলাম ঠিক ঠিক কর‍্যাছিস ?

হাঁ। ভুলচুক নাই।

গৌঁড়ির চুল এনাছিস তিনগাছ, মাড়ানো মাটি ? ষাঁড়ের লোম ? আর সেই সেটা ?

দোংড়া শুধিয়ে যায়, সায় দিয়ে যায় সুব্বা।

সেটা দিলে কে ?

গাবার বউ। গিয়ে চাইতে না এই মারে তো সেই মারে, ওস্তাদের শাপ লাগবে ভয় দেখাতে রাজি হল।

গাবার বউ। চিন্তিত মুখে বলে, দোংড়া, গাবার বউ ? ছেলা হইছে একটা। আর কারুকে পেলি না, ছেলা পিলা হয়নি ?

আঁ ? সুব্বা আঁতকে ওঠে, সামান্য ভুলের জন্য এত হাঙ্গামা এত পয়সা খরচ সব ভেস্তে যাবে !—তু কেন বললি না উ কথা ?

দোংড়া ভরসা দিয়ে বলে, ঠিক আছে। হবে খন যা। একটুখানি কমজোরি হতে পারে তুকটা, তা কাজ চল্যা যাবে উয়াতে। পরের ঘরের মেয়া বউ হলে ভাবনা ছিল। নিজের বউ তো, ঢের হবে উয়াতে, ঢের। পা চাটবে বশ হয়ে।

কাসা ইদিক-সিদিক কথা কয় না, সোজা দাবি জানায়, বোতল কই ? বোতল দে।

শুদ্ধাই হয়নি যে ? দোংড়া বলে ভয়ে ভয়ে।

শুদ্ধাই কর ? আটক কীসের শুনি তা ? মতলব জানি তুমাদের। ইদিকে ঘুমাব, দিন ভোর খেটেছি ঘরে বাইরে, ভোঁস ভোঁস ঘুমাব, বোতলটি খুলে তুমরা সাবাড় করবে দুজনায়। কী শুদ্ধাই, মোর সামনে করো।

সুব্বাও জানে কাসার ঘুমোবার অপেক্ষায় আছে দোংড়া। বাইরে খেটে পয়সা কামায় কাসা পেটের জন্য, দোংড়া যা ভরণ-পোষণ জোগায় তাতে তার পেট ভরে না। এত খাটে কাসা যে রাত জাগতে পারে না, মড়ার মতো ঘুমোয় রাত বেশি বাড়বার আগেই বিছানা নিয়ে। কাসা ঘুমানো পর্যন্ত দেরি না করে সুবিধা নেই। তার জাগন্তে বোতল খুললে একা সে আদ্ধেকটা গিলবে।

প্যাঁচার ডাক না শোনাতক—

শুনেছি ডাক। ওদিকে ডেকেছে, জামগাছটায়। শুদ্ধাই কর, এসতেছি।

শুদ্ধাই-এর প্রক্রিয়া শুরু করতে করতে দোংড়া খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, দেখছি ? ও মাগি মোষের মতো গুঁতোয় ! হাড়পাঁজরা ভাঙে নাই তো তোর দুটো একা ?

কুথা এত জোর পায় ভাবি।

খায় যে, গা চুলকে চুলকে বলে দোংড়া বলার মতো কথা পেয়ে, মোর চেয়ে দুগুণা তিনগুণা খায়, ভালা ভালা জিনিস আনে, একলাটি খায়। খাও তো সব না খাও তো কিছু নাই। গুরু গুণ দেছে তাই, না তো উয়াকে বশে রাখতে পারতাম মুই ? যদি না গুনিন হতাম, মানুষ হতাম তোর মতো ? হাঁ হাঁ বাবারাম, গুনিন না হলে মোকে চুষে লিত দশ দিনে, ছাবড়িয়ে দিত, মেরে দিত একদম। গুনিন বাদে খাওয়া সব, উ ছাড়া কিছু নাই।

হাতের দশটা আঙুল সারা গায়ে চুলবুল চুলকে বেড়ায়। বক্তৃতা যত জোরালো হয়, তার চুলকানি তত বাড়ে।

পেট ভরে মাছ্ দুধ খেলে তোর তেজ কত, জুৎজুয়ানি কত, কাজে তেজ, বজ্জাতিতে তেজ। দুটো দিন উপোস দে, ভালা কাজে ঝিমঝিমোবি, বদ কাজে ঝিমঝিমোবি, কুথাও গা নাই, সাড় নাই। শালা বোকা বুঝিস না সিধা কথা ? দুটা দিন উপাস করে বলিস দিকি গৌড়িকে একবারটি কাছে এসো—গৌড়ি এসবে, হেঁসে হেঁসে টিটকিরি দেবে রাত ভোর ! হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে এবার অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার হয় দোংড়ার মুখ থেকে। শুদ্ধাই-এর প্রক্রিয়া চটপট সাববার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সবটা না করলেও অবশ্য চলে। সুব্বা টেরও পাবে না কি প্রক্রিয়া বাদ পড়ল কিন্তু দোংড়া নিজেই যে পারে না যা এসেছে করে বরাবর, করতে করতে পুরুত ঠাকুরদের পুজো আচ্চার মতো যা তার অভ্যাসে আর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তা কেটে ছেঁটে ছোটো করতে ! তাতে দোষ হবে। রাগ করবে আঁধারের জীবরা। সুব্বার মতো যারা আসে তার কাছে তাদের মনে খটকা লাগবে তার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে।

কথা সে বলে যায় সমানে।—গুনিন বাদে আর সবার খাওয়াই সব। আরে শালা, কেষ্ট ঠাকুর যে দশ-বিশ হাজার গয়লা মেয়েকে মজুত রাখত রাধা সুদ্ধু, সে শুধু ক্ষীর ননী সর খেত বলে, ঘরে খেত, ফের পরের ঘরে চুরি করে খেত, তবে না ! খেতে যদি পেতিস জুত করে তো কি এসতিস মোর কাছে এ তুকের জন্যে, এমনিতে গৌড়ি তোর বশ থাকত, পা চাটত দু বেলা !

ক্রিয়াকর্ম শেষ হবার আগেই কাসা এসে পড়ে চুপচাপ একপাশে বসে থাকে, কথা কয় না, বাধা দেয় না। সময় মতো জ্বলন্ত অঙ্গারটাও সে দোংড়াকে জুগিয়ে দেয় বরাবর যেমন কৌশলে দিয়েছে তেমনিভাবে।

সিংহীকে বশ করে যে মহাপুরুষ অনেক বছর সিংহীর সঙ্গে বসবাস করেছিল তার হাড়ের টুকরোটি হাত পেতে নিতেই জ্বলে পুড়ে যায় হাতের তালু সুব্বার !

ফেলে দিলি ! ফেলে দিলি ! আর্তনাদ করে ওঠে দোংড়া।

বিড়বিড় করে বলে, তেজ ফারাক হয়ে গেল, ভাগ হয়ে গেল। শালা তু কেমন মন্দ ? থাম্ বোস চোখ বুঁজে। কুড়িয়ে আনি, তেজ খানিক দি তোকে।

হাড়ের টুকরোটি কুড়িয়ে এনে সে সুব্বার হাতে দেয়। জ্বলন্ত অঙ্গারটি পিষে গুঁড়ো হয়ে নিভে গিয়ে মিশে গেছে উঠোনের মাটির সঙ্গে।

হল না কি ? কাসা শুধোয়।

হাঁ। সব ঠিক আছে। এ শালা মাটি করলে সব। শালা হাতে পেয়ে—

বক্‌বক্ ! বক্‌বক্ ! সিংহীর মতো গর্জে উঠে কাসা, চুপ যা। সিলাই কর ঠোঁট। আর যদি কথা বলবি তো তোর মুখটা মোর চট সিলায়ের ছুঁচ দিয়ে সিলিয়ে দিব। খোল বোতল !

এক-আধবোতল নিজের গলায় ঢালে না কাসা, মাল সে নেয় খুব কম। আশ্চর্য হয়ে সুব্বা দ্যাখে কী, দোংড়াকেই সে খাওয়াচ্ছে বেশি বেশি করে। তাকে পর্যন্ত কম দিচ্ছে। একবার সে প্রতিবাদ জানাতে যায়। কাসা হাত বাড়িয়ে গালটা তার টিপে দেয় জোরে। ব্যথায় কাতরে উঠেই নেশায় সামলে নিয়ে সে চোখ ঠারে কাসাকে।

এ ন্যাকামিতে গোসা করে কাসা বলে, মর না কেনে ? যা মরগা যা।

তখনও আলোয় চমকে চমকে আওয়াজে গর্জে গর্জে বিদ্যুৎ খেলছে আকাশে।

দেবরাজ ইন্দর ব্যাটা, দোংড়া বলে যায় জড়িয়ে জড়িয়ে, এমনি কাণ্ড করে অখন তখন খেয়াল হলি পর, মানুষটা খেয়ালি ভারী, উঁহু, মানুষ না মানুষ না, দেব্‌তা দেবরাজ, কথাটা কী যে তেনা মান্‌ষের মতো খেয়ালি, হাওয়া গাড়ির রেতের বাবু। তাই কয়ে কী, দু ফোঁটা বিষ্টি দিয়ে বলে, বাস্। বজ্জর নিয়ে লুটোপুটি খেলা করে আকাশে। বেম্মার বারণ আছে, হাত ফসকে বজ্জর যদি ভুঁয়ে পড়ে তো পেলয়ের আগেই দফা শেষ পিথিমির। তা মানা কী মানে সে না মানতে পাবে, রাজা, সে দেবতার রাজা, মানা করলে খেপে বলে কী যে দুত্তোরি তোর মানার নিকুচি করেছে, চালাও হাওয়া গাড়ি চালাও, জোরসে ! ওর স্বভাব এমনি তো কী করবে ও বেচারা ! চিরকালডা এমনি ও শালা, জুয়ান বয়স থেকে। শিখতে গেছে ওস্তাদের কাছে, সে মস্ত ওস্তাদ, গোতম ওস্তাদের নাম নিয়ে চান করলে রাজার রানির গভভো হত। ধম্মো মানা করলে, গোতমের বউটা বড়ো ইয়ে মতো, তড়বড়াতে যাসনি ইন্দর তার সাথে। দরকার কি ছিল বাপু তোর গায়ে পড়ে মানা করার ? তুই ধম্মো, তুই কি জানিস না ইন্দর মানা মানে না, যা মানা ঠিক তাই করে, না তো সে রাজা কীসের, দেবতার রাজা ? গোতমের বউটা তড়বড়ায়, নামটা কী যেন ছিল তার, আউলা সতী ? হাঁ, আউলা সতী, তা, আউলা সতী তড়বড়াক, ধম্মো মানা যদি না করতো তো ইন্দর শুধু শিস-টিস দিত, চোখ চেয়ে বলত হুররে, জয়হিন্দ, এক পাত্তর সুধা টেনে আউলার চুলে এক থাবড়া বসিয়ে গোতম ওস্তাদের কাছে যেত বিদ্যে শিখতে। বুড়ো বেতোরুগি, শুধু মানা করে করে ধম্মো বজায় রেখেছে চিরটাকাল, সবাইকে শুধু মানা করা তার কাজ। সে কেন পারবে দেবরাজ ইন্দরকে মানা না করে ? আউলা তড়বড়ায়, ইন্দর ভাবে, ধম্মো মানা করেছে। ভাবে, মানা করেছে ? মোকে মানা করেছে ? দুত্তেরি ধম্মো, দুত্তেরি মানা ! আউলা তড়বড়ায়, সেও গিয়ে তড়বড়ায় তার সাথে। ওস্তাদি শেখে না কিছু। শিখলে কি এমন ফ্যাসাদে পড়ে দৈত্য মারা নিয়ে, অস্থি মুনির পা ধরে কেঁদে বজ্জর আনতে হয় ? আউলার সাথে তড়বড়াতে তড়বড়াতে ইন্দর দ্যাখে কী, হায় সর্বনাশ, গর্মি হয়ে ঘা হয়েছে সারা গায়ে। ধম্মো কেন মানা করেছিল তা টের পেয়ে হাপুস চোখে কাঁদে ইন্দর। শুধু কাঁদে আর কাঁদে। এত কাঁদে যে তার চোখের জল বিষ্টি হয়ে পড়ে পিথিমিতে। বিষ্টি হতে চাষিরা জমি চষে চাষ শুরু করে দেয়, ভাবে ফসল যদি—কাশতে হওয়ায় একটু থামতে হয় দোংড়াকে।

খা না কেন ? কাসা তার মুখে তুলে ধরে মাল ভরা ভাঁড়টা।

আকাশে শুধু চমক আর গর্জন। পূর্ণিমা কদিন পরে, চাঁদ গেছে আড়ালে তার পাত্তা নেই। দূরে ওই সড়ক বেয়ে চলেছে দুটো দুটো জ্বলজ্বল চোখ মেলে ধবধবে সাদা আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে চাকাওলা কলের গাড়ি।

দেখছিস ? দু ফোঁটা বিষ্টি দিয়ে এমনি খেলা করে ইন্দর, ব্যাটা দেবতার রাজা। দে না বেটাচ্ছেলে, জল দে না আরও দু ফোঁটা, মাঠে ধান হোক ? লাখ গন্ডা লোক যে শালা মরে গেল না খেয়ে ? না ! না !—বীভৎস আর্তনাদ করে ওঠে দোংড়া ! সুব্বা চমকে ওঠে, কাসা আরও কাছে ঘেঁষে যায় দোংড়ার। সুব্বাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, ঠিক আছে। ইবারে ঘুমাবে।

কাসা আরেক ভাঁড় তুলে ধরে দোংড়ার মুখে। তৃষাতুরের জল খাওয়ার মতো দোংড়া সেটা শুষে শুষে নেয়। কাসার কাঁধে একটা হাত রেখে আবার বকতে শুরু করে। এবার সে কথা বলে আস্তে আস্তে জড়িয়ে জড়িয়ে, চোখ বুজে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

ইন্দরটা এমনি। পরান নিয়ে খেলার শখ। দে না বাবা দু ফোঁটা জল, চাষ করি ? না ! না ! এবার আর্তনাদ ফোটে না দোংড়ার গলায়, সর্বাঙ্গে ঝাঁকি দিয়ে আঁতকে উঠে সে মৃদু ফোঁসফোঁসানির মতো বলে যায়, না না, বিষ্টি চেয়ো না ও যেয়ো রাজার ঠেঁয়ে। দু ফোঁটা বিষ্টি চাইলে ও লুচ্চা বন্যা দেবে। সব ভেসে যাবে। ঘর দোর খামার ভেসে যাবে। মাইরি বলছি কাসা—

কাসার বুকে মাথা রেখে গুটানো পা দুটো এবার সামনে মেলে দিয়ে দোংড়া একটা মস্ত হাই তোলে, চোয়াল ভাঙা হাই। সে ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত সে কথা কয়, অনর্গল কথা কয়। ঘুমোলে এমনি একটা হাই তোলে।

কাসা হেসে বলে, রাত ভোর ঘুমাবে। বজ্জর পড়লে জাগবে নাই। আর।

ঘর ও ঘরামি

সারারাত বৃষ্টি পড়িয়াছে, কখনও টিপিটিপি, কখনও ঝমঝম। ভোরে দেখা গেল আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। অন্যদিন রোদ উঠিলে পৃথিবীকে কেমন দেখায় আজ যেন মনে পড়িতে চায় না ; আজ চারিদিকে হাসির ছড়াছড়ি। সমতল মাটির উপর যা কিছু মাথা উঁচু করিয়া আছে, ঝোপঝাড় আর বড়ো বড়ো গাছ, লাউ কুমড়ার মাচা আর শন ও খড়ের ঘর, সব কিছুর গায়ে ঝরিঝরি অবস্থায় অসংখ্য জলবিন্দুতে অস্থায়ী ঝিকমিকি। একটি ফোঁটা ঝরিয়া গেলেই চুয়াইয়া চুয়াইয়া আরেকটি সেখানে ঝুলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে টুপটাপ শব্দ, কেবল মাঝে মাঝে বাতাস সাড়া দিয়া গেলে ঘরের পিছনের প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটির নীচে ঝরঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে।

ঘরের মধ্যে এখন আর জল পড়ে না। রাত্রে পড়িয়াছিল, মাঝরাতে শুরু করিয়া ভোর হওযার আগে পর্যন্ত। বৃষ্টির দেবতার মুয়ে আগুন—এমন শত্রুতা তিনি ভামিনীর সঙ্গে করেন। বাতিতে তেল ছিল, দেশলাইয়ে কাঠি ছিল না। অন্ধকারে আন্দাজে কী ঠাহর হয় ঘরের কোনখানে জল পড়িতেছে না, পিঠ পাতিয়া পরীক্ষা করিয়া কত কষ্টে শুকনো কোনাটি বাহির করিয়াছে। তারপর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সেখানে জিনিসপত্র জড়ো করা। বটিতে পা একটু কাটিয়া গিয়াছে গলাটা কাটিল না কেন ? একেবারে দু ফাঁক ! আজ হোক কাল হোক ও বঁটি দিয়া নিজের গলা তো কাটিতে হইবেই, রাত্রে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া সে হাঙ্গামা না হয় চুকিয়া যাইত, হাড়ে বাতাস লাগিত ভামিনীব !

কামিনী বলিল, বালাই ষাট ! অমন কথা কইতে নেই দিদি সক্কালবেলা। তা ঘবটা ছেয়ে নিলে হত।

কে ছাইবে ?

ওমা, কী গো ! দশ গাঁয়ের ঘর ছাইছে যে ঘরের মানুষ তোমার।

পরাশর তাড়াতাড়ি বলিল, ছাইব, এবারে ছাইব, পেথম বর্ষা নামল, কে জানে শালা ঘরের চালা জল ধরে না।

হ্যাঁ বটে ? জানতে না তুমি ? আর বাদলায় জল পড়েনি ঘরে ?

তা পড়িয়াছিল, মোটে দু-চারফোঁটা জল পড়িয়াছিল। তাই পরাশর তেমন ব্যস্ত হয় নাই। যা দাম খড়ের ! এবার নিশ্চয় ঘরের চাল মেরামত করিবে, দু-চারদিনের মধ্যে। কামিনীর স্বামী জগৎ হাসিতে আরম্ভ করিলে ভামিনীর অন্ধকারক্লিষ্ট মুখেও হাসি ফুটিয়া ওঠে। কামিনী মাথাটা একটু কাত করিয়া তার দিকে চাহিয়া থাকে। তার চোখেমুখে প্রশ্রয় ও সহানুভূতি। বিশ্বনিন্দিত দুরন্ত অকেজো ছেলের দিকে চাহিয়া মা যেন ভাবিতেছে, তোর মতো কে আছে সংসারে, যে তুই শুধু আমার আমার আমার ?

ভামিনী জগৎকে বলে, দেখছ ত ? শুনছ ত ?

জগৎ ভামিনীকে বলে, দাদা চিরডা কাল এই মতো। আর তা যদি বল তো তোমার এ বুনটিও কম লয়। মন খালি ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ছে পাখির লাখান। কাজ যদি করবে তো একদম লন্ডভন্ড কাণ্ড, নয়তো কীসের সংসার, কীসের কী, হেথা যাচ্ছেন, হোথা যাচ্ছেন, বসে বসে গান গাচ্ছেন। ছেলেটা ভুঁয়ে পড়ে কেঁদে সারা, একবারটি কোলে নিতে কষ্ট।

জগৎ ধীরে ধীরে কথা বলে, তার আপশোশও যেন ধৈর্য দিয়া গড়া। কুটুমবাড়ি আবার মেরজাইটি গায়ে দিয়াছে, তাতে তাকে দেখাইতেছে সংসারধর্মের ব্যবস্থাপকের মতো। জগতের কথা শুনিতে শুনিতে তীব্র ঈর্ষা আর ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ভামিনী বারবার কামিনীর দিকে তাকাইয়া থাকে।

কচি কচি পায়ে তার স্তন ঠেলিয়া কামিনীর ছেলে তার কাঁধ ডিঙাইয়া ওপাশে গিয়া পড়িবার চেষ্টা চালাইয়া যায়। দু হাতে আঁকড়াইয়া সে তাকে সেইখানে ধরিয়া রাখে।

কাল রাত্রেই জগতের জন্য মন্ডা আনিয়া রাখা হইয়াছিল, ভামিনী তাকে পিতলের থালায় কেনা মন্ডা আর ঘরের তৈরি লাড়ু ও মোয়া খাইতে দিল। তারপর জগৎ বিদায় হইয়া গেল। কাজের মানুষ সে, তার কাজ আছে। কাজ সারিয়া দুপুরে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবে।

ভামিনী বলিল, শিগগির এসো, চট করে। রসুই সারতে কতখন। পরাশর বলিল, বিড়ি আছে নাকি আর ?

আগেই জগৎ তাকে পরপর অনেক বিড়ি দিয়াছে, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এবারও দিল। ভামিনীর মুখে যে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিল তার তুলনা হয় না। বিড়িটা ধরাইয়া পরাশর সজোরে টান দিতে চড়চড় করিয়া অর্ধেকটা পুড়িয়া গেল। তামাক বিড়ির ধোঁয়াতে তার সুন্দর গোঁফজোড়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কামিনী বলিল, বিড়ি খেতে পার বটে তুমি, হাঁ।

ঘরে কাদা হয় নাই, মেঝেতে ভামিনী গোবর মাটির পুরু ও শক্ত আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে, জল বাহির হইবার ব্যবস্থাও ভালো। জিনিসপত্র বাহির করিয়া ভামিনী রোদে দিল। কাঁথা বালিশ চাপাইয়া দিল গোয়ালের নিচু চালটায়, এখানে ওখানে বাঁশ বাহির হইয়া পড়ায় বালিশ আটকানোর অসুবিধা নাই। সমস্ত বাড়িটার ছন্নছাড়া শ্রীহীন ভাবের রূপকের মতো দেখায় শূন্য গোয়ালটিকে, দেখিলে দুঃখ জাগে, একটি অনির্দিষ্ট দুর্বোধ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে ইচ্ছা হয়।

আমি ঘর গুছোই দিদি। ঘাটে যাবে বলছিলে, সেরে এসো গে, যাও।

ভামিনী বাসন হাতে ঘাটে চলিয়া গেল। লুকানো দুটি থালা, দুটি গেলাস আর তিনটি বাটি বাহির করিয়াছে, কুটুমের কাছে আজ কোনোরকমে মান বাঁচিবে। কামিনীর অনেক বাসন আছে, জগৎ তার বাসন বাড়ায়, কমায় না। ঘাটের পথে কাদায় ভামিনীর পা ডুবিয়া যাইতে থাকে। কাদায় আরও অনেক পায়ের ছাপ আঁকা আছে। ঘাটের কাজ সারিয়া সকলে বোধ হয় ফিরিয়া গিয়াছে। ভামিনীর আজ বড়ো দেরি হইয়া গেল। ঘরের কাজে দেরি হইলে, সময়মতো নিখুঁতভাবে ঘরের কাজ সারিতে না পারিলে ভামিনীর কষ্ট হয়, বাঁচিয়া থাকায় যেন ফাঁকি পড়িতেছে।

কামিনী বলিল, ছেলেকে ধরো, ঘর গুছোই।

পরাশর বলিল, আমার ছেলে নয়, কাঁদবে।

পরিহাসে খুশি হইয়া কামিনী মুখের একটা ভঙ্গি করিল। ছেলেকে শোয়াইয়া দিয়া ঘরের কোণে জমা করা হাঁড়ি, ভাঁড়, টিনের কৌটা ইত্যাদি জিনিসগুলির মধ্যে একটি হাঁড়ি শিকায় তুলিয়া রাখিল। ঘর গুছানোর এই দায়িত্বটুকুই সে যেন চাহিয়া নিয়াছিল। দক্ষিণের ছোটো জানালার কাছে গিয়া বাহিরে চাহিয়া ডাক দিল, দেখবে এসো।

রোয়াক হইতে পরাশর সাড়া দিল, কী দেখব, আঁ ?

এসেই দ্যাখো না বটে নিজে ?

পরাশর উঠিয়া গিয়া দেখিল বিলের ধারে মাছের আশায় কুড়ি-বাইশজন লোক জমিয়াছে। বিলে অনেক মাছ, আজ সুযোগ পাইয়া ছিপ হাতে, কেঁচো হাতে লোভী মানুষ তাদের আয়ত্ত করিতে আসিয়াছে। বিলের দক্ষিণ তীরে ঘেঁষাঘেঁষি কতকগুলি ঘর, অনেকদিন আগে ওই ঘরগুলির চালা পরাশর ছাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। জমি ও ঘর ধার দিয়া বাবুরা নূতন প্রজা বসাইয়াছিল, বাবুদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া দল বাঁধিয়া পরাশর সাত দিনে সমস্ত ঘরের চালা বাঁধিয়া দিয়াছিল।

চুক্তির অর্ধেক টাকা কী করিয়া যেন বাতিল হইয়া গিয়াছিল, দলের অন্য ঘরামিরা গাল দিয়াছিল পরাশরকে। ঘরের বাসিন্দারা আজও বোধ হয় বাবুদের ধার শুধিতেছে, এতকালের মধ্যে

কারও চালায় এক আঁটি নূতন খড় ওঠে নাই। তবে নূতন খড় দিবার দরকারও হয় নাই নিশ্চয়। পরাশর যে ঘর বাঁধিয়া দেয় তাতে অত সহজে নূতন খড় দিতে হয় না।

জানি। তোমায় সবাই ডাকে।

এতটুকু জানালা দিয়া দুজনে বাহিরে তাকাইতে গেলে গায়ে গায়ে ঠেকিয়া যায়। একটু আমোদ, একটু উপেক্ষা আর একটু সমতার দৃষ্টিতে পরাশর কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার গালটা টিপিয়া দিয়া আবার বলিল, দুষ্টু মেয়ে।

তারপর রোয়াকে গিয়া ঘরের দুয়ারের সামনে সে বসিল। হাই তুলিয়া বলিল, কতকাল তোর সাজা তামাক খাইনি। এক ছিলুম খাওয়া দিকি কামিনী ?

জগতের কাছে দেশলাইয়ের কাঠি ধার করিয়া রাখা হইয়াছিল। তামাক সাজিয়া দিলে পবাশর আরাম করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, কামিনী খুঁটি ধরিযা দাঁড়াইয়া বহিল। তার মুখের তীব্র বিস্ময়ের ভাব এখনও কাটিয়া যায় নাই। খসিয়া পড়া ঘোমটাটি সে খোঁপায় লটকাইয়া দিয়াছে।

কুমড়ো ডগা রাঁধিস কামিনী, ঝাল দিয়ে।

মাচা ছাইয়া সতেজ কুমড়ো গাছটি এদিকে ওদিকে শূন্যে লিকলিকে ডগা বাড়াইয়া দিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই, জল সেঁচিয়া ভামিনী বোধ হয় বর্ষার চেয়ে বেশি জল জোগাইয়াছে গাছটিকে। বুড়ো গাছে তাই এমন সবুজ পাতা আর কচি কচি ডগা। এবার গাছটি কাটিয়া ফেলিয়া কামিনী পুঁই আব লাউ মাচায় তুলিয়া দিবে।

ভামিনী ঘাট হইতে আসিয়া হাটে যাওয়ার তাগিদ দিল। বোন আর বোনের জামাইকে কুমড়ো ডগা খাওয়াইলে তো চলিবে না ?

এক প-র বেলা হল, যাও এবার।

এই যাই। হাট বসুক ! বাদলা গেছে কাল রাতে।

গ্রামের নিত্যকার তুচ্ছ হাট, ভোর হইতে না হইতে বসে। পরাশবের যুক্তি শুনিযা ভামিনী সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বেতের বাক্সো খুলিয়া টিনের একটি ছোটো বার্লির কৌটা বাহির করিল। নাড়াচাড়ায় শব্দের অভাবে না খুলিয়াই বুঝা গেল ভিতরে কিছুই নাই। দুদিন আগে হঠাৎ পরাশর কিছু রোজগার করিয়া আনিয়াছিল, আজের জন্য তার একটা অংশ ভামিনী কৌটায় রাখিয়া দিয়াছিল। বাকিটা একরকম সঙ্গে সঙ্গেই সে দিন খরচ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরে গিয়া ভামিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

পরাশর বলিল, মরণদশা মোর, কান্না কীসের শুনি ? বলছি পয়সা আছে হাটের, উনি কাঁদতে লাগলেন।

দেখি পয়সা ?

বারান্দার এক প্রান্তে কিছু খড় জমা ছিল, পরাশর খড়ের গাদাটা দেখাইয়া দিল।—নিতাই এসে নগদ কিনে নিয়ে যাবে।

খড় বেচে হাটে যাবে ! এ বেলা যদি নিতাই না আসে ?

পরাশর অবজ্ঞাভরে একটু হাসিল, আসবে না নিতাই ? উয়ার বাপ আসবে। কাল বলে দিইছি পষ্ট করে, সকালে গিয়ে নগদ দিয়ে খড় লিয়ে আসবে, তবে কাল চালায় উঠব তোমার। না এসে যাবে কোথা ?

উ, তুমি ছাড়া ঘরামি নেই দেশে।

পরাশর কথা বলিল না। টান হইয়া গোঁফে হাত বুলাইয়া একবার শুধু উলটাইয়া দিল। জগতের সৃষ্টিকর্তাকে যেন বলা হইয়াছে, তুমিই সব নাও, স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই নিতাই আসিল। তার গায়ে ফতুয়া, গলায় তুলসী মালা। মুখের গোঁফদাড়ি কামাইয়া ফেলায় কানে চুলের গোছা ঝোপের মতো দেখায়। খড়ের দিকে চাহিয়া বলিল, সুবিধে মনে হচ্ছে না তো পরাশর।

পরাশর বলিল, হাঁ বটে ! অমন কথা বলোনি নিতাইদা। মাস কাটেনি এই খড় কুঞ্জ খুড়োকে বেচেছিলে তুমি নিজে। বলেছিলে সব চাইতে সেরা। কাজ করিয়ে কুঞ্জ খুড়ো বললে, পয়সা তো নেই এখন পরাশর ! আমি খড় নিয়ে পাওনা শোধ করলাম।

নিতাই বিষণ্ণভাবে বলিল, অনেক জমে গেছে, বেচাকেনা একদম নেই। তোর এ খড় নিয়ে কী করব ভাবছি।

আমায় বেচে দেবে দুদিন বাদে। ঘর কাল ভেসে গেছে নিতাইদা, চালায় খড় না চাপালে নয়।

গাড়িতে খড় চাপানো হয়, নিতাই ঘনঘন পরাশরের দিকে তাকায়। পরাশরকে কাল অবশ্য অবশ্য কাজ আরম্ভ করিবার তাগিদ দিতেও মনে থাকে না। একটা বিড়ি বাহির করিয়া বলে, লে খা।

পরাশর হাত জোড় করিয়া বলে, তামুকের পর বিড়ি রোচে না নিতাইদা !

খড়ের দাম দিয়া নিতাই চলিয়া যায়।

পাঁচ দিনের মজুরির বদলে খড় পাইয়াছিল, খড়ের বদলে পাইয়াছে পয়সা। পরাশর যেন রাজা হইয়া গিয়াছে। গামছা কাঁধে ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—বলো এবার কী আনব হাট থে। তোর জন্য কী আনব কামিনী ?

এতক্ষণ পরে ভামিনীর মুখে আজ প্রথম হাসি ফুটিল।

এখনও খুকি আছে নাকি কামিনী, এমন করে শুধোচ্ছ ? মাছ এনো বেশি করে উয়ার জন্য, ছুঁড়ি মাছ পেলে কিছু চায় না। যাবে আর আসবে, বুঝলে ?

সত্যই অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘরের চালায় রোদে পুড়িয়া পুড়িয়া রোদের ঝাঁঝে আর পরাশর তেমন টের পায় না, ভিজা পৃথিবী ধীরে ধীরে গরম হইয়া ভাপসা গরম উঠিতে থাকিলে সে বড়ো অস্বস্তি বোধ করে। বাড়ির সামনে আমবাগানের সোজা রাস্তায় জল জমিয়াছে। গাছের ছায়ায় ঝোপ-জঙ্গলের আগাছাগুলি এখনও শাখা ও পাতায় জল ধরিয়া রাখিয়াছে। বাগানের মধ্যে পরাশর খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে, ছপছপ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে কামিনী আসিয়া তার নাগাল ধরিল।

আমার জন্যে এনো একটা জিনিস।

কী জিনিস ?

কী আনিতে বলিবে কামিনী বোধ হয় ঠিক করিয়া আসে নাই। তাই ছুটিয়া আসিয়া হাঁপ ধরিয়া যাওয়ার ছলে ক-বার সে হাঁপাইল, অকারণে একটু হাসিল।

এই গিয়ে আলতা এনো একটা—তরল আলতা।

দুহাতে কামিনী হাঁটুর কাছেব শাড়ি তুলিয়া ধরিয়া আছে, হাঁটুর অনেক নীচে গোড়ালি ডুবানো জল। একটা পা একটু উঁচু করিয়া সে পরাশরকে দেখাইল।—ননদ তাড়াতাড়ি পরিয়ে দিলে, বললে, কুটুমবাড়ি যাবি বউ আলতা পরে যা। জল-কাদায় ধুয়ে গেছে দ্যাখ। আলতা পরে না গেলে ননদ বলবে, কেমন ধারা বোন তোর বউ, পায়ে দুপোঁচ আলতা দিলে না ?

ঘরের জানালার কাছে পরাশর পিছনে ছিল, কামিনী তার মুখ দেখিতে পায় নাই। এখানে তার মুখের একটু আমোদ একটু উপেক্ষা আর একটু মমতাও চোখে পড়িতে কোনো বাধা ছিল না। দেখিয়া কামিনী ঝিমাইয়া গেল, থামিতে পারিল না। আগে, এখন এবং পরে যার একসঙ্গে গতি মাঝখানে তাকে রোধ করবার ক্ষমতা আছে কার ? মানুষ তার জগৎকে শুধু একবার শূন্যে ছুড়িয়া দিতে পারে :

অসহায় বেদনা আর আক্রোশের মর্মে এই সত্যটাই তার গেঁয়ো মনের গেঁয়ো ধরনে অনুভব করিতে কামিনী বলিল, শিগগির এসো হাট থেকে, অ্যাঁ ? তোমাদের সাথে বোসপুকুরে নাইতে যাব। দিদি জানলে মানা করবে—দিদিকে লুকিয়ে যাব। রসুইঘরে দিদি রসুই করবে, ঘাটে নাইতে গেলাম দিদি—বলে বোসপুকুরে চলে যাব। তুমি আগে গিয়ে বসে থাকবে আমার জন্যে। একলা যেতে ডর লাগে, জনমনিষ্যি নেই চারিদিকে।

আরও বলিল কামিনী : দুপুরে আমায় হেথা-হোথা নিয়ে যেয়ো। পরাশর বলিল, কোথা যাবি দুপুরে ?

যেথা যেথা নিয়ে যেতে আগে সেইখানে ?

হাটে গিয়া আগে পরাশর মাছ কিনিল। এত এত সওদা কিনিতে লাগিল যেন ঘরে তার মোটে দুজন অতিথি আসে নাই। তরল আলতার কথা মনে পড়িলে দেখা গেল পয়সা শেষ হইয়া গিয়াছে। ছোটো মনিহারি দোকানটির মালিক ভূধর বলিল, কেন বলছ ? ধাব তোমায় আমি দিতে পারব না। নেবার বেলায় নিতে জান, দেবার বেলায় আজ নয় কাল। তোমায় জানা আছে।

তখন সেইখানে আবির্ভাব ঘটিল বাবুদের গোমস্তা নগেনের। গোমস্তাগিরিতে প্রাচীন হইয়াছে, এখন আর রাগিলেও রাগ করে না এবং রাগ না করিয়াও রাগ দেখাইতে জানে।

ভোর থেকে দুবার তোকে না ডাকতে গেল পরাশর ? কাছারি ঘরে জল পড়েছে, মেজোবাবু আগুন হয়ে আছেন, তোর মতলবটা শুনি ?

ঘরে আমার কুটুম এসেছে।

তোর ঘরে কুটুম এসেছে, মেজোবাবু এদিকে আমায় বড়োকুটুম বলে খাতির করছে। ও সব কথা রাখ। নগেন একটু থামে, ইতস্তত করে।—নগদ পাবি।

কাজের শেষে নগদ নয় শুধু, এক শিশি তরল আলতার দামটা পরাশরের আগাম চাই। শুনিয়া নগেন কৌতুক বোধ করে।

আজও তোর বউ তরল আলতার বায়না ধরে ! দাও, ভূধর, এক শিশি তরল আলতা দাও ওকে।

পাগলা দীনুকে দিয়া পরাশর হাট আর আলতার শিশি ঘরে পাঠাইয়া দিল। বাবুদের কাছারি ঘরের চালায় সে এদিকে কাজ করিতে লাগিল, ওদিকে অন্নব্যঞ্জন রান্না করিয়া ঘরের ছায়ায় জগৎকে ভামিনী খাওয়াইতে বসাইল। ভোরে ডাকিতে গেলে আসে নাই, অনেক বেলায় কাজে লাগিয়াছে, বাড়িতে খাইতে গিয়া সময় নষ্ট করিলে পুরা মজুরি পরাশর পাইবে না।

তা হোক, তার জন্য ও বেলা সব তোলা থাকিবে। ঘাটে স্নান করিয়া পেট ভরিয়া মাছ খাইয়া কামিনী ছেলেকে পাশে নিয়া একটু শুইয়াছে, কখন ঘুম আসিয়া গেল কে জানে। গড়াইয়া গড়াইয়া বেলা পড়িয়া আসিল, ঘুম ভাঙিয়া আলস্যে হাই উঠিতে লাগিল। সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলে কোথা হইতে কালো মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিতে শুরু করিল। কাল রাত্রের বৃষ্টি তবে শুধু বর্ষার জানান দেওয়া নয়, বর্ষা একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। ভামিনী তাড়াতাড়ি শিশি খুলিয়া কামিনীর পায়ে আলতা পরাইয়া দিল, বারবার আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে কামিনীও তাড়াতাড়ি জগতের সঙ্গে গরুর গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তারও অনেক পরে কাছারিঘরের চাল হইতে পরাশর নামিয়া আসিল। যত বৃষ্টিই পড়ুক আজ আর বাবুদের কাছারিঘরে এক ফোঁটা জল পড়িবে না।

কালো কালো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চাহিয়া পরাশর গভীর তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করিতে লাগিল।

পারিবারিক

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, কেউ স্টেশনে গেল না, জামাই মানুষ—

ইতিমধ্যেই মা দু-তিনবার কথাটা বলেছে, বনমালী একবার। আলোচনাও হয়ে গেছে যেটুকু হবার। এবার আর কেউ কান দেয় না কথাটায়। নন্দিনীর মনেই বিষয়টা সবার বেশি গুরুত্ব পাওয়া স্বাভাবিক, সেই আর একবার বলে, পা তো আছে, চলে আসবে। কে যাবে এ বিষ্টিতে ? নতুন তো নয় !

নিশ্চিন্তভাবেই বলে নন্দিনী, মিষ্টি করে একটু হেসে। বেশি যে পুরোনো নিখিল তা নয়, তবে বাড়ির লোকের দুর্ভাবনা সামলানোর দায়িত্ব তো তারই ! যদিও আগের মতো দুর্ভাবনা শত আনকোরা জামাইও বোধ হয় কোনো বাড়িতেই আনতে পারে না আর, বাস্তব ও সব বাড়াবাড়ি চেপে পিষে শেষ করে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, দু-তিনবার বলা কথাই বলে, কার ওপর রাগ করে যে শ্লেষ্মায় ভাঙা গলা চড়ায় ঠিক বোঝা যায় না,—চিচিঙ্গা খাবে জামাই, চিচিঙ্গা ? বলি, জামাই এসে শুধু চিচিঙ্গা খাবে ?

খেতে হলে খাবে ! এবারও নন্দিনীই কথা কয়, সবাই যা খায়, তাই খাবে !

যাবে যাবে, সব যাবে !—রাখাল ক্রুদ্ধ আপশোশের সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, ধর্ম ভাসিয়ে দিলে থাকে কিছু ! ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে নিতে না পারলে কোনো জাত টেকে।

কেউ কান দেয় না।

বাজার কাল করে রাখা হয়নি। যদি আসে নিখিল ভোব ভোর এসেই পৌঁছোবে, বাজার করার যথেষ্ট সময় থাকবে। আগে থেকে বেশি ও বিশেষ বাজার করে রাখলে যদি সে না-ই আসে ! ফেলা অবশ্য যাবে না কিছুই, খাবার লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয় বাড়িতে কিন্তু খরচ তো আছে, অকারণ বাড়তি খরচ। আজ না এলে কাল হয়তো নিখিল আসবে।

আজ যদি আসে, বৃষ্টি মাথায় করেই একজন কেউ বাজার যাবে। যা পায়।

তবে বাজার আজ বসবে না।

এ এক সর্বনাশা দারিদ্র্য ঘনিয়ে এসেছে চারিদিক থেকে অকথ্য অদ্ভুত। তিন-তিনজন চাকরি করে বাড়িতে, আরও দুজন এই কদিন আগেও করত—বেকার হয়েছে খুবই সম্প্রতি, একজনের স্থায়ী গভর্নমেন্ট সার্ভিস। আজ অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রায় নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মতো। মোট জড়িয়ে নেহাত কম হয় না মাসিক উপার্জন, দুশো টাকার বেশি, কিন্তু এমন আগুন লেগেছে জিনিসপত্রে সব যে মাসের গোড়ার দিকেই চড়চড় করে পুড়ে যায় প্রায় তার সবটাই, অর্ধেকের বেশি যে বাকি আছে মাসটা, সেটা কীসে চলবে কেউ ভেবে পায় না !

অসুখ-বিসুখও যেন পাল্লা দিয়েছে। অসুখ সংসারে লেগে থাকেই, চিরদিন থেকেছে সবার বাড়িতে, কিন্তু এ যেন রোগের নিত্য বাজার হাট, সমারোহ।

কাগজে বিজ্ঞাপনে উপদেশ ছাপা হয়, অপব্যয় কোরো না, অদরকারি কিছু এমন কিনো না, টাকার দাম বাড়বে পরে, জিনিস সস্তা হবে, এখন শুধু জমাও !

নন্দিনী খিলখিল করে হাসে, কী জমাবে দাদা ? খোলামকুচি ? অদরকারি জিনিস যেন কেউ কিনতে পারে !

রাখাল বড়ো ভাই, সে হাসে না। বুড়োটে বাপ বনমালী, সেও নয়। মেজোভাই দিব্যেন্দু যেন মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতেই শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেজো অসীম নিঃশব্দে হাসে, অল্পদিন আগে

ছাঁটাই হওয়া এবং তার কিছুকাল আগে বিয়ে করে থাকা সত্ত্বেও। জোরে হাসে কল্যাণ, সুমতিরা। নন্দিনীর বলার ভঙ্গিটা বড়োই হাস্যজনক ছিল।

পারিবারিক গালগল্পের বা সবাই মিলে কাগজ পড়ার বৈঠক নয়, সকাল বিকাল ও রকম জমাট বাঁধার মতো গুরুত্ব কোনো পরিবারের আছে কিনা কে জানে! বাইরে শেষরাত্রি থেকে মুষলধারে বৃষ্টি, তাই। বাড়ির কাঁচা অংশের খড়ো ঘর দুখানার এবং রান্নাঘর ও গোয়ালঘরের চালা সারাই হয়নি চার বছর, জলে ভেসে গেছে। গোয়ালটা শূন্য, বছর দুই গোরু নেই, চালাটা বর্ষার জলে গলে গেলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু দু-দুভাগে ভাগ করা চালাঘর দুটির চারিটি শোয়া-বসার কামরা থেকে বিছানাপত্র জামাকাপড় সব সরিয়ে আনতে হয়েছে বাড়ির এই পাকা অংশে। সাত বছর আগে, যুদ্ধের গোড়ার দিকের সেই ইংরাজি একচল্লিশ সালের মধ্যে যে পয়লা বৈশাখটি ছিল, সেদিন ভিত্তি পত্তন করে, তিন মাসের মধ্যে দুখানা পাকা ঘর তুলে দিয়েছিল ঠাকুর্দা প্রিয়রঞ্জন। দিয়ে দুমাসের মধ্যে মারা গিয়েছিল। সারাই চুনকাম কিছুই আর হয়নি এ পর্যন্ত, তবু আকাশটা বর্ষা হয়ে ভেঙে পড়লেও এ দুখানা ঘরে জল পড়ে না। বাতাস থাকলে অবশ্য দুটো জানলা দিয়ে ছাঁট আসে, আলকাতরা মাখানো তক্তা জোড়া দেওয়া জানালার পাট বন্ধ করলেও। জানালা দুটির সংস্কার করার কথা গম্ভীরভাবে আলোচনা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু কাজে এ পর্যন্ত কিছু হয়নি।

পাশাপাশি দুখানা ঘর, মাঝের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা দরজা। লম্বা একটা হল করাব সাধই যেন ছিল প্রিয়রঞ্জনের, মাঝখানে দেয়াল তুলে ভাগ করতেই চায়নি, কিন্তু সেটা অবাস্তব অনর্থক সাধ বলে দুটো ঘর করতেই হয়েছে। জিদ বজায় রাখার জন্যই যেন বুড়ো লম্বায় চওড়ায় খাপছাড়া এই সাই দরজাটি বসিয়ে গেছে, কপাট খুলে রাখলে যেন মনে হয় ঘর বুঝি দুটি নয়। ইটের চেয়ে অনেক বেশি দাম কাঠের। আর কী মানে হয় বুড়োর পাগলামির?

ঘর দুটিতে থাকে বড়ো রাখাল আর মেজো দিব্যেন্দু। রাখালের ছেলেমেয়ে এক পাল, দিব্যেন্দুর কিছু কম। ঘর নিয়ে দিব্যেন্দু সব চেয়ে বেশি ঝগড়া করেছিল বলেই বোধ হয় তার ঘরেব প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ সমান চাঁচের বেড়ায় আড়াল করে বনমালী বসবাস করে। বাড়ির মা, বনমালীর স্ত্রী, স্বামীর কাছে বহুকাল শোয় না। সে যেমন শীর্ণ, চুল-ওঠা কপালে তার যেমন চওড়া সিঁদুব, তেমনই সে পেট রোগা। চালাঘরেই সে থাকে, পুবের ঘরটায়। ঘরের পিছনেই ডোবা আর জঙ্গল, বেতবন।

বর্ষা সবাইকে কাঁচা অংশ থেকে পাকা অংশে আনলে মাঝের দবজায় মরচে ধরা শিকলটা অগত্যা খুলতে হয়। বনমালী চাঁচের বেড়ার ওদিক থেকে বেরিয়ে আসে এদিকে, তার অংশের পাশের জানালায় ছাঁট আসে বৃষ্টির মতো। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জির ওপর আঠারো বছরের পুরানো গরমকোট চাপিয়ে কলার ফুটো কম্ফর্টার জড়িয়ে সে যেন বীরের মতো আত্মরক্ষার যুদ্ধ করে।

নন্দিনী কাগজ পড়ে সকালে।

গতকালের মফস্‌সল এডিশন শহরের পরশুর কাগজ।

কাগজ এলে টানাটানি হয়। একজনের হাতে কাগজ ধরা থাকে, পিছন থেকে তিন-চারজোড়া চোখ কাগজের পৃষ্ঠা হাতড়ায়। নেহেরু মেনেছে? জিন্না? দাঙ্গা কমেছে না বেড়েছে? কী ঘোষণা গান্ধীর প্রার্থনায়? জেলা শহরের গা-ঘেঁষা গাঁ ধুলচারিতে নুরুল হোসেন আর রাঘব আচার্য যে দুটো নৌকা আর এগারোজন গুন্ডাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখায় হইচই পড়ে গেছে শহরে সে খবরটা কি ছাপিয়েছে কাগজে? কল্যাণ পাঠিয়েছিল খবরটা, তাদের কল্যাণ! সাতগাঁর গুলি চালাবার খবরটা—ধানের জন্য তিনটা চাষা খুন আর একুশটা জখম—হাবিজুল্লের বউটার ওপর—?

নন্দিনী টাটকা কাগজের কাছে ঘেঁষে না। ও রকম ছাড়া-ছাড়া ভাসা-ভাসা খবর পড়ায় তার তৃপ্তি নেই। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে তার অল্পবিদ্যা নিয়ে নিচু ক্লাসে বাংলা শেখায়, হাজিরা নিয়ে

বড়ো কড়াকড়ি। সেক্রেটারি কুমুদবাবু একটু তাকে আদর করতে চেয়েছিল, প্রথমে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে, তারপর জেলা বোর্ডের অফিসে তার খাস কামরায়।

হাজিরার কড়াকড়ি চলছে, ক্লাস নেবার খুঁটিনাটি কৈফিয়ত। কবে জবাব দেয় ঠিক নেই।

অনেকক্ষণ তন্নতন্ন করে কাগজ না পড়লে, শুধু মাউন্টব্যাটনের খবর নয়, বিজ্ঞাপন পর্যন্ত বুঝে শুনে না পড়লে তার ভালো লাগে না।

খবর আর বিজ্ঞাপন সব এক ধাঁচের—ধর্মশক্তি বৃদ্ধি এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধি।

পড়তে পড়তে খিলখিল করে হেসে ওঠে বটে, পরিবারের কাউকে রাগায় কাউকে হাসায় বটে, বুকটা তার জ্বলে যায়। এমন একটা কাগজও কি এই স্বাধীনতা পাওয়া দেশে হয় না যাতে সত্যি খবর, সত্যি বিজ্ঞাপন ছাপে ?

কেন ? মিছে খবরটা কী ছেপেছে ?

অর্ধেক মিছে খবর, কত খবর বাদ দিয়েছে !

বড়ো গাল দিয়ে লেখে নিজেদের যেন কোনো দোষ নেই। ঝগড়া তো আরও বাড়বে ওতে !

বাড়ুক। আমরা সইব না আর। কেন সইব ? ব্যাটাদের মেরে লোপাট করে—ও খবরটা কিন্তু মিছে। বাজপুরে একটা জোতদারের ঘরও পোড়ায়নি। তুই জানলি কী করে পোড়ায় নি ? মিছেমিছি একপাল লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে এসেছে ! ওরা তো স্বদেশি করেনি যে ধরবার জন্য—

বাজপুরে গিয়েছিলাম না কাল ? কোনো জোতদারের ঘর পোড়েনি। বরং কটা চাষির ঘরে আগুন দিয়েছিল।

খবরের কাগজের খবর আর মন্তব্য নিয়ে রোজই ভাসাভাসা কথাবার্তা হয়। ধীরে ধীরে একটা পারিবারিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে এত সব বিরাট ঘটনা দুর্ঘটনের সমারোহ, এই ছোট্ট শহরেও যার ঢেউ এসে লাগে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে যোগ আছে অনুভব করে, কী হল কী হবে জানবার আগ্রহ সকলের মনেই। কেমন একটা অসন্তোষ, অতৃপ্তি জাগে কাগজ পড়ে। আরও কী জানতে চায়, কী ভাবে জানতে চায়, কেন জানতে চায় ভালো বোঝে না কেউ, শুধু মনে হয় কেমন যেন একপেশে ব্যাখ্যা মন্তব্য নির্দেশ কাগজটার, খবর পরিবেশনেও। ছাঁটাই বাছাই করা ঘুরিয়ে বলা সত্যমিথ্যার মেশাল দেওয়া ঘন্টের মতো, মন পোড়ানো ঝাল দেওয়া।

দেরিতে আসা বছরের প্রথম খাঁটি বর্ষা একটু অপ্রস্তুতে ফেলেছে সকলকে। রান্না চড়াবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা গেছে, এ বছর আর কোনোমতেই কাঁচাঘরে রান্না করা সম্ভব নয় বৃষ্টির সময়, রাঁধতে হলে এই পাকাঘরের মধ্যেই আয়োজন করতে হবে। কয়লার ছোটো আলগা উনানটা এনে ভিজে কাঠ জ্বালিয়ে ডাল ভাত সিদ্ধ করার আয়োজন খানিকটা এগিয়েছে। শহরে কয়লা মেলে না, একটা কেলেঙ্কারি হব হব হয়েছে কয়লা চালান ও বিতরণের ব্যাপারে শহরের কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে—ধামাচাপা পড়ে যাবে। বাজার আজ হবে না জানা কথাই। ডাল ভাত হলে চিচিঙ্গার চচ্চড়ি হবে। তরিতরকারির মধ্যে অদ্ভুতরকম সস্তা চিচিঙ্গা, ঝিঙাও প্রায় অর্ধেক দামে বিকোয়। সকালে তরকারির ঝুড়িতে শাক রাঁধার জন্য আগের দিনের সঞ্চয় করা ডাঁটা মুলোর পাতাগুলি আর চিচিঙ্গা থাকে—লুকানো একটা পটোল বা ছোটো একটা কানা বেগুন কোনো কোনো দিন দেখা যায়।

স্কুল হয়তো ছুটিই হয়ে যাবে আজ, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত অফিস কাছারিও বসবে না। ঝড় বাদলেও হাকিম হুকিম ছাড়া সবার কাছারি যাওয়ার আজ্ঞা আছে, কিন্তু ওনারা নিজেরা যান না বলে না গেলেও চলে। সরকারি দপ্তরগুলিতে সব কিছুর সঙ্গে এ সব কড়াকড়িও শিথিল হয়ে এসেছে,

নিয়মকানুন মানার দিকে নজর দেবে কে, সবাই যখন পচন বাড়াতে ব্যস্ত তাতেই যখন লাভ। রাখালেরও আগের দিনের তাগিদ নেই, সুনীল নতুন কাজে ঢুকেছে, তারও না। তবে বিমলকে যেতে হবে যথাসময়ে, তার বেসরকারি চাকরি।

হঠাৎ বৃষ্টি ধরে গেলে ছুটতে হবে সকলকেই—নুন ভাত তো পেটে দেওয়া চাই। তাছাড়া, খিদেও তো আছে।

আমরা বাঁচব ? বাঁচব না—ধ্বংস হয়ে যাব। ধর্ম ভুলে গেছি, ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে পারি না—যে জোর দেখায় তার সঙ্গেই আপস। কী করে বাঁচব ? তরকারির ঝুড়িটার দিকে চেয়ে থেকে রাখাল চড়া গলায় ঘোষণা করে, ঘরে ধোঁয়া নইলে যেন তার কথার মানে অস্পষ্ট করে রাখবে।

সবাই শোনে, কেউ কান দেয় না। শুধু চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাওয়া তো নয়, অনেক কিছুই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে সর্বদাই তাকে দিয়ে কথাটা ঘোষণা কবাচ্ছে। কত শোনা যায় ?

ছেলেপিলে কাঁদে কোঁকায়, ঝগড়া করে, চলতে থাকে তাদের সামলানো, শান্ত করা—কেমন যেন সমারোহ ছাড়াই ! আগের দিনে ঘরবাড়ি সরগরম হয়ে উঠত বাচ্চাদের চেঁচামেচি কাঁদাকাটার সঙ্গে তাদের আওয়াজ ছাড়িয়ে ওঠা বড়োদের বিরক্তির ঝংকার মিশে। তেমন বিরক্ত কেউ যেন আব হয় না, এমন অসহ হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকা, তবু অথবা হয়তো সেই জন্যেই—আশ্চর্য এক ধৈর্য এসেছে সবার মধ্যে, অপরূপ এক সহ্যশক্তি। তবে সে রকম আদরও কেউ আর করে না, বাচ্চাকাচ্চাকে হরদম বুকে চেপে চুমু খেয়ে সোনা আমার মানিক আমার বলে বলে আবেগে গলে গিয়ে এবং গলিয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে—কল্পনার মোটাসোটা অমন সুন্দব কোলের ছেলেটার পর্যন্ত ভাবাবেগের বাজারে দর নেই। এখনও মাই ছেড়ে রোগা বিচ্ছিরি হতে পারেনি ছেলেটা, বুকে দুধও পায় মোটামুটি—কল্পনার স্বাস্থ্য অসাধারণ ভালো ছিল।

আধভেজা কাপড় পরে আছে কল্পনা, এখানে ওখানে ছেঁড়া। তা, ছেঁড়াকাপড় সবাই পরে, যে অবস্থায় পৌঁছোবার অনেক আগেই কাঁথা-ন্যাকড়া হয়ে যেত ধুতিশাড়ি, সে অবস্থাতেও ! তবে, একটু জ্বর এসেছে কল্পনার এই যা। এসেছে দিন তিনেক।

দালানে মেলা বড়োবউ অতসীর শাড়িখানা শুকিয়েছে। রেশনের নতুন শাড়ি।

দাও না দিদি, ভিজে কাপড়টা ছাড়ি ? শীত করছে।—হঠাৎ কল্পনা অনুরোধ জানিযে বসে, একটু যেন দাবির মতো জোরের সঙ্গে। মনে তার একটা জ্বালা ছিল !

নেয়ে উঠে আমি পরব কী ?

জ্বরতপ্ত মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে কল্পনার !—

এবারও রেশনের কাপড়টা তো কায়দা করে—মরুক গে যাক।

ঝিমিয়ে পিছিয়ে যায় কল্পনা। জ্বরের দুর্বলতায় নয়, কলহ করার তেজ জ্বরে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পায় না মনের মধ্যে !

কী কায়দা শুনি ? ঘাড় তোলে অতসী, কীসের কায়দা ? শোনো দিকি কথা একবার !

শঙ্কিত চোখে নন্দিনী চেয়ে থাকে। কিন্তু আর এগোয় না বিবাদ, চোখে চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে দুজনে ঝামটা মেরে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ঝগড়াঝাঁটিরও যেন কী হয়েছে আজকাল। জমে না।

ভিজে কাপড় পরে আছ ? বলতে পার না ? বললে একখানা শুকনো কাপড় তোমার জোটে না ? নাও, এটা পরো।

কল্যাণ মেজোবউদিকে একখানা সরুপাড় ধুতি এগিয়ে দেয়।

কল্পনা হেসে বলে, ধ্যেত।

কেন ? কী হয় পরলে ? নন্দিনী বলে, কত সধবা থান পেলে বর্তে যাচ্ছে !

কল্পনার বড়োই শীত করছিল, দ্বিধাভরে বলল, পরব ?

তার দ্বিধা আর অস্বস্তি দেখে নন্দিনী ধুতিটা নিয়ে নিজের পবনেব শাড়িখানা ছেড়ে ফেলল। শাড়ি তার আরও আছে, তবে একটু ভালো শাড়ি সে কখানা, সর্বদা পরতে মায়া হয। তাছাড়া, কিছুক্ষণের জন্যও ধুতি পরে থাকার কথা ভাবতে তার নিজেরও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ওটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয।

বেলা দশটা নাগাদ বৃষ্টি কমে এল। সুনীল চিচিঙ্গা চচ্চড়ি দিয়ে পাতলা খিচুড়ি খেয়ে তখন বেরোবার উপক্রম করছে। ভালো ছাতিটা সে নিয়ে যাবে না বাড়ির দরকারে রেখে যাবে, এই দাঁড়িয়েছে পারিবারিক সমস্যা। দেরি তার হয়েছে, আর একটু দেরি করে দেখবে বৃষ্টি ধরে কি না ? সৌভাগ্যের বিষয়, আপিস বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় সুনীলের, মোটে দশ-বারোমিনিটের পথ। বৃষ্টি একবার ধরলে সেই ফাঁকে ছাতি ছাড়াই চলে যেতে পারবে, আর এক দফা বর্ষণ শুরু হবার আগেই।

বাড়ির আর দুজন আপিস যাত্রীও ধীবে ধীবে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময় নিখিল এল সাইকেল রিকশায়। ভিজে সে চুপসে গেছে, তাব জিনিসপত্রও রেহাই পায়নি। জিনিস সে সামান্যই সঙ্গে এনেছে, মোটে দুদিন থাকবে। দশদিনের ছুটি, তার মধ্যে তিনটে দিনই আসা যাওয়ার জন্য বরাদ্দ। দেশে নিজের বাড়িতে তিন দিন থাকতে হয়েছে, একরাত্রি গেছে সেখান থেকে এখানে আসতে। নন্দিনী আগে থেকে শ্বশুববাড়ি গিযে থাকলে ভালো হত, তা সে তো আর হবার নয়। সাত মাস বলে নয় শুধু, এ পথে রাত্রে মেয়েছেলের যাতায়াত যেমন জঘন্য তেমনই বিপজ্জনক।

রিকশা চালক ছোঁড়াটা আরও বেশি ভিজেছে. পিঠেব কাছে দুফালা হয়ে ছেঁড়া খাকি ময়লা শার্টটা এঁটে গিয়েছে, পিঠের চামড়ার সঙ্গে। ব্যাগ আর বিছানা ঘরে পৌঁছে দিয়ে সে ঘরের মধ্যেই দরজার চৌকাঠের কাছ ঘেঁষে পরিবারটির দিকে পিছন ফিবে দাঁড়িয়ে জামাটা খুলে নিংড়ে নেয়, কাপড় চিঁপে চিপে জল ঝবায়। জামা দিয়ে গা মুছে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টি থামার জন্যে একটু অপেক্ষা করাই বোধ হয় তার মতলব।

বেশি পয়সার লোভেই সে অবশ্য এই বৃষ্টিতে নিখিলকে পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে, তবু তাকে রাস্তায় নেমে যেতে যেন বলা যায় না, অন্তত কিছুক্ষণ দাঁড়াতে না দিযে

শুধু রাখাল নিচু গলায় বলে, ব্যাটা মুসলমান কী না না জেনে ?

সে কথায় কেউ কান দেয় না।

ইলিশ মাছ দুটি হাতে করেই নিখিল নেমেছিল। মস্ত দুটো ইলিশ, বেশ চওড়া।

মাছ এনেছ ? মা যেন আশীর্বাদ করে জামাইকে।

ভিজে কাপড় ছেড়ে নিখিল বনমালীর এক পায়ের পাতায় এক হাতের একটি আঙুল ছুঁইয়ে প্রণাম পর্ব শেষ করে, আর কারও পায়ের দিকে তাকিয়েও দ্যাখে না।

বলে, খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয মাছ দুটো।

সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

খারাপ হয়ে যাবে না ? নন্দিনী বলে মুখ ভার করে, এ ভাবে আনলে কখনও মাছ থাকে ?

একটু বরফ পেলাম না। থলিটাতে বড়ো বড়ো বরফের চাকা ভরে—

ভেজে আনলেই হত !

আসবার সময় কিনে নিলাম বাজার থেকে। ভাবলাম বরফ কিনে—

যাক, বেশ করেছ। দুধ ছাড়া চা খেতে হবে কিন্তু। শুধু এইবার—পরের বার দুধ এসে যাবে। তোমার জন্য চিনি তোলা আছে, গুড়ের চা নয়।

এবার নন্দিনী হাসল।

ট্রামে

কিছুদিন হল চাকরি করছি।

আজ বাদে কাল চৈত্র শেষ হয়ে যাবে। বেলা দশটাতেই রোদের তেজের বাড়াবাড়ি রাগিযে দেয়। শহরতলিতে বাড়ি। মিনিট চারেক হেঁটে বড়ো রাস্তায় এসে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি। স্নানের সিক্ততা ভালো করে উঠে যাবার আগেই শরীরটা কাপড় জামার নীচে বেশ ঘেমে উঠেছে। ট্রামে উঠলে আরাম পাব—ফ্যান আব ট্রাম চলার বাতাসে।

দু স্টপেজ তফাতে ডিপোর সামনে ট্রামটি ছাড়বার জন্য অপেক্ষা কবছে দেখতে পাচ্ছি। এক রকম খালি অবস্থাতেই ট্রামটি আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, ইচ্ছামতো যে কোনো সিটে বসতে পাবব। কথাটা ভাবতেও বেশ আরাম অনুভব করি, নিজেকে রীতিমতো ভাগ্যবান মনে হয়। শহবতলিতে ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি বাস করি বলেই তো দাঁড়িযে থাকার কষ্ট, পঁচিশ-ত্রিশমিনিট দাঁড়িয়ে থাকাব ভয়ানক পরিশ্রম এড়িয়ে যেতে পারি। কালিঘাট পৌঁছবার আগেই সব সিট ভর্তি হয়ে যাবে। দাঁড়ানো মানুষের ভিড় ক্রমে বাড়তে থাকবে, পাদানি পর্যন্ত সমস্ত ফাঁকা স্থানটুকুতে গাদাগাদি কবে দাঁড়াবে সব কচি বুড়ো মাঝবয়সি আপিস যাত্রী—সায়েব আর টমিও থাকবে কিছু।

আমি বসেই যাব।

নিজের পছন্দ করা সিটে হেলান দিয়ে সিগারেট টানব আর দাঁড়ানো মানুষগুলির সান্নিধ্য অনুভব করতে করতে উপভোগ কবব বসে থাকাব আরাম। এতগুলি ভদ্রলোককে একসঙ্গে কষ্ট পেতে দেখে সমস্ত পথ পুলকিত হয়ে থাকব। আপিসের ছুটির পর অবশ্য দাঁডিযেই ফিরতে হয়। ডালহৌসি থেকেই গাড়িগুলি বোঝাই হয়ে এসপ্ল্যানেডে আসে। বসে বাড়ি ফিববার একটা কৌশল অবশ্য আছে, কিছু সময় খরচ হয়। বিপরীত দিকের গাড়িতে চেপে ডালহৌসি পাক দিয়ে এলে বসে বসেই বাড়ি ফেবা যায়। কিন্তু নিজস্ব নির্দিষ্ট চেয়ারে এতক্ষণ বসে কাজ করে আসার জন্যই বোধ হয় বসবার তাগিদটা তেমন জোরালো থাকে না। বোঝাই গাড়িতেই উঠে পড়ি। ফার্স্ট ক্লাসে ওঠা অবশ্য একেবারেই সম্ভব হয় না, সেকেন্ড ক্লাসে উঠে ঠেসাঠেসি করে কোনো রকমে দাঁড়ানো যায়। কিছু ধরে দাঁড়াবার দরকার হয় না, গাড়ির থামা ও চলার টাল সামলাতে মানুষেব অবলম্বন পাই। বেশ লাগে দাঁড়াতে। আরাম পাই। আনন্দ হয়। চারিদিক থেকে মানুষের নরম দেহেব জোরালো চাপ, মানুষের ঘামের গন্ধ, মানুষেব নিশ্বাসের ভাপসা বাতাস আর মানুষের দেহের উত্তাপে জমজমাট ভেজা গরম, এ সব যেন জীবন্ত করে তোলে আমাকে। গাড়ির ভিড় দেখে স্টপেজে দাঁড়ানো সুন্দবী মেয়েটি মুখ বাঁকায়, তার কোমল তরুণ রোমাঞ্চময় দেহে চোখ বুলিয়ে মনে হয় ভিড়ের স্পর্শ ঢের বেশি স্নায়বিক, ঢের বেশি উত্তেজক।

বাড়ি ফিরে খালি গায়ে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় দাঁড়াই, দূর সমুদ্রের বাতাস সামনের জলা আর খোলা মাঠ ডিঙিয়ে প্রথমে আমাকে স্পর্শ করে শহরে ঢোকে। স্পষ্ট বুঝতে পারি সে শুধু বাতাস, নিশ্বাস নয়। দক্ষিণা বাতাসে গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেলে চান করি, খাবার খেয়ে খিদে মেটাই, চা পান করি। গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যা আসে।

ট্রাম এল।

তিনটি বাঙালি পুরুষ আর একটি বিদেশি মহিলা ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে। লেডিজ সিটে না বসে মহিলাটি একেবারে সামনের বাঁদিকের সিটে বসেছে। ওখানে বসার সুবিধা আছে। জানালা দিয়ে জোরে

বাতাস গায়ে লাগে আর ঘাড় বাঁকিয়ে পাশের জানালা দিয়ে দ্রুত অপস্রিয়মাণ ঘরবাড়ি দোকানপাট দেখার বদলে সোজাসুজি সামনে তাকিয়ে দূরকে কাছে আসতে দেখে একটু সহজে সময় কাটানো যায়। আমি তাই মাঝামাঝি একটি সিটে বসলাম। সময় আমার কখনও কাটাতে হয় না, আপনিই কেটে যায়।

বিদেশি মহিলাটির পোশাক আর চেহারা দুই-ই বেশ জমকালো। ত্রিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ বয়স, উথলে ওঠা দুধের মতো মাঝবয়সের যৌবন পরিপুষ্টির ফাঁকিতে ফেঁপে ফেনিয়ে উঠেছে। স্ত্রৈণের মনে শ্রদ্ধাপূর্ণ লালসা যেন জাগাবেই, কিছুতে রেহাই দেবে না।

প্রত্যেক স্টপেজে লোক উঠে গাড়ি ভরে যেতে লাগল। পর পর বই হাতে দুটি মেয়ে উঠে একজন ডানদিকের এবং অন্যজন বাঁদিকের লেডিজ বেঞ্চ দুইটি দখল করল। কালীঘাট থেকে গাড়ি ছাড়বার পর দেখা গেল সাতজন দাঁড়িয়ে আছে। লেডিজ বেঞ্চ দুটিতে দুজনের সিট খালি আছে, কিন্তু নারীজন্ম না নিলে সেটা দখল করা সম্ভব নয়। একটি মেয়ে অন্য বেঞ্চে উঠে গেলে অন্তত নূতন আর একটি মেয়ে গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত দুজন পুরুষ বসতে পারে। কিন্তু দুজনেই তারা নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে মেরুদণ্ড আর ঘাড় সিধে করে বসে আছে। মেয়েদের জন্য রিজার্ভ করা সিট, পুরুষের শিভাল্‌রিহীনতার প্রামাণ্য বিজ্ঞাপন, পুরুষের পাশে বসলে নারীদের অশুচি হবার ঘোষণা। লজ্জায় আর একটা সিগারেট ধরালাম।

গত রবিবার একজন ভবানীপুরে আমাকে গ্রেফতার করে তার বালিগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লেখা শোনাবেন। শুনিয়ে প্রশংসা শুনবেন। রূপেগুণে যৌবনের তেজে স্বাধীন চিন্তায় কর্মপটুতায় পুরুষকে সমান ভাবায় আর যুগান্তর ঘটাবার পিপাসায় তিনি অসাধারণ। আগাগোড়া সমস্ত পথটা দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছিল। নেমেই বলেছিলেন দেখলেন ? একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখেও কেউ একটা সিট অফার করল না ! এই সব অমানুষ আমার দেশের মানুষ ! আমি কিছু না ভেবেই বলেছিলাম কেন, অনেকেই তো দাঁড়িয়েছিল। তিনি মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলেন, আপনি আবার অনেক মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন কোথায় ?

তখন বলেছিলাম, কী জানো পুরুষের পাশে তুমি বসবে এটা কেউ ভাবতেও পারেনি। বেয়াদবি করতেও কেউ সাহস পায়নি। একজন উঠে সিট অফার করলে তুমি বসতে ?

নিশ্চয় বসতুম ! কেন বসব না ! আর বসি বা না বসি—

সে বসত না। আমি জানি সে বসত না। স্পর্শ বাঁচিয়ে তাকে দাঁড়াবার স্থান দিতে সকলে যে ভাবে গাদাগাদি ঠেসাঠেসি করে তালগোল পাকিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল সেটা গ্রহণ করেছিল সকলের উচিত কাজ বলে, তার প্রাপ্য বলে। এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি, মর্মাহত হয়নি।

সামনের সেই বিদেশি মহিলাটির পাশের স্থানটি খালিই পড়ে আছে।

একজন দাঁড়ানো যাত্রীকে বললাম, ওখানে গিয়ে বসুন না ?

ভদ্রলোক পানের রসে ঢোক গিলে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অকারণে একটু হাসল, শুধু বলল হেঁ হেঁ হেঁ—

আমি সাহস দিয়ে বললাম, ওটা লেডিজ সিট নয়।

সে একগাল হাসল, ঠোঁট বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ার আগে শুষে নিল, কত লোকের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষিত হয়েছে চট করে দেখে নিয়ে বলল, আমরা ও সব পারিনে মশায়। সংকোচ লাগে আর কি, বুঝলেন না ? অভ্যেস তো নেই !

তখন তাকিয়ে দেখি পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবিতে আবছা ঢাকা গেঞ্জি গায়ে ঘাড়ছাঁটা এক ছোকরা দাঁড়ানো মানুষগুলিকে বেপরোয়া ঠেলে ঠেলে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সোজা গিয়ে সে বিদেশি মহিলাটির পাশে বসে পড়ল, মুখের বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে তার মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

কন্ডাক্টর বলল, টিকেট ?

ছোকরা বলল, মন্থলি। দেখনে মাংতা ? ওই হোথায় একদফা দেখিয়েছি কিন্তু বাবা হ্যাঁ। দেখো আবাব দেখো।

কন্ডাক্টর যুবক, মুখখানা সুশ্রী। দাড়ি কামিয়ে মুখে স্নো মেখেছে বলে মনে হল। চোখেমুখে কলেজ স্টুডেন্টদের মার্কামাবা সুপবিচিত প্রতিভাব নিবু নিবু ছাপ দেখেও স্বস্তি বোধ কবলাম। কয়েক বছরের মধ্যে মুখের চামড়া শক্ত হয়ে এ কলঙ্ক ঢেকে যাবে। প্রতিফলিত উজ্জ্বলতা নিভে গিয়ে দুটি চোখে দেখা দেবে বজ্র ও বিদ্যুৎ ভবা মেঘের মতো খাঁটি বিদ্রোহ ভরা ঘৃণার ছায়া।

পাঁচটার কিছু আগেই আপিস থেকে বেবিয়ে পড়লাম। আজ দেখলাম প্রথম বোঝাই ট্রামখানার সেকেন্ড ক্লাসেই ভিড় বেশি। ফার্স্ট ক্লাসে দাঁড়ানো চলে। উঠবাব ও দাঁড়াবার জন্য স্থানসৃষ্টিব লড়াই শেষ হলে বহুদিনের বদভ্যাসের ফলে অজানা নূতন অভিব্যক্তি আবিষ্কাবের আশায় দৃশ্যমান মুখগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। মুখে মুখে মিল নেই, কিন্তু সব চেনা মুখ, আত্মীযেব মুখ। এই অঘটনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, বিশেষ খারাপ লাগে না। তাই অনায়াসেই অন্যমনস্ক হযে গেলাম। আমার অতি নিকটে যে একটা অন্যায় ঘটছে সে বিষয়ে তাই সচেতন হলাম খানিক পরে।

সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাঁটি বিদেশিনি কি ফিবিঙ্গি বিদেশিনি ঠিক বুঝলাম না। তরুণী বিনা রোগ ব্যারামে ছিপছিপে এবং মনোবম শ্রীমতী। লেডিজ সিটগুলি ভবে গেছে। দবজা আর লেডিজ সিটের মাঝখানে একজনের যে সিটটি থাকে সেটি দখল কবে আছে একজন বাঙালি যুবক—সবল সুস্থ চেহারার গম্ভীর শান্ত ভদ্র যুবক। সামনে মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে এতখানি নির্বিকার চিত্তে বসে আছে যে তার নিষ্ক্রিয় অভদ্রতা ঔদ্ধত্যের মতো বিশ্রী ও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে। ক্ষুব্ধ হলাম এবং একটু খুশিও হলাম।

ভিড়ের ঠেলায় বিদেশিনি মেয়েটিকে একটু ধাক্কা দিয়ে ফেললাম। ক্ষমা চাইবাব আগেই সে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে আর সায় দেবাব ভঙ্গিতে দুবাব মাথা নেড়ে যেন স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিল ক্ষমাব প্রশ্নই ওঠে না, কাবও কোনো দোষ নেই, বর্তমান অবস্থায এটা একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

তখন আর চুপ কবে থাকা সম্ভব হল না। মনে হল সমষ্টিব সমস্যা ছাড়িয়ে ব্যাপাবটা এখন ব্যক্তিগত প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। ছেলেটিকে বললাম, আপনি একটু উঠলে—

সে বলল, কেন ?

তাব মুখের ভাবের এতটুকু পবিবর্তন ঘটল না।

আমি চুপ করে গেলাম। খানিক পরে একটি বাঙালি তবুণী উঠে বিদেশি মেয়েটিকে নিষ্প্রভ করে তার পাশেই দাঁড়িয়ে বইল। মাঝে মাঝে সে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে লক্ষ কবলাম—কী গভীব অবজ্ঞা আর তিরস্কার তার বড়ো বড়ো দুটি চোখে।

বিদেশি মেয়েটি বলল, প্লিজ—

দেশি মেয়েটির ডান হাতের কনুই তার পাঁজরার নীচে খোঁচা দিচ্ছিল। দেশি মেয়েটি নীরবে তাকে রেহাই দিয়ে চোখের বজ্রে ছেলেটির পিপাসু চোখ দুটিকে কানা করবার চেষ্টা কবেই প্যানেলের একটি বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটি ফাঁপানো বেলুনের মতো একটি শিশুর ছবি। কোন খাদ্য খাওয়ালে শিশুরা এ রকম ভয়ংকর মোটা হতে পারে তারই বিজ্ঞাপন। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না, দেশি মেয়েটির বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। দেখলাম বিজ্ঞাপনের কথাগুলি পড়তে তার ঠোঁট নড়ছে।

বিচারের জন্য, বিশ্লেষণের জন্য, সমালোচনার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কী দিয়ে বিচার করব, ওর মনের সত্যমিথ্যার দলিল তো পাইনি আমি ! গাড়ির আর যে কোনো লোক ওখানে

বসে যদি জিজ্ঞাসা করত, কেন ? আমি তার মানে বুঝতাম ! এ ছেলেটি আমার অনুরোধের জবাবে প্রশ্ন করেনি, বলে দিয়েছে সে উঠবে না। একটি মেয়ে যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে তা গ্রাহ্য করে না। মেয়েটির সুঠাম সুন্দর দেহ তার চোখ দুটিকে আনন্দ দিচ্ছে বলেই তার কাছে মেয়েটির কোনো পাওনা সৃষ্টি হয়নি।

পরের স্টপেজে গাড়ি থামতে গলাবন্ধ কোট গায়ে ছাতি বগলে পুঁটুলি হাতে প্রৌঢ় বয়সি এক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত ভাবে আগে একটি ঘোমটা টানা মহিলাকে গাড়িতে তুলিয়ে নিজেও উঠে পড়ল। কোন ম্যাজিকে জানি না সেই জমজমাট ভিড় ফাঁক হয়ে মহিলাটিকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিল, সেই পথে পিছু পিছু তার সঙ্গীও তাকে অনুসরণ করল। সেই ছেলেটি তার একজনের সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বলল, এখানে বসুন।

চেয়ে দেখলাম তার মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

বাড়ি ফিরে বারান্দায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে দক্ষিণা বাতাসে ঘাম শুকিয়ে স্নান করলাম। পেট ভরে খাবার খেয়ে পান করলাম চা। গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। লেখার তাগিদ ছিল, কিন্তু আজ আর লেখা হবে না। মাথায় ভাবনা জুটেছে। টেবিলে ভারী কাচচাপা কাগজ আর কলমটির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একতলার কোণের ঘরে রেডিয়োতে গান হচ্ছে। পাশের বাড়িব মেয়েটি তার মিষ্টি গলা সাধছে। দূরে কে যেন বাঁশিও বাজাচ্ছে করুণ সুরে। বড়ো রাস্তা থেকে ট্রাম চলবার আওয়াজ কানে এল। তাকিয়ে দেখি যে, ট্রামগাড়িটা বাড়িটার আড়ালে পড়েছে, কিন্তু উপরের তারে নীলাভ দ্যুতির চমক তুলে কী যেন ইঙ্গিত করছে আমাকে।

ধর্ম

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দুজনের বেধে যায়। তীক্ষ্ণ ধারালো কথায় পরস্পবকে এরা কুচিকুচি কবে কাটতে থাকে, মুখের সঠিক সূক্ষ্ম ভঙ্গি সমর্থন কবে চলে কথাকে, ভিতরের জ্বালার তাপে আব আক্রোশের চাপে ফরসা মুখ দুটি লাল হয়ে যায়—তমসার বেশি হয়। সৌম্যেনের দাড়ি কড়া, অনেক যত্নে কামানোর পরেও কূপের ভিতর থেকে লোমের গোড়া উঁকি দেয়।

তমসা বেশ ফবসাই।

গলা তাদের চড়ে না, বরং কথার ধার বাড়বার সঙ্গে আওয়াজ কমে আসে। চাপা হিসহিসানির মতো শোনায় সময় সময়, তাদের ভেতরে যেন সাপ আছে, ঝগড়া কবছে সেই সাপ দুটি, তারা নয়। বুদ্ধি চোখা, জটিল চিন্তা নিয়ে দ্রুত পাক দেওয়া মনের অভ্যাস, চিন্তার স্পিডও অনেক। গলার জোরে গায়ের ঝাল ঝাড়বার দরকার তাদের হয় না, গালাগালি তো একেবারেই অচল। নতুন নতুন বলার কথা খুঁজে না পেয়ে একটি মাত্র খোঁচার পিছনে তেজ ঢেলে দিতে হয় না, সবটুকু, যা মনে আসে, তাই বলতে হয় না। বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা চলে, কথা কাজ ও ব্যবহারের শত খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতির ;—একে প্রমাণ করে অপরের স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য, অবিবেচনা, আলস্য, অপটুতা, অকর্মণ্যতা, অন্যায়, অবিচারকে, না-বোঝাকে, স্নেহমমতা ভালোবাসার অভাবকে। হৃদয়মন টুকরো টুকরো হয়ে যায় দুজনের। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষতে রক্ত ঝরতে থাকে।

তমসা কেঁদে থামে। অথবা থেমে কাঁদে।

সৌম্যেন থামে, যে কোনো বই তুলে উলটো সোজা যে ভাবে হোক খুলে মুখেব সামনে ধবে গুম হয়ে থাকে।

খানিক পরে একজন কথা কয়,—সহজ স্বাভাবিক সাধারণ কথা। কোনো দিন তমসা, কোনো দিন সৌম্যেন।

আরম্ভ হওয়ার একমুহূর্ত আগেও যেমন যুদ্ধের ইঙ্গিতটুকুও থাকেনি তাদের কথায় ব্যবহারে, শান্তিও তেমনই শুরু হয় বিনা ভূমিকায়।

হাসি আসে, মাধুর্য আসে শান্তিতে। যতটা সম্ভব। টুকিটাকি খিটিমিটিব মধ্যে যুদ্ধেব জের টেনে চলবার মতো অন্ধ একগুঁয়ে তারা নয়, চাপা যখন পড়ল সংঘাত তখন তা চাপা দিয়ে রাখবাব মতো উদারতা তাদের আছে। ভালো তারা দুজনেই, মন তাদের ছোটো নয়, হৃদয় বড়ো কঠিন। কোমল অনুভূতি, ব্যাপক প্রেমভাব, মৃদুতম স্পর্শে সমবেদনার সাড়া, আধ্যাত্মিক ত্যাগপ্রেরণা, মার্জিত বিনয় ও নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধির সমাবেশ ঘটেছে তাদের মধ্যে। তারা কি পারে মিছামিছি পরস্পরকে ব্যথা দিতে ?

তবু হঠাৎ তারা মরিয়া হয়ে পরস্পরকে কুচিকুচি করে কাটে দিনে রাত্রে কয়েকবার,—তিক্ত বিস্বাদ হয়ে যায় জীবন ; দুজনেই ভাবে, এর চেয়ে মরণ ভালো।

দুজনেই ভাবে, কেন এমন হয় ? অনেক স্বপ্ন সফল হয়নি জীবনে, অনেক আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, অনেক বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বাস্তবের আঘাতে—তাই বলে অমন অশান্তি, এমন তিক্ততা কেন দুর্বহ করে তুলবে তাদের জীবনকে ? যা আছে তাও তো একেবারে তুচ্ছ নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। হাসি ও মাধুর্যভরা নিবিড় শান্তির দু-চারঘন্টা তো সার্থক করে রাখছে আংশিক জীবনকে—যা আছে, যা পাওয়া গেছে তারই মূল্যে। সমস্ত জীবনটা কেন অর্থহীন হয়ে গেছে ? কেন

দিবারাত্রি সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় মহাশূন্যে নির্ভরহীনতার আতঙ্কের মতো এই ভয়াবহ শূন্যতাবোধ জেগে থাকছে যে, সব মিছে—এই শেষ ?

মাঝে মাঝে নিজের মনকে জবাব দিয়ে বোঝাবার জন্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা ভাবে, জীবনটাই বুঝি এমনই ছেলেখেলার ব্যাপার, বিশ্রী।

প্রতিবিধানের সাধ্যমতো চেষ্টা করে।

সিনেমায় যাবে ?

চল যাই।

বেশ কাটে কয় ঘণ্টা।

সনৎ বিশেষ করে যেতে বলেছে কিন্তু।

না গিয়ে উপায় আছে ?

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

রবিবার ডাকলে হয় না ওদের ? নীলাকে পাওয়া যাবে গান গাইতে।

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

মোটে বারোদিন ছুটি। তবু চলো, ঘুরে আসি। অনেকদিন বাইরে যাওয়া হয়নি।

টাকা ?

সে হয়ে যাবে।

বেশ কাটে নটা দিন দিদির বাড়িতে, পাহাড়ে, বনে, ঝরনায়। কিন্তু সে তো কতকগুলি ঘণ্টা, কয়েকটা দিন ! ঘুষ দিয়ে কি জীবনকে বাগানো যায় !

সুনীল সৌম্যেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনোবিজ্ঞানে বিদেশি ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ায়। সে বলে, না, এটা কোনো বিশেষ মানসিক রোগের লক্ষণ নয়। কী জানিস, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এটা বৈশিষ্ট্য। ঝগড়া করে কেঁদে কেটে আদর চায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব মেযে এক রকম।

আদর চায় ? আদর ? ঝগড়া আর কাঁদাকাটার পর আদর তো তমসা পায় না, চায়ও না। কে জানে ! সৌম্যেন ভাবে, কে জানে ! ঝগড়ার পর আদর করতে যায় পরদিন তমসাকে।

এ আবার কী তামাশা ? তমসা বলে তাকে।

পাতলা কাঠির তক্তা গেঁথে, সাদা পেন্ট মাখিয়ে, দুভাগ-করা দোতলা। ও পাশের বাড়িতে নির্মল দস্তিদার থাকে। সৌমেন্যের সমবয়সি, বিদ্যা মাত্র দুবার বি এ ফেলের, চাকরি অনেক নিচুস্তরের সৌম্যেনের চাকরির তুলনায়, আয়টা সামান্য কিছু বেশি উপরি নিয়ে। স্ত্রীর নাম নলিনী, বয়সে দু-তিনবছরের ছোটো হবে তমসার। রূপসি বেশিই হবে সব হিসেবে। আশ্চর্য এই, ছেলে আর মেয়ে—দুটি দুজনের প্রায় একবয়সি।

নলিনী বলে, আপনি যদি মুখ্যু হতেন দিদি আমার মতো, সই পাতাতাম আপনার সাথে।

নির্মল অতটা সরল নয়। সৌম্যেনের দাম্পত্য ব্যাপার নিয়ে সোজাসুজি উপদেশ ঝাড়বার সাহসও তার হয় না। ইশপের মতো গল্পছলে সে দাওয়াই বাতলে দেয়। একবার নয়, অনেকবার। যে কোনো প্রসঙ্গে গল্পটা টেনে আনতেও অসুবিধা হয় না, বিজ্ঞাপন-লেখকদের মতো এ বিষয়ে সে নিরঙ্কুশ একস্‌পার্ট।

বলছেন তো দিন আর এক কাপ। ওতে আর কী। দু-চারকাপ বেশি চা খাওয়া অভ্যাসও হয়ে গেছে আজকাল।...সুন্দর চা করেন আপনার স্ত্রী, ভাগ্যবান মশায় আপনি...আগে ছিল না। আগে—মানে ওই বেশি চা খাবার অভ্যাসের কথা বলছি। সকালে এক কাপ, বিকালে এক কাপ বাঁধা। এক কাপ যদি বেশি চেয়েছি কোনোদিন, সর্দিটর্দি হলে পর্যন্ত—সেকি কাণ্ড মশাই, একেবারে যেন দাঁতমুখ

খিঁচিয়ে মারতে উঠতেন। সে রণচণ্ডী মূর্তি তো দ্যাখেননি দাদা। আর শুধু কি চা এক কাপ বেশি চাইলে ? ও লেগেই আছে উঠতে বসতে, পান থেকে চুনটি খসবার জো ছিল না, দেয়াল ফাটিয়ে দিত চেঁচিয়ে।

চায়ে চুমুক দেবার আরাম ভোগ করে নিয়ে তারপর সে শিউরে ওঠে অতীতের স্মৃতিতে, বাপ্‌স ! কী দিন গেছে ! তারপর সে গম্ভীর হয়। সৌম্যেন জানে, গম্ভীর হয়ে এবার সে কী বলবে। তবু সে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে, অনেকবার-বলা কথাটা এবার সে কী বলে শুনবার জন্য। দোষ ছিল আমারই। বোঝার দোষ। জীবনটা তো ছিনিমিনি খেলা নয়, আপনিই বলুন দাদা ? আনো খাও, সুখ কর, তাকে কি সংসার বলে ? মানুষের আত্মা আছে, তার তো একটা অবলম্বন চাই ? নইলে শুধু খেয়ে দেয়ে ফুর্তি করার জন্য সংসার হলে কি সুখ-শান্তি থাকে সে সংসারে ? মনটা বিগড়ে গেল একেবারে, ভাবলাম সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব। ভাবতে ভাবতে ধর্মে কেমন মতি হল একটু, বাড়িতেই অল্পবিস্তর চর্চা শুরু করলাম। সামান্য পুজো-আচ্চা জপতপ, সংসারে কী বলে গিয়ে তাই যথেষ্ট। বলব কী আপনাকে, সংসারের চেহারা যেন আমার বদলে গেল দুদিনে। জড়ি শিকড় ছোঁয়ালে সাপ যেমন মিইয়ে যায়, উনি ঠিক তেমনই ঠান্ডা ভালোমানুষ হয়ে গেলেন। সত্যি কথা দাদা, কুঁদুলে মেয়েমানুষ হল সাপের মতো, ধম্মোকম্মো ছাড়া তাদের বশ করার উপায় নেই। এখন দেখুন না, দশ কাপ চা চাইলে বানিয়ে দেবে ঠিক, কথাটি কইবে না।

সৌম্যেন তমসার কাছে গিয়ে বলে, ধর্মে তো আমরা বিশ্বাস করিই, ধর্মের কর্তারা যাই বলুন আমাদের একেলেদের সম্বন্ধে। ধর্মকর্মে আমাদের অবিশ্বাস নেই, কী করে ধর্মকর্ম করব তাই জানিনে বলে মুশকিল।

কিন্তু আজ ধর্মের কথা কেন ? সন্ন্যাসী হবে নাকি ? তমসা জিজ্ঞাসা করে।

ইচ্ছা হয়।

তা হবে না ? চাকরি করা সংসার করার কত কষ্ট !

দুজনের বেধে যায়, কুচিকুচি করে কাটে তারা পরস্পরকে। কাঠের দেয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে ঘরে সঞ্চারিত হয় ধূপের মৃদু গন্ধ। নলিনী ফুল-জল দিচ্ছে পটের দেবতাকে, স্নান করে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে।

নির্মলের পাঁচ বছরের মেয়ে মণি প্রসাদ এনে দিয়ে তাদের থামায়। কয়েকটি বাতাসা, কয়েক টুকরো শশা ও কয়েক কোয়া কমলা। ছোটো রেকাবিটিতে ছিটেফোঁটা চন্দনের গন্ধ। দুজনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

নির্মলদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে অনুভূতি গড়ে উঠছিল সেটা আবার নতুন করে স্পষ্ট অনুভব করে দুজনেই। সেই সঙ্গে নিজেদের মনে হয় বড়ো নিরুপায়।

পাতলা কাঠের পার্টিশন। একটা ফাঁকের কাছে এসে নলিনী বলে, একটা কথা শুনবেন দিদি ? পুজো-আচ্চা ধম্মেকম্মে একটু মন দিন। আপনি মন দিলে, ওনারও মন আসবে। দুজনে শান্তি পাবেন। আমাদের লাগত না আগে ? চুলোচুলি কাণ্ড হত না ? পট আনিয়ে নিত্যি পুজো করি— পুজো মানে ওই দুটো ফুল আর জল দেয়, আর কী ! চানটান করে শুদ্ধ হয়ে মনটা ঠিক করে নিয়ে কোনোদিন ওনাকে দিয়ে করাই। আর ছোটোখাটো নিয়মনীতি পালন করি। উনি যেন বদলে গেছেন, একেবারে নতুন মানুষ। রাগারাগি করেন না বললে হয়।

বলে সে সরল ভাবেই, হৃদ্যতার সঙ্গে। তবু একটু ঈর্ষা ও ব্যঙ্গের ভাব উঁকি মারে অন্তরাল থেকে। বসে গল্প করে সুখদুঃখের, মোটা গয়নার মতো মোটা সুখের, মাটিতে চেপে বসার মতো মোটা দুঃখের। জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে গেল সে সংসারে। বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই, আরাম নেই, শান্তি নেই। তবে মেয়েমানুষের আর কী চাই। এতেই মেয়েমানুষ ধন্য। স্বামীপুত্র রেখে যেতে পারলেই হয়।

জ্বালাতন পোড়াতন কীসে হলেন তবে ?

ওমা ! সামলাতে হয় না সব ? আপনি হন না ? অত লাগেন কেন কত্তার সঙ্গে তবে ?

নির্মলেরাও ছুটিতে বেড়াতে যায়। দেশের বাড়িতে যুদ্ধের ক-বছরও নিয়মিত গিয়েছে, এবারও যাবে। তার দেশের পথে এক ট্রেনে একই দিনে দূরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্দেশে সৌম্যেনেরা রওনা হবে শুনে নির্মল দারুণ খুশি আর উৎসাহিত হয়ে উঠল।

আপনাদের নামতে হবে, দুটো দিন থেকে যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। কোনো হাঙ্গামা নেই, স্টেশনে নামবেন, আবার স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠবেন। দুটো দিন কষ্ট করবেন।

বাড়িতে তার গাই বিইয়েছে। ক-মাস খাঁটি দুধ খাওয়াবে। যুদ্ধ শেষ হলেও দেশের অবস্থা খারাপ বটে, তাই বলে টাটকা মাছ তরকারি কী আর অতিথিকে সে খাওয়াতে পাববে না অন্নবিস্তর দুটো দিন। স্টেশন থেকে মোটে চার মাইল, ঘোড়াব গাড়ি পাওয়া যায়। কোনো কষ্ট হবে না। স্টেশনমাস্টার আবার নির্মলের নিজের বোনাই। দরকার হলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবে আধঘণ্টা, ভিড় হলে শোয়ার জায়গা করে দেবে। এ সুযোগে দেশেব বাড়িতে পায়ের ধুলো একবার না দিলে সৌম্যেনদের সে ছাড়বে না।

ওদের এত উৎসাহের মানে ভালো বোঝে না, কিন্তু তাদের দুদিন অতিথি পাবার জন্য ওদের আগ্রহ প্রায় মুগ্ধ কবে দেয় সৌম্যেন আব তমসাকে। ট্রেনে খানিকটা মানে বোঝা যায়।

সদরের ম্যাজিস্ট্রেট মুখার্জি সায়েবকে তো আপনি চেনেন ? নির্মল বলে কথায় কথায়।

জানা শোনা ছিল।

কাল আসবেন আমাদেব গাঁয়ের স্কুল দেখতে। দেখা হবে আপনার সঙ্গে। নির্মল বলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

ওব কাছে আপনার কি কোনো দরকাব— ? সৌম্যেন বলে, ফাঁদেব সন্দেহে বিব্রত হয়ে।

আবে রাম রাম। সোজা হয়ে উঠে বসে নির্মল। ও সব ভাববেন না। সভাটভা হবে, উনি আসবেন, দেখাসাক্ষাৎ হবে আপনার সঙ্গে, তাই বলছি। আমি কমিটিতে আছি কিনা। স্কুলের গ্রান্টটা কিছু বাড়াতে অনুরোধ করা হবে।

মানে খানিকটা বোঝা গেলেও তাতে নিমন্ত্রণের আন্তরিকতায় খুব বেশি সন্দেহ হয় না। ছাঁচে ঢালাই মানুষ নির্মল, কিন্তু লোক খারাপ নয়।

ভোরে তারা নামে। স্থানটি ছোটো, তার তুলনায় স্টেশনটি সত্যই খুব বড়ো। নির্মলেব নিজেব বোনাই স্টেশনমাস্টারটিকে খোঁজাখুঁজি করেও না পাওয়ায় নির্মল রীতিমতো ক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাব এ অপমানে যেন খুশি হয়েই নলিনী বলে, তোমারই তো বোনাই !

স্টেশন থেকে লাইনের পাশাপাশি বাঁধানো লাল রাস্তা গেছে অনেক দূর, রোগা ঘোড়া দুটি টকর টকর করে গাড়ি টেনে চলে। সকালের শান্ত রোদে এদিকে রেলের লাইন আর ওদিকে খেত মাঠ, ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি ও অস্থায়ী খড়ের ছাউনি দেখতে বেশ ভালো লাগে। সামনে কিছু দূরে চোখ পড়ে কারখানার উঁচু চোঙা।

আমাদের গাঁয়ের জমিদার রামপ্রাণ চৌধুরী, তার মিল। মিলে কী সব হাঙ্গামা চলছে শুনছিলাম !

পথ দক্ষিণে বেঁকে গেছে মিলের গেটের সামনে দিয়ে। কাছাকাছি গিয়ে তাদের ঘোড়ার গাড়িকে থামাতে হয়। মিলের গেটের দিকে মুখ করে পাশাপাশি রাস্তা বন্ধ করে আছে একটা লরি, থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে ইঞ্জিন, কিন্তু এগোতে পারছে না ! লরির সামনে থেকে গেট পর্যন্ত গাদাগাদি করে শুয়ে আছে মানুষ। পুরুষ ও নারী। চারিদিকে ভিড় করে আছে আরও অনেক লোক।

নির্মল দেখিয়ে দিল, উনি চৌধুরী মশায়।

খদ্দরের কোট গায়ে মোটা ভুঁড়িওলা মানুষটি, হাতে দামি কাঠের মোটা লাঠি। দুপাশে ও পিছনে তার সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে ডজন খানেক পুলিশ। থেকে থেকে চৌধুরী গর্জন করছে : চালাও চালাও উপরসে চালাও। চাপা দে দেও শালা লোককো !

লরির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠছে। লরির এক হাত সামনের শায়িত মানুষ একটু নড়ছে না। ইঞ্জিনের গর্জন কমে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে সৌম্যেন আর তমসা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। তমসার ছোটো ছেলেটা কাঁদে, নলিনী তাকে থামাতে চেষ্টা করে, তমসার খেয়ালও থাকে না। তখন হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে অবস্থার। ইঞ্জিন একেবারে থামিয়ে দিয়ে লরির ড্রাইভার নীচে নেমে আসে।

নামলি যে হারামজাদা ? রামপ্রাণ গর্জে ওঠে।

আমি পারব না। আপনি চালান।

রামপ্রাণের প্রাণে বোধ হয় আর সয় না। অকথ্য একটা কথা বলে সে হাতের লাঠি বসিয়ে দেয় লরি-চালকের মাথায়। সে ঘুরে পড়ে গেলে তার দিকে এক নজর না তাকিয়েই এগিয়ে গিয়ে রামপ্রাণ আথালিপাথালি পিটতে থাকে শায়িত পুরুষ ও মেয়েদের।

তমসার মাথাটা বোধ হয় বিগড়ে যায় দেখে। মুখে চেঁচায়, এ কী ! এ কী ! কাজ করে আবও অদ্ভুত। ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে তড়াক করে নেমে ছুটে গিয়ে দুই হাতে জড়িযে ধরে রামপ্রাণেব মোটা শরীরটা।

কী করছেন আপনি ?

নিজেকে মুক্ত করে রামপ্রাণ বলে, তুমিই বুঝি সরোজিনী ?

না। আপনি মানুষ না পশু ?

সৌম্যেন লরি চালকের মাথায় বুমাল চেপে ধরেছিল। সে ডেকে বলে, শুনছ ? ছোটো সুটকেসে ছেঁড়া কাপড় আছে আমার, খানিকটা ন্যাকড়া ছিঁড়ে আনো তো।

বিকালে স্কুলের সভায় সৌম্যেনের যাওয়া হয় না। রামপ্রাণ চৌধুরীর মিলেব অদূবে প্রতিবাদ সভা হবে, গাঁয়ের অর্ধেক লোক সেখানে ছোটে। সৌম্যেনও যায়।

বড়ো ছেলেটাকে নলিনীর কাছে রেখে ছোটো ছেলেকে কোলে নিয়ে তমসাও সঙ্গে যায় সৌম্যেনের।

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেও তারা রাত জেগে কথা বলে। পরের বাড়ির নতুন আবেষ্টনীতে যেন নতুন করে তাদের বিয়ে হয়েছে। সুখদুঃখের কথাই বলে। নিজের নিজের নয়, অনেকের সুখদুঃখের কথা।

দেবতা

পদস্থ ও বয়স্ক ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন ব্রজদুর্লভবাবু। চেহারাটা ছিল জমকালো। চ্যাপটা ধরনের নয় গোলাকার। সম্ভবত সেই জনাই মেরুদণ্ডটা ভদ্রলোকের সব সময় সোজা হয়ে থাকত। মনের জোরের বদলে এই কারণে মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে থাকত বলেই বোধ হয় তার অপরিমেয় তেজ ও সাহস ছিল পাথরের কামানের মতো নম্র। হাকিমি পদগৌরব আর কীর্তনের আসর জমাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছাড়া কোনো বিষয়ে অহংকার করার কিছু না থাকায়, বিনয়ের তার একেবারেই প্রয়োজন ছিল না। তবু পুরুষোচিত বিনয় বজায় রাখবার জন্য পদগৌরবটা ভদ্রলোক প্রকাশ করতেন পাণ্ডিত্যে আর কীর্তনের অসাধারণ ক্ষমতাটা প্রকাশ করতেন কেবল কীর্তনে। পাণ্ডিত্যের বিশেষ অভাব থাকায় মানুষের সভয় শ্রদ্ধাটা তার ভালোরকমই জুটত, কীর্তন গেয়ে মানুষকে ভাবোন্মাদ করে দেবার বিশেষ প্রতিভা থাকায় মানুষের হৃদয়ে তার জন্য বয়ে যেত সানুরাগ ভক্তির বন্যা।

কী যে হয়ে যেতেন তিনি কীর্তনের আসরে ! গায়ে দামি মুগার জামা থাকত, তবু দীনহীন কাঙালের মতো একবার, শুধু একটিবার, চিরন্তন প্রেমময়ের অফুরন্ত প্রেমের ভান্ডার থেকে এক কণা প্রেম ভিক্ষা করতেন, তখন মনে হত এত বড়ো কাঙাল কি জগতে কেউ আছে ! চাকর আসরে তামাক দিতে এসেছে, তার গলা জড়িয়ে ধবে তিনি কাঁদতেন। আধা-অন্তরালবর্তিনী মেয়েদের অনেকের চোখ দিয়ে ভাবাবেগে জল পড়ছে, আনন্দে গদগদ হয়ে তিনি নাচতেন। নিজের মধুর ও গম্ভীর গলার আওয়াজ একটু ধরে এসেছে, আবেগে গড়াগড়ি দিয়ে তিনি ছটফট করতেন। রাত্রি বেশি হয়ে পড়ায় উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে কেউ কেউ উঠি উঠি করছেন, বারকয়েক হুংকার দিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ সমাধিমগ্ন হয়ে তিনি পড়ে থাকতেন।

আসর বসত প্রায়ই। সাধারণত শনিবার সন্ধ্যায়, অথবা অন্তত একটা দিনও ছুটি হাতে থাকে এমন কোনো দিনে। কীর্তনের শ্রান্তি দূর করবার জন্য ব্রজদুর্লভবাবুর কমপক্ষে একটা দিনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম অথবা কমবয়সি (সম্ভবত দ্বিতীয় পক্ষের, ঠিক মনে নেই) স্ত্রীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন পার্থিব প্রেমালাপের প্রয়োজন হত। তবে মোটে এক দিনের ছুটি থাকলে বেশি শ্রান্তি তিনি অর্জন করতেন না, রাত বারোটার আগেই কীর্তন শেষ করে দিতেন। রাত কাবার করতেন লম্বা ছুটির গোড়ায়, মনে হত যে উৎসব উপলক্ষে ছুটি সেই উৎসবই তার মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

মফস্‌সলের হতভাগা শহর, সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, ভদ্রলোকের উপযুক্ত অভদ্র স্ত্রীলোকের পল্লি নেই, গোটা তিন চারেক মুমূর্ষু সমিতি ছাড়া জবরদস্ত সমিতি নেই, জোরালো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও নেই,—থাকার মধ্যে আছে কেবল একটা ক্লাব আর লাইব্রেরি। ব্রজদুর্লভবাবুকে পেয়ে শহরটা যেন বর্তে গিয়েছিল। নিজের বাড়িতে কীর্তনের আসর বসাবার প্রয়োজন ভদ্রলোকের হত না। জীবনের অব্যক্ত অংশের পীড়ন থেকে মুক্তিকামী নরনারীকে উন্মাদনা জোগাতেন তিনি পরের বাড়ি। বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে আসবার এবং বাড়িতে পৌঁছে দেবার গাড়ি জোগান, আসরের শতরঞ্চি ফরাশ আলো এবং দরকার হলে শামিয়ানা ও শখ হলে আসরকে সাজসজ্জা দান করা, বাজারে ঢুকবার পথে প্রথম মুদি দোকানটির মালিক রাধাচরণ বসাক নামে যে ব্যক্তিটি খোলকে প্রায় কথা বলাতে পারে তাকে সংগ্রহ করে আনা, শহরের কীর্তন বিশারদ ও কীর্তন রসজ্ঞদের সমবেত করা, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মাঝে মাঝে পান তামাক আর

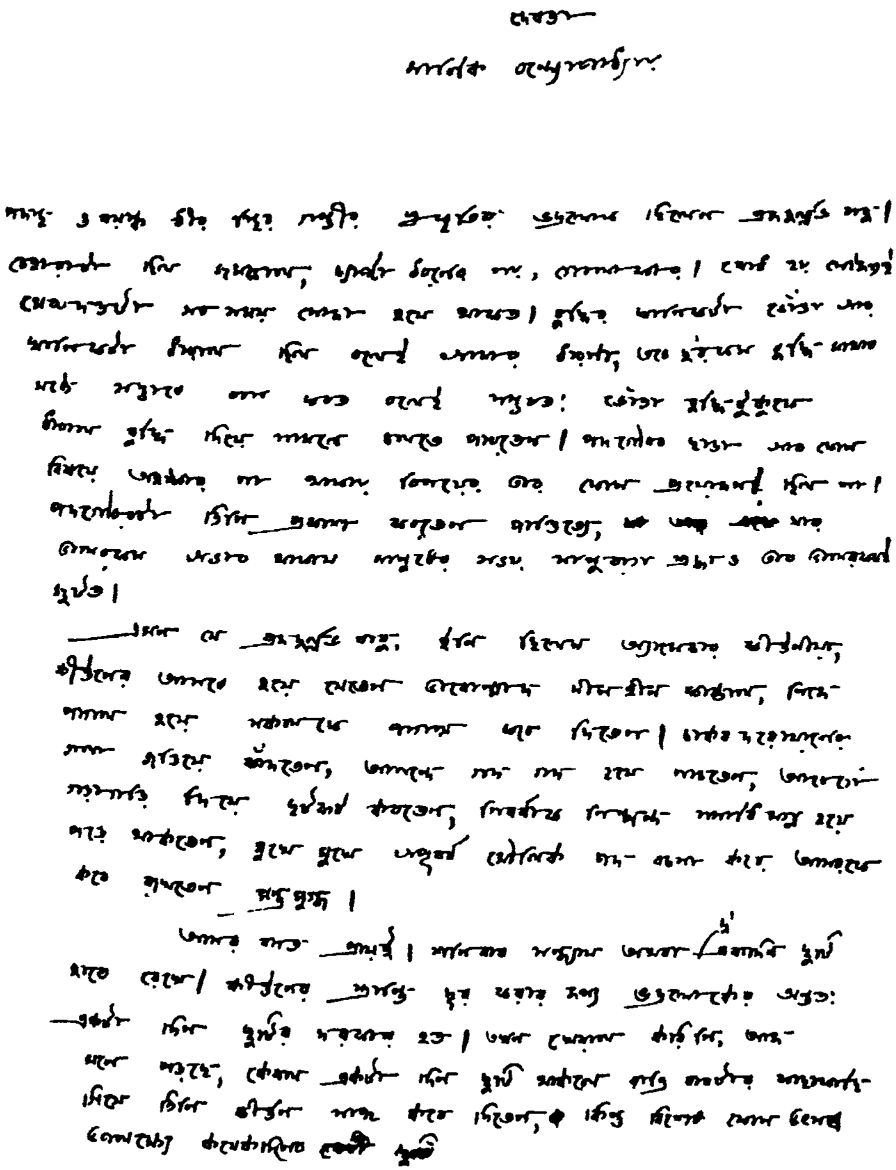
দেবতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতা গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

শীতল পানীয়জল সরবরাহ কবা, এই সব ব্যবস্থা করে ব্রজদুর্লভবাবুর কৃপায় রোমাঞ্চ, শিহরন আবেগ, উন্মাদনা প্রভৃতি লাভ করার জন্য শহরের অনেকেই উৎসুক হয়ে থাকতেন।

বেশি উৎসুক ছিলেন স্থানীয় রাজা-জমিদার মুরারীমোহন। প্রথম বয়সে নাট্যচর্চার উৎসাহে তিনি একটি স্থায়ী স্টেজ নির্মাণ করেছিলেন। জীবনের অলস অনাড়ম্বর গতিতে অসন্তুষ্ট এই শহরের এই অপ্রধান শহরে ব্রজদুর্লভবাবু সুলভ হওয়াব অনেক আগে স্টেজে অভিনয় রজনির সংখ্যা কমতে কমতে বছরে বার তিনেকে এসে ঠেকেছিল। মাসে চার-পাঁচবার ব্রজদুর্লভবাবুব কীর্তন আরম্ভ হওয়ার পর পূজার সময কেবল একদিন একটি মাত্র ছোটো ভক্তিমূলক নাটকের অভিনয় হত। প্রহসন পর্যন্ত বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

শহরবাসীর সকাতর অনুরোধে কত কষ্টেই যে ব্রজদুর্লভবাবু তিন-তিনবার নিজের বদলি রদ করেছিলেন।

ক্যানেলের ধারে ব্রজদুর্লভবাবুর বাড়িখানা ছিল লোভনীয়। লাল রং করা মাঝারি আকারের সাধাবণ দোতালা বাড়ি, রঙের আবরণ ছাড়া কিছুই হয়তো নতুন ছিল না, শোভার হিসাবে চারিদিকে প্রকৃতিও ছিল রিক্ত, তবু কামুক যুবকের কাছে প্রতিবেশীর অনাদৃতা পত্নীর মতো কী আশ্চর্য মনোরমই বাড়িটা ছিল ! ক্যানেলের স্রোতহীন স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে প্রকাণ্ড অপরিচ্ছন্ন আমবাগান, যার পিছনে আজও সূর্য অস্ত যায়। পুবদিকে খানিক দূরে পাকা রাজপথ, যা থেকে একটা কাঁচাপাকা পথ এ বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। শাখা পথটির দক্ষিণে প্রকাণ্ড দিঘি, উত্তবে ছেলেদের ফুটবল খেলাব মাঠ। দিঘিব দক্ষিণে স্কুল। ব্রজদুর্লভবাবুব বাড়িব ছাতে উঠলে দেখা যায স্কুলেরও ওদিকে অনেকগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো বাড়ি পার হয়ে বাজপথ মোড় ঘুরে পুলের ওপর দিয়ে ক্যানেল ডিঙিয়ে শহরের আরও জমাটবাঁধা অংশে প্রবেশ করে হাবিয়ে গেছে। যদি কারও জীবনে কোনোদিন কোনো প্রিয়জন নিরুদ্দেশ যাত্রা করে থাকে, ব্রজদুর্লভবাবুর বাড়িব ছাতে উঠে পুল ডিঙিয়ে রাজপথটির শহরেব ঘনীভূত অঞ্চলে ঢুকে নিরুদ্দেশ হবাব রকম দেখলে তাব মনে হবেই, এও একটা নিরুদ্দেশ হবার পথ।

তিনবার বদলি হবার সম্ভাবনা ঘটলে ব্রজদুর্লভবাবুর স্ত্রী, যার নাম সম্ভবত ছিল মাধবী, খোনা গলায় বলেছিলেন, ওরে বাবারে গলায় দড়ি দিয়ে মরব নাকি আমি ! এই সেদিন এসে গোছগাছ করে বসলাম এখেনে, দুদিন যেতে না যেতে বদলি ! যেতে হলে তুমি যাও, আমি যাব না।

সেটা সম্ভব নয়। তাই কত কষ্টেই যে ব্রজদুর্লভবাবু তিন-তিনবাব নিজের বদলি রদ করেছিলেন।

সহজ বিষয়কে কঠিন করার সবচেয়ে সহজ উপায় মাঝে মাঝে ধারাবাহিকতার খানিক খানিক গাপ করে ফেলা ! রামকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে সিগারেট টানাবার পর ইন্দ্রেব সভায় আসব পান করালে, দশবছর সময় আর রক্তের চাপে রামের মৃত্যুকে যে চুরি করেছে পরম রহস্য-স্রষ্টা বলে সেই চোরের পায়ে মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। নিজের জীবনের ধারাবাহিকতার ছোটোবড়ো অংশ ক্রমাগত পরকে দান করে করে মানুষের আজ এই দশা হয়েছে। তাই শেষবার বদলি রদ করতে হওয়ার রাগে সাতদিনের ছুটি নিয়ে পরপর তিনরাত্রি ভদ্রলোক কীর্তন করেছিলেন।

মাধবীর কীর্তন-শ্রান্ত স্বামীর সেবার তুলনা জগতে আছে কিনা সন্দেহ। স্বামী যেন স্বামী এবং পুত্র এবং পর এবং অতিথি—একাধারে সব। ব্রজদুর্লভবাবুর কীর্তন শুনে সকলের যে রোমাঞ্চ হত, মাধবীর খোনা গলায় একটি মাত্র মধুর সম্ভাষণেই ব্রজদুর্লভবাবুর তার চেয়েও গুরুতর রোমাঞ্চ হওয়া অসম্ভব ছিল না। মানুষ ব্রজদুর্লভবাবু যেতেন কীর্তনের আসরে, নিজে পাগল হয়ে সকলকে করে

দিতেন পাগল, নিজের অলৌকিক পরিণতির সঞ্চয় নিয়ে তিনি যখন বাড়ি ফিরতেন মাধবীর পূজা পাবার জন্য তখন হয়ে যেতেন দেবতা।

অন্তত আমার যে নিঃশব্দ পূজা নিয়ে তিনি বাড়ি যেতেন, দেবতা ছাড়া আর কারও তা প্রাপ্য নয়।

আসরে যেতাম সকলের আগে। বাড়িব দিকে পা বাড়াতাম ব্রজদুর্লভবাবু গাড়িতে উঠে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসবাব পর গাড়ি যখন চলতে আবম্ভ করত। একবার শেষ চোখাচোখি হওয়ার সাধ কোনোদিন আমার মিটত, কোনোদিন মিটত না।

কীর্তন শুনতে শুনতে বুকফাটা বিহুলতায় যে চোখ দিয়ে আমার জল পড়ত, সবদিন সে চোখেব দিকে তাকিয়েও যেতেন না, এমনই নিষ্ঠুর ছিলেন ব্রজদুর্লভবাবু। স্বাধীন স্বাভাবিক চোখে তখনও আমার চশমা ওঠেনি, চোখের জল 'ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে না পড়ার তো কোনো কাবণ ছিল না।

আসরে বড়োর মধ্যে আমি ছোটো, চুপ করে বসে থাকা ছাড়া সব বিষয়েই অনধিকারী। কীর্তন আরম্ভ হলে আমার ভাবান্তর হবে আমি তা জানতাম। তাই প্রথম·থেকে হয়ে থাকতাম নির্বাক নিঃশব্দ সুশীল সুবোধ বালক, কেবল ভাবের অভিব্যক্তিতে একটু চঞ্চল। তবু মাঝে মাঝে কেন যে আমাকে শুনতে হত, গোলমাল কোরো না খোকা, আজও তা বুঝতে পারি না। তবে তাতে আমার ক্ষতি ছিল না। এত বড়ো হৃদয় ছিল তখন যে ব্রজদুর্লভবাবু যা পরিবেশন করতেন তার সঙ্গে এ সব কথা শোনাব অভিমানেরও হৃদয়ে স্থান হত।

গুরুজন বলতেন, অনেক রাত হয়ে গেছে, চল এবার বাড়ি যাই। ঠোঁট কামড়ে অসম্মতি জানাতাম। ঠোঁট কামড়াতাম কথা বলতে পারতাম না বলে। গুরুজন শঙ্কামিশ্রিত চিন্তাকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখতেন।

বাড়ি ফেরার পথে শুনতাম, লেখাপড়া ফেলে এ সব করলেই তোর দিন যাবে ?

কে সে কথার জবাব দেবে ? দিন তো চলে গিয়েছে কখন ! গাছের আড়ালে ক্ষীণাঙ্গী চাঁদ। পাতা আর ডালের ফাঁকে ফাঁকে আলোর বিন্যাসেব সঙ্গে ছাযাব যোগাযোগ ঘটিযে ইচ্ছামতো মূর্তিকে রূপ দেওয়া যায়।

জিজ্ঞাসা করতাম, কেঁদে কেঁদে দেখতে চাইলে দেখা দেন, না ? কত কাঁদতে হয় ? অনেক ? গুরুজন বলতেন, চল, জোরে হাঁট।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে আলোচনা শুনতাম, আমার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের সম্বন্ধে। এই বয়সে এ রকম পাগলামি আমার অকল্যাণ ঘটাতে পারে ভেবে আমার আপনজনের আশঙ্কায় আমাকে আশ্চর্য কবে দিত। আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবার জল্পনা-কল্পনা শুনতে শুনতে ঘুমের ভান কখন আসল ঘুমে পরিণত হয়ে যেত, স্বপ্ন দেখতাম আমার জাগ্রত কল্পনার তপ্তকাঞ্চনাভ বিরাট এক পুরুষের অবিভক্ত অস্তিত্বের এবং আমার প্রতিবেশিনী সখী রেণুর সবচেয়ে ছোটো পুতুলটির মতো শুভ্রকায় বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র এক পুরুষের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অস্তিত্বের কী ভাবে দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না হওয়া সম্ভব। চারিদিকে অসংখ্য ব্রজদুর্লভ পলকে পলকে মাধবী হয়ে যাচ্ছে অথবা অসংখ্য মাধবী পলকে পলকে ব্রজদুর্লভ হয়ে যাচ্ছে, স্বপ্নে এ সব ঘোরপ্যাঁচ আমায় পীড়া দিত না। ধারাবাহিকতার ফাঁদ এড়িয়ে অনায়াসে ভিজা মাঠে ভিজা ফুটবল শুট করে গোলের দিকে পাঠিয়ে দিতাম, পরক্ষণে নিজে চলে যেতাম উলঙ্গিনি মাধবীর কাছে।

মাধবীর কাছে যেতাম, সকালে ঘুম ভেঙে নয়, স্কুল পালিয়ে।

দোতালার একটা ঘরের কোণে ছোটো একটি কাঠের বেদিতে কোনো একজন দেবতার পট, তার সামনে ছোটো দুটি রেকাবিতে ফলমূল বাতাসার নৈবেদ্য সাজিয়ে মাধবী পূজায় বসেছে। বিড় বিড় করে কী মন্ত্র বলছে সেই জানে।

আমাকে দেখেই বলত, মহারাজ এসেছেন ? আসুন, বসুন।

কীর্তনের আসরে যার জন্য ব্রজদুর্লভবাবু পাগল হয়ে যেতেন তাকে পাওয়া যায় কিনা, কী করলে পাওয়া যায়, দিনরাত মনের মধ্যে এই প্রশ্ন গুমরে বেড়াত ! ব্রজদুর্লভবাবুকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেই তাদের বাড়ি যেতাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস হত না। ভাবতাম মাধবীর কাছে প্রশ্নের জবাব জেনে নেব, পূজারতা মাধবীর ফাজলামিতে সে ইচ্ছাও লোপ পেয়ে যেত। ম্লান মুখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পটের অজানা দেবতার মধ্যে আমার কল্পনার মহান সুন্দর প্রেমময় দিব্য পুরুষকে প্রণাম করে নীরবে মাটিতেই বসতাম।

পূজা সাঙ্গ করে মাধবী আমাকে প্রসাদ দিত। দুহাত পেতে প্রসাদ নিতাম, সসম্ভ্রমে কপালে ঠেকিয়ে মুখে দিতাম। শশার টুকরোটি লাগত তিতো। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ তো তিতো লাগলে চলবে না। অমৃতের মতো মধুর লাগছে মনে করবার চেষ্টা করতে করতে তিতো শশা গিলে ফেলতাম।

মাধবী শশার টুকরোতে কামড় দিয়ে বলত, কী তিতো মাগো !

বলে, খোলা দরজা দিয়ে বারান্দা ডিঙিয়ে শশার টুকরোটি ছুঁড়ে ফেলে দিত উঠানে।

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম, ভাবতাম, এমন অবহেলার সঙ্গে এত বড়ো পাপ সঞ্চয় করবার সাহস সে পেল কোথায় ? ঠাকুরের প্রসাদ মুখে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল !

প্রসাদ ফেলে দিলেন ?

বড়ো তিতো! এক একটা শশা এমনই হয়ে যায়।

একটি দুটি করে বাতাসা মুখে দিত মাধবী, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকত ক্যানেলের জলের দিকে।

পায়ে পায়ে নীচে যেতাম অপরাধীর মতো, আমার চোখের সামনে প্রসাদ ছুঁড়ে ফেলে মাধবী যে দেবতাকে অপমান করেছে সে দায়িত্ব যেন আমার। উঠানে নেমে দেখতাম, উঠানের একদিকে নর্দমার কাছে যেখানে আবর্জনা জমা করা হয় সেইখানে মাধবীর চিবানো শশাটুকু পড়ে আছে। হাতখানেক তফাতে একটা কেন্নু হেঁটে চলেছিল, মৃদু মন্থর গতি। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখা নর্দমা সাফ করার ঝাঁটাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে অর্ধেকের চেয়েও কমে গেছে। এত ঝাঁটানো সত্ত্বেও সেখান থেকে কিন্তু শ্যাওলা লোপ পায়নি। সেদিন সকালেই হয়তো সেখানটা সাফ করা হয়েছিল, তারপর হয়তো কেটেছিল মোটে কয়েকটি ঘণ্টা সময়, তারই মধ্যে এই ছোটোখাটো সংসারটির কত নোংরামিই যে সেখানে জমেছে ! বুকে বল সঞ্চয় করবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেবতার ইঙ্গিত খুঁজেছিলাম, চারিদিকে তাকিয়ে একবার দেখেছিলাম মানুষ আমাকে দেখেছে কিনা, তারপর পানের পিক থেকে তুলে নিয়েছিলাম সেই চিবানো শশা। মাধবীর হয়ে মনে মনে বলেছিলাম, অপরাধ নিয়ো না। কপালে ঠেকিয়ে শশাটুকু মুখে দিয়ে গিলে ফেলেছিলাম।

বমি আসছিল এ কথা সত্য, কিন্তু মনের জোরে বমি ঠেকানো কঠিন নয়।

ভয়ংকর

বিশ্বম্ভব গদিতে বসে তামাক টানছে, আশেপাশে প্রসাদ ও অন্যান্য কর্মচারী। তামাক টানতে টানতে বিশ্বম্ভবেব কাশি, সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও খক্ খক্ করে কাশতে আবম্ভ কবল। পবে বিশ্বম্ভরেব কাশি থেমে গেল কিন্তু প্রসাদের কাশি আর থামে না। তখন—

বিশ্বম্ভব : [*ধমকে*] প্রসাদ !

প্রসাদ : [*কাশি থামাতে পাবলে না*]

বিশ্ব : [*আবও জোবে*] প্রসাদ—!

প্রসাদ : [*কাশি চাপতে চাপতে*] আ্-জ্ঞে—!

বিশ্ব : বলি তোমার ব্যাপারটা কী হে প্রসাদ ? আমি কাশলে তোমাব কাশি পায কেন ?

গজেন : বেযাদপি বাবা—স্রেফ ছোঁড়ার বেযাদপি। শুধু কাশলে কেন, তুমি হাসলেও ওব হাসি পায।—ভগবান না করুন, তুমি যদি কখনও কাঁদো—

বিশ্ব : [*উচ্চহাসি*] হাঃ—হাঃ—হাঃ—কাঁদব কেন মামা।

গজেন : বালাই ! কাঁদবে কেন ?

বিশ্ব : তোমাব কিন্তু এ ভারী বিশ্রী স্বভাব প্রসাদ। তামাক টানতে গিযে আমি দুবাব কাশলুম, তুমিও অমনি কাশতে কাশতে মববাব দাখিল হলে।

প্রসাদ : না বাবু, তা নয—

বিশ্ব : ইস, মুখখান যে টুকটুকে লাল হয়ে উঠল।

গজেন : আর বল কেন বাবা, ছোঁড়া কথায কথায মেযেলোকেব মতো লালচে মেবে যায়। ও যদি মেযেলোক হত—

বিশ্ব : প্রসাদ যদি মেযেলোক হত। হাঃ—হাঃ—হাঃ— হাঃ—

[*উচ্চহাসি, সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও হাসতে থাকবে। বিশ্বম্ভবেব হাসি থেমে গেলেও প্রসাদেব হাসি থামবে না*]

বিশ্ব : প্রসাদ !

প্রসাদ : [*হাসি চলতে থাকবে*]

বিশ্ব : [*ধমকে*] প্রসাদ !

প্রসাদ : [*আচমকা হাসি থামিযে*] আ জ্ঞে !

বিশ্ব : ফের যদি এ রকম বেযাদপি কববে প্রসাদ—

প্রসাদ : [*কাতব ভাবে*] আজ্ঞে বেয়াদপি নয বাবু।

বিশ্ব : কী তবে ? মাথায ছিট আছে ?

প্রসাদ : না বাবু।

বিশ্ব : কাঁপছ কেন ? জ্বব আসছে ?

প্রসাদ : আজ্ঞে না তো !

বিশ্ব : তবে ?—মুখখানা ফের দেখছি কাগজের মতো সাদাটে বনে গেছে। গায়ে কি তোমার রক্ত নেই ?

প্রসাদ আজ্ঞে- ছেলেবেলা থেকে নানারকম অসুখে ভুগছি-

বিশ্ব কী অসুখ ? সাত বছর আমার কাছে আছ, তেমন কোনো অসুখ বিসুখ হতে তো কখনও দেখিনি।

প্রসাদ আছে বাবু, ভেতরে ভেতরে আছে।

বিশ্ব ছাই আছে। রোগীর মতো রোগা চেহারা তোমার নয়।

প্রসাদ কিছু নেই বাবু দেহে। দিনরাত বনবন করে মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে। নিয়ম মেনে সাবধানে চলি বলে কোনোমতে টিকে আছি। একদিন যদি বিষ্টিতে ভিজি, সর্দি কাশি নিম্যুনিয়া হয়ে মরে যাব।

বিশ্ব তোমার মরাই ভালো

গজেন মরেই তো আছে বাবাজি !

বিশ্ব যাই হোক, কারখানায় টাকাটা আগে পৌঁছে দিয়ে মরো বাঁচো যা খুশি কোরো। আজ মাইনে না দিলে কাল কেউ কাজে আসবে না বলেছে। ব্যাটাদের আস্পদ্দা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আবার আইন দেখায়—আমি বিশ্বম্ভর শর্মা, বামুনের ছেলে হয়ে চামড়ার কারখানা খুলেছি, আমায় আইন দেখায় ! কোনো ব্যাটাকে আমি ডরাই ! থাকগে দেব বলেছি আজকে, তাই পাঠাচ্চি,- নইলে একবার দেখে নিতাম ব্যাটারা কী করে !— হিসেব ঠিক আছে মামা ?

গজেন ঠিক আছে বাবাজি ! ন শো তেইশ টাকা পাঁচ আনা তিন পাই।

বিশ্ব কামাই কেটেছ সব ?

গজেন হ্যাঁ— !

বিশ্ব আচ্ছা তবে প্রসাদকে হিসেবের কাগজটা দাও। বেলাবেলি চলে যাও প্রসাদ। বৈশাখ মাস - ঝড় টড় উঠতে পারে। আমি ঘরে গিয়ে টাকা বার করে রাখছি।

প্রসাদ যে আজ্ঞে।

বিশ্ব মামা, তুমিও বেরোও। আড়তে গিয়ে বংশীকে বোলো, রাতের চালানটা যতক্ষণ না আসে আড়তে লেগে বসে থাকতে হবে, লোকজন নিয়ে। দরকার হলে সমস্ত রাত ! হাঁ—আর একটা কাজ কোরো মামা। আসবার সময়ে দুটো বোতল নিয়ে এসো।

গজেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্চে না বাবা ? কদিন উপরো উপরি একটানা চলছে—

বিশ্ব তোমার ভাগনে বউ আজ মাংস রাধছেন কোর্মা ! বলেছেন পেট ভরে ভালো করে না খেলে কাল বাপের বাড়ি চলে যাবেন। ভদ্দরলোকে শুধু শুধু মাংস খেতে পারে মামা ! প্রসাদকে আজ এক গেলাস খাইয়ে দেব। ভদ্দরলোকের ছেলে—তিরিশ বছর বয়েস হল, একদিন একটু চেখে দেখলে না বিলিতির স্বাদ ! আজ চাখিয়ে দেব।

প্রসাদ না— বাবু না!

বিশ্ব আরে মোলো -এটা মানুষ না বাঁদর ?—যাক, আমি চললাম যেমনটি বলেছি- সেইমতো যেন সব কাজ হয় ! [*বিশ্বম্ভর চলে গেল*]

গজেন দেখলে প্রসাদ ? দেখলে ? আমি ওর মামা, গুরুজন আমার সঙ্গে ব্যাভারটা দেখলে ? আমি মামা—আমি মদ এনে দেব—তাই উনি গিলবেন—!

প্রসাদ বড়ো তেজি মানুষ !

গজেন তেজি না তোমার মাথা ! একটা পাষণ্ড—খাঁটি পাষণ্ড ! তবু যদি মাইনে বাড়িয়ে দিত দশটা টাকা। তিনমাস ধরে বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, গেরাহ্যিই করে না। বামুনের ছেলে চামড়ার ব্যাবসা করলে এমনই হয়—হাঁড়ি-মুচি ডোমের অধম হয়ে যায়।

প্রসাদ : [*সভয়ে*] আঃ একটু আস্তে আস্তে বলুন—শুনতে পাবেন যে ?

গজেন : [*চমকে উঠে তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে*] পায় পাবে ! ওকে ডরাই আমি ? কী করবে আমার ? তাড়িয়ে দেবে ? দিক—তাড়িয়েই দিক। মামা হয়ে ভাগনেব দাসত্ব—ছোঃ !

প্রসাদ : আমার বাকি মাইনের কী হবে মামাবাবু ?

গজেন : ছাই হবে—কচুপোড়া হবে ! আজ না মাইনের কথা বলবেই ঠিক করেছিলে ? কই, এতক্ষণ ধরে এত কথা হল বলতে পারলে না বাকি মাইনেব কথাটা ?

প্রসাদ : সাহস হল না। মেজাজটা যেন কেমন কেমন--

গজেন : হুঁ—তবে আর তুমি বলেছ। এর চেয়ে ভালো মেজাজ ও গুন্ডাটাব কস্মিনকালেও দেখতে পাবে ভরসা কোরো না। মরুকগে বাবা—আমার কী ?—যাই আড়ত হয়ে বোতল দুটো নিয়ে আসি—যত সব ইয়ে—

[*শেষের কথাগুলি বলতে বলতে যাবে*]

প্রসাদ : বাবুকে কেউ গাল দিলে শুনতে ভালোই লাগে, আবার কেমন বিশ্রী একটা অস্বস্তিও বোধ করি। গা কাঁপতে থাকে।

ফুলি : [*নিকটে এসে*] কাঁপবে না ? গা তোমাব সারাক্ষণ কাঁপবে ! পুরুষ মানুষ তো তুমি !

প্রসাদ : ওঃ—ফুলি ! আচমকা তোমায় দেখে চমকে গেছি—

ফুলি : চমকাবে না ? সারাক্ষণ চমকাবে ! পুরুষ মানুষ তো তুমি !

প্রসাদ : আজ যে বড়ো ঝাঁঝ দেখছি কথার !

ফুলি : হবে না ঝাঁঝ ? সব শুনেছি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, সব দেখিছি। আজকেও বড়দা তোমায় বাঁদব নাচ নাচালে ? হেসে-কেঁদে ঘেমে-কেশে আজও ভূত বনে গেলে ? ছিঃ ছিঃ ! তোমার যত বাহাদুরি আমার কাছে। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে কত লম্বা চওড়া কথা শোনানো হল আমায—স্পষ্ট কবে কথা কইব, বাকি মাইনে চেযে নেব, কত কী !—আব বড়দার সামনে গিয়ে কুকুরের মতো পা চাটতে লাগলে ! মা গো মা,—কী লজ্জা—কী ঘেন্না—

প্রসাদ : ফুলি—শোনো—

ফুলি : না, শুনব না। কথা কইব না তোমার সঙ্গে।

প্রসাদ : আহা—শোনোই না—

ফুলি : না শুনব না। আজ থেকে কোনো সম্পর্ক নেই তোমাব সঙ্গে।

প্রসাদ : [*হতাশাব সুরে*] সম্পর্ক আর হলো কই যে সম্পর্ক ছেদ কবছ ? আমাকে দিয়ে কিছু হবে না ফুলি, আমি একেবাবে অপদার্থ। আশা ভরসা আমি সব ছেড়ে দিয়েছি ! তুমি রাগ কোরো না ফুলি—

ফুলি : আমি রাগ করলেই বা তোমার কী ! আমি বুঝিনে ভেবেছ ? বড়দাব কাছে টাকাটা চেযে নিলে আমায় বিয়ে করতে হবে কি না, তাই তুমি ন্যাকামি করে আমায় ভুলোচ্ছো ! [*কাঁদোকাঁদো হয়ে*] আমার যেমন পোড়াকপাল—বাপ থেকেও নেই, কিন্তু দড়ি-কলসি তো আছে—পুকুরের জলও শুকোয়নি—

প্রসাদ : [*ব্যাকুল হয়ে*] কেঁদো না ফুলি, তা হলে আমিও কেঁদে ফেলব কিন্তু।

ফুলি : ওমা—সত্যিই কেঁদে ফেললে যে !

প্রসাদ : [*সামলে নিয়ে*] আমার ভেতরে কী রকম করছে তুমি জানো না ফুলি। বলতে কি চাইনি আমি ? সারাক্ষণ ছটফট করেছি বলার জন্যে। কিন্তু বলতে গিয়ে গলার কথা আটকে গেছে। শুধু যে ভয়ে তা নয়—বাবু চটে যাবেন, আগুন হয়ে গালমন্দ করবেন এ সব ভেবে

ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল সত্যি ! কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়, আরও যেন কেমন একটা ভাব হচ্ছিল আমার। কেবলি মনে হচ্ছিল—বাবু কী ভাববেন, আমাকে আশ্রয় দিয়ে—

ফুলি : আশ্রয় কীসের ? দিন নেই রাত নেই গাধাব মতো খাটছ না তুমি বড়দার জন্যে ? গোড়ায় ঠিক হয়নি তোমার সঙ্গে যে বাড়িতে থাকবে, খাওয়া আব মাইনে পাবে ?

প্রসাদ : তা অবশ্য হয়েছিল।

ফুলি : তবে ?

প্রসাদ : তুমি বুঝবে না ফুলি ! সব ঠিক কথা ! কিন্তু বাবু কিছু মনে করবেন, মুখ ভার করে থাকবেন,—এই কথা ভাবলে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসে। আর যদি তাড়িয়ে দেন—বলেন মাইনে নিয়ে ভাগো ?

ফুলি : ভাগবে। এখানে খেটে খাচ্ছ, অন্য কোথাও খেটে খাবে, আর—আর—আমাকে খাওয়াবে !

প্রসাদ : অজানা অচেনা জগতে কোথায় যাব ফুলি ? কে আমায় আশ্রয় দেবে ? এই শবীর আমাব একটুতেই ভেঙে পড়ে। বিদেশে কে আমার দিকে তাকাবে ! অজানা জায়গায় কত ভয়, কত কী বিপদ—

ফুলি বুঝেছি। এমনি কবেই আমাব দিন যাবে, নইলে তোমাব মতো লোকের সঙ্গে আমাব ভাব হয় ! মেয়েলোক হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে এত যে পেড়াপিড়ি কবি তোমায়, বুঝতে পার না কী জন্যে ? এ বাড়িতে থাকতে আমাব দম আটকে আসছে। প্রতি মুহূর্তে সাধ যায় ছুটে পালিয়ে যাই।

প্রসাদ : তুমি কেন বাবুকে বলো না ? তুমি বললে বাবু শুনবেন। তুমি বাবুর বোন !

ফুলি : ওঃ—সেদিকে জ্ঞানেব নাড়ি টনটনে ! দাদাকে বলে তোমার পাওনা মিটিযে দেব। নিজে ঘটকালি করে তোমায় বিয়ে কবব। তাবপব ? তারপর আমাকেই তো বলতে হবে—একটা চাকরি দাও বড়দা। সোয়ামিকে খাওয়াতে হবে ?—

প্রসাদ : সবাই অপমান করে বলে তুমিও আমায় অপমান করবে ফুলি ? আমি কি জানি না—আমি কত ভীরু, কত অপদার্থ ? জানি বলেই তো আরও ভীরু আরও অপদার্থ বনে যাই। যারা সোজা মানুষেব চোখের দিকে তাকায়, জোর গলায় কথা কয়, তাদের দেখি আর হিংসায় আমাব বুক জ্বলে যায়। দিনরাত কী যেন একটা লড়াই চলে আমার মধ্যে, কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—। আমি বড়ো দুঃখী ফুলি, আমার বড়ো কষ্ট। মরতে ভয় করে, নইলে—কবে আত্মহত্যা কবে বসতাম !

ফুলি : ছিঃ—ও সব কথা বলতে নেই। নিজেকে তুমি ছোটো মনে কর, নইলে আসলে তুমি মোটেই অপদার্থ নও। এ বাড়িতে মনুষ্যত্ব যতটুকু একমাত্র তোমার মধ্যে আছে, আর সবাই তো অমানুষ। কারও ওপর অন্যায় করো না, কারও মনে কষ্ট দাও না—সব বকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য কর—

প্রসাদ : আমার একটুও মনের জোর নেই, হয়তো তাই—

ফুলি : সহ্যশক্তি মনের জোর নয় ? তুমি যে এত সহ্য কর মুখ বুজে, মনের জোর না থাকলে কেউ তা পারে ?

প্রসাদ : সহ্যশক্তি না ছাই। ক্ষমতা নেই তাই সহ্য করি।

ফুলি : নিজেকে তুমি কেন যে এত হীন ভাব—আমি তা ভেবে পাইনে। যাক গে—এ সব কথা ঢের বলেছি, বলে কোনো ফল হয় না। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন ? বড়দাকে না বলতে পার, বউদিকে বল না কেন ?

প্রসাদ : ও বাবা !

ফুলি : কেন ? বউদি তো তোমায় বেশ দরদ দেখায়। সর্বদা কাছে ডাকে, হেসে কথা কয়---

প্রসাদ : না, না,—ওনাকে আমি কিছু বলতে পারব না।

ফুলি : আচ্ছা তবে আমিই বলবখন।

প্রসাদ : [*সভয়ে*] সর্বনাশ ! অমন কাজও কোরো না ফুলি। আমার বিষয় কোনো কথা কখনও তুমি ওনাব কাছে বলতে যেয়ো না ! বলো -- বলবে না ? কথা দাও !

ফুলি : কী ব্যাপার বলো তো? আর একবার তোমায় বলেছিলাম বউদিকে সব জানিয়ে দিই, সেবারও তুমি এমনই ভয় পেয়েছিলে ! আমি বউদিকে বলব তাতে তোমাব কী ? বলো, আজ তোমায় বলতেই হবে।

প্রসাদ : [*ইতস্তত করে*] উনি আমাব ওপব বড়ো অত্যাচার করছেন, ফুলি।

ফুলি : অত্যাচার করছে ! তোমার ওপর কী অত্যাচাব করেছে ?

প্রসাদ : আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না ফুলি ! বাবুর চেয়ে ওনাকে আমি আজকাল বেশি ভয় করি। বাবুর গালাগালির চেয়ে ওনার মিষ্টিকথা আমার বেশি ভযানক লাগে। উনি কাছে এলে আমাব সমস্ত শবীব যেন অবশ হয়ে আসে। উঃ—কী ফাঁদেই যে পড়েছি ! আমি— আমি ওঁকে ঘেন্না করি—কিন্তু কাছে যখন যাই—

ফুলি : যাও কেন কাছে ?

প্রসাদ : যাই না তো ! কিন্তু ডাকলে—না গিয়ে কী করব ? বাবুকে যদি বলে দেন আমি ওঁব কথা শুনিনি। যদি তাড়িয়ে দেন আমাকে ! তা ছাড়া না গেলে উনিও তো বাগ করতে পারেন ! তাইতে যাই, ভয়ে ভয়ে। কাছে গেলেই আমি যেন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, জেগে থেকেও যেন ঘুমিয়ে গেছি মনে হয়। উনি যা বলেন তাই করি—। উনি বোধ হয় কোনো মন্ত্রতন্ত্র জানেন, ওই যে বশীকবণ না কী বলে--

ফুলি : ছি ছি ছি ! বউদি এমন মানুষ !

প্রসাদ : তুমি আমায় বাঁচাও ফুলি। আমায় রক্ষা করো। এ ভাবে আব কিছুদিন চললে আমাব মাথা খাবাপ হয়ে যাবে, আমি পাগল হয়ে যাব !—ফুলি !

ফুলি : আমাবও যে মাথা ঘুরচে, এ সব কী শোনালে তুমি আমায ? চলো—আমবা পালিয়ে যাই। পাওনা টাকার দরকার নেই, বিয়েতে দরকার নেই, আজকেই চলো--আমরা দুজনে পালাই।

প্রসাদ : কোথায় পালাব ফুলি, তোমায় নিয়ে ? একা পালিয়ে যেতে ভরসা পাইনে, তোমায় নিয়ে কোথায় যাব, কী করব ? তা ছাড়া, সবাই কী ভাববে ভাবো দিকি ? মামাবাবুর মনে কষ্ট হবে, বাবু রাগ করবেন—

ফুলি : মাগো, আমার কী হবে—[*কান্না*]

[*দিগম্বরী ধীরে ধীরে ঘরে এল*]

দিগম্বরী : কাঁদছিস কেন লা ছুঁড়ি ! অ্যাঁ—?

ফুলি : [*সামলে নিয়ে*] কাঁদিনি তো।

দিগ : আ মরণ ! চোখে দেখলাম কাঁদচিস, কানে শুনলাম কাঁদচিস—তবু বলে কাঁদিনি তো ! এ ঘরে এসে প্রসাদের কাছে তোর কান্না কীসের লা ? জবাব দিসনে যে কথার ? আস্পদ্দা বেড়েছে, নয় ?

ফুলি : বেশ করেছে বেড়েছে। তোমার মতো তো বাড়েনি ?

প্রসাদ : [*সভয়ে*] ফুলি !

দিগ : কী বললি হারামজাদি ! আসুক তোর দাদা আজ বাড়ি, ওঁকে দিয়ে খড়মপেটা না করি তোকে, বাপের বেটি নই আমি !

ফুলি আর আমি যদি বড়দাকে বলে দিয়ে—

প্রসাদ [*বাধা দিয়ে সভয়ে*] ফুলি, ও ফুলি—কাকে কী বলছ ? —সর্বনাশ কোরো না, বাগের মাথায় যা তা বোলো না গুরুজনকে। মাপ চেয়ে নাও পায়ে ধবে মাপ চেয়ে নাও।

ফুলি কেন মাপ চাইব ? মরতে জানি না আমি—

[*কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল*]

দিগ এ-সব কী প্রসাদ ?

প্রসাদ আজ্ঞে ওর মাথার ঠিক নেই। ছেলেমানুষ কি না—

দিগ নাও, তোমাকে আর ও-ব সাফাই গাইতে হবে না। ছেলেমানুষ ! ছেলেমানুষি ঘোচাচ্ছি আমি, কালই দূর করে দেব বাড়ি থেকে। কিন্তু তোমার ছেলেমানুষ কচিখুকিটি তোমার কাছে কান্নাকাটি কচ্ছিল কেন শুনি ?

প্রসাদ আঁ ? কী ? কী ?

দিগ ন্যাকামি কোরো না, স্পষ্ট কবে বলো।

প্রসাদ আজ্ঞে, বলছিল কী—খোঁড়া বলে ওকে কেউ ভালোবাসে না।

দিগ তাই তোমার একটু ভালোবাসা চাইছিল—না ?

প্রসাদ না, না—ছিঃ। কী যে বলেন ! বলছিল কী—এখানে মন টিকছে না, কদমতলায় পিসির কাছে যেতে চায়, আমি যদি আপনাকে বলে কয়ে—

দিগ : বানিয়ে বলছ—নিশ্চয় বানিয়ে বলছ ! এত লোক থাকতে তোমায় কেন বলতে এল শুনি ?

প্রসাদ : আজ্ঞে, দেখেছে তো আপনি আমায় একটু অনুগ্রহ করেন, আবদার করলে রাখেন—

দিগ : [*খুশি হয়ে*] তোমাব ওই আজ্ঞে হুজুর রাখো তো, ভাল্‌লাগে না বাপু। সত্যি বলছ তো, পিসির কাছে যাবার কথা বলছিল ? না, ভাব-টাব হয়েছে তোমাদের দুজনের ?

প্রসাদ : ছি—ছি—!

দিগ . টের যদি পাই, কী কাণ্ড করি দেখো। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া চলবে না—এই তোমায় বলে দিচ্ছি। কী দেখছ প্রসাদ অমন করে ?

প্রসাদ · [*মরিয়া হয়ে*] আপনি আগুনের মতো সুন্দব।

দিগ : বাবাঃ—কী কথার ছিরি ! এত সুন্দব আমি, তবু তো না ডাকলে একবারটি চোখের দেখা দেখতে যাও না !

প্রসাদ : ভয় করে।

দিগ : ভয় ? ভয় আবার কী, ভয় ? টান থাকলে যেতে।

প্রসাদ : আপনার জন্যে আমি মরতে পারি।

দিগ : মরতে পার কিন্তু মান্যি করে কথা কওয়া ছাড়তে পার না। কেউ তো নেই এখানে যে শুনবে ? কেমন করে তাকিয়ে আছে দ্যাখো ! ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছে। তুমি কী বলো তো প্রসাদ ? কী আছে তোমার মধ্যে ? [*দাঁতে দাঁত ঘষে*] এমন রাগ হয় আমার মাঝে মাঝে, ইচ্ছে করে—

বিশ্ব : [*দূর থেকে*]—প্রসাদ—!

প্রসাদ : [*সভয়ে*] আজ্ঞে—!

বিশ্ব : [*কাছে এসে*] এই রাস্কেল। তোমায় না বললাম—টাকা নিয়ে কারখানায় চলে যেতে ?

দিগম্বরী : বোকো না গো। ওর কোনো দোষ নেই। আমি কথা কইছিলাম।
বিশ্ব : ওঃ—তাই নাকি। কী কথা কইছিলে ?
দিগ : বলছিলাম, বিয়ে করে একটি টুকটুকে বউ নিয়ে আসুক।
বিশ্ব : বিয়েটাই বাকি আছে। [*হাসি*]
দিগ : হেসো না অমন করে, বেচারি লজ্জা পাচ্ছে।
বিশ্ব : আচ্ছা, বিয়েটা পরে কোরো প্রসাদ, এখন চটপট কারখানায় চলে যাও তো ! এই নাও টাকা, সাবধানে যেও—
দিগ : পেনোর মাঠ পেরিয়ে যাবে তো ? আমার জন্যে জাম পেড়ে এনো কিন্তু, প্রসাদ !
প্রসাদ : [*সভয়ে*] আজ্ঞে—আচ্ছা—!

বিস্তৃত পেনোর মাঠ। দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। প্রসাদ একা। ভয়ে ভাবনায় তার থমথমে চেহারা।

প্রসাদ : এই মাঠ পেরোতে হবে আমায়। এখনও বেশির ভাগ পথ বাকি। ওদিকে আদ্দেক আকাশ দেখতে দেখতে মেঘে ছেয়ে গেল। ওঃ—কী ভীষণ চেহারা মেঘের। গুলিয়ে গুলিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে আকাশ বেয়ে উঠছে···এখুনি ঝড় উঠবে—! কী করি এখন ? কোথায় যাই ? এই মাঠের মধ্যে ঝড় উঠলে আমি তো বাঁচব না ! কী কবি এখন ? ফিরে যাব ? ওরে বাবা, বাবু তা হলে আর রক্ষে রাখবে না। কিন্তু কী করি এখন ? মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছি, এদিকে গ্রাম যদ্দুর—ওদিকে কারখানাও তদ্দুর—!

[*বাতাসেব শব্দ*]

আর বাঁচা গেল না ! ওই ওই—ঝড় এল—

[*বাতাসের বেগ বাড়তে থাকবে*]

ওরে বাবা—এ যে অন্ধ হয়ে গেলাম ধুলোয় ! শুকনো ডালপালা এসে চাবুকের মতো গায়ে পড়ছে। পালাতে হবে। কোনদিকে পালাই ? অ্যাঁ কোনদিকে পালাই ?

[*বাতাস বইতে থাকবে তেমনিভাবে*]

উঃ—পড়ে গেলাম যে ! কিন্তু পড়ে গেলে তো চলবে না। উঠে পালাতে হবে। উঃ—আবার ফেলে দিলে—আমায় পালাতে দেবে না—! ঝড় এইখানে ফেলে আমাকে মেরে ফেলবে। আমি মরব না—মরতে পারব না।

[*বাতাসেব সাথে বৃষ্টি ও বিদ্যুতেব শব্দ*]

উঃ—গেলাম—গেলাম—কান ফেটে গেল !

[*গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ*]

[*আর্তনাদ করে*] আঃ—! গাছ ভেঙে পড়েছে ! অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। শুধু ডালপালার ঘা লেগেছে। মনে হল কে যেন হাজার চাবুক দিয়ে আমায় মারলে ! এখানে গাছের কাছে থাকলে তো চলবে না, ফাঁকায় যেতে হবে। গাছের কাছ থেকে সরে যেতে হবে।—

[*বাতাসের সাথে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের শব্দ*]

এখানে গাছ নেই এইখানেই একটু বসি। পালাতে পেরেছি—কেউ আর গাছ চাপা দিয়ে আমায় মারতে পারবে না। এখান থেকে আর নড়ছি না আমি। এই গ্যাঁট হয়ে বসলাম, মরি তো এইখানে বসে মরব।

[*ঝড়ের দিকে মুখ করে*]

আয় আয় [*উন্মাদের মতো হাসি*]

—আরও জোরে আয়—ছিষ্টি তলিয়ে দে ! পেসাদচন্দর আর ডরায় না।—মারবি তো মার—দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি আর করছিনে বাবা—আমায় নিয়ে ছিনিমিনি আর খেলতে দিচ্ছি না ! তোর ঝড়ের নিকুচি করেছে। আয় দেখি তোর কত জোর ! আরও জোরে আয় !

[*খুব জোরে বাতাসের শব্দ হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়*]

প্রসাদ : ঝড় একটু কম মনে হচ্ছে। কোথাও আশ্রয় নিতে পারলে হত।

[*ট্রেনের হুইসেল্*]

এ কী ! ছুটোছুটি করতে রেল লাইনের এত কাছে এসে পড়েছি ! ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে না একটা ? ওই তো পেছনের আলো দেখা যাচ্ছে। লাল একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। দিগম্বরীর কপালের সিঁদুরের মতো। দিগম্বরী ? ওই যত নষ্টের গোড়া। ওর জন্যে জাম পাড়তে গিয়েই তো দেরি হয়ে গেল। নইলে ঝড় ওঠবার আগেই হয়তো মাঠ পেরিয়ে যেতাম !

[*ট্রেনের হুইসেল্*]

গাছটাছ বোধ হয় ভেঙে পড়েছে লাইনে। ট্রেনটা দাঁড়িয়েই আছে। এক কাজ করলে হয় না ? এখানে বসে না থেকে ট্রেনের একটা কামরায় ঢুকে তো বসতে পারি ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত। তাই করা যাক। কেন এখানে বসে কষ্ট পাই মিছিমিছি !

[*উঠে এগিয়ে যায়*]

ট্রেন দাঁড়িয়ে। যাত্রীদের কোলাহল

যাত্রী বসুন না। বসে পড়ুন। অ্যাক্সিডেন্ট নাকি ?

প্রসাদ না ! অ্যাকসিডেন্ট নয়।

যাত্রী রক্তে যে মাখামাখি হয়ে গেছেন !

প্রসাদ রক্ত ?

যাত্রী : জল, কাদা, রক্ত সব আছে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে আপনাকে। রুমালটা নিন। মুছে ফেলুন।

প্রসাদ : থাক ! একেবারে বাড়ি গিয়ে চান করে ফেলব। ঝড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে আছাড় খেয়েছি। একটু কেটে ছড়ে গেছে আর কী !

যাত্রী : একটু ! আপনি তো খুব বেপরোয়া লোক দেখছি। ঝড়ের সময় বাইরে ছুটোছুটি করতে ভালোবাসেন বুঝি ? আমারও মশায় এমনই স্বভাব ছিল ছোটোবেলায়। ঝড় উঠলে ফুর্তির চোটে কী করব ভেবে পেতাম না।

প্রসাদ : বলেন কী ?

যাত্রী : আপনাকে দেখে সাধ হচ্ছে আমিও বাইরে গিয়ে একটু মাতামাতি করে আসি।

প্রসাদ : আপনি কোথায় যাবেন ?

যাত্রী : ভিজিগাপট্টম।

প্রসাদ : সে তো অনেক দূর !

যাত্রী : [*হেসে*] দূর তো হয়েছে কী ! সেখানেই থাকি, ব্যাবসা আছে !

প্রসাদ : দেশ ছেড়ে এত দূরে গিয়ে—

যাত্রী : আর বলেন কেন। বারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম বোম্বাই। তারপর থেকে পনেরো-বিশবছর ধরে এখানে ওখানে পাক খেতে খেতে ভিজিগাপট্টমে ব্যাবসা ফেঁদে বসলাম। সেখানেই আটকে গেছি সেই থেকে।

প্রসাদ : বারো বছর বয়সে ? ভয় হয়নি ?
যাত্রী : ভয় ? ভয় কীসের ?
প্রসাদ : এই অজানা অচেনা জায়গায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কী করবেন—
যাত্রী : জায়গা কি অজানা অচেনা থাকে ? যতক্ষণ না যাবেন, ততক্ষণ। গিয়ে পড়লেই জানাশোনা হয়ে যায়। মানুষের বাচ্চার আবার থাকার ভাবনা। সব জুটে যায়। পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে, মানুষ নিজের ব্যবস্থা করে টিকে আছে।

[*ট্রেনের হুইসেল*]

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। চট করে নেমে পড়ুন।
প্রসাদ : আপনার নামটি জানতে পারি ?
যাত্রী : প্রসাদ। আপনার ?
প্রসাদ : আমারও ওই নাম, প্রসাদ।—

[*ট্রেন চলার শব্দ এবং আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে যাবে*]

বিশ্বম্ভর : আঃ ! কী গন্ধই বেরিয়েছে তোমার মাংসের ! জিভে জল আসছে !
দিগম্বরী : খাবে নাকি এখন ?
বিশ্বম্ভর : একটু পরে ! খিদেটা চড়িয়ে নিই ! বৃষ্টি ধরে এসেছে, মামা এইবার এসে পড়বে। কিরে ফুলি, তোর মুখ এত শুকনো কেন ?
ফুলি : দাদা, প্রসাদবাবু এল না কেন এখনও ?
বিশ্ব : প্রসাদবাবু ! প্রসাদ আবার বাবু হল কবে থেকে রে ? ওটাকে অত সম্মান করে কথা বলিস নে ফুলি, শুনলে হাসি পায়।
ফুলি : ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে—
বিশ্ব : ওটা একটা বাঁদর, আস্ত বাঁদর ! ওটাকে সত্যি মানুষ বলে মনে হয় না !
ফুলি : মানুষ হতে দিলে মানুষ হত। তোমরা সবাই মিলে ওকে পায়ের নীচে পিষে রেখেছ !
দিগ : তা, ওর জন্যে তোর এত দরদ কেন শুনি ? ঝড় ওঠার সময় থেকে ছটফট করছিস, কোথায় গেল, কী হল।
ফুলি : দরদ আবার কী! লোকটা কেমন ভীরু তা তো জান না। ঝড়ের সময় বাড়িতে থাকলে ঘরের কোণে লুকিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে। সেই লোক এই ঝড়ের মধ্যে বাইরে আটকে গেছে, হার্টফেল করে মরে গেছে কিনা কে জানে !
বিশ্ব : তা ও মরতে পারে, আশ্চর্য নয় !
ফুলি : কেন তবে পাঠালে তুমি ওকে ? ঝড় আসছে জেনেও পাঠালে কেন ?
বিশ্ব : [*গর্জন করে*] কী বললি ! আমার চাকরকে আমি কোথায় পাঠাব, সে কৈফিয়ত তোর কাছে দিতে হবে ?
দিগ : তোর বাপও তো ঝড়ের মধ্যে বাইরে গেছে। বাপের জন্যে তো এতটুকুও ভাবনা দেখছি না তোর।
ফুলি : বাবার কিছু হবে না। বাবা ওর মতো ভীরু নয়।
দিগ : প্রসাদ তোর কে ?
ফুলি : কে আবার। কেউ না।
দিগ : স্বয়ম্বরা হবার সাধ আছে নাকি গো কন্যে ? তাই তো বলি, একা পেলেই মেয়ে গিয়ে পেসাদের কাছে ঘুরঘুর করেন।

[গজেনের প্রবেশ]

গজেন : *[একটু জড়ানো গলায়]* কী হয়েছে ?

বিশ্ব : বাঃ ! মামা যে বেশ সরগরম দেখছি।

দিগ : শুনছ ? তোমার মামাকে বলে দাও, সাতদিনের মধ্যে যদি মেয়ের বিয়ে না দেন তো আমার বাড়িতে জায়গা হবে না। মেয়ে ধেড়ে করে রাখতে চান অন্য জায়গায় রাখুন গে। এখানে চলবে না। বলে দাও মামাকে।—

বিশ্ব : আর বলে দিতে হবে না। মামার কান আছে।

গজেন : বউমাকে শুধোও দিকি ফুলি কী করেছে।

বিশ্ব : শুনলে তো ? জবাব দাও !

দিগ : মামাকে বলো, ওনার মেয়ে নিজেই বর খোঁজবার চেষ্টায় লেগেছেন। কদ্দুর কী করেছেন উনিই জানেন।

ফুলি : *[তীব্রকণ্ঠে]* বউদি !

[গজেন মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিল ফুলি কাঁদল না। তীব্র দৃষ্টিতে নীরবে চেয়ে রইল]

বিশ্ব : কী করছ মামা ? অত বড়ো মেয়ের গায়ে হাত তোলে ?

গজেন : সামনে যে ভালো দিন আছে, বংশীর সঙ্গে সেই দিনে বিয়ে দিয়ে দেব।

বিশ্ব : আমার আড়তের বংশী ? না, না, ও গাঁজাখোর বুড়োর সঙ্গে নয়। বরং পেসাদের সঙ্গেই দাও না মামা।

দিগ : তুমি চুপ করো। পেসাদের সঙ্গে ওর বিয়ে হয় না।

বিশ্ব : কেন ? ওরা তো স্বঘর।

দিগ : হোক স্বঘর। পেসাদ ওকে বিয়ে করবে না। ওকে পেসাদ দেখতে পারে না। ওর রকম সকম দেখে পেসাদ সেদিন আমার পায়ে ধরে কেঁদেছিল। আমি বললাম, কাঁদছ কেন পেসাদ ? পেসাদ বললে, আপনি আমায় রক্ষে করুন ও ডাইনির হাত থেকে।

[গজেন আবার ফুলিকে মারতে হাত তোলে]

বিশ্ব : মামা ! ফের হাত তুলছ ? একবার বারণ করলাম, কানে গেল না বুঝি ? বড়ো তো স্পর্ধা বেড়েছে তোমার ! কাঁদিস নে ফুলি।

দিগ : যা তুই। যা এখান থেকে।

বিশ্ব : পেসাদ তোমার পায়ে ধরে ও কথা বলল ? ডাইনির হাত থেকে রক্ষা করুন ! ছোঁড়াটা তো শুধু ভীরু অপদার্থ নয়—বজ্জাতের ধাড়ি ! হারামজাদা আজ আসুক।

দিগ : তুমি পেসাদকে কিছু বলতে পাবে না।

বিশ্ব : কেন ?

দিগ : ওর কোনো দোষ নেই। ফুলিকে ওর পছন্দ হয় না, ফুলি ওকে জ্বালাতন করে। বেচারি ভয়ে ভাবনায় কাঠ হয়ে থেকেছে। কখন কী করে বসবে হতচ্ছাড়ি মেয়ে, দোষ তো হবে পেসাদের। তুমি নিজেই তখন ওর ঘাড় মটকাবে।

বিশ্ব : মাঝে মাঝে সত্যি ইচ্ছে করে ওর ঘাড়টা মটকে দিতে। ওই যে আসছেন পেসাদবাবু। অ্যাঁ ! কী চেহারা হয়েছে ছোঁড়ার !

দিগ : ইস্ !

[জলকাদা রক্তমাখা ঝড়ে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে প্রসাদ এল। তার পদক্ষেপ দৃঢ়। মেরুদণ্ড সিধা।]

প্রসাদ : কারখানায় যেতে পারিনি।

বিশ্ব : কেন ?

প্রসাদ : পেনোর মাঠে ঝড়ে আটকে গেলাম।

বিশ্ব : আটকে গেলে। মাঠটুকু পেরিয়ে কারখানায় যেতে পারলে না ? ভ্যাবা গঙ্গারাম কোথাকার !

দিগা : পেসাদ ! এ কী ভীষণ চেহারা হয়েছে তোমার। কাদা রক্ত ধুয়ে এসো, চান করে এসো। তোমায় দেখে ভয় হচ্ছে।

বিশ্ব : টাকা দিয়ে যাও।

প্রসাদ : আজ্ঞে টাকাটা—

বিশ্ব : টাকা হারিয়ে এসেছিস !

প্রসাদ : ঝড়ের সময় পেনোর মাঠে কোথায় পড়ে গেছে।

বিশ্ব : হতভাগা ! নচ্ছাড় !

[*বিশ্বম্ভর লাফিয়ে উঠে তাকে মারতে যায়*]

প্রসাদ : [*ভয়শূন্য বিস্মিত কণ্ঠে*] আমায় মারবেন ! আমি ভদ্রলোকের ছেলে, কটা টাকার জন্য আমায় মারবেন !

বিশ্ব : না, মারব না, পুজো করব। তোকে বেচলেও অতগুলো টাকা হবে না, তা জানিস ?

প্রসাদ : [*চাপা দৃঢ়গলায়*] গায়ে হাত দেবেন না। খবর্দার গায়ে হাত দেবেন না বলছি !

বিশ্ব : [*সুর বদলে*] তুমি কি গাছ চাপা পড়েছিলে ?

প্রসাদ : না, চাপা পড়ছিলাম, অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। টাকাটা যদি না পাওয়া যায়, আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

বিশ্ব : তোমার মাইনে !

গজেন : ওরে ছোঁড়া ! তোমার পেটে চালাকি ! টাকা তুমি হারাওনি—মাইনে বলে আদায় করে নিয়েছ। জানো বাবা, কদিন থেকে মাইনে মাইনে করে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। তোমায় বলতে সাহস হয় না, আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করে। চাইলে পাবে না জানে, তাই চালাকি করে বাগিয়ে নিল। টাকা হারিয়েছে মাইনে থেকে কেটে নিয়ো।

প্রসাদ : আমার তিন বছরের ওপরে মাইনে বাকি আছে !

বিশ্ব : তোমার আবার মাইনে ! খেতে পরতে দিয়েছি !

প্রসাদ : খাওয়া পরা আর তিরিশ টাকা করে মাইনে দেবেন বলেছিলেন। যে টাকা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশিই পাওনা হবে আমার।

বিশ্ব : তোমার কী হয়েছে হে বাপু ? কামড়ে দেবে নাকি ?

প্রসাদ : কামড়ে দেব কেন ?

বিশ্ব : রকম দেখে তাইতো মনে হচ্চে। চান করবে যাও। মাথা ঠান্ডা হোক ! তারপর কথা কইব !

প্রসাদ : আমার মাথা গরম হয়নি।

বিশ্ব : বেশ বেশ, জামাকাপড় ছাড়বে তো ? ভালো করে সাবান মেখে চান করো গে ! ভালো করে ধুয়ে যেখানে যেখানে কেটে গেছে টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে দিয়ো ! একটু ব্র্যান্ডি খাবে ?

প্রসাদ : না, আমি কিন্তু চোর নই ! টাকাটা সত্যি পেনোর মাঠে পড়ে গেছে।

বিশ্ব : না বলছে কে !

প্রসাদ : খুঁজে পেলে টাকাটা আমি মাইনে বাবদ নেব।

বিশ্ব : আচ্ছা আচ্ছা সে হবেখন। চল মামা, আমরা একটু টানিগে।

[*বিশ্বম্ভর ও গজেন তার দিকে তাকাতে তাকাতে একরকম পালিয়ে যায়*]

দিগ : তোমায় দেখে ভয় করছে পেসাদ। কী চেহারা হয়েছে তোমার। উনি পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন।

প্রসাদ : ভয় পেলেই মানুষ ভয় পায় !

দিগ : অমন করে তাকিয়ো না ! আমার গা কাঁপছে। নেয়ে এসো, গরম গরম মাংস দিয়ে ভাত দেব।

প্রসাদ : তোমার রান্না আমি খাব না।

দিগ : খাবে না ? কেন ?

প্রসাদ : ঘেন্না করবে ! এতকাল ঘেন্না করেছে—তবু তোমার রান্না চোখ কান বুজে খেয়েছি। আর খাব না !

দিগ : *[বেগে]* কী বললে ? *[ভয়ের সুরে]* না না অমন করে তাকিয়ো না ! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ পেসাদ ? তোমার চোখ দেখে ভয় করছে। কেন তাকাচ্ছ অমন করে ? কেন ভয় দেখাচ্ছ ? আচ্ছা আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

[দিগম্বরী পালিয়ে যায়]

ফুলি : ওগো মাগো, তোমার কী হয়েছে। কোথায় তুমি ছিলে ? এমন লাগল কীসে ?

প্রসাদ : আমার কিছু হয়নি ফুলি ! শরীর থেকে কিছু রক্ত বেরিয়ে গেছে। কিন্তু উপকার যা হয়েছে বলার নয় ! ফুলি আজ আমি মুক্তি পেয়েছি—নিজের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি কাউকে ভয় করি না। আমি স্বাধীন।

ফুলি : কী বলছ তুমি ?

প্রসাদ : ঠিক কথাই বলছি। পেনোব মাঠে কালবোশেখির ঝড়ে লড়াই করে আজ মরে বেঁচেছি। আমি ভয় করতে ভুলে গেছি ফুলি ! বাড়ি এসে বিশুবাবুকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল, এই একটা সামান্য দুর্বল মানুষকে আমি এত ভয় করতাম ! তারপর টাকা হারিয়েছি বলে বিশুবাবু যখন আমায় মারতে এলেন, প্রথমটা আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিন্তু চেয়ে দেখি বিশুবাবু ভয় পেয়েছেন। কাছে এসে আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে বিশুবাবুর বুক কাঁপছে। জানো ফুলি, আমায় দেখে বিশুবাবু ভয় পেয়েছেন !

ফুলি : আমি দেখেছি। বউদিও তো ভয় পেয়ে চলে গেলেন।

প্রসাদ : হ্যাঁ।

ফুলি : আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি না।

প্রসাদ : ভয় পাচ্ছ না তো ? তবে চল পেনোর মাঠে যাই। একটা লণ্ঠন নিয়ে চলো। আমি জামা কাপড় বদলে আর একটা লণ্ঠন নিয়ে বাঁশতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তুমি ওইখানে যেয়ো। ওখান থেকে দুজনে মিলে পেনোর মাঠে গিয়ে টাকাটা খুঁজে তিনটের গাড়িতে ভিজিগাপট্টম চলে যাব !

ফুলি : ভিজিগাপট্টম ? সে কোথায় ?

প্রসাদ : সেখানে আমার মিতা থাকে।

আপদ

চাল নেই ? বাঃ, বেশ !

সকালবেলা কী শুভ সংবাদ ! স্বাধীনতা পাওযাব বাসি পচা সংবাদটাব মতো। জর্জব প্রাণে আর এক দফা জ্বর এনে দেয়। রাত্রে নলিনী খববটা চেপে গিয়েছিল , আপিস ফেরত কেবানি বেচারাকে তখন ও খববটা জানিয়ে আর লাভ কী। কালোবাজাবে ছাড়া চাল নেই। হোক সে সবকারি কেরানি, স্বাধীন দেশেব স্বাধীন সরকারের বেতনভুক্ত। রাতারাতি চাল-বাড়ন্ত সমস্যাব সমাধান কবাব সাধ্য তাব নেই। নলিনীব মতে, সরকার স্বাধীন বলেই কেরানিদেব দাসত্বেব ডিগ্রি চড়েছে। তাব যুক্তি আর ব্যাখ্যা একটু তির্যক ও রসালো হয, কাবণ সে কথাগুলি বসিকতা কবেই বলে। এত চড়া তার ক্ষোভ যে বেশি তেতে লোহা জ্যোতির্ময় হওয়ার মতো তার প্রাণের জ্বালা ব্যঙ্গ হয়ে বিচ্ছুবিত হয !

আমি কী করব ? নলিনী আলগোছে বাঁকা হাসি হেসে বলে, তোমবা স্বাধীন হযেছ, আমবা তো হইনি। আমরা ঘবের কোণে হাঁড়িই ঠেলছি। হাঁড়ি চড়াবাব ব্যবস্থা তোমবা বাদ দিযেছ, আমবা করব কী ?

কেউ যেন তাকে কিছু করতে বলেছে ! এই রকম ঢং হয়েছে নলিনীব কথার, শুধু আজকাল নয়, অনেকদিন থেকে। আগে অন্যকথাব ঠেকা দিত, আজকাল কথায় কথায় এই স্বাধীনতাব কথা তুলে খোঁচায়। কথা আরম্ভ কবে আমি দিয়ে, পবক্ষণে তা দাঁড়ায় আমবা ও তোমবাব ব্যাপাবে। সে যেন কণাদ বাযের বউ নয়, সে ভিন্ন একটা জাতেব একজন এবং কণাদ অন্য একটা জাতেব প্রতিনিধি। ঘরে চাল নেই এ কি নতুন কিছু ? প্রাযই এক রকম চাল থাকে না, প্রায সকলেব ঘরেই। নলিনী এমনভাবে খববটা দেয যেন তাবই পরামর্শে গভর্নমেন্ট ঘরে ঘবে চালেব অনটন ঘটিযেছে, লোভী ব্যবসায়ীদের চাল আটা কাপড়চোপড় সিকেয় তোলাব ষড়যন্ত্রে সেও যেন একজন অংশীদাব। সেই যেন এই বিশ্বাসঘাতকেব জগতে সবাব সেরা বিশ্বাসঘাতক।

ঘবের কোণে হাঁড়ি ঠেলে বলে ? অন্যদের হাতের কাছে পায না, একমাত্র পুরুষ তাকেই পায় বলে ? কিন্তু তাকে পুরুষ মনে কবে কি নলিনী ! কথা শুনে সন্দেহ জাগে আজকাল !

আজকেই চাল ফুরোল ? বিষ্যুদ্‌বাব পর্যন্ত যেত না ?

পেট বাড়েনি দুটো ?

বাড়িতে লোক বাড়েনি, পেট বেড়েছে দুটো, পেট ! কথার কী ছিরি নলিনীব। পাকিস্তান থেকে দুজন আত্মীয় এসে ঘাড়ে চেপেছে বটে এবং তাদের পেট ভরাতে হওয়ায় রেশনের আইনি চাল-আটা মঙ্গলবারেই শেষ হয়েছে। রেশন কার্ড সংগ্রহের হাঙ্গামা চুকলে আশা করা যায় ভবিষ্যৎ সপ্তাহে আবার বিষ্যুদ্‌বাব পর্যন্ত সবকারি বরাদ্দ খাদ্য টানা চলবে। শুক্রবার সকালে নলিনী মনে করিয়ে দেবে ঘরে একদানা চাল নেই, একগুঁড়ো আটা নেই—তার আগে নয়। তখন চোরাবাজারে যাবে চালেব সন্ধানে। বারবার এই কথা ভেবে বুকে বল পাওয়া যাবে যে মোটে তিনটি দিন, শুধু আজ কাল আর পরশু, শুক্র, শনি আর রবিবারটা চোরা চালে কোনোরকমে চালান—হিসেব করে, আরও কম খেয়ে, কোনোরকমে। সোমবার আবার রেশন মিলবে !

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে ইট-সুরকি সিমেন্টের নূতন গাঁথনিটার দিকে। বাড়ির পাশে কী তাড়াতাড়ি যে গড়ে উঠছে সিনেমা হাউসটা। ওষুধের নেশা'র মতো সস্তা আনন্দের জোলো দুটি ঘণ্টার জন্য বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে একদিন দেরিও যেন সইবে না।

তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোশনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও —কিছু রেডিয়ো-মার্কা মাছি-ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসরঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্য ভিখারির মতো মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিট ঘরের দরজায় !

নিজের চিন্তায় চমক লাগে কণাদের—এ তার স্বকীয় নয়, নলিনীই এমনি করে বলে। চোখে কি জল নলিনীর ? না চকচক করছে মনের জ্বালায় ?

কী ভাবছ জানি, নলিনী ভারী গলায় বলে, নিজের পেটে পুরিনি আমি সব। কাল রাত্রে উপোস গেছে আমার। আচমকা মুখ ফিরিয়ে সে মুচকে হাসে, মেয়েরা উপোস দিলে আগে মাছের একটা আঁশ দাঁতে কাটত। মাসের ন-দশ তারিখ হল মাছের গন্ধও আসে না বাড়িতে। কী করি বল ? তোমরা স্বাধীন হয়েছ—

থলি দাও। দুটো দিয়ো, বাজারটাও সেরে আসব।

থলি নিয়ে কণাদ পালিয়ে যায়।

কিছুদিন আগেও কণাদ বোঝাত, তর্ক ও রাগারাগি করত। শেষে বলত, তুমি কী বুঝবে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার ত্যাগ নেই, ধৈর্য নেই, তুমি স্বার্থপর ! সম্প্রতি সে আর উৎসাহ পায় না। যত সহজ ভেবেছিল অত সহজ নয় ব্যাপার, না স্বাধীনতার প্রশ্ন না তার প্রতি নলিনীর অদ্ভুত জ্বালার মানে। ছোটো ভাই চেঁচিয়ে পড়ছে, এমনই চেঁচিয়ে সেও একদিন পড়ায় মন বসাত, আলস্য কাটাত। পূর্ববঙ্গের পলাতকা আত্মীয়া দুটি, মা ও মেয়ে, স্যাঁতসেঁতে উঠানটুকুর কোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—সবাইকে খেতে দিয়ে নলিনী যে কাল না খেয়ে ছিল সেই বিষয়ে কী ? অথবা নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ? কাকিমা আর খুকিকে এখানে রেখে রমেশকাকা ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে সে জন্য কণাদের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তবু কাকিমা আব খুকিকে তাব মাবতে ইচ্ছা হয়।

এত সকালেই সিনেমা হাউসটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলবে। মিস্ত্রি আর কুলিরা কীরকম মজুরি পায ? ভালোই পায় নিশ্চয়, দিন ভালোই চলে নিশ্চয়, নইলে কথায কথায স্ট্রাইক করাব এত তেজ কোথায় পেত ! হলদে কার্ডে ওদেব রেশন পর্যন্ত বেশি ববাদ্দ করা হয়েছে দেশের এমন সংকটের সময়ে। ভবিষ্যৎ গড়বার বা ভাঙবার এই সন্ধিক্ষণ, ওবা যদি শুধু আদায় করার ফিকির ছেড়ে এই দুর্দিনে—

এ যেন মুখস্থ করা চিন্তা, তোতাপাখির মতো শুধু আবৃত্তি করা নিজেব মনে, পরের কাছে। নিজের মনও আর সায় দিতে চায় না। ইট গেঁথে গেঁথে নূতন দালান উঠছে, তার বিশ্বাসের ইমারত পড়ছে ভেঙে ভেঙে। ভালোই যদি চলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে যদি তেজ বাড়ে, উদয়াস্ত খেটে কেন মরবে মানুষ ? নিজেই কি সে খাটত ?

নলিনী বলে, বোকো না বেশি। এতটুকু আশা ভরসা থাকলে মানুষ যেন কষ্ট সইতে নারাজ হয়। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আধপেটা খেয়ে প্রাণপাত করে না মানুষ একটু সংস্থানের জন্য ? মানুষ কি ভূত যে সুখে থাকতে নিজেকে কিলোবে ? ত্যাগ ত্যাগ করে তোমরা সবাইকে সন্ন্যাসী বানাতে চাইছ !

তোমরা ! তাকে তোমরা ছাড়া সম্বোধন করতে নলিনী ভুলে গেছে। দেশকে ভালোবাসে বলে নলিনী বড়ো শ্রদ্ধা করত তাকে, নিজেকে উজাড় করে উন্মুখ অতল ভালোবাসায় তার জীবন ভরে রাখত। নলিনী ভুলে গেছে, আজও সে দেশকে ভালোবাসে। কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে, কত অল্পদিনে ! যুদ্ধ, বোমার ভয়, দুর্ভিক্ষ হাসিমুখে হেলায় পিছনে ঠেলে দিয়েছে, কীসের সমস্যা কীসের কী, তুমি আছ আমি আছি ! একটি মেয়েকে জন্ম দিতে সব ভুলে গেছে নলিনী। কলকাতায় তখন

দাঙ্গা। চারিদিকে বিদ্রোহ-হাঙ্গামা, তারপর বিভীষিকা। ভয়ে নয়, নলিনীর ভাবান্তর দেখে তাকে কণাদ ক-মাসের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল !

তবু তাকে বাঁচিয়ে চলে কেন নলিনী ? রাত্রে কেন তাকে জানায় না ঘরে চাল নেই, সে না খেয়ে পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পাশে এসে শুয়েছে ? আদব করতে চেয়ে কাছে টানায় খানিকক্ষণ সে কাঠ হয়ে থেমে ছিল, হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কত দুঃখ আর ক্ষোভের সঙ্গে নলিনীকে তখন তার মনে হয়েছিল স্বার্থপর, এখন নিজের সেই জ্বালার কথা ভেবে লজ্জায় কণাদের মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে সাধ যায়। সারাদিন খেটে মেয়েকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নলিনী শুয়েছিল অন্যদিনের মতোই, সে টেরও পায়নি যে তার একমুঠো ভাত জোটেনি। তারপর নিজেই নলিনী পাশ ফিরে তার গলা জড়িয়েছিল। এটাও তার নলিনীর স্বার্থপরতাই মনে হয়েছিল। সকালে এখন আকাশে সূর্য উঠেছে, নোংরা রাস্তায় মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, বাজারে তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনীর মতোই রোগা ফোলা চোখ মুখ, আলুথালু কুৎসিত শিথিল ভঙ্গিতে শাড়ি জড়ানো বস্তির একটি সস্তা বেশ্যা আধপোয়া কুচো চিংড়ি কিনছে। ভগবান আছেন বলে আর ভরসা নেই কণাদের, সত্য আর আদর্শও হয়তো নেই তবু কণাদ নিজের কাছে স্বীকার করে যে এখনও নলিনীকে সে স্বার্থপর বলেই ভাবছে। নলিনী জানে তার জন্যই তার সব, বর্তমানের খাওয়া-পরা ও ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম বিরাম। তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নলিনী তাকে রাত্রে চালের কথা না বলে তাকে ঘুমোতে দেয়, তাকে বেশি চটানো উচিত নয় ভেবেই উপোসি অবশ দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে শীর্ণ হাত দুটিকে তার গলায় জড়িয়ে দেয় ! সে বাঁচলে, সে খুশি থাকলে তবেই নলিনীর স্বার্থ বজায় থাকবে।

কুচো চিংড়ি দেড় টাকা সের ! একদিন মাছ ছাড়া নলিনীর মুখে ভাত রুচত না। বেশিদিনের কথা নয়। দুধ-ঘি, পোলাউ-মাংস কে চায়, নলিনী বলত, জন্ম জন্ম তুমি শুধু আমাকে একটুকরো মাছ দিয়ে ভাত খাইয়ো—আমি হাতির মতো খাটব, এখন অর্ধেক মাস বাড়িতে আঁশটে গন্ধ ঢোকে না। এ নালিশও নলিনী ভুলে গেছে।

ধরুন—বাবু, একপো।

দাঁড়াও বাছা, কণাদ চিন্তার ভান করে,অভিনয়ের ভঙ্গিতে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, বেলা হয়ে গেছে, চিংড়ি বাছবে কে ? তার চেয়ে বরং—

মেছুনিও হাসে, বলে, ইলিশ পোনা নাও বাবু, কে বারণ করছে ?

খুচরো টাকাপয়সা ছিল না, দশ টাকার একটা নোট নিয়ে বাজারে এসেছে। হায় রে রোমাঞ্চকর অভিজাত দশ টাকার নোট ! পাঁচ সের চোরাবাজারি চাল কিনতেই তার চারটে টাকা খরচ হয়ে গেছে। মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, তবু পকেটে টাকা আছে বলেই কি কণাদ আজ ছ আনার কুচো চিংড়ি বদলে পাঁচসিকে দিয়ে বাচ্চা একটা ইলিশ কিনবে ? এটা কি উচিত ? এমন ঝোঁকের মাথায় কাজ করা ? ইলিশের দাম দিতে দিতে কণাদের মনে পড়ে বহুদিন আগে, বছর পনেরো আগে প্রবাসীতে একজন কেরানিকে নিয়ে লেখা একটা গল্প পড়েছিল। প্রবাসীর গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরস্কার পেয়েছিল গল্পটা, বোধ হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। দেশের জন্য চাঁদা তুলতে বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা, তারই মতো অভাবগ্রস্ত এক কেরানির প্রাণটা আকুল হয়েছিল চার আনা চাঁদা দিতে চেয়ে। খুচরো ছিল না, শুধু একটা দশ টাকার নোট। বোধ হয় বাকি মাসটা সংসার চালাবার শেষ সম্বল। তার সামান্য দান কেটে নিতে বলে বাকি টাকা ফেরত চেয়ে নেবে ভেবে নোটটা সে বাড়িয়ে দিয়েছিল, দেখে জয়ধ্বনি করে উঠেছিল ছেলেরা। মনের চাপা আগুন কিন্তু তার দিন চালানোর চিন্তা, দশটা টাকার প্রাণান্তকর মায়া ভুলিয়ে দিতে পারেনি। জীবনে হয়তো সেই প্রথম ও একমাত্র জয়ধ্বনিকেও সে দশটাকার একটা নোট দিয়ে কিনতে পারেনি। মাথা হেঁট করে জানিয়েছিল যে পুরো নোটটা সে দেয়নি, অন্তত ন-টা টাকা তার ফেরত চাই।

তখন সে ছাত্র, চরকা মানে, খদ্দর পরে। আদর্শের চেয়েও জগতে বড়ো কিছু থাকতে পারে, বাস্তব অবস্থার ফেরে পড়া কোনো একটা মানুষের দশটা টাকার মায়া ছাপিয়ে উঠতে পারে মনের চাপা আগুনকে, তখন এ কথা ভাবতেও গা তার লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠত। লেখককে সে অভিশাপ দিয়েছিল। স্বাধীনতার অভিযান চলছে, সারা দেশে বিরাট ব্যাপক আন্দোলন, শোভাযাত্রা আর ছেলেদের জয়ধ্বনি করে ওঠার মতো নাটকীয় অবস্থায় সাময়িক একটা ঝোঁকও চাপল না কেরানিটির যে যাক যাক, দেশের জন্য যাক আমার দশটাকার নোটটা ? গুনে গেঁথে সে ফিরিয়ে নিল ভাঙানি টাকা ! দুঃখ-দুর্দশার, অভাব-অনটনের, বাস্তবতার নামে কী কুৎসিত অপপ্রচার—মানুষের হৃদয়াবেগের চেয়ে টাকাকে বড়ো করা !

আজ সেও দশ টাকার একটা নোট নিয়েই সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চালের চোরাবাজার হয়ে মাছ-তরকারির চোরাবাজারে এসেছে। আজ আর দশটা টাকার নোটে কেরানির দেশপ্রেমকে ঘায়েল করার জন্য পনেরো বছরের পুরানো সেই গল্পের লেখককে গাল দিতে সাধ যায় না। কী যেন চাপা ছিল সেই ত্যাগের মন্ত্রে গড়ে তোলা দেশপ্রেমের মধ্যে, একটা মস্ত মিথ্যা বিরাট ফাঁকি ; যার ফলে ভাবের ঘরের আবেগের বন্যা মাটির পৃথিবীতে নামলেই শুকিয়ে যেত। যারা ফেনিয়ে তুলত সে আবেগ, অপবিত্র মাটির পৃথিবীর বাস্তব মানুষ তাকে অশুদ্ধ প্রাণের জ্বালায় বদলে নিয়ে বুদ্ধ চৈতন্যের তুচ্ছ ত্যাগের চেয়ে ঢের বড়ো ত্যাগ ঘর-সংসার সুখ শান্তির সঙ্গে জীবনটা পর্যন্ত দান করতে মেতে উঠলে তারাই রাশ টেনে ধরত—আকাশে ছড়ানো মহান বাষ্পরাশির মোহ কাটিয়ে জীবনের বিরাট ইঞ্জিন প্রাণের আগুনে কঠিন প্রতিজ্ঞার ইস্পাতে আটক নিজের বাষ্পেই দুর্দান্ত চাপ সৃষ্টি করে চাকা ঘুরিয়ে চলতে আরম্ভ করলেই ওই ফাঁকির সেফটি ভাল্‌ভ খুলে হুস করে বার করে দেওয়া হত শক্তির চাপ, অনড় নিশ্চল হয়ে যেত গতি। শোভাযাত্রার ছেলেরা জয়ধ্বনি করে উঠলেও কেন সেই কেরানি ফিরিয়ে নেবে না ভাঙানি ? তার দেশপ্রেমের জগতের সঙ্গে তো যোগ ছিল না তার ওই দশটা টাকায় বাকি মাস সংসার চালাবার জগৎটার ! এ জগতের ত্যাগ সে কী করে পৌঁছে দেবে আর এক জগতে, কী করে সে ভাববে যে দেশের জন্য ত্যাগ করার সঙ্গে তার অচলপ্রায় কষ্টকর জীবনযাত্রা চালু হবার যোগ আছে ?

বাজারে ভাপসা বাতাসে পচা মাছের গন্ধ। পচা মাছ চালানও আসে বাজারে, বিক্রিও হয়ে যায়। দাম একটু সস্তা। তার দেশপ্রেম থেকে কি এমনই পচা গন্ধ পায় নলিনী ?

পথান্তর

অতুলের মনে হয়, সে স্বপ্ন। অথবা সিনেমার সস্তা ঘটনা সত্যই অভিনীত হচ্ছে তার জীবনে ? নইলে এমন উদ্ভট, অবান্তর, অর্থহীন অবস্থা কখনও মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয় ? বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বন্যা-পীড়িতদের সেবা করতে এসেছে এটা অসাধারণ কিছু নয়, আদর্শ নিয়ে বাপের সঙ্গে কত ছেলেই কলহ করে। কিন্তু টিলায় বসে কর্তব্য সম্বন্ধে রাসমণি আর রাখহরির সঙ্গে পরামর্শ কবতে করতে নিশান দেখিয়ে সতর্ক করছে নৌকার মাঝিদের কোনদিকে ঘূর্ণাবর্তের বিপদ আর ঠিক সেই সময় তার নিজের বাপের বজরা ভেসে আসছে সেই ঘূর্ণাবর্তের দিকে !

রাখহরি অস্বীকার করছে নিশান দেখিয়ে বজরার মাঝিকে সতর্ক করতে ! ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বজরা মারা যাক।

রাসমণি জোর দিয়ে বলে, রাখহরি, তুমি বুঝতে পারছ না। একটা রাঘব চৌধুরীকে মেরে আমাদের কী হবে ? ওর জায়গায় আর একজন রাঘব চৌধুরী আসবে। তুমি নিশান দেখাও !

রাখহরি তবু ইতস্তত করে। এ যুক্তি সে বোঝে না। তারা তো মারছে না রাঘব চৌধুরীকে। মরতে চলেছে সে নিজেই। তারা শুধু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না। কেন করবে ?

বজরা এগিয়ে আসে। আর সময় বড়ো বেশি নেই। আর একটু দেরি হলে ঘূর্ণির কবল থেকে বজরাটাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অতুল শান্তকণ্ঠে বলে, তাছাড়া, রাখহরি, একটা কথা ভেবে দ্যাখো। বজরার মাঝি-মাল্লারা কী দোষ করেছে, রাঘব চৌধুরীর জন্য জন্য ওদের কেন প্রাণ যাবে ? একজনেব জন্য এতগুলি নির্দোষ মানুষকে তুমি মারতে দেবে ?

রাখহরি ঠোঁট কামড়ায়।

অতুল আবার বলে ওরা চৌধুরীর হুকুমে চলে। কিন্তু, চাকরি ওরা করে পেটের দায়ে।

রাখহরি তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে নিশান তুলে ধরে। কিন্তু নিশান দেখাবার প্রয়োজন তখন এমন জরুরি যে গলা ছেড়ে হাঁকও সে দেয়। কথা না বুঝলেও আওয়াজটা বোধ হয় বজরার লোকের কানে পৌঁছায়।

বজরার মুখ ধীরে ধীরে ঘুরছে দেখা যায়। ঘূর্ণির স্রোতের টানে গিয়ে পড়বার আগেই দিক পরিবর্তন করে টিলার খানিক তফাত দিয়ে রাঘব চৌধুরীর বজরা চলে যায়।

রাসমণি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অতুল নির্বিকারভাবে নিজেই রাখহরির কলকেতে একটু তামাক দিয়ে নারকেল ছোবড়ার আগুন জ্বালিয়ে নেয়। একটা পাতা গোল করে পাকিয়ে নলের মতো করে নিয়ে একটা মুখ কলকের তলায় লাগিয়ে আর একটা মুখ দিয়ে তামাক টানে। হাতে কলকে ধরে টান দেবার কায়দাটা সে এখনও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি।

কতকটা নিজের মনেই বলে, বজরাটা সদরে যাচ্ছে।

রাসমণি প্রশ্ন করে, কী করে জানলেন ?

রাখহরি তার জবাব শুনবার জন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অতুল বলে, আমি জানি। সদরের কোর্টে ওর জরুরি দরকার আছে। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

রাখহরি বলে, এত খপর কোথা পেলেন আপনি ?

অতুল বলে, তোমাদের কাছে আর গোপন করব না, আমিই রাঘব চৌধুরীর ছেলে।

রাখহরি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অতুলেব মুখের দিকে। কিন্তু রাসমণি বিশেষ আশ্চর্য হয়েছে মনে হয় না। বরং অতুলের এই সহজ স্বীকারোক্তিতে তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখা দেয়। সে বলে, আমি জানতাম। আপনাকে দেখেই চিনেছিলাম।

বলেননি কেন ?

আমার কী গরজ ? আপনাব কোনো খারাপ মতলব আছে টেব পেলে অবশ্য ফাঁস করে দিতাম কিন্তু আপনি যদি পরিচয় ভাঁড়িয়ে এদের ভালো কবতে চান সে আপনার বিবেচনা। আমার কী বলার ছিল ? আমি ভেবেছিলাম, রাঘব চৌধুরীর ছেলে বলে পরিচয় দিতে আপনার বোধ হয় লজ্জা হচ্ছে।

আপনি কেন বাপ তুলে গাল দিলেন।

দিলাম কি ?

দিলেন বইকী। আমি কার ছেলে তাতে আমাব লজ্জা বা গৌরবেব কী আছে ? বাপের পরিচয়ে তো আমার পরিচয় নয়। আমি কী, আমাব পরিচয় হল তাই।

বাপের ধাবা তো মানুষ পায়।

পায় বইকী। আমি যে বাপের গোঁ-টা পেয়েছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বাপের কাছে মানুষ হলে অন্য ধারাগুলিও হয়তো পেতাম। কিন্তু আমায় মানুষ করেছে অন্য লোকে, আমি মিলেছি অন্য জগতের অন্য ধাতের মানুষের সঙ্গে। পরিবেশের ধারা মানুষ বেশি পায় সেটা ভুলছেন কেন ?

রাসমণি হেসে বলে, ভুলিনি। ভোলাব জো আছে কি ?

অতুল কলকেটা এগিয়ে দেয়, রাখহরি কিন্তু হাত বাড়ায় না। মুখে একটা অদ্ভুত ভাব এনে সে এতক্ষণ চুপচাপ দুজনের কথা শুনছিল, এবাব ঝাঁঝালো গলায় বলে, বাঘব চৌধুবীর ছেলে আপনি ? মোদের সাথে আপনি কেন বাবু ?

আমি তোমাদেরই একজন।

বাঘব চৌধুবীব ছেলে মোদেবই একজন ! পশ্চিমে সূর্য উঠবে তাহলে। নৌকা আসছে, আপনি যান বাবু চলে। আপনাকে মোদের দরকাব নেই।

রাসমণি তাকে ধমক দিয়ে বলে, বাখো, তুমি যেমন গোঁয়ার, তেমনই বোকা। শুনলে না বাঘব চৌধুরী ওঁকে ত্যাজ্যপুত্র করতে গেছে ? জান না, তোমাদের দলে ভেড়ায়, ওর বাপের এত রাগ ? বুঝে কথা বলো, বুঝে কাজ করো।

রাখহরি মুখ বাঁকিয়ে হাসে। ত্যাজ্যপুত্তুব করল তো কী ? আজ ত্যাজ্যপুত্তুর কবল কাল ঘরে টেনে নেবে ! বলে খানিক তফাতে সরে পেছন ফিবে বসে রাখহরি আপন মনে বিড়বিড় কবতে থাকে।

অতুল রাসমণিকে বলে, থাক, আর কিছু বলবেন না ওকে। ওদের সন্দেহ আব অবিশ্বাস হবে, কথায় তা যাবে না। ওদের চিঁড়ে অত সহজ কথায় ভেজে না।

এদের খানিকটা চেনেন দেখছি।

একে একে তিন চারটি নৌকা এসে টিলার গায়ে লাগে। এরা চারিদিকের খবব নিয়ে আসছে, কোথায় বন্যার প্রকোপ কী রকম। কয়েকটি গ্রামেব খবর এরা দেয়, যেখানে জল কম হয়েছে আর চারিদিক থেকে দুস্থ নরনারী ও গৃহপালিত পশুরা যেখানে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে। বন্যার কবল থেকে তারা বেঁচেছে কিন্তু আশ্রয় পাচ্ছে না। এ সব গ্রামের অধিবাসীদের অবস্থাও সুবিধে নয়, ভবিষ্যতে কী হবে কেউ ভেবে পাচ্ছে না, নিজেরা কী করে বেঁচে থাকবে সেই ভাবনাতেই তারা ব্যাকুল, অন্যকে আশ্রয় দিতে কেউ ভরসা পাচ্ছে না। পীরপুব বড়ো গ্রাম। বন্যায় পীরপুরের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে কম, বাইরে থেকে লোকও সেখানে এসেছে বহু। তাদের খাওয়া জুটছে না, অনেকে অসুখে ভুগছে।

অতুল জিজ্ঞেস করে, পীরপুর যেতে কতক্ষণ লাগবে রসুল।

ঘণ্টা তিনেক।

তাহলে আমরা পীরপুরে প্রথম গিয়ে কাজ আরম্ভ করি ! আপনি কী বলেন ? তুমি কী বলো রাখহরি ?

রাখহরি শুধু চোখ তুলে তাকায়, কথা বলে না।

রাসমণি বলে, তাই চলুন। রাখহরি কোনো কথা বলে না কিন্তু তাদের সঙ্গে রসুলের নৌকায় গিয়ে ওঠে।

নৌকায় যেতে যেতে বন্যা-পীড়িত গ্রাম দেখা যায় কাছে ও দূরে। কত ঘর ভেঙে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, যে ঘরগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার চালায়, গাছের ডালে আর মাচায় আশ্রয় নিয়েছে নিরাশ্রয় মানুষ, এদের জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। কিন্তু এখন অবিলম্বে কিছু করবার ক্ষমতা তাদের নেই। পীরপুরে শুরু করতে হবে। সদরে গিয়ে রিলিফের আন্দোলন ও ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। সম্ভব হলে পীরপুরে কেন্দ্র করে সেখান থেকে চারিদিকে এ সব গ্রামে সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো কাছাকাছি সুবিধামতো অন্য কোথাও কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। নৌকার ধারে বসে ঘোলা জলের স্রোতের দিকে চেয়ে অতুল স্তব্ধ হয়ে বসে এই সব কথা ভাবে, রাসমণি মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। মৃতদেহ ভেসে যায় নৌকার পাশ দিয়ে, মানুষের, গোরু-ছাগলের, কুকুরের। দেখে রাসমণি শিউরে ওঠে, কিন্তু অতুলের মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। সে জানে এ দেশে মরণ কত সস্তা।

পীরপুরে পৌঁছে দেখা যায়, রসুলদের কাছে যে বর্ণনা শোনা গিয়েছিল, অবস্থা তার চেয়ে গুরুতর। প্রায় হাজার খানেক নিরাশ্রয় লোক এখানে এসে জড়ো হয়েছে, হাটের চালা, গোয়ালঘর, গাছতলা, মাটির পথের বাঁধ, যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বেশির ভাগের মাথার ওপরেই খোলা আকাশ, অধিকাংশই উপবাসী। গাঁয়ের লোক কিছু কিছু চাল ডাল দিয়েছে কিন্তু তা যৎসামান্য। তাদের নিজেদের সঞ্চয় নেই, তারা কোথা থেকে দেবে ?

ঘুরে ঘুরে অতুল চারিদিকের অবস্থা দেখে বেড়ায়, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে। লোকে কিন্তু তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। পীরপুরে সে পা দেবার অল্পক্ষণের মধ্যেই কী করে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে যে রাঘব চৌধুরীর ছেলে এসেছে গাঁয়ে। এমনই নামের মহিমা রাঘব চৌধুরীর যে খবর শুনেই সবাই রীতিমতো ভড়কে গেছে।

রাসমণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, এর চেয়ে গোপন রাখলেই পারতেন পরিচয়টা।

কপালের ঘাম মুছে অতুল শান্ত, প্রায় সস্নেহ কণ্ঠে বলে ভাবছেন কেন ? সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকের কাছে তার অনাদরে রাসমণির ক্ষোভটা তার বড়ো ভালো লাগে। তার শ্রান্ত কোমল মুখ দিয়ে কেমন মায়াও সে বোধ করে। কিন্তু একটু বিশ্রাম করে নিতে বলার ইচ্ছাটা মনেব ওপর চোখ রাঙিয়ে দমন করে ফেলে।

জিজ্ঞাসা করে করে জানা যায় যে গাঁয়ের একজনের কাছে মরাই-ভরা প্রচুর ধান আছে, তার নাম যোগেন সাউ। পীরপুরের সে ইজারা ভোগ করে রাঘব চৌধুরীর কাছ থেকে।

অতুল বলে, ওর মরায়ের ধানগুলিই তবে বার করতে হবে।

ধান ও দেবে না বাবু।

এমনি না দিক, বেচবে তো।

একমুঠো ধানও বেচবে না।

দেখাই যাক বেচে কী না। ওর মরাই-ভরা ধান থাকবে আর এতগুলো লোক না খেয়ে মরবে, তা তো হয় না।

রাসমণি জিজ্ঞেস করে, কী করবেন ?

চলো না যাই।

রাসমণি চকিতে তার দিকে তাকায়। কিন্তু অতুলের মুখ দেখে বোঝা যায় তাকে যে এই প্রথমবার সে তুমি বলেছে এটা তার খেয়াল আছে।

যোগেন সাউয়ের কাছে সে ধান জোগাড় করতে যাচ্ছে শুনে অনেক লোক তার পিছু নেয়, কিন্তু সঙ্গে না গিয়ে একটু তফাতে থাকে। যোগেন সাউ কম ধড়িবাজ শয়তান লোক নয়।

যোগেন সাউ লোকটা বেঁটে, মোটা, গায়ে শ্বেতির ছাড়া ছাড়া দাগ, মাথায় টাক। বয়স প্রায় চল্লিশ। অতুলের পরিচয় পেয়েও উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জানাবার কোনো লক্ষণ তার দেখা যায় না। সবিনয়ে শুধু বলে. চৌধুরী মশায়ের ছেলে আপনি ? বেশ, বেশ।

অতুলের প্রস্তাব শুনে সে বলে, ধান কিনে নেবেন ? তা ধানের দামটা কে দেবে ?

আমি দেব।

আপনি দেবেন ?

দেব। আমার যা কিছু আছে সব এদের জন্য দিয়ে দেব। আপনার ধানের দাম হিসাব করে খত লিখে দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে টাকা পাবেন।

যোগেন সাউ একটু ভড়কে যায়। এ বন্যার সুযোগে ধানের দর সে হাউইয়ের মতো আকাশের কোথায় চড়িয়ে দিতে পারবে সেই কথাটাই সে ভাবছিল, এর কাছে সে দর নেওয়া যাবে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যাকগে ছোটোবাবু, ও সব হাঙ্গামা আমি জানি না। তা ছাড়া, ধান আমি বেচব না।

ধান আপনাকে বেচতেই হবে।

বটে ? আমার ধান—

এতগুলো প্রাণ যে ধানে বাঁচবে, সে ধান আপনার নয়। ধানের ন্যায্য দামটা আপনার হতে পারে বটে, যদিও তাও হওয়া উচিত নয়। ন্যায্য দাম পাবেন, ধান ছেড়ে দিন। কথা বাড়াবেন না।

ন্যায্য দামটা কত ?

বন্যার আগে খোলা বাজারে যে দাম ছিল।

আমি দেব না। এ কি জবরদস্তি নাকি ?

জবরদস্তি নয়, ন্যায় বিচার। ধান আপনি দেবেন, ধান আমরা নেব, নিতেই হবে আমাদের— এর জন্য কেন মিছে জোর জবরদস্তি করছেন ?

মুখ ফিরিয়ে অতুল রাখহরিকে বলে, ওদের ডাকো তো রাখহরি, ধান বার করে মাপুক। ভয় নেই সাউ মশায়, আমি নিজে দাঁড়িয়ে মাপাব, এদিক ওদিক হবে না।

যোগেন সাউ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে অতুল দেখতে পায়, রাসমণি সজল চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু রাখহরি ? সবাই তার ত্যাগে উদারতায় মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছে, রাখহরি কি এখনও তাকে বিশ্বাস করবে না ? তার নির্বাক উদাসীনভাব ঘুচবে না ?

তখন ধান মাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রাখহরি হঠাৎ বলে, মোর একটা ভুল হয়েছিল ছোটোবাবু।

অতুল তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে প্রত্যাশার সুরে বলে, কী ভুল রাখহরি ?

রাখহরি বলে, এ সব রিলিফ-টিলিফের কাজ তোমরা বাবুরা ভালো পার, এটা খেয়াল ছিল না বটে। তোমাদের এ শখ কিছু দোষের নয় কো মোটে।

সিদ্ধপুরুষ

সেদিন বিজয়া দশমী। সকালে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিখিল প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় চাপরাশি কানুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। সে যাবে হালিয়ায় অজিতদের বাড়ি। হালিয়া মাইল পাঁচ-ছয় দূর হবে শহর থেকে, কিছু পথ নৌকায় গিয়ে বাকিটা হাঁটতে হবে।

পূর্ববাংলায় এই মহকুমা শহরে নিখিলেরা এসেছে অল্পদিন। তার বাবা শহরের বড়োদরের হাকিম। তালুকদার শশাঙ্ক চক্রবর্তীর ছেলে অজিতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কী করে যেন খুব ভাব হয়ে গেছে নিখিলের ! এক ক্লাসে পড়ে অবশ্য তারা, কিন্তু তাতেই কি ভাব হয় ? সম্ভবত দুপক্ষের কৌতূহল। অজিতের বাবা বেশ বড়োলোকও বটে কিন্তু একেবারে সেকেলে গেঁয়ো বড়োলোক। হালিয়া গ্রামে টিন আর খড়ো সেকেলে বাড়িতে একগাদা আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে বাস করে, এত কাছে শহরে এসে একটা দালান তুলে একা থাকবে এটুকু শখও নেই। অজিতের বেশভূষা চালচলনও গেঁয়ো গেঁয়ো। আজকাল স্মার্ট হবার কিছু কিছু চেষ্টা সে আরম্ভ করেছে বটে কিন্তু সে চেষ্টা পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেমন গেঁয়ো ধাঁচের।

তাই, নিখিলের মতো ধোপদুরস্ত ছেলে এমন গলায় গলায় ভাব করবে তার সঙ্গে এটা একটু খাপছাড়া মনে হয়েছে অনেকের।

অজিতদের গাঁয়ের বাড়িতে প্রতিবছর খুব সমারোহের সঙ্গে পূজা হয়, এবার বিশেষ বন্ধু নিখিলকে সে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করেছে তাদের ওখানে যাবার জন্য। বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতেই নিখিল আজ রওনা হয়েছে, আজকের দিনটা ওখানেই থাকবে।

অজিত তাকে একেবারে পুজোর কয়েকটা দিন তাদের ওখানে কীভাবে কাটে তার বিবরণ শুনিয়ে রেখেছে, নিখিলের আশা হয়েছিল এবার নতুন রকমের হইচই করে পুজোটা কাটবে। চাররাত্রি যাত্রা, মহিষ বলি, ঢুলির নাচের লড়াই, মেলা এ সব উপভোগ করবে নিখিল, কোনোদিন চোখেও দেখেনি এমন সব নতুন নতুন জিনিস খেয়ে দেখবে এ দেশের। তার কোনো অসুবিধা হবে না, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে অজিত।

নিখিল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার এ উৎসাহে বাড়ির মানুষ গোড়ায় একেবারেই সায় দিতে চায়নি। বাংলাদেশের রোগেভরা অস্বাস্থ্যকর গাঁ, চারিদিকে জলকাদা, গেঁয়োলোকের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার নোংরা ব্যবস্থা, তাতে আবার লোক গিজগিজ করবে পুজো উপলক্ষে। এর মধ্যে ছেলে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দিয়ে আসতে চায় শুনেই তারা সভয়ে ও সজোরে মাথা নেড়েছিল।

অনেক লড়াই করে মাত্র কাল নিখিল তাদের অনুমতি আদায় করেছে যে শুধু আজকের রাতটা সে হালিয়ায় কাটাতে পারবে। তাও মন্দের ভালো। মেলা আর ঢুলির লড়াইটা দেখতে পাবে। রাত্রে যাত্রাও আছে।

নদী থইথই করছে জলে। ঘণ্টা তিনেক চলে নৌকা এক গাছপালাভরা গাঁয়ের কাছে ভিড়ল। আরও কয়েকটি নৌকা সেখানে বাঁধা ছিল।

তীরে নেমে নিখিল জিজ্ঞেস করল চাপরাশিকে, হালিয়া কতদূর এখান থেকে ?

চাপরাশি সোৎসাহে বলল, এই তো হালিয়া, দেখা যাচ্ছে।

মাঝিরাও সায় দিল সমস্বরে যে হালিয়া গ্রাম কাছেই, ঘরবাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় গাছপালার ফাঁকে !

পুরো আধঘণ্টা হেঁটেও কিন্তু হালিয়া পাওয়া যায় না। চাপরাশি আবার বলে, ওই তো হালিয়া বাবু !

কী আর করা যাবে। চাপরাশির গালে অবশ্য নিখিল একটা চড় কষিয়ে দেয়, কিন্তু কিল চড় খাবার অভ্যাস চাপরাশির আছে। তাতে হালিয়া তো হালিয়া হবে না। আবার সে পা চালায় হালিয়ার উদ্দেশে।

নৌকো থেকে নামতেই চারটে বেজেছিল। হালিয়া পৌঁছুতে সন্ধ্যা হবে সন্দেহ নেই। চলতে চলতে পা টা সুড়সুড় করে নিখিলের সামনের চাপরাশিকে বলের মতো একটিবার শুট করার জন্য। নরম নরম কাদা কাদা মেটে পথ। সবে কিছুদিন গাঁয়ের পথঘাট জলের তলা থেকে মাথা তুলেছে। অধিকাংশ মাঠ খেত এখনও জলময়। ছোটো ছোটো গাঁ পড়ছে পথে। বিসর্জনের বাজনা কানে আসছে কাছ ও দূর থেকে।

সন্ধ্যার পর নিখিল অজিতদের বাড়ি পৌঁছোল। পা দুটো তখন তার বেশ টনটন করছে। দু-তিনমাইল রাস্তা কী করে পাকা ছ-সাতমাইলের মতো দীর্ঘ হয় ভেবে মেজাজটা আরও বেশি বিগড়ে গেছে। [illegible] পেয়েছে প্রচণ্ড।

তখন প্রতিমা বার করার আয়োজন চলছে। সকলেই ব্যতিব্যস্ত। নিখিলকে দেখে খুশি হয়ে অজিত বলল, ভাসান দেখতে যাবি প্রতিমার সঙ্গে ?

সেই নদীতে ?

অজিত হাসল। এ অঞ্চলের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় কাছেই কালোদিঘি নামে একটা মস্ত বিলে, নদী পর্যন্ত প্রতিমা যায় না। বিলের ধারেই মেলা বসে। বিসর্জনের পর সব ঢুলিরা সেখানে নাচের লড়াই দেখায়।

যাব। একটু জিরিয়ে নিই।

একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে অজিত চলে যায়। তার বসবার সময় নেই। অতিথিকে কিছু খেতে দেবার কথাও সে বলে না। এখন কিছু খেতে নেই। প্রতিমা বিসর্জনের পর ফিরে এলে তখন কোলাকুলি আর খাবার ব্যবস্থা।

ঘরের অর্ধেক জুড়ে নিচু কাঠের চৌকিতে মস্ত ফরাশ বিছানো। ফরাশের মাঝখানে ছোটো কাঠের টুলে একটা লন্ঠন, উপরে চালা থেকে আর একটা বাতি ঝুলছে। তার নীচে প্রকাণ্ড একটা পিতলের হাঁড়িতে কাঠের একটা দণ্ড দিয়ে একজন চাকর সবুজ রঙের কী ঘুঁটছিল। ঘরে আর লোকজন কেউ নেই।

ওটা কী ?

আজ্ঞে, শরবত।

কীসের শরবত ?

চাকর বোকার মতো একটু হাসল। একটু পরেই শরবত ঘোঁটা বন্ধ করে ঘরের কোণে হাঁড়িটা রেখে একটা থালা দিয়ে ঢেকে আর একবার নিখিলের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে সে ঘর থেকে চলে গেল।

বাদাম পেস্তা দিয়ে বানানো শরবত নিশ্চয়। কী গাঢ় সবুজ রং ! খেতে কেমন লাগবে কে জানে। পুষ্টিকর যে হবে তাতে সন্দেহ নাই। এক গ্লাস চেয়ে নিয়ে খেলে হত।

মণ্ডপে প্রচণ্ড শব্দে ঢাক ঢোল কাঁসি ঘণ্টা বাজছে, লোকজন গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করছে। বড়োই শ্রান্তি বোধ করে নিখিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নাড়া দিয়ে দিয়ে ওঠে ভেতরে। তৃষ্ণাটা এখন যেন বেশি

জোরালো হয়েছে। ঘরের বেড়া ঘেঁষে একটি কুঁজো বসানো ছিল, গলায় উপুড় করা একটি কাঁচের গ্লাস। গ্লাসে জল খাওয়া যায়।

শরবতও খাওয়া যায়।

এক হাঁড়ি শরবত থাকলে জল কেন খাবে ? গাঢ় সবুজ পেস্তা বাদামের খাসা শরবত। বন্ধুর বাড়িতে না বলে একটু শরবত খেলে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ হবে না নিশ্চয় !

কাঠের দণ্ডটা শরবতের হাঁড়ির মুখে চাপানো থালাটার উপরেই ছিল। শরবতটা একবার ভালো করে ঘুঁটে সে গেলাস ভর্তি করে নেয়। গেলাসে চুমুক দিয়েই মনটা তার খুশিতে ভরে উঠে। সুন্দর স্বাদ শরবতের, চমৎকার গন্ধ। এমন শরবত জীবনে নিখিল কখনও চোখে দেখেনি। বেশ একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি ক্ষীর ক্ষীর মেওয়া মেওয়া খেতে, গলা দিয়ে নামবার পরেও যেন স্বাদটা জানান দিতে থাকে। তেজি শরবত !

গেলাস খালি করে নিখিল বলে, আঃ !

সে আর এক গ্লাস শরবত খায়।

খিদে আর তেষ্টা দুই মেটে সঙ্গে সঙ্গে, শ্রান্তি ক্লান্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে যায় শরীর মন দুয়েরই। বেশ তাজা মনে হতে থাকে নিজেকে, মনটা ভরে উঠতে থাকে জীবন্ত খুশির ভাবে। পৌঁছুতে একটু দেরি হয়েছে বলে, পথ একটু বেশি হাঁটতে হয়েছে বলে, পূজার আমোদটা যেন তার মাটি হয়ে গেল ভাবছিল সে ! কথাটা মনে করে নিখিল মুচকে হাসে।

আর একটু শরবত ঢেলে নিয়ে সে খায়। বেশি নয়, আধ গেলাস।

আলো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে ঘরের। লণ্ঠনের লালচে আলোয় এমন আশ্চর্য চাকচিক্য থাকে নিখিল জানত না। খুব হালকা লাগছে শরীরটা। হুঁঃ, মা আবার বলে দিন দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে, মা কী জানবে তার গায়ে কত জোর !

বাড়ির কথা ভেবে তার হাসি পায়। কী মজাটাই আজ সে করল ! ওরা সকলে সেজেগুজে মোটরে চেপে নদীর ধারে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে যাবে, ওরা কি কল্পনা করতে পারবে সে কোথায় আছে, কী করছে ! ঢোলের বাজনার সঙ্গে সে আজ খুব এক চোট নেচে নেবে, প্রতিমার আগে সবাইকে যেমন নেচে যেতে দেখেছে চিরকাল, কিন্তু নিজে কোনোদিন নাচেনি।

মাথার মধ্যে কেমন কেমন করছে কেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কেমন কেমন করাটাও যে ঠিক কী রকমের সে ধারণা করতে পারে না। মাথার মধ্যে যা কিছু আছে, সেগুলো কী কে জানে, সব যেন একবার সরু আর একবার মোটা হচ্ছে, তারপরেই চ্যাপটা হয়ে পাটি গুটোনোর মতো গুটিয়ে যাচ্ছে নিজে নিজেই। বেশি ফুর্তি হলে বোধ হয় এ রকম হয়। হয়তো হয়, বয়ে গেল নিখিলের ! এত সব হাস্যকর ব্যাপারের মধ্যে আর একটা হাস্যকর ব্যাপার নয় ঘটলই তার মাথার মধ্যে !

ভেবে, এমন হাসি পায় নিখিলের যে শূন্য ঘরে আপন মনে হাসতে হাসতে সে বেদম হয়ে পড়ে।

হাসি থামে হঠাৎ। সামনে ঘরের শাল কাঠের খুঁটিটাকে এদিক ওদিক দুলতে দেখে। চোখ পাকিয়ে সে খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন কত ভালো মানুষ এমনিভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খুঁটিটা, একটু নড়ে না পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে সেই অবসরে মেঝেটা বেশ দুলতে আরম্ভ করে দেয় তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

এমন সময় ঘরে আসে অজিত। বলে, ইস, বড়ো দেরি হয়ে গেল প্রতিমা বার করতে। হাঙ্গামার আর শেষ নেই। যাবি না প্রতিমার সঙ্গে ?

যাব না, একশো বার যাব ! যাব বলে যাব, একদম—

উৎসাহেব আতিশয্যে তড়াক কবে লাফিয়ে ওঠে নিখিল। অজিত তাব মুখের দিকে চেয়ে ভড়কে গিয়ে বলে, কী হয়েছে তোর ?

কী হবে ? কিস্‌সু না।

অমন করছিস যে ?

নাচ শিখছি। ঠাকুরের সঙ্গে নাচব না ? দাঁড়া একটু শরবত খেযে নিই।

গেলাস নিযে নিখিল খানিকটা শরবত ঢালে হাঁড়ি থেকে, অর্ধেকটা পড়ে মাটিতে অর্ধেকটা গেলাসে।

খাবার সময় কশ বেয়ে শরবত পড়ে, বুকের কাছে জামা ভিজে যায়। অজিতের চোখ হয বড়ো বড়ো।

কতটা শববত খেযেছিস নিখিল ?

কত আর, দু-তিন গ্লাস।

দু-তিন গ্লাস ! কী সর্বনাশ ! ও যে সিদ্ধিব শববত জানিস না ?

জানি না ? আমার সামনে বানালো, আমি জানি না ?

সিদ্ধি খাস তো তুই ?

নিখিল জীবনে কখনও সিদ্ধি খায়নি। কিন্তু সে হল আলাদা কথা। কে একজন একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে, এখন পিঠে কথা চাপিযে তাকে জবাব দিতে হবে, বাস। কীসেব মানে কী তা নিয়ে কে মাথা ঘামায !

কত খেযেছি !—সে বলে অবজ্ঞার ভঙ্গে।

শুনে অজিত একটু নিশ্চিন্ত হয। ব... এ কিন্তু দেশি বুনো সিদ্ধি। এদিকে যেখানে সেখানে সিদ্ধি গাছ হয় দেখেছিস তো ? এ সেই সি...া, ভীষণ তেজ, আর খাস না কিন্তু।

নিখিলকে একটু চোখে চোখেই রাখে অজিত। কিন্তু কালো দিঘিব কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ তাকে আর সে দেখতে পায না। প্রতিমা নিযে সবাই তখন ব্যস্ত, অজিত নিজেও এদিক ওদিক তার খোঁজে একটু চোখে বুলিযে প্রতিমাব সঙ্গে যেতে বাধ্য হয। বিসর্জনেব পব খোঁজ কবা হয ভালোভাবে। কিন্তু কোথাও নিখিলের পাত্তাও মেলে না।

অজিত ভয পেযে ভাবে, সেরেছে।

নিখিল যখন চোখ মেলে তাকায়, বেশ বেলা হয়েছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝে উঠতে পারে না, সত্যসত্যই জেগেছে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে ! ভাঙাচোরা এই কুঁড়েঘরেব মধ্যে সে কী করে এল, স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে বিছানো চাটাইয়ে ময়লা দুর্গন্ধ এই ছেঁড়া কাঁথা গাযে দিয়ে কখন শুল ? দরজার ঝাঁপ খোলা, বাইরে উঠানে গামছা পবা কালো একটি লোক বাঁশের মাচায় কল্কি সাজাচ্ছে। এ তো অজিতের বাড়ি নয় !

উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হয় গায়ে বুঝি একটুও জোব নেই। অনেকদিন যেন অসুখে ভুগছে এমনই বিশ্রী দুর্বল লাগছে শরীরটা, মাথার মধ্যে টনটন করছে। বাইরেও কী যেন জোরে সেঁটে আছে মাথার সঙ্গে। মাথায় হাত দিয়ে নিখিল চুল খুঁজে পায় না, মাটির মতো শক্ত কী যেন হাতে ঠেকে।

ভাবতে ভাবতে অজিতদের বাড়িতে গিয়ে খালি ঘরে বসে সবুজ রঙের শরবত খাওয়া পর্যন্ত মনে পড়ে নিখিলের, তারপরের আর কোনো কথাই মনে আসে না। সব ফাঁকা হয়ে থাকে।

পিঁ পিঁ আওয়াজ করে নিখিল উঠানের লোকটিকে ডাকে। লোকটি ঘরে এসে খুশিতে একগাল হেসে বলে, জেগেছ বাবু !

তুমি কে ? এটা কার বাড়ি ? আমি এখানে এলাম কী করে ?

তাকে কথা বলতে দেখে লোকটি যেন আরও খুশি হয়ে বলে, মাথা ভালো হয়ে গেছে বাবু ?

নাম তার শিবু। গরিব চাষি। দশমীর রাত্রে মেলা থেকে ফেরবার সময় রাস্তায় তাকে পাগলামি করতে দেখে সাথে করে বাড়ি নিয়ে এসেছে। তাদের গাঁয়ে ভালো গুণী আছে একজন, মাথার ব্যারামের সুন্দর চিকিৎসা জানে ! তাকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে।

আজ কী বার ?

বিষ্যুদ্‌বার !

দশমী ছিল সোমবার। সেই থেকে সে পাগল হয়ে ছিল আজ পর্যন্ত ! শিবু জানায়, না, পাগল হয়ে সে থাকেনি। গুণীর ওষুধে ঘুমিয়েছে একটানা। মাঝে মাঝে দু-একবার অল্পক্ষণের জন্য জেগে আবোল-তাবোল কথা বলেছে, তারপর আবার ঘুমিয়েছে।

হালিয়া কত দূর এখান থেকে ?

পাঁচ-ছকোশ হবে।

তাকে শিবু পেয়েছিল এ গাঁয়ের কাছাকাছি, তখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। হালিয়া থেকে এত দূরে সে কী করে এসেছিল ওই অবস্থায় এ রহস্যের মীমাংসা নিখিল কোনোদিন করতে পারেনি।

আমার মাথায় কী ?

শিবু গর্বের সঙ্গে জানায়, ওই তো ওষুধ, গুণীর খাঁটি ওষুধ, হাতে হাতে ফল। মাথা নেড়া করে ওষুধ লাগিয়ে দেবার পর নিখিল ঘুমিয়ে ছিল, ঘুম যখন ভাঙল মাথা তার ভালো হয়ে গেছে। নির্ঘাৎ ওষুধ নয় ?

মাথা নেড়া করে দিয়েছে। তখনকার মতো চুপ করে থাকে নিখিল ! শিবুকে দিয়েই শহরে বাবার কাছে খবর পাঠায়। শিবুর বউ দুধ গরম করে এনে দিলে এক চুমুকে দুধটাও শেষ করে। তারপর লোকজন নিয়ে তার বাবা এসে পড়লে একটা মোটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে পাগলের মতোই আথালিপাথালি পিটতে আরম্ভ করে শিবুকে।

শিবু, তার বউ আর গাঁয়ের সমবেত লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে পরম যত্নে রেখে একজনকে সুস্থ করে তোলার কী অপূর্ব পুরস্কার !

হ্যাংলা

বাজার সাপটে বড়োলোক হয়েছে মীর্ণার বাবা, বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে চমৎকার আর্টিস্টিক ছাঁদে। সমস্ত বাড়িটা নয়, কেবল সামনের অংশটা—বাইরের মানুষরা যে অংশে আসে এবং পথচারী রাস্তা থেকে যে অংশ দেখতে পায়। ভিতরের অন্দর মহলে চারমহলা দুর্গা-বাড়ির পুরানো ঐতিহ্য খানিকটা ভদ্র সাজ করে হাজির আছে।

মীর্ণার বাবা জবরদস্ত লোক। অনেক টাকা আছে বলে নয়, বাড়ি করা, মোটর কেনা, মেয়েকে তিন শো টাকায় শাড়ি কিনে দেওয়া প্রভৃতি দরকারি বিষয়ে ছাড়া কদাচ টাকার অপচয় করে না বলে। এমন কী, সামনে দোয়ানো দুধ ভালো হচ্ছে না বলে বাপ-বেটিতে মিলে গোয়ালাকে শাসাতে পর্যন্ত পারে বলে। যে ফার্ম কন্ট্রাক্ট নিয়ে বাড়িটা তৈরি করেছিল তারা তাকে ঠকাতে সাহস করেনি। বিলামসন আর দাদা-ভাই লালভাই দুজনেরই সার্টিফিকেট দেখিয়েছিল। বিলামসনের বাড়ির সাঁইত্রিশটা ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটাতে আলো-বাতাস যায়, রাস্তা নজরে পড়ে ! দাদা-ভাই লালভাইয়ের সাততলা বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশকে দেখতে পাওয়া যায় একটা লম্বা চোঙার ঢাকনির মতো।

তাতে কাজ হয়নি। মীর্ণার বাবার আরও উঁচুতে প্রভাব।

সুলেখা, সুধা ও মীর্ণা এক কলেজে পড়ে। সুলেখা ও সুধা মিলের সাফ শাড়ি পরে কলেজে যায়। মীর্ণার তো রং-বেরঙের শ-তিনেক শাড়ি সর্বদা মজুত আছেই—পুরানো দু-চারখানা বাতিল হতে না হতে নতুন পাঁচ-সাতখানা এসে জোটে। সুলেখা ইচ্ছে করে দুবার এবং মীর্ণা অনিচ্ছায় একবার ফেল করায় সুধা প্রত্যেকবার পাস করতে করতে এসে তাদের নাগাল ধরেছে।

শহরতলিতে সুলেখা ও সুধার বাড়ি, এক পাড়াতে এবং কাছাকাছি। দুজনের এক ধরনের ভাব হয়েছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা জন্মেনি। সুলেখা বারবার ফেল করায় সুধা তাকে একটু নিকৃষ্ট জীব মনে করে। সুলেখা সর্বদাই মৃদু মৃদু হাসি দিয়ে বেশি কথা বলার কাজটা চালিয়ে নিতে চায়, এটাও সুধার পছন্দ হয় না।

মীর্ণার নাগাল দুজনেই পায় না। মীর্ণা নিজেকে ওদের নাগালের বাইরে রেখে দেয়। কলেজে দেখা হয়, কিন্তু না হয় দুটো মনের কথার বিনিময়, না জাগে এক সমতলে দাঁড়াবার অনুভূতি। জমকালো দেহ এবং জমকালো শাড়িতেও নির্বোধ অহংকার টলমল করে বলে মীর্ণা মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো চোখ দুটির কুটিল দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকায়। সস্তা মিলের শাড়ির চেয়ে দামি সিল্কে যে মেয়েদের ভালো দেখায়, এই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যে মীর্ণার রীতিমতো সন্দেহ উপস্থিত হয়।

মথুরামোহনের একটি খবরের কাগজ এবং একটি রাজনৈতিক দল আছে। সে নিজে এবং জনকয়েক অনুগত ছেলেমেয়ে এই নিয়ে তার দল এবং এতেই সে সন্তুষ্ট। কারণ, দলের গালভরা নাম, নিজের বক্তৃতার দাপট আর খবরের কাগজ, এতেই তার বেশ চলে যায়। হিসাব করে নিজের রাজনৈতিক ওজনটুকু সে ধারও দেয়, ভাড়াও দেয়। সুধার সাহায্যে মথুরা মীর্ণাকে বাগিয়েছে। সুলেখাও হাত লাগিয়েছে কিন্তু সে একটু গভীর জলের মেয়ে। তার হস্তক্ষেপ ধরতে পারেনি বলেই মীর্ণার কল্পনায় সেই রং চড়াতে পেরেছে বেশি। মীর্ণা চড়বড় করে উপরে উঠে নেতৃ স্থানীয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে অল্পদিনের মধ্যে। এখন সুধাকেই সে কাজের নির্দেশ দেয়। রীতিমতো শক্ত কাজ—যাতে অনেক খাটা এবং হাঁটা দরকার। সুলেখাকে কয়েকবার কাজের শাস্তি দেবার চেষ্টাও সে করেছিল, স্বয়ং মথুরামোহনের জন্য পারেনি।

ও পারবে না। মেয়েটা কোনো কাজের নয়। মথুর যেন কৈফিয়ত দিয়েছিল।

শিখতে হবে না ?

কী দরকার ? সকলকে বিশ্বাস করা যায় না।

ও ! বলে মৃদু হেসেছিল মীর্ণা !

সুধা খুব উৎসাহী। কোনো কাজে সে কখনও না বলে না। সে জানে, ভালো ওয়ার্কাব হিসাবে সে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা বজায় রেখে চললে বড়োরকম সুযোগ সুবিধা কোনোদিক থেকে জুটে যাবে। শুধু মীর্ণার প্রতি গভীর বিদ্বেষে তার গা জ্বালা করে। ও কেন এত উঁচুতে স্থান পেল ? মোটরে আসে যায়, বড়োলোকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, বাড়িতে আজ পার্টি, কাল বসন্তোৎসব করে হাওয়ায় ভেসে দিন কাটায়। তাদের কখনও ডাকে না। তার সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতে চায় না।

একদিন বিনা আহ্বানে সুধা ওর বাড়ি গিয়েছিল—সন্ধ্যাবেলা। ড্রয়িংরুমে পাঁচ সাতটি ছেলেমেয়ে বসেছিল, দু-তিনজন সুধার মুখচেনা। সুনীলের সঙ্গে তো তার আলাপ পর্যন্ত আছে। কাগজের অফিসে একদিন অনেকক্ষণ সে তাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনে তার সমস্ত কথার জবাব দিয়েছিল সুনীল। আর একদিন খুব অল্প সময়ের জন্য আলাপ হয়েছিল বটে কিন্তু সেদিন সুনীল রাজি হয়েছিল তার বাড়িতে একদিন চা খেতে আসবে, গবিব বলে অবহেলা করবে না। তারপর সে আর সুনীলকে এ পর্যন্ত একটা দিন স্থির করে নিমন্ত্রণ করাব সুযোগ পায়নি, কেমন যেন তাকে এড়িয়ে গেছে সুনীল। নিশ্চয় মীর্ণার কুপরামর্শে। কিন্তু মুটকি মীর্ণা ওকে আর কদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবে, একদিন তার বাড়িতে ও নিশ্চয় আসবে চা খেতে।

কিন্তু সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে আধ মিনিট তাকে মীর্ণা দাঁড়াতে দেয়নি, কারও সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে সোজা স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিল, কী চাই ?

এমনি আলাপ করতে এসেছি।

আর একদিন এসো।

আর একদিন এসো ! অপমানে বুক ফেটে গিয়েছিল সুধার। কেন আব একদিন আসবে ? আজ তাকে সকলের মধ্যে বসিয়ে চা আর ওই খাবারগুলির কিছু খেতে দিলে দোষ কী হত ?

আঘাতটা সমলে নিয়ে পরে সুধা মনে মনে হেসেছে। ওরা ওই রকমই হয়। ওরা বড়োলোকেব জাত—বজ্জাত। ওদের দিয়ে সমাজের কোনো কল্যাণ হতে পারে ?

সুলেখা বলে, তোমার অত হিংসা কেন ? তুমি তোমার কাজ করে যাও।

আমাদের মানুষ বলে গণ্য করবে না ?

নাই বা করল ? আমরাও ওকে মানুষ বলে গণ্য করব না। তাছাড়া, ওকে মথুরাবাবুর তেমন পছন্দ নয়।

নয় ? সুধা চমকে যায়।

সুধা কাজ করে, খুব ভালো কাজ করে। প্রতিদিন বিকালে সে তাদের আপিসে হাজির থাকে। বই পড়ে, অন্য ওয়ার্কারদের সঙ্গে কথা বলে আর উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ করে কে আসছে আর কে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে একজনের পিছু পিছু বেরিয়ে যায়। রাস্তায় নাগাল ধরে বলে, বাড়ি যাবেন নাকি মোহনদা ?

মোহন বিব্রত হয়ে বলে, অ্যাঁ ? হ্যাঁ, বাড়িই যাব ভাবছি।

চলুন আপনার সঙ্গে ভবানীপুর পর্যন্ত যাওয়া যাক। পরিচয়টা আরও জমবে।

চলুন।

অবিশ্যি যদি আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

মোহন ধীরে ধীরে বলে, বাড়িতে একটু কাজ ছিল।

এসপ্ল্যানেডে ট্রাম বদল করতে নেমে সুধা বিস্ময়কর স্বগতোক্তি করে, ওই যা, ভুলে গেলাম। সর্দি হয়েছে, একটু কফি খেয়ে যাব ভেবেছিলাম। কলেজ থেকে বেরিয়ে কিছু খাইনি—খিদেও পেয়েছে চনচনে।..... খাওয়াবেন তো বুঝলাম, আপনিও খাবেন তো ?

তা, বাড়ির অবস্থা সুধার তেমন ভালো নয়। কলেজের পর খিদে পেলে সস্তা কিছু খেয়ে কোনোরকমে পেট ভরাতে পারে—তাতে স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, পুরুষ একজন সঙ্গীকে নিয়ে পাখার নীচে ভালো চেয়ারে গা এলিয়ে খাবার সুখ নেই।

সুলেখা বলল, এ সব বাদ দে ভাই।

সুধা বলল, তুই বড়ো হিংসুটি। ডেকে নিয়ে যায় তো আমি কী করব ? বেশি প্রশ্রয় তো দিই না।

তলে তলে কী চাল চালল সুলেখা সেই জানে, কদিন পরে মীর্ণা নিজেই সুধার কাছে প্রস্তাব করল, তার ছোটো বোনকে সে যদি পড়ায়, ত্রিশ টাকা করে সে পাবে।

সকালে একঘণ্টা আর বিকেলে একঘণ্টা। বাড়ি তোমার কাছেই, অসুবিধে হবে না। নিয়ম মতো মনোযোগ দিয়ে কিন্তু পড়াতে হবে। মথুরাবাবু তোমাব কথা বললেন তাই, নইলে—

তিরিশ টাকা ! মাসে শুধু তিবিশটা টাকা দুবেলা পড়ানোর জন্য ! এত টাকা খরচ কবে মীর্ণা, তাকে পঞ্চাশ না হোক চল্লিশটা টাকা মাইনে দিতে পারে না সে ! মবুক গে, তিবিশ টাকাই সই। দু একখানা শাড়ি কেনা যাবে, হাত খরচেব ক-টা টাকা বেশি হবে—

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাব পর মীর্ণাব ছোটো বোনকে সে অতি কষ্টে পড়াচ্ছে, বাড়ির সামনে মোটরেব পর মোটর এসে থামতে লাগল। আরও মিনিট কুড়ি পড়িয়ে মীর্ণাব ঘবে গিয়ে মুখে পাউডাব লাগিযে সে সোজা গিযে হাজির হল বসবার ঘরে। চেনা আধচেনা কয়েকজনের সঙ্গে বাক্য বিনিময় কবে সুনীলের পাশেব আসনে বসে পড়ল।

কই চা খেতে একদিন তো গেলেন না গরিবেব বাড়ি ?

পরদিন সন্ধ্যার পব সুলেখা কয়েকটা সরু গলিতে পাক দিযে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ল। প্রেসে ছাপার কাজ চলবার দেযাল-কাঁপানো শব্দ হচ্ছিল। ছোটো একখানা ঘরে কাঠেব টেবিলেব সামনে একটি হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারে বসে মাঝবয়সি একজন প্রুফ দেখছিলেন। তাকে কাগজ, মেঝেতে কাগজ, চারিদিকে কাগজের ছড়াছড়ি ! খববেব কাগজেব অপিসের গন্ধে ঘরেব বাতাস ভরা। মুখ তুলে একবার চেয়েই মথুরা বলে, বোসো। কী খবর ?

সুধার খবর।

কী রকম দাঁড়াল ?

হ্যাংলা।

মুখ না তুলে গলায় বিস্ময় না ফুটিয়ে মথুরা বললেন, হ্যাংলা ? এ সব মেযে কজন হ্যাংলা বেরোয় শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও ওকে।

আমায় টাকাটা দিতে পারবেন আজ ?

টাকা ?

এবার মাথা তুলে মথুরা আর নামাল না—মীর্ণা টাকাটা দিচ্ছে না। ওর টাকাটা আদায় করিয়ে দাও, ডবল কমিশন দেব। সহজে হবে না, চাপ দিতে হবে। কী করবে বলে দিচ্ছি। সবাই যেন একটু

অবহেলার ভাব দেখায়। কথা বলতে আরম্ভ করলে কান না দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা চালাতে হবে। ওয়ার্কাররাও যেন ডাকলে সাড়া না দিয়ে সরে যায়। দু-চারজন আসছি বলে চলে যাবে, আসবে না। মীর্ণা যেন বুঝতে পারে কাগজের টাকাটা তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। বুঝিয়ে বলে দিয়ো সকলকে।

প্রুফ দেখতে আরম্ভ করে বললেন, চা খাবে নাকি একটু ? আমায় কিন্তু এক কাপ দিয়ো।

দিন তিনেক পরে বাপের কাছে একটা চেক চেয়ে নিয়ে মীর্ণা বলে, তোমার ওই মথুববাবু বড়ো হ্যাংলা বাবা।

বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে

ভর দুপুরে দুলে বাগ্‌দি নায়েবমশাই শ্রীমন্ত সরকারের ঘরের দাওয়ায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসে আছে। ছেলের মতো যত্নে পাশে তার পাকা বাঁশের লাঠিটি শোয়ানো। কত তেল আর কত স্নেহে পাকানো এই লাঠি, রক্তও যে মাখেনি কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে এমন নয়।

লাঠিটি হাতে নিয়ে দুলে সকালবেলা বাগ্‌দিপাড়া থেকে বেরিয়েছিল। কাছারিবাড়ি গিয়েছিল কত্তাবাবুকেই তার দুঃখ আর নালিশ জানাতে। জমিদার অনুকূল তার নিবেদন কানেও তোলেনি, তার গুরুতর কিছু বলার আছে টের পেয়েই হুকুম দিয়েছিল ; শ্রীমন্তর কাছে যা দুলে। যা বলতে চাস শ্রীমন্তকে বল। পরে আমি শুনবখন।

শ্রীমন্ত বলেছিল, কীরে দুলে ' বুড়ো বয়সে আবার কোনো ছুঁড়ির সাথে 'অঙ' (রং) করে ফ্যাসাদে পড়েছিস নাকি ? এখন বাবু আমি বড়ো ব্যস্ত। আমাব বাড়ি যা, পুবের বেড়াটা একটু ভেঙে গেছে সেরে দিগে যা ততক্ষণ। কাছারির কাজ সেরে আসছি, তোর নালিশ শুনব।

পুবের গাছেব মাথা ঘেঁষা সূর্য মাথার উপরে চড়া পর্যন্ত দুলে নায়েববাবুর বাড়িতে বেগার খেটেছে, বাগানের বেড়া সারিয়েছে। অন্য বাড়ি চুক্তি করে নিলে এ কাজের জন্য সে কম করে আট আনা মজুরি পেত। কিন্তু বেলগাছে দেবতা থাকেন দুলের, তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান এবং সেই জন্যই দুলে বাগ্‌দিপাড়ায় প্রধান। ওই বেলগাছের দেবতা বা দৈত্যকে সে মানে বলেই জমিদাব আর নায়েব গোমস্তা তাকে পায়ের গোলাম হতে দিয়েছে, বাগ্‌দিপাড়ার প্রধান করেছে। বেগাব তাকে খাটতেই হবে। শুধু তাকে কেন, বাগ্‌দিপাড়ার সব মদ্দপুরুষকে খাটতে হবে।

অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে শ্রীমন্ত বলেছিল, একটু বোস বাবা। চট কবে নেয়ে খেয়েনি, তারপর তোর নালিশ শুনব। তোদের ভালো করতে হারামজাদা আমি যে মারা গেলাম !

দুলে সেই থেকে দাওয়ায় বসে আছে। মাঝদিনের মাথার উপরের সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলতে আরম্ভ করেছে। তবু নীরবে বিনা প্রতিবাদে অপেক্ষা না করে তার উপায় কী। গ্রামের বাইরে যেখানে গোল হয়ে বাঁক নিয়েছে নদী সেইখানে ঘন বাঁশঝাড় জলাজঙ্গল ভরা জমিতে বাগ্‌দিপাড়া, সে পাড়ায় সে প্রধান। সেটা তো বেলগাছের দেবতা, জমিদাব আর নায়েববাবুর দয়াতে। তার রাজ্যে, ওই বাগ্‌দিপাড়ায়, আজ যখন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার যখন খটকা লেগেছে ব্রাহ্মণ জমিদার নায়েব ভগবান ইংরেজরাজ তাকে আর কতদিন প্রধান করে রাখতে পারবে, তখন এ ভাবে শ্রীমন্তর বাড়ি এসে বেগার খেটে ধরা না দিয়ে তার উপায় কী। তার রাজ্য যে যায় যায়।

কষ্টে তার মাথা ঘুরছে। আধেক দিন প্রতীক্ষা করাল, আধবেলার বেশি বেগার খাটাল, একমুঠো গুড়মুড়ি জল খেতে দেয়নি। বেলগাছের দেবতার মতোই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচারী বলেই তো এরা দেবতা। তাই হবে !

ভুঁড়িতে আলগা করে লুঙ্গি আটকে হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্ত এসে জলচৌকিটাতে ধপাস করে বসে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, চটপট বল দিকি কী ব্যাপার। প্যানাস নি, এক কথায় বল। তোদের নালিশ শুনতে শুনতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, হারামজাদা বজ্জাতের দল। ঘুম পেয়েছে বাবু আমার।

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে দুলে ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনে--

আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম
বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে,
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে --

তবে তুমি ঘুমোবে যাও। নালিশ শুনে কাজ নেই।

শোয়ানো লাঠি হাতে তুলে দুলে উঠতে যাবে, ব্যাপার বুঝে সচেতন হয়ে শ্রীমন্ত হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বলে, রাগিস কেন ? তুই আর আমি কি তফাত? তুই আমার পুত্রতুল্য ! কী বলছিস বল।

বলব কী ? দারুণ অভিমানে লাঠি আবার শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে দুলে বলে, একদল বদ বেজাত যারা কারখানায় কাজ করতে যায় না ? বাগ্‌দি-পাড়া ওরা নষ্টাৎ করে দিচ্ছে। কী বলে শুনবে ?

বল না শুনি।

বলে, মোরাও মানুষ। রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ, মোরাও মানুষ।

বলে তো হয়েছে কী ?

হয়েছে কী ? ঠাকুরথানের বাঁধ কাটতে চায়, এই হয়েছে ! ঠাকুরথানের অপমানের কথা উচ্চারণ করার জন্যই নিজের দু-কান মলে দুলে শিউরে ওঠে।

বলিস কীরে ! কবে কাটবে ?

অনেকে গুঁইগাই করছে, তাইতে হঠাৎ ভরসা পাচ্ছে না, নইলে কবে কেটে দিত। তবে রাতদিন জপাচ্ছে, ইয়াকে উয়াকে রাজি করাচ্ছে। বেশিদিন আর সামলানো যাবে মোর ভরসা নাই। তোমরা ইবারে বিহিত কর।

বাগ্‌দিপাড়া জলার কাছে, প্রায় জলার মধ্যে। প্রতিবছর বর্ষায় জল পাড়ায় ওঠে, আবদ্ধ জল পচতে পচতে এক আঙুল দেড় আঙুল সরতে সরতে আর এক বর্ষার আগে শুধু কিছুদূর তফাতে সরে যায় মাত্র। নিচু জমির স্বাভাবিক জলা, চারিদিকে জমি উঁচু, জলা ওখানে থাকবেই। পশ্চিমে জমি শুধু একটু কম উঁচু--আগে, বহুকাল আগে, ওইদিক দিয়ে জলার কিছু বাড়তি জল বেরিয়ে যেত, বর্ষার জল একেবারে পাড়া পর্যন্ত উঠত না। বহুকাল আগে, কতকাল আগে কারও আজ স্মরণ নেই, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে এক জায়গায় হাত ত্রিশেক লম্বা, দশ-বারোহাত চওড়া এবং পাঁচ-ছহাত উঁচু একটি বেদি বানায়, ইট আর মাটি দিয়ে। তার নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে বাগ্‌দি সমাজের চিরদিনের কল্যাণের জন্য ওখানে শিবাই ঠাকুরের বেদি স্থাপন করতে হবে। এবং এমনই আশ্চর্য ব্যাপার, স্বপ্নাদেশের খবর শোনামাত্র জমিদার টাকা আর লোক দিয়ে নিজেই বেদিটা বানিয়ে দেয়। মহাসমারোহে বেদিতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, বাগ্‌দিদের মধ্যে নেশা উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা পরিসীমা থাকে না। সেই থেকে ওই ঠাকুরের থান তাদের সমস্ত ধর্মকর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সেই থেকে বর্ষাকালে জলার বাড়তি জল ঠাকুরের থান ডিঙিয়ে যেতে না পেরে পাড়ার মধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে।

শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে, হাই তুলে বলে, কী বলে জপাচ্ছে ? ঠাকুরের থান তো বেগার খাটা তেভাগা নয় ?

দুলে তার ঝাঁকড়া চুল পিছন দিকে ঠেলে দেয়। চুলে তার কটা রং ধরেছে, বিশেষ পালাপার্বনে কদাচিৎ একটু তেল পড়ে। চুলে অসংখ্য উকুনের বাসা, মাঝে মাঝে সে পাগলের মতো মাথা চুলকায় তখন মনে হয় রাগে বুঝি নিজের চুল ছিঁড়ছে, বাগ্‌দিপাড়ার অবাধ্যতার রাগে !

শোনো তবে কী বলে। পাপ কথা মুখে উচ্চারণ করতি মোর গা কাঁপে। বলে মোরা খাটি খাই, মোরা ছোটো কীসে, মোরা সজ্জাত হব। মোরা বজ্জাতি ধরম করম মানবো নাই।

সজ্জাত কী রে ?

ঠাকুরমশাইরা তোমরা বাবুরা যে জাত, তাব চেয়ে উঁচু জাত, ভালো জাত।

ও, সৎ জাত। উঁচু জাত।

দুলে মাথা হেলিয়ে সায় দেয।---হাঁ সজ্জাত। বলে, বম্ভান্ড সংসার পালটে গেছে, বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে, মজুরের জাত, খাটিয়েব জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস। আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন ? না, তারা চোর ছ্যাঁচোড়। কেন ? না যারা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর বেজাতের দেবতা ধরম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত।

বলতে বলতে দুলে বাগ্‌দি কেঁদে ফেলে, কুলি খাটা ছোঁড়াছুঁড়ি মোর পাড়া সমাজ বেদখল করলে গো ! তুমরা এর বিহিত কর !

ভাত খেয়ে তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্তের ঢুল আসছিল। বাগ্‌দি পাড়ায় আবার বিদ্রোহ ! জোয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেয়াদপি বেড়েছে এই পর্যন্ত, দুটো গুঁতো খেলে টিট হয়ে যাবে। সমাজেব মাতব্বরকে সবাই মেনে চলবে এটা উচিত এবং দরকাব। মাতব্বব নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দবকাব।

শ্রীমন্ত ধমকে বলে, কাঁদিস না ব্যাটা, মেয়েছেলেব মতো কাঁদতে লেগেছে ! সাধে কি তোকে কেউ মানে না ?

দুলে ভাবাবেগ সামলে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বলে, তোমরা হলে মা-বাপ, তোমাদের ঠেঁয়ে [illegible] পারি। না তো দুলে বাগ্‌দি কেমন মরদ দশটা গাঁয়েব মানুষ জানে।

শ্রীমন্ত ব্যঙ্গ করে বলে, মরদ যদি তো ধরে ঠেঙিয়ে দিতে পারিস না ব্যাটা ?

উই তো মোর পোড়া কপাল ! হাউমাউ করে ওঠে দুলে, তোমরা বুঝবে নি। ই যে সামাজিক অমান্যি গো, জেতেব ব্যাপার, ঠেঙাব কাকে ?

সামাজিক বৈঠক ডেকে বিচাব ও শাস্তিব ব্যবস্থা কবাব চেষ্টা কি আর করেনি দুলে কিন্তু কে মানছে বিচার, কে মাথা পেতে নিচ্ছে শাস্তি ? যাদেব জাতে ঠেলবে একঘরে করবে তারাই যে বর্জন করেছে যে কজন দুলের পক্ষে আছে তাদের। খুঁটিতে বেঁধে যে ঠেঙাবে, মাথা মুড়োবে, ছ্যাঁকা দেবে, তার উপায় কই ? ওরাই যে উলটে তাদেব পিটিয়ে দেবার মতো দলে ভারী। দুলে বরং জাত ধর্ম ঠাকুর দেবতা চিরকালেব রীতিনীতির কথা বুঝিয়ে বুঝিযে, কারণে অকারণে পচাই-খাওয়া সামাজিক পরব-ফুর্তির ব্যবস্থা করে, তাতে মেয়েমদ্দব মেলামেশার নীতিনিযম আরও শিথিল করে কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। নইলে সব চুরমার হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু—

মোর আর খ্যেমতা নাই। ইবারে তোমরা বিহিত কব !

শ্রীমন্তর আবার ঢুল আসছিল। সে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা। কে কে পান্ডা নাম বল তো। বিশে শিবু ?—

উপরে ভাদ্র শেষের মাথা ফাটা রোদ, তলায় বর্ষায় পরিপূর্ণ জলা-পুকুর ভিজে মাটি থেকে গরম ভাপ উঠছে। বাগ্‌দিপাড়ার দিকে চলতে চলতে দুলে হিংসার আনন্দে চোখে প্রায ঝাপসা দেখতে থাকে। হোক বিহিত, চরম বিহিত হোক। তার প্রতিপত্তি তার অধিকার নষ্ট হবার বদলে বাগ্‌দি-পাড়াটাই যদি আগুনে পুড়ে যায়, বাগ্‌দি জাতটাই ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও দুলের আপত্তি নেই ! তার দেবতা অপদেবতাদের কাছে দুলে মাথা কপাল খুঁড়ে প্রার্থনা জানায়। বলি মানত করে।

বাগ্‌দিপাড়ার জলকাদা শীতকালের আগে শুকোবে না, শুকোবার আগে পচে যায়। গ্রামের বাইরে নিচুজমিতে তাদের কুঁড়ে বাঁধবার ঠাঁই, সাধ করে মানুষ সেখানে থাকে না। গোড়ায় রাজা জমিদারের প্রজা-ঠেঙানো লেঠেল-পুলিশি আর বেগারদারির বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। লাঠি মাঝে মাঝে আজও ধরে, তবে পেশা হিসাবে তুচ্ছ হয়ে গেছে। জমির

টুকরো নানাভাবে খসে গেছে, বৃত্তির বদলে পূজাপার্বণে চিঁড়ে-মন্ডা সিধে পায় কিন্তু রীতি হিসাবে বেগারখাটা ঠিক বজায় রয়ে গেছে। আর আছে তাদের দুর্ধর্ষ বন্য ও বোকা করে রাখাব জন্য খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ধর্ম-কর্ম সমাজ-গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব বর্বর রীতিনীতি ব্যবস্থা চাপানো হয়েছিল তার অবশিষ্ট পরিশিষ্ট।

আছে মানে এই সেদিনও ছিল। যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় এখন যায় যায় অবস্থা। কাছাকাছি যুদ্ধকালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচণ্ডভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধা নিষেধ অমান্য করে কারখানায় খাটতে গিয়ে অনেকে হয়ে এসেছে সমাজ-ভাঙা বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কী অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারের বদ্ধ পশুগুলি ! তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্‌দিপাড়ার পচাই খাওয়া মেয়ে পুরুষকে, যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল মারামারিতে পটু খেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই-বোনা ঘরামি-খাটা বাগ্‌দিদের। উঁচুতলার মানুষের আচার নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি ভোগের ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্বরতার পাশবিক সাহস—লাঠি হাতে খুন করতে খুন হতে ভয় না পাওয়া—চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে, মুক্তি কামনায়।

এই তেজের প্রমাণ দুলে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক বাগ্‌দি মেয়ে পুরুষ কোদাল খন্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ছে—এক পাশে চার-পাঁচহাত চওড়া সুড়ঙ্গ কাটছে বেদিতে।

এ কী দুঃস্বপ্ন দেখালে ঠাকুর ? এ কী সর্বনাশ ঘটালে ? বাগ্‌দি সমাজের বিদ্রোহ দমনের বিহিত করতে এক সকাল সে কত্তাবাড়ি আর নায়েববাবুর বাড়ি ধন্না দিয়েছে, তার মধ্যে জগৎ ওলট পালট হয়ে গেল ? অপরাধ কি হয়েছে কোনো ? ঠাকুরের থানে ধন্না দিতে সে তো কসুর করেনি, হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে তার যখন মনে হয়েছে ঠাকুর নিজে ফিসফিস করে শিস্‌ দিয়ে আদেশ দিলেন কত্তাবাবুর কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার জন্য, শুধু তখনই তো সে ওদিকে ধন্না দিতে গিয়েছে।

উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দুলে চিৎকার করে : সব্বোনাশ হবে, সব্বোনাশ হবে ! ঠাকুরের থানে কোদাল ছোঁয়ালি ?

শিবু কোদাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বাবুদের ঠাকুর ঘরে নালা থাকে। মোরা একটা জল নিকেশের নালা করে দিচ্ছি। ঠাকুরের থান তোমার ঠিক রইবে।

পালা ! পালা সব ! কত্তাবাবুকে খবর দিয়ে এয়েছি, পুলিশ আসছে, মিলিটারি আসছে। পালা, পালা, সব পালা !

সকলে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুলালি কচি বয়সে কারখানায় খাটতে গিয়ে জাত-ধর্ম সব নষ্ট করেছে। উথলে উঠেছে তার যৌবন। খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, আরে বুড়া তোর মরন নাই ? খপর দিছিস ?

খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। রক্তে তা রুক্ষ কটা চুলে চাপ চাপ জটা বাঁধতে থাকে। ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী

গাড়িটা ঘণ্টাখানেক লেট করেছে।

ঠিক সময়ে পৌঁছোলেও অবশ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, স্টেশনের তেলের বাতিগুলি তার আগেই জ্বালানো হয়। প্ল্যাটফর্মে অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, শঙ্কিত ও স্তব্ধভাবে। আরও গভীর রাত্রের ট্রেনের জন্যও এ স্টেশনে সাধারণত আরও অনেক বেশি যাত্রী জড়ো হতে দেখা যায়। আজ একদল সিপাই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূর্ণ করেছে।

গাড়ি দাঁড়ায় মিনিট দেড়েক। এই সময়টুকুর ব্যস্ততা এবং কলরবও আজ স্টেশনে ঝিমানো মনে হয়, তারপর গাড়ি ছেড়ে যাবার দু-চারমিনিটের মধ্যে অদ্ভুতভাবে স্টেশন এলাকা যাত্রীশূন্য হয়ে ছমছমিয়ে আসে। গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তারা কোনোদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গেটে টিকিট দিয়ে পথে নেমে যায় - এত লোকে যে টিকিট কাটে এবং সদর গেটে টিকিট দাখিল করে স্টেশন ছাড়ে এও এক অসাধারণ ব্যাপার বটে। চারিদিকে এক নজর তাকালেই টের পাওয়া যায় যে বাড়ির টান আজ সকলের হঠাৎ বেড়ে যায়নি, স্টেশন এলাকা ছেড়ে তফাত হবার তাগিদেই যাত্রীদের এত তাড়া।

পথে নেমেও কেউ দাঁড়ায় না। স্টেশনের লাগাও তেরাস্তার মোড়, দু-তিনটে দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলিও বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এ সময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরে থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষি কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ভিন্ডি-বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যে আজ কারও নেই।

স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক-ওদিক তাকায়। চোখের পলকে তার জানাচেনা স্টেশনটি যে ভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস আছে। কাল এখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়িতে শুনেছে। এ রকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল।

দেখলি ব্যাপার ?

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, দেখব আবার কী ? হাঙ্গামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার হবে ? হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকোনি, যাই চলো।

বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে ক জন বাবুমতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ করছিল, নামধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-একজনকে। স্টেশন যাত্রী-শূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদের নজর পড়ে। মাঝবয়সি বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, চাষাভুসো বাজে লোক, যেতে দাও। তার খদ্দর-পরা ছোকরা বয়সি সঙ্গীটি পান-রাঙা মুখে আরও দুটো পান পুরে চিবুতে চিবুতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকে, আচমকা পাঁচ করে পিক ফেলে হাত উঁচিয়ে আঙুল ঠেরে দিবাকরকে কাছে ডাকে, এই ! শোনো !

দিবাকর অবশ্য দেখেও দ্যাখে না, শুনেও শোনে না। পুঁটুলিটা বগলে চেপে দড়িবাঁধা হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকে।

ওরা জন তিনেক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

টিকিট আছে ?

আছে।

শার্টের বুক পকেট থেকে দিবাকর দুখানা টিকিট বার করে দেখায়।

কোথা যাবে ?

আজ্ঞে ছোটোবকুলপুর যাব।

শুনে তারা যেন একটু চমকে যায়। পানখোর ছোকরা আবার প্যাঁচ করে খানিকটা পিক ফেলে। গতকালের হাঙ্গামায় প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে খানিক রক্তপাত ঘটেছিল, ছোঁড়া যেন পানের পিক দিয়েই তার জের টেনে প্ল্যাটফর্মটা রাঙা করে দিতে চায়। দিবাকরও পান ভালোবাসে, রাস্তায় পুরো চার পয়সার তৈরি পান কিনেছে। কাগজের ঠোঙাটা বার করে সেও একটা পান মুখে পুরে দেয়। লোকগুলির এত কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধ হয় পানটা তার একটু তিতো লাগে। ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানাটার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শো-মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধাচাষি আধামজুর প্রাণটা বড়োই বিগড়ে আছে।

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, রাত করে ছোটোবকুলপুর যাবে ? সেখানকার খবর জানো সব ?

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে বলে, খবর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয়কুটুম আছে সেথা, খপর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।

বেঁটে বলে, ও বাবা তোমার দেখি চটাং চটাং কথা !

না বাবু, গরিব মানুষ কথা কোথা পাব ?

তেমাথার পাশে দুটি খোলা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ। স্টেশনের সামনে সাধারণত দু-তিনটি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়া যত প্রাচীন, গাড়িগুলি ততোধিক। বেগার খাটার ভয়ে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করেনি। গাড়ি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবার মতো বড়োলোক দিবাকর কোনোদিন ছিল না, আজ কিন্তু সে ঘোড়ার গাড়ি চেপেই যেত—আন্নার রুপার গয়না বাঁধা দিয়ে এই উদ্দেশ্যেই সে টাকা জোগাড় করে এনেছে। ছোটোবকুলপুর পৌঁছোতে রাত হবে এটা জেনেই তারা রওনা দিয়েছে, তবে রাত করে মেয়েছেলে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ির আশাটা ছিল।

এখন ভরসা গোরুর গাড়ি।

গাড়োয়ান কই হে ! দিবাকর ডাকে।

দুই গাড়ির দুজন মালিকেরই আবির্ভাব ঘটে। আবছা আলোয় মনে হয় একজন যেন পুরানো বটগাছটা এবং অন্যজন দোকান ঘরের বেড়া ভেদ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের তাড়া নেই, গোরুর গাড়িতে কম্পিটিশনও নেই। ধীরেসুস্থে তারা জানতে চায় দিবাকরেরা কোথায় যাবে।

ছোটোবকুলপুর।

শুনে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে। ওরে বাবা, রাত্রিবেলা ছোটোবকুলপুর কে যাবে ! সেখানে সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমতো লড়াই চলছে'

চারজনেই তারা সম্মুখে পথটার দিকে তাকায়। ছোটোবকুলপুরের এ রাস্তা কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সে পর্যন্ত এখন নজর চলে না—মনে হয় বিপজ্জনক অন্ধকারেই বুঝি পথটা হারিয়ে

গেছে। বাঁ হাতে কোলের বাচ্চাকে সামলে ডান হাতে আন্না দিবাকরকে এক পা পিছু ঠেলে দেয়, নিজে এগিয়ে দায়িত্ব নেয়।

ওখান তক্ নাই বা গেলে বাবা ? যদ্দুর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকি রাস্তা মোরা হেঁটে যাব। ভাড়া ঠিকমতো পাবে।

রাম বলে, রাতের বেলা কে অত হাঙ্গামা করে, না কী বলো ঘোষের পো ?

ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ ! আন্না মিষ্টি সুরে বলে, বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ !.

রাম চুপ করে থাকে। তার বয়স বেশি, সাহস কম। গগন ঘোষ বলে, কমলতলা তক যেতে পারি।

তাই হোক। কমলতলার সীমা পেরিয়েও যদি নামিয়ে দেয় তবু প্রায় আধমাইল হাঁটতে হবে। পুরো দেড়ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভালো। একটা গাড়িতে বলদ জুড়লে আন্না উঠে বসে, এ কসরত তার অভ্যাস আছে। গগনের গাড়িটা নড়বড়ে, ক্রমাগত লেজ মলে তাড়া না দিলে শীর্ণ বুড়ো বলদ এক পা এগোতে চায় না। আন্না আগ্রহের সঙ্গে ছোটোবকুলপুরের খবর জিজ্ঞাসা করে, তবে গাঁয়ে ঘরে পৌঁছোবার আগে বাপ-ভাইয়ের কুশল জানার আশা সে করে না। গ্রামের সাধারণ অবস্থার ঘনিষ্ঠতর বিবরণ, অনেক নতুন খবব গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোটোবকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেবস্থ জীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপাব [illegible]ক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তাবপব গাঁয়ের লোক এম[illegible] আঁটসাঁট বেঁধে তৈরি হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষেদের কোনো লোক অন্তত দু ডজন [illegible]ল ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায না।

একবার মুখ খুললে গগনকে থামানো [illegible]য। গোরুর লেজ মলে মলে মুখে গোরু তাড়ানোব অদ্ভুত আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সে চারিদিকের অবস্থা বর্ণনা করে যায়, তার মতে কলিযুগ সত্যিই এবার শেষ হতে চলেছে। সমস্ত লক্ষণ থেকে তাই মনে হয়। নইলে রাজায় প্রজায় এমন যুদ্ধ বাধে ?

মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্যযুগ করবে !

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথে বেশ শোরগোল তুলেই গাড়ি চলে। রাস্তার ধারের কোনো কোনো ঘরের বেদখল দাওয়া থেকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়িতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসে : কে যায় ? কোথা যাবে ?

গগন জবাব দেয় : ইস্টেশনের ট্রেইনের মেয়েছেলে। কমলতলি যাবে।

গাড়ি গাছপালা বাড়িঘরের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়িটাতে সেটা যেন যতক্ষণ সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।

এ অঞ্চলে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগানো বড়ো বড়ো গ্রাম তবু এখন সন্ধ্যারাত্রেই রাস্তায় প্রায় লোক চলাচল নেই। গেঁয়ো লোকের পথ চলাও খাপছাড়া রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এই পথ ধরেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকে পাড়ি দেয়, আজ যেন চারিদিকে সকলেরই দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার পাশ থেকে আচমকা হয়তো একজন রাস্তায় উঠে আসে, জোরে জোরে পা ফেলে খানিকটা এগোতে না এগোতেই আবার রাস্তার ধারের অন্ধকারেই মিশিয়ে যায়। মাত্র দুটি একটি লোকের এ রকম টুকটাক খুচখাচ খুচরো চলাফেরার প্রয়োজন নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে আরও বেশি অস্বাভাবিক করে তোলে।

কলতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। চোখ তুলে সেদিকে চেয়ে গগন মাথা চুলকায়।

যাব নাকি এগিয়ে ছোটোবকুলপুর তক ?—গগন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলে, দিবাকরেরাই যেন তাকে যেতে বারণ করেছে ?—চলো যাই মেয়া, তোমায় নিয়ে যাই। মাঝ রাস্তায় কেমন করে নামিয়ে দি বলো, আঁ ?

আন্না খুশি হয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, ভগবান মুখপোড়া একচোখো কানা, নইলে তোমার নতুন গাড়ি হত বাবা, জোয়ান বলদ হত !

ছোটোবকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একেবারে তিন তিনটে টর্চের আলো গোরুর গাড়িতে এসে পড়ে। কিছু হাঁকডাক শোনা যায়। বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে যারা পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, অসময়ে গগনের গোরুর গাড়ির আবির্ভাবে তাদের মধ্যে খানিকটা সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। গাড়িতে শুধু দুটি বলদ, একটি গাড়োয়ান, একজন পুরুষ ও একটি মেয়েমানুষ এবং একটি বাচ্চা—সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

দেখতে দেখতে সাত-আটজন গাড়িটা ঘিরে ফেলে। টুপিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে মাঝ বয়সি মোটা লোকটি, সেই বোধ হয় বেসরকারি দলপতি, গম্ভীর গলায় বলে, কোথা থেকে আসছ ?

গগন বলে, ইস্টিশনের টেরেনগাড়ির প্যাসিঞ্জার আজ্ঞা।

শাট্ আপ ! তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে ? তোমার নাম ?

মোর নাম দিবাকর দাস।

বাপের নাম ? কোথায় থাক ? কী কর ? এদিকে এসেছ কেন ?

বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা সগ্‌গে গেছেন—তিপ্পানের মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানায় মজুর খাটি। ইদিকে হাঙ্গামা শুনলাম, বউ কাঁদতে লাগল যে তার বাপ ভাই মরেছে না বেঁচে রয়েছে। তা ভাবলাম কী যে কারখানার ধরমঘট দু-দশদিনে মেটার নয়, যা দিনকাল। বউকে নিয়ে দেখে আসি শ্বশুরবাড়ি ব্যাপার কী।

সবিনয়ে স্পষ্ট সরল ভাষায় দিবাকর তাদের আগমনের কারণ ও বিবরণ দাখিল করে। কাঁদাকাটা করে না বলে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে পায়ের তলায় আছড়ে আছড়ে পড়ে না বলে বোধ হয় তার ব্যাখ্যা এদের পছন্দ হয় না।

পুঁটলিতে কী আছে ? বোমা বন্দুক ?

আজ্ঞে কাঁথা কাপড়।

তুমি যে সত্যি দিবাকর দাস, মজুর খাটো, শ্বশুরবাড়ি আসছ, কোনো বদ মতলব নেই, তার প্রমাণ দিতে পার ?

কী প্রমাণ দেব বলেন ? সাক্ষী প্রমাণ তো সাথে আনিনি !

ষোলো সতেরো বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফরসা ছেলেটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়বয়সি লোকটির ধমকে বিষম খেয়ে থেমে যায়, কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে।

আন্না বলে, গাঁয়ের চাষাপাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না বাবুরা, মোকে দু-চারজন চিনবেই, গাঁয়ের মেয়া আমি।

সে তো চিনবে, না চিনলেও চিনবে। যাদের সঙ্গে যোগসাজশ তাদের যদি না চিনবে তো কাদের চিনবে ?

আন্না দিবাকরের কানে কানে বলে, গাঁয়ের লোক ডাকতে ডরাচ্ছে, জানো ?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি আঙুল উঁচিয়ে বলে, এই ! কানে কানে কী কথা হচ্ছে ? চুপিচুপি শলাপরামর্শ চলবে না, খপর্দার !

গাঁয়ে যাওয়া কি বারণ বাবু ? একশো চুয়াল্লিশ রটিয়েছো ? দিবাকর প্রশ্ন করে।

কদমছাঁটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে বয়াটে চেহারার ছোঁড়াটা বলে, বারণ কেন, বারণ নেই। তোমরা কে, কী মতলবে এসেছ জানা গেলেই যেতে দেওয়া হবে।

ও সব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত করো বাবুরা ?

চোপ, তামাশা হচ্ছে, না ?

ধমকানির চোটে দিবাকরেরা চুপ হয়ে যায়, বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায়। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে শান্ত করতে করতে আন্না তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ শোনে। আচমকা গোরুর গাড়ি চেপে হাজির হয়ে তারা যে গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে মানুষগুলি রীতিমতো বিব্রত ও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গের জিনিস বেশভূষা চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সত্যি সত্যি টের পাবার জো নেই যে এরা সত্যিকারের নিরীহ সাধারণ গোবেচারি চাষামজুর মাগভাতার ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ সন্দেহের কারণ। যে তাণ্ডব চলেছে ছোটোবকুলপুরে কদিন ধরে, তাতে সত্যিকারের কোনো ভীরু মুখ্যু ছোটোলোক মাগছেলে সাথে নিয়ে সাধ করে কখনও তার মধ্যে আসতে চায় ? তাও আবার হাঙ্গামার খবর জানবার পরে ! বাজে লোকের এ সাহস হবে কোত্থেকে ? তার চেয়েও বড়ো কথা, সন্দেহের কথা, চারিদিকে এত রাইফেল বন্দুকের সমারোহ দেখেও ওরা মোটে ভড়কে যায়নি, দিব্যি নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব।

একজন নিচু গলায় বলে, নিশ্চয় কোনো ডেঞ্জারাস লোক ছদ্মবেশে এসেছে। আরেকজন বলে, সার্চ করা যাক না ?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি হুকুম দেয়, এই ! জিনিসপত্র নিয়ে নামো।

তার মুখের কথা খসতে না খসতে দুজনে দিবাকরকে ধরে টেনে নামিয়ে দেয়। উৎসাহ অথবা উত্তেজনার আতিশয্যে একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মুখবাঁধা মাটির হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আধ হাঁড়ি জল আর তাতে কিলবিল করে গোটা ছয়েক শিং মাছ !

দিবাকর গোসা করে বলে, দিলে তো বাবুরা, গরিবের পথ্যির দফা মেরে দিলে তো ? রুগি বউটা এখন খাবে কী !

বলি ওহে দিবাকর দাস, একজন গম্ভীর মুখে বলে, কারখানায় খেটে খাও বললে না ? কুলি মজুরের বউরা কবে থেকে শিং মাছের ঝোল খাচ্ছে হে ? পাঁচ-ছটাকা শিং মাছের সের।

শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু ?

এ ফোড়নের অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে সে গর্জন করে ওঠে, শাট্ আপ, বেয়াদপ !

পোঁটলাটা খুলে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়, তাতে একটা অঘটন ঘটে যায়। আন্নার বাচ্চাটা রাস্তায় দু-একবার পায়খানা করেছে, নোংরা ন্যাকড়া দলা পাকিয়ে আন্না পুঁটলির মধ্যে রেখেছিল। ঘাঁটতে যাওয়ায় অনুসন্ধানীর হাতে ময়লা লেগে যায়। গন্ধে ও স্পর্শে রাগ চড়ে যাওয়ায় বেহিসাবির মতো পুঁটলিটাতে সে বল শুট করার মতো লাথি মেরে বসে। ফলে কাদার মতো তরল পদার্থ খানিকটা তার পায়েও লাগে, ছিটকে বন্দুকের গায়েও একটু আধটু লেগে যায়।

গাড়িতে বিছানো বিচালি তুলে, ছেঁড়া বস্তাটার ভাঁজ খুলে খোঁজার পর গগন আর দিবাকরের গা খোঁজা হয়। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হয় পানের মোড়কটা।

বাঃ, সাজা পান ! দে তো একটা।

তিনটি পান অবশিষ্ট ছিল, তিনজনের মুখে যায়। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় পান মোড়া ছাপানো কাগজটার দিকে এক নজর তাকিয়েই যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে চমকে ওঠে। কাগজটা ভালো করে মেলে ধরে সে বিস্ফারিত চোখে বড়ো হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে—'ছোটোবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি'।

নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, পাওয়া গেছে ! ইস্তাহার পাওয়া গেছে !

ইস্তাহার ? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার ! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।

তবু তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর শূন্যে হাতড়াতে হবে না, মনগড়া সন্দেহ সংশয়ে জর্জরিত হতে হবে না, একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে হাতেব মুঠোয়। এবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

এ ইস্তাহার পেলে কোথা ?

প্রশ্নটার যেন স্বাদ আছে এমনিভাবে আরামে জিভে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করা হয়।

ইস্তাহার ? ইস্তাহারের তো কিছু জানি না ! চার পয়সার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।

পানওয়ালা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবে-চিন্তে পান কিনে ইস্তাহাবটাতে জডিয়ে নিলে ?

কেন ? তা কেন করতে যাব ?

আর ঢং কোরো না। এবার আসল নাম বলো দিকি।

দিবাকর আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

মেজাজ

চা আর ডিম ভাজা এসেছিল দুজনের জন্য, মনোরঞ্জন নিঃশব্দে দুটি প্লেটের ডিম ভাজাই নিজের মুখে পুরে দিতে থাকে। এককালে সে দারুণ কংগ্রেসি ছিল, আজকাল একেবারে চাষাভুসো বনে গেছে। অনেকদিন পরে তাকে দেখে বড়ো আনন্দ হচ্ছিল। ভাষাহীন খিদে দিয়ে এত সহজে সে-ই শুধু চোখের পলকে আত্মীয়তা ঝালিয়ে নিতে পারে। চাষাভুসো বনার কারণও বোধ হয় তাই।

ডিম শেষ করে সে বলে, তোমার তাকানি দেখে ভৈরবকে মনে পড়ছে। সেও এমনিভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে মানুষকে বিব্রত করে।

তোমাকে মোটেই বিব্রত বোধ হচ্ছে না। কিন্তু ভৈরব কে ?

লক্ষ্মীপুরের একজন চাষি। তার মেজাজের অদ্ভুত গল্প শুনলে—

গরিব চাষি ?

দেড়-দুবিঘে জমি হয়তো আছে। তা ছাড়া ভাগে চাষ করে।

গল্পটা বলার আগে তবে একটা সংশয় মিটিয়ে দাও। মানুষটা চাষা, তাতে গরিব, তার মেজাজ হয় কীসে ? জমি নেই, ভাতকাপড় নেই, আরামবিরাম স্বাস্থ্য নেই, দেশের মালিক সরকারের কাছে দূরে থাক গাঁয়ের মালিক জমিদারের বাজার সরকারের কাছে পর্যন্ত মানুষ বলে গণ্য হবার যোগ্যতা নেই, মেজাজের মতো এমন ফ্যাশনেবল দামি চিজ সে কোথা পেল ? কিছু অর্থ সংস্কৃতি আরাম বিলাস প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্থাৎ এককথায় লোকের ওপর ঝাল ঝাড়বার অধিকার না থাকলে তো মেজাজ গজায় না—ওটা খেয়ালখুশির অঙ্গ।

কথাটা বুঝে মনোরঞ্জন মৃদু হাসে।—বেশ, মেজাজ না বলে রাগ বলো, মাথা গরম বলো। যার কিছু নেই তার ঘৃণা রাগ এ সব তো কেউ কাড়তে পারবে না ?

গল্প বলতে মনোরঞ্জন পটু নয়। আমাকেই গল্পটা মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়; অভিজ্ঞতার স্বাদটা অবশ্য এসে যায় মনোরঞ্জনেরই।

মাঝারি আকারের মানুষটা ভৈরব, মোটা হাড়, সিটকানো শক্ত চেহারা, ছোটো চাপা কপালটার নীচে একজোড়া স্থির জ্বলজ্বলে চোখ। ওই চোখ দিয়ে একদৃষ্টে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা তার স্বভাব। হুকুম শুনতে বা গাল খেতে একটু সময়ের জন্য সামনে এলেও এতে মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বড়োই অস্বস্তি বোধ করে, ভেতরে ভেতরে রেগেও যায় লোকটার ওপরে। প্রথমত সবিনয়েই হয়তো সে দাঁড়িয়েছে রাখালবাবুর সামনে, হাত জোড় করে আজ্ঞে হুজুর বলেই কথা কইছে, কিন্তু মাটিতে আটকে রাখার বদলে চোখ পেতে রেখেছে সোজা রাখালবাবুর মুখে। ধমকধামক গালমন্দ নীরবেই শুনে যাচ্ছে, চিরকাল তার বাপদাদা যেমন শুনে এসেছে, কিন্তু থেকে থেকে আচমকা কী যেন ঝিলিক মেরে যাচ্ছে, ঝলসে উঠছে তার চোখে। দেখলে ভয় করে।

রাখালবাবুর মতো মস্ত লোক, খুশি হলে সে তার গলা কাটতে পারে, সেও একভাবে ভেতরে ভেতরে ভৈরবকে ডরায় !

ভয় তাকে কমবেশি সকলেই করে। তার মেজাজের খবর কারও অজানা নয়, বহুদিন থেকে নানাভাবে পরিচয় পেয়ে আসছে। ঝাঁ করে মাথায় তার রক্ত চড়ে যায় এবং সে অবস্থায় স্বয়ং থানার

দারোগাবাবুকে পর্যন্ত সে যে মেরে বসতে পারে সে প্রমাণও ভৈরব দিয়েছে। গ্রাম্য আক্রোশে একজন তাকে মিথ্যে চুরির দায়ে জড়িয়েছিল, দারোগাবাবু তদন্তে এসেছে। ধমকধামক এবং দু-চারটে চড়চাপড় সে যথারীতি দিব্যি হজম করে যাচ্ছিল, দারোগাবাবু হঠাৎ একটা খারাপ রসিকতা করে বসায় সেটুকু তার সইল না, ধাঁ করে গালে একটা প্রচণ্ড থাবড়া বসিয়ে দিল ! চড়চাপড় যার সইছিল গালমন্দও সইছিল একটা বদ রসিকতায় যে তার মাথা বিগড়ে যাবে, কে এটা ধারণা করতে পারে ? চুরির দায় বাতিল হয়ে গেল কিন্তু জেল তাকে খাটতে হল ওই অপরাধে। বেগুন খেতে গোরু ঢোকার জন্য কানাইয়ের সাথে একদিন তার বচসা, সে ঝগড়া অন্যের মধ্যে খুব বেশি হলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াত—আচমকা লাঠির ঘায়ে সে কানাইয়ের মাথা ফাঁক করে দিল। তাতেও কি রাগ পড়ল ? সেই লাঠি দিয়ে অপরাধী গোরুটার মাথাতেও আরেক ঘা না বসিয়ে পারল না, গোরুটা গেল মরে। এই নিয়ে হল আরেক দফা জেল। এবং একটা সামাজিক হাঙ্গামা।

গো-হত্যার জন্য বিধানমতো প্রায়শ্চিত্ত সে করত, ভট্টাচায্যের কয়েকটা চটাং চটাং কথায় মেজাজ গেল বিগড়ে।

বলল, বামুন আছো, বামুন থাকো, গাল পেড়োনি। করবনি যাও প্রাচিত্তির। কর গে যাও একঘরে। খাটব নরক দশ জন্ম।

কুটুমবন্ধু পাড়াপড়শি তাকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে, তবু সামান্য কারণে আচমকা ধারণাতীতভাবে তবু মাঝে মাঝে বেধে যায়। হেটোরা দোকানিদের সঙ্গে তো তার নিত্য হাতাহাতির উপক্রম ঘটে। মার খেয়ে খেয়ে বাড়ির লোকের প্রাণ যায়। গালমন্দ সে বিশেষ দেয় না, খানিক গালাগালি দিয়ে সামলে যাবার মতো নরম রাগ তার কদাচিৎ হয়। তার গরম হওয়া মানেই একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া। তার বউ কালীর হয়েছে জ্বর, হয়তো আগের দিন তার পিটুনি খেয়েই। শম্ভুর দোকানে সে বউয়ের জন্য চার পয়সার সাগু কিনতে গেছে।

কম দিয়েছ শম্ভু। ওজন করে দাও।

যাও যাও, বেশি দিয়েছি। চার পয়সার সাগু, তার ওজন চায় !

শুনেই মেজাজে আগুন ধরে যায় ভৈরবের।

কেন হে কত্তা ? চার পয়সা পয়সা নয় ? ওজন করো তুমি, বেশি হয় ফিরে নাও বেশিটা তোমার। তোমার ঠেঁয়ে ভিক্ষে চাইছি ?

দোকানে তখন ভিড়ের সময়, দু-চারজন ভদ্রলোকও আছে। শম্ভু মুখ বাঁকিয়ে শোলোক বলে, চার পয়সার সাগু খায়, বউ ডিঙিয়ে শাউড়ি পায় !

ভৈরব সাগু ছুঁড়ে মারে শম্ভুর শোলোক-বলা মুখে। তোর সাগু তুই খা।

শুধু সাগু ছুঁড়ে ঠান্ডা হবে তেমন মেজাজ নয় ভৈরবের। এদিক ওদিক তাকাতে সামনে গুড়ের হাঁড়িটা নজরে পড়ে।

গুড় দিয়ে খা !

গুড়ের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খাবলা খাবলা গুড় সে শম্ভুর মুখে ছুঁড়ে মারে। পরে যা হবার তাই হয়, গরিব অসহায় চাষি তো। কিন্তু সে হিসাব তো আর মেজাজ বোঝে না !

এ সব লোককে নিয়ে ওইখানে বিপদ। রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে, নিজের ভালোমন্দের বিচার বিবেচনা পর্যন্ত লোপ পায়, মরবে কী বাঁচবে খেয়াল থাকে না। সুতরাং তুচ্ছতায় যতই সে মশামাছির শামিল হোক, সহজে তাকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তাই থেকে একটা মোটা সিদ্ধান্ত বোধ হয় করা চলে। যতই মনে হোক যে মেজাজটা তার একেবারেই অন্ধ ও বেহিসেবি, জগৎসংসার ভুলে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় যা খুশি কাণ্ড করে বসে, ঠিক অতটা হয়তো সত্য নয়। মানুষ যে তাকে ভয় করে, সহজে তার পেছনে লাগতে চায় না, এটা বোধ হয় সে বোঝে।

তারপর একদিন এল লক্ষ্মীপুরেব ওই হাঙ্গামা। গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে রাখালের চোরাই ধানচাল চালান বন্ধ করতে যাওয়া নিয়ে যার সূত্রপাত, পরে অবশ্য ব্যাপার অনেকদূর গড়ায়। কারণ, গরিবের যে কোনো বেয়াদবিই ভীতিকর, সমূলে উৎপাটন না করলে চলে না। ধানচাল উপে যেতে যেতে সে এলাকায় মানুষের প্রাণ যায় যায় হলে মরিয়া হয়ে যখন তারা নিজেরাই প্রতিকার করবে স্থির করে, ভৈরবও সেখানে পরামর্শের গোড়ার দিকে উপস্থিত ছিল। ব্যবসায়ী-জমিদার রাখালের অপকর্মের বিবরণ শুনতে শুনতে সে গরম হয়ে উঠেছিল, জোর গলায় দাবি জানিয়েছিল যে, উহুঁ, শুধু ধানচাল নয়, আগে ও লোকটাকে সবাই মিলে ফাঁসি দিতে হবে, তারপর ধানচাল ঠেকানো। বুড়ো বনমালী তাকে ধমক দিয়েছিল, তুই থাম ভৈরব। এ ছেলেখেলা নয়।

তবে যা খুশি করো। মোকে ডেকোনি !

বলে গটগট করে সে উঠে এসেছিল বৈঠক থেকে। তাতে বিশেষ কেউ অখুশি হয়নি। তাকে সঙ্গে রাখার ঝক্কি কম নয়। একা তার জন্যই হয়তো সম্পূর্ণ অকারণে দু-একটা খুনজখম হয়ে যাবে, সে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবে না।

গ্রামের লোককে দাবাতে যে তাণ্ডব শুরু হয় তারপর তাবা কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি। রাখালের গুণ্ডাব দল জড়ো হয়ে পাড়ায় পাড়ায় হানা দেয়, প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও গ্রামের লোক শেষে প্রাণের দায়ে মরিয়া হয়ে দল বেঁধে তাদেব মেরে হটিয়ে দেয়। পুলিশের স্থায়ী ছাউনি পড়ে লক্ষ্মীপুরে। কয়েকটা পাড়ায় গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষাব এমন শক্ত ব্যবস্থা কবে যে রাখালের গুন্ডাবা দল বেঁধেও সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না।

ভৈববেব ঘরটা ছিল এই এলাকার কিছু তফাতে। একদিন একদল লোক ঘবে ঢুকে খুঁটিব সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধে। বাচ্চা ছেলেটা কালীর কোলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, ছিনিয়ে নিয়ে ভৈববের পিঠের সঙ্গে ছেলেটাকেও তাবা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে। তারপর সেইখানে ভৈববেব চোখেব সামনে কালীর উপব একে একে তাবা সাতজন অত্যাচার কবে। আলো জ্বালেনি। জ্যোৎস্না ছিল। গরিবের ছোটো ঘব, খুঁটিটাব তিন-চারহাত তফাতেই ছেঁড়াকাঁথাব বিছানা।

কাহিনির এইখানে থেমে গিয়ে মনোবঞ্জন আচমকা প্রশ্ন করে : কেন বলো তো ? পাশবিক অত্যাচাবের মানে হয়, কিন্তু স্বামীর সামনে কেন ? মাতাল মার্কিন সোলজারদেরও এই ঝোঁক দেখা যেত। কোনো কারণ ভেবে পাই না।

মানে ? অত্যাচাব মানেই বিকাব। অত্যাচাবীর মনে দারুণ আতঙ্ক থাকে। নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কার, নিজেব নিয়মকানুন পর্যন্ত সে ভাঙছে—নিজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সকলকে পায়ের নীচে পিষে রাখবার জন্য ওরা নিজেরাই নীতি ধর্ম আইন কানুন আদর্শ খাড়া করে—নিজেবাই আবার তা ভাঙে। আত্মবিরোধ এড়িয়ে যাবার সাধ্য ওদের নেই, অন্যায় করতে ওরা বাধ্য। নেশাখোব যেমন নেশা চড়ায়, এরাও তেমনি অন্যায়কে আরও উগ্র আরও বীভৎস করে চলে। হিটলাব অসংখ্য ভয়াবহ অন্যায় করেছে, যাতে তার এতটুকু স্বার্থসিদ্ধি হয়নি। গুন্ডারা ওই একই জাত।

মনোরঞ্জন একটু ভেবে বলে, তাই কী ? কে জানে !

তারা চলে যাবার পর কালী কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। কাছাকাছি কোনো চালায় আগুন ধরেছে, বাইরে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির রক্তিম দ্যুতিময় রূপ দেখা যায়। ভৈরব মৃদুকণ্ঠে বলে, বাঁধনটা খুলে দে বউ।

তার শান্ত গলার আওয়াজে কালী বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যায়। তবু সে ভয়ে ভয়ে বলে, মোকে কিছু করবে না তো ?

না, তোর কী দোষ ? শিগগির দড়ি খোল—ছেলেটা বুঝি শেষ হয়ে গেল।

কালী তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালে। ছেলের দিকে এক নজর তাকিয়েই এতক্ষণ পরে সে প্রথম আর্তনাদ করে ওঠে। এ পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুধু তার গোঙানি শোনা গিয়েছিল। বিক্রি করে কিছু বাড়তি রোজগারের জন্য ঘরে ভৈরব পাটের দড়ি পাকায়, বাঁধবার দড়ির তাদের অভাব হয়নি। দিশেহারা উন্মাদ তারা, ওইটুকু ছেলেকে পাটের সরু পাকানো দড়ি দিয়ে বাপের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে গায়ের জোরে, গলাতেও প্যাঁচ পড়েছে। ইচ্ছা করে কিনা তারাই জানে। ছেলেটা খুব চেঁচাচ্ছিল, কান্না থামাতে হয়তো এইভাবে গলায় দড়ি জড়িয়েছে। দড়ি খুলে নামাতে নামাতেই টের পাওয়া যায় ভৈরবের আশঙ্কাই সত্য, ছেলেটা শেষ হয়ে গেছে।

কালী হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে খুঁটিতে বাঁধা ভৈরব সেই রকম শান্ত গলায় বলে, মোর বাঁধনটা খোল আগে।

ভয়ে ভয়ে কালী তার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করে। ভয়টা তার অকারণ নয়, এতদিন একসঙ্গে ঘর করেছে, মানুষটাকে সে সবার চেয়ে ভালোভাবেই জানে। কারণে অকারণে কত ছ্যাঁচা খেয়েছে, গায়ে আজও তার অনেক চিহ্ন আঁকা আছে এখানে ওখানে। এ অবস্থায় আজ ভৈরবের মাথা ঠিক আছে এটা সে স্বপ্নেও সম্ভব বলে ভাবতে পারছিল না। তুচ্ছ কারণে মানুষটা খেপে যায়, মহামারি কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, বাইরে রাগের কারণ ঘটলে ঘরে হাতের কাছে তাকে পেয়ে পিটিয়ে দেয়, আজ রাতের এত ভয়ানক কাণ্ড তার সইবে কী করে ? বাঁধন খুলে দিলে দিশেহারা উন্মাদ ভৈরব যদি প্রথমে তাকেই খুন করে বসে !

দড়ি খুলে দিলে যে খুঁটিতে ওকে তারা বেঁধেছিল তাতেই ঠেস দিয়ে ভৈরব মেঝেতে বসে পড়ে। মনে হয়, তার সামনে তার বউয়ের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়ে গেল, তারই গায়ে গায়ে লেগে থেকে কচি ছেলেটা যে ওদের দড়ির ফাঁসে দম আটকে মরে গেল, এ সব কিছুই সে গায়ে মাখেনি। তার রাগও নেই, হা-হুতাশও নেই।

কালী নিজে টের পায় না, সেও কত শান্ত ধীর হয়ে গেছে, ছেলের জন্য উন্মাদিনীর মতো সেও আছড়ে পিছড়ে কাঁদছে না। সাধারণভাবে অসুখে বিসুখে ছেলেটা মরলে এতক্ষণ তার গলা ফাটানো আর্তনাদ সারা গাঁকে জানান দিত তার শোকের খবর। সাতজন অত্যাচার করেছে। স্বামীর সামনে। রক্তাক্ত দেহে রক্তাক্ত মন কি সাধারণ শোক দুঃখের স্তরে থাকতে পারে ?

আবার কে আসে ? ভৈরব অস্ফুট স্বরে বলে।

শুধোও—সাড়া দাও ! কাছে সরে এসে কালী বলে।

কে ?

আমি। বনমালী।

বনমালী ঘরে এসে বলে, আরও ক-জনা আসছে। বন্দুক হাতে পাহারা ছিল, মোরা এগোতে পারিনি ভাই। তোমার ঘরে অত্যাচার করবে তাও মোদের ভাবনার অগোচর ছিল। সেদিন চটাচটির পর তুমি তো তফাতে ছিলে বরাবর।

গরিবের এই দশা।

ভৈরবের নম্র শান্ত সুর বনমালীকেও আশ্চর্য করে দেয়। কোনোদিন কোনো অবস্থাতে কেউ কখনও তাকে এমন ধীরভাবে কথা বলতে শোনেনি। প্রদীপের আলোয় তার দিকে চেয়ে বনমালী ভাবে : পাগল হয়ে যায়নি তো মানুষটা ?

উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে বনমালী বলে, এর প্রতিশোধ পাবে একদিন।

ভৈরব সায় দিয়ে তেমনই ধীরভাবে বলে, পাবে বইকী, শিগগির পাবে।

কড়ায় গন্ডায় শোধ দিতে হবে, সুদে আসলে।

একে একে আরও কয়েকজন চেনা লোক আসে, ভৈরবের ধীর শান্ত ভাব তাদেরও অবাক করে দেয়। নগেনের বউ আর নিতাইয়ের পিসি এসেছিল, এক কোণে তাদের কাছে বসে কালী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুনে ভৈরব বলে, কাঁদিস না বউ। আর কান্না কীসের ? যদ্দিন বেঁচে রইব, তোতে মোতে শুধু দেখব ওদের কত সব্বোনাশ করতে পারি, ক-টাকে কাঁদাতে পারি।

ছেলেকে পুড়িয়ে জিনিসপত্র পুঁটলি করে কালীর সঙ্গে ভৈরব পাড়ার ভিতরের দিকে ব্রজেন দাসের বাড়ির একটা ঘরে আশ্রয় নেয়। একদিকে তাকে দেখে যেমন টের পাওয়া যায় না সে সেই বদরাগি পাগলাটে ভৈরব, অন্যদিকে তেমনই ভাবাও যায় না সেদিন রাত্রে তার জীবনে কী ভীষণ ঘটনা ঘটে গেছে। গ্রামরক্ষী দলে সে নাম দেয়, কাজ করে, মন দিয়ে আলাপ আলোচনা পরামর্শ শোনে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আর মানুষকে সবলভাবে সংক্ষেপে নিজের কাহিনি বলে। দাওয়ায় বসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাটে বাজারে চাবাভুসো লোককে পরমাত্মীয়ের মতো ঘটনাটা শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে, প্রতিকার করবে না ? তুমি মোর ভাই ?

সাতদিন পরে সেই গুন্ডার দল যখন মাঝরাত্রে লোচন দাসেব ঘরে হানা দিয়ে তাকে আব তাব বাপকে বেঁধে বাড়ির বউ আব মেয়েকে নিয়ে আরেকটা উৎসবেব আয়োজন কবে তখন তিনশো লোক নিয়ে ভৈরব বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কজন এসেছিল প্রায় সকলকেই বাপেব নাম ভুলিয়ে দেয়।

কী ভীষণ যে দেখায় তখন তার মুখেব চেহারা। দেখে বনমালী এবং আবও অনেকে বুঝতে পারে ভৈরবের মেজাজ কোথায় চড়েছে। তাই, পরদিন আবার তাকে মৃদু ও শান্ত দেখে তাবা কজন আশ্চর্য হয় না।

প্রাণাধিক

আজ জ্যোতির্ময়ের আসবার কথা। দিল্লি থেকে প্লেনে আসছে, লিখেছে অবনীদের বাড়িতে এসে উঠবে এবং দু-একদিন থাকবে। অযাচিত সম্মানিত অতিথি। অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য একজনের কি এরোড্রোমে যাওয়া উচিত নয় ?

এখন সমস্যা হল, কে যাবে ? অবনীর সে বন্ধু, সুতরাং সে গেলেই সবচেয়ে মানানসই হয়, কিন্তু এদিকে মুশকিল হয়েছে যে কেরানি জীবনে অঘটন ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু আপিস গিয়ে কলম পিষে ছুটির পর নিজের ঘর সংসার আত্মীয়বন্ধুর প্রতি প্রাণপণে কর্তব্য করা নিয়ে হিমসিম খেয়ে আর দিন কাটে না। জীবনটাই যাতে টেকে সে জন্য কেরানিপনার রীতিনীতি বিধিব্যবস্থা অর্থাৎ মাসান্তিক মজুরির কিছু উন্নতি সাধনের জন্য বেপরোয়া চেষ্টা শুরু করতে হয়েছে। অবনীদের আপিসে কাল ধর্মঘট—অবনী আবার এটা ঘটাবার ব্যাপারে ভালোরকম জড়িয়ে গেছে। কোনো সম্মানিত বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে নষ্ট করার মতো সময় তার মোটেই নেই।

তার পিসতুতো ভাই সুব্রত যাবে ছাত্রদের জরুরি মিটিংয়ে।

বাণীর সঙ্গেও জ্যোতির্ময়ের একদিন পরিচয় ছিল কিন্তু সে গেলে বাড়িতে এ বেলা রান্না করার লোক থাকবে না, পিসিমার অসুখ।

বাণীর শ্বশুর অবনীর বাবা বুড়ো মানুষ। যত না বুড়ো হয়েছে ভদ্রলোক তার চেয়ে বেশি অকালবার্ধক্য তাকে কাবু করেছে। জেল খেটে খেটে দেশটা স্বাধীন করার পর কোথাও আর পাত্তা না পাওয়ার মনোবেদনার চাপে। বিরাট বিবাট সত্যযুগীয় ফাঁপা স্বপ্ন আর আদর্শগুলিতে সরোজের চিরদিন অন্ধ বিশ্বাস, ভদ্রলোক কোনোদিন ফাঁকিও চেনেনি, ফাঁকি দিয়ে নিজের জন্য বাগাতেও শেখেনি। আদর্শের ব্যাবসাদারি হাটে তাই তার ত্যাগের মহিমা কানাকড়ি দামেও বিকোল না। বাষট্টি বছর বয়সে অম্বলের জ্বালার সঙ্গে প্রাণের জ্বালা মিশে বেচারিকে তাই অথর্ব করে ফেলেছে।

কিন্তু আদর্শ তো তার যাবার নয়। জীবনে কত উন্নতি করেছে জ্যোতির্ময়, কোথায় উঠে গেছে, তার মতো বড়োমানুষকে উপযুক্ত সম্মান না দেখালে গুরুতর অপরাধ হবে। এও তার আদর্শেরই অন্তর্গত। সরোজের তাই টনক নড়ে।

তোমরা বলছো কী ? কেউ যাবে না ? তা কখনো হয় ?

কচি খোকা তো নয়, অবনী বলে, বাড়ি চিনে আসতে পারবে।

ট্যাক্সি চেপে আসবে, অসুবিধাটা কি ?

কতো বড়ো অভদ্রতা হয় ? একটা মান্যগণ্য পদস্থ লোক, তার একটা সম্মান নেই ? তোমরা কেউ না যাও আমি যাব।

তা সরোজের যদি জ্যোতির্ময়কে এগিয়ে আনতে যাবার আগ্রহ জেগে থাকে কারও কিছু বলবার নেই ! নিজের অকারণ নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ঘুচিয়ে যদি নড়েচড়ে বেড়াতে চায় সেটা বরং ভালো লক্ষণ। শুধু বাণী বলে, আপনি একা যেতে পারবেন না বাবা। মণ্টুকে সাথে নিয়ে যান।

মণ্টুর বয়স এগারো বছর। সে বাণীর ভাই।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাণী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, ঘামে-ভেজা গায়ে একটু হাওয়া লাগায়। খানিক দূরে রাস্তার ধারে ফাঁকা জমিটুকুতে বস্তির মজুরদের গানবাজনার ছোটোখাটো একটা আসর বসেছে। কী উচ্চগ্রামে ওদের সুর বাঁধা, কী জমজমাট জীবন্ত স্থূল ওদের আওয়াজ। পানের

দোকানটার শেডহীন বালব আর রাস্তার বাতি থেকে ওদের আসরে কিছু আলো পড়েছে, কিন্তু ওরা ধার করা আলোকে পর্যন্ত যেন অগ্রাহ্য করতে নিজেদের এক হাত উঁচু একটা কারবাইডের আলো জ্বালিয়েছে, শিখাটা কাত হয়ে লড়াই করছে বাতাসের সঙ্গে।

আগাগোড়া কী ভাবে বদলে গেছে জগৎ। জ্যোতির্ময় শহরে এসে যেচে তাদের বাড়ি উঠতে চাইবে এই কল্পনাতীত সম্ভাবনায় আগে তারা কত উত্তেজনা বোধ করত, বিব্রত হয়ে উঠত। সন্দেহ নেই যে অনেক কিছু প্রত্যাশাও জাগত তাদের। আজ একমাত্র তার ওই বুড়ো পাগলাটে শ্বশুরটি ছাড়া জ্যোতির্ময়কে নিয়ে কারও বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আজ শুধু তারা ধরে নিয়েছে যে, এ একটা রহস্যময় ঘটনা, জ্যোতির্ময় এসে ব্যাখ্যা না করলে এ খাপছাড়া ব্যাপারের মানে বোঝা যাবে না। বালিগঞ্জে তাদের মস্ত বাড়ি সেখানে তার ভাই সপরিবারে বসবাস করছে। শহরে বড়ো বড়ো হোটেলের অভাব নেই, বড়োলোক বন্ধুরও অভাব নেই। তবু জ্যোতির্ময় প্লেন থেকে নেমে সোজা এসে উঠছে তার কেরানিবন্ধুর বাড়ি, অতিথি হয়ে সেই বাড়িতেই দু-একটা দিন কাটাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছে।

শখ ? খেয়াল ? কে জানে কী আছে জ্যোতির্ময়ের মনে। এ কথা ভেবে নেওয়া বাণীর পক্ষে কঠিন নয় যে তাকে স্মরণ করে তার আকর্ষণে জ্যোতির্ময় আসছে, কিন্তু এ রোমান্টিক কল্পনায় তার সুখ নেই বলে কথাটা ভাবতেও তার ভালো লাগে না। তার জন্যই যদি জ্যোতির্ময়ের এ আগমন হয়, সে জানে তার মানে কী। একদিন চেনা ছিল, হয়তো মাঝে-মধ্যে কখনও মনেও হয়ে থাকতে পারে যে এ মেয়েটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, দূর থেকে সেই চেনা মেয়েটিকে ভেবে হৃদয়মনে ব্যাকুলতা জাগায়, জ্যোতির্ময় হঠাৎ তাকে দেখতে আসছে এ কথা কল্পনা করতেও বাণীর হাসি পায়। ঘটনাচক্রে যদি তারই জন্য জ্যোতির্ময় এসে থাকে, তার একমাত্র অর্থ হবে এই যে তার একটা কুৎসিত খেয়াল চেপেছে। মনে পড়েছে যে বাণীকে দু-একবার লোভনীয় মনে হয়েছে অথচ পাবার চেষ্টা করা হয়নি, আজ সে গরিব কেরানির বউ, তাকে দুদিন একটু ঘেঁটে আসা যাক।

আগে থাকতে একটা লোককে মন্দ ভাবতে বাণীর ভালো লাগে না।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মতো উঁচুস্তরের লোককে মন্দ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাও আজকাল কঠিন। ও জাতটাই বজ্জাত।

সরোজকে জ্যোতির্ময় একটু ঠাহর করে দেখে চিনতে পারে, বলে, ও, আপনি ? আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। অবনী এল না ?

অবনী একটা জরুরি কাজে গেছে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।

কিছু মনে করার ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুর অস্তিত্বও জ্যোতির্ময় অস্বীকার করে। তাকে বেশ উৎসাহী সানন্দ আত্মপ্রতিষ্ঠ মনে হয়, মন্টুকে চিনতে না পাবার ত্রুটির জন্য তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে বলে, ভারী অন্যায় হল। তুমি তো শুধু ওনার ছেলে নও, তুমি যে আবার অবনীরও ইয়ে, না কি বলো অ্যাঁ ?

গাড়িতে সে সরোজকে বলে, আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি। একটা ভুল হয়ে গেল, অবনীকে লিখে দিতে মনে ছিল না, আমি এসেছি যেন চারিদিকে রটিয়ে না বেড়ায়।

না না, এ খবর রটেনি। ওই যে তুমি লিখেছিলে কাজের চেয়ে দুটো দিন বন্ধুর বাড়ি শান্তিতে বিশ্রামের লোভটা তোমার বেশি, ওটা পড়েই অবনী কাউকে জানায়নি। জানলে দশটা লোক এসে তোমায় বিরক্ত করবে এ কি আমরা জানি না বাবা ? তুমি এ গরিবের বাড়ি পা দেবে, লোকের এটা ধারণায়ও আসবে না।

একটা সিগারেট বার করে সরোজের প্রায় সাদাটে চুল ও শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সেটা না ধরিয়েই জ্যোতির্ময় আবার পকেটে রেখে দেয়। তাতে আনন্দের সীমা থাকে না সরোজের।

জ্যোতির্ময় বলে, আপনাকে খুলেই বলি। আমি একটা এজেন্সি খুলব। নিজের নামে তো পারি না, চারিদিকে শত্রু, নানা লোকে নানা কথা বলবে। তাই ভাবলাম, বিশ্বাসযোগ্য কে আছে, কাকে ভার দেওয়া যায়। তখন মনে হল, এত লোকের জন্য এত করেছি, অবনী আমার কতকালের বন্ধু, ওর জন্য কিছুই করা হয়নি। আপনি সারাজীবন কাজ করলেন, শেষ জীবনে আপনারও সুখ হল না। তাই অবনীকেই সব ভার দেব ঠিক করেছি। ওকে আর চাকরি করতে হবে না, আপিসে মাইনে যা পায় আমার কাছে তার বিশ গুণ কমিশন পাবে।

কীসের এজেন্সি বাবা ? সরোজের গলা কেঁপে যায়, চোখে জল এসে পড়ে। এতদিনে— এতদিনে কি তবে তার সারা জন্মের আদর্শনিষ্ঠার প্রতিদান আসবে ? এই কঠোর বাস্তববাদী জগতে অহিংসা দারিদ্র্য উপবাস বরণের পুরস্কার মিলবে ?

বলবখন বাড়ি গিয়ে। বিস্তারিত বলব।

মনে মনে বিড় বিড় করে অভ্যস্ত কয়েকটা মন্ত্র আউড়ে অনির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সরোজ নিশ্বাস ফেলে। ভগবান তবে ছপ্পড় ফুঁড়েই দিলেন !

ছেলেমেয়ে কটি ?

একটা মেয়ে আছে বছর তিনেকের। দাদামশায়ের কাছে থাকে। কাজের চাপে, জানেন জ্যাঠামশায়, বছর খানেকের মধ্যে মেয়েটাকে চোখে দেখিনি।

সরোজ মনে মনে বলে, যাট্ ! তিনিও কর্মী ছিলেন, এও কর্মী, এই বয়সে বেচারি কত সাফল্য লাভ করেছে, টাকাপয়সা মানসম্ভ্রম প্রভাব-প্রতিপত্তি ! কিন্তু এরা নীতি জানে না, ব্রত বোঝে না। একটা মোটে মেয়ে, কার জন্য তবে এই তপস্যা ? এরা মনে রাখে না যে গান্ধিজিরও সংসার ছিল, পুত্র-সন্তান ছিল ; তারপর যখন সময় এল তখন তিনি সন্ন্যাসী।

এরা যখন পৌঁছোল, বাড়িতে বাণী তখনও একা, শুধু পিসিমা বিছানায় শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে। সরোজ প্রায় চটে যায়, চেঁচিয়ে বলে, কী আশ্চর্য, এখনও কেউ বাড়ি ফেরেনি ! এদের যদি কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে।

জ্যোতির্ময় তাকে শান্ত করে : আহা আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাজে গিয়ে আটকে গেছে, আসবে সময়মতো।

কিন্তু অবনীর অনুপস্থিতি যে তাকে বিরক্ত করেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। পরক্ষণে সে প্রশ্ন করে, অবনী জরুরি কাজে গেছে বলছিলেন, কীসের কাজ ?

ও তার আপিসের ব্যাপার।

আপিসের ব্যাপার ? বিরক্তি কেটে জ্যোতির্ময়ের মুখে স্মিতভাব ফোটে। কেরানির কাছে আপিস কত গুরুতর এটা তার অজানা নয়।

বাণীর দিকে সে আশ্চর্য হয়েই তাকায়, কী দেখবে ভেবেছিল আর কী দেখছে, যেন চোখ দিয়েই যাচাই করে নিতে চায়। পাঁচ-ছবছর বিয়ে হয়েছে, কেরানির মেয়ে কেরানির বউ ! সে এখনও এমন আঁটো আছে, জীবন্ত আছে ! বাণীকে গরিব বাঙালি গেরস্ত ঘরের বিবাহিতা মেয়ের চিরন্তন মাতৃরূপা রূপে না দেখে সে রীতিমতো বিব্রত বোধ করে।

আপনাকে তো আগে তুমিই বলতাম, আপনার বোনের সঙ্গে দু বছর একসাথে পড়েছি। আশা কোথায় আছে ?

আশা, আশা একটু বিলাতের দিকে বেড়াতে গেছে। মানে, দেশে কেমন ওর মন টিকল না, একটা সুযোগ জুটে গেল, ও একটু আমেরিকা বেড়িয়ে আসতে গেল।

জ্যোতির্ময়েব অস্বস্তি বাণী টেব পায়। কথাটা হালকা কবে উড়িয়ে দিতে সে বলে, ওব বেড়ানোব ভাবনা কি ? সাধ হলে বেবিয়ে পড়লেই হল। জামাকাপড় ছাড়ুন, চান কববেন ? বিশেষ চেষ্টায় দু বালতি জল বেখেছি।

বিশেষ চেষ্টা কেন ?

জলেব বড়ো অভাব। সব জিনিসেবই অভাব—কেবানিব বাড়ি তো ! কথাটা বাণী না বলতেও পাবত। জ্যোতির্ময় এ সব হিসাব কবেই এসেছে, বড়ো একটা মোটা লাভেব গোপনীয় ব্যবস্থাব জন্য একটা দুটো দিন এ সব কষ্ট অসুবিধা সইতে সে নাবাজ নয়।

নাইতে অনেক সময় লাগিয়ে, সম্ভবত নিজেব উচ্চতম জগতেব অভ্যস্ত হিসাবনিকাশ চালচলন কী ভাবে মানুষেব জগতেব উপযোগী কবে ঢালাই কবে নেবে, কয়েক ঘণ্টাব জন্য কবে নেবে (আটচল্লিশ ঘণ্টা যদি এখানে থাকতে হয়, বাইবে নিজেব জবুবি কাজেব নামে দশ ঘণ্টা, ঘুমানোব নামে চোদ্দো ঘণ্টা, চিঠি লেখা কাগজ পড়া চিন্তা কবাব নামে দশ ঘণ্টা যাবে। তবু চোদ্দো ঘণ্টা থাকে ঘবোয়া সামাজিক জীবনেব জন্য ! অসুস্থতাব ভান কবে আবও ঘণ্টা দশেক কাটানো ছাড়া উপায় নেই। অন্যভাবে ছাঁটাই কবে টোটালটা আবও কিছু কম কবা যায় কি ? বোধ হয় এবা ভড়কে যাবে। বন্ধুত্ব, প্রীতি, আদর্শ, নীতি, মানবতা ইত্যাদি ভান তো চাই, সবোজেব ছেলেকে চাকবি ছাড়িয়ে চোবা কাববাবে নামাতে হবে। তাব জীবনে, তাব পবিবাবে এটা প্রায় বিপ্লবেব সমান !) সেটা ঠিক কবে সবল সহজ হাসিখুশি হয়ে জ্যোতির্ময় বাবান্দায় জেঁকে বসে।

দূবে এক হাত কাববাইড লাইটেব আলোয় মজুবদেব গানেব আসবেব দিকে চেয়ে বলে, ও ব্যাটাদেবই আজকাল ফুর্তি ! স্ট্রাইক কবে কবে মোটা মজুবি কামাচ্ছে, সস্তায় ফুর্তি কবছে। লোকে আমাদেব প্রফিটটাই দ্যাখে। একখানা গান শুনতে আমাদেব যে হাজাব টাকা খবচ সেটা কেউ হিসাব কবে না। হেসো না বাণী, ঠিক কথাই বলছি।

বলছেন না কি ?

বলছি না ? একটা ছোঁড়াকে বিনি পয়সায় মেয়ে সাজিয়ে ওবা নাচাচ্ছে, গান কবাচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো কী জমজমাট আসব ! আমবা যে মেয়েটাব গান শুনে একটু মাতব, সে মেয়েটাব বাপকে একটা খাতিবি চাকবি দিতেই হবে। মেয়েটাকে শান্তিনিকেতনে পড়িয়ে ঘুবিয়ে আনতে হবে। বেডিয়ো সিনেমায় নাম কবাতে হবে। গান তো আসলে অষ্টবম্ভা, কাজেই নাম-টাম কবিয়ে নিয়ে না শুনলে তো মাতলামি আসবে না। একটা বোমাঞ্চকব গান শুনতে আমাদেব হাজাব কেন, তাব বেশি খবচা হয় !

না শুনলেই হয় ?

হয় না। যাব মেয়ে বা বউ গান শোনাবে সেও সব জানে বোঝে কি না। সব কল টিপে হয়। কল টেপাটাই আসল।

এমন যখন কাহিল অবস্থা, বাণী হেসে বলে, ও কল আপনাদেব বিগড়ে গেছে। আব কাজ দেবে না।

সবোজ বাণীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি। একটু হিসেব কবে কথাবার্তা বোলো। অবনীব একটা ব্যবস্থা কবে দেবে বলেছে, যা-তা বলে ওব সর্বনাশটা কোবো না।

আমি আপনাব ছেলেব সর্বনাশ কবব ? তাতে আমাব লাভ কী বাবা ?

প্রাণপণ উদাবতায় সবোজ ক্রোধ সংববণ কবে। এবা কিছু জানে না বোঝে না মানে না। এদেব আধ্যাত্মিক জীবনে এমন দৈন্য যে স্বার্থপবেব মতো সর্বদা সব বিষয়ে স্বামীব সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ভাবে। আমাব কিছু হোক বা না হোক স্বামীব আমাব ভালো হোক এ চিন্তাও এদেব আসে না।

বাণী তার মুখের ভাব লক্ষ করে ভরসা দিয়ে বলে, ভাববেন না, বাড়িতে এসেছে মানুষটা, আমি প্রাণ দিয়ে আদরযত্ন করব।

দুখানা ঘর আর ওই বারান্দাটুকু সম্বল। ছোটো ঘরে বাণীরা থাকে, জ্যোতির্ময়ের কাছে চাদর চেয়ে নিয়ে বাণী সে ঘরে বিছানা করে দেয়, বলে, খাটে হাত-পা ছড়িয়ে বসুন, যা চেয়ার বাড়িতে ! কষ্ট পাবেন অনেক।

বেশ তো তোমাদের সঙ্গে নয় কষ্টই পেলাম।

পিঠ চাপড়ানো উদার আত্মীয়তা জাহিরের ভাব সুর ভাষা বাণী জানে। এ হল রক্ষাকর্তার পিতৃত্ববাদ। জ্যোতির্ময়ের অসুবিধাটাও বাণী টের পায়। তাদের দেখতে হচ্ছে অন্যদৃষ্টিতে, চোখ তার অভিনয়ের সংযম মানতে রাজি নয়। আগে খেয়াল ছিল না, জ্যোতির্ময়ের তাকানি দেখে বাণী টের পেয়েছে সে এখন একটা নতুন আকর্ষণ হয়েছে। বিয়ের আগে বাপের ঘাড়ে খেত পরত, বাপ যতই হোক, মজুর মেয়ের মতো তার মন্দের হাড়ভাঙা খাটুনি নয়, যত ওঁচা হোক, খাওয়াও সে তুলনায় সে অনেক ভালো পায়।

ছেলেমেয়ে হয়নি ? জ্যোতির্ময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে। তার আসল কৌতূহলটা কী বাণীর তা বুঝতে কষ্ট হয় না, কারণ চোখ দিয়ে তার সর্বাঙ্গে কৌতূহলটার জবাব সে খুঁজছিল।

বাণী ধীরকণ্ঠেই বলে, একটা চিকিৎসা ছিল। তাতে বহু টাকা লাগে, জোগাড় করা গেল না।

জ্যোতির্ময়ের মাথা একটু নামে, দৃষ্টি মেঝেতে নেমে যায়।

আমায় লিখলে না কেন ?

এ প্রশ্নের আর জবাব কী ? বাণী চুপ করে থাকে।

অবনীর যদি মাসে পাঁচ-ছশোটাকা রোজগার হয়, খুশি হবে ?

হবো না ! কী বলেন !

জ্যোতির্ময় চোখ তোলে, কালকেই সব ব্যবস্থা করে দেব। নাম থাকবে সরোজবাবুর, ওঁর নামের একটা বিশেষ ইয়ে আছে। দেখাশোনা সব অবনীই করবে। কালকেই ও রিজাইন দিয়ে দিক।

রিজাইন বোধ হয় দিতে হবে না, এমনিই তাড়িয়ে দেবে।

কেন ?

স্ট্রাইক ফাইক করছে।

জ্যোতির্ময়ের চোখে সংশয় ঘনিয়ে আসে।—ও বাবা, ও সবে যায় না কি ? একটু ভেবে বলে, যাক গে, ও পেটি চাকরিও আর করতে হবে না, স্ট্রাইকেরও দরকার হবে না।

বাণী কিছু বলে না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বামী-শ্বশুরের সর্বনাশ করতে কিছুতেই মুখ খুলবে না। তরকারি নামাতে সে রান্না ঘরে যায়। পরনের শাড়িখানাই একটু ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে নিয়ে একটা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে জ্যোতির্ময়কে বলে, আধঘণ্টা বাবার সঙ্গে কথা বলুন। পাড়ার একটি মেয়েকে পড়াই, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েই চলে আসব।

জ্যোতির্ময় আশ্চর্য হয়, ক্ষুণ্ণও হয়। কাল স্বামী চাকরি ছাড়বে, মাসে পাঁচ-ছশোটাকা রোজগার শুরু করবে, তার খাতিরেও সে একবেলা মেয়ে পড়ানো কামাই করতে সাহস পেল না।

অবনীর ফিরতে রাত প্রায় নটা বেজে যায়। বাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কী হল ?

ঠিক হল। সবাই একমত।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সবে অবনী জামাকাপড় ছেড়েছে, সে ফিরেছে টের পেয়েই সরোজ তাকে ব্যগ্রভাবে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। বাণী যখন মেয়ে পড়াতে গিয়েছিল সে

সময় জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তার এজেন্সি সম্পর্কে আরও আলাপ হয়েছে। সমস্ত ব্যাপার জেনে সরোজের যেমন হয়েছে ভয় তেমনি বেড়েছে উত্তেজনা। নিজে আগে ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তাকে আলাপ আলোচনা করতে দিতে সে রাজি নয়। এজেন্সির প্রস্তাবে সায় দিতে ছেলের নতুন বিবেকে বাধবে বলেই সরোজের ভয়, সোজাসুজি হয়তো সে জ্যোতির্ময়কে বলে বসবে : আমি তোমাব ওই লোকঠকানো ব্যাপার নেই।

তাহলেই সর্বনাশ।

জ্যোতির্ময় তোমায় বলেছে কিছু ? উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে সরোজের, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

কখন বলবে ?

শোনো তবে বলি—

সরোজ জ্যোতির্ময়ের বেনামি এজেন্সির ব্যাপারটা ছেলেকে খুলে বলতে শুরু করে। অবনীর শ্রান্ত ক্লান্ত মুখ দেখে আলোচনাটা খাওয়ার পর আবম্ভ করার কথা বলতে গিয়ে বাণী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে যায়। খিদেব কষ্ট অবনীর সইবে, কিন্তু একটু শান্ত হতে না পারলে যে কোনো মুহূর্তে বুড়ো মানুষটাব হার্ট ফেল করা আশ্চর্য নয়। সেইখানে একটা মাদুর বিছিয়ে বাণী দু হাত ধরে সরোজকে বসিয়ে দেয়, বলে, বসে কথা বলুন বাবা, ব্যস্ত হবেন না।

রাগে দুঃখে তাব চোখে তখন প্রায় জল এসে গিয়েছে। খিদেয় মানুষ মরে যাক, জীবন অচল হয়ে আসুক, এমান সব দুর্বলতা বাধা হয়ে মানুষকে ব্যস্ত হতে দেবে না, তাড়াতাড়ি কিছু করতে দেবে না।

সরোজ এই বলে, শেষ কবে, সাবা জীবন আমি নীতি আর আদর্শ বাঁচিয়ে এসেছি, এতে কোনো দোষ দেখলে আমি নিজেই বাবণ করতাম। মানুষেব নীতিধর্ম অন্তরে, বাইরেটা দেখলেই শুধু চলে না। তুমি যেন জ্যোতির্ময়কে না বলে বোসো না।

অবনী বাণীব দিকে তাকায। বাণী যেন জানত সে এই ভাবে তাকাবে, পাশের দিকে সরোজের চোখের আড়ালে সে দাঁড়িয়েছিল। নীবরে ঠোঁট কামড়ে বাণী চোখেব ইশারায় সরোজকে দেখিয়ে দেয়। ইঙ্গিতটার মানে বোঝা সহজ। ধৈর্য হারালে চলবে না, ব্যস্ত হলে চলবে না, বুড়ো বাপটা যখন আছে তার অস্তিত্বটাও মানতে হবে। অবনীর শান্ত চোখে বিপজ্জনক অসহিষ্ণু ক্রোধ ঝলসে উঠছিল, বাণীর ইঙ্গিত না পেলে সে হয়তো ভুলেই যেত আসল কারসাজি কার, অসহায় নিবুপায় বাপকে দাবড়ে দিত।

কী ভয়ংকর মুহূর্তটা যে কেটে যায় বোঝে শুধু বাণী আব অবনী। ঘৃণার মতো প্রচণ্ড মহৎ হৃদয়াবেগকে যুগে যুগে যারা অনেক কাযদায় বিপথে উলটো দিকে চালিত করে ঘরে ঘরে ভুল-বোঝা অশান্তি আর হতাশা সৃষ্টি করেছে তাদের কৌশল আবও একবার প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল !

জ্যোতির্ময় ঠকাবে মানুষকে, লোকচক্ষুর আড়ালে সে হাজার হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে বাগাবার ব্যবস্থায় কাজে লাগাবে সবল বোকা অসহায় সবোজ আব তার গরিব কেরানি ছেলে অবনীকে, আর একটু হলে আড়ালের মানুষ তাকে আড়ালেই রেখে ফাটাফাটি হয়ে যেত সরোজ আর অবনীর মধ্যে।

অবনী মৃদু শান্ত স্বরে বলে, আপনি যদি জোব করেন আপনি যা বলেন তাই হবে। আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব না। কিন্তু আমি ভাবছি, আমার ভালোর জন্যই আপনি এটা করতে বলছেন। সবার কাছে হীন হয়ে আমার সুখ শান্তি যদি নষ্ট হয়, আপনি কি সুখী হতে পারবেন ?

ওই তো, ওই তো দোষ তোমার ! ক্ষুব্ধ অভিযোগের সুরে সরোজ বলে। কিন্তু অভিমান সাধারণ হৃদয়াবেগ, মোটেই মারাত্মক নয়। সারা জীবনের ত্যাগ স্বীকারের পুরস্কার যেচে ঘরে এসেছে অথচ ছেলে তা বাতিল করে দেবে, এই আতঙ্কে যে কাঁপুনি ধরেছিল সরোজের তা কেটে গেছে। ক্ষুব্ধ হোক আর অভিমান করুক, এখন সে শান্ত হয়েছে, আচমকা তার হার্ট ফেল করে মরার সম্ভাবনা নেই।

দুবার নাক ঝেড়ে, বাণীর কাছে এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে সরোজ বলে, তোমার ঠেকছে কীসে ? এ তো চুরি-চামারির ব্যাপার নয়, সাধারণ ব্যাবসার কথা। কেউ না কেউ এজেন্সিটা পেত, এজেন্সি দেওয়ার ব্যাপারে জ্যোতির্ময়ের হাত ছিল, সে অন্যকে না দিয়ে তলে তলে নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছে। এটা একটু অন্যায় বটে, দেশের লোককে জানানো হল একরকম কাজে হল অন্যরকম। কিন্তু বিশেষ কী এসে গেছে ? অন্য লোকেও এজেন্সিটা চালাত, জ্যোতির্ময় নিজের লোক দিয়ে সেটা চালাবে। এজেন্সি চালানোটাই আসল কথা। তাতেই দেশের মঙ্গল। এতে তোমার আপত্তি কী ?

অবনী বলে, এক কাজ করা যাক। জ্যোতি আপনার নামে এজেন্সি করতে চায়, তাই করুক। আপনি মাইনে দিয়ে লোক রাখুন, এজেন্সি চালান। আমি নাই বা রইলাম ওর মধ্যে।

আশেপাশের তিন চারটে বাড়িতে রেডিয়ো বিনিয়ে বিনিয়ে গানের নামে কাঁদছে। তবে সুখের বিষয়, এ কাঁদুনি ঢোল করতাল ঘুঙুর আর সমবেত গলার আওয়াজে খানিকটা চাপা পড়ে গেছে।

সরোজ নিশ্বাস ফেলে বলে, ভেবে দেখি। তোমরা খাবে যাও। আমি আজ কিছু খাব না বউমা।

বাণী চট করে সামনে আসে।—না খাওয়াই ভালো। পাতলা একটু বার্লি করে রেখেছি, চুমুক দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

খাদ্য দেখে রীতিমতো ক্রোধের সঞ্চার হয় জ্যোতির্ময়ের, যদিও তার জন্যই বিশেষভাবে সরোজ এক পোয়া মাছ আনিয়েছিল এবং মাছটা বেশির ভাগ তাকেই দেওয়া হয়েছে। তবে রাগ করে যেখানে লাভ নেই সেখানে জ্যোতির্ময় রাগ চাপতে জানে। তার শুধু লাভের হিসাব। বিনা লাভে রাগ দুঃখ খরচ করাও তার স্বভাব নয়।

বাঃ ! লাউ শাকটা তো খাসা হয়েছে !

বাণী বলে, ওটা পুঁই-চচ্চড়ি। জানেন, পুঁইশাক ছিল বলে বাঙালি বেঁচে আছে! ভাতের বদলে কচু আর মাছ-মাংসের বদলে পুঁই। কচু আর পুঁই না থাকলে—

কুচো চিংড়ি বাদ দিও না।—অবনী বলে।

জ্যোতির্ময় খিলখিল করে হেসে ওঠে। কী করবে কী বলবে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

চাদর গায়ে জড়িয়ে পিসিমা ধীরে ধীরে ঘরে এসে দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁষে বসে। ধীরে ধীরে বলে, সলিল আসেনি, না ?

বাণী বলে, না পিসিমা, এখনও ফেরেনি।

পিসিমা তেমনই মৃদু স্বরে বলে, বেরোবার আগে অনেকক্ষণ কপাল টিপে দিয়ে গেল। তখনই বুঝেছি মিটিংয়ে গোলমাল হতে পারে, নইলে মার জন্য ছেলের অত দরদ হয় ! নাও ফিরতে পারে ভেবে গেছে।

এখনও ফেরার সময় যায়নি।

পিসিমা নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। এদিকে জ্যোতির্ময়ের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ দেখায়।

সলিল কে ? কীসের মিটিং ?

জবাব শুনে তার মুখ আরও পাংশু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ভাত গিলতে পারে না। বারবার চোখ তুলে সে বিধবা পিসিমার শীর্ণ কিন্তু শান্ত মুখখানার দিকে তাকায়।

তাদের খাওয়া শেষ হতে হতে সলিল বাড়ি আসে। বলে, বাঃ, সবাই পেট-পূজায় লেগে গেছ।

জ্যোতির্ময়ের মতো মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতি তাকে মোটেই বিব্রত করেছে মনে হয় না। আধ ময়লা পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলে হাত ধুয়ে একটা আসন টেনে বসে পড়ে বলে, চট করে থালা আনো বউদি, আগে খাব তার পর অন্যকথা।

ভাতের থালা সামনে পাওয়া মাত্র সে খেতে আরম্ভ করে, কোনো দিকে তাকায় না। জ্যোতির্ময় যেন আশ্চর্য হয়ে এই পুঁজি-করা প্রাণবন্ত প্রচণ্ড ক্ষুধার অভিব্যক্তি চেয়ে দ্যাখে। অবনীর খাওয়ার রকমে সে জোরালো খিদে দেখেছিল, তবে এতটা নয়। তার বোধ হয় বিশ্বাস হয় না যে, ভদ্র ঘরেও এত খিদে পায় এবং সে খিদে চেপে রাখতে হয় রেশনের নির্দিষ্ট অন্নের জন্য।

অবনী বলে, মিটিং কেমন হল ?

গ্র্যান্ড। পরশু জয়েন্ট প্রসেশন।

কিছুক্ষণ সলিলের সঙ্গেই সকলে কথা কয়, জ্যোতির্ময়কে তারা যেন ভুলে গেছে। শরীরটা দুর্বল বোধ করে সরোজ শুয়ে পড়েছিল, এখানে উপস্থিত থাকলে তার হৃৎস্পন্দন বোধ হয় বন্ধ হয়ে যেত। জ্যোতির্ময়ের মুখে গভীর চিন্তার ছায়া নেমে এসেছে।

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে সে উসখুস করে। নাক ঝাড়ে, গলা খাঁকারি দেয়, নড়েচড়ে নানাভাবে বসে, হাতের তালু দিয়ে নিজের থুতনি ঘষে।

টায়ারড লাগছে ? তুমি বরং তবে শুয়ে পড়ো। অবনী বলে।

টায়ারড নয়। ভাবছি, তোমাদের বড়োই অসুবিধা করলাম। ঘরের এত টানাটানি জানলে আমি—

আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, ভেবো না। অসুবিধা তোমারই।

বাণী জলের কুঁজো আর গ্লাস এনেছিল, সে বলে, আমাদের অতিথি আসে না ?

তবু জ্যোতির্ময় উশখুশ করে। গ্লাস জল খেয়ে নামিয়ে রাখা জ্বলন্ত সিগারেটটার কথা ভুলে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরায়।

আচমকা সে বলে, একটা ভুল হয়ে গেছে, ইস ! আমায় তো ভাই যেতে হবে।

বেরোবে ? তা বেশ তো। ফিরতে বেশি রাতে হবে না কি ?

জিনিসপত্র নিয়েই যাব। আমার কি আর বিশ্রাম আছে ? তোমাদের চিঠি লেখবার পর এটা ঠিক হয়, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমাকে হোটেলেই যেতে হবে, সকালে কজন বড়ো বড়ো লোক আসবে, জরুরি কনফারেন্স।

অবনী বলে, ও !

জ্যোতির্ময় হাসবার চেষ্টা করে, বলে, ভেবেছিলাম হোটেলেই উঠব, সেখান থেকে এসে তোদের সঙ্গে দেখা করে যাব। তোর বাবাকে দেখে সব ভুলে গেলাম। এত দিন পরে তোদের সঙ্গে দেখা, কী ভালোই যে লাগছে। হোটেলের কথাটা স্রেফ ভুলে গেছি !

বাণী খেয়ে উঠে শোনে, সলিল ট্যাক্সি ডাকতে গেছে। জ্যোতির্ময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। ট্যাক্সি এলে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। সরোজের বোধ হয় ঘুম এসেছে, তাকে না জানিয়েই কি জ্যোতির্ময় চলে যাবে ?

আমরা বুঝিয়ে বলব। এমনি ভালো ঘুম হয় না, ঘুম যখন এসেছে ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই।

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জ্যোতির্ময় ট্যাক্সিতে ওঠে। ট্যাক্সি চলে গেলে বাণীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল বাবা। নিজেই আমাদের সমস্যা মিটিয়ে দিল।

অবনী বলে, তাই তো দেয়।

রাত্রে শুতে যাবার আগে বাণী একবার সরোজের খবর নিতে যায়। শ্রান্ত অবনী আগে শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, বাণীর হাতের নাড়ায় জেগে উঠে তার মুখ দেখেই সে খানিকটা বুঝতে পারে। নিঃশব্দে গিয়ে দুজনে সরোজের চৌকিতে বিছানো সামান্য সাধারণ বিছানার পাশে দাঁড়ায়, সামান্য ইঙ্গিতটুকু পাবে না জেনেও অবনী জীবনের সন্ধান করে। বাণীর দু চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বুড়ো সরোজ চিরতরে ঘুমিয়ে গেছে।

ঘর করলাম বাহির

মাঝে মাঝে এই হোটেলে খেতে আসি।

গরিব মানুষের হোটেল, যারা খেতে আসে তারা অধিকাংশই কারখানা আপিসের মজুর কেরানি। একপ্রস্থ ভাত, ডালের জল আর সবুজ একটা ঘন্ট আজকালকার বাজার হিসাবে মোটামুটি সস্তা। পাইস সিস্টেম প্রচলিত, গাঁটে কড়ি কম থাকলে আধপেটা সিকিপেটা খেতে বাধা নেই। পেটে অন্তত ভাত পড়েছে এ সান্ত্বনাটুকু কেনার সাধ্য এখানে হয়, খিদের সঙ্গে বোঝাপড়া জল দিয়েই করতে হোক। মাছ মাংস পাওয়া যায়, চড়া দাম। অবসাদ বোধ করলে, বড়োলোকের মিথ্যা প্রতারণা ভরা কুৎসিত জগতের ছড়ানো মায়াজালের ছোঁয়াচ লেগে লেগে নিজেকে ক্লেদাক্ত অশুচি মনে হলে, এইখানে এসে বসি। এই মলিন নোংরা পরিবেশে মজুর কেরানির খাদ্য আর খাওয়ার রকম দেখতে দেখতে জগতের সীমাহীন দুর্দান্ত অতৃপ্ত ক্ষুধার অস্তিত্ব অনুভব করি। অসংখ্য চেতনায় তারই প্রতিফলন ঘৃণা-যজ্ঞের মহান পবিত্র আগুন হয়ে অনির্বাণ জ্বলছে, নিজের চেতনায় তার উত্তাপ পাই। নিজেকে সুস্থ, শুচি মনে হয়।

প্রায় তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। সকাল থেকে এঁটো থালাবাটি তুলে তুলে ন্যাতা বুলিয়ে যাওয়ার ফলে খাওয়ার ঘরে বিছানো আসনগুলির সম্মুখের মেঝে চ্যাপচেপে কাদাটে হয়ে গেছে। খাদ্যার্থীদের ভিড় এখন কম। খেতে বসব কিনা ভাবছি এমন সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, পশুপতি জুতো খুলে খাওয়ার ঘরে একটা আসন দখল করে বসল।

এত বেলায় পশুপতি আপিস যায়নি এটা আমার বিস্ময়ের কারণ নয়, আমি জানতাম তাদের আপিসে আজ ধর্মঘট। কাছাকাছি একটা ভাড়াটে বাড়িতে পশুপতি সপরিবারে বাস করে। বাড়ি এত কাছে তবু এত বেলায় সে হোটেলে ভাত খেতে এসেছে কেন এটাই আমার কাছে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকল।

আমিও পাশের আসনে বসি, ভাত দিতে বলি। ইতিমধ্যেই পশুপতির খাদ্য এসে গিয়েছিল, হোটেলের ঠাকুর অদ্ভুত রকম চটপটে হয়। পিতলের বাটিতে মশলা গোলা জলের মধ্যে পেন্সিলের দাগ তোলা রবারের মতো মাছের টুকরোটির দিকে চেয়ে পশুপতি বলে, ছ আনার এই মাছ !

বিলাসিতার দাম দেবে না ? হোটেলেরও তো মালিক আছে !

তা হোটেলে কেন, বাড়িতে রান্না হয়নি ? অসুখ নাকি ?

পশুপতি নিশ্বাস ফেলে বলে, অসুখ নয়, যুদ্ধ। কদিন ধরেই চলেছে, আজ চরম সংঘাত। এক পক্ষে আমি অপর পক্ষে বাড়ির সবাই।

মানুষকে উত্তপ্ত করলে তার ভাষার জড়তা কেটে যায়। আমি ইচ্ছা করেই হালকা সুরে বলি, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, তাই বুঝি চিরকেলে প্রথায় ভাতের উপর রাগ করে বেরিয়ে এসেছ ?

সে শান্ত উদার চোখে তাকায়, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু করুণার হাসি ফোটে। বুঝতে পারি সে ভাবছে : এ লোকটা কোন জগতে বাস করে ! শখের কলহ আর ভাতের উপর গোসা ! ও সব ন্যাকামির দিন কোন কালে পার হয়ে গেছে মধ্যবিত্তের জীবনে সে খবরটাও রাখে না ?

মুখে বলে, ঝগড়াঝাঁটি ? ঝগড়াঝাঁটিই বটে ! কদিন আজ বাড়িতে পারিবারিক, সামাজিক, দাম্পত্য, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক যত রকম লড়াই আছে সব চলছে—শুধু বোধ হয় সাম্প্রদায়িক যুদ্ধটা বাদ। বাড়িতে আজ ও পক্ষের হাঙ্গার স্ট্রাইক, রাঁধেনি। আগে থেকে নোটিশ দিয়েছে আজ আপিস না গেলে বরখাস্ত করবে। বাড়ির সকলে তা জানে। এ বাজারে চাকরি পাব ? না খেয়ে মরতেই হবে সকলকে। উপোস করিয়ে মারতেই যখন চাই সকলকে, তাই যখন আমার প্রাণের ইচ্ছা,

আজ থেকেই উপোস শুরু হোক ! দুদিন আগে আর পরে। মা বাবা পিসিমা বউ সবাই সকাল থেকে বিছানায় শুয়ে হা-হুতাশ করছে, চোখের জল ফেলছে। আড়চোখে আড়চোখে দেখছে নটার মধ্যে গুড় মুড়ি খেয়ে গুটিগুটি আপিস রওনা দেওয়ার আয়োজন করছি কি না।

শুকনো ভাতের একটা গেরাস মুখে দিয়ে বাটিতে চুমুক দিয়ে সে একটু ডাল মুখে নেয়। এত পাতলা ডাল যে মেখে খাওয়া সম্ভব নয়। তার হাত একটু কাঁপছিল। কল্পনায় তার বাড়ির দৃশ্যটা রূপ নিয়ে আমাকেও সচকিত করে দেয়। পরিবারেব একমাত্র উপার্জনশীল মানুষটির বিরুদ্ধে এ তো প্রায় সমগ্র পরিবারটির সংঘবদ্ধ আক্রমণ এবং সকলেই তারা ওই মানুষটির উপর নির্ভরশীল। তবু ব্যাপারটা বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি মনে হয়। একটু যেন অবাস্তব, অস্বাভাবিক ঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে কে না ধর্মঘট করে, না করে উপায় আছে কার ? মা বাবা মাসিপিসি ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে বেঁচে থাকার দায়ে ঠেকেছে বলেই কেরানি মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে নামে, ওটা তার শখ নয়। তার মানেই তো এই যে বাড়ির অন্য সব মানুষের জীবনযাত্রাও অতি শোচনীয় অবস্থায় এসে ঠেকেছে। একদিনে এই শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয় না, ক্রমে ক্রমে দুর্দশা বাড়ে এবং তাতেই বাড়িতে কমবেশি সমর্থন সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন তো নয় যে আপনজনকে বাদ দিয়ে, তাদের ভালোমন্দের হিসেব শিকেয় তুলে, শুধু নিজের জন্য নিজের খেয়ালে পশুপতি আজ আপিস যায়নি। ধর্মঘট তো ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়াব অ্যাডভেঞ্চাব নয়।

কত মাইনে পাও ?

এই দেড়শোর মতো।

ব্যাপাবটা এতে পরিষ্কার হয না। পরিবারটি উলঙ্গ হয়ে উপোস দিয়ে মরার অবস্থার মুখোমুখি পৌঁছাযনি. এই পর্যন্ত। কিন্তু জীবনেব সমস্ত সাধ আহ্লাদ আশা আনন্দ সার্থকতা বৈচিত্র্য বিকাশের সম্ভাবনা ছেঁটে ফেলে ডালপালা বর্জিত গাছের মতো বেঁচে থাকা তো এমন লোভনীয় নয় যে পরিবর্তনের চেষ্টাতেই ভীত হয়ে উঠবে তার আত্মীয়স্বজন। তাব মুখ আলগা করাব জন্য আরও একটা খোঁচা দিই. বলি. তোমার যদি কিছুমাত্র মনেব জোর থাকত—

তুমি বুঝবে না।—মুখের কাছ থেকে ভাতের গেরাস নামিয়ে সে বলে—আমি চিরদিন স্বাধীনতা চেয়েছি, চিরটা কাল আমি সবার চেয়ে পরাধীন হয়ে রইলাম। কী ভাবি আর কী হয়। কী চাই আর কী পাই। কলেজে পড়বার সময় ভেবেছিলাম ডাক্তার হব, শেষ পর্যন্ত হলাম কেরানি। তাও বাবার চেষ্টায়, আমার নিজের গুণে নয়। জানোই তো কী অবস্থা হয, ভবিষ্যতের স্বপ্ন না ছাই, যেমন তেমন একটা উপার্জনের ব্যবস্থাব জন্য পাগল হয়ে উঠতে হয়। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে উঠেও আমি কিছু করতে পারিনি, বাবা ধন্না দিয়ে ধরাধরি করে চাকরিটা জুটিয়ে দেন। আজ আমার কাণ্ডে বাবা স্তম্ভিত হয়ে যাবেন এ আর আশ্চর্য কী ? প্রথমেই কী বললেন জানো ? বললেন, আমি উমেশবাবুকে মুখ দেখাব কী করে ! মনে হল যেন কেঁদেই ফেলবেন। উমেশবাবু চাকরিটা দিয়েছিলেন। কাজেই আমি কত বড়ো অকৃতজ্ঞতার কাজ করছি, কত বড়ো অন্যায় করছি ! বাবা খুব নিষ্ঠাবান লোক। এখনও খদ্দর পরেন।

মিনিটখানেক সে নীরবে খেয়ে যায়। আচমকা একটু অদ্ভুতভাবে হাসে : কত তর্ক, কত বোঝানো, কত হা-হুতাশ মান অভিমান। তবে দেশপ্রেম, শিশুরাষ্ট্র এ সব যুক্তি তোলেননি, আমারও তো বয়স হয়েছে বোঝেন। তাঁর একটা যুক্তি হল, আমি প্রায় অফিসার—একটুখানি নীচে। লেগে থাকলে পেটি অফিসার হতে পারব। যারা পঞ্চাশ ষাট টাকার কেরানি, তারা যা খুশি করুক, আমি কেন তাদের দলে ভিড়ব ? আসলে এ সব যুক্তিতর্ক বড়ো কথা নয়, ঘরোয়া ব্যাপার তো। মায়া মমতা স্নেহের দাবির চাপটাই মারাত্মক। বাড়িতে যেন গভীর শোকের ছায়া পড়েছে, সর্বনাশ আসন্ন। দিবারাত্রি কানের কাছে শুধু গুঞ্জন, কী উপায় হবে ? হায়, হায়, উপায় কী হবে ? বোনের বিয়ে আসছে, আমার স্ত্রীর সাত মাস, বাবার অসুস্থ শরীর—

খাবার ঘরে লোক চলাচল করে আর হোটেলের মাছির ঝাঁক ভনভনিয়ে উড়তে থাকে। রান্নাঘরে ঠাকুর আর ঝিয়ের মধ্যে কী নিয়ে কলহ বেধেছে, ঝির তীক্ষ্ণ চড়া গলা ঝনঝন করে বাজছে। চিরদিন উপরের মিতালির ভরসাটুকু সম্বল করে শূন্যে ঝুলে থাকা মধ্যবিত্তের চেতনায় ফাঁস ছিঁড়ে আছড়ে পড়ার আতঙ্ক যে কত সহস্র রূপে পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল, নীচের ওই নিবিড় কালো হতাশার অতল গভীরতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার করুণ চেষ্টাতেই কীভাবে ব্যর্থ ব্যাহত জীবন কাটত, পশুপতি তার বর্ণনা দিতে পারে না। ছেলেবেলাতেই এই ভয় আর ভয়ের সংস্কার দেখে ভয় পেয়ে মাটির মানুষের কাছে পালিয়েছি সাহস খুঁজতে, তার অপটু কথা থেকেই কল্পনা করে নিতে পারি কীসের ইঙ্গিত সে করছে। কিন্তু আজও কি এত ভয় আছে ? দ্বিধা আছে, সংশয় আছে, বিভ্রান্তির হতাশা আছে কিন্তু এত আতঙ্ক ? দু-একজনের থাকতে পারে, সমগ্র পরিবারটির কী করে থাকে ? কেউ একজন চেষ্টা করে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে না তুললে এ তো সম্ভব নয় !

আমার মনের প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন পশুপতি বলে, স্ত্রী গোড়ায় আমার দলেই ছিল। অন্দরে থাকলেও বাইরের খবর তো কিছু কিছু পায়, আমরা যা ভাবি আর অনুভব করি দাম্পত্যালাপে কিছুটা তো চুঁইয়ে গিয়ে মর্মে পৌঁছায়। খানিকটা বুঝত যে এটা আমার একার ব্যাপার নয়, আপিসের সবাই মিলে করছি। কিন্তু বউটাও শেষে বিগড়ে গেল। বেচারির সাত মাস, কানের কাছে সকলে ক্রমাগত মন্ত্র জপছে, কতক্ষণ ভরসা রাখবে ? বাবা বোধ হয় টের পেলেন, একা আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না। আমার দিদিকে নিয়ে এলেন। বেশ মোটাসোটা জবরদস্তি গিন্নিবান্নি, ছেলেপিলে নিয়ে সচ্ছল সংসার, খুব সাংসারিক বুদ্ধি। সবাই মিলে কী যে বোঝাল, বউটিও আক্রমণ শুরু করে দিল। আর সে কী আক্রমণ ! একটা নমুনা শুনবে ? রাত দুপুরে কাঁদে আর বলে আমার এই অবস্থায় তুমি আমার দিকে তাকাবে না ? দু ছেলের মা বউ যখন পেটের ভারে এলিয়ে পড়ে ওরকম ভাবে বলে, ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায় অনুমান করতে পার ? জানি না কী করে শক্ত আছি, খাড়া আছি।

শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নীরবে সায় দিই।

পশুপতি মৃদুস্বরে বলে যায়, আপিসের লড়াই সহজ। এতগুলি লোক একসঙ্গে আছি, এক চিন্তা, এক উদ্দেশ্য। জানি গুঁতো খেলে সবাই ভাগাভাগি করে খাব। শালা, ঘরের লড়াইয়ে প্রাণটা যায় যায় হয়েছে। ভাবলাম বটে যে আমায় কাবু করতে ওরা উপোস করে শুয়ে আছে, আমি কেন উপোস করে মরি ? তাই হোটেল খেতে এলাম। কিন্তু গলা দিয়ে ভাত কি গলে ?

তোমার ওই দিদিটি এখনও আছেন ?

আছে। ভাইয়ের চাকরির মায়া কাটিয়ে যেতে পারছে না।

বলতে বলতে মুখ তুলে সে চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে থাকে। পশুপতির স্ত্রী সাধারণভাবে একখানা শাড়ি পরে একেবারে হোটেলের খাবার ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার কাছে বাইরে তার বাবা মা আর কিশোরী বোনটিকেও দেখা যায়। পিসিমা বোধ হয় আসেনি। বড়ো দিদিটিও নয়।

এই যে তুমি এখানে !—পশুপতির স্ত্রী যেন কত জন্মের আটকানো দম ছাড়ে— মাগো মা, না বলে এমন করে চলে আসে ? তারপর পশুপতির বাবা ভেতরে আসে। গভীর স্নেহাতুর চোখে খানিকক্ষণ চুপচাপ চেয়েই থাকে ছেলের দিকে।

আচমকা বলে, তা তোমার মনের ইচ্ছাটা জোর করে বললেই পারতে ! তোমার বিচার বিবেচনার উপর আমরা কি কথা কইতে যাব ?

চেয়ে দেখি, পশুপতির ক্লিষ্ট মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আপনা থেকে সিধে হয়ে গেছে তার বাঁকা মেরুদণ্ডটা। মধ্যস্থ হয়ে আমি একটি প্রস্তাব করি, প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। পশুপতির পরিবারটি বোধ হয় এই প্রথম ঘর থাকতে বাইরের এই নোংরা হোটেলে আসন পেতে ভাত খেতে বসে।

সখী

সদরের কড়া নড়তে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বিভা বলে, দ্যাখ তো রিণা কে, কাদের চায়।

উপরে নীচে পাঁচ ঘর ভাড়াটে। উপরে তিন, নীচে দুই। বাইরে লোক এলে দরজা খুলে খোঁজ নেবার দায়িত্ব স্বভাবতই নীচেব তলার ভাড়াটে তাদের উপর পড়েছে, বিভা এবং কল্যাণীদের। সদর থেকে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একরত্তি উঠানটুকু পর্যন্ত সবু প্যাসেজের এ পাশের ঘরটা তাদের, ও পাশেরটা কল্যাণীদের। ভিতরে আরও একখানা করে ছোটো ঘর তারা পেয়েছে—কিন্তু রান্নাঘব মোটে একটি। কল্যাণীরা রান্নাঘরের ভেতরে রাঁধে, বিভা রাঁধে বারান্দায়। তবে সুবিধা অসুবিধার হিসাব ধরলে লাভটা কাদের হয়েছে ঠিক করা অসম্ভব। রান্নাঘরখানা ঘুপচি, আলোবাতাস খেলে না, উনান ধরলে একেবারে হাড়কাঁপানো দিনগুলি ছাড়া শীতকালেও ভাপসা গরমে বেশ কষ্ট হয়। নিশ্বাস আটকে আসে, মাঝে মাঝে ছুটে বেড়িয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের ফালিটুকুর দিকে মুখ তুলে হাঁপ ছাড়তে হয়। বাবান্দায় আবার জায়গা এই এতটুকু, নড়াচড়া করতেও অসুবিধা হয়।

সাধারণত কল্যাণীরাই সদরের কড়া নাড়ায় বেশি সাড়া দেয়—তাড়াতাড়ি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে দেয়। বিভাদের বা উপবতলার ভাড়াটেদের কাছে লোকজন কদাচিৎ আসে, কল্যাণীরা নিজেবাও সংখ্যায় অনেক বেশি, দেখা করতে বেড়াতে বা কাজে বাইবেব লোকও ওদের কাছেই বেশি আসে। অন্য ভাড়াটেদেব তুলনায় বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ অনেক বেশি।

কল্যাণীরা সম্ভবত রান্নাঘবে খেতে বসেছে বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছে, বিভার রান্না খাওয়াব পাট অনেক আগেই চুকে যায়। দু-এক মিনিট দেখে ওদেব কাছেই লোক এসেছে ধরে নিয়েও শোয়া বিণাকে তুলে সে খবব নিতে পাঠিয়ে দেয়। এটুকু কবতে হয় এক বাড়িতে থাকলে।

ক্ষীণ অস্পষ্ট আশা কি জাগে বিভার মনে যে আজ হযতো তার কাছেই কেউ এসেছে ? কেউ তো এক বকম আসেই না, যদিই বা কেউ আজ এসে থাকে !

একটু পরেই ফ্রক পরা তিন বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে বিভাব সমবয়সি একটি মেয়ে খোলা দবজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ভাবতে পেরেছিলি ? কেমন চমকে দিয়েছি !

তাকে দেখেই বিভা ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, ব্যাকুল ও উৎসুক কণ্ঠে সে বলে, রানী ! ইস, কী রোগা হয়ে গেছিস ? কী চেহারা হয়েছে তোর ?

রানী যেন বেশ একটু ভড়কে যায়, মুখের হাসি খানিকটা মিলিয়ে আসে।—তা যদি বলিস, তুইও তো কম রোগা হসনি। কালো হয়ে গেছিস যে, তোর অমন রং ছিল ?

দুই সখী ব্যাকুল ও প্রায় খানিকটা ভীতভাবে পরস্পরের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে। দুজনেরই ভাঙাচোরা অতীতের প্রতিবিম্ব নিয়ে যেন দুটি আয়নার মতো তারা পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন খারাপ হয়ে গেছে চেহারা, এত ময়লা হয়েছে রঙ, এমন ক্লিষ্ট হয়েছে চোখ ? এতখানি উপে গেছে স্বাস্থ্যের জ্যোতি, রূপ-লাবণ্য ? প্রতিদিন আয়নার সামনে তারা চুল বাঁধে, মুখে পাউডার সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, নিজেকে রোগা মনে হয়, কখনও একটু আপশোশ জাগে। কিন্তু আজ বন্ধুর চেহারা চেয়ে দেখার আগে পর্যন্ত তারা ধরতেও পারেনি ক বছরে কী শোচনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে নিজের দেহেও, কী ভাবে শুকিয়ে সিটকে গেছে।

আয় রানী, বোস। কটি হল ?

বিভা রানীর মেয়ের হাত ধরে কোলে টেনে নেয়।

কটি আবার ? এই একটি। তোর ?

কতকাল কেটেছে, ক বছর ? এই তো সেদিন তাদেব বিয়ে হল, যুদ্ধ বাধার পর একে একে দুজনেরই। বছর পাঁচেক কেটেছে তাদের শেষ দেখা হবার পর। পাঁচ বছরে একটি মেয়ে হয়ে রানীর সেই আঁটো ছিপছিপে গড়ন, যা দেখে তার প্রতিদিন হিংসা হত, সে গড়ন ভেঙে এমন চাঁচাছোলা প্যাকাটির মতো বেঢপ হয়ে গেছে ? কণ্ঠার হাড় উঁকি মারছে, চিবুকের ডৌল বুঝি আর খুঁজলেও মেলে না। অমন মিষ্টি কোমল ফরসা রঙ জলে ধোয়া কাটা মাছের মতো কটকটে সাদা হয়ে গেছে। বিভা ভাবে আর উতলা হয়, তার চোখে জল আসে। বিভার দুটি ছেলেই ঘুমোচ্ছিল, ছোটোটিব দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে রানী মৃদুস্বরে বলে, ওর কত বয়স হল ?

দু বছর।

দুটি ছেলেই রোগা, ছোটোটির পেট বড়ো, হাত পা কাঠির মতো সরু। ওটিকে দেখতে দেখতে রানী নিজের চেহারার কথা ভুলে গিয়েছিল। আচমকা সে বলে, কী আর করা যাবে, বেঁচেবর্তে যে আছি তাই ঢের। যা দিনকাল পড়েছে।

সত্যি ! শেষ করে দেবে। .

বিভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে ভুলে গিয়েছিল কী ভয়ংকর দুর্দিনের মধ্যে কী প্রাণান্তকর কষ্টে তারা বেঁচে আছে, ভুলে গিয়েছিল কী অবস্থায় কী খেয়ে কত দুশ্চিন্তা আব আতঙ্ক বুকে নিয়ে তারা দিন কাটায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে আর অস্পষ্ট অনুভব করে করে মনেব মধ্যে যে রহস্যময় ভীতিকর একটা চোরাবালির স্তর গড়ে উঠেছে, যার অতল বিষাদ আব হতাশায় মিছে মায়ার মতো দুদিনের অর্থহীন লীলাখেলার মতো জীবন যৌবন তলিয়ে যায়, সেটা আজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এই তবে জীবনের রীতিনীতি মানুষের বাঁধাধরা অদৃষ্ট যে এত তাড়াতাড়ি লাবণ্য আনন্দ উৎসাহ সব শেষ হয়ে যায় ? জীবনের এই চিরন্তন নিয়মেই সে আব বিভা জীবনটা শুরু করতে না করতে মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন হয়ে গেছে ? রানী তাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে, না, তা নয় ! জীবন অত ফাঁকিবাজ নয়, অমন ভঙ্গুর নয় দেহ। শুধু খেতে পরতে না পেয়ে, চিন্তায় ভাবনায় জর্জরিত হয়ে, হাসিখুশি আমোদ আহ্লাদের অভাবে তাদেব এই দশা।

একা এসেছিস রানী ?

একা কেন ? ঘোড়ায় চেপেই এসেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে !

কী আশ্চর্য ! তুই কী বল তো ? এতক্ষণ বলতে নেই ?

অসহায়ভাবে বিভা পরনের কাপড়খানার দিকে তাকায়। রানী একখানা ভালো কাপড় পরে এসেছে, আগেকাব দিনের সঞ্চিত তোরঙ্গে তোলা কাপড়ের একখানা, বিয়ে বাড়ির মতো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া কেউ যা পরে না, পরলে মানায়ও না। এ রহস্যের মানে বিভা জানে, তারও একই অবস্থা। আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি যেতে, সিনেমা দেখতে বেড়াতে বার হতে সাধারণ রকম ভালো কাপড় যা মানায় তাব তোরঙ্গেও আগেকার পাঁচ-সাতখানা ছিল, বাড়িতে পরে পরে সে ভান্ডার শেষ হয়েছে। এ দুঃশাসনেব দেশে দ্রৌপদীদের কাপড় টানাটানির শেষ নেই।

বিয়ের সময়ের দামি শাড়ি আর ঘবে পরার শাড়ির মাঝামাঝি কিছু নেই, রাখা অসম্ভব। ঘরেও তো উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না মেয়েমানুষ ? ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে চোখ কান বুজে সাধারণ সামাজিকতা রাখার জন্য সাধারণ রকম ভালো দু-একখানা কাপড় সে কিনেছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে এই প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার না করার কিন্তু সম্ভব হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টা দেহ ঢাকতে হয়, বাসি

কাপড় ছাড়তে হয়, স্নান করে ধুতে হয় সাবান কেচে ধোপে দিয়ে ধোয়াতে হয়—নিত্যকার এই চলতি প্রয়োজনের দাবি সবচেয়ে কঠোর। তাই ভাবতে হয়েছে, এখনকার মতো পরে ক-টা দিন চালিয়ে দিই, উপায় কী, ধোপ দিয়ে এনে তুলে রাখব। তুলে রেখেছে কিন্তু বেশি দিন তুলে রাখা যায়নি।

আলনার শাড়ি দুখানার একটি পরনের খানাব মতোই ছেঁড়া অন্যটি বড়ো বেশি ময়লা। বাক্সো কি খোলা যায় ? রানীর স্বামী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন কি অত সমারোহ কবা চলে ? হাত বাড়িয়ে সে ময়লা কাপড়খানাই টেনে নেয়।

কল্যাণী অমিয়কে জিজ্ঞাসা করছিল, কাকে চান ? কল্যাণী বিভার চেয়ে দশ বছরের বড়ো হবে, তার বেশি নয়। তার দুটি ছেলে মেয়ে, সংসারে এগারোজন লোক। সেই চাপে তার লজ্জা শরম মুষড়ে গেছে। আঁচিয়ে উঠে সদরে মানুষ দেখে এক কাপড়ে সে অনায়াসে তার প্রয়োজন জানতে এসেছে, তার সংকোচ নেই দ্বিধা নেই অস্বস্তি নেই। দাসীর মতো দেখায় না রানীর মতো দেখায়, বাইরের অজানা লোকের চোখে কেমন লজ্জাকর ঠেকে এ চিন্তার অঙ্কুরও বুঝি আর গজায় না তার মনে, এমন শক্ত অনুর্বর হয়ে গেছে তাব মধ্যবিত্তের অভিমান।

কিন্তু কী ভয়ানক কথা, নিজেও বিভা যে এগিয়ে এসেছে ব্লাউজ না গায়ে দিয়েই ! এটা তারও খেয়াল হয়নি। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় বলে দশটা নাগাদ বাড়ির পুরুষরা আপিসে কাজে বেরিয়ে গেলেই সে ব্লাউজ খুলে ফেলে, বিকালে পুরুষদের ফেরার আগে একেবারে গা ধুয়ে আবার গায়ে দেয়। খালি গায়ে থাকাটা কি তাবও অভ্যাস হয়ে গেল কল্যাণীর মতোই ? দাসী চাকরানি মজুরনির মতোই ? কান দুটি গবম হয়ে ওঠে বিভার।

আমাদেব এখানে এসেছেন, সে কল্যাণীকে বলে, সেই যে রানীর কথা বলেছি আপনাকে, আমার ছেলেবেলায় বন্ধু ? তাব স্বামী।

আপনাব অসুখ নাকি ? কল্যাণী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে।

অসুখে পড়েছিলাম, এখন সেরে উঠেছি।

কল্যাণী বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস কবে না, অমিয়র চেহারায় সেরে ওঠার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। কোনো রোগ সেরে গেলে এ রকম চেহারা হয় না মানুষের, বোগ বজায় থাকলেই হয়। কালিপড়া চোখে শুধু তার দৃষ্টিটা উজ্জ্বল ঝকঝকে।

ওঃ, মনে পড়েছে, কল্যাণী আচমকা বলে, আপনারই গুলি লেগেছিল।

কাগজে পড়ে বিভা বলেছিল আপনার কথা।

এত বড়ো কথাটা ভুলে যাবার জন্য কল্যাণী অপরাধীর মতো হাসে।

অসুখও হয়েছিল। অমিয় বলে।

দশ মিনিটের বেশি অমিয় বসে না। কাজে যাবার পথে সে রানীকে শুধু পৌঁছে দিতে এসেছে। বেচারির গুলিও লেগেছে, সরকারি দপ্তরের চাকরিটিও গেছে। বন্ধুরা একটি কাগজে মোটামুটি একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাগজটি আবার সরকার-বিরোধী, কাগজটাই কবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই।

কিন্তু অমিযকে বিশেষ শঙ্কিত মনে হল না। বরং কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে।

কী জানেন, সব উনিশ আর বিশ, সে বিভাকে বলে, ও ছাতার চাকরি থেকেই বা কী এমন স্বর্গলাভ হচ্ছিল ? ঘরে বাইরে চাকরির মর্যাদা রাখতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নিজের মনটাও মানে না, যেমন হোক চাকরি তো করি, মাস গেলে মাইনে তো পাই যা হোক, একদম মিনিমাম ভদ্রলোকের স্ট্যান্ডার্ড তো অন্তত রাখতে হবে ? সে এক ছুঁচো গেলার অবস্থা, পেটও ভরতে পারি না, না খেয়ে মরতেও পারি না। এখন শালা বেশ আছি, হয় এসপার নয় ওসপার ; ব্যস !

অনায়াসে বিনা দ্বিধা সংকোচে সে বিভার সামনে শালা শব্দটা উচ্চারণ করে। সত্যই করে। কী ছোটোলোক হয়ে গেছে শিক্ষিত মার্জিত ভদ্র সন্তান ! পাশে কোথায় রেডিয়োতে মিষ্টি অলস সুরে গান বাজছে, উঠানে এঁটো বাসনের ঝনঝনানি। কল্যাণীদের বাসনের সঙ্গে দোতলার এঁটো বাসনও উঠোনে এসে জড়ো হচ্ছে। একসঙ্গে ছোটো ছেলেমেয়ে কাঁদছে তিনটে অথবা চারটে, সংখ্যাটা ঠিক ধরা যায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় বলে, আপনার চিঠি পাবার পর থেকে বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া করার জন্য কোমর এঁটে বসেছিল, আমার অসুখের জন্য দেরি হয়ে গেল।

কীসের ঝগড়া ?

বলেনি ? চিঠিটা পড়ে কেবলি বলত, দেখলে ? ছেলেবেলার বন্ধু, কত ভাব ছিল, কাগজে গুলি লাগার খবর পড়ে একটা চিঠি লিখে দায় সেরেছে। কর্তাটিকে পাঠিয়েও তো খবর নিতে পারত ?

ওঃ, এই ঝগড়া !—বিভা সত্যই বিব্রত বোধ করে,—যাব মনে করেছিলাম। ওঁকে তাগিদ দিয়েছি, এক মাসের ওপর যাব যাব করছেন—

কিন্তু যেতে পারেননি।—কোটরে বসা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সোজা বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে দশ মিনিটে গড়া আশ্চর্য অন্তরঙ্গতায় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিয় সহজ সহানুভূতির সায় জানিয়ে বলে, আপিস, ছেলে পড়ানো, বাজার, রেশন কয়লা ওষুধ ডাক্তার--কী করেই বা পারবেন ?

এখনো ছুঁচো গেলার অবস্থা।—বিভা প্রাণ খুলে হাসে।

অমিয় চলে গেলে বিভা সহজভাবে বলে, নে কাপড়টা ছেড়ে হাত পা এলিয়ে বোস, সং সেজে থাকতে হবে না।

সত্য কথা বলতে কী, রানীকে এতক্ষণ সে প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারেনি, ভিতরে একটা আবিষ্টভাব বজায় থেকে গিয়েছিল। খুশি হলেও সে আনন্দে খাদ ছিল। হোক সে ছেলেবেলার সখী, মাঝখানে অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে চারিদিকে ও তার নিজের জীবনে। কে বলতে পারে তাকে কী রকম দেখবে কল্পনা করে এসেছে রানী, তার কাছে কী রকম ব্যবহার আগে থেকে মনে মনে চেয়ে এসেছে ? হয়তো অনেক কিছু অন্য রকম দেখে তার ভালো লাগছে না--হয়তো সে ভুল বুঝছে তার কথা ও ব্যবহার, আরও হয়তো ভুল বুঝবে ! এই একখানা আর পাশের আধখানা নিয়ে দেড়খানা ঘরে কত দিকে যে বিষিয়ে গেছে জীবনটা সে নিজেই কি খানিক খানিক জানে না। রানী এসে দাঁড়ানো মাত্র তার ফ্যাকাশে ম্লান চেহারা দেখে উতলা হওয়ার সঙ্গে প্রাণটা তার ধক করে উঠেছিল বিপদের আশঙ্কায় ! তার সখী এসেছে, এককালে দিনে অন্তত একবার যাকে কাছে না পেলে সে অস্থির হয়ে পড়ত এতদিন পরে সেই সখী এসেছে তার ঘরের দরজায়—আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে তো সে অভ্যর্থনা করতে পারবে না, হেসে কেঁদে অনর্গল আবোল-তাবোল কথা যা মনে আসে বলে গিয়ে প্রমাণ দিতে পারবে না সে কৃতার্থ হয়েছে ! সে সাধ্য তার নেই, হাজার চেষ্টা করেও বেশিক্ষণ সে আনন্দোচ্ছ্বাস বজায় রাখতে পারবে না, ঝিমিয়ে মিইয়ে তাকে যেতেই হবে। কী ভাববে তখন রানী ? কী বিশ্রী অবস্থা সৃষ্টি হবে ?

আরও ভেবেছিল : বিকাল পর্যন্ত যদি থাকে, চায়ের সঙ্গে ওকে কী খেতে দেব ? ওর মেয়ে যদি দুধ খায়, দুধ কোথায় পাব ? শ্রান্তিতে যদি ওর হাই ওঠে, বিছানায় কী পেতে দিয়ে ওকে আমি শুতে দেব।

দশ মিনিটের মধ্যে অমিয় তাদের সখীত্বকে সহজ করে বাস্তবের দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। বিভার আর কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই সংকোচও নেই। কারণ, কোনো অভাব

কোনো অব্যবস্থার জন্য রানী তাকে দায়ি করবে না, তার মেয়ে দুধের খিদেয় কাঁদলে সে যদি শুকনো দুটি মুড়ি শুধু তাকে খেতে দেয়, তাতেও নয়। চাদরের বদলে ময়লা ন্যাকড়া পেতে দিলেও গা এলিয়ে রানী তাকে গাল দেবে না মনে মনে।

এটুকু অমিয় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

ময়লা শাড়িখানা পরে রানীও যেন বাঁচে।

একটা পান দে না বিভা?

কোথা পাব পান? ত্যাগ করেছি। মাসে তিন চারটাকা খরচ—কী হয় পান খেয়ে? একটি লবঙ্গ মুখে দিয়ে মুখশুদ্ধি হয়। নে। বিভার বাড়ানো হাতে প্লাসটিকের চুড়ি নজর করে রানী হাসে। তুইও ধরেছিস? ভাগ্যে এ ফ্যাশনটা চালু হয়েছে—সোনা না দেখে লোকে কিছু ভাবে না।

ফ্যাশন কি এমনি চালু হয়? যেমন অবস্থা তেমন ফ্যাশন। সোনা নেই তোর?

টুকটাক আছে। তোর?

চারগাছা চুড়ি, সরু হারটা আর কানপাশা। সে বছর টাইফয়েডের এক পালা গেল, তারপর আমার কপাল টানল হাসপাতালে। মরবে জেনেও কেন যে পেটে আসে বুঝি না ভাই। আমাকেও প্রায় মেরেছিল, কী যে কষ্ট পেলাম এবার। অথচ দ্যাখ, এ দুটোর বেলা ভালো করে টেরও পাইনি। দিন কাল খারাপ পড়লে কি মানুষের বিয়োনোর কষ্টও বাড়ে?

বাড়ে...। খেতে পাবে না, মনে শান্তি থাকবে না, গায়ে পুষ্টি হবে না, বিয়োলেই হল?

দুই সখী অদ্ভুত এক জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চোখে চোখে তাকায়, দুজনের মনে এক সঙ্গে একই অভিজ্ঞতা একই সমস্যা জেগেছে, আজ দুজনের নিরিবিলি দুপুরে কাছাকাছি আসার সুযোগে পরস্পরের কাছে প্রশ্নটা তাদের যাচাই করে নিতেই হবে। জানতে হবে, খাপছাড়া অদ্ভুত একটা ফাঁদে পড়ার যে রহস্যময় ব্যাপারটা নিয়ে যন্ত্রণার অন্ত নেই, সেটা শুধু একজনের বেলাই ঘটেছে না দুজনেরই সমান অবস্থা। বুঝতে হবে কেন এমন হয়, এমন অঘটনের মানে কী?

রানী বলে, বল না? তুই আগে বল।

আগেও ঠিক এমনি ভাবেই জীবনের গহন গভীর গোপন রহস্যের কথা উঠত, কেউ একজন মুখ খোলার আগে চোখ মুখের ভাবভঙ্গি দেখেই দুজনে টের পেত যে জগতের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা শুধু তাদের দুই সখীর প্রাণে কথা বলাবলি হবে।

বিভা বলে, কিছু বুঝতে পারি না ভাই। এ রকম যাচ্ছেতাই শরীর, কী যে খারাপ লাগে বলার নয়, তবু আমার যেন বেশি করে ভূত চেপেছে। বিয়ের পর দু-একবছর সবারই পাগলামি আসে, ও বাবা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তখন রীতিমতো সংযমী ছিলাম বলা চলে। আগে ভাবতাম ও বেচারির দোষ, ঝগড়া করে ও ঘরের ঘুপটির মধ্যে বিছানা করে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তখন টের পেলাম কী বিপদ, আমারও দেখি মরণ নেই। ঘুম আসবে ছাই, উঠে এসে যদি ডাকে ভেবে কী ছটফটানি আমার। বিশ্বাস করবি? থাকতে না পেরে শেষে নিজেই এলাম।

রানী একটু হাসে, উঠে এসে বললি তো একা শুতে ভয় করছে?

তোরও তবে ওই রকম?—বিভা যেন স্বস্তি পায়।

কী তবে? তোর এক রকম আমার অন্য রকম?

দুই সখী আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রানী বলে, তবে আমার আজকাল কেটে গেছে, অন্যদিকে মন দিতে হয়। তোরও কেটে যাবে।

একটু ভেবে রানী আবার বলে, আমার মনে হয় এ একটা ব্যারাম। ভালো খেতে না পেলে ভাবনায় চিন্তায় কাহিল হলে এ রকম হয়। ছেলেপিলেকে দেখিস না পেটের ব্যারাম হলে বেশি খাই খাই করে, চুরি করে যা তা খায়?

চুরি করেও খাস না কি তুই ?

দুই সখী হেসে ওঠে।

সেই এক মুহূর্তের হাসির ক্ষীণ শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যায় শিশুর কান্না বাসন নাড়ার শব্দ মেশানো দুপুরের স্তব্ধতায়। শুধু শিশুর কান্না নয়, এ বাড়ির দোতলাতেই মেয়েলি গলায় একজন সুর করে কাঁদছে। উপবতলায় একজন ভাড়াটে রমেশ, তাব বুড়ি মা। রমেশের ছোটো ভাই অশেষ, সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির ধান্ধায় ঘুরতে শুরু কবেছিল, কদিন আগে টিবি রোগে সে মারা গেছে।

এই সেদিন দেখেছি চলাফেরা করছে, বিভা হঠাৎ শিউরে উঠে বলে, দিনরাত ঘুবে বেড়াত। ওঁর সঙ্গে তর্ক করত আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কি না। এই বিছানায় বসে একদিন রাত্রে কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করল, এক ঝলক রক্ত উঠে চাদরে পড়ল। কী বকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যে চেয়ে রইল ছেলেটা। আগে একটু আধটু রক্ত পড়েছে গ্রাহ্যও করেনি, সেদিন প্রথম বেশি পড়ল। নিজেব শরীরটাকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না, কী যে হয়েছে আজকালকার ছেলেরা—

আনমনে কী যেন ভাবে, একটু ম্লান হেসে বলে, প্রথমে ঠিক হয়েছিল চাদরটা পুড়িয়ে ফেলব। কিন্তু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চাদর কিনতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাই—

এ কথাটাও বিভা শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারে না, আবার আনমনা হয়ে যায়।

কী ভাবি জানিস রানী ? শুধু শাকপাতা আব পচা চালের দু মুঠো ভাত খায়, না এক ফোঁটা দুধ না এক ফোঁটা মাছ। এই খেয়ে আপিস করা, রাত নটা পর্যন্ত ছেলে পড়ানো। একদিন যদি ওই রকম কথা কইতে কইতে ও কাশতে শুবু করে আর—

এ কথারও শেষটা মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব।

রানী অসম্ভবকে সম্ভব করে যোগ দেয়,—রক্তে বিছানা যদি লাল হয়ে যায় ? আমিও আগে এ রকম আবোল-তাবোল কত কী ভাবতাম। রক্তে একদিন রাস্তাই লাল হয়ে গেল। আর ভাবি না। কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করাব ? সংসারে কুলিমজুবও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।

নিচু চোখে দু আনা আর দু পয়সা

টিপি টিপি বৃষ্টিতে বস্তির হাঁটাপথের পাঁক কালো ক্ষীর হয়ে আছে। কী কী মেশাল আছে তালিকা বানানো শক্ত। লাগাও জমিটাতে বহুকাল গন্ডা তিনেক মহিষের বসবাস, এখান থেকেই উপকরণ এসেছে বেশির ভাগ। মাঝে মাঝে পিলু ধাঙর বন্ধ নালাটার নানারকম আবর্জনার জমাট বাঁধা মিতালি কোদালে টেনে তুলে নালার পাশেই জমা করে যায়, তাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। মানুষের দৈনিক স্বভাবগত ত্যাগও খানিক বয়ে গড়িয়ে পথে এসে যায়, কী করা যাবে কোনো প্রতিকার নেই। মরা ইঁদুর, বেড়ালছানা, পাখি, ব্যাঙ, ইত্যাদি পচে গলে মিশে যায়। আরও অনেক কিছুর সমন্বয় ঘটে। নিচু আকাশে ঘন কালো মেঘ থেকে যে নির্মল ধারা নামে টিন ও খোলার চাল বেয়ে গড়িয়েও ছলছলে পরিষ্কার থাকে, কী বিষাক্ত নোংরা হয়ে যায় এখানকার পৃথিবীতে পড়া মাত্র।

চালার কোনার দিকের মোটা ধারাটা সুখলালের ঘরের জানালার হাত দেড়েক তফাতে নামে, বৃষ্টি যখন জোরে হয়। সুখলাল ওখানে দুখানা ইট বসিয়ে দিয়েছে, নইলে জলের তোড়ে মাটিতে গর্ত হয়ে যাবে। টিপ টিপি বর্ষার ধারাটা এখন খুব সরু, ইট ঘেঁষা কটকটে ব্যাঙটা তারই ছিটকানো জলের ছাটে বিরক্ত হচ্ছে। বুড়ো আব্দুলের বড়ো মোরগটা আবর্জনার স্তূপে নিরাহ নিস্পৃহের মতো ঠোকর মারছিল, আচমকা সে মাথা উঁচু করে উদ্ধত বীরের মতো দাঁড়ায়, ফুলে ফেঁপে ওঠে পালক, মুরগি ক টা সচকিত হয়ে ওঠে।

মোরগটার দাম চার টাকা। সুখলাল মুরগি খায় না, মাছ মাংস ছোঁয় না। রাম রাম, ভাবাও যায় না ও সব খাওয়ার কথা। তার বাবুর জন্য মোরগটা সে দর করে রেখেছে। শকুন্তলা ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়ার বীরেনবাবু তার বাবু। বাড়ি বেশি দূরে নয়, ও বেলা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। শনিবার রাইরে মদ বন্ধ, বীরেনবাবু সেদিন বাড়িতেই খায়। তার বউ মুরগির মাংস রাঁধবে। চার টাকা দাম মোরগটার। গা জ্বালা করে সুখলালের। শালা মুরগিখোর।

গোবরার মা এসে শুধোয়, হাঁ সুখলাল লক্ষ্মী রুপেয়া রেখে যায়নি ?

সুখলাল জিজ্ঞাসা করে, কীসের রুপেয়া ?

গোবরার মা বলে, একটা রুপেয়া দেবে বলেছিল।

কী জন্য বলেছিল ? কীসে লাগবে রুপেয়া ?

পেটে লাগবে রুপেয়া, খেতে লাগবে। দু হাতে গোবরার মা চামড়া কুঁচকানো সরু পেটটা থাবড়ে দেয়—ধার দেবে বলেছিল।

আমি কুছু জানি না।

গোবরার মা ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়। লক্ষ্মী টাকা রেখে যাক বা না যাক, সুখলাল কিছু জানুক বা না জানুক, আসল কথাটা এই যে টাকা ধার দেওয়া হবে না। অন্য অবস্থায় লক্ষ্মী টাকা রেখে না গেলেও সুখলাল নিজেই দিত, কিন্তু অবস্থা এখন অন্যরকম। এক মাসের ওপর গোবরা ধর্মঘট করে বসে আছে।

গোবরার মা ভেংচে বলে, আমি কুছু জানি না ! জানো না তো অত কথা কেন, কীসের রুপেয়া, কী জন্য রুপেয়া—তোমার মুন্ডুর জন্য রুপেয়া।

দু মিনিটের মধ্যে সে ঘর থেকে কাঁসার ছোটো গেলাসটা নিয়ে ফিরে আসে। বলে, নাও, এবার বার করো টাকা।

একটা কার্ডের রেশন আনা বাকি আছে, এ বেলা না আনলেও উপায় নেই। শনিবার বিকালে রেশন দেয় না, রবিবার দোকান বন্ধ। আটা চাল আনাই চাই এ বেলা।

এ জ্বালা পেটের জ্বালার চেয়ে বেশি, কারণ পেটের জ্বালাতেই এর জন্ম। ময়লা ন্যাতানো এক টাকার নোটটা হাতে পেয়েই গোবরার মা তাই একটা শাপ ঝেড়ে দেয়, সুখলালের একটা টাকাও অন্তত সুদে ধার দেবার ক্ষমতা থাকায় তাকে ভয় করে বলে শাপটা সোজাসুজি গাল হয়ে বেরোয় না তার মুখ থেকে। শিল্পী কবির কায়দা খাটিয়ে ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, সিঁথেয় অত যে সিঁদুর সাঁটে তোমার লক্ষ্মী, তেলে জবজবিয়ে, ওতে উকুন লাগবে, পোকা ধরবে সুখলাল। এত তোমার টাকার খাঁকতি, টাকার পোকা নোংরা করবে সিন্দুর !

নোংরা কীসের ? আসলি চিনা সিন্দুর আছে। তোমার ছেলের বউ ভি ওই সিঁদুর লাগায়। আচ্ছা সিন্দুর।

গোবরার বউ দুর্গাকে সিঁদুরের গল্পটা সে শোনায় রেশন নিয়ে এসে। ইতিমধ্যেই হৃদয় পুড়ে যাওয়া জ্বালার সেই পুরাণ ইতিহাস কথকতার ছোঁয়াচ লাগা উদ্দীপনার মুহূর্তে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে যা বলেছিল আর সুখলাল যে জবাব দিয়েছিল তা অনেকখানি ধাঁধার মতো হয়ে গেছে। লক্ষ্মীর নামে যে অকথা কুকথা কানাঘুষা শোনা যায় তাই নিয়ে সে কি গাল দিয়েছিল সুখলালকে ? সুখলাল কী জবাব দিয়েছিল যে তার ছেলের বউ দুর্গাও বজ্জাতিতে কম যায় না ? কে জানে। ও রকম ঘষেমেজে সাবধানে শাপ দিতে গেলে না হয় জিভের সুখ, না হয় প্রাণের শান্তি। যা মুখে আসে বলে দিলে হয়তো সুখলাল চটে লাল হয়ে যেত, এ বস্তিতে বাস উঠত তাদের। তবু বোঝা তো যেত সঠিকভাবে যে একজনকে প্রাণ ভরে গাল দিলাম আর সে প্রাণভরে প্রতিশোধ নিল !

দুর্গার এক ফোঁটা কৃতজ্ঞতা নেই ! বুড়ি শাউড়ি যে জোগাড়যন্ত্র করে রেশনের চাল আটা এনে আজ শনি আর কাল রবিবারের পেটপূজার ব্যবস্থা করেছেন যেমন করেই হোক, নইলে এ বেলা থেকেই উপোস শুরু হত, এ সব যেন দুর্গার হিসাবে আসে না।

সে বলে, একবার গেছলাম, ফের যেতাম। তোমায় এত কাণ্ড করতে কে বলেছে ? ছেলে তোমায় কালীঘাটের ধর্মের ঘট ফেলে ধর্মঘটের ঘট মেনেছে। তা বাবা যা করেছে, সে আর দশটা মদ্দপুরুষের সাথে করেছে। বুড়িঘাগি মেয়েমানুষ তুমি, সব তাতে তোমার মাথা গলানো কেন ?

আ মরণ, গোবরার মা ভড়কে গিয়ে বলে, রেশনের চাল আটা না আনলে পর—

বড়ো তুমি পেট চিনেছ ওনার মা !—দুর্গা বলে আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে, সগ্‌গে যাবে সে ভাবনা নাই, পেটের ভাবনায় মলে। আমি বলে কত করে মাইনের দু টাকা আগাম নিয়ে ঘরে এলাম যে রেশন আনব, উনি আগে ভাগে সুদে টাকা ধার করেছেন ! তর সয় না !

একটা অতি আধুনিক ছোটো সাইজের ধাতুব টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, টাকা দিয়ে মোর গেলাস নে এসো, যাও।

আর দু আনা ?

সে তুমি দেবে। অত তোমার বাড়াবাড়ি কেন ?

সুদের দু আনা অবশ্য দুর্গাই দেয়। মুখে যা বলার তা যত খুশি বলা যেতে পারে কাজে মানিয়ে না চললে হবে কেন ? গোবরার মা তো কেবল নিজের পেট নয় তাদের সবার পেটের ভাবনাতেও উতলা হয়েছিল।

কয়েক মিনিট জোর বৃষ্টি হয়ে আবার টিপটিপ বর্ষণ চলে। মোটে একটা মাস, আষাঢ় মাসটা খেটেই যেন মেঘেরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভোরে এমনই এক পশলা জোরালো বর্ষণের মধ্যেই লক্ষ্মী বস্তা মাথায় চাপিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। সুখলালের একটা ছাতি আছে কিন্তু মেয়েরা কি ছাতি মাথায়

দেয় ? দিলে একটা ছাতি নিয়ে টানাটানিতে পুরুষের বড়ো অসুবিধা ঘটে। আগে লক্ষ্মী তিন বাড়িতে ঠিকে হিসাবে ঝিয়ের কাজ করত, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জলতোলার কাজ। এখন সে শুধু এক বাড়িতে ভোর থেকে প্রথম রাত্রি পর্যন্ত খাটে, বাসনমাজা জলতোলার কাজ ছাড়াও ছেলে রাখে, দুপুরে ওখানেই খায়, রাত্রের খাবার বাড়ি নিয়ে আসে। সিনেমা জগতের এক মস্ত লোকের বাড়ি, গিন্নির বড়ো বড়ো দুটি এবং একেবারে কচি দুটি বাচ্চা। দুটি জোড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় বারো বছরের তফাত। লক্ষ্মীর কাছে বস্তির সমস্ত মেয়ে পুরুষ এক আশ্চর্য কাহিনি শুনেছে এবং হেসেছে। কীসে এমন হয়, কোন রোগে, তারা জানে। দীর্ঘ যুদ্ধটা তাদের জানিয়ে দিয়ে গেছে। ওই যে মনোহর হেয়ার কাটিং সেলুনে চুল ছাঁটে, ওর বউ কাদম্বিনী বছর বছর চার পাঁচটা বিইয়ে আচমকা থেমে গেল খট করে—সাত-আটবছর। কোথায় ছিল তার ভগ্নীপতি দাশরথি, যুদ্ধের হট্টগোলের বাজারে এ কাজ ছেড়ে ও কাজ ধরতে ধরতে কোথা থেকে এসে জুটল এখানে, জোর করে ধরে বেঁধে চিকিৎসা করিয়ে দিল দুজনের। তারপর চেয়ে দ্যাখো ম্যাজিক, তিন বছরে ফের আবার দু-নম্বর বাচ্চাটা মাই টানছে কাদম্বিনীর। এত সব ঝঞ্ঝাট ছিল না জগতে, সায়েব রাজা মালিক বড়োলোকেরা তৈরি করেছে। নাচে গায় ফুর্তি করে, মেয়েপুরুষে বাছবিচার নেই কে কার সোয়ামি। শুধু তাই হলে তবু পদে ছিল। রক্তের সম্পর্কের বালাই পর্যন্ত নেই ওদের। বাপ মেয়ের হাত ধরে হাওয়া খেতে যায়, গভীর রাতে ভাইবোন ছাতের আলশেয় ঘেঁষাঘেঁষি ঝুঁকে ফিসফাস গুজগাজ করে। ঘরে বাইরে বল আর [illegible] পরের মধ্যেই বল, ওদের যে কোনো নিয়মনীতি ধর্ম নেই এ তো তারা চিরকাল টের পেয়ে এসেছে। আরও বেশি টের পেয়েছে মাঝে মাঝে সিনেমায় ওদের জীবনযাত্রার মারপ্যাঁচ দেখে—মেয়েবা যা সব দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, পুরুষেরা শিস দেয়, কী অনায়াসে ওরা নিজেদের সে সব কুৎসিত বেলেল্লাপানা দেখিয়ে দেয় !

বুড়ো বিনোদ বলে, তা যাই বলো, একধার থেকে পাপ করে যেমন ছিষ্টিছাড়া রোগ ছিষ্টি করে তেমনই আবার চটপট সেরে যাবার চিকিচ্ছেও বার করে খুঁজে।

তা করে, ধনদৌলত বিদ্যাবুদ্ধি কিছুর অভাব নেই, বিপদ যেমন টেনে আনে তেমনই তার কাটানও জানে। কিন্তু কেন ? এ কোন দেশি ছিনিমিনি খেলা সৃষ্টির সাধাসিধে সহজ নিয়ম নিয়ে ? কোন ভূতে ওদের কিলোয় যে মানুষ হয়ে পশুর মতো আচরণ না করে স্বস্তি পায় না ?

অনাদি বলে, টাকার গরম, খেমতার গরম।

বিপিন বলে, হাঁ, গরম বটে। নয় তো এত জানে এত করে আর নিজেদের স্বভাবটা শুধরাতে পারে না ? আপসে কটা নিয়ম করে আপসে মেনে চলতে পারে না ? তা, সবাই হল হামবড়া, কে বা কার কথা শোনে, কে বা কাকে মেনে চলে।

কাহিনি থেকেই কাহিনি আসে, লক্ষ্মী তার মনিব বাড়ির পারিবারিক কাহিনি আজ বলেনি, কাকডাকা ভোরে সে কাজে গেছে, এখানে হাজিরও নেই। কিন্তু গোবরার মার একটা টাকা ধার করা আর তাই নিয়ে দুর্গার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি এবং গোবরার মার আঠারো আনা দিয়ে গেলাসটা খালাস করে আনার ব্যাপারটা বাদলার এই সকালে ঘটেছে। তাতে জন্ম নিয়েছে নতুন এক কাহিনি, যার টানে গাঁটে গাঁটে গাঁটছড়া বাঁধা ইতিহাসের মতো অন্য কাহিনিগুলি বেরিয়ে এসেছে জটলার মধ্যে। ঘেঁষাঘেঁষি লাগালাগি সব চালা, একটা চালার নীচে খোপে খোপে ভাগ করা আস্তানায় প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে অনেকগুলি মানুষের বসবাস। বিশেষ ঘটনা ঘটলে, কাহিনির গাঁটছড়ায় নূতন একটা গাঁট পড়লে, ঢিল-লাগা চাকের মতো চাঞ্চল্য ও জটলার গুঞ্জন দেখা দেবে বইকী।

লক্ষ্মী বা সুখলালের কাছে মাঝে মাঝে অনেকেই ওরকম দুটো একটা টাকা ধার নেয়, ঘটিবাটি বাঁধাও দেয় অবস্থা বিশেষে, আসল এবং সুদ দুইই আদায় করে সুখলাল। এ বস্তির ক্ষুদ্র এলাকায় কেন, প্রকাণ্ড পৃথিবীটায় সর্বত্র এটা নিত্যকার ঘটনা, মানুষের জীবনযাত্রার একটা সাধারণ মূল নিয়ম।

কীসে তবে সারা বস্তিটা চঞ্চল হল ? জগতের সমস্ত অনাচার অত্যাচার অনিয়মের অসংখ্য গুদামখানার যেটা অন্যতম, সেখানে যারা প্রায় উলঙ্গ হয়ে উপোস দিয়ে পর্যন্ত থাকে, সুখলালের ব্যবহারে কী এমন গুরুতর অন্যায়টা তাদের টনক নড়িয়ে দিল ?

সুদের ওই দু আনা পয়সা।

ময়লা ন্যাতানো একটা এক টাকার নোট দশ-বিশমিনিট পরে চকচকে নতুন একটা ধাতুর টাকা হয়ে ফিরে এলে সুখলাল কেন সেটা গ্রহণ করে গোবরার মার কাঁসার গেলাস ফিরিয়ে দেবে না ? একটা আনি একটা ডবল আর দুটো ফুটো তামার পয়সাও কেন সে জোর করে আদায় করবে গোবরার মার কাছ থেকে ? একটা দিনরাত্রি দূরে থাক, একটা বেলাও কাটেনি, কয়েক মিনিটের মধ্যে গোবরার মা টাকাটা ফেরত এনেছে। তার জন্যও সুদ ? দু আনা সুদ, নগদ ? সুদ নেবার অধিকার নিশ্চয় আছে সুখলালের। টাকায় দু আনা সুদ সে নিশ্চয় পাবে যেই টাকা ধাব নিক—বরাবর বিনা প্রতিবাদে সবাই তাকে তার প্রাপ্য সুদ দিয়ে এসেছে। গোবরার মাও আগে দু বার গোবরার হয়ে তার কাছে টাকা নিয়ে আসলের সঙ্গে পুরো সুদ মিটিয়ে টাকা শোধ দিয়েছে। কিন্তু এবাব সে সুদ দেবে কেন ? এতটুকু সময়ের মধ্যে সে যখন টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, তার আবার সুদ কীসের ?

কেন ?—এ যুক্তি সুখলাল বুঝতে চায় না, মানতে চায় না,—টাকায় দু আনা দিবে। আজ না দিক, দশ রোজ বাদে দিক, এক মাহিনা তক্ দু আনা। আজ দিতে বলেছি আমি ?

বিনোদ মিস্ত্রি বলে, সুখলাল, ও হিসাব ছাড়ান দাও। মনে কর পাঁচ টাকার নোট নিয়ে এলাম তোমার কাছে। সুখলাল, ভাঙানি আছে ? তুমি বললে, না, ভাঙানি নাই। নোটটা রেখে একটা টাকা নিলাম তোমার কাছে, ফের খানিক পরে তোমার টাকা ফিরিয়ে দিলাম। সুদ নেবে তুমি ?

বিনোদের দীর্ঘ কাল্পনিক উপমার ব্যাখ্যা সকলে মন দিয়ে শোনে, কারণ তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের মর্মকথাটা সত্যই এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের কাছে। তুচ্ছ দু আনা পয়সাটাই যে আসল নয়, গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতির যে প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে সেটাই বড়ো কথা, মনে মনে পরিষ্কার বুঝলেও ভাষায় সেটা ব্যক্ত করতে তাদের সকলকেই রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল। সুখলাল তাদের সহজ ভাষায় কথা কইতে জানে, আসল বক্তব্য কী তাও বেশ বোঝে, কিন্তু এখন সে ওই ঘরোয়া ভাষা বুঝতেই নারাজ হয়েছে, তাই অবশ্য এত মুশকিল। কাটা ছেঁড়া ছাঁকা কথায় একেবারে ওই দু আনা সুদ থেকে নীতিটা ছেঁকে নিয়ে ভিন্ন করে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে গেলেই এতক্ষণ তাদের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যটা যেন হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল। সকলের মেজাজ তাই চড়ছিল, বিনোদ গোবরার মার কাঁসার গেলাসটার স্থানে কাল্পনিক একটা পাঁচ টাকার নোট আমদানি করে মূল কথাটা সুখলালের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে ভেবে তারা একটু ঠান্ডা হয়।

কিন্তু সুখলালেরও নিজের সাদাসিধে নীতিবোধ আছে, সে তার গোঁ ছাড়তে রাজি নয়। টাকা হাত বদল হলে সুদ নিয়ে ফিরবে এর মধ্যে তার কাছে আর কোনো জটিল হিসাব নেই।

পাঁচ রুপেয়ার নোট !—সে বলে, পাঁচ রুপেয়া নোটে এক রুপেয়া নিলে সেটাও হাওলাত আছে কি ? পাঁচ রুপেয়া নোট দিয়ে এক রুপেয়া নাও, চার রুপেয়া নাও, পুরা পাঁচ রুপেয়া নাও, আমার তাতে কী আছে ? রুপেয়া যদি ধার নিবে, তবে সুদ দিবে, বাস্।

এটা যুক্তি বইকী, আইনের অকাট্য যুক্তি। মুশকিলও হয়েছে ওইখানেই। উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায় মানবে না সুখলাল, সে শুধু আইন জানে !

মালতী বলে, মরণ তোমার। আর তুই কথা জানিস নে ? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা একশোবার !

মালতী তিন টাকা ধারে সুখলালের কাছে, মাস পুরতে আর মোটে কটা দিন বাকি। মাস পুরে দুটো দিন গেলেই তার ছ আনা সুদ ন আনা হয়ে যাবে।

বনমালী কটমট করে তাকিয়েছিল। দু বার মুখ খুলে নরম গরম অনেক কথা বলে ব্যর্থ হয়ে সে গুম খেয়ে গিয়েছিল। কারখানায় অ্যাকসিডেন্ট ঘটে সে তিন হপ্তার ওপর বসে আছে, এখনও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ঘটি বাটি তার বউও বাঁধা দিতে শুরু করেছে, তবে সুখলালের কাছে নয়। সুখলালের প্রতি তার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে। অন্য কোনো কারণে নয়, সংগতি থাকতেও বউকে সুখলাল বাবুদের বাড়ি খাটতে দেয় বলে।

বনমালী হঠাৎ গর্জন করে ওঠে, এ সুদ তুমি পাবে না সুখলাল !

রাগে সে কাঁপছে বোঝা যায়। তবে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতটাও চোখের সামনেই ছিল। সেদিকে চেয়ে সুখলাল ব্যঙ্গভরে বলে, কী জন্য পাব না ?

এই জন্য পাবে না।—বাঁ হাতে বনমালী তার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।—শালা দালাল !

সবাই চুপ করে থাকে, সুখলালও। এতক্ষণে তার চৈতন্য হয়েছে। বনমালীকে কেউ সমর্থন জানায় না কিন্তু প্রতিবাদও আসে না কারও কাছ থেকে। বনমালী যা ভালো বুঝেছে করেছে, কারও কিছু বলার নেই।

কিন্তু সুখলাল তার মানে জানে।

দু আনার [illegible] কাণ্ড যাদের খাপছাড়া উদ্ভট মনে হবে, বানানো গল্পের মতো মনে হবে, সোজাসুজি তাদের কেউ বলতেও যায় না ব্যাপারটা। ঘটনাচক্রে দু-একজনের কানে যায়।

যেমন লোচন সা ব মুদি দোকানে বিনোদ যখন লোচনকে ঘটনার বিবরণ বলে, ধরণীবাবু বিপিনবাবু অবিনাশবাবুও তা শোনে। ধরণীবাবু উকিল, অন্য দুজন চাকুরে।

ধরণী উদাসভাবে বলে, ভেতরে আরও কত ব্যাপার আছে !

বিনোদ মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়, উৎসুক হয়ে এমনভাবে প্রশ্ন করে যেন ভেতরে আরও যে সব গোপনীয় ব্যাপার ধরণীর জানা আছে শুনতে না পেলে তার চলবেই না।—কী ব্যাপাব আছে বাবু ?

ধরণী ব্যঙ্গ টের পায়।—সে তোমরাই জানো ! ব্যাপার আছে নিশ্চয় নইলে—

বিপিন বলে, মেয়েছেলের ব্যাপার হতে পারে। নইলে দু গন্ডা পয়সার জন্য—

অবিনাশ বলে, ঝগড়া মারামারি তো লেগেই থাকে, একটা উপলক্ষ পেলেই হল। সকালবেলাই মদটদ খেয়ে হয় তো—

ওটা হল গিয়ে কী জানেন বাবু,—লোচনের হাসি শান্ত, স্বস্তিকর,—ওরকম হয়। মানুষের জিদ চেপে যায়, সেটাই আসল, পয়সাটা নয়। কিশোরীবাবু কাল আধসের মোটা দানা চিনি নিলেন, দাম সাড়ে আট আনা, একটা আধুলি দিলেন। আমি বললাম, আর দু পয়সা বাবু ? কেন, তোমায় সাড়ে আট আনা দিয়েছি। না বাবু একটা আধুলি দিয়েছেন, দু পয়সা দেননি। বাবু চটে উঠলেন, আমি বলছি সাড়ে আট আনা দিয়েছি, নিজে গুণে দিয়েছি, তবু তুমি না বলবে ? আমি বললাম, যাক গে বাবু, দুটো পয়সার ব্যাপার তো। শুনে সে কী রাগ কিশোরীবাবুর ! চটেমটে বললেন, তার মানে ? আমি মিছে কথা বলছি ? তোমায় ঠকাচ্ছি দু পয়সা ? আমি যত বলি, যাক না বাবু, আমারই ভুল হয়েছে, বাবু তত চটে যান ! বললেন, দাঁড়াও, তোমায় আমি হিসেব করে দেখাচ্ছি আমি মিছে কথা কই না। দশ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়েছিলাম, খরচ মেলালে বেরিয়ে পড়বে তুমি মিথ্যেবাদী কি আমি মিথ্যেবাদী। চাকরের কাছ থেকে বাজারের থলি নিয়ে ঢাললেন, পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট আর কী সব টুকিটাকি জিনিস বার করলেন, ব্যাগ ঝেড়ে পয়সাকড়ি সামনে রাখলেন। তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে হিসেব মেলাতে লাগলেন। সকালবেলা খদ্দেরের ভিড় কত, কেনাবেচা সব বন্ধ

রইল !—লোচন মুখের স্থায়ী হাসিকে আরও ফলাও করে তোলে,—জিদ চাপলে দু-পয়সার জন্যেও অনেক কাণ্ড হয় বাবু !

তারপর কী হল লোচন ? কিশোরীবাবু কী করলেন ?

কিশোরীবাবু ? মুখ গোমড়া করে তিন-চারবার হিসাব মেলালেন, টাকা পয়সা গুণলেন। তারপর খানিক গুম খেয়ে থেকে হেসে বললেন, আমার ভুল হয়েছিল লোচন, দু পয়সা বেশি হচ্ছে ! এই নাও তোমার দু পয়সা।

একভাবে বেড়ে কমে বৃষ্টি চলেছে। জোরে বৃষ্টি নামায় দোকানে আটকে না গেলে বিনোদের কথাও ধরণীদের কানে যেত না, দাঁড়িয়ে লোচনের গল্প শোনারও সময় হত না। বৃষ্টি আবার ধরে আসায় যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ধরণী বলে, কিশোরীবাবু কিন্তু বললেন, তুমি নাকি খুব মেজাজ দেখিয়েছ, অভদ্র ব্যবহার করেছ। তুমি নাকি ওজনে কম দাও, খুঁজে পেতে সস্তা দরে খারাপ মাল আনো। তা যাই বলো, দোকানটা তোমার বড়ো নোংরা লোচন !

তারা তিনজন বিদায় হলে লোচন বিনোদকে এবং সাধারণভাবে উপস্থিত খদ্দেরকে উদ্দেশ করে বলে, শুনলে ? তাই আজ কিশোরীবাবু লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে সওদা নিয়ে গেলেন, আমি ভাবি ব্যাপার কী ! নিজে ভুল করলেন, নিজে চটাচটি করলেন, এখন খদ্দের ভাঙাচ্ছেন ! দুটা পয়সার জন্যে !

নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা

মেয়েটির নাম দুর্গা। নোটন মিস্ত্রির মেয়ে। নোটনেব আর একটি মেয়ে আছে, সেটি খুবই বাচ্চা, নোংরা স্যাঁতসেঁতে দাওয়ায় সবে হামা দিতে শিখেছে। মাঝে মাঝে গড়িয়ে আরও নোংরা ভেজা উঠানে পড়ে গিয়ে তারস্বরে চেঁচায়। ছেলেমেয়েদের উপর নোটনের ভালোবাসা কত সেটা বস্তির আর দশজনেরটা দিয়েই মাপা চলে, এদিকে আছে ওদিকে নেই, তলানি আছে ফেনা নেই, বস্তির নরম গরম ভোঁতা বাৎসল্য যেমন হয়। বয়সকালে দুর্গা একটু বেশি রকম তড়বড়িয়ে বেড়ে গিয়ে দশটা পুরুষের চোখে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠায় বাপের দায়িত্ব সম্পর্কে নোটনের চেতনাও তড়তড় করে বেড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। বাস্তব স্নেহের যা চিরকালেব রীতি। ছোটো মেয়েটার দাওয়া থেকে উঠানে গড়িয়ে পড়া নিবারণ করা অসাধ্য না হলেও অতটা আর পেরে ওঠা যায় না, ওটুকু পড়লে মেয়েটার ব্যথা পাওয়ার বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অনেক চোট জীবনে সইতে হবেই, এখন থেকেই নয় শিক্ষা শুরু হল, শক্ত হবে। পড়ে গিয়ে মরে যাবাব বা অন্তত হাত পা মাথাটা ভাঙবার ভয় থাকলেও নোটন উদাসীন না থেকে প্রতিবিধানের একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয় করত। যেমন বড়ো হলেও দুর্গাব সম্পর্কে তারা সচেতন হয়েছে। দুর্গার বুক পিঠ মাজা থেকে সমস্ত শরীরটা অল্পদিনে বর্ষাকালের কলাগাছের মতো পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে ওঠায মাবাত্মক বিপদেব আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গেল। বাপ হয়ে তখন মেয়ের দিকে নজর না দিয়ে সাবধান না হয়ে আর উপায় কী?

বস্তিতে পাপপুণ্যের, আত্মরক্ষা আব ধ্বংস হওয়ার সীমানা বড়ো সংকীর্ণ। বড়ো অস্থায়ী বস্তির মেয়ের এই পরম লোভনীয় দৈহিক ও মানসিক অবস্থাটি, যৌবনের প্রথম জোয়ারে থইথই করা দেখতে দেখতে দুদিনে শেষ হয়ে ভাঁটার টানে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে, এমনই ভয়ানক সেখানে খেয়ে পরে বাঁচার লড়াই। বাবুদের মতো তো নয় যে সামলে সুমলে ডাক্তার দেখিয়ে টনিক খাইয়ে শুইয়ে বসিয়ে হাসি তামাশা খেলাধুলো সিনেমা থিয়েটারে মন ভুলিয়ে বিশ-ত্রিশবছর পর্যন্ত পুষে রাখা চলবে। বস্তির গরিব উপোসি ঘরে রূপ যৌবন স্রেফ প্রকৃতিব খেলা, শুধু একবার দুদিনের জন্য, কুমারী মেয়ের মা হবার জন্য খাঁটি সাজসরঞ্জাম, সেইখানেই খতম। তাবপর শুধু কপালের জের টানা। অরাজক লুটের রাজ্যে তাই জগতের সমস্ত লোভ, মালিকবাবুদের লোভ পর্যন্ত, বস্তির মেয়ের দামি দুদিনকে লুট করতে ওত পেতে থাকে।

মেয়েকে আড়াল করে বাঁচিয়ে চলতে কী না করেছে নোটন। দুর্গার মার জ্বর হয়েছিল, তাই মেয়েকে সে একা বাবুদের বাড়ি জল তুলতে বাসন মাজতে পাঠিয়েছিল বলে মেরে সে তার পিঠের চামড়া আস্ত রাখেনি। তাড়াতাড়ি বিনোদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্থির করে ফেলেছে। মেয়ের জন্য দুর্গাব মার কোনো ভাবনা নেই এমন নয়, কিন্তু তার মন মেজাজ ভোঁতা হয়ে গেছে। কোনো বিষয়েই তেমন উৎসাহ পায় না। মেয়েটা ভালো থাক সে তো ভালো কথাই। একটু আধটু নষ্ট হলে কী আর কবা যাবে? একেবারে বিগড়ে খারাপ না হয়ে গেলেই হল। এমন করে আগলে রেখে কি স্বর্গ লাভ হবে?

মেয়েটাকে বাঁচিয়ে চলার ঝোঁকে, এমন রত্ন তার কুঁড়েঘরে আছে এই গর্বে, কতগুলি দিকে নোটন প্রায় মানুষ হয়ে উঠেছিল। নেশা করে হইচই হল্লার স্বভাব প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, কাজের পর তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে মনটা ছটফট করত। দুর্গার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সে আবিষ্কার করেছে মেয়েটা তার দেখতেই শুধু ভালো নয়, তার স্বভাবটাও বড়ো ভালো।

বস্তির অনাবৃত জীবন। বাপ-মা সজাগ সতর্ক থেকে মেয়েকে পাহারা দিতে পারে কিন্তু চারিদিকের লোভকে আড়াল করার সাধ্য কারও নেই। সেটা অন্তর নামক স্থানেই সম্ভব। সেটাই হয়ে

দাঁড়ায় সবচেয়ে বিপদ। মেয়ে টের পায় চারিদিকে তার জন্য বিপুল কামনা উদ্যত হয়ে আছে,—দুঃখ দুর্দশা লাঞ্ছনা অবজ্ঞা সওয়া মেয়ে ! জগতে হঠাৎ নিজের দাম এমন অদ্ভুতরকম চড়ে যেতে দেখে তার মাথা বিগড়ে যায়, সে দিশে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু দুর্গা তেমন নয়, সে মাথা ঠিক রেখেছে, তার নিজের মধ্যেই সামলে চলার ঝোঁক আছে। চোখ তুলে সে তার ছোটো জাতটির দিকে তাকায়, অনুভব করে এইবার যে মস্ত একটা বোঝাপড়া করবে বলে চারিদিকে জগৎ উদগ্রীব হয়ে আছে। নিজেরও এই ভাবনায় একটা অদ্ভুত সুখকর অস্থিরতা বোধের মধ্যে তার খেয়াল রাখতে ভালো লাগে না। বোঝাপড়া করলে সেই করবে, সেই বোঝাপড়া করা না করার মালিক। নিজের উপর তার এই মালিকানা স্বত্বকেই তার বাপ সযত্নে রক্ষা করেছে।

দুর্গা প্রাণপণে খাটে, বাপের যত্ন করে। সুখলালের উগ্র দৃষ্টি আর নোট দেখানো ইঙ্গিত নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় উপেক্ষায় চেয়ে দেখে, বুড়ি মাতঙ্গিনীর মারফত কে তাকে রাজরানির মতো সুখে রাখতে পাগল হয়েছে তার কাহিনি শুনে নাক সিঁটকোয়, অন্যদের ভাব জমানোর আলগা চেষ্টায় মুচকে হাসে, সরে সরে যায়।

রেশনে পেট ভরে না, শাড়িতে গা ঢাকে না, কোনও একটা শখ মেটে না, খাবার জলটুকুর জন্য নিত্য মারামারি করে প্রাণ যায়, শ্যাওলায় পাঁকে পায়ের হাজা কামড়ায়, আলোহীন বদ্ধ বাতাসে সারা গায়ের ঘামাচি চুলকানি হয়ে দাঁড়ায় তবু বস্তির মেয়েটার কাছে জীবন মিষ্টি মজাদার লাগে। বাপ কারখানায় খেটে আর মা বাবুদের বাড়ি বাসন মেজে দুটো পয়সা ভিক্ষা পায়, তাতেই !

এরই মধ্যে একদিন কারখানায় মেশিনে জখম হয়ে নোটন তার ঘরের খাটিয়ায় দীর্ঘকালের জন্য বিশ্রাম পায়। ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন কোম্পানি আমলেই আনে না, অকাট্য প্রমাণ খুঁজে বার করা হয় যে মাতাল অবস্থায় সম্পূর্ণ নিজের দোষে নোটন বিপদ ঘটিয়েছে, দুর্ঘটনার জন্য অন্য কেউ দায়ি নয়। তবু কোম্পানি দয়া করে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং কয়েকটা টাকার ব্যবস্থা করে দেয়। এই নিয়ে একটু গোলমাল হয় কিন্তু ঠিক ওই সময় বিরোধী একটা ইউনিয়ন গড়বার তোড়জোড় চলতে থাকায় সেই ডামাডোলে এটা চাপা পড়ে যায়।

ক-মাসে নোটন বিছানা ছেড়ে উঠবে, আবার কাজ পাবে, ঠিক নেই। শুধু দুর্গার মার ঝি-গিরির ভরসা। দু বাড়িতে সে ঠিকে কাজ করছিল, আর এক বাড়িতে কাজ নেয়—দুর্গা সাথে গিয়ে হাত লাগিয়ে কাজ খানিকটা এগিয়ে দিতে আসে। তবু শ্রান্তিতে হাত-পা প্রতিদিন ঝিমিয়ে আসে দুর্গার মার, এমনিতেই তার অবস্থা কাহিল হয়ে আসছে দিন দিন, আঁতুড়ে যাবার সময় ঘনিয়ে এল। আর কিছুদিন পরে কাজ করাই বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রথম বাড়িতে কাজ শুরু করেই দুর্গার মা তীব্র আক্রোশে চাপা গলায় ধমকাতে থাকে : হাত চালা হাত চালা, হারামজাদি ! খেয়ে খেয়ে হাতি হয়েছিস, হাত চলে না তোর ? বলে, খুচখুচ দুটো বাসন মেজে এক বালতি জল তুলে ঘর যাবার মন—বাপকে রেঁধে খাওয়াবেন।

দুর্গা আরও জোরে হাত চালিয়ে ঝেঁঝে বলে, আদ্দেকের বেশি কাজ করে দিই তোর ফের বলছিস ! তার চোখে জল আসে ! এক মুহূর্তের জন্য।

দু-একটাকা বেতন আগাম নিয়ে চাল আটা এনে কোনোমতে দিন চলে, দু-একদিন উপোস যায়। ঠিকে ঝিরা আজ আছে কাল নেই, বাবুরাও তাই হিসেব করে আগাম বেতন দেয়, কিছু পাওনা হাতে রেখে। নইলে হঠাৎ বিনা নোটিশে কাজ ছেড়ে দিলে বাড়ির মেয়েদের বাসন মাজতে হবে। পাঁচ-ছ তারিখের আগে গতমাসের পুরো বেতন শোধ করে না, বেতন পেয়ে হঠাৎ যদি কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়ি যায়, বাসন মাজতেই হয় বাড়ির মেয়েদের, পাঁচ-ছদিন এমনই খাটিয়ে নেওয়া গেছে ভেবে গায়ের জ্বালা অন্তত কিছুটা শোধ হবে ! গরিবের ওপর অগ্রিম প্রতিশোধ ব্যবস্থা।

নোটনের মুখ দাড়িগোঁফে ভরে গেছে, চোখ কোটরে ঢোকানো। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে ঝিম ধরা সুরে বলে, এক বাড়িতে এক মাইনেতে দুজনার খাটার দরকার ? তুই দু বাড়ি কাজ নে দুর্গা।

মা তিন বাড়ি সারতে পারে একা ?

এক বাড়ি নে। মিত্তি বাবুর বাড়িতে নে, ওদের কাজ হালকা।

মিত্তির বাড়ি ? মা ও বাড়ি নেক, আমি মার একটা বাড়ি ধরব।

তারা দুজনেই জানে এটা কাজের কথা নয়, মিত্রদের বাড়ি দুর্গার মাকে রাখবে না, মিত্রবাবুর দরকার দুর্গাকে। নোটন একদিন দুর্গাকে একা কাজে পাঠানোর অপরাধে দুর্গার মার পিঠের চামড়া তুলে দিয়েছিল, আজ সে দুর্গাকে একা ওই মিত্রদের বাড়িই কাজ নিতে তাগিদ দিচ্ছে। পঙ্গু অসহায় অবস্থায় বিছানায় পড়ে থেকে উপোস দিয়ে সেরে উঠে কাজে যাবার আশা সফল হবার অনেক আগে অনাহারে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখে আর কোনো হিসাব কি মানুষের থাকে ?

জীবনটা তিতো লাগতে শুরু করে দিয়েছে, কারণ দিগন্তে দেখা দিয়েছে আতঙ্কের কালো মেঘ। নোটন পঙ্গু হয়ে পড়েছে বলে শুধু নয়, আজ বাদে কাল তার মা আঁতুড়ে ঢুকবে বলেও নয়। বস্তি বাড়ির মজুরের মেয়ে কি আর বাবুদের বাড়ির মেয়ের মতো বাপ ভাই একমাত্র ভরসা করে থাকে ? বড়ো হয়েও যে ওদের কিছু হলেই সর্বনাশ ঘটে যাবে, কূলকিনারা পাবে না। যা হত শুধু দুর্ভাবনার বিষয় তাই আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে বিনোদের কারখানায় ছাঁটাই আর ধর্মঘটের জন্য ! কী কপাল দুর্গার ! ঠিক এই সময়টাতেই বিনোদের কারখানায় হাঙ্গামা শুরু হল, দুদিন সবুর সইল না। ঠিক যখনটা সে শেষ ধাপে পৌঁছেছে, এদিক বা ওদিক তাকে ঝাঁপ দিতেই হবে।

বিনোদ একলা মানুষ, সে এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে না পড়লে তার ভাবনা কী ছিল।

টুকিটাকি যে জিনিসগুলি বিনোদ তাকে গোপন উপহার দিয়েছে সেগুলি দুর্গা চুপিচুপি ঘাঁটাঘাঁটি করে। উনানে আগুন দিতে হয়নি সেদিন, ভাত রাঁধবার পাট নেই, শূন্য হাঁড়িতে শুধু জল ফুটলে কি ভাত হয় ? কী ছাই জিনিসগুলি চিরুনি, খোঁপার নকল ফুল, রঙিন কাঁচের চুমকি বসানো চুড়ি, পুঁতির মালা—এ সব দিয়ে কি পেট ভরবে মানুষের, পেটেব আগুন মনের আগুন নেভে ? মা ঘরের কোণে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কোঁকাচ্ছে। নোটন থেকে থেকে গাল আর শাপ দিচ্ছে মা মেয়ে দুজনকেই—জোয়ান মাগিরা এতকাল তার ঘাড়ে খেয়ে হাতির মতো মুটিয়েছে, দুদিন দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পাবে না। বড়ো মোড়ের দোকানটায় রেডিয়ো বাজছে শোনা যায়। এদিকে কানেব কাছাকাছি কে যেন তীক্ষ্ণসুরে প্রাণপণে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে।

মা কী বলেছিল দুর্গা শোনেনি, তার বাপ মা তুলে গাল দিতে নোটন আধ-শোয়া অবস্থায় হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে মাটির ভাঁড়টা ছুঁড়ে মারে। ভাঁড়টা ছিল দইয়ের, দুর্গার মা-ই তার এক মনিব বাড়ি থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। ভাঁড়টা নোটনের কফ থুতু ফেলার কাজে লাগছিল।

কচি মেয়েটার মাথা কেটে রক্তপাত করিয়ে ভাঁড়টা মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে যায়।

দুর্গার মা বলে, এত রাতে যাচ্ছিস কোথা শুনি ?

যাচ্ছি চুলোয়

নোটন আশান্বিত হয়ে বলে, যাক না যাক। যেতে দাও।

বিনোদও খাটিয়ায় শুয়ে অল্প অল্প কোঁকাচ্ছিল, কারখানার দরজায় পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেয়েছে। রাগে ক্ষোভে উত্তেজনায় দুর্গা তখন কাঁপছে, কারও কোঁকানি শোনার মতো অবস্থা তার ছিল না।

শুনছ ? আজ শেষ কথা বলো। এই দণ্ডে বলো।

কীসের শেষ কথা বিনোদ জানে। ক-দিন আগেও দুর্গার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গেছে। সে নিঃশব্দে দুর্গার বিস্ফারিত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার শুকনো শীর্ণ মুখ আর আলুথালু বেশ দেখতে দেখতে নিজেকে বিনোদের বড়ো দুর্বল, অসহায় মনে হয়।

তুমি ধর্মঘট চাও, না মোকে চাও ?

আবার কী হল ?

হয়নি কিছু। শেষ কথা বলে দাও, আমি আমার পথ দেখি।

বিনোদ চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবে।

তোকে চাই দুর্গা।

তবে যাও সুখলালের ঠেয়ে, আপস করে এসো গে। টাকা নিয়ে খাবার কিনে আনো। আমি সারাদিন খাইনি, ভাইবোন খায়নি।

বিনোদ বলে, আচ্ছা তুই বাড়ি যা দুর্গা, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

দুর্গা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। এবার এতক্ষণে মানুষটা তার চোখে পড়েছে।

তোমার কী হয়েছে শুনি ?

বিনোদ তীব্র গলায় ঝেঁঝে ওঠে, কী হবে, পিটুনি দিয়েছে। যা তুই বাড়ি যা।

খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দুর্গা নরম গলায় শুধোয়, তুমি একা আপস করলে কী হবে ?

বিনোদ কথা কয় না। ঘরের কোনার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে।

তখন সেইখানে দাঁড়িয়ে দুর্গা আবার মনে মনে হিসাব করে। উলটে-পালটে বিবেচনা করে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা। ঘাড়টা তার একটু কাত হয়ে আসে ভাবনার দাপটে। ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়, কী আর এমন লাভ হবে এই লোকটাকে আর তার লড়াইটাকে ভেঙে দিয়ে ? কোন স্বার্থটা বজায় থাকবে তার ? তার চেয়ে কোনোরকমে সেই যদি চালিয়ে নিতে পারে কিছুদিন সেও রইল তার এই মানুষটাও রইল, তাদের ভবিষ্যৎটাও রইল।

আজ তবে বরং থাক। কাল এসে ফের বিবেচনা করা যাবে।

কী বল অ্যাঁ ?

আজ কী খাবি তোরা ?

চলে যাবে ! মা জোগাড়ে গেছে।

বিনোদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে দুর্গা সুখলালের আস্তানার দিকে এগোয়। যে সুখলাল কালও তাকে বড়ো বড়ো চোখে দেখেছে, নোট দেখিয়েছে। বাঁচতে হলে লড়াই না করে উপায় কী ?

জীয়ন্ত

জীয়ন্ত প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

এক

১

নয়নতারা ক্লাব ও পাঠাগারের বড়ো হল ঘরটাতে আজ সন্ধ্যায় একটি সভা বসেছে। গোড়ায় এটির নামকরণ হয়েছিল স্থানীয় একজন প্রবল প্রতাপান্বিত ম্যাজিস্ট্রেটের নামে, যদিও স্বর্গীয়া নয়নতারার উপযুক্ত ছেলে ভৈরবই চাঁদা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি—দি ব্যাগুেন পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাব। ক বছর আগে একুশ সালে বাংলা ঘুরবার সময় গান্ধীজি ঘণ্টা তিনেকের জন্য এখানে পদার্পণ করে এক স্তূপ বিলাতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যান, সেই আগুনে পুরানো নামটি পুড়ে এই নাম হয়েছে।

ক্লাব শব্দটাকে বদলে সংঘ করার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু মতভেদ ঘটে। সংঘ বলতে নাকি রাজনৈতিক গন্ধ এসে যায় ! বিশেষ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যেই সংঘ কবা হয়, এই শহরেই যেমন দু-তিনটি আছে। এটা হল বিশুদ্ধ ক্লাব, দশজন ভদ্রলোকের মেলামেশা গল্পগুজব খ্রি: খেলার এবং মাঝে মাঝে তরুণদের সহযোগিতায় পূজাপার্বণ অভিনয় ইত্যাদি আনন্দ করার স্থান। অনর্থক রাজনীতির গন্ধওয়ালা সংঘ নামে দরকার কী ?

তবে লাইব্রেরিকে পাঠাগার করতে কারও আপত্তি হয়নি। ভৈরবের ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে নিজের নামটা জুড়ে দেবে। চেষ্টা করলে হয়তো পারত। দুটি কারণে ভরসা হয়নি। ব্যাগুেন সায়েব উঠতে উঠতে তখন অনেক উঁচুতে উঠে সশরীরে বর্তমান, নাম খারিজের জন্য তার রাগটা নিজের উপর নেওয়া উচিত হত না। তা ছাড়া ব্যাগুেনের বদলে নিজের নামটা দিলে লোকেও গোলমাল করত। হয়তো পালটা প্রস্তাব করত মৃত বা জীবিত কোনো স্মরণীয় স্বদেশি নেতার নাম দিতে। তখন আর না বলার পথ থাকত না, ভৈরব নিজেও তো স্বদেশি ! তার চেয়ে মার স্মৃতিরক্ষা করে ভালো হয়েছে। চারিদিক বজায় থেকেছে।

হঠাৎ ডাকা জরুরি সভা, সভ্যেরা কিন্তু গাদাগাদি করে এসেছে। শহরের উকিল ডাক্তার চাকুরে পেনশনভোগী ভদ্রলোকেরা। ঘর জোড়া মস্ত লম্বা টেবিলের চারিদিকে ঘিরে বসেছে প্রায় পঞ্চাশজন বিশিষ্ট সভ্য। কয়েকজন সাধারণ ও অল্প-বিশিষ্ট সভ্যকে দেয়াল ঘেঁষে বেঞ্চি পেতে বসতে দেওয়া হয়েছে, তারা কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে। এদের মধ্যে অনেকে হয় সময়মতো এসে চেয়ার বা বেঞ্চ দখল করতে পারেনি, অথবা মুরুব্বি গোছের বিশিষ্ট মানুষ দেখে সবিনয় হাসির সঙ্গে আসন ছেড়ে দিয়ে ভদ্রতারক্ষা ও আত্মরক্ষা করেছে। বাইরের বারান্দার দুটি বড়ো বড়ো দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল ছেলে।

একটি ছেলে বসে আছে ঘরের মধ্যে, টেবিলের একমাথায় মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে চেয়ারে। বাড়ন্ত গড়নের একটু কাঠখোট্টা চেহারা ছেলেটির, বয়স অনেক বেশি মনে হয়। মুখে বয়সের ছাপটা ঠিক ধাঁধার মতো, আদুরে কচিছেলের ঢলঢল কোমলতার সঙ্গে এমন খানিকটা পাকা বখাটে ভাব মিশে আছে যে, তার মধ্যে যখন যেটা চোখে পড়ে সেটাকেই খাপছাড়া মনে হয়। ছেলেটির নাম প্রকাশ, হাইস্কুলে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে। এই প্রকাশ্য সভায় আজ প্রকাশের এক গুরুতর অপরাধের বিচার হবে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হবে। শাস্তি যা দেবার সেটা অবশ্য ভৈরব নিজেই দেবে ; তার ভাগনের কান মলতে বা তাকে বেত মারতে অন্য কেউ হাত তুললে সেটা উলটে হবে ভৈরবের অপমান। ভৈরব না নিয়ে এলে এ বেসরকারি আদালতে বজ্জাত

ছোঁড়াকে বিচারের জন্য হাজির করবার ক্ষমতাই বা ছিল কার? ভৈরব ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হত। ভৈরব নিজেও টের পেত এত বড়ো ব্যাপারটা উপেক্ষা করার মজা।

ভৈরব আর ভুবনের মধ্যে আছে সামাজিক মান কষাকষি। মান থেকে মন। যারা ভুবনের কাছে বসেছে, নিচুগলায় জোর দিয়ে তারা বলে, সহজে ছাড়বেন না কিন্তু। ঘা টা যেন ভৈরবেরও লাগে। তফাত থেকে উঠে এসেও দু একজন তাকে প্রায় এই কথাই বলে যাচ্ছে। আগেও অনেকবার বলেছে।

তাই কি ছাড়ি ?—ভুবন বলেছে মৃদু হেসে।

প্রকাশ কী শাস্তি পাবে না পাবে তা নিয়ে ভুবনের খুব বেশি মাথাব্যথা নেই, যে কোনো একটা শাস্তি পেলেই হল। আসলে শাস্তি যা পাবার এখন থেকেই পাচ্ছে ভৈরব, তাতেই ভবন খুশি। শহরের দশজন ভদ্রলোকের সামনে প্রকাশ্যভাবে ভৈরবকে যে অপদস্থ হতে হচ্ছে, মাথা তার হেঁট হয়ে যাচ্ছে, এটাই ভুবনের আসল লাভ। শুধু ক্ষমা চাওয়ার মধ্যেও যদি শেষ হয় ব্যাপারটা, সে ক্ষমা চাওয়া হবে ভৈরবেরই। এমন গণ্যমান্য মামা হাজির থাকতে স্কুলের একটা ছেলের আবার কীসের ক্ষমা চাওয়া, বিশেষ করে এ রকম সভায় ! শুধু ওই ছোড়া হলে, স্কুলে হেডমাস্টারকে জানালেই সোজাসুজি ওর শাস্তি হত। এত কাণ্ড করবার দরকার কী ছিল তবে !

টেবিলের উত্তর পাশের লম্বা সারির মাঝামাঝি গম্ভীর মুখে বসে আছে ভৈরব। মাথা তার হেঁট নয়, মুখে লজ্জা বা অপমানের চিহ্নও নেই। তবু তার দিকে চেয়ে খুশি হয়ে উঠছে ভুবন। সভার কাজ একবার আরম্ভ হলে হয়। সব তার বেডি করাই আছে। ক্লাবের সভ্য তিনজন ভদ্রলোককে দিয়ে সে জোর গলায় ঘোষণা করবে, প্রকাশের অমার্জনীয় অপরাধের পেছনে ভৈরবের পরামর্শ ছিল, উসকানি ছিল। মৃদু ক্ষমার সুরে তারা উল্লেখ করবে ছেলেটির অল্প বয়সের কথাটা, পিছনে খুঁটি না পাবলে কি এত সাহস হয় এইটুকু ছেলের ! ইঙ্গিতের পর ইঙ্গিত ছড়াবে নানা কৌশলে যে আসল অপরাধী ভৈরব। অনেকের মন বিষিয়ে যাবে, তিতো হয়ে উঠবে লোকটার বিরুদ্ধে। অনেকে বিরক্ত হবে।

একটা ব্যাপার শুধু ভালো লাগছে না ভুবনের। মনে বড়ো একটা খটকা লেগেছে তার। কলকাতা থেকে অনন্তলালের কাল মফস্বলের এই শহরে এবং আজ এই সভায় হঠাৎ আবির্ভাব। এই শহরেরই সে ছেলে, আত্মীয়স্বজনেরা এখনও তার পুরানো ভিটে দখল করে বসবাস করছে। ভৈরবের সঙ্গেও বুঝি প্যাঁচালো একটা কী সম্পর্ক আছে তার। পরীক্ষা পাসের কৃতিত্বে অনন্ত এ শহরের মুখোজ্জ্বল করেছিল , শহরের মুখ সে আরও উজ্জ্বল করেছে ব্যারিস্টারিতে অল্পসময়ে অসাধারণ পশার জমিয়ে এবং গত আন্দোলনে যোগ দিয়ে নেতা হিসাবে নাম করে। নাম ও সম্মান তার আরও বেড়েছে আইন সভার ইলেকশনে দাঁড়িয়ে। শহরে তার পদার্পণের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে, শহরবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা সভার আয়োজন তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা হচ্ছে। আগে থেকে উপযুক্ত সংবর্ধনার আয়োজন গড়ে উঠবার যথেষ্ট সময় না দিয়ে, কোনো খবর না দিয়ে এমন আচমকা তার কলকাতা ছেড়ে এখানে আসবার মানে হয়তো কল্পনা করা গেলেও যেতে পারত। বিশেষত যখন সস্ত্রীক এসেছে। এটা তার দেশবাড়ি, যতই রোজগার করুক আর উপরে উঠুক, দেশবাড়িতে বেড়াতে আসবার শখ কি মানুষের হয় না ? কিন্তু বিনা নোটিশে, বিনা সংবর্ধনার আয়োজনে, এমন কী, বিনা আহ্বানে সে এ সভায় আসে কেন ? এটাই উদ্ভট ঠেকছে ভুবনের কাছে।

কথা বলছে প্রায় সকলেই, পরস্পরে অথবা একজন কয়েকজনকে শুনিয়ে। তবু সভা যেন সংহত, সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে টের পাওয়া যায়। সকলের মধ্যে প্রত্যাশা ও আগ্রহের ভাবটা স্পষ্ট। এলোমেলো ভাব কেটে গিয়ে সভা এবার থমথম গমগম করছে। সভার কাজ আরম্ভ হলেই সকলে চুপ করে সেদিকে মন দেবে, গমগম চাকের গুঞ্জন থেমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

গোড়ায় বুড়ো শিবকালী সরকার মশায়কে সভাপতি করা হবে ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব উলটে পালটে গেল।

সভাপতি হবার জন্য বুড়ো শিবকালীবাবুর নাম প্রস্তাব করার ঠিক কয়েক সেকেন্ড আগে অনন্তলাল উঠে দাঁড়ায়। সানন্দ হাসিমুখে একবার সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে ঘরের লোকের মতো সহজ সুরে বলে, সভার কাজ এবার আরম্ভ করা যাক, কী বলেন আপনারা ? মিছামিছি দেরি করে লাভ কী ! তা ছাড়া আমার ওপর হুকুম জারি হয়েছে যে এখান থেকে ফিরবার পথে বসন-সংঘ হয়ে যেতে হবে। ওঁরা নাকি সারাদিনের কাজকর্মের পর সাতটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত চরকা কাটেন, দুটো তাঁত বসিয়েছেন। দেশ-গাঁয়ে ফিরে জানাশোনা চেনা মানুষের এমন একটা বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্র যদি না দেখে যাই, আজ আমার ঘুম হবে না নিশ্চয়।

হাসি মুখ, শান্ত নির্বিকার। এখন মোটে সওয়া সাতটা, এগারোটা বাজতে অনেক দেরি। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। একুশ-বাইশের আন্দোলনের জোয়ার কেটে ভাটা এসেছে অনেকদিন, মানুষের মনে বড়ো হতাশা, বড়ো ব্যাকুলতা। আশেপাশে কিছুই ঘটছে না, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আগামী নির্বাচনে ভৈরব আর ভুবনের লড়াই ছাড়া। এখন একমাত্র ভরসা তো অনন্তলালের মতো মানুষেরা, যদি তারা কিছু করতে পারে !

সভার আবহাওয়ায় কেমন একটা পরিবর্তন আসে। টেবিলের পুব-পশ্চিম কোণে কয়েকজন কী বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। ভুবন অবস্থাটা অনুমান করে তাড়াতাড়ি শিবকালী সরকার মশায়কে সভাপতি করার ব্যবস্থা করে ফেলবার জন্য উঠতে না উঠতে ওদিকের কোণ থেকে মনোমোহন ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমাদের বড়ো ভাগ্য যে অনন্তবাবুর মতো লোককে অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে আমরা আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি। আমি অনন্তবাবু বললাম, যদিও অনন্ত বলাই উচিত ছিল, কারণ ছেলেবেলায় একদিন ওর সঙ্গে এই শহরে ধুলোমাটি মেখে খেলা করেছি, তুই-তুকারিও করেছি, যদিও অনন্ত আমার দু-তিন ক্লাস নীচেই পড়ত। কিন্তু নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় উনি আজ এমন স্তরে উঠে গেছেন যে ধুলোমাটির খেলার সাথিদের কাছেও উনি মহাপুরুষ। যাই হোক, আমি লম্বা বক্তৃতা দেব না, সভাপতির নাম প্রস্তাব করতে উঠে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলে আপনারাও হাসবেন। যাই হোক, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে আমরা যখন ভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত অনন্তবাবুকে আজ আমাদের এই সভায় পাইয়াছি, তিনি আজ সভাপতিত্ব করিয়া আমাদের বাধিত ও আনন্দিত করিবেন।

আধবুড়ো শ্রীধর উকিল উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব সমর্থন করে বলে, আমি সর্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। সত্য কথা বলিব কী, আমার প্রাণটা কেমন যেন আনচান করছে। সময় বয়ে যায়, কালস্রোতের মতো। আজ যে শিশু, কাল সে বালক, পরশু তরুণ, পরদিন সে আবার বৃদ্ধ, আমারই মতো মরণের প্রতীক্ষায় ধুঁকছে। কিন্তু জীবন কী ? মরণ কী ? কেহ কি কোনোদিন তাহা জানিয়াছে ? হাঃ, হাঃ, হাঃ ! ও সমস্যার সমাধান নাই। একমাত্র সত্য—কর্ম। সেই কর্মের প্রতীক আমাদের এই অনন্তলাল। কর্মণ্যেবাধিকার বলিয়া যে একমাত্র সার্থক মন্ত্র আছে, জগতে সেই মন্ত্রের সাধক, ভবিষ্যৎ মহাপুরুষ।...

শান্ত সমাহিত স্তব্ধ সভা। অনন্ত উঠে দাঁড়ায়। আপনজনের মতো মৃদু হাসি আর শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আবার তাকায় চারিদিকে। বলে, আমায় কী বিপদে ফেললেন বলুন তো ? এতদিন পরে ফিরে এলাম, কোনো কিছু জানি না, আমাকেই করে দিলেন সভাপতি ! আপনাদের স্নেহ প্রীতির সম্মান আমি তুচ্ছ করব না। ভুলচুক হলে দায়ি কিন্তু আপনারা।

অনন্ত বসে, ভুবন ও তার অনুগতদের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হয়। ভুবন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, একটা গুরুতর, অতি গুরুতর বিষয়ে এ সভা ডাকা হয়েছে। সভাপতি মহাশয় অনুমতি দিলে—

অনন্তও উঠে দাঁড়ায়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে সংযত করার ভঙ্গিতে দুহাত তুলে বলে, নিশ্চয়। নিশ্চয়। এবার সভার কাজ আরম্ভ হবে। এই ছেলেটির দুষ্টামির—

দুষ্টামির। ভুবন গর্জন করে ওঠে, আমাকে আগে বলতে দিতে হবে। আমি ব্যাপারটি সভায় উপস্থিত করতে চাই।

অসহায় হতাশভাবে অনন্ত এদিক ওদিক সকলের মুখের দিকে তাকায়, ভুবনের বাহাদুরিতে, গর্জনে, সে বড়ো বিব্রত, বিরক্ত, আহত হয়েছে। ভুবনের দিকে চেয়ে জোর গলায় কিন্তু বিনা গর্জনে সে বলে, সবাই বলবেন, যার যা কিছু বলার আছে। কিন্তু হইহই রইরই হলে তো আমি এখানে থাকতে পারব না। একটা সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হইচই আমার বিশ্রী লাগে, কুৎসিত লাগে। দেশের সব কাজ করা যখন বাকি আছে, দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করা—

তিন দরজায় জমায়েত ছেলেরা উল্লাস জানায়। ভুবন হঠাৎ চমকে ওঠে। সভা আবার থমথম গমগম করে।

আমি বলি কী, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অনন্ত বলে, যে ছেলেটির বিচারের জন্য আমরা জমা হয়েছি, তাকেই আগে তার যা কিছু বলার আছে বলতে দেওয়া হোক। এটা নিশ্চয় ইংরেজের আদালত নয়, যেখানে স্বরাজ চাই বলেছিলাম প্রমাণ হতে না হতে আমার ছমাস জেল হল ? ছেলেটি আগে বলুক, দোষ করেছে কী করেনি। যদি স্বীকার না করে, তখন দোষ প্রমাণ করার ফ্যাসাদটা বাধ্য হয়েই মানতে হবে। কিন্তু সব যদি মেনেই নেয় ছেলেটি, মিছামিছি হাঙ্গামা করে কী লাভ ! একটি স্কুলের ছেলে, অবুঝ ছেলে, একটা কাজ করে বসেছে বলে তার বিরুদ্ধে এমন একটা কাণ্ড করা আমার কাছে বড়ো লজ্জার বিষয় মনে হয়। পাকা, আই মিন, প্রকাশ, উঠে দাঁড়িয়ে বলো তো তোমার কী বলার আছে ?

প্রকাশ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, আমি স্বীকার করছি যে আমার দোষ হয়েছিল। রাখালবাবুকে মারা আমার উচিত হয়নি। এক বছর ধরে চাওয়া মাত্র ওই বইগুলি রাখালবাবু আমাকে দিয়েছেন—

কোন বইগুলি প্রকাশ ? অনন্ত প্রশ্ন করে।

পাকা চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকে।

খানিক চুপ করে থেকে অনন্ত আর একবার আরও স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করলে প্রকাশ মরিয়া হয়ে বলে, কতকগুলি উপন্যাস আর সেক্সের বই।

কী কী বই ? অনন্ত প্রশ্ন করে।

আগে থেকে শেখানো-পড়ানো আছে, তবু প্রকাশ এবার রেগে যায়, আপনি জানেন না ?

অনন্ত ধমক দিয়ে বলে, আমার জানার কথা হচ্ছে না প্রকাশ। তুমি কী জান বলো।

প্রকাশ একটু চুপ করে থেকে কলের মতো বলে যায়, পঁচিশ-ছাব্বিশখানা খারাপ ধরনের বই লাইব্রেরিতে আছে। আর সেক্স-সাইকোলজির কুড়ি-বাইশটা বই আছে। সেক্রেটারির পারমিশন ছাড়া ও সব বই ইস্যু করা বারণ। আমি আজ এক বছর বিকেলে খেলা বন্ধ করে এসে রাখালের, মানে, রাখালবাবুর কাছ থেকে এ সব বই নিয়ে পড়েছি, নটার আগে ফেরত দিয়ে বাড়ি চলে গেছি। সেদিন স্যান্ডার্সের প্রিন্সিপলস্ অব লাভ বইটা চাইতেই কোথাও কিছু নেই খেঁকিয়ে উঠে রাখাল বলল, যা যা ফচকে ছোঁড়া, লভের বই পড়তে হবে না।

ফচকে ছোঁড়া বলেছিল রাখালবাবু তোমাকে ?

লাইব্রেরিয়ান রাখালের বয়স কুড়ি-বাইশ, অনেকদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। ভুবনের বাড়িতে সে থাকে। তার তীক্ষ্ণগলার প্রতিবাদ শোনা যায়।

আমি যদি বলে থাকি—

অনন্ত বলে, আপনি চুপ করুন।—বলেছিল ?

বলেছিল। আরও বলেছিল, আমার মামা এবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশনে হেরে যাবে, চামারটাকে কেউ ভোট দেবে না। তাইতে রাগ সামলাতে না পেরে আমি ওকে মেরেছি। একটা ঘুষি আর লাথি খেয়েই যে মরোমরো হয়ে হাসপাতালে যাবে, আমি তা ভাবতে পারিনি।

চুপ করো প্রকাশ ! অনন্ত প্রচণ্ডভাবে তাকে ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সভাকে সে বলে, ছেলেটা লজ্জায় দুঃখে ভয়ে ভাবনায় আধমরা হয়ে গেছে। প্রকাশ ! তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে।

বাখালকে, মানে রাখালবাবুকে মারার জন্য আমি ভারী দুঃখিত।

বাস্ ! বাস্ ! অনন্ত সোল্লাসে বলে ওঠে, রাখালবাবুর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আবার গড়ে উঠবে নিশ্চয়। অন্যায় করার দুঃখই তোমার নবজন্ম দিক। বন্দে মাতরম্ !

কী ঘটনা কীসে দাঁড়াল ! ব্যাপারটার আসল ও গুরুতর অংশটাই রয়ে গেল আড়ালে, চাপা পড়ে গেল। প্রকাশ যা বলল তা মিথ্যে নয়, বানানো নয়, কিন্তু যা নিয়ে আজকের এই সভার এত আড়ম্বর এটুকু তার তুচ্ছ একটা দিক মাত্র। আসল ঘটনা সকলের জানা, সেটাকে আরও ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তুলে ভৈরবকে সভায় অপদস্থ করার যে আয়োজন ভুবন করেছে তাও প্রায় কারও অজানা ছিল না। পাহাড়কে এ ভাবে ইঁদুর বিয়োতে দেখে অনেকে কৌতুক বোধ করল। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে জমকালো নাটক দেখতে এসে শুরুতেই অভিনয় ফেঁসে যেতে দেখার মতো ব্যক্তিগতভাবে বঞ্চিত হবার ক্ষোভও অনুভব কবল অনেকে। তবে এটাও ভাবল অনেকে যে, অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। অনন্তের কৃতিত্বে কমবেশি মুগ্ধ হয়ে গেছে সকলেই। অনায়াসে হাসিমুখে খেলার ছলে সে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এমন একটা মান্যগণ্য জমায়েতের মনের গতির ! এমন না হলে এত কম বয়সে ব্যারিস্টারিতে এত পশার, নেতাগিরিতে এমন নাম করতে পারে কেউ !

দু-চারজনের ক্ষীণ এবং ভুবনের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ আর অভিযোগ সভাভঙ্গের বিশৃঙ্খলায় কোথায় ভেসে যায়। চেয়ার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অনন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে সভা ভেঙ্গে দিয়েছে। অনেকে তাড়াতাড়ি উঠে কাছে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ভুবন অসহায় ক্রোধে অগত্যা নিজে নিজেই ফোঁস ফোঁস করে নিজের লোকের কাছে।

পাকা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল অনন্তের দিকে। চোখে তার ধাঁধা দেখার অবাক জিজ্ঞাসা। এখন মুখ দেখলে মনে হবে, ছেলেটা বুঝি হাবাগোবা, ভাবুকতা আর পাকামির মেশানো ছাপটা মিলিয়ে গেছে। অনন্তের বাহাদুরি তাকে মোটেই মুগ্ধ করেনি, ওটা বাহাদুরিও হয়ে ওঠেনি তার কাছে, অন্য একটা শব্দ এসেছে মনে সংজ্ঞা হিসাবে—চালবাজি—তার মনে আঘাত লেগেছে কঠিন। ছেলেবেলা থেকে এই মানুষটাকে সে বোধ হয় অন্য সবার চেয়ে ভয় ও ভক্তি করে এসেছে, তার কাছে অনন্ত অনেক উঁচু, অনেক বড়ো দৃঢ়চেতা কর্তব্যনিষ্ঠ চরিত্রবান মানুষ। সে যে এমন ছল-চাতুরী অভিনয় জানে, দেশ ও স্বাধীনতার নামে ফাঁকি দিয়ে বোকা বানাতে পারে এতগুলি মানুষকে এমন গা-ছাড়া অবহেলার সঙ্গে এ কথা সে ভাবতেও পারত না। হাঙ্গামা যে অল্পেই মিটে গেছে এ জন্য তার বিশেষ দুঃখ নেই, কিন্তু কী দরকার ছিল এ ভাবে অল্পে হাঙ্গামা মেটাবার ? একটুখানি সত্য নিয়ে পাক দিয়ে চালাকি করে এমন মিথ্যা খাড়া করবার ? তেমন গুরুতর প্রয়োজন থাকলেও সে নয় বুঝতে পারত এ রকম ঘোরপ্যাঁচ চালবাজির মানে। বিশেষ বই ইস্যু করা নিয়ে রাখালের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু ফচকে ছোঁড়া বলার জন্য সে তাকে মারেনি। সে নিজেও কতবার কত বন্ধুকে বলেছে কথাটা। ভুবন এসে রাখালের পক্ষ নিয়ে তাকে ধমক দেওয়ায় তার মেজাজ বিগড়ে যায়। রাগারাগি করে সে চলে গিয়েছিল, ভৈরবকে দিয়ে একখানা স্লিপ লিখিয়ে এনেছিল। ভৈরব অবশ্য জানত না সে কী বই চায় কিংবা তার স্লিপেব জোরে লাইব্রেরি থেকে সে একেবারে

পঞ্চাশ-ষাটখানা বিশেষ বই দাবি করে বসবে ! মামার সঙ্গে এ ছলনাটুকু সে করেছিল। রাখালের সঙ্গে ঝগড়ার কথা, নিজের আসল মতলবের কথা গোপন রেখে সরলভাবে চিটটা চেয়ে নিয়েছিল। প্রকাশ্য সভায় এটা মেনে নিতেও রাজি ছিল প্রকাশ। কিন্তু সে যা করেছে, করেছে তার নিজের মামার সঙ্গে, মামাকে যদি সে ঠকিয়ে থাকে তাই নিয়ে বোঝাপড়া হবে মামার সঙ্গে তার, এর সঙ্গে অন্যের তো কোনো সংস্রব নেই। রাখাল কোন সাহসে কী যুক্তিতে স্লিপ দেখেও বইগুলি তাকে দিতে অস্বীকার করবে, মামা তার ক্লাব আর লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট ? ভৈরবের চিট নিয়ে এলেও ভুবনবাবু এবং আরও কয়েকজন কোন আইনে রাখালের পক্ষ নিয়ে তাকে ধমকাতে আসবে ? বারবার সে জোর দিয়েছিল এই কথাটাতে। রাগে কাঁপতে কাঁপতেও ধীর শান্ত ভদ্রভাবে সকলকে সে বলেছিল, প্রেসিডেন্টের লিখিত অনুমতি সে নিয়ে এসেছে, লাইব্রেরি থেকে যে বই খুশি, যতগুলি বই খুশি নিয়ে যাবার অধিকার তার আছে। এার সঙ্গে তর্ক না করে পরে যেন তারা তার মামার সঙ্গে বোঝাপড়া করে। এরই মাঝে বলা নেই কওয়া নেই রাখাল তাকে দিয়েছিল ধাক্কা। তখন সে মেরেছিল রাখালকে। ভুবনদের সামনেই মেরেছিল।

বাড়িতে আলোচনার সময় অনন্ত বলেছিল, ওরা বলবে তুমি আগে রাখালের গায়ে হাত তুলেছিলে, জোর করে আলমারি ভেঙে বই নিতে গিয়েছিলে।

আমার বন্ধুরা ছিল, তারা দেখেছে—

অনন্ত ঘাড় নেড়েছিল।

তা ঠিক। পাকা তা জানে, মানেও। তার বন্ধুদের, বিশেষ করে কানাই তিনু পাঁচু নবেশদেব কথার বিশেষ দাম কেউ দেবে না। এটুকু না বুঝবার মতো বোকা সে নয়। হাঙ্গামা করার জন্য, রাখালকে মারার জন্য সে যে সত্যি সত্যি বন্ধু চারটিকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি, এরা শুধু বইগুলি বয়ে আনার জন্য সঙ্গে গিয়েছিল, কেউ যে ওরা একটি কথাও বলেনি আগাগোড়া, রাখালকে মারার সময় কাছে পর্যন্ত যায়নি, কেবল ভুবনবাবুরা সাত-আটজন রুখে তেড়ে এলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কী আসত যেত তাতে ? লোক নয় বিশ্বাস করত দল বেঁধেই সে হাঙ্গামা করতে গিয়েছিল, রাখালকে মেরেছিল। রাখালকে মেরেছে এ কথা তো সে অস্বীকার করতে চায়নি, সে জন্য সভায় দুঃখ প্রকাশ করতে সে রাজি হয়েছিল অনন্তের কাছে, দুঃখ প্রকাশও করেছে। ভুবনবাবুরা তার গুরুজনের মতো বয়সে বড়ো মান্যগণ্য ভদ্রলোক, একটা অন্যায় কথা না বলে থাকলেও তার ব্যবহারকে বেয়াদপি মনে করে ওদের মনে যদি আঘাত লেগে থাকে, ওদের কাছেও সে নয় দুঃখ প্রকাশ করত !

তার বদলে বিশ্রী দোষে সে দোষী হল, ভীরু কাপুরুষ দাঁড়িয়ে গেল সবার চোখে। সে যে মামার কাছ থেকে স্লিপ নিয়ে এসেছিল, সে কথা উঠল না। সবাই জানল, রাখাল তাকে দয়া করে কিছুদিন লাইব্রেরির বই পড়তে দিয়েছিল, অনুগ্রহটা বন্ধ করায় হীন অকৃতজ্ঞ বখাটে ছোঁড়া সে, দল বেঁধে এসে রাখালকে মেরেছে। রাখাল তাকে গাল দিয়েছিল, এ সব বাজে সাফাই গেয়ে আজ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে।

আরও জানল সবাই, অনন্তের কুটিল ব্যারিস্টারি চালবাজির ফলে সহজে রেহাইও পেয়েছে।

সে সভায় না এলে যেন কেউ তার কিছু করতে পারত, কোর্টে নালিশ করা ছাড়া।

ভৈরব পারেনি, অনন্ত তাকে রাজি করিয়েছিল। তাও ক্ষমা চাইতে নয়, দুঃখ প্রকাশ করতে। রাখালের জন্য তার সত্যই দুঃখ হয়েছিল, মার খেয়ে তাকে এলিয়ে পড়তে দেখে খেয়াল হয়েছিল, কী রোগা দুর্বল একজনকে সে মেরেছে। অনন্ত সকলকে বোকা বানিয়েছে, তাকেও ঠকিয়েছে। কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে কী জবাব দেবে, অনন্ত যখন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তখনও সে বুঝতে পারেনি তার আসল মতলব। সে ভেবেছিল এমনি জিজ্ঞাসাবাদের ভেতর দিয়ে আজেবাজে কথা বাদ দিয়ে

অনন্ত যেটা আসল কথা, প্রধান কথা সমস্ত ব্যাপারটার, যা সত্যিকারের মানে তার কাজের, তাই টেনে বার করবে ; দেখিয়ে দেবে যে তার অধিকার ছিল বই দাবি করার, তবে রাখালকে মারা তার উচিত হয়নি।

খারাপ লাগছে, না ? মুন্সেফ সুরেনবাবু কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে। শান্ত স্নিগ্ধ মিষ্টি তার মুখখানা, একটু শীর্ণ। সুন্দর কীর্তন গাইতে পারে। এখানে বদলি হয়ে এসে কয়েক মাসের মধ্যে শহরের শিক্ষিত ভদ্রসমাজকে কীর্তন শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এমনি তার কথাবার্তা চালচলন বা খাওযা পরা জীবনযাপনে বৈষ্ণবত্বের কোনো লক্ষণই প্রায় ধরা পড়ে না, মাছমাংস খায়, ইংরেজি সাহিত্যই বেশি পড়ে, শ-কে নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী, দশজনের মতোই সাধারণভাবে দশজনের সঙ্গে মেলে মেশে, হাসি গল্প করে। সরলতা আর নম্র মিশুক স্বভাবের শুধু একটা আকর্ষণ তার আছে, তাকে সকলের ভালো লাগে। কিন্তু কীর্তনে মানুষটা সত্যই গুণী। আসরে গাইতে নামলে তার মধ্যে আশ্চর্য এক পরিবর্তন আসে, সে জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, নিজেও বিভোর হয়ে যায় কীর্তনে, উপস্থিত সকলের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় খাঁটি আবেশ, গভীর ব্যাকুলতা।

প্রকাশও দু-তিনবার তার কীর্তন শুনতে গিয়ে ভেতরে জোরালো নাড়া খেয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে সে কীর্তন শিখতে আরম্ভ করেছিল সুরেনের কাছে। তার গলার সাধারণ গান শুনে সুরেনও আগ্রহের সঙ্গে তাকে শেখাতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শেখার আগ্রহে প্রবল জোয়ার-ভাটার খামখেয়ালি লীলাখেলা দেখে শিষ্যের কীর্তন গাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনে রীতিমতো খটকা লেগেছে।

তার স্নেহ ও সহানুভূতিতে ফাঁকি ছিল না। শিষ্য বড়োই প্রিয় পদার্থ—স্নেহ করতে ভালো লাগে, অবশ্য যদি বশংবদ হয়। কিন্তু খাঁটি জিনিসটাও এখন ক্লেদের মতো লাগল পাকার কাছে। ভৈরব উঠে চলে গেছে ; শান্ত নির্বিকারভাবে এব ওর তার সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে বলতে। পাকা জানে, আজ এখানে এখন ভৈরব দশজনের চোখের সামনে অনন্তের সঙ্গে একটা কথাও বলবে না, দুজনের যেন চেনা পরিচয়ও নেই। যদিও সকলেই জানে তারা আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ। অনন্তকে ঘিরে ভদ্রলোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়ছে।

আধবুড়ো শ্রীধর উকিলের নিজের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টাটা এমন করুণ ! সুরেনের কথায় নীরবে মাথা নেড়ে পাকা তাড়াতাড়ি হল থেকে বেরিয়ে যায়। ভদ্র বেশ, ভদ্র ভাষা, ভদ্র ভিড়ের ঘাম আর নিশ্বাস চুরুট সিগারেটের গন্ধের চাপে তার ফাঁপর ফাঁপর লাগছিল।

২

কাঁকর বিছানো পথের দুদিকে টেনিস কোর্ট। সাধারণ বন্ধু দু-চারজন নাম ধরে ডাকে পিছন থেকে। সে সাড়াও দেয় না, ফিরেও তাকায় না। যে বন্ধুদের সঙ্গ সে মনে মনে চাইছিল তারা অবশ্য ডাকাডাকির হাঙ্গামা না করেই তার সঙ্গ ধরে।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পাকা বলে কানাইকে, বিড়ি দে।

নরেশ তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়া-মার্কা সিগারেট বার করে।—একটা ছিল, তোর জন্যে রেখেছি। জবর লোক বটে তোর অনন্তমামাটা সত্যি ভাই। হবে না কেন ? ব্রেন আছে তো !

আগে একটা বিড়ি দে। পরে সিগ্রেট খাব।

পাঁচু বলে, কী ব্যাপার ! আগে বিড়ি, পরে সিগ্রেট ?

তিনু বিড়ি দেয়, চারজনকেই। পাকার একটানে চড়চড় করে আধখানা পুড়ে যায় বিড়িটা। পথে নেমে এসে এদের সঙ্গ পেয়ে তার প্রাণ জুড়িয়েছে। ফুঁসে-ওঠা ঈর্ষা অভিমানের আগুন থিতিয়ে গিয়ে

অনন্তের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী খেদটা আর ফুটন্ত অবস্থায় নেই। অত বেশি অস্থির হবার জন্য বরং একটু লজ্জাই বোধ হচ্ছে তার। চাঁদের কাঁচা আলোয় পড়ে আছে লাল কাঁকরের লম্বা সড়ক। কার গাড়ি ধুলো উড়িয়ে দিয়ে গেছে, নাকে চেনা মেটে গন্ধের মতো লাগছে ধুলোটা।

কালীনাথকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনজনে বিড়ি লুকিয়ে ফেলে, পাকা ছাড়া। মনের তলা থেকে তার হাতে টান লাগে জ্বলন্ত বিড়িটা পিছন দিকে সরিয়ে ফেলতে নয়তো ফেলে দিয়ে জুতোর নীচে পিষে ফেলতে। কিন্তু বিড়ি লুকানোটা হবে কালীদাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। বিড়ি ফুঁকলেও হবে কালীদাকে অসম্মান করা। তাই রফা সে করে বিড়িটা মুঠিতেই একটু আড়াল করে ধরে রেখে।

প্রৌঢ়বয়সি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কালীনাথ নয়, বছর সাতাশ বয়সের যুবক মাত্র, ধুতি আর হাতকাটা শার্ট পরা সাদাসিদে বেশ, শক্ত ব্যায়ামী শরীর, ধীর পদক্ষেপ। ছেলেদের কাছে কিন্তু অনেক গুরুজনস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের চেয়ে তার শ্রদ্ধা ও সম্মান বেশি। গত আন্দোলনে যোগ দিয়ে মাসকয়েকের জন্য জেলে গিয়েছিল। ফিরে এসে চরকাব্রতীদের ঢিমে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সরে গিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছে। একটা ব্যায়াম সমিতি করেছে ছেলেদের জন্য, ডন বৈঠক সাঁতার কুস্তি বক্সিং ছোরাখেলা যুযুৎসু সবকিছু শেখানো হয়, চরিত্র গড়া হয় আর মানানো হয় কঠোর ডিসিপ্লিন। অনেক কিশোরের মা-বাবা, ছেলেকে হঠাৎ মেয়ের মতো লাজুক হয়ে উঠে শুকিয়ে চিমসে মেরে যেতে দেখে যারা ভড়কে গিয়েছিল, ছেলে ব্যায়াম সমিতিতে যোগ দেওয়ার পর আবার তাব চোখ-মুখে স্বাস্থ্যের জ্যোতি ফুটতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। একটা সেবাসংঘের পিছনেও কালীনাথ আছে। গত বন্যায় এই সংঘেব রিলিফের কাজ দেখে বড়োবাও কালীনাথকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।

শুধু শ্রদ্ধা নয়, সকলে একটু ভয়ও করে তাকে। দু-দণ্ড তার সঙ্গে মিশলে মানুষ টের পায়, শুধু তেজি সাহসী ত্যাগী নয়, কাজেব নিষ্ঠায় চরিত্রের দৃঢ়তায লোহাব মতো শক্ত নয়, কী যেন প্রচণ্ড একটা শক্তি আছে তার মধ্যে, ভয়ংকর আবেগের জমানো বিস্ফোরক। তাকে ঘিশে একটা রহস্যেব আবরণ নামে অনুভূতিগত কল্পনায়। মনে হয়, সে বুঝি বিপজ্জনকও বটে।

কালীনাথের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করে পাকা। ওর সামনে সে নার্ভাস হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তার মধ্যে প্রবল একটা বিদ্রোহের ভাবও জাগে। হঠাৎ অবাধ্যতার অবজ্ঞায় মানুষটাকে হুট করে উড়িয়ে দিতে প্রচণ্ড তাগিদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

তুমি তিনদিন যাওনি প্রকাশ, এই ব্যাপারের জন্য কি ?

একটু ইতস্তত করে পাকা।

ঠিক তা নয়, ভোরে ঘুম ভাঙেনি।

ঘুম ভাঙেনি ! এ তো চলবে না পাকা। আমার ক্লাবের ছেলে তুমি, ভোরে তোমার ঘুম ভাঙে না ! কাল আসবে ?

কাল ? কাল নয় কালীদা, পরশু।

আচ্ছা। কিন্তু তোমার মনে আছে তো এটা তোমার ফার্স্ট স্টেজের শেষ মাস ? ঢিল দিলে চলবে না আর। ক্লাবের নিয়ম কিন্তু ভারী কড়া।

দু-পা এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে কালীনাথ বলে যায়, তোমায় একটা খবর দি। রাখালের বেশি লাগেনি। হাসপাতালে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না।

কানাই বলে, আমারও সন্দ ছিল। ভুবনটা কম ঝানু !

পাঁচু বলে, কী ব্যাপার, মাইরি ! মোটে লাগেনি রাখালের ? হি হি করে পাঁচু হাসে, পাকা মোদের বক্সিং শিখছেন, এক ঘুষিতে রাখাল কুপোকাত ! তাই তো বলি !

তোকে একটা মারব ?

মার। মাইরি মার।

সামনে বেঁকে পাঁচু দাঁড়ায়, বলে, গাঁটের ব্যথা কমেছে ? ছাল ওঠেনি তো রাখালকে মেরে ? আহা ষাট !

পাঁচু গাঁয়ের ছেলে, তার বাবা ধনদাস চার ক্রোশ দূরের আটুলিগাঁর গেরস্ত চাষি। পাঁচু এখানে আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ে। এমনি পাঁচুর চালচলনে গেঁয়ো ছাপ আছে, হাবাগোবাই মনে হয় তাকে। কিন্তু পাকাকে খোঁচা দেবার ব্যঙ্গ করবাব সুযোগ পেলেই কী স্মার্ট যে সে হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ! শহুরে বন্ধু কটিকেও যেন ছাড়িয়ে যায়।

তিনু বলে, ভুবনটাকে একদিন দিলে হয় না ক্লাব থেকে ফেরার পথে ?

কানাই বলে, ধেৎ !

কানাই লম্বা, কালো, রোগা। কম কথা কয়।

ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে, গতবার ইচ্ছা করে ম্যাট্রিক দেয়নি। কারণ কেউ জানে না, বাড়ির লোকেরাও না। তার সঙ্গে পাকার ভাব হওয়ার ইতিহাস এই যে, তার বাবা রসিকের সাইকেল সারাইয়ের দোকানে পাকা প্রায়ই তার পুরানো সাইকেলটা নিয়ে যেত টুকিটাকি মেরামতের জন্য। বন্ধুত্ব জমাট বাঁধতে তাদের মাসখানেকও লাগেনি। তারা দুজন একা থাকলে কানাইয়ের মুখ ফোটে।

পাকা বলে, কোথায় যাওয়া যায় !

তিনু প্রস্ত.: কবে, তামাক খাবি তো দোকানে যাই চ।

পাকার উৎসাহ জাগে।—তাই চ।

তিনুর বাবা ধনেশ সাধুখানেব আছে মুদি দোকান। দোকানে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের, বিশেষ কবে পাকাকে, তামাক লজেন্স বিস্কুট খাওয়াবার লোভটা তিনুব সদাজাগ্রত। বোজই প্রস্তাব কবে দু-চাববার, যখন তখন। পাকা কান দেয় না, রাজি হয় কদাচিৎ। নেমন্তন্নটা যখন সে গ্রহণ করে খুশির যেন সীমা থাকে না তিনুর।

সৈদবাজাব এলাকায় ধনেশের দোকান। ভৈরবের বাড়িও ওই এলাকায়। সৈদবাজারের আরম্ভ কোথায় শেষ কোথায় দুশো বছব আগে হয়তো সুনির্দিষ্ট ছিল, আজ কোনো মহাপুরুষের সাধ্যও নেই সেটা আবিষ্কার কবে। ডাকপিয়ন জৈনুদ্দিন আজ একুশ বছর এ শহবে চিঠি বিলি করছে, খাম পোস্টকার্ডের ঠিকানার নামগুলিই তাব কাছে সৈদবাজাব। রাস্তার দুপাশে শুকনো নালায় ফণীমনসা, পাতাকচু আর বুনো চারার ঝোপ। পথে পুরু ধুলোব আস্তরণ বিছানো। পুবানো ইটের ভাঙাচোবা চৌকো মহলওয়ালা বাড়িই এই পুবানো শহরের বৈশিষ্ট্য, ইটের স্তূপ হয়ে এখানে সেখানে পোড়ো বাড়িও পড়ে আছে অনেক, তাতে বাস করে সাপ আর শেয়াল। শহরের প্রাচীনতাই যেন এ ভাবে স্তূপাকার হয়ে স্থানে স্থানে পড়ে আছে। কতকগুলি বাড়িব খানিকটা অংশ ভেঙে পড়েছে, বাকিটাতে বসবাস করছে মানুষ। এত বেশি পুরানো যে-সব বাড়ি নয়, সেগুলিরও গড়নের ধাঁচে আর বিবর্ণতায় প্রাচীনতার ছাপ। শহরের এ সব এলাকায় নতুন বাড়ি প্রায় চোখে পড়ে না। নতুন বাড়ি দেখা যায় শহরের পুব দিকে, ওদিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শহর এখনও নিজেকে বাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে হাল ফ্যাশনের বাড়ি তুলে তুলে।

ধনেশের বাড়ির দেয়াল কাঁকর-মেশানো মাটির, পাথরের মতো শক্ত, ছাত টিনের। সামনের বারান্দা ঘিরে একাংশ মুদির দোকান করা হয়েছে। মুদিখানার এদিকের অংশটা ফাঁকা, শুধু পুরানো ভারী তক্তাপোশ পাতা আছে। তিনু তাড়াতাড়ি পাটি বিছিয়ে দেয়। হুঁকোতে জল বদলে রান্নাঘরের আখা থেকে জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তামাক সেজে আনে। হুঁকোটা নতুন, তাদের ব্যবহারের জন্যই তোলা থাকে। ধনেশ নিজেই দোকান থেকে হুঁকোটা দিয়েছে তাদের জন্য। দুদিন বাদে তিনু ম্যাট্রিক দেবে, পাকার মতো উঁচু ঘরের ছেলেরা তার বন্ধু, গর্বে ধনেশের বুক আজকাল দশ হাত হয়ে থাকে। পাকা

তামাক টেনে চলেছে একমনে, ভাবে বিভোর হয়ে। কালি-পড়া লণ্ঠনটার মৃদু লালচে আলোয় মনে হয়, সে যেন এখানে নেই, হারিয়ে গেছে।

একাই ফুঁকে দিবি নাকি ? কানাই বলে শেষ পর্যন্ত। পাকা চমকে ওঠে। আজ চটে না, লজ্জা পেয়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয়। তিনু জানায় যে অনেকটা তামাক দিয়েছে, সহজে ফুরোবে না। ফুরোলে আর এক ছিলিম সেজে আনবে, সামান্য তামাক তো।

কী ভাবা হচ্ছিল ভাবুকমশায়ের ? নরেশ বলে খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে।

তা দিয়ে দরকার কী বাবুমশায়ের ? পাকা বলে মুখ বাঁকিয়ে।

কী ছোটোলোকের মতো তামাক টানা ! শেষ করে যাই চল।

আমরা ছোটোলোক, তামাক টানি। তুই যা নরেশ।

নরেশ সরকারি ডাক্তাব ধরণী গোস্বামীর ছেলে। এখানে তামাক খেতে আসা সে তেমন পছন্দ করে না, কড়া তামাক টানতেও পারে না, কাশি আসে। এ দলে আগে তার মেলামেশা ছিল না, পাকার প্রেমে পড়ে এসে ভিড়েছে। লেখাপড়ায় ভালো ছিল, এদের সঙ্গে এত আড্ডা দিয়ে শহর চষে পাকামি করে বেড়িয়েও গত পরীক্ষায় ফিফথ্ হয়ে ক্লাসে উঠেছে। তার আগের পরীক্ষায় হয়েছিল সেকেন্ড। বাড়িতে তাকে নিয়ে অফুরন্ত হতাশা আর দুর্ভাবনা। নানা ভাবে শাসন তোষণ পেষণ চলে অনিবাব। এমনিই ছেলেটা খুব নিরীহ, চেহারাও কোমল, ফরসা মুখখানা সুশ্রী মেয়েলি লাবণ্যে ভরা। একান্ত বাধ্য ছিল সবার কথার, বাপকে ভয়ানক ভয় করত। তার যে এ কী অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে ভেবে দিশেহারা হয়ে যায় বাড়ির লোক। ধরণীর প্রচণ্ড শাসনে দু-একটা দিন ভালো ফল দেখা যায়, স্কুল থেকে সময়মতো বাড়ি ফেরে, বিকালে খেলে বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসে। পরদিনই হয়তো দশটায় খেয়ে দেয়ে স্কুলে গিয়ে ফেরে রাত দশটায়, বিকালে জলখাবার খেতেও বাড়ি আসে না।

নরেশের জন্য একটু করুণার প্রশ্রয় দেওয়া প্রেমের ভাব আছে পাকার। পাকার অবহেলা নরেশ সইতে পারে না, অন্য কারও সঙ্গে পাকার বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখলে সে ঈর্ষায় জ্বলে যায়। মাঝে মাঝে দারুণ অভিমানে সে পাকাকে বর্জন করে। কিন্তু বাপের ভয়ে যদি বা দু-চারদিন দূরে থাকতে পারে, নিজের অভিমান নিয়ে একটা দিনও পারে না। মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে পাকার কাছে ছুটে যায়। পাকা কড়া কথা বললে পাংশু বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখ। দেখে বোধ হয় খুশিই হয় পাকা।

ছেলের বন্ধুদের তামাক টানার আসরে ধনেশ এসে উঁকি দেয়। তার মুখভরা খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, কোঁচা দিয়ে আট হাতি ধুতি পরা।

সে সাগ্রহে সবিনয়ে বলে, বাবারা, শনিঠাকুরের পেসাদ পেয়ে যেতে হবে। ঘর দিয়ে এনে দেবার জো নেই পেসাদ, ভেতরের উঠানে একবারটি যেতে হয়।

তিনুর হাতে হুঁকো ছিল, নামিয়ে রাখে। তার তামাক খাওয়ায় ধনেশের অনুমোদন আছে। স্কুলে না পড়লে হয়তো এ বয়সে তামাক ধরা নিয়ে একটু খিটিমিটি বাধাত, কিন্তু ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে ছেলে, তার চেয়েও ছেলের আজ বিদ্যা বেশি, তামাক ধরার বয়স তার অবশ্যই হয়েছে। স্কুলের ছুটির দিন একসঙ্গে ভাত খেয়ে উঠে তামাক খেয়ে আজকাল সে ছেলের জন্য হুঁকোটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে আড়ালে সরে যায়।

নিকানো উঠানের একপাশে শনিঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা, বেঁটে ফরসা নন্দ ঠাকুর পুরোহিত।

পাকা বলে, কেমন আছেন পুরুত ঠাকুর ?

কেউ পুরুত বললে নন্দ ঠাকুরের ভীষণ রাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে দশটা সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে প্রায় গায়ের জোরে বুঝিয়ে দেয় যে, সে কুলীন বামুন, পুরুত নয়। তবে পাকাকে সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে দেবার সাহসও নন্দ ঠাকুরের নেই। একবার কটমট করে তাকিয়ে সে পুঁথি পড়ে যায়।

পাড়ার দশ-বারোটি মেয়ে-বউ বসবার এত জায়গা থাকতে এককোণে ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি করে বসে পাঁচালি শুনছে। তারা যেন জমাট বাঁধতে চায়, একেবারে মিশে গিয়ে দলা পাকিয়ে যেতে চায় পরস্পরের সঙ্গে। পরনে মোটা শাড়ি, তবু যেন শুধু আঢাকা গায়ের চামড়াই সম্বল করে এসেছে পাঁচালি শুনতে, প্রসাদ পেতে। লজ্জায় তাই যেন পর্দা খুঁজছে সবার মধ্যে, তারাই সকলে যেন তাদের প্রত্যেকের বোরখা।

কেন ? পাকার মনে জিজ্ঞাসা জাগে। দশজনের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে নিজেকে একেবারে লোপ করে দিতে চায় কি ? এ তো লজ্জা নয়, এ নিছক ভয়, হাড়েমাসে জড়ানো ভীরুতা। একটি রাখাল যেন হাতের লাঠি উঁচিয়ে আছে, গোরু ছাগলের পাল ঠেলাঠেলি করে ঘেঁষে এসে বাঁধছে দল।

ফলমূল বাতাসা নারকেলের সন্দেশ আর শিন্নি—তারা সকলে খুশি হয়ে খায়। খিদেও পেয়েছিল। উঠোনে পূজা, প্রসাদ ঘরে নেওয়াও বারণ। শনি বোধ হয় খুশিই হয়েছে আজ শনিবারের সন্ধ্যায় অনেক ঘরে এ রকম পূজা পেয়ে—পূজা দেবে অথচ পূজার প্রসাদ ঘরে নিতে শিউরে উঠবে এটা তো আসলে অবজ্ঞা নয়, ভয়েব পূজা। এ রকম ভয়ের পূজায় মানুষও খুশি হয়, দেবতার তো কথাই নেই, মানুষের দেবতা তো মানুষেরই বানানো। নলিনী দারোগা বাড়ির সামনের পথ দিয়ে হাঁটুক তাও কেউ চায় না, সে সাপ, সে মারী,—তাতেই নলিনীর কত আনন্দ ! ছড়ি ঘুরিয়ে হেলেদুলে চলন দেখলেই টের পাওয়া যায়।

শনিঠাকুর শুধু পূজা পেয়েই খুশি।

কাড়াকাড়ি করে তারা প্রসাদ খায়, হাসি আনন্দে হালকা হয়ে যায় বিপজ্জনক দেবতার ভয়ার্ত পূজার কৃত্রিম থমথমে ভাব। তিনুর সুখ বুকের মধ্যে উথলে মুখে হয়ে থাকে একগাল হাসি। শুধু পাঁচু একটু বিষণ্ন মনমরা হয়ে যায়।

বলে, আমাদের বাড়ি প্রত্যেক শনিবারে শনিপূজা হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পূজা।

তাদের সামনেও তিনুর মা ঘোমটা দিয়েছে। ঝকঝকে মাজা গ্লাসে জল এনে দেয় তিনুর বিধবা দিদি, আধহাত ঘোমটায় মুখ ঢাকা কিন্তু পিঠে বুকের পাশে কাপড় নেই। তিনুর বুড়ি পিসি মেয়েদের প্রসাদ দেয় হাতে হাতে। পাঁচু উৎসুক চোখে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। তাদের গাঁয়ের বাড়িতে হয়তো এমনি প্রসাদ বিতরণ চলছে।

সে আবার বলে, পাকা, যাবি ?

কোথা ?

মোদের গাঁয়ের বাড়ি ? আমি আজ যাব, সাথে আয় না ?

বলতে বলতে পাঁচু উৎসাহিত হয়ে ওঠে, আমি গিয়ে যদুকাকাকে বলি, তুইও চট করে বাড়ি গিয়ে সাইকেলটা নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি রওনা দিলে সাইকেলে বারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব।

তোর সাইকেল কই ?

একটাতেই হবে। একজন রডে বসব, তুই একবাব চালাবি আমি একবার চালাব।

তা হয়। সাইকেলও আর একটা জোগাড় করা যায় সহজেই। আবছা চাঁদের আলোয় জনহীন পথে ষোলো মাইল সাইকেল চালিয়ে গিয়ে মাঝরাতে নিঝুম গাঁয়ে একজনের বাড়িতে ওঠা, অচেনা গাঁয়ে ঘুরে অজানা লোকের সঙ্গে মিশে একটা দিন কাটানো,—মনে টান লাগে পাকার। কিন্তু অনন্তমামারা কাল বিকালের গাড়িতে চলে যাবে। নতুন মামির সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। পাঁচুর সঙ্গে গেলে দেখা হবে না।

পাকা ভাবে, নাইবা হল দেখা ! তাকে কিছু না জানিয়ে নতুন মামি এসেছে কলকাতা থেকে, তা সে আসুক। হয়তো সময় ছিল না চিঠি লেখার, হয়তো ছল করেই জানায়নি। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় ওরা পৌঁছেছে, সারাদিনের মধ্যে একবার কি নতুন মামি আসতে পারত না তাদের বাড়ি ? অনন্ত মামা

দুবার এল। স্কুল কামাই করে সে পথ চেয়ে কাটাল সারাটা দিন। নিজে থেকে সে কালও যাবে না দেখা করতে। কিন্তু কাল যদি নতুন মামি আসে ? আটুলিগাঁ চলে গেলে যদি দেখা না হয় তার সঙ্গে ?

মন্দ কী হয় ? নতুন মামি টের পায় তার জন্য কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই পাকার। প্রায় দুবছর পরে কাছাকাছি এসেছে দুজনে কিন্তু পাকার কাছে সে এতই তুচ্ছ যে তার সঙ্গে দেখা না করেই বন্ধুর বাড়ি চলে গেছে আটুলিগাঁ !

না, তা হয় না। যেচে গিয়ে দেখা না করুক, একেবারে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। এমন তো হতে পারে যে নতুন মামিও সারাদিন আশা করে বসে ছিল পাকার পথ চেয়ে ! তাদের এ বাড়িতে এত লোকের ভিড়, নতুন মামি এলেই বাড়ির সবাই তাকে ঘিরে ধরবে, পাকার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলার সুযোগ মিলবে না। তার চেয়ে এটা বুঝে পাকা যদি তার কাছে যায়, বেশ হয় তা হলে— এ কথা যদি ভেবে থাকে নতুন মামি ?

ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর চটে যায় পাকা। নিরিবিলি তার সঙ্গে কথা বলার আশায় তার পথ চেয়ে বসে থাকতে গরজ পড়েছে নতুন মামির ! সব তার মনগড়া ছেলেমানুষি। নতুন মামি কি খবর দিয়ে ডেকে পাঠাতে পারত না তা হলে ? অনন্ত মামাকে বলে দিতে পারত না তাকে যেতে বলতে ? তবু, কালকের দিনটা শুধু নতুন মামি আছে এখানে। শহর ছেড়ে একেবারে আটুলিগাঁ চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কী ভাবছিস ? পাঁচু ধৈর্য হারায়।

না ভাই, আমার যাওয়া হয় না। আর এক শনিবার যাব। তোর বুঝি মন কেমন করছে বাড়ির জন্যে ?

না—পাঁচু অস্বীকার করে।

আমার সাইকেল নিয়ে তুই যেতে পারিস।

পাঁচুর সাইকেলের লাইট নেই। মফস্বলের শহরে আবার সাইকেলের লাইট্, অমাবস্যার অন্ধকারেও তারা চেনা রাস্তায় বন্‌বন্ সাইকেল চালায়। তবে শহরের বাইরে রাস্তাটা বড়ো খারাপ। নিজের টর্চটা সে পাঁচুকে দেয়। পাঁচুর উৎসাহে একটু ভাটা পড়েছে মনে হয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে ইতস্তত করে পাকা না গেলে একা যাবে কী না ! তারপর হঠাৎ বুঝি আটুলিগাঁয়ে মা-মাসি ভাই-বোনের মাটির দেয়াল টিনে-চাল নিকানো উঠানে ধান-খড় গোয়ালগন্ধি নীড়টির জন্য প্রাণটা আবার আনচান করে ওঠে তার।

আচ্ছা আমি চললাম—বলেই সে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। মনে হয় যেন ছুটছে। কতক্ষণে কাকার বাড়ি পৌঁছে সাইকেলে গাঁয়ের দিকে রওনা দেবে।

তিনু বাড়িতে রয়ে গেল। থমথম করছে পাকার মন। ভিতরের অস্থিরতা আরও বেড়েছে। কী শান্ত চারিদিক, শহর কেমন ঘুমন্ত ! রাত বুঝি নটাও বাজেনি। ঝিঁঝির ডাক আর অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের চিৎকার। কাঁচাপাকা বাড়িগুলিতে লালচে আলোয় মানুষ জেগে আছে, সাড়াশব্দ নেই, মড়ার মতো চুপচাপ। একটা কিছু করার জন্য সে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে। হইচই লাফালাফি হাসাহাসি দুর্দাম দুরন্তপনা নয়, অন্য কিছু, খাপছাড়া কিছু, নতুন কিছু। নয়তো নদীর বালিচড়ায় গিয়ে বসে প্রাণ খুলে গান গাওয়া। যদিও ও সব কিছুই ভালো লাগবে না। সে জানে, ভালো লাগবে না। বাড়িতে থাকলে কবিতা লিখত। তাও ভালো লাগত না। কাল রাত্রে ভালো লেগেছিল, ইচ্ছা হয়েছিল কবিতা লিখতে। প্রথম কটা লাইন গড়গড় করে এসেছিল, ভাবতে হয়নি, মনে হয়েছিল চমৎকার হয়েছে কবিতাটা। সকালে উঠে ভালো লাগেনি।

তাতে আপশোশ নেই। কেউ তো আর পড়ছে না তার কবিতা, সে নিজে ছাড়া !

নরেশ ঘা খাওয়ার পর আরও জোঁকের মতো পাকার সঙ্গে লেগে আছে।

কানাইকে চুপিচুপি পাকা বলে, ওকে ভাগা দিকি।

কানাই বলে, ভাগাচ্ছি।

তাদের কানে কানে কথা বলতে দেখে নরেশ সন্দেহের চোখে তাকায়। জানবাজারের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে একটু পরে কানাই তাকে বলে, এবার তুই কেটে পড় নরেশ। বাড়ি যা।

কেন ?

বাড়িতে বকবে তো তোকে।

তোরা কোথা যাবি ?

আমরা একটু তাস পিটোতে যাব এক জায়গায়। সেখানে তোর যাওয়াটা—

এটা সত্যি সত্যি কানাইয়ের কথা হলে নরেশ গায়ে মাখত না। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে কেটে পড়ত। কিন্তু পাকা কানে কানে মন্ত্রণা দিয়েছে কানাইকে। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সে যেন ফেটে পড়ে, কথা জড়িয়ে যায় তার জিভে।

তোর সঙ্গে কোনোদিন যদি আর কথা বলি পাকা...

আমি তোর কী করলাম ? থাকতে চাও সঙ্গে থাকো। কিন্তু বারোটা বেজে গেল, একটা বেজে গেল বলে জ্বালাতে পারবে না।

নরেশ যেন কেঁদে ফেলবে। পরক্ষণে সে ছুটে চলে যায় মোড়ের দিকে।

কানাই কিছু বলে না। বুড়োর মতো বড়োর মতো, তার ধৈর্য সময় সময় নার্ভাস করে দেয় পাকাকে। বন্ধু যদি তার কেউ থাকে এ শহরে, সে কানাই। একমাত্র সে-ই তার মুগ্ধ ও অনুগত সাথি নয়, সমান বন্ধু। সবচেয়ে প্রাণ খুলে শুধু ওরই সঙ্গে সে মিশতে পারে। তবু সময় সময় ওর সঙ্গও তার বিরক্তিকর লাগে। মনে হয় তার প্রায় সব রকম পাকামিতে যোগ দিলেও দিচ্ছে আলগা আলতোভাবে, সব বিষয়ে সে যেন খুব সংযত, ভাবী শক্ত তার ভেতরটা।

৩

মোড়ে বনমালীর চায়ের দোকানটার দিকে এগোতে এগোতে পাকা নিজেই অনর্গল কথা বলে যায়।

চায়ের দোকান তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। ভিড় হয় সকাল ও সন্ধ্যার দিকে। তেরচা করে আটকানো কাঠের পায়ায় বসানো সাদাসিদে তক্তা হল চায়ের টেবিল, পালিশ পর্যন্ত করা হয়নি। সরু লম্বা বেঞ্চিটার কোণের দিকে বসে ছিল একুশ-বাইশবছরের একটি ছেলে। পাকা তার মুখ চেনে, নাম জানে, কিন্তু পরিচয় নেই। তার নাম অমিতাভ, কলকাতায় কলেজে পড়ে। সিল্কের মতো মিহি একরাশি চুল, চওড়া কপাল, মাঝখানে খাঁজকাটা চ্যাপটা মোটা চিবুক। ওকে দেখলেই পাকার মনে হয়, কাঁচা বয়সের সাধারণ একটি মুখ শুধু ওই চওড়া কপাল আর খাঁজকাটা চিবুকের জন্যই এমন আশ্চর্য রকম দৃঢ়তা আর কাঠিন্যের ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

কানাই বলে, কখন এলে অমিতদা ?

আজ সকালে। তুমি ভৈরববাবুর ভাগনে প্রকাশ, না ?

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিয়ে প্রকাশ ওদিকের বেঞ্চে গিয়ে বসে। কারও কাছ থেকেই গায়ে-পড়া দাদাত্ব তার ভালো লাগে না। সে অমিতাভই হোক, আর কালীনাথই হোক।

বনমালী ! দুকাপ চা।

কানাই এসে পাশে বসলে পাকা কথা বলে যায়, আগের কথারই জের টেনে। এটার কেন, ওটার মানে, সেটার কারণ। এই বয়সেই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার যেন সীমা পরিসীমা নেই তার। সংসারে সব সে জেনে গেছে ! মেয়েদের পর্যন্ত ! একটানা বলে যায়, কানাইকে শোনাচ্ছে না নিজেকে শুনিয়ে বলছে, নিজের কাছে কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে নিজেই ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করছে,

ঠিক বোঝা যায় না। নিজের কথা বলতে বলতে সে টেনে আনে ভদ্র জীবনের অজস্র ফাঁকি মিথ্যা ও নোংরামির কথা আর হঠাৎ শুরু করে যৌন-বিজ্ঞান।

পাকার এই পাকামি ছেলেদের কাছে তাকে প্রায় মহাপুরুষ করে দিয়েছে। গোপনে গোপনে কথা তারাও বলে—এত বেশি বলে যে শুনলে বড়োরা থ বনে যেত। বড়ো হয়ে মানুষ ছেলেবেলার কথা ভুলে যায়। মেয়ে-পুরুষের রহস্যময় ব্যাপার এবং তার নানাবকম বিকার নিয়ে কিছু জানা কিছু শোনা আর বানানো আলাপে ছেলেরা পারিবারিক জীবনের কত দৈন্য আর কৃত্রিমতা যে ফুটিয়ে তোলে ! ফ্রয়েডীয় অপব্যাখ্যার বদলে সামাজিক মানে খুঁজলে ভদ্রসমাজকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হত।

পাকার গোপনতা নেই, যেন কৌতূহলও নেই। প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে চুপিচুপি যে আলাপে অন্যের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়, তার দশগুণ নিগূঢ় কথা পাকা নির্বিচারে বলে যায়। যেন, শুধু জানে বোঝে নয়, জানা বোঝারও অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে।

কানাই বলে, নরেশকে নিয়ে এত কথা কেন ? ও রকম কত ছেলে আছে।

আছে বলেই তো।

তোর এত মাথা ব্যথা কেন ?

ছেলেরা বিগড়ে যাবে, মাথা ব্যথা হবে না ?

কী করবি তুই ? নিজে খাঁটি থাকলেই হল।

না। যতটুকু পারি করব। একটা ছেলেকেও যদি বাঁচাতে পারি সেটা কি কম হল ?

যেমন নবেশকে বাঁচিয়ে মানুষ করছিস ? যতক্ষণ ভালো লাগবে ততক্ষণ পা চাটতে দিবি, খুশি হলে তাড়িয়ে দিবি। এমনি করে যদি ছেলেদেব মানুষ কবা যেত, কালীদাকে একটা ছেলে তৈবি করতে এত কাণ্ড করতে হত না।

পাকা বুড়োর মতো হাসে।

কালীদা বেছে বেছে মনের মতো ছেলে নিয়ে ক্লাব করেছেন। একটু দুর্বল ছেলে এলেই সে বাতিল। এই ছেলেদের কী হবে ? এদের অ্যাবনরম্যালিটি এদের গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে যে ? এদের যদি কিছু করতে পারতেন কালীদা, বুঝতাম।

অমিতাভ শুনছিল। পাকারও তা অজানা নয়। কানাই গম্ভীর হয়ে বলে, এদের জন্যই করছেন কালীদা।

তাই এত বাছবিচার ? এত কড়াকড়ি ?

হ্যাঁ, তাই এত এত বাছবিচার, এত কড়াকড়ি। তুই ভাবছিস একটি দুটি ছেলের কথা, তোর দু-একজন বন্ধুর কথা, কালীদা ভাবছেন সব ছেলের কথা, সারা দেশের সমস্ত মানুষের কথা। দেশটাই অ্যাবনরম্যাল, তুই ক-টা ছেলের অ্যাবনরম্যালিটি ঘুচাবি ?

পাকা চুপ করে থাকে। কানাই বুড়োর মতো কথা বলছে। কালীদার মতো।

কানাই বলে, দেশ স্বাধীন না হলে ভালো শিক্ষার ব্যবস্থাও হয় না, কিছুই হয় না। বাছা বাছা ছেলে নিয়ে গড়তে পারলে তারাই দেশকে স্বাধীন করতে পারে। কালীদা তাই—

অমিতাভ ডাকে, কানাই !

কানাইয়ের গলা চড়ে গিয়েছিল। ভালো লাগছিল পাকার তাকে দেখতে ও তার কথা শুনতে। অমিতাভ নাম ধরে ডাকতেই কানাই থেমে যায় ; চায়ের দোকানে লোক ছিল না তবু কালীনাথের নাম ধবে এত জোরে এ সব কথা বলা উচিত হয়নি, পাকাও এটা বুঝতে পারে। অমিতাভ যেভাবে সতর্ক করে দেয় আর কানাই অপরাধীর মতো থেমে যায়, সেটা আশ্চর্য করে দেয় পাকাকে। সে বুঝতে পারে, কানাই তার চেয়ে অনেক বেশি জানে কালীনাথদার সম্পর্কে। এতদিন এটা ঘুণাক্ষরে টের পাওয়া যায়নি।

অমিতাভ বলে, কানাই, কাল আমার একটা সাইকেল ভাড়া চাই ভাই—সারাদিনের জন্যে।

সাইকেল ভাড়া চাই ? আচ্ছা।

একটু চুপচাপে কাটে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কানাই বলে, চলি।

পাকার সঙ্গ যে তার ভালো লাগছে না, সহ্য হচ্ছে না, সেটা একরকম স্পষ্ট ঘোষণা করেই কানাই পা বাড়ায়। তাকে শুনিয়ে পাকা হাঁকে, বনমালী, আর এক কাপ চা দেবে বাপধন ?

অমিতাভ উঠে এসে তার পাশে বসে।—আমাকে এক কাপ খাওয়াবে ভাই ?

এবার আর মনে হয় না অমিতাভ দাদাত্ব করছে। সহজ সাধারণভাবে আলাপ করে, পাকার মামাদের কথা জিজ্ঞেস করে, শহরের দু-একটা সাধারণ খবর জানতে চায়। প্রসঙ্গক্রমে জানায় যে কালীনাথের কাছে পাকার কথা সে শুনেছে। নয়নতারা ক্লাবের ব্যাপারটা মন দিয়ে শোনে। তার সঙ্গে অমিতাভের ভাব করার আগ্রহটা পাকা টের পায়। সে খুশি হয়।

বাড়ি যাবে না ? চলো একসঙ্গেই যাই কোতোয়ালি পর্যন্ত।

আপনি এগোন। আমার মনটা ভালো নেই।

দুই

এখনও বাড়ি যেতে মন চায় না।

হইচই কাণ্ডকারখানা কম হয়নি সারাদিন, ঢং ঢং করে কোতোয়ালির ঘড়িতে রাত দশটা বাজল। অস্থিরতা ছটফটানি ছড়িয়ে দেওয়া সারাদিনেও কুলোতে পারা যায়নি, রাতে এসে ঠেকল। একেবারে যেন দম আটকে আসছে, তাই দিশে হারিয়ে মুক্তি চেয়ে দিনরাত্রি একাকার করে দিচ্ছে। শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই কিশোর দেহ-মনটার। কিশোর বলেই বোধ হয়, একটু বেশি বয়স হলে বুড়োদের চালচলন এবং মন ঠান্ডা আর শান্ত রাখতে হাওয়ায় ফাঁপানো নীতির দাওয়াইয়ে ভক্তি জন্মে যেতে পারত। একা হয়ে যেন আরও বেড়েছে অজানা উদ্‌বেগ, অবোধ্য চাপ।

বটগাছটার তলে একদল পশ্চিমা মজুর ঢোল করতাল বাজিয়ে একটানা গেয়ে চলেছে সা-রা-রা-রা, সা-রা-রা-রা, তাও যেন একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা হলেও হয়ে উঠতে পারত কিন্তু কেন যেন হতে পারছে না। কোথায় রহস্য আছে, রোমাঞ্চ আছে, আছে জীবনের নিষিদ্ধ অসঙ্গত প্রকাশ—খুঁজে বার করো, দ্যাখো, জানো, বোঝো, ভয় করুক, গায়ে কাঁটা দিক, অদ্ভুত উল্লাসে ভরে যাক হৃদয় মন।

একা হলেই সবার কাছে পাকা অপরাধী হয়ে যায় এই তাগিদের জন্য। এ অন্যায়। কোনো ছেলের মতিগতি এমন নয়, বড়ো তার বাড় বেড়েছে। বাড় বেড়েছে বাড় বাড়বে বলে, বড়োলোক না হয়ে ছোটোলোক হতে চেয়ে বাড়বে বলে। গুনগুনিয়ে গান গেয়ে তাই এগিয়ে যায় বাজারের পাশের রাস্তা ধরে।

কী হবে বাড়ি গিয়ে ?

নতুন মামি যদি এসেও থাকে বেড়াতে বিকালের দিকে, অনেক আগেই নিশ্চয় ফিরে চলে গেছে। বাড়ি গিয়ে শুধু বিশ্রী মন কেমন করা, গুমরানো কান্না যেন গলায় এসে ঠেকে রয়েছে, নামবে না। ও বিষাদকে বড়ো ভয় করে পাকা, ঠিক যেন মা মরে যাবার ভয়ানক দিনগুলিকে আবার অনুভব করে।

মরিয়া হয়ে সে খারাপ পাড়ায় যায়।

এ মন্দ কী, হোক অন্যায়। পাড়ায় ঢুকবার আগে থেকেই উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছে। আজকের সঙ্গে সেদিনের মজা দেখতে আসার তুলনা হয় না। সেদিন এসেছিল সন্ধ্যার আগে, তখনও দিনের আলো ছিল। আজ রাত দশটা বেজে গেছে। এ সব পাড়ার আসল যা পরিচয়, নাচগান বাজনা, মাতলামি গুন্ডামি, মারামারি খুনজখম, সে তো শুরু হয় বেশি রাত্রে। অনেক দিন থেকেই মনে মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল সাধটা, বেশি রাত্রে একবার এসে দেখে যাবে এই ভয়ংকর রহস্যপুরীর কাণ্ডকারখানা, যেখানে রাত কাটানোর অপরাধে তার সেজোমামাকে ভৈরব দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে যাতায়াত করে বলে পরমেশবাবুকে পাড়ার লোকে এত ভয় আর ঘৃণা করে। সরু সরু আঁকাবাঁকা গলি, আবছা অন্ধকার, গা ছমছম করে। দূরে দূরে থামের মাথায় টিমটিমে তেলের বাতি, আলো দেয় না, প্রমাণ দেয় না যে শহরে মিউনিসিপালিটি আছে। সেটা দখল করবার জন্য দুদিন বাদে ভৈরব আর ভুবনের মধ্যে লড়াই লাগবে। পান সিগারেটের দোকানের আলোগুলি তেজি, দু-একটাতে আবার ডে-লাইট টাঙিয়েছে। কোনো কোনো বড়ো বাড়ির সামনে রোয়াকে বা ভেতরে ঢুকবার প্যাসেজে সেজেগুজে মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়ে আছে ডে-লাইটের আলোয়, তবে বেশির ভাগই টিমটিমে লন্ঠন। তেমন যেন সরগরম নয় আজ পাড়াটা, সেদিন সন্ধ্যায় যত দেখেছিল মেয়েগুলিও যেন তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম। এবাড়ি ওবাড়িতে তবলা হারমনিয়মের সঙ্গে গান চলছে, নাচের আওয়াজও পাওয়া যায়। হইচই হুল্লোড়ের শব্দ শুধু এল একটা বাড়ির ভেতর থেকে, তাও অল্প লোকের সামান্য গলাবাজি। রাস্তায় লোকও চলাচল করছে কম। একটু দমে যায় পাকা, তার আগ্রহ আর উত্তেজনা ঝিমিয়ে আসে।

হঠাৎ বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে তারই বয়সি একটি ছেলের মুখোমুখি হয়ে। ছেলেটি বেরিয়ে এসেছে পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে। সেখানে পানের দোকানের আলো ছিল, চেনাচেনি হয় তৎক্ষণাৎ। সাবজজ তুষারবাবুর ছেলে অবনী। বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়ো একজন যুবক সঙ্গে আছে। সিল্কের জামা গায়ে লুচ্চা আর ফুলেল ধরনের মেশানো বাবুবেশ। তুষারবাবু নামকরা কৃপণ। তাদের স্কুলেই ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে অবনী। সঙ্গী যুবকটি পাকার অচেনা। কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত চোখে বিহ্বলের মতো পাকার দিকে চেয়ে থাকে অবনী, তারপর হনহন করে চলতে আরম্ভ করে তার পাশ কাটিয়ে। বুকের ধড়ফড়ানি কমে পাকার। না, সে ভয় নেই, অবনী কিছু প্রকাশ করবে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্যই ওকে চুপ করে থাকতে হবে। কিন্তু এই বয়সে ছেলেটা এমন বিগড়ে গেছে, এই মাতাল বদ সঙ্গীর সঙ্গে এতদূর গড়িয়েছে তার অধঃপতন ? একটা ঝাঁকি লাগে পাকার মনে, একটা সে বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করে। এ তার নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন আবিষ্কার, নতুন জ্ঞান। ছেলেরা বদ অভ্যাস শেখে তা সে জানত এবং বিশ্বাস করত ওইখানেই সেটার সীমা। এই বয়সে বাজারের মেয়েমানুস যে দরকার হতে পারে কোনো ছেলের, এ ধারণাও তার ছিল না এতকাল।

বাঁয়ের একটা গলিতে বেঁকে দু-পা এগিয়ে যেতে ডাক শোনে, কী গো ! ফিরেও তাকাবে না ?

বাড়িটা চিনতে পারত না পাকা, মেয়েটিকে মনে ছিল। বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, কপালের আধখানা ঢেকে পাতা কেটেছে, আজও সেদিনকার সেই নীলাম্বরী শাড়িখানাই পরনে। মানুষের মন ভুলাতে দেহটা সাজাবার জন্য ওই শাড়িখানাই বোধ হয় ওর সম্বল। শাড়িখানা দিয়ে দেহ সাজিয়ে এতদিন মানুষের মন ভুলিয়েও দ্বিতীয় আর একখানি মানুষের মন ভুলানোর শাড়ি জোগাড় করতে পারেনি। সেদিন ঘরের যে অবস্থা দেখেছিল তাতেও সে কথাই মনে হয়।

ভুলে গেছ ? চিনতে পারলে না ?

আজ টাকা আনিনি।

একটা টাকা, তাও সাথে নেই ? মেয়েটি হাসে, আচ্ছা, আট গন্ডাই আজ দিয়ো তুমি।

দাঁড়াও, দেখি।

পকেটের পয়সা গুনে দেখে পাকা মেয়েটির সঙ্গে ভেতরে যায়। সেদিন ওর ঘর দেখে কী রকম হতাশ আর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে। সব কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। জীবটা সৃষ্টিছাড়া, জীবন সৃষ্টিছাড়া তার আস্তানাও হবে খাপছাড়া উদ্ভট ধরনের কিছু, কখনও যেমনটি সে চোখেও দেখেনি, ভাবতেও পারেনি। তার বদলে ঝি-শ্রেণির একজন গরিব মেয়েলোকের সাধারণ নোংরা গেরস্থালি ঘর দেখে থ বনে গিয়েছিল পাকা। তাছাড়া, সেদিন লজ্জা সংকোচ অস্বস্তিতে সে একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, বারবার শুধু এই কথাটাই মনে হচ্ছিল যে মেয়েটা মনে মনে নিশ্চয় ভাবছে : আমি ওর দিদির বয়েসি, আমার কাছে ছোঁড়া এয়েছে পিরিত করতে ! শুধু পালাই পালাই করছিল সেদিন মনটা, আস্ত একটা টাকা খরচ করেও ভালো করে দুটো কথা কয়ে রহস্য জগতের এই খাপছাড়া প্রাণীটিকে একটু জানবাব চিনবার সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি। ঘরটা যেমন হোক, মানুষটা কি উদ্ভট হতে পারে না ?

পয়সা হাতে দিতে হয় ঘরে ঢুকেই। মানুষ এদের ঠকায়, নিশ্চয় ঠকায়, নইলে ভদ্রঘরের ছেলেকে এত অবিশ্বাস কেন ? কী ভয়ানক ! এদেরও মানুষ ফাঁকি দিতে পারে !

তোমার নাম কী ?

ও বাবা ! সেদিনের শোধ তুলবে বুঝি আজ ?

সে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসে, মোর নাম বিমলি। তোমার নামটা শুনি ?

স্যাঁতসেতে ঘর, ধোঁয়াটে গন্ধ। নোংরা ময়লা ঘর, অথচ বাসন ক-টি কী ঝকঝকে করে মাজা, প্রদীপের শিখাটা চকচকে, যেন পিলসুজ বেয়ে লম্বিয়ে উঠেছে, মেঝেতে গর্ত থাক, এককণা ধুলো নেই, নিকানোর চিহ্নটা স্পষ্ট। উই-ধরা পায়া তক্তাপোশের, তুলো-নড়া ছেঁড়া তোশক বলেই চাদর টান করে পেতেও এবড়ো-খেবড়ো ভাবটা ঘোচানো যায়নি, কোনার দিকে একটু বেরিয়েও আছে তেলচিটে ছেঁড়া তোশক, কিন্তু সাবান-কাচা পরিষ্কার চাদরটি।

বাবা কী করেন ?

বিমলি আজ খালি প্রশ্ন করছে। বিমলিকে তার জানবার চিনবার কৌতূহলের চেয়ে যেন তার ঘর-সংসার আপনজনদের কথা জানবার আগ্রহ বিমলিরই বেশি। তার বাড়ির অবস্থাটা বিমলি আঁচ করতে চায়, পাকা বোঝে। সে ছেলেমানুষ, রোজগার করে না, বড়োলোকের ছেলে হলে হয়তো কিছু বাগাবার ভরসা থাকবে। ছেলেমানুষকে ভোলানোও হবে সহজ। তাকে সরল, লাজুক, ভালো ছেলে বলে জেনেছে বিমলি। একটু ভীরুও হয়তো ভেবেছে। মেয়েদের সঙ্গে কারবার করতে জানে না, একেবারে অভিজ্ঞতা নেই, ঠাহর করে নিয়েছে। তাই তার মন ভোলাতে কথা কইছে আদুরে সুরে, হাসি তামাশায় তাকে ভরসা দিচ্ছে, ঢং করছে, নিজেকে দেখাচ্ছে।

ইস্, আশায় পেয়েছে ওকে, আশা ! আট গন্ডা পয়সা পেয়েছে মোটে তার কাছে, কিন্তু আশা করছে ভবিষ্যতের ! বয়স কম হয়নি, কতকাল ধরে কত মানুষের কাছে কত আশা করে করে এসেও এ পর্যন্ত ঝি-চাকরানির চেয়ে অবস্থা ভালো হয়নি, আজ অল্পবয়সি নতুন রকমের একটা মানুষ পেয়েই ফের ভীষণভাবে আশা করতে শুরু করেছে ! ও কি সত্যই এমন বোকা যে ভাবতে পারছে তামাটে রঙের ওই গোলগাল শরীর, ওই তেলচিটে মুখ নিয়ে তাকে ভোলাতে পারবে ?

ধাঁধার মতো লাগে ব্যাপারটা পাকার কাছে। মানে বুঝে উঠতে পারে না বিমলির ব্যবহারের।

এদিকে রাত বাড়ছে। তাগিদ বাড়ছে আট গন্ডা পয়সায় ভাড়া খাটা শেষ করার।

ভূমিকা শেষ করে হঠাৎ বিমলি যে ব্যবহার করে তার বীভৎসতার ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে বেরিয়ে যেতে হয়, হতবুদ্ধি ভাবটা একটু সামলে নেবার পর সাম্প্রতিক ধাঁধাটার একটা জবাব মনে আসে পাকার। মনের জিজ্ঞাসার জবাব টেনে আনাটা তার স্বভাব। ছেলেবেলা থেকে মনটা তার 'কেন'র পোকায় ভরতি, ছোটো-বড়ো সাধারণ-অসাধারণ সব ব্যাপারেই সে জিজ্ঞাসু, যখন যে

'কেন'টা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার একটা লাগসই ব্যাখ্যা খুঁজে বার না করলে তার চলে না, মানসিক অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় শরীর খারাপ হয়ে যায়।

কয়েক আনা পয়সা অবশিষ্ট ছিল, দু-পয়সা দিয়ে দুটো সিগারেট কিনে একটা ধরিয়ে সে ভাবে, বিমলির আশা হয়তো একেবারে অর্থহীন পাগলামি নয়। এ রকম হয়তো ঘটে সংসারে। তারই মতো ভদ্র ভালোমানুষ হয়তো বিমলির মতো কুৎসিত কদর্যতা চায়। হয়তো কেন, চায়। মনোবিজ্ঞানের বইয়ে সেও তো পড়েছে এ কথা। সে তো জানে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের কাণ্ড। স্বাধীনতার সংগ্রাম ভাঙিয়ে খাবার ব্যবসায়ে রত বিখ্যাত পত্রিকায় দেশের মুক্তি-সাধনার সংগ্রামের সংবাদ, দেশপূজ্য নেতাদের নড়াচড়া চলাফেরা কথা বলার সংবাদ থাকে, আবার ওই কাগজেই আদালতের মকদ্দমার বিবরণে পদস্থ ভদ্রলোকের যে কদর্য কেচ্ছার কাহিনি বার হয় সেগুলি বানানো গল্প হতে পারে না।

তাছাড়া থাকে আদালতে বিচার্য পাশবিক অত্যাচারের কাহিনি। সব ক-টাই অবলা মেয়ে। প্রাইভেট মাস্টারের অট্টালিকায় পড়ার ঘরের নির্জনতায় উঁচু শ্রেণির কচি মেয়ের মন ভুলিয়ে এবং পাটের খেতের পাশে ডোবার ধারে জঙ্গলে নিচু স্তরের কচিবউটাকে টেনে নিয়ে মুখ বন্ধ করে দু-চার-দশজনের পাশবিক ভোগের কাহিনি। স্বয়ং মহাদেবেরই যেন জগৎ-ধর্ষণ !

সে যে আজ এ পাড়ায় এসেছে এত রাতে, বিমলির ঘরে গিয়েছে, তার মানেও কি তাই ?

নতুনমামিকে সে ভালোবাসে।

এ খাঁটি ভালোবাসা, অতি স্বর্গীয়, খুব পবিত্র। চিরজীবন দূর থেকে মন দিয়ে বিরহের ব্যথায় পূজা করে যাওয়ার ভালোবাসা। তারই প্রতিক্রিয়ায় সে কি আজ এই নোংরামির দেশে এসেছে, পয়সা দিয়ে যেখানে কেনা যায় মেয়েমানুষের সশরীর ভালোবাসা, বিমলির মতো স্ত্রীলোকেরা যেখানে উদ্যত হয়ে থাকে যেচে বীভৎসতম বিকারের তৃপ্তি দিতে ?

মাথায় ঝাঁকি দেয় পাকা, কাতরভাবে শুধায় পানওয়ালাকে, লেমোনেড ক-পয়সা ?

উঃ, তৃষ্ণাই পেয়েছিল বটে মরুভূমির পথহারা পথিকের মতো। নইলে এত ভাবে ? অন্তত সাতাশ-আটাশ কি ত্রিশ বছর বয়স হবার আগে ও সব জটিল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না, সেটা উচিতও নয়। একা হলেই কেন যে নিজেকে এত কষ্ট দেয় বোবার মতো বড়ো বড়ো কথা ভেবে ; জগতে কারও সে ক্ষতি করেনি, করছেও না। ওটুকুই যথেষ্ট।

পাড়া থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আর একজন চেনা ভদ্রলোক চোখে পড়ে। পাকা মুখ বাঁকায়। আর ভালো লাগছিল না। কত রোমাঞ্চ আশা করেছিল, পাড়াটা তাকে বঞ্চনা করেছে। কিছু নেই এখানে, খানিকটা ভোঁতা নিস্তেজ নোংরামি ছাড়া।

এই অজানা জাতকে জানবার জন্য সে উতলা হয়েছিল ?

২

স্টেশনে যাবার রাস্তা।

শহরের দুদিক থেকে দুটি বড়ো রাস্তা বেরিয়ে শহরকে বেড় দিয়ে বৃত্তাকারে এগোতে এগোতে হঠাৎ এক জায়গায় মুখোমুখি মিশে দিক পরিবর্তন করে সিধে চলে গেছে স্টেশনের দিকে। পশ্চিমে নদী, লিটন ময়দান। লিটন ময়দান মাঠ নয়, প্রান্তরের শামিল—রেলপথ ও নদী দুয়েরই দুপাশে অনেক দূর অবধি ছড়ানো। রেললাইন বুক ভেদ করে গিয়ে উঠেছে নদীর পুলে, ঘেসো মাঠ, পাথুরে ধূসরতা, ঝোপঝাড় শালবন সবই আছে প্রান্তরে, একটি ঝরনা পর্যন্ত। লিটন ময়দানের শহর-ঘেঁষা

অংশের বিস্তৃতিতে শহরের ছাঁকা উপরওয়ালাদের কতকগুলি বাড়ি আর বাংলো ছড়ানো, ফলে ফুলে ভরা বাগান দিয়ে ঘেরা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট রাজা-জমিদার লাখপতি ব্যবসায়ীরা এ সব বাংলোয় বাস করেন, ক্লাব করেন, বাগানবাড়ি করেন, নোংরা ঘিঞ্জি শহরের দূরত্ব উপভোগ করেন দিগন্ত পর্যন্ত ফাঁকা দক্ষিণের হাওয়াকে টানা পাখায় নাড়া দিয়ে। এদের এলাকার একপাশে কিছু তফাতে অনেক বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে নতুন ফ্যাশানের কতকগুলি ছোটো-বড়ো বাড়ি উঠেছে সাধারণ বড়োলোক আর মধ্যবিত্ত মানুষের। অনন্তের বাড়িটিই বোধ হয় এই নতুন গড়ে ওঠা অবিমিশ্র দেশি পাড়ায় সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে সুন্দর হবে। অন্য এলাকাটিতেও বাড়িটা বেমানান হত না মোটেই। সামনে বাগান, চুনকাম করা ধবধবে সাদা মানুষ-সমান উঁচু প্রাচীর। দোতলার চারটি ঘরে আলো জ্বলছে।

কোন ঘরে নতুন মামি আছেন কে জানে ?

আলোকিত জানালাগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে পাকা সামনের পথ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়িটা অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিল, বাগানের শেষ কোণটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। ফুলের তীব্র সুগন্ধ তার নাকে লেগেছে একটা মনোরম মাদক আঘাতের মতো। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি ভুঁইচাঁপা নিশ্চয় ফুটেছে দেয়ালের ওধারের গাছে, নইলে রাস্তায় এমন গাঢ় হত না গন্ধ যে দম নিতে তার কষ্ট হয়। এত প্রিয় এই গন্ধ তার, অভিজ্ঞতা অনুভূতি স্মৃতির মতো, আনন্দ-বেদনার স্বাদের মতো !

গেট খুলিয়ে গটগট করে বাড়ির ভেতব গিয়ে নতুন মামির সঙ্গে দেখা করা যায়, ফিববার সময আলো দিয়ে খুঁজে কয়েকটা ফুল পেড়ে সে নিয়ে যেতে পারে অনায়াসে।

কিন্তু ফুলের জন্য হার মানবে নতুন মামির কাছে ? একেবারে প্রমাণ করে দেবে যে, না দেখে আর থাকতে পারল না বলে পাগলের মতো দেখতে ছুটে এসেছে রাত এগাবোটার সময় ?

প্রাচীব ডিঙিয়ে মিনিট দশেক খোঁজাখুঁজির পর দুটি ভুঁইচাপা ফুল উপড়ে নিয়ে পকেটে ভরে পাকা আবার রাস্তায় নেবে যায়। নাকের কাছে ফুল দুটিকে একটিবারের জন্যও সে ধরে না। নতুন তাজা ভুঁইচাঁপার গন্ধ শোঁকার সে রোমাঞ্চকর রতিও সে বাতিল করে দেয। বড়ো একা লাগছে। বড়ো বেশি রকম একা লাগছে। কেমন জটিল আর আড়ষ্ট হয়ে আসছে তার নিজের কাছেই নিজের মতিগতির স্বাচ্ছন্দ্য। একাকিত্ব দিয়ে যেন ক্রমাগতই সে জড়িয়ে জড়িয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলছে নিজেকে।

জীবনকে মেনেও এ কী অভিশাপ !

নদীর দিকের পথটা অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন এবড়ো খেবড়ো। কিছু দূর এগোলে অস্পষ্ট আর একটা গন্ধেরই অনুভূতি জাগে। এগোতে এগোতে বাড়তে থাকে পচা গন্ধের জের। নদীর ধারে কেদার ভট্টাচার্যের বেনামি চামড়ার কারখানার গন্ধ এটা। চাংসি নদীতে বর্ষাকালে মাস দুই নৌকা চলাচল করে, তারপর আরও মাসখানেক বজায় থাকে হাঁটুজলের একটা মৃদু স্রোত। বাকি মাসগুলিতে ভেসে থাকে বালির চর, তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে পচা বদ্ধ জলের পুকুর, দীঘি, হ্রদ। এমনই একটা জলার কাছে করা হয়েছে চামড়ার কারখানা, জলাটা কাজে লাগে। জঙ্গুলে আমবাগানটার গা ঘেঁষে কতগুলি অস্থায়ী কুঁড়েঘর, কারখানার কয়েকজন চামারের একটা বস্তি। কারখানা কিছু তফাতে থাকলেও এখানে গাঢ় পচা গন্ধ ম ম করে যেদিক থেকেই বাতাস আসুক। কালচে-মারা কাঠের গুঁড়ো এদিক ওদিক ছড়ানো আছে দেখা যায়, চামড়া পাকানোর কাজে লাগে ওই গুঁড়ো। এই গুঁড়ো বিছিয়ে চলার পথ ওরা নরম করেছে, শত বর্ষাতেও কাদা হয় না।

স্ত্রী-পুরুষ কয়েকজন একত্র হয়ে তখনও চেঁচামেচি করছিল ফাঁকা আমগাছটার নীচে নিকানো জায়গায় বসে। পচাই গিলে দু-তিনজন কাত হয়ে পড়েছে পচাইয়ের মাত্রা বাড়ায়।

খানিক তফাত থেকেই পাকা টের পায় এদের আজ কোনো পরব ছিল। ধরা-বাঁধা বছর-ঘুরতি কোনো পরব নাও হতে পারে, বিয়ে বা বিয়ে খারিজ বা অপরাধের প্রাচিত্তির বা অসঙ্গত জন্মকে সঙ্গত করা বা মরণকে মেনে নেওয়ার মতো কোনো ব্যাপার হতে পারে—সবই এদের পরবের মতো পালিত হয়, একভাবে সবাই মিলে পচাই খেয়ে চেঁচামেচি করে। ঢোলক করতাল বাজিয়ে আওয়াজ তুলে সবাই মিলে এক সুরে এক তালে একটানা সা-রা-রা-রা সা-রা-রা আওয়াজ করে জমজমাট করবে মেলামেশার পরব, তাও এরা জানে না। শুধু চেঁচামেচি করে এলোমেলো।

পাকাকে দেখে বুড়ো নাণ্ডি জিভ কাঁপিয়ে একটা উদ্ভট লুয়াউ লুয়াউ আওয়াজ তোলে, আওয়াজ থামিয়ে বলে, পা'লা বাবু এতাম রে !

চুপ থাক্ ঢ্যামনা বুড়ো।—পাকা হেসে বলে।

নিকানো মাটিতে সে বসে পড়ে ধপ করে।

বাস্, সভ্যতার সব দড়ি যেন ছিঁড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, গিঁট খুলে যায়, আলগা হয়ে খসে যায় সব বাঁধন। যা খুশি বলুক সে, যা খুশি করুক, কেউ এখানে ভাববে না : ছি ছি, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে—? ন্যাংটো হয়ে সে যদি ধেই ধেই নাচতেও আরম্ভ করে হঠাৎ, মজা পাবে সকল স্ত্রী-পুরুষ এখানে, হা হা করে হাসবে সকলে, বাবুদের ছেলে বলে তার সম্বন্ধে এদের মনে যেটুকু সন্দেহ ভয় আর অবিশ্বাস এখন আছে, আরও তা কমে যাবে। পাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মতো অভাগা ছেলে সত্যি জগতে নেই। এমন দুঃসহ তার জীবন যে জীবনের এই আদিম নিঃস্বতার মধ্যে এসে তাকে হাঁফ ছাড়তে হয় !

কারকি ভাঁড়ে পচাই এনে দেয় পাকাকে, ভাঁড়টা সামনে রেখে পাকার ডান হাতটা তুলে নিজের মুখে গালে বুকে পিঠে বুলিয়ে শুধোয়, পছন্দ হয় ? মোকে লিবি আজ ? একটা স্তন কারকির মরা, শুকনো। খড়ি-ওঠা কর্কশ গায়ের চামড়া। কিন্তু এমন তার দেহের গঠন, নতুন মমির ভাসুরঝি উষা এত উপোস আর বিশেষ ব্যায়ামের সাধনা দিয়েও যার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। কারকির ছেলেটাকে আছড়ে মেরেছিল পুলিশ সায়েব কার্লটন বুটের ধাক্কায় তেরো হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে। লিটন ময়দানের ঝরনার ধারে তিন বছরের ছেলেটা না বুঝে ধরতে গিয়েছিল সায়েবের কচি মেয়েটাকে। তার পুরুষ গিধার সাহেবের মাথায় লাঠি মারতে গিয়ে মারতে রাজি হয়নি বলে কারকি দা দিয়ে নিজের স্তন কাটতে আরম্ভ করেছিল।

যা যা বুড়ার কাছে যা।

পচাইয়ের ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকায় পাকা নিশ্বাস আটকে রেখে। গন্ধেই তার বমি আসে। একটা দুয়ানি নাণ্ডির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, আমার চাঁদা।

দুনি ? আঠ আনা দে, আঠ আনা দে।

পাকা মাথা নাড়ে।—ভাগ্ ভাগ্, আট আনা খায় না।

ও সব জানা আছে পাকার। বেশি পয়সা খয়রাত করলে এদের খাতির মেলে, পাত্তা মেলে না। দয়া এরা চেনে টাকাওয়ালা মানুষের, কেউ টাকা ছড়ালেই এদের মনে সন্দেহ জাগে তার মতলবটা কী। সে অবিশ্বাস আর ঘোচে না, দাতা হিসাবে তাকে সসম্মানে তফাতে রেখে দেয়, নজর রাখে উপকারী সাপকে চোখে চোখে রাখার মতো। যতক্ষণ সে দাতা হাজির থাকে কাছে এরা আর নিজেরা থাকে না ততক্ষণ, সে যেমন চায় সেই রকম হবার চেষ্টা করে, আড়ষ্ট, সতর্ক, ভোঁতা আর বোকা ভালোমানুষ। জেলে-বাগদি চাষি-মাঝিদের সঙ্গে পাকা মিশছে ছেলেবেলা থেকে, ও অভিজ্ঞতা তার আছে। বিকৃত শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা-ভব্যতার ভারী বোঝা নামিয়ে মনটাকে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রামের সুযোগ দিতে হলে ভদ্রত্ব বাবুত্ব ছাঁটলেই শুধু চলে না, পয়সাওলাত্বটাও ছাঁটতে হয়। নইলে

এই গরিব ছোটোলোকেরা ততটুকু আমল কিছুতেই দেয় না যতটুকু আমল না পেলে এদের সঙ্গে বসে এদের মতো অভদ্র হওয়া যায়।

অবশ্য একেবারে ঘোচে না সন্দেহ অবিশ্বাস—কিছুতেই না। সব খোলস খুলে ওদের ভাব ভাষা ভঙ্গি আয়ত্ত করে প্রাণখুলে সমানভাবে মিশলেও না। ভয়, সংকোচ, ব্যবধান কমবেশি থেকে যাবেই। বন্ধু বলে, আপন বলে, নিজেদের একজন বলে এরা তাকে মেনে নেয়নি। এটা তার পাগলামি বলে জেনে, মাথায় ছিট থাকার জন্যই সে এ ভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে আসে ধরে নিয়ে, তবে এরা মোটামুটি আশ্বস্ত হয়েছে যে হয়তো তার বিশেষ কোনো খারাপ মতলব নেই। বয়সটা তার কম, এ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে নিয়ে টানাটানিও করেনি। সে পাগলাবাবু, তাই বাবুত্বের প্রতি হাড়েমজ্জায় মেশানো ভয়-সংকোচ অনেকটা এরা বাতিল করেছে তার বেলায়।

তা হোক, উপায় কী! এরা পাগল ভাবে না ছাগল ভাবে তাকে তাতে তার বয়ে যায় বলেই না এখানে সে পায় এতখানি মুক্তি, মনটা এত সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারে। কে কী ভাববে ভাবতে হয় না, নিজেকে জাহির করতে হয় না, বিদ্যাবুদ্ধির বাহাদুরি বজায় রাখতে হয় না, মান অভিমানের পালা গাইতে হয় না, দরদ দেখাতে হয় না, যাকে দেখলে গা জ্বলে তার সঙ্গে হাসিমুখে আর যাকে দেখলে গায়ে থুতু দিতে ইচ্ছা হয় তাকে সম্মান করে কথা কইতে হয় না...কিছুই করতে হয় না।

ওদের সুখী স্বাধীন মনে করে পাকা, কী সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন! ওদের মধ্যে নিজে সে যে অপূর্ব মুক্তির স্বাদ পায় তারই মাপকাঠিতে সে বিচার করে ওদের জীবনকে। দরদ খানিকটা আছে বইকী, তবে সেটা সব সময়ে তেমনভাবে অনুভব করে না। একটা দয়া আর সহানুভূতির ভাব মাঝে মাঝে গভীরভাবে নাড়া দেয় তার হৃদয়-মনকে। বড়ো সে বিচলিত হয়ে পড়ে তখন। ভাবে, মোটা মোটা টাকা দান করে এদের দুঃখ যদি সে দূর করতে পারত!

নতুন একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছিল। আগে বোধ হয় দু-একবার ওকে দেখেছিল পাকা, মাঝখানে এখানে ছিল না, ভালো মনে নেই। কমদামি হলেও রঙিন একখানা শাড়ি তার পরনে—তার চেয়েও দর্শনীয় গলার তার ছেঁড়া জুতার মালাটি। কপালে সিঁদুরে মাটির থাবড়ানো গোলাটা শুকিয়ে উঠেছে, চাঁদের আলোয় মনে হয় কপালের চামড়াটাই বুঝি চলটার মতো উঠে আসবার উপক্রম করছে।

হেই পাগলাবাবু, খপর্দার! জবরদস্ত মোচে তা দিয়ে জোয়ান ঝান্‌কু বলে, উয়ার পানে নজর লয়।

সে জবর নেশা করেছে এতক্ষণ চেঁচামেচি করছিল সবার চেয়ে বেশি। এমনিতেই তার মেজাজটা গরম, পচাই খেলে একেবারে বিগড়ে যায়। মোটা মোটা হাড়ে গড়া মস্ত জোরালো চেহারা, বাঁ গালে কান থেকে চিবুক পর্যন্ত একটা কাটা দাগ, ঢেউ তোলা গোঁফ সেটা অতিক্রম করে গেছে।

পাকা এক গাল হেসে বলে, চুপ থাক শালা।

টলতে টলতে উঠে তাকে মারতে আসে ঝান্‌কু গাল দিতে দিতে। ছেঁড়া জুতোর মালা-পরা মেয়েটি তার কাপড় ধরে টেনে রাখতে চায়। ধর্‌রাও জোয়ান, সে উঠে এসে ঝান্‌কুর হাত চেপে ধরে।

বুড়ো নাঙি হাঁকে, হেই ঝান্‌কু!

পাকা গলা ফাটিয়ে ধমকায়, মুখ সামাল এই বজ্জাত! খুন করে ফেলব।

ঝান্‌কু গর্জে ওঠে। একা সে মেরে থেঁতলে দিতে পারে পাকাকে পাঁচ মিনিটে, কিন্তু কোমর থেকে পাকা ধারালো ঝকঝকে ছোরা বার করে বাগিয়ে ধরেছে। আরও তিন-চারজন পুরুষ উঠে এসে ঝান্‌কুকে জাপটে ধরে। নাঙি তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে, চুপ মেরে বস্‌ গা ভালা চাস্‌ ত। তুর বিয়া বাতিল করে দিব বলে দিলম, খানকির বাচ্চা!

অঁ ? ঝান্‌কু যেন সত্যই ভয় পেয়ে সজাগ হয়ে নিজে থেকে পিছু হটে শান্ত হয়ে বসে, জোর করে ঠেলে নিতে হয় না।

উয়ার বিয়া ?—পাকা শুধোয়।

অঁ।—সায় দেয় নাঙি।

ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হবে ঝান্‌কুর। দুলী একজন খ্রিষ্টানের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল কমাস আগে, লোকটা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে খবর পেয়ে ঝান্‌কু তাকে নিয়ে এসেছে। দোষ কাটাবার ব্যবস্থা আজ সম্পূর্ণ হল, আজ মাঝরাত্রে। এখন গলার জুতার মালা খুলে ফেলা হবে দুলীর, কাল বিয়ে। জুতার মালা খোলার পর স্নান করে একটা জিনিস খেয়ে নির্দোষ হবে দুলী, বাকি রাতটা কোনো ছেলের মার কাছে শুয়ে থাকবে। খেয়ে পবিত্র হবার জিনিসটার নাম শুনে গা শিরশির করে উঠল পাকার—এত নিচু কি এরা যে প্রায়শ্চিত্তে গোবর খাওয়াও সানায় না, এমন নোংরা অশ্লীল জিনিস দরকার হয় ?

চাঁদ হেলে পড়েছে। গাছের ছায়া প্রায় ঢেকে দিয়েছে নিকানো স্থানটি। এবার বাড়ির দিকে পা বাড়ানো উচিত, অনেকটা হাঁটতে হবে।

৩

মাঝরাত্রি পার করে পাকা বাড়ি ফিরল।

এই প্রথম নয়, অভ্যাস আছে। দরজা খুলতে কাউকে সে ডাকে না, দেয়াল বেয়ে গোয়ালের চালা রান্নাঘরের ছাত হয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে যায়। সেখান থেকে তেতলায় উঠবার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থাই আছে।

তেতলায় ছোটো একখানা নিরিবিলি ঘরে থাকত বড়োমামির আশ্রিত-ভাইপো রমেন, আবদারের গায়ের জোরে তাকে উৎখাত করে নিজে ঘরটি পাকা দখল করেছে। রমেন অবশ্য দোতলায় অনেক ভালো আর বড়ো ঘরে স্থান পেয়েছিল মেজোমামা গিরিশের ছেলে সলিলের সঙ্গে, নইলে বড়োমামি কখনও সইত না এ অপমান। এবং সমবয়সি রমেনের সঙ্গে সলিলের অবশ্য খুব ভাব হয়েছিল, নইলে নিজের ঘরে সে তাকে কোনোমতে ঠাঁইও দিত না।

ভৈরব জানত পাকার আবদার কী চিজ। তেতলার ঘরটি না পেলে পাকার আবদার দাঁড়াত জিদে, একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। পাকা হয়তো রাগ করে ফিরে যেত তার বাবার কাছে। পাকার বাবা ভৈরবকে লিখত : শুনিলাম তুমি শ্রীমানকে লেখাপড়ার সুবিধার জন্য একখানা ঘর ছাড়িয়া দিতেও আপত্তি করিয়াছ। তোমার ভাগনে ভাগনিরা তোমার কাছে কখনও কোনো প্রত্যাশা করে নাই, কখনও করিবেও না। অত্যন্ত দুরন্ত বলিয়া এবং তুমি নিজে হইতে লিখিয়াছিলে বলিয়া যে তোমার ওখানে থাকিয়া পড়িলে হয়তো শ্রীমান শুধরাইতে পারে সেই জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তুমি যে একটা বছরও—ইত্যাদি। দেশ-বিদেশে যেখানে যত আত্মীয়কুটুম্ব আর বন্ধুবান্ধব থাকে সকলে ভৈরবের হীনতার খবর পেত—পাকার বাবা গরিব নয়, পাকা আশ্রয়-ভিখারি নয় মামাবাড়িতে, তবু তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার ! পাকা নিরুপায় নিরাশ্রয় গরিবের ছেলে হলে বরং কথা ছিল। ঘরে ভাত ঢাকা থাকে, কোনোদিন লুচি বা পরোটা, বাটিভরা দুধ, প্রায়ই সন্দেশ। আঁতুড়েই কেন যে ছেলেটাকে কেউ গলা টিপে শেষ করেনি ভেবে ভৈরব মাঝে মাঝে নিজের মনে আপশোশ করে, কিন্তু কী করা যায়, নিজের মান বাঁচাতে বাধ্য হয়ে পাকার আদরযত্নের বিশেষ ব্যবস্থার হুকুম দিতে হয়েছে। নয়তো টাকা থাকলেও বাড়ির মানুষকে লুচি-পরোটা দুধ-সন্দেশ খাওয়াবার মতো হাতখোলা মানুষ ভৈরব নয়।

বড়োলোকের বড়ো সংসার, রাতে হাঙ্গামা চুকে আলো নিভে বাড়ি অন্ধকার হতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। বড়ো জোর, মাঝরাত্রি হয় ঠাকুর-চাকরদের শুতে। পাকা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে, আজ এখনও কয়েকটা ঘরে আর বারান্দায় আলো জ্বলছে,—রাত প্রায় দুটো বাজে। রাঙামামির ঘরের দরজা খোলা, রাঙামামি ঘরে নেই, ছেলেমেয়েগুলি ঘুমোচ্ছে। মেজোমামির ঘরের দরজা ভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে। ভৈরবের মেজো মেয়ে সরযূর ঘরে তার বর টেবিলে খোলা বইয়ে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে, বোধ হয় সরযূর প্রতীক্ষায় বই অবলম্বনে জেগে থাকবার চেষ্টার ফল এটা,—সরযূর বিয়ে হয়েছে মোটে বছরখানেক।

কিছু ঘটেছে। নিশ্চয় ঘটেছে।

তেতলা থেকে সরযূর চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে আসে।

নতুন মামি এসেছে নাকী? এত রাত পর্যন্ত বাড়ির মেয়েদের হাসিগল্পের আর কী উপলক্ষ ঘটতে পারে আজ!

তেতলায় সেজোমামির ঘরে নতুন মামিকে ঘিরেই গল্পের আড্ডা বসেছে দেখা যায়। দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভালো করে একনজর নতুন মামিকে দেখারও সুযোগ পায় না পাকা, মেজোমামি কথা থামিয়ে বলে, ওই যে এসেছেন!

নতুন মামির চোখ ঘুরে আসে পাকার দিকে। মুখের হাসি, চোখেব কৌতুক মিলিয়ে যায়। আগ্রহ উৎকণ্ঠা বিস্ময় মিশিয়ে নতুন মামি বলে, পাকা! কোথা গেছিলে তুমি? কোথা ছিলে এত রাত পর্যন্ত? ভেবে মরি আমরা এদিকে, চাদ্দিকে লোক পাঠিয়েছিলাম খুঁজতে—ইস্, কী চেহারা হয়েছে?

নতুন মামির হাসি দেখেই পাকার মন বিগড়ে গিয়েছিল। ভেবে মরি? এত হাসি, এত গল্প বুঝি ভেবে মরার লক্ষণ যে পাকা কোথা গেছে?

সরযূ বলে ঠোঁট উলটে, নতুন কাকির যেমন, ও তো রাতকাবার করে ফেরেই। আমি টের পাই না? দরজা দিয়ে আসেন না, গোয়ালঘরের চালায় উঠে ছাত বেয়ে বাড়ি ঢোকেন। কত বললাম, আসবে আসবে, সময় হলেই বাবু বাড়ি আসবে। নতুন কাকি হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল, যাও যাও, ছোটো সবাই, খোঁজ নাও কী হল! আমি যত বলি, নতুন কাকি—

তুই থাম তো সরযূ।

সরযূ থেমে গেল অত্যন্ত আহত হয়ে। নতুন কাকি সুধাময়ী শুধু তাকে থামতে বলেনি ধমক দিয়ে, গম্ভীর থমথমে মুখে এমন তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে!

সুধা সহজভাবে পাকাকে বলে, ভেতরে এসো পাকা। জিরিয়ে নাও একটু, তারপর খাও যদি তো খাবে, নয় ঘুমোতে যাবে। দশটা বাজে, এগারোটা বাজে তুমি ফিরলে না। আমার সত্যি বড়ো ভাবনা হয়েছিল, ওরা বলেছিল বটে এক-একদিন তুমি খুব রাত কর বাড়ি ফিরতে, কিন্তু আমি ভাবলাম, লাইব্রেরিতে ওই সব কাণ্ড হল, তুমি যদি কিছু করে বসে থাক! খেয়েদেয়ে বাড়ি চলে যাব ভেবেছিলাম, তার মধ্যে তুমি নিশ্চয় ফিরবে, ওমা, তোমার দেখাই নেই। এখানেই রয়ে গেলাম আজ রাতটা—

আমরা যেন থাকতে বলিনি? ফোঁস করে ওঠে দারুণ অভিমানে গিরিশের মেয়ে গীতা।

সুধা কান না দিয়ে পাকাকে বলে, তোমার চেহারা তো বড়ো খারাপ হয়ে গেছে পাকা।

আমরা খেতে দিই না—

পাকাও কান না দিয়ে বললে, নদীর ধারে গিয়েছিলাম।

আমিও তাই ভাবছিলাম, নদীর ধারে, নয় লিটন ময়দানের ঝরনার কাছে নিশ্চয় বসে আছে। জানি তো তোমায়!

নদীর ধারে ভয় করল না একা একা ?—ভয়ে ভয়ে ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করল সেজোমামি মিনতি। পটের পরির মতো সুন্দরী মিনতি, অত্যন্ত ছেলেমানুষ, বয়স বোধ হয় সতেরোও হয়নি। খারাপ পাড়ায় গিয়ে চরিত্র খারাপ করার জন্য ভাইকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবার মাস তিনেক আগে মণীশকে ঘরে চরিত্রবান ছেলে করে আটকে রাখার শেষ চেষ্টা হিসাবে ভৈরব মিনতিকে ঘরে এনেছিল। মিনতিকে দেখলে ভৈরবের শেষ চেষ্টার সত্যি তারিফ করতে হয়। সে হেন মানুষ টাকা চায়নি, গয়না চায়নি, শুধু চেয়েছিল রূপ,—মণীশের চোখে যাতে এমন ধাঁধা লেগে যায় যে বাজারের রূপসিদের তার মনে হবে বিন্দে ঝির মতো কুৎসিত। মিনতিকে দেখে মানুষ সত্যি অবাক হয়ে ভাবে যে কেন তা হয়নি, চোখে কেন পলক পড়া বন্ধ হয়নি মণীশের।

মণীশ চলে গেছে, তাড়িয়ে দেবামাত্র গভীর রাত্রে মাতাল অবস্থায় এক কাপড়ে চলে গেছে। মিনতিকে ভৈরব একদিনের জন্য গরিব বাপের একতলা বাড়িতে যেতে দেয় না। ভাইকে শোধরাবার এমন চাল তার ব্যর্থ হয়েছে ভৈরব তা মানবে না। মিনতির জন্যই নাকি মণীশ ফিরে আসবে !

পাকা বলে, কীসের ভয় ?

এই নদীর ধারে একেবারে একলাটি—মিনতি হাসবার চেষ্টা করে। কান্নার মতো চেষ্টা।

যাগ গে, যাগ গে, সুধা বলে জোর দিয়ে, রাত বুঝি ভোর হল। কিছু খাওনি তো ? খাবে নাকি এত রাতে ?

খাব, চান করে খাব।

চান করবে ? নতুন মামি যেন মিনতির সুরে বলে।

একটু যেন রোগা হয়ে গেছে নতুন মামি, না-ফরসা না-কালো রঙের সে অদ্ভুত মখমলে জলুশ খানিকটা ভোঁতা হয়েছে। গালের তিলটা যেন আলগাভাবে ভাসছে না, এঁটে বসেছে। কোমরের বাঁকটা যেন আরও বেঁকেছে, রোগা হওয়ার জন্য নিশ্চয়। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত আগেরই মতো অবিকল। পায়ের গোড়ালিতে কয়েকটা ফাটার দাগ নতুন, দুর্বোধ্য। আলতা পরুক আর না পরুক, ঝামা ঘষুক আর না ঘষুক, নতুন মামির পায়ে ফাটল ধরেছে বড়োমামি, মেজোমামি, বিন্দে ঝির মতো, যারা খালি পায়ে ভিজে মেঝেতে হেঁটে বেড়ায় সংসারের কাজে ! কী অদ্ভুত ব্যাপার এটা ? চোখ একেবারে নতুন হয়ে গেছে নতুন মামির। এ আবছা কালো কাজলের ছোপ কোথা থেকে এল চোখের নীচে, চোখের পাতায়, যা কাজল নয়, চামড়ার রং ? চোখে যেন কোনো একটা কষ্ট স্পষ্ট হয়েছে, দেহরে অথবা মনের। বরাবর সে দেখে এসেছে শুধু আনন্দের, উল্লাসের, প্রাণ-চাঞ্চল্যের চমক-মারা জ্যোতিভরা চোখ নতুন মামির, ক্লান্তিতে স্তিমিত। অথবা অন্য কিছু হয়েছে নতুন মামির চোখে ? চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা নেবার দরকার ? এ বড়ো বিশ্রী ব্যাপার। নতুন মামির চোখ বদলে গেছে, খাপছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু কেন হয়েছে, কী বৃত্তান্ত কিছুই সে জানে না, জানবার উপায় নেই। অথচ শুধু এটুকু জানবার জন্য সে মরতে রাজি আছে।

চান করবে ? সত্যি চান করবে ? চলো তবে, আর দেরি নয়, চলো।

নতুন মামি যেন ধৈর্য হারায়।

পাকা সাবান মেখে স্নান করে আসে। খেতে বসে। ডাল তরকারি মাছ দুধ সন্দেশ সব চেটেপুটে খায়। আঁচিয়ে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। নতুন মামি মশারি ফেলে মশারি গুঁজে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চৌকির পাশে এটা সে অনুভব করে দু-একমিনিটের জন্য, স্বপ্ন দেখার মতো। তারপর গাঢ় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে জাগ্রত দিনটা শেষ হয়।

তিন

১

একুশের আন্দোলন আপসের হতাশায় ফুরিয়ে গেছে। স্বাধীনতা আসেনি।

আন্দোলন নেই কিন্তু নেতারা আছেন। সাধারণ খাটিয়ে গরিব মানুষ বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু নেতারা মুনাফা লুটেছেন জনপ্রিয়তার।

এই শহরের ছোটোখাটো নেতারা পর্যন্ত।

স্বাধীনতা নাই বা পাওয়া গিয়ে থাক একুশ সালে, ক-বছর পরে শহরটা স্বাধীনতার ভরসা-দাতা মহাপুরুষ অনন্তলালকে পেয়েছে।

রবিবার বিকালে রাজা ভীমশ্রীতিলক মেমোরিয়াল হলে অনন্তলালকে মহাসমারোহে সংবর্ধনা দেওয়া হল।

শুধু বিকালে নয়, সমস্ত রাত ধরেও বটে। সভাটা হল বিকালে, ঘণ্টা দুই। তারপর রাত দশটা থেকে কাকডাকা ভোর পর্যন্ত হলের স্থায়ী স্টেজে অভিনয় করা হল বাংলায় বর্গির হানা অবলম্বনে লিখিত একটি নাটক ও 'শিক্ষিতা বউ' প্রহসন। এটাও যে অনন্তলালের সংবর্ধনারই অঙ্গ বিকালে সভায় তা বিশেষভাবে ঘোষণা কবা হয়েছিল।

এই জেলা শহরে একটি মস্ত অ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাব আছে, প্রতিষ্ঠা ১৯১৮ সাল ইং। সাত-আটবছর ধরে ক্লাবটি প্রতিবছর গড়ে তিনটি নাটক এবং প্রত্যেকটি নাটকের সঙ্গে ছোটো একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করে শহরবাসীকে আনন্দ দিয়ে আসছে, অসহযোগ আন্দোলন চলবার সময়টা ছাড়া। আন্দোলন একটু থিতিয়ে এলে, যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন অধিকাংশই যখন বেরিয়ে আসেননি, ক্লাব মরিয়া হয়ে ক্লাবের সভ্য তরুণ উকিল নরেন দস্তিদারের স্বলিখিত একটি স্বদেশি নাটকের অভিনয় করে শহরবাসীর হৃদয় জয় করে।

নাটকটি ছিল খুবই কাঁচা আর অত্যন্ত ফেনিল ও করুণ। দেশের জন্য ত্যাগ করা, এমন কী নায়িকাকে পর্যন্ত কিছুদিনের জন্য দেশের বৃহৎ প্রয়োজনের কাছে ছোটো করা, এ সব ছাড়াও অন্য বড়ো বড়ো কথা ছিল অনেক, তবু নাটকটা ছিল শুধু ব্যর্থতা ও হতাশার বেদনায় ভরা, পরিণতিটা মিলনাত্মক হলেও। মাত্র কয়েকবছর পরে আজ ক্লাবের সভ্যরাই টের পেয়ে গেছে, ও রকম বাজে নাটক কেন তখনকার মানসিক অবস্থায় মর্মস্পর্শ করেছিল সকলের। সংঘর্ষের অভাব, জীবন্ত তেজ ও বিক্ষোভের অভাবে কাতর হয়ে মনটা আঁকুপাঁকু করেছিল সকলের যে, মানুষ যা চায় তা হয় না কেন ?

ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল রাজকুমার জয়শ্রীতিলক, এখন সে সীতাপুরের রাজা। গোড়ায় সে অভিনয় নিয়ে মেতে উঠেছিল, ক্লাবের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছে। রাজা হবার পর অন্য কড়া কড়া নেশায় মেতে পুরুষকে মেয়ে সাজিয়ে অ্যামেচার থিয়েটার করবার বা করাবার নেশাটা জলো হয়ে গেছে খানিকটা। আজও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নাম থাকলেও ক্লাব তাকে তেমনভাবে আর পায় না, তার টাকাও পায় কদাচিৎ, যৎকিঞ্চিৎ।

অনন্তলাল বরাবর মাসে দশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে এসেছে, এবার এখানে এসে সকলে ধরে পড়ায় ক্লাবের ফান্ডে এককালীন দান করেছে আড়াইশো টাকা।

আরও সপ্তাহ দুই রিহার্সাল দেবার দরকার ছিল নাটকটা ভালোমতো খাড়া করতে, কিন্তু অনন্তলাল কাল চলে যাবে তাই আজ তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে অভিনয় করা হচ্ছে। অভিনয়ে খুঁত থাকবে সন্দেহ নেই কিন্তু কে ধরবে খুঁত মফস্বলের শহরে এই বিখ্যাত দলের অভিনয় বিনা পয়সায় দেখতে এসে !

এদের থিয়েটার সত্যই এখানে একটা উৎসব পরবের মতো। ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে যায়, পান, বিড়ি, লেমোনেড, চা যারা বিক্রি করে তাদের মধ্যেও। বাড়ি বাড়ি মেয়েরা তাড়াহুড়া হইচই করে বেলাবেলি রাঁধাবাড়া সারে, আগ্রহে উত্তেজনায় তাদের ওলট-পালট হয়ে যায় কথাবার্তা চলাফেরা কাজকর্ম। উতলা হবার জন্য পুরুষেরা ঠাট্টা করে মেয়েদের, তেমন সম্পর্ক হলে ধমকও দেয়, কিন্তু মনে মনে তারাও কম উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে না সময়মতো যাবার জন্যে, আগে থেকে পাট-করা জামাটি, ফরসা কাপড়টি ঠিক করে, জুতোতে কালি লাগিয়ে রাখে।

ও সব বালাই যাদের নেই, রান্নাবান্নার হাঙ্গামারও নয়, ফরসা জামাকাপড়েরও নয়, অর্থাৎ গরিবদের, তারাও অনেকে শুনতে যায় থিয়েটার। কয়েকটা বেশি পয়সার ব্যবস্থা রাখে, কিছু বেশি পান ও বিড়ির জন্য। আগে গেলেও তারা সামনে বসতে বা দাঁড়াতে পায় না। পিছনের বেঞ্চে কয়েকজনের স্থান হয়, বাকি সব দুপাশে ও পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে সারারাত থিয়েটার যতটা পারে দেখে ও শোনে।

অনেকে ভাবে যে বাবুদের এমন বোকামি কেন, লম্বাটে ঘরের এক মাথায় পালা না কবে ফাঁকা জায়গায় আসর করলেই হয় চাদ্দিকে স্থান রেখে, ঘিরে বসে মানুষ শুনতে পারে।

রাজা ভীমশ্রীতিলক মেমোরিয়াল হলটি অভিনয় করার উদ্দেশ্যে থিয়েটার হলের মতো করেই তৈরি। পাকা মেঝে ও উঁচু দেয়াল, উপরে কাঠের আচ্ছাদন, তার উপর টিনের চালা। গাদাগাদি করে হাজার খানেক লোক ধরে। ক্লাবের প্রত্যেক অভিনয়েই গাদাগাদি মানুষ হয়।

একটু ফাঁকায় হলটা তৈরি করা হয়েছে জায়গার সুবিধার জন্য, কাছাকাছি বাড়িঘর বেশি নেই। শহরের সভাসমিতি সব কিছুই প্রায় হয়ে থাকে আদালত এলাকা ও শহরের বসবাসের এলাকার মাঝামাঝি চৌকো টাউন হলটাতে। কদাচিৎ বিরাট জনসভা হলে, ফাঁকা মাঠে। এই হলটি শুধু যেন আছে অভিনয় করবার জন্য, এখানে সভা করার, এমন কী বিরাট জনসভা করার পর্যন্ত এত সুবিধা, কিন্তু নাটক অভিনয় ছাড়া সারা বছর ওখানে কিছুই হয় না। বোধ হয় এই কারণে যে সেটাই দাঁড়িয়ে গেছে প্রথা। টাউন হলটি পুরানো, দেয়ালে কয়েকটি বড়ো বড়ো তৈলচিত্র, কয়েক স্থানে বসানো কয়েকটি মর্মর মূর্তি এবং টেবিল চেয়ার বেঞ্চগুলি অযথা ভারিক্কি গঠনে গুরুগম্ভীর। ভারিক্কি লোকেরা ওখানে সভা করতেই হয়তো তাই ভালোবাসে।

সারা বছর ফাঁকা পড়ে থাকে থিয়েটারের হলটির আশেপাশের জায়গা, সন্ধ্যার পর সেখানে হয়তো শেয়ালও ঘোরাফেরা করে নিঃশঙ্ক চিত্তে, অসংখ্য বাদুর-চামচিকে যে হলটার ভেতরে বাসা বেঁধেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অভিনয়ের রাত্রেও—অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তৃতার সময়ও হয়তো চামচিকে নায়কের গালে ঝাপটা দিয়ে নায়িকার ওড়নায় জড়িয়ে গিয়ে দর্শকদের হাসায়। তবে তাতে অভিনয় মাটি হয় না। এক মিনিট পরে কেউ মনেও রাখে না চামচিকের কথা।

নিখিল ঘোষাল এই ক্লাবের সেরা অভিনেত্রী।

ক্লাব স্থাপনের পর প্রথম নাটকে সতেরো-আঠারো বছর বয়সে সে নায়িকার পার্ট করেছিল, সাত-আটবছর পর আজও কেউ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে অতিক্রম করে যেতে পারল না। পড়াশোনা ছেড়ে সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে চাকরি নিয়েছে, পাড়ার একটি কালো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিয়ে করেছে বছর দুই আগে বাড়ির লোকের সঙ্গে লড়াই করে, ক-মাস আগে একটি মেয়ে হয়েছে তার। রোগা ছিপছিপে গড়নটি তার অবিকল বজায় আছে, গোঁফদাড়ি কামিয়ে মুখে রং মেখে বুকে কাঠের বর্তুল দুটি এঁটে নিজের স্ত্রীর একখানা জমকালো সিল্কের শাড়ি পরে (ক্লাবের সভ্যরা অভিনয়ের জন্য দরকারি সাধারণ পোশাক নিজেদের বাড়ি থেকেই আনে, বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ক্লাবের আছে) সে যখন এবারও স্টেজে এসে দাঁড়াল, পুরুষেরা তাকাল সচকিত হয়ে, মেয়েদের চোখের কোণে ঝিলিক মেরে গেল ঈর্ষা।

কবে বর্গি এসেছিল বাংলায়, তখনকার মেয়েদের বিশেষ ধরনের বেশ ধারণ করার সুযোগে একেবারে মোহিনী হয়ে নিখিল নেমেছে স্টেজে, বাস্তব জীবনে কোনো মেয়ের আজ যে সুযোগ স্বাধীনতা নেই।

ভুবনের বিধবা বোন চপলা তার মেয়েকে বলে, ও রকম সাজতে ইচ্ছে হচ্ছে তোর ! টের পেয়েছি।

পনেরো বছরের প্রতিমা বলে, কী রকম মানিয়েছে দেখো মা !

মানিয়েছে, স্টেজে মানিয়েছে,—চপলা বলে, মেয়েকে অত্যন্ত বিরক্ত করেছে জেনেও ধীর-স্থির ভাবে বলে—তুমি যদি বাড়িতে ও রকম বেশ কর, স্কুলে যাও, সবাই হাসবে। পাকাও হাসবে। তা ছাড়া কী জানো, তখনকার দিনেও কোনো মেয়ে ও রকম বেশ করত না। কোনো মেয়ে তখন এ রকম বেশ করলে তখনকার লোকেরাও ভাবত সং সেজেছে।

মা, আমি রানীর কাছে গিয়ে বসি ?

বসো।

চপলা নিশ্বাস ফেলে। উপায় কী ?

সুধার সঙ্গে কথা বলে চপলা। ভুবন ও ভৈরবের বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বাড়ি বেড়াতে যায় না বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কথা বন্ধ নেই। কথা না বলে দূরত্ব বজায় রাখাটা ধাতে আসে না মেয়েদের। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস গুজগাজ নিন্দা ও সমালোচনা চলে অফুরন্ত অন্য বাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে, দূর থেকে এড়িয়ে চলা চলে, সামনে পড়লে পরিহার করাটা ধাতে সয় না। নলিনী দারোগার বউটাকে পর্যন্ত ছেঁটে ফেলতে পারেনি মেয়েরা এখানে, পারলে দোকান সাজানোর মতো গয়না আর অদ্ভুত ঝলমলে শাড়ি পরে বেচারি ঘেঁষাঘেঁষি মেয়েদের মধ্যে একেবারে একা হয়ে যেত, সাথি থাকত শুধু তার ন-মাসের ছেলে রাখবার ঝিটি।

দারোগার বউ ! কিছুকাল আগেও যে দেশে মা ছেলেকে আশীর্বাদ করত এই বলে যে, দারোগা হও,—সেই দারোগার বউ !

অহংকারে এমনই তার গলা উঁচু, বুক চেতানো, আর একটু অহংকার বেড়ে নিজে থেকেই সে যদি একা হয়ে যেত কারও সঙ্গে কথা না বলে, সকলে খুশি হত, স্বস্তি পেত। পান চিবিয়ে চিবিয়ে তার কাটা কাটা কথা, নাক সিটকানো, বয়স্কাদেরও তুমি তুমি করা, ভুল করে অন্যটার বদলে আজ এই জড়োয়া নেকলেসটি পরে আসবার কথাটা হাজারবার উল্লেখ করা—শুনতে শুনতে সকলের গা জ্বালা করে। বড়োঘরের মেয়ে-বউয়েরা নানা কৌশলে স্থান অদলবদল করে একটু সরে যায়, পিক ফেলতে উঠে গিয়ে ফিরে এসে অন্য একজনকে নিজের খালি জায়গায় বসিয়ে নিজে বসে তার জায়গায়। একসময় দেখা যায়, নলিনী দারোগার বউ যাদের মধ্যে এসে বসেছিল তারা আর নেই তাকে ঘিরে, গরিব মধ্যবিত্তের বউ, বয়স্কা গৃহিণী আর বিধবাদের মধ্যে সে শোভা পাচ্ছে। তার বসার উদ্ধত ভঙ্গি বদলে গেছে, কথাও কমে গেছে আশ্চর্য রকম !

ভুবনকেও আসতে হয়েছে অনন্তলালের সংবর্ধনার সভাটি বাদ দিয়ে এই অভিনয় উপলক্ষে। এখানে না এসে উপায় নেই, লোকে ভাববে তাকে বুঝি নিমন্ত্রণ করা হয়নি, সে বুঝি বাদ পড়েছে। সামনে সম্মানের আসনে ভৈরবের পাশেই তাকে বসতে দেওয়া হয় অন্যান্য গণমান্যদের সঙ্গে, ভৈরব ও অনন্তলালের সঙ্গে ভদ্রতার অমায়িক আলাপও তার চলে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বা উঁচুদরের হাকিমরা কেউ এখানে আসে না, কারণ তাদের বসবার স্পেশাল স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নেই। ভৈরব, ভুবন, অনন্তলাল প্রভৃতি বিশেষ মান্যগণ্যেরাও সাধারণত নাটক আরম্ভের একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার মধ্যে উঠে যায়। তারা যে গণ্যমান্য নেতা !

২

রাতের পর রাত যে শূন্য নির্জন হলটিকে ঘিরে অন্ধকারে মেঠো বাতাস কেঁদে ফেরে, আজ তার ভিতর ও বাইরে এত হইচই কলরব, আলোর ছড়াছড়ি ভোজবাজির মতো অদ্ভুত লাগে, রাত্রি জাগরণের এমন উপভোগ্য উন্মাদনার মধ্যে ভোলা যায় না কাল আলোহীন শব্দহীন এই পরিত্যক্ত স্থানটি দূর থেকে দেখেও মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যাবে। স্বপ্নের মতো মিথ্যা মনে হবে আজ রাত্রের উৎসব, আনন্দ, কোলাহল।

পাকা অন্য মনে কানাইকে বলে, কাল সন্ধ্যাবেলা একবার আসতে হবে কানাই। দেখে যাব, কী রকম লাগে !

কানাই চুপ কবে গম্ভীর হয়ে থাকে। অন্য একটি ছেলের সঙ্গে পাকাব অনেক পরে কানাই থিয়েটার দেখতে এসেছে। এসেই একেবাবে বসে পড়েছে জায়গা দখল করে। তাদেব যেন বসে দাঁড়িয়ে সামনে থেকে বা স্টেজের ভিতবে গিয়ে থিয়েটার দেখার কখনও অসুবিধা হয়, সাজঘরে ঢুকে আড়ালের ব্যাপারগুলি দেখবার ইচ্ছা হলেও কেউ ঠেকাতে পারে। কানাইযেব সঙ্গেব ছেলেটিকে চেনে না পাকা।

সিগ্রেট টেনে আসি চ।

নাঃ, কানাই বলে একান্ত অবহেলার সঙ্গে, ছেড়ে দিইছি। ধোঁয়া গিলে স্বাস্থ্য নষ্ট কবে লাভ ? মিছিমিছি পয়সা নষ্ট।

কানাইয়ের মুখে এমন গুরুজনি কথা ! পাকা একটু হেসে সরে যায়। সঙ্গেব ছেলেটিব সামনে কানাই সিগারেট খাবে না, এটুকু কী আর সে বোঝে না ! নরেশ কিন্তু গুরুতর খবর দেয়। কানাই নাকি সত্যই বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ভালো হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে মেশে না। শুধু বিড়ি-সিগারেট নয়, তাদেরও ত্যাগ করেছে। শুনে তখন খেয়াল হয় পাকাব যে কানাই তাব সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি, তাকে এতটুকু আমল দেয়নি। কানাই তার সঙ্গে মিশবে না ? নতুন বন্ধু পেয়েছে ? বহুৎ আচ্ছা, কেঁদে কেঁদে সে মরে যাবে !

দু মিনিটের মধ্যে সে ভুলে যায় কানাইকে, একবার সাজঘর ঘুরে আসে, মালাইকর সিদ্ধেশ্বরেব কাছে মালাই কিনে খায়, সিগারেট টানে, পান চিবোয়, মানুষের রকম দেখে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে, ভেতরে বাইরে এখানে সেখানে পাক খেয়ে বেড়ায়, ড্রপ উঠলে একটা সিন স্টেজে উইংসেব পাশে দাঁড়িয়ে আর একটা সিন সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দ্যাখে। তার প্রাণ আনন্দে উচ্ছল, সেখানে তুচ্ছ সুখ-দুঃখের স্থান নেই। কেবল সে নয়, ছেলেবুড়ো সকলেই যেন এখানে আজ কী একটা গভীর লজ্জা ও দুঃখের, আত্মকৃত অপরাধের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়েছে, আজকের সন্ধ্যার চরম কর্তব্য হিসাবে আঁকড়ে ধরেছে এই উৎসবকে, সাময়িক কাঁপানো আনন্দে মশগুল হয়ে যেতে। ছেলেরা চঞ্চল, একটু উচ্ছৃঙ্খল, বড়োরা একটু ধীরস্থির কিন্তু ভাব প্রায় সকলের একরকম। আনন্দের উপলক্ষ হিসাবে সারারাতের থিয়েটার তো আগেও ছিল এখনও আছে, কিন্তু তাতেই সবাই খুশি নয়, এই উপলক্ষকে নিঙড়ে নিঙড়ে শেষবিন্দু আনন্দ আহরণ করলেই শুধু চলবে না, নিজের ভেতরের উত্তেজনা উন্মাদনা দিয়ে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে উথলে তুলতে হবে সে উপভোগকে ! নাটক, অভিনয়, দৃশ্যপট ভালো কী মন্দ কেউ যেন তা বিচার করে না, যে রসটুকু পরিবেশন করা হয় রঙ্গমঞ্চ থেকে তাতে নিজের তাগিদেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দর্শকেরা। ভালো করে যে নাটক দেখছে না, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে চঞ্চলভাবে, বাইরে যে রয়েছে নাটক না দেখেই, তার মুখখানাও উত্তেজনায় স্ফুরিত।

গ্রামের মেয়েপুরুষ বিশেষ উপলক্ষে যেভাবে সমারোহ করে যাত্রা দেখে, অবিকল সেই রকম।

তা ছাড়া, তুচ্ছ কারণে, হয়তো একেবারেই অকারণে, আজ ক্রমাগত গন্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা চলতে থাকে দর্শকদের মধ্যে, বিশেষ করে বয়স যাদের কম। একটা বাধা কাটিয়ে দেখতে দেখতে নাটক জমজমাট হয়ে ওঠে, অভিনেতাদের যেন কিছুমাত্র সাধ্য-সাধনারও দরকার হয় না, হঠাৎ হয়তো এক কোণে হাতাহাতি বাধবার উপক্রম ঘটে যায় একজনের কনুইয়ে আর একজনের একটু গুঁতো লাগায়, অথবা একজন আর একজনকে মাথাটা পকেটে ভরতে অনুরোধ করেছে বলে। এই হলে আজকের মতো অভিনয়ও কখনও আর এমন জমেনি, আন্দোলন থামবাব পর সেই স্বদেশি নাটকটির অভিনয়ও নয়, এমন গন্ডগোলও কোনোবার দেখা যায়নি দর্শকদের মধ্যে।

লোকে বিরক্ত হয় অল্পক্ষণের জন্য, গোলমাল থামলে তখন সেই ফ্যাকড়াটাও যেন উপভোগ করে। একঘেয়ে জীবনে অভিনয় একটা নতুনত্ব, চিরকেলে একটানা অভিনয়ে গোলমাল যেন আর একটা নতুনত্ব, মজার ব্যাপার।

কয়েকজনের ভালো লাগে না। যেমন সপরিবারে মুন্সেফ সুরেন ঘোষালের। টসটসে মিষ্টিরকম মোটা স্ত্রী, কাঁদো-কাঁদো-মুখ কিশোরী মেয়ে ও ছ-সাতবছরেব দুটি গম্ভীর চুপচাপ যমজ ছেলে।

পাকাকে দেখে যেন আকুল পাথারে কূল পেল সুরেন।

পাকা, বড়ো বিপদে পড়েছি বাবা। বেয়ারাটাকে এখানে থাকতে বলেছিলাম, ব্যাটা যেন কোথা ভেগেছে !

কোথা দাঁড়িয়ে থিয়েটাব শুনছে।

আমাব যে এদিকে মুশকিল ভাই। উনি বলে পাঠাচ্ছেন, ভিড়ে ওঁর ফিটের উপক্রম হচ্ছে, এখুনি বাড়ি যাবেন।

বাড়ি নিয়ে যান।

কোথা গাড়ি পাই, কী করি—সুরেন যেন কেঁদে ফেলবে।

ভৈরব ও অনন্তলাল তখনও যায়নি। পাকা গিয়ে দাবি জানায়, একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে, মামার গাড়িটা একটু চাই আধঘণ্টার জন্য।

অনন্তলাল বলে, আমি যে যাব ভাবছিলাম ? তোর নতুন মামি—

নতুন মামি থাকবে বলেছে, পাকা স্পষ্ট মিথ্যা জানায়।

গাড়িটা পাওয়া যায় ভৈরবের, সুরেন সপরিবারে উঠে বসে গাড়িতে, কিন্তু পাকা নিজেই গোল বাধায় সব বিষয়ে তার কর্তালি করা স্বভাবের দোষে। গঙ্গা কামার, সৈদবাজারে দক্ষিণে গলির মোড়ের কাছে তার কামারশালা আছে, পানের দোকানের সামনে মাটিতে বউটিকে শুইয়ে তার কপালে বরফ ঘষে দিচ্ছিল, বউটি সত্যসত্যই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চারিদিকে ঘিরে কাঁদছিল এগারো থেকে দেড় বছরের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। পাকা মাঝে মাঝে ওর দোকানে উবু হয়ে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, নেহাইয়েব উপর তাতানো লোহা থেকে হাতুড়ির আঘাতে আগুনের ফুলকি ছোটা, দেখেছে দু হাতে হাতুড়ি তুলে প্রাণপণে যে ঘা মারছে সেই ধুমসো কালো সহকারীটির ডাকাতের মতো চেহারা।

গঙ্গাকে ব্যাপার জিজ্ঞেস করেই সে এক অন্যায় প্রস্তাব করে বসল। ওদেরও তুলে নিতে হবে গাড়িতে, আগে ওদের পৌঁছে দিয়ে গাড়ি সুরেনদের বাড়ি যাবে।

হাসপাতালে নিতে হবে না তো ?

না বাবু। ঘর গিয়ে একটু শুয়ে রইলে ঠিক হয়ে যাবে। ফিটের ব্যারাম, মাঝে মাঝে এমন হয়।

সুরেন চটে বলে, পাকা, এ গাড়িতে কখনও জায়গা হয় ?

তার স্ত্রী অনুরাধা বলে অধীর হয়ে, আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক না, তারপর ওদের নিয়ে যাবে ?

তুমি গাড়ি চালাও ড্রাইভার, ও পাগলের কথা শুনো না—বলে তাদের রূপসি কিশোরী মেয়ে মায়া।

তবে আপনারা নেমে একটু ওয়েট করুন, পাকা বলে, আগে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। দেখছেন না অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ?

সুরেন বলে, পাকা, শুনে যাও, কাছে এসো।

অনুরাধা বলে, পাকা, তুমি ভাবী হয়ে কিন্তু !

মায়া বলে, পাকাদা !

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। গঙ্গা কামারকেও সপরিবারে স্থান দিতে হয় গাড়িতে—বউকে বুকে কোলে নিয়ে এক কোণে বসে যথাসম্ভব কম জায়গা দখল করার চেষ্টা করে গঙ্গা, কিন্তু হলে কী হবে, তার পরিবারটি প্রকাণ্ড। ড্রাইভার যখন একটু বিরক্তি ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে গিয়েছিল গঙ্গারা গাড়িতে উঠবার আগেই কী করছেন দাদাবাবু, বাবু জানতে পারলে—

চোপরাও !

সে গর্জনে শুধু ড্রাইভার নয়, সুরেনও সপরিবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুধাও এদিকে অনন্তলালকে জিজ্ঞেস করে পাঠায়, বাড়ি ফিরতে দেরি কেন ? এ সব যাত্রার মতো অভিনয় ও লোকের তা উগ্র আগ্রহে শোনা বেশিক্ষণ ভালো লাগে না সুধার। অনন্তলাল বলা মাত্র তিনটি ছেলে খুঁজে পেতে এনে হাজির করে দেয় পাকাকে, সঙ্গে আসে নরেশ। নরেশকে হঠাৎ কিছু সদুপদেশ দেবার সাধ জেগেছিল পাকার। বাসরে থেকে যা মনে হয় অপরূপ অদ্ভুত, ভেতরে সেটা যে শুধু ফাঁকির ব্যাপার, এটা বোঝানোর জন্য নরেশকে সে সাজঘরে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে সাজা নিখিলকে দেখিয়ে বলছিল, বাইরে থেকে কেমন দ্যাখায়, আর কাছে থেকে কেমন দ্যাখায় দ্যাখ। গা ঘিনঘিন করে না দেখলে ?

করে না তো ! আমার বরং ভালো লাগছে দেখতে।

পাকা একটু ভড়কে গিয় মনে মনে জবাব খুঁজছে, অনন্তের অনুগত একটি ছেলে তাঁকে সেখানে আবির্ভাব করে বলে, শিগগির, অনন্তবাবু ডাকছেন।

পাকা ধীরভাবে বলে, কী হয়েছে ?

ছেলেটি উত্তেজনায় প্রায় তোতলায়, অনন্তলালের একটা হুকুম তালিম করতে পেরেছে এ তার কল্পনাতীত সৌভাগ্য ! বলে, ডাকছেন, তাড়াতাড়ি এসো।

অনন্তলাল বলে, তুমি বললে থাকতে চায়, এদিকে দেখি যাবার জন্য তোমার মামি ব্যস্ত।

নতুন মামি আজ রাত্রে যাবে ? হুঁঃ ! দাঁড়ান আমি দেখে আসছি।

সুধা বলে, ভালো লাগছে না আমার। খালি বীরত্ব আর চিৎকার—

পাকা বলে, এ ঘুপচির মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকলে ভালো লাগে ? চাদ্দিকে একটু ঘোরো ফেরো, দ্যাখো শোনো—

ওমা, থিয়েটার চাদ্দিকে ছড়ানো থাকে নাকি ? বাইরে পর্যন্ত ?

থাকে না ? চাদ্দিকেই তো আসল থিয়েটার।

তা নয় হল। শরীরটা যে ভালো লাগছে না !

শরীর ভালো লাগছে না ? চলো এখুনি তবে তোমায় বাড়ি নিয়ে যাই। গাড়ি যোগাড় হয়ে যাবে।

সুধার গলায় কথা আটকে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। এই অনিয়মকে নিয়ে কী করা উচিত ভাববারও সময় নেই।

ও কিছু নয়। আর একটু দেখেই যাই। বাড়ি দিয়ে আসতে পারবে তো ?

পারব না ?

সকলের সঙ্গে গেলে হবে না কিন্তু, ওরা রাত কাবার করবে। আমি অত রাত জাগতে পারি না।

পাকা হাসিমুখে অভয় দিয়ে বলে, যখন তুমি যেতে চাইবে, তখনই নিয়ে যাব। আধঘণ্টা পরে পরে তোমার খোঁজ নিচ্ছি।

সুধা শুধু চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে পাকা একটু বিব্রত বোধ করে নিজের বাহাদুরিতে। মনে হয়, সুধা যেন জগতে সকলের চেয়ে তাকেই বেশি আপন বলে চিনে ফেলেছে হঠাৎ !

কানাই কখন উঠে চলে গেছে তার নতুন বন্ধুটির সঙ্গে, পাকা টের পায়নি। কানাইকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধুত্বও ত্যাগ করেছে। তার সঙ্গে মিশে বখে যাবার ভয় হয়েছে নাকি ওর ?

নরেশ সঙ্গে লেগে ছিল গোড়া থেকে, মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য সেও যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল কোথায়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সে আবার এসে সঙ্গ ধরল।

পাকা, তুই আমাকে চাস কিনা বল তো স্পষ্ট করে ?

তার মানে ?

মানে, তুই যদি আমার বন্ধুত্ব না চাস, সোজা কথায় বল, আমি কানাইয়ের দলে যাই।

কানাই দল করেছে নাকি ?

দল নয়, তোর সঙ্গে কানাই মিশবে না।

তুই কানাইয়ের দলে যা নরেশ।

নরেশ আহত হয়ে ফোঁস করে ওঠে কিন্তু লেগে থাকে পাকার সঙ্গেই।

গাড়ি ফিরে এলে ভৈরব আব অনন্তলালের সঙ্গেই পাকা নতুন মামিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। হুকুমের ভঙ্গিতে তার কথা বলার ধরন শুনে সুধা হেসে ফেলে।—থিয়েটার দেখব না ?

না, খারাপ শরীরে রাত জাগতে হবে না।

তোমায় জাগতে হবে, কেমন ?

আমার শরীর তো খারাপ নয় !

মস্ত নাটক, অভিনয় শেষ হয়ে প্রহসন আরম্ভ হতে হতে চারিদিকে ফরসা হয়ে এল। তখন পাকার খেয়াল হল, আজ তার ব্যায়ামের আখড়ায় যাওয়ার কথা কালীনাথকে কথা দিয়েছে। ঘাটে নেমে মুখে চোখে জল দিয়ে দোকানে এক কাপ চা খেয়েই সে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে। রাত জাগা আর ছটফট করে ঘুরে বেড়ানো পা দুটিকে ছুটিয়ে জোরে হাঁটা অসহ্য হয়। পাকা ভাবে, সাইকেলটা আনলে এখন কাজ দিত।

চলতে চলতে পথে এক অদ্ভুত গুজব শোনে পাকা, মাঝ রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফেরার পথে নলিনী দারোগার স্ত্রীর গায়ের গয়না ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতেরা নাকি ভদ্রঘরের ছেলে, মুখোশ পরা ছিল। নলিনী দারোগার স্ত্রীকে তারা নাকি বলেছিল, মা, আপনার বিয়ের গয়না রেখে অন্যগুলি খুলে দিন—আমরা কিন্তু জানি কোনটি কোনটি আপনার বিয়ের গয়না। তারা নাকি আরও বলে দিয়েছে যে আজ মহাপাপের গয়নাগুলি গেল, স্বামী যদি তার সাবধান না হয় একদিন তাকেও হারাতে হবে।

৩

আখড়ায় পৌঁছবার তাড়ায় খবরটা ভালো করে শুনবারও সময় সে পেল না। ছেলেরা সবাই ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে, খেলা ও ব্যায়াম শুরু হয়েছে। কালীনাথ হাজির ছিল, পাকা পৌঁছতেই কাছে ডাকল।

পাকা, তোমার নাম কাটা গেছে। তুমি আর এখানে এসো না।

নাম কাটা গেছে ? দু চোখ জ্বলে ওঠে পাকার, কেন ?

তোমার মতো ছেলেকে আমরা চাই না পাকা।

কী করেছি আমি ?

বদ ছেলেদের এখানে স্থান হয় না ভাই।

অন্য যে কোনো মানুষকে যা-তা বলা যায় রাগের মাথায়, কালীনাথকে গাল দেওয়া যায় না। পাকা অনুযোগের সুরে বলে, এ আপনার অন্যায় কালীদা। আমি বদ, আমার নাম কেটে দিলেন, আমায় বলবেন না আমি কী করেছি ?

তুমি নিজেই বেশ বুঝতে পারছ।

কালীনাথ ভাবে, এখনও সতেজে কথা বলছে ছেলেটা। এই বয়সে চরম অধঃপাতে গেছে অথচ সোজাসুজি মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছে সহজ ও স্পষ্ট। পোকায় না ধরলে কী যে তৈরি করা যেত একে ! মনের মতো একটা আগুনের গোলা !

সিগ্রেট খাই, আড্ডা মেরে বেড়াই বলে ?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায় কালীনাথ।—চাল মারছ, না ? তুমি কি শুধু সিগ্রেট খাও, আড্ডা মেরে বেড়াও ? ও সব দোষ আছে জেনেই তোমায় ক্লাবে নিয়েছিলাম। ও দোষগুলি ধরিনি। যে সব ছেলের এনার্জি বেশি থাকে, ঠিক মতো ট্রেনিং না পেলে তারা একটু ও রকম বিগড়ে যায়— এনার্জির আউটলেট চাই তো। আবার দুদিনে শুধরেও নেওয়া যায় ওদের। গোবেচারি ভোঁতা ভালো ছেলের চেয়ে এ রকম ছেলেদের দিয়েই বরং কাজ হয়, মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তুমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছ, তোমাকে দিয়ে আর কোনো আশা নেই।

পাকা চেয়েই থাকে জিজ্ঞাসু চোখে।

কালীনাথ আবার বলে, আজ তোমায় বলতে বাধা নেই, তোমার কাছে অনেক আশা করেছিলাম পাকা। অদ্ভুত প্রাণশক্তি দেখেছিলাম তোমার মধ্যে, তেজ আর সাহস। ময়দানে যেদিন চারজন গুন্ডার সামনে একা রুখে দাঁড়িয়েছিলে, শঙ্করের কাছে শুনেই পরদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তোমায় ডিসিপ্লিন মানানো কঠিন হবে জানতাম, কিন্তু সে জন্য ভাবিনি। আমার সত্যি বিশ্বাস ছিল, অল্পে অল্পে তোমাকে ক্লাবের সেরা ছেলে করে তুলতে পারব। তোমার তুলনা থাকবে না। সারা দেশ একদিন তোমায় নিয়ে গর্ব করবে।

নিন্দা নয়, সমালোচনা নয়, আন্তরিক আপশোশ। কালীনাথের আবেগ ও দরদে ফাঁকি নেই। বুকটা তোলপাড় করে পাকার। ক্লাবের ছেলেরা ব্যায়াম করে চলেছে, ডন বৈঠক কুস্তি, মুগুর ভাঁজা, লাঠি ছোরা খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু। সুন্দর সুগঠিত শরীরগুলি, নতুন কয়েকটি ছেলের শরীর গড়ে উঠছে। শঙ্করও আছে ওদের মধ্যে। ময়দানে দুটি মেয়ের পিছু নিয়েছিল চারজন গুন্ডা গোছের জোয়ান ছোকরা একদিন সন্ধ্যাবেলা। পাকা একাই এগিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু দেহটা আস্ত থাকবে এ ভরসা রাখেনি। তবে মেয়ে দুটি সরে পড়তে পারবে সে কাবু হতে হতে এটুকু জানত। কিন্তু মারামারি বাধতে না বাধতে চারজনেই আচমকা দৌড় দিয়েছিল পাশের নালা ডিঙিয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে।

সাইকেল থেকে নেমে শঙ্কর আপশোশ করে বলেছিল, পালিয়ে গেল !

সেই দিন থেকে পাকার মনে গভীর শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ জেগেছে কালীনাথের ক্লাবের প্রতি। যে ক্লাবের একটি ছেলেকে আসতে দেখেই চারজন গুন্ডা মরি কি বাঁচি ভাবে পালায় সে ক্লাব তো সামান্য নয় !

আমার স্বভাব খারাপ জেনেই ক্লাবে নিয়েছিলেন বলছেন, তবে কেন তাড়াচ্ছেন কালীদা ?

আগে জানতাম না তুমি বেশ্যাবাড়ি যাও, বস্তিতে গিয়ে তাড়ি খেয়ে হইচই কর।

ও ! এবার বুঝতে পেরে পাকা মাথা হেঁট করে। এই দোষ দুটি এতক্ষণ তার মনে আড্ডা মারা হইচই করে বেড়ানোর অন্তর্গত হয়েই ছিল।

কালীনাথ বলে, যদি পার নিজেকে শুধরে নিয়ো ভাই। এ ভাবে নষ্ট করার জন্য মানুষের জীবন নয়। কত মহান আদর্শ আছে, সাধনা আছে, কাজ আছে জীবনে, সমস্ত ভবিষ্যৎটা তোমার সামনে.....

মাথা হেঁট করে শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মাথা উঁচু হতে থাকে পাকার। উপদেশ তার সয় না, কোনো অবস্থাতে কারও কাছ থেকেই না।

নিজেকে যদি বদলে নিয়ে মানুষ করে তুলতে পার ভাই, সবার চেয়ে আমি বেশি খুশি হব।

একটা কথা বিশ্বাস করবেন কালীদা ? আমি বেশ্যাবাড়ি যাই না, তাড়ি খাই না। দু দিন শুধু গিয়েছিলাম ওরা কী রকম মানুষ, কী ভাবে থাকে দেখবার জন্যে, একটু সময় থেকেই চলে এসেছি, আর ওই গরিব দুঃখী ছোটোলোকদের সঙ্গে মিশতে আমার ভালো লাগে তাই মাঝে মাঝে যাই, তাড়ি খেতে নয়।

কালীনাথ গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। সরল হলেও বোকা নয় পাকা। সে জানে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালীনাথ ভাবছে, এ তার চালাকি। বিশ্বাস করলেও তাতে দোষ কাটানো যায় না। বেশ্যাবাড়ি যাওয়াটাই কম গুরুতর অপরাধ নয় এবং তাড়ির ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকানো। কিন্তু হৃদয় যে এদিকে তার প্রচণ্ড আবেগে ঠেলে উঠছে, কোনো মতে মানতে চাইছে না আজ থেকে ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে যাবে। মাঝখানে কয়েকদিন একটু উদাসীন ভাব এসেছিল, খানিক আগে পাকা নিজেও জানত না ক্লাবের জন্য তার এত মায়া, ক্লাব ছাড়তে গিয়ে মনে হবে সব ফুরিয়ে গেল, সর্বনাশ হল তার। দু হাতে ক্লাবের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা হবে।

সত্যি বলছি কালীদা, আমার ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়নি। কোনোদিন এক ফোঁটা তাড়ি আমি গিলিনি। আমায় আর একটা চান্স দিন।

আর্ত আবেদন জানায় পাকা।

তা হয় না পাকা।

আমি আজ থেকে অক্ষরে অক্ষরে ক্লাবের নিয়ম মেনে চলব প্রতিজ্ঞা করছি। সিগারেট ছোঁব না, আড্ডা দেব না—

তা হয় না ভাই। আমাকে ক্লাবের ডিসিপ্লিন বজায় রাখতেই হবে। তোমায় আর একটা চান্স দিলে অন্য ছেলেদের নিয়মনিষ্ঠা দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রলোভনে পড়লে মনে হবে, একবার ভুল করলেও চান্স পাওয়া যায়। ক্লাবে নাই বা রইলে, নিজেকে বদলে ফেলো। ইচ্ছে হলেই এসো আমার কাছে।

অমিতাভের সঙ্গে কানাই আসে আখড়ায়। পাকার রাত-জাগা শুকনো মুখ দেখে অমিতাভ বলে, অসুখ করেছে ?

না। তুই ক্লাবে ঢুকেছিস নাকি কানাই ?

কানাই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, কথা বলে না।

পাকা বেরিয়ে যায়। ব্যায়ামরত ছেলেদের দিকে চোখ তুলে সে তাকাতে পারে না। দু কান ঝাঁঝাঁ করে অপমানে, অভিমানে। তাড়িয়ে দিয়েছে ! কানাইকে বরণ করে নিয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ক্লাব থেকে ! চলতে চলতে বাড়তে থাকে জ্বালা আর আক্রোশ। আজ থেকে সে শত্রু কালীদার, কালীদার ক্লাবের। মহান আদর্শের জন্য ক্লাব করেছে না কচু ! মারপিট করার জন্য তৈরি করছে কতকগুলি গুন্ডা। সেও একটা ক্লাব করবে। কালীদার ক্লাবে আর ক-টা ছেলে, তার ক্লাবের মেম্বার হবে একশো।

সুধা বলে, তুমি সত্যি অধঃপাতে গেছ পাকা।

বেশ করেছি। একশোবার অধঃপাতে যাব। তোমাদের কী ?

পড়ার টেবিলে দু হাতে মাথা গুঁজে দেয় পাকা।

সুধা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পাকা কাঁদছে। তাকে কখনও কাঁদতে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না সুধা।

পাকাও তবে কাঁদে ? ওর কাঁদুনে মুখখানা দেখতে বড়ো সাধ হয় সুধার।

কী হল ? চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু হাতে ধরে সে তুলবার চেষ্টা করে পাকার মুখ।

যাও, যাও, চাই না তোমাদের। আমায় কেউ ভালোবাসে না, দেখতে পারে না, কাউকে চাই না আমি।

যাঃ, ও কথা বলতে নেই।

এবার জোর করে পাকার মাথা তুলে সুধা বুকে চেপে ধরে। চোখের জলে ভেসে গেছে পাকার মুখ। রাত-জাগা দু চোখের গভীর দুরন্ত ব্যথা প্রায় অভিভূত করে দেয় সুধাকে।

ছি, একটু বকেছি বলে এমন করে ? রাত জেগে বুঝি বিগড়ে গেছে মাথা ? যে ভালোবাসে সে-ই বকুনি দেয়, বোকা ছেলে। চলো, এখুনি চান করে একবাটি গরম দুধ গিলে, সঙ্গে সঙ্গে বিছানা নেবে। নইলে শুধু বকুনি নয়, মেরে আস্ত রাখব না।

নতুন মামি, আমি খুব খারাপ, না ?

না, তুমি খুউব ভালো। ওঠো দিকি এবার।

চার

১

শহর তোলপাড় কদিন থেকে।

ঘটনাটাই একটা চমক, শান্ত অহিংস ভদ্র শহরের ঘাড় ধরা ঝাঁকুনি। তার উপর পুলিশের আকস্মিক কর্মতৎপরতা, খোঁজখবর জিজ্ঞাসাবাদ খানাতল্লাশের হিড়িক—গ্রেপ্তার। অন্দরে-বাইরে রাস্তায়-বাজারে স্কুলে-কাছারিতে লোকের মুখে অন্য কথা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে সাবধানে নিচু গলায় কানাকানি ফিসফাস কথা—সতর্ক হওয়া ভালো, কে চর, কে শত্রু, কে জানে ! মুখোশপরা স্বদেশি ডাকাত কেড়ে নিয়েছে নলিনী দারোগার বউয়ের গায়ের গয়না—বিয়ের গয়না বাদ দিয়ে ! বলেছে, মাগো, পাপের বোঝা খানিক হালকা করে দিলাম, এবার একদিন পাপটার কবল থেকে মুক্তি দেব তোমায়। কতকাল এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেনি এ শহরে, অহিংস অসহযোগের আগে তখনকার পুলিশ সায়েব ডেভিসকে স্টেশনে মারবার সেই চেষ্টার পর থেকে। বছর গুনে হয়তো খুব পুরানো নয়, অহিংসার বন্যাই যেন স্মৃতিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে দূর অতীতে। নগেন বোসের ছেলে পনেরো-ষোলোবছর বয়সের বাচ্চা নারায়ণ গিয়েছিল পিস্তল নিয়ে, একা। গুলিটা বেরিয়েছিল ঘোড়া টেপার দশ-পনেরোসেকেন্ড পরে পিস্তলটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার সময়, ডেভিসের বুকের বদলে ভেদ করেছিল শেষ বেলার নীল আকাশ।

এবার পিস্তল ছিল চারজনের হাতেই। দেখেই কেঁউ কেঁউ করে উঠেছিল মেয়েদের সঙ্গে চাকর-আর্দালি আর নলিনীর শালা। পিস্তল নিয়ে ডাকাতিটুকুই যথেষ্ট ছিল শহরকে নাড়া দেবার পক্ষে, ওদের শাসানিটা চরমে তুলে দিয়েছে উত্তেজনা। এই শেষ নয়, এ শুধু ভূমিকা, আরও আছে ভবিষ্যতে।

রাত আড়াইটে তিনটের সময় জনহীন পথের ঘটনা, কিন্তু তার খুঁটিনাটি বিবরণও জানাজানি হয়ে গেছে। নলিনী অবশ্য ভয়ংকর হুমকির সঙ্গে হুকুম দিয়েছিল সকলকে বাইরের লোকের কাছে মুখ বুজে থাকতে। শ্যামলী কি পারে সে হুকুম মানতে, পাড়াব মেয়েদের কাছে কী কী গয়না গেছে তার ফর্দ আর কীভাবে গেছে তার রংদার বর্ণনা দাখিল না করে বাঁচতে ! ইয়ার বন্ধু আছে নলিনীর শালা সুখেন্দুর। চাকরটা আরদালিটা গাড়োয়ানটারও কি নেই ?

ভদ্রলোকেরা সন্ত্রস্ত, ব্যক্তিগতভাবে যেন বিপন্নও। শঙ্কা ও উত্তেজনা চাপতে আরও বেশি ধীরস্থির। গভীর বিরক্তি আর আপশোশ যে, কী কাণ্ড করে গুন্ডাগুলি ! বয়াটে বখাটে ছোঁড়া ক-টা গা ঢাকা দেবে, টানা-হেঁচড়া চলবে নির্দোষ ছেলেদের নিয়ে। তবে, নলিনীরও বড়ো বাড়াবাড়ি, ইয়ংম্যান সব, এমনিতেই রক্ত গরম.....। দেশের নামে মেয়েছেলেদের গয়না কেড়ে নেওয়া, গয়না-পরা মেয়েরা বলে, উচিত নয়, ছি ! তবে, মাগিরও বড্ড গুমোর বেড়েছিল, সোনাদানা যেন কারও নেই আর, উনি একাই গয়না পরেন !

যুবকদের অনেকটা থমথমে ভাব, অসীম কৌতূহল, জিজ্ঞাসা আর সংশয়, এলোপাথাড়ি তর্ক কিন্তু হাতাহাতি নয়। ব্যাপারটা নলিনী-ঘটিত, তর্কের সময়ও দু পক্ষের মাঝখানে তার অদৃশ্য উপস্থিতি ভোলা যায় না, ঘোচানো যায় না কিছুতেই, মুখের বদলে হাতাহাতি তর্ক চালাবার মতো গরম হয়ে উঠতে পারে না তার্কিকেরা। ছেলেদের বিস্ফারিত চোখ, আবেগে গলায় আটকে আটকে যাওয়া কথা, সব মতে এটা জঘন্য কাজ, তারও। নিন্দা করা যায় কাজটার, কাপুরুষ বলা যায় আর গুন্ডা ভাবা যায় ডাকাতদের, কিন্তু কোনো তরুণ বা কিশোরেব সাধ্য কী যে অখুশি হয় নলিনী দারোগার বউয়ের গয়না লুঠ হয়েছে বলে।

গরিব সাধারণ মানুষের মধ্যে অতটা উত্তেজনা নেই, যেটুকু আছে তাও অন্য ধরনের। রূপকথার মতো তাদের মুগ্ধ করে ডাকাতির গল্প, স্বদেশিবাবুদের দুঃসাহসে তারা অবাক, নলিনীর ক্ষতি ও লাঞ্ছনায় উল্লসিত। হাতুড়ি চালাতে, চাকা ঘুবোতে, তাঁত বুনতে, ঘর বানাতে সারাতে, সাইকেল বাসন আসবাব মেরামত করতে, মাছ ধবতে, কাঠ চিরতে, বাস্তা সারাতে, গাড়ি হাঁকাতে, মোট বইতে, চামড়া পাকাতে, বেসাতি নিয়ে এসে বাজাবে বসতে জোরদার বলাবলির সময় বা সুযোগ কম, কাজ শেষের ক্লান্ত অবসরেও পেট বুকের ভালোমন্দেব কথায় বারবার চাপা পড়ে যায় ও-আলোচনা। তবু ঘুরে ফিরে বারবার কথাটা ওঠে, স্বদেশিবাবুরা বউয়ের গয়না নিয়েছে, খুনেটাকে খুনও করবে।

ডেভিসের চেয়ে কার্লটন চালাক বেশি, একটু পিছনে, আড়ালেই থাকে নিজে, যা কিছু করা দরকার করায় নলিনীকে দিয়ে। নলিনীকেই লোকে ভয় করে, ঘৃণা করে বেশি। সাদা হাতের চেয়ে সাদা হাতের কালো চাবুকটাকে।

সার্চ চলে চারিদিকে, সকলের আগে কালীনাথের অগ্রণী ক্লাব, সাধনা সংঘ, ক্লাব ও সংঘের সভ্য ও পুরানো দিনের ছাপ মারা কয়েকজন বিপ্লবপন্থীর বাড়িতে। সাধনা সংঘ একটি ছোটোখাটো লাইব্রেরি, জেল-ফেরত প্রৌঢ়বয়সি আগের যুগের স্বদেশি ডাকাত বিপিন দত্তের বাড়িতে একটি আলমারি ও একটি বুক শেলফ নিয়ে। তাতে সাজানো থাকে শুধু দর্শন ও যোগসাধনের বই। সঙ্গে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, ভূমার বিচার-বিশ্লেষণ, যোগসাধনার লাভালাভ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। বক্তা অধিকাংশ দিন বিপিন, মাঝে মাঝে তার সহযোগী দীনেশ দাশ। নারায়ণ মাঝে মাঝে এখানে আসে। বছর খানেক আগে ছাড়া পেয়ে সে বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে আছে। রসিকের সাইকেল সারাইয়ের কারখানা আর বাড়ি তল্লাশ করা হল তন্নতন্ন করে, কানাইকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, মুখ-চোখ ফুলিয়ে কানাই ফিরে এল। রাত্রে জ্বল এল হু-হু করে। থিয়েটার দেখতে দেখতে উঠে গিয়ে সে বাড়ি ফেরেনি, রাত্রে শুয়েছিল সমরের বাড়িতে। সার্চ করা হল সমরের বাড়ি। তার বাবা দুর্গাপদ আদালতের পেশকার। যাকে তাকে বাড়িতে আনার জন্য ছেলেকে সে একটা চাপড় মেরে বসল পুলিশ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর। সমর এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে, দশ-বারোদিন পরে খোঁজ পেয়ে দুর্গাপদকেই কলকাতা গিয়ে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হল যাকে তাকে বাড়িতে আনার তার যে পূর্ণ অধিকার আছে এটা পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়ে। অমিতাভ একবার গ্রেপ্তার হল ঘটনার পরদিন দুপুরে। রাত দুপুরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এগিয়ে গিয়েছিল জানবাজারের রাস্তা ধরে, সে পথ সোজা গিয়েছে ঘটনাস্থলের দিকে। ডাক্তার এন রায় চৌধুরী স্বীকার করল যে, মাঝরাতে অমিতাভ এসেছিল মার কলিকের ব্যথার জন্য তাকে ডাকতে, সে যায়নি, তবে ওষুধ দিয়েছিল আর ব্যবস্থা। দু দিন পরে ছাড়া পেলে অমিতাভ, আবার গ্রেপ্তার হল তিন দিন পরে কলকাতা যাবার সময় স্টেশনে। হাজত থেকে আবার ছাড়া পেল কিন্তু বঞ্চিত হল ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত হুকুম ছাড়া শহর ছেড়ে যাবার বা সন্ধ্যার পর বাইরে আসাব অধিকার থেকে। নারায়ণের বাড়ি সার্চ করা হল দুবার, চার-পাঁচবার থানায় গিয়ে তাকে প্রমাণ দিতে হল যে সে বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি ঘটনার রাত্রে, পুলিশের রাত দশটার হাঁকেও সাড়া দিয়েছিল, রাত তিনটের হাঁকেও সাড়া দিয়েছিল। সিদ্দিকের দর্জির দোকানেও একদিন হানা দিল পুলিশ, এগারোজন সন্দেহজনক লোক এত দর্জি থাকতে শুধু সিদ্দিককে জামা বানাবার অর্ডার দেয় কেন ? দোকান ও পিছনে বসবাসের ঘর দুখানা চার ঘণ্টা ধরে তল্লাশ করা হল। রমেশ আর কান্তি প্রায়ই যায় দীপ্তিব বাড়ি, দীপ্তি প্রায়ই যায় কালীনাথের কাছে, থার্ড ক্লাসের এতটুকু মেয়ে স্কুলের মেয়েদের সভায় জোরালো বক্তৃতা দেয় স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে—হেড মিস্ট্রেস মিসেস তরফদারের কড়া চিঠির জবাবে অবশ্য দীপ্তির বাবা রজনী সিকদার জানিয়েছে, মেয়ে তার ভবিষ্যতে কখনও ও রকম পাগলামি করবে না—তাকেও জেরা করা হল। শহব থেকে বাইরে যাবাব পথের মোড়ে মোতায়েন পুলিশ তল্লাশ করতে লাগল পথিকেব মোটঘাট, গাড়ির মালপত্র। স্টেশনে তছনছ করা হতে লাগল যাত্রীব বাক্‌সো পেঁটরা শ্যামলীর গয়নার সন্ধানে।

বেশ একটু দিশেহারা ভাব পুলিশের, যাকে তাকে সন্দেহ করছে, যেখানে সেখানে টুঁ মারছে।

তখন কলকাতা থেকে এল স্পেশালিস্ট রায় বাহাদুর এন এন ঘোষাল। ঘোলাটে ফরসা মুখে বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিকের শান্ত সমাহিত ভাব, চোখে ভাবুক কবির অন্যমনা উদার দৃষ্টি। একটা দিন থেকেই সে কলকাতা ফিরে গেল, বেলা তিনটের গাড়িতে। পরদিন অদৃশ্য হয়ে গেল পথের মোড়ে, স্টেশনে, বাজারে মোতায়েন বাড়তি পুলিশ, খানাতল্লাশ ও যখন তখন যাকে তাকে টানাটানি ও গ্রেপ্তার প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। শ্যামলীর গয়না ডাকাতি হওয়ার মতো তুচ্ছ বিষয় যেন হঠাৎ তুচ্ছই হয়ে গেল পুলিশের কাছে। শুধু বোঝা গেল, নজর কড়া হয়েছে। সাদা পোশাকের ছদ্মবেশি চোখ-কানের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছে, কয়েকজনের চলাফেরা গতিবিধি চব্বিশ ঘণ্টা দেখছে চোখগুলি, সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কে কী বলে কানগুলি শুনছে।

কলকাতা ফিরবার দিন সকালে এন এন ঘোষাল দেখা করতে এল ভৈরবের সঙ্গে। পিসির জা-এর মেয়ের জামায়ের মতো কোনো একটা সম্পর্কে সে ভৈরবের ভগ্নিপতি হয়।

কেমন আছেন রায় বাহাদুর ?

আসুন রায় বাহাদুর।

আত্মীয়তামূলক ভদ্র আলাপ চলে, নিকট ও দূর আত্মীয়কুটুম্বের সংসারে বিবাহ মৃত্যু পাশ ফেল চাকরি-বাকরির সংবাদ আদান-প্রদান।

এই ব্যাপারে এসেছেন ? ভৈরব জিজ্ঞাসা করে কিছুক্ষণ পরে।

হ্যাঁ, তা ছাড়া কী।

কী যে দাঁড়াচ্ছে ছেলেগুলো আজকাল, ভৈরব আপশোশ করে, ধর্ম নেই, নীতিজ্ঞান নেই। অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল, যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। গান্ধীজির প্রভাবে আর কিছু না হোক, এ সব চাপা পড়ে যাবে ভেবেছিলাম, একটু সংযত হবে। এই জন্য চরকায় এত জোর দেন গান্ধীজি, আমার যা মনে হয়। এমনি নিয়মনিষ্ঠা তো মানবে না কিছু, তবু নিয়মমতো চরকা কাটলে মনটা হয়তো কিছু শান্ত থাকবে। তা, চরকাও ছোঁয় না ছোঁড়াগুলো। আচ্ছা রায় বাহাদুর, একটা কথা মনে হয়। স্বদেশি ছেলের নামে সাধারণ চোর-গুন্ডার কাজ হতে পারে না ?

রিভলবার পাবে কোথা ?

ও, হ্যাঁ, তা বটে, ঠিক কথা, খেয়াল ছিল না। তা, কদিন চলবে এ রকম ?

আর চলবে না। নলিনী একটা গোমুখ্যু। তেমনি মুখ্যু কার্লটন আর আপনাদের নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হার্টলি। সবে বিলেত থেকে এসেছে, কিছু জানেও না, বোঝেও না।

ওই সাদা মুখ্যুরাই তো চালাচ্ছে !

তা নয় রায় বাহাদুর, তা নয়। চালাচ্ছি আমরাই, কালা আদমিরা। আমাদেরই ব্রেন, আমাদের ওয়ার্ক, ওরা সেটা শুধু কাজে লাগায়। ওরা স্রেফ নুলো জগন্নাথ, আমরাই দড়ি টেনে রথ চালাই।

একটু থেমে ঘোষাল বলে, পাকা নাকি আপনার কাছে থেকে পড়ে ? ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শরীর খুব খারাপ দেখলাম। বহুকাল পরে দেখা, কী রকম বদলে গেছে মানুষটা। পাকা কোন ক্লাসে পড়ে ?

সেকেন্ড ক্লাসে। বড়ো দুরন্ত ছেলে, বড়ো অবাধ্য। ওরে কাঞ্চা, পাকাবাবু আছে নাকি, ডাক তো।

চা-মিষ্টির সঙ্গেই প্রায় পাকা আসে। ঘোষাল সস্নেহে বলে, তুমি পাকা ? কত বড়ো হয়ে গেছ ! আমি তোমার মেসোমশাই হই। তোমায় আগে দেখেছিলাম, দাঁড়াও দেখি হিসেব করি। তেরো না চোদ্দো সালে, বাঁকুড়ায়। তুমি তখন এইটুকু বাচ্চা। আমায় দেখলেই বলতে, মুসু, মুসু, লজেন ? রোজ পকেটে করে তোমার জন্য চকোলেট লজেন্স নিয়ে যেতে হত। তোমার মা বলতেন—

মা তো বেঁচে নেই।

চুরমার হয়ে যায় আত্মীয়তা অমায়িকতা স্নেহপ্রীতির সংগঠন, বুঝি বা রবারধর্মী ভদ্রতাও। এ কী কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলে, এ সময় এমন গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে এ ভাবে বলে তার মা তো বেঁচে নেই ! তিন বছর আগে তার মা মরেছে এ খবর যেন মানুষটা রাখে না—যে দাবি করছে আত্মীয়তার !

বিব্রত ভৈরব বলে, মেসোমশায়কে প্রণাম করলে না পাকা ?

একটু থতোমতো খাওয়া ঘোষাল বলে, থাক, থাক। তোমার মার কথা জানি ভাই।

পাকাকে ভাই বলে বসে ঘোষাল, বলে খেয়ালও হয় না, পাতানো মেসো শালি-পুত সম্পর্ক, ভাই বলার সম্পর্ক নয়। অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির রকমই এই, কয়েকটা ফলা চকচকে ধারালো হয়, কয়েকটা মর্চে ধরে মেরে যায় ভোঁতা।

শুভাদি আমায় আচার খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসতেন। কী শখ ছিল আচার করার ! দিনাজপুরে একবার আমাকে সাতরকম আচার খাইয়েছিলেন, তুমি তখনও জন্মাওনি।

মা তো কখনও বলেনি আপনার কথা ?

বলেছে, তুমি ভুলে গেছ।

এতক্ষণে পাকাকে একটু নরম, একটু উৎসাহী মনে হয়।

বলে, মার এগারোটা আচারের জার ছিল। শ্মশান থেকে ফিরে আমি সব কটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলাম। বলুন না মেসোমশাই, আচারের জার দেখে, কার্পেট দেখে, ফটো দেখে মাকে মনে রাখতে হবে ? ও রকম মনে নাই বা রাখলাম !

বোসো পাকা, দাঁড়িয়ে কেন ? ঘোষাল তার সঙ্গে সস্নেহে আলাপ করে—এবার গুরুজনের বদলে খানিকটা বন্ধুর মতো সস্নেহে।

২

সুধার কাছে সগর্বে বলে পাকা, জানো নতুন মামি, আমি ইচ্ছে করলেই কালীদাকে আচ্ছা জব্দ করতে পারতাম। ঘোষাল মেসোমশায়কে বলে দিলেই হত। নামকাটার মজা টের পেত কালীদা। ইচ্ছে করে বললাম না।

সুধা চমকে ওঠে, কী বললে না পাকা ?

তা শুনে কী করবে তুমি ? শোধ নিতে পারতাম, নিলাম না, বাস।

সুধা হাত চেপে ধরে পাকার, আমায় বলো।

দারুণ বিব্রত হয়ে পড়ে পাকা। এ কী মুশকিল হল ? বলবে নতুন মামিকে ? না বললে ভয়ানক রাগ করবে নতুন মামি। কিন্তু বললে যদি জানাজানি হয়ে যায় ? যে গল্প করার স্বভাব নতুন মামির !

তামাশা করছিলাম নতুন মামি। আমি জানি না কিছু।

আমায় চুপিচুপি বলো পাকা। আমি কাউকে বলব না।

আমি সত্যি কিছু জানি না।

তোমার এ সব ইয়ার্কি বিশ্রী লাগে পাকা। আমি তোমার গুরুজন না !

সুধা দুপদাপ পা ফেলে চলে যায়। মুখখানা বিপন্ন করে পাকা চেয়ে থাকে। নরেশের কাছে সে কথাটা শুনেছে। নির্বিবাদে সোজাসুজি তাকে কানাইয়ের দলে যাবার অনুমতি দেওয়ায় আহত ক্ষুব্ধ অভিমানী নরেশ সেদিন রাত্রে একা বাড়ি চলে গিয়েছিল আর থিয়েটার না দেখে। যেখানে ডাকাতি হয় তার কাছে রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজন কথা বলছিল। সে কাছে আসতে রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে আরম্ভ করে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছিল কালীনাথ, অন্যজন সরে গিয়েছিল আড়ালে। তাকে ঠিক চিনতে পারেনি নরেশ, মনে হয়েছিল নারায়ণ হবে ! বাড়ি বয়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে নরেশ পাকাকে জানিয়েছে সব। পাকা তাকে বারণ করে দিয়েছে কারও কাছে এ কথা বলতে, বললে জীবনে কখনও সে তার সঙ্গে কথা কইবে না। নরেশ মুখ বুজে থাকবে পাকা জানে। বোকার মতো সে যে কেন বাহাদুরি করতে গেল নতুন মামির কাছে !

সত্যই কী আর সে পুলিশের লোকটাকে কিছু বলত, না, এতটুকু ইচ্ছাও তার হয়েছিল বলতে ? ঘোষালের সঙ্গে কথায় কথায় কী ভাবে যেন ক্লাবের কথা উঠেছিল, তখন শুধু একবার মনে হয়েছিল, সে ইচ্ছা করলে কালীদাকে বিপদে ফেলতে পারে। শুধু মনে হয়েছিল কথাটা, আর কিছু নয়। ক্লাব থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এ রকম হীন প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে সে বরং মরে যাবে।

খবর পেয়ে শেষ মুহূর্তে কালীনাথ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে গিয়েছিল নারাণকে ঠেকাতে পারে কিনা। ভরসা খুব বেশি ছিল না, নারাণের যেমন প্রাণের মায়া নেই এতটুকু, তেমনই আবার ঠিক করে ফেলা কর্তব্যে তার মমতাও অটল। সে নিষ্ঠায় তখন যুক্তিতর্ক মিছে, অচল।

নারাণ, আমি কালীনাথ। কথা আছে।

বিরক্ত হয়েছিল নারায়ণ। শ্যামলীর গাড়ি কখন এসে পড়ে ঠিক নেই। রাত আড়াইটে বেজে গেছে। অনেক আগেই বাড়ি ফেরা উচিত ছিল শ্যামলীর। এমনিই সে কখনও রাত জাগতে পারে না

অথবা জাগে না, এখন আবার কাছে কচি ছেলেটা। থিয়েটার থেকে তাকে রওনা হতে দেখলে কিশোর জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে বেলে সংকেত বাজিয়ে চলে যাবে সামনের রাস্তা দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে সে কিশোরকে প্রত্যাশা করছে। এই কি তর্কবিতর্কের সময় ! তবু, আড়াল থেকে নারায়ণ উঠে আসে।

তোমায় আমি আবার অনুরোধ করছি নারাণ, এটা ক্যানসেল করে দাও। তোমায় আগে বলিনি, এখন জানাচ্ছি, তোমায় এত করে বারণ করার আর একটা কারণ আছে, আমরা একটা বড়ো প্ল্যান করেছি। কারও গয়না বা টাকা নয়, গবর্নমেন্টের টাকা, পঞ্চাশ-ষাট হাজার হবে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তাতে ব্যাঘাত ঘটিয়ো না ভাই। আমাদের বিপ্লবীদের মধ্যে যদি এটুকু ঐক্য না থাকে আমরা কোনোদিন কিছুই করতে পারব না।

তুমি যদি খুলে বললে, আমিও বলি। আমারও বড়ো প্ল্যান আছে, শুধু এই গয়না ডাকাতি করা নয়। নলিনীকে শেষ করাই আমার আসল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে নলিনী খুব বাড়াবাড়ি করলে, আজকের এটা দরকার হত না, সোজাসুজি ওকেই ঘা দিতাম। কিন্তু চারিদিক ঝিমিয়ে আছে, নলিনীরও লাফালাফি নেই, হঠাৎ ওকে মারলে তেমন এফেক্ট হবে না। সাড়া জাগবে না। আজকের ব্যাপারে ও খেপে যাবে, খুব দাপট চালাবে। তখন ওকে শেষ কবব।

একজন দুজন অফিসারকে মেরে কি বিশেষ লাভ আছে ? সেদিন বোধ হয় চলে গেছে। আজ দরকার বড়ো দল করে সোজাসুজি গবর্নমেন্টকে বড়ো ঘা মারা।

এ সব কাজে বড়ো দল হয না। অত ছেলে পাবে কোথায় ? একজন দুর্বল থাকলে তার জন্য দল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তুমি ভুল বকছ কালীনাথ।

আমাদের দলে এমন একটি ছেলেও নেই, একটু একটু করে গায়ের চামড়া খুলে নিলেও যে মুখ খুলবে।

কী জানি !

এক কাজ করো। তোমরাও এসো আমাদের সঙ্গে, নলিনীকে খ্যাপাতে চাও, বড়ো ঘা খেয়ে ওরা সব ক-টাই খেপে যাবে। তখন তোমরা যাকে খুশি মেরো।

তোমাদের মধ্যে অনেক কাঁচা ছেলে। কোন ভরসায় তোমাদের সঙ্গে যাব ? তুমি এত ঘাবড়েই বা যাচ্ছ কেন কালীনাথ ? আজকের ব্যাপারে বড়ো জোর ওদের কড়াকড়িটা বাড়বে। সে জন্য ভয় পেলে চলে আমাদের ? ওরা তো সতর্ক হবেই, কড়া ব্যবস্থা করবেই, আমরা আজ কিছু না করি, তোমার অপারেশনটার সঙ্গে সঙ্গে করবে। দু দিন আগে আর পরে। ওটাই তো তোমার শেষ কাজ নয় ? আরও তো প্ল্যান আছে ?

শুধু তাই নয়, মেয়েদের গয়না লুঠ করা লোকে পছন্দ করে না। আমাদের যারা সমর্থন করে তাদের কথাই বলছি।

নলিনী দারোগার বউ মেয়ে নয়।

রাতের শেষভাগে গাছের ফিকে চাঁদের আলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে তারা মৃদুস্বরে কথা বলছিল, দুজনেই শান্ত, নিরুত্তেজ।

আর একদিন আলোচনা করতে হবে। শেষ কথা বলেছিল কালীনাথ।

বেশ তো।

৩

মুনসেফ সুরেনবাবুর মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে তাদের দেখা হল। ঘোষাল এসে ফিরে যাবার কয়েকদিন পরেই। যে কজনের চলাফেরা ওঠা-বসা নিয়ন্ত্রণ করে নতুন নিষেধ জারি করা

হয়েছিল সব তখন তুলে নেওয়া হয়েছে। এমন কী, নাবায়ণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে বাড়ি থাকবার পুরানো হুকুমটাও বদলে হয়েছে মাঝরাত্রি থেকে বাড়ি থাকার হুকুম। ঘোষাল নিজে থেকে তাকে হেসে বলেছিল, এদিকে রিভলবার নিয়ে সায়েব মারতে যান, সাধারণ বিষয়ে একেবারে উদাসীন আপনারা। সন্ধ্যা থেকে কোটরে ঢোকার হুকুম একটা দেওযা হয়েছে, আপনিও তা মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। ও সব হল ফর্মাল অর্ডার একটা দিতে হয় তাই দেওয়া। এক বছর তো হয়ে গেল, এবার একটা দরখাস্ত করুন। আপনি চুপ করে থাকলে কার গরজ পড়েছে মাথা ঘামাবার !

নারায়ণ উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, ঠিক কথা, খেয়াল হয়নি তো !

এতদিন দেয়নি, এখন গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের হুকুম রদের প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত দেওযা, শহবে এমন ঘটনার পরেই ! ভেবেচিন্তে তাই করেছিল নারায়ণ। ওরা যদি চায় সে একটু স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করুক, তার আপত্তি কীসের !

দেশে কে রাজা কে প্রজা, কে কেন ডাকাতি কবে, পুলিশ কেন তোলপাড় কবে শহব, এ সব বিষয়ে সুরেন একান্ত উদাসীন। মেয়ের বিয়েতে সে আয়োজন করে বিরাট ভোজেব, শহরে সমস্ত চেনা মানুষকে নেমন্তন্ন করেছে।

পাঁচ

১

সুরেনের বাড়িটা একটু পুরানো আর বেঢপ এবং সেই জন্যই ভাড়ার অনুপাতে ঘর অনেকগুলি, স্থান অঢেল। সামনের উঠানটা এত বড়ো যে যাত্রাব আসর বসানো চলে। বাড়িওযালাকে মিঠেকড়া উপরোধ অনুরোধ জানিয়ে জানিয়ে বিফল হয়ে সুরেন অগত্যা নিজেই পয়সা খরচ কবে ভাসা-ভাসা ছাড়া-ছাড়া চুনবালির প্রলেপে বাড়িটার জীর্ণতা খানিক ঢাকবার চেষ্টা করেছে। সংকল্প আছে ভাড়া থেকে টাকাটা কেটে নেবার, কিন্তু খুব বেশি ভরসা নেই। বাড়িওয়ালা শ্রীমন্ত সাহা পাকা ঝানু লোক, আর এদিকে সরকারি চাকুরে হলেই বা কী, সে নিছক মুনসেফ। ছোটোখাটো একটা সাবডেপুটি হলেও লোকে কিছু ভয় করত, শ্রীমন্তও হয়তো বাড়ি মেরামতের অনুরোধটা অমান্য করতে সাহস পেত না, কিন্তু মুনসেফকে কে মানে, একটা ছ্যাঁচড়া চোরকেও যার পুলিশ দিয়ে বেঁধে এনে জেলে দেবার ক্ষমতা নেই ? অথচ সে হাকিম, জোর করে ভাড়া না দিলে বদনাম রটবে যে অমুক হাকিম বাড়ি ভাড়া দেয় না—জজসায়েবের কানে গেলে রাগ করবে, ধমক দেবে। এ এক বড়ো আপশোশ সুরেনের, বড়ো সে ঈর্ষা করে পুলিশি ফৌজদারি হাকিমদের।

ছাতটা হোগলা দিয়ে ঢেকে সেখানে সকলের পাতা পাতবার ব্যবস্থা। ভিতরের উঠানে ছোটো শামিয়ানার নীচে বিয়ের আসর। সামনের অঙ্গনে মস্ত শামিয়ানার তলে বসবার জন্য ফরাশ ও চেয়ার। ডে-লাইট জ্বলে আর কারবাইড পুড়ে দরকারের চেয়ে অনেক বেশি আলোকিত করেছে চারিদিক। যে ঘর আর আনাচ-কানাচে এ আলো পড়ছে না সেখানে জ্বলছে সাধাবণ লণ্ঠন। শুধু আলোর বাড়াবাড়ি নয়। রাত আটটা নাগাদ বর নিয়ে বরযাত্রীরা এসে হাজির হবার পর কিছু বাজিও পুড়ল, তুবড়ি এবং হাউই। তখন সাধারণ নিমন্ত্রিতেরা অনেকেই এসে গেছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুরু করেছে আসতে। সকলের সঙ্গে কুশঘাসের আসনে বসিয়ে পাতায় খাওয়ানোর বদলে এইসব পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোকগুলিকে বড়ো একটা ঘরে ভিন্নভাবে বিশেষভাবে খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছে বটে কিন্তু আসরে বসবার জন্য সাধারণ ভদ্রলোকের নাগালের বাইরে পৃথক কোনো রিজার্ভ ব্যবস্থা করা হয়নি।

তাদের জন্যও ওই সাধারণ চেয়ার। তবু যেন কী ভাবে সক্রিয় কৌশলে প্রকৃতির কোন অলঙ্ঘ্য নিয়মে আপনা থেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসবার একটা নিজস্ব এলাকা সকলের মধ্যে গড়ে উঠছে দেখা যায়। ফরাশে একাকার হয়ে গেছে ছোটো-বড়ো সাধারণ ভদ্রলোক, চেয়ারের সারিগুলির একদিকে খানিকটা মাননীয় ও গণনীয় উকিল ডাক্তার চাকুরেদের মধ্যে পর্যন্ত মেশাল পড়েছে সাধারণ ছোটো-বড়ো ভদ্রলোকের, কিন্তু অপরদিকে শহরের শুধু সেরা ব্যক্তিদের নিছক নির্ভেজাল ঘাঁটি। ঘাঁটি গড়ার কেন্দ্রটা সহজেই লক্ষণীয়, কয়েকজন বড়ো অফিসার। ওঠাবসা নড়াচড়া হাসিকথা রকম-সকম দেখে মনে হয় ওরাই চুম্বকের মতো জমিদার, ব্যবসায়ী, নেতা, কলেজের অধ্যক্ষ, সরকারি উপাধিধারী প্রভৃতিকে কাছে টেনে জড়ো করেছে—খাঁটি চুম্বকের মতো ওরাই হল আসল সম্ভ্রান্ত,—লোহার টুকরোর মতো অন্যদের মানসম্ভ্রম কেবল ওদের সঙ্গগুণে অর্জন করা।

লগ্ন রাত সাড়ে এগারোটায়।

প্রথম ফাল্গুনে শীতের ছোটো দিন কিছু বড়ো হয়েছে বটে কিন্তু তিন-চারদফায় এতগুলি লোককে খাওয়াতে হলে আটটাই বা কি এমন কম রাত ? প্রথম দলকে ভোজনে বসাতেই হবে শিগগির। তার আয়োজন চলছে ছাতে। একতলায় চলছে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, অকারণেই নানা ছুতায় উলুধ্বনি উঠছে ঘনঘন। আসবে চলেছে আসুন বসুন রব তুলে সিগারেট বিতরণের সংবর্ধনা।

অথচ মেয়ের বাপ সুরেন যেন একেবারেই নিরপেক্ষ। এ যেন তার মেয়ের বিয়ে নয়, তারই পয়সার ঘটা নয়, সে-ই যেন শুধু নগদেই সাড়ে তিন হাজার টাকার পণ দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের নতুন কাউন্সিল অঘোরের জীবনের ভরসারূপ পুত্ররত্ন কর্পোরেশনেই সদ্য নিযুক্ত কেরানি রোগা ও কালো শ্রীমান পরিমলকে বাগায়নি মেয়েকে বিলিয়ে দেবার এই উৎসবের জন্য। তাকে কেমন যেন মন-মরা, উদাসীন মনে হয়। জেলা জজ অরবিন্দবাবুকে ফাগুনের দখিনা হাওয়ায় দামি শাল উড়িয়ে আসতে দেখেও সে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় না। কাজটা করতে হয় তার দাদা হরেনকে।

অরবিন্দ বলে, সুরেনবাবু— ?

জজ হয়েও বোকার মতোই বলে। কারণ, দুজনেই তারা খানিক দূরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুরেনকে। বাঁশের খুঁটিতে লটকানো ডে-লাইটের নীচে তাদেরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সুরেন যেন সব ভুলে তন্ময় হয়ে শুনছে তার মেয়ের বিয়ের সানাই। বাড়ির সদর দরজার ডাইনে রোয়াকে বসে লখীন্দর তান ধরেছে তার নিজস্ব মেশাল পূরবীতে—এ জেলায় লখীন্দর বিখ্যাত সানাইওয়ালা। বিভোর হয়ে বাজাচ্ছে লখীন্দর, ওটা তার স্বভাব। পোঁ-ধরা তাল বাজানেদের নিয়ে সানাই বাজিয়ে মোট পাবে তেরোটি টাকা, পাঁচ বেলা খাওয়া আর একখানি কাপড়, আটহাতি কী বড়ো জোর ন-হাতি হবে কাপড়খানা জানা কথাই, গামছাও হয়ে দাঁড়াতে পারে শেষ পর্যন্ত। তবুও মন দিয়ে সানাই বাজায় লখীন্দর, শুনে মন কেমন করে মানুষের !

মেয়ের বিয়ের ব্যাপার বুঝতেই তো পারেন, হরেন সবিনয়ে জানায়, আসুন, বসুন এসে, সুরেনকে খবর দিচ্ছি। আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন শুনলে--

খানিক এমনি বিভোর আনমনা হয়ে থাকে সুরেন, আবার হঠাৎ সচেতন হয়ে খানিক এদিক ওদিক ছটফট করে বেড়ায়, যাকে সামনে পায় তার সঙ্গেই কথা বলে। বলে যে, সাড়ে এগারোটায় লগ্ন, বিয়ে শুরু হতেই বারোটা বাজবে, কী দিয়ে সকলকে সে যে আপ্যায়ন করবে—একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। তার বিনয়ের জবাবে সকলে বিনয় করে, এটা যে আসলে তার একটা গোপন প্রার্থনা বুঝে উঠতে পারে না। বলে যে, আহা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিছু ভাববেন না আপনি, এ তো আমাদেরই ঘরের কাজ !—কেউ ভুলেও বলে না তাকে যে, গান-বাজনার ব্যবস্থা নাই বা রইল, আপনিই আমাদের একটু কীর্তন শোনান না

সুরেনবাবু ? বলে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে চেপে ধরে তাকে বাধা করে না কীর্তন গেয়ে শোনাতে।

ভৈরব বরং বলে, আরে মশায়, এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা করেননি, বেঁচে গেছেন। ও সব কিছু দিলেই ভজঘট বাড়ে। কাজের ভার দিয়েছেন যাকে সে দাঁড়িয়ে গান শুনছে, খেতে বসতে ডাকছেন কেউ উঠছে না, আবার হয়তো এক সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে এসে বসতে চাইছে।

আর একজন বলে, ডান হাতের আয়োজন আছে, আবার কীসের এন্টারটেনমেন্ট ?

মাঝে মাঝে হরেন এসে তাকে ভর্ৎসনা করে যায়, তুমি করছ কি সুরেন ?

আর ক্ষণে ক্ষণে এ এসে ও এসে জানায়, এটা চাই, ওটা হল না, সেটার কী করা যায় !

মেয়ের বিয়ে দেবার শ্রান্তিতে, চারিদিকের এই নীরস বাস্তব ব্যবস্থা আর বেসুরো কলরবের চাপে, উজ্জ্বল আলো আর উলঙ্গ আনন্দের কটুস্বাদে সত্যই ফাঁপর ফাঁপর লাগে সুরেনের। সব বন্ধ করে পালিয়ে যদি যাওয়া যেত দূরে, বহুদূরে, এ সব হাঙ্গামার সীমা ছাড়িয়ে, যেখানে শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহের বিচিত্র মধুর রসে মশগুল হয়ে জগৎ-সংসার ভুলে থাকা যায়। পাকা নেশাখোরের যেমন কাজ আর দায়িত্বের ঝঞ্ঝাটে দম আটকে আসে, অভ্যস্ত নেশায় মাত্রা বাড়িয়ে ডুব দিতে প্রাণটা ছটফট করে, সুরেনেরও সেই দশা।

বিয়ের আসরেও দেশের কথা নিয়ে তর্ক বাদ যায় না। অসহযোগ আন্দোলন রাশ টেনে থামিয়ে দেওয়া উচিত হয়েছে কী হয়নি, সেই তর্ক। বয়ন সংঘের ভবতোষ বলে, আর কিছুই করার ছিল না। আন্দোলন বিপথে চলার উপক্রম করলে সেটা বন্ধ করাই নেতাদের কর্তব্য।

অমিতাভ মৃদুস্বরে মন্তব্য করে, আন্দোলন বিপথে যায় কেন !

ভবতোষ বলে, দেশের লোক নিয়ে যায়। সংযম হারায়, নেতাদের কথা শোনে না, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

অমিতাভ বলে, কিম্বা আন্দোলনটাই ভুল পথের বলে দেশের লোক ধৈর্য হারায়, নেতাদের কথা শোনে না, নিজেরা আন্দোলন চালাতে চায় ?

ভবতোষ বলে, কী যে বলো তুমি অমিত ! সাধারণ লোক কত রাজনীতি বোঝে !

অমিতাভ বলে, স্বাধীনতা চাই, এটুকু তো বোঝে ? ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করা চাই, এটুকু তো বোঝে ? মুখ বুজে মার খেলে স্বাধীনতা আসে, এ রাজনীতি তারা বুঝতে পারে না, তা ঠিক। কোনোদিন বুঝতে পারবেও না। যে মারে তাকে মারতে হয়, এই সোজা সত্যটা তারা বোঝে। চিরকাল তাই বুঝবে।

তোমরাই দেশের শত্রু। বুঝলে অমিত, মাথা-গরম তোমরাই দেশের সর্বনাশ করছ !

কেন ? আমরা তো নেতা নই !

আহা, গরম হয়ে লাভ কী ? তোমার কথাই ঠিক ভবতোষ। আর কী করার ছিল ? ভবতোষকে সমর্থন করে ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, যে-ভাবে যে-পথে যিনি মুভমেন্ট চালাবেন তিনিই যখন দেখলেন দেশের লোক সে-ভাবে সে-পথে চলছে না, তাঁর নির্দেশ মানছে না, বুঝতেই পারছে না তাঁর কথা, মুভমেন্ট বন্ধ না করে তিনি করেন কী ? তাঁরই মুভমেন্ট তাঁরই দায়িত্ব, তিনিই সব। চৌরিচৌরার পর আর তিনি পারেন চালাতে ?

ডাক্তার রায়চৌধুরীর পরনে ফেনার মতো কোমল আর ধবধবে সাদা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, তার তুলনায় বয়ন সংঘের ভবতোষের জামা-কাপড় অনুজ্জ্বল, কর্কশ ও মোটা।

তাঁরই মুভমেন্ট, তাঁরই দায়িত্ব, তিনিই সব !

নিশ্চয় ! এ বিষয়ে সন্দেহ আছে ? বলতে বলতে প্রশান্ত উদ্দীপনার ভাব ফুটেছে ডাক্তার রায়চৌধুরীর মুখে, একটা কথা ভেবেছেন মশায় গান্ধীজি ছাড়া কারও সাহত হত বলতে, আর নয়,

যথেষ্ট হয়েছে, এবার বন্ধ করো ! মুভমেন্ট শুরু করতে পারে অনেকে, বন্ধ করতে পারে কজন ? আমরা তখন ধরতে পারিনি, শুধু উনি একা বুঝেছিলেন মুভমেন্ট চলতে দিলে কী অবস্থা দাঁড়াত, একা ওঁর সে দূরদৃষ্টি ছিল।

কীসের দূরদৃষ্টি ? মুভমেন্ট আর ওঁর থাকবে না, ওঁর একার দায়িত্ব থাকবে না, উনিই সব থাকবেন না, এই দূরদৃষ্টি ?

ভৈরবের মেজো শালা গিরিশ বলে, আমি একটা কথা বুঝে উঠতে পারি না। মুভমেন্টটা যখন আরম্ভই করলেন, ওঁর কি আগেই জানা উচিত ছিল না এতবড়ো দেশে ও রকম একটা মুভমেন্ট চালালে এখানে-ওখানে হাঙ্গামা হবেই ?

আহা, অ্যামেচার ক্লাবের অভিনীত স্বদেশি নাটকটির লেখক—উকিল নরেন দস্তিদার বলে, তাই তো উনি খোলাখুলি স্বীকার করলেন ওঁর মস্ত ভুল হয়েছিল। অন্য কেউ এমন সরলভাবে বলত এ কথা ? ওঁর কাছে ছলচাতুরী নেই।

ঠিক কথা, ভবতোষ সায় দেয়, অহিংসা আর সত্যই ওঁর সাধনা। রাজনীতির চেয়ে তা ঢের বড়ো জিনিস। নইলে দেশসুদ্ধ লোক তাঁকে দেবতার মতো পূজা করে ?

বাস্, গান্ধীজিকে বুঝে ফেলেছ তো তোমরা ? ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, আপনিও বুঝে ফেলেছেন তো ভবতোষবাবু ? অতই যদি সোজা হত গান্ধীজিকে বোঝা, তিনি গান্ধীজি হতেন না, আর দশটা পলিটিক্যাল লিডারের মতো সাধারণ নেতাই হয়ে থাকতেন। গান্ধীজি কখনও ভুল করেন না। তিনি সব জানেন, সব বোঝেন, ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে আয়নার মতো স্বচ্ছ। মুভমেন্ট শুরু করার আগেই তিনি জানতেন কিছুদিন পরে বন্ধ করে দিতে হবে।

গিরিশ, নরেন ও ভবতোষ তো বটে, আরও যারা শুনছিল সকলেই অল্পবিস্তর ভড়কে যায়। —কী বললেন কথাটা ? গান্ধীজি জানতেন ? ফল কিছু হবে না জেনেশুনেই তিনি মুভমেন্ট শুরু করেছিলেন বলতে চান ?

ফল কিছু হবে না মানে ? ডাক্তার রায়চৌধুরী প্রশান্ত গম্ভীর মুখে চেপে চেপে বলেন, ওইখানেই ভুল করেন আপনারা। ফল কি হয়নি কিছু ? সাড়া কি পড়েনি দেশে, দেশ কি জাগেনি ? ওইটুকুই গান্ধীজি চেয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি, আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দেড়শো বছরের পরাধীন দেশ, হঠাৎ একটা আন্দোলনে একেবারে তার স্বাধীনতা আসে না, দেশকে শুধু জাগাবার জন্যই দুটো একটা আন্দোলন দরকার হয়। গান্ধীজি তা জানতেন, তাই স্বরাজ আসবে না জেনেও মুভমেন্ট চালিয়েছেন—স্বরাজ যদি আনতে হয় কোনোদিন, এ মুভমেন্ট করতেই হবে। সেই জন্যই যতদিন মুভমেন্ট চালানো দরকার চালিয়ে, ঠিক সময়ে বন্ধ করে দিয়েছেন।

আপনার এ ব্যাখ্যা জানিয়েছেন নাকি গান্ধীজিকে ? অমিতাভ বলে হাসিমুখে, জানালে খুশি হবেন। আপনার মতে গান্ধীজি চালবাজ, না ডাক্তারবাবু ?

নরেনও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানায়, কী বলছেন আপনি ডাক্তারবাবু ? উনি মনে মনে এক কথা ভাবেন আর দেশের লোককে অন্য কথা বলেন ? আপনাদের মতো ভক্তদের জন্যই মুভমেন্টটা বানচাল হল !

আহা, মাথা গরম করবেন না নরেনবাবু ! গিরিশ বলে।

ডাক্তারবাবু জেল খেটেছেন, নাটক লিখে দেশোদ্ধার করেননি।—বলে ভবতোষ।

আপনার ব্যাখ্যার মানে কিন্তু তাই দাঁড়ায় ডাক্তারবাবু, গান্ধীজি সবাইকে ধাপ্পা দিয়েছেন। অমিতাভ সহজভাবে কথার কথা বলার মতো করে বলে, উনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন ভুল করেছেন, হিমালয় পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড ভুল করেছেন, দেশের লোক তাঁর অহিংস নীতি মানল না। আপনি

বলছেন তিনি ভুল করেননি, তিনি গোড়াতেই জানতেন সবাই পুতুলের মতো মার সইবে না, উলটে পুলিশকে মারবে। তা হলে তাঁর মুভমেন্টটাই ছেলে-ভুলানো ধাপ্পা দাঁড়ায় না ?

চটে আগুন হয়ে ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, তুমি কি বলতে চাও গান্ধীজি দেশকে নিয়ে ছেলেখেলা করছিলেন ?

আমি কি পাগল ? অমিতাভ হাসিমুখেই জবাব দেয়, গান্ধীজি মহাপুরুষ, নেতা হিসাবে তাঁর তুলনা হয় না, এতে আপনি সন্তুষ্ট নন, তাঁকে অদ্ভুত উদ্ভট কিছু বানাতে চান, তিনি সর্বজ্ঞ দেবতা, মহাঋষি, ম্যাজিসিয়ান, সব কিছু। আমার তাতেই আপত্তি। আপনার ব্যাখ্যা মানতেও আপত্তি হয় না, গান্ধীজিও তাতে ছোটো হন না, তাঁকে যদি ধর্মপ্রচারক না করে রাজনৈতিক নেতা বলে ধরেন। আর কিছু হোক বা না হোক, ঘুমন্ত দেশটাকে শুধু জাগাবার জন্যই একটা আন্দোলন দরকার এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তিনি আন্দোলন চালিয়ে থাকেন, সে তো ভালো কথা, গৌরবের কথা। তাঁর বিশ্বাস ভুল কি না, সে প্রশ্ন আলাদা। ভাবুন তো তা হলে কত সরল সহজ হয়ে যায় তাঁর অহিংসা, আর সত্য ? অহিংসনীতি পরাধীন দেশের শিকল কাটার অস্ত্র, রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি, আর কিছু নয়। বেদান্তের মাপকাঠিতে সত্য হোক বা না হোক, দেশের কোটি কোটি লোকের ভালোমন্দের হিসাব কষে যা করা দরকার, যা বলা দরকার, তাই করা আর বলাই সত্য। হিসাব ভুল কি না সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা।

বাস হয়ে গেল ! বিক্ষুব্ধ ভবতোষ ব্যঙ্গ করে, উনি শুধু রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজির প্রতীক ? শুধু পাকা পলিটিশিয়ান ? ভারতের যুগযুগান্তের জ্ঞানকর্মের সাধনা যাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছে, বেশ একটা সার্টিফিকেট তাঁকে দিলে তো অমিত !

কী করব বলুন ? অমিতাভ নির্বিবাদে বলে যায়, অমন একটা মানুষের নামে যা-তা রটাতে ভালো লাগে না। ভারতের যুগযুগান্তের জ্ঞানকর্মের সাধনা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে থাকে, তাঁকে শত শত প্রণাম। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে রাজনীতি করতে আসেন কেন ? চল্লিশ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে রাজনীতি, সেটা শুধু একটা সাইড লাইন হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এ কথা বললে যে তাঁব মতো মহাপুরুষকে অপমান করা হয় ভবতোষবাবু ! তা ছাড়া দেখুন, তাঁর নীতি বুঝতে হাবুডুবু খেতে হয়, কূল-কিনারা মেলে না. একেবারে অবতারের লীলাখেলার শামিল করে তাঁর মত আর পথকে সমর্থন করতে হয় ডাক্তারবাবু। মানুষটা দেশের জন্য এত করেছেন এ ভাবে তাঁকে অপমান করা কি উচিত ? তার চেয়ে তিনি যখন রাজনীতি করেন তাঁকে নিছক রাজনৈতিক নেতা বলে ধরে নিলেই গোল থাকে না। আমরা তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর নীতি বিচার করতে পারি, তাঁর পথ ঠিক না ভুল তাই নিয়ে ঝগড়া করতে পারি।

তুমি করবে গান্ধীজির বিচার ! ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, তার চেয়ে সোজাসুজি গালাগালি দাও, তাতে কম অপমান করা হবে।

চটেন কেন ? অমিতাভ বলে, স্বাধীনতার লড়াইটা ফাঁসিয়ে দেওয়া, তার লজ্জা আর গায়ের জ্বালাটাও একচেটে করে নেবেন ? আমারও হার হয়েছে, আমারও লজ্জা করে, গা জ্বলে।

আশেপাশের ক-জন যারা শুনছিল সশব্দে হেসে ওঠে। ডাক্তার রায়চৌধুরীর নিরুপায়ের আঘাত হেনে আত্মসমর্পণের ঝাঁজ উড়ে যায় সে হাসিতে।

২

এইখানে, চেয়ারের সারির এই সাধারণ প্রান্তে এ রকম আলোচনা বা তর্ক বা কথার লড়াই শুধু এইটুকুই চলে, তাও অমিতাভ আলোচনার সূত্রপাতটা ঘটিয়েছিল বলে। ডাক্তার রায়চৌধুরী সদ্য সদ্য গান্ধী আশ্রম ঘুরে এসেছে, সেখানে ইলেকশন সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা যে সাধারণ

বৈঠক হয় সেই কমিটির একজন মেম্বারের সঙ্গে দর্শক হিসাবে—ডাক্তার রায়চৌধুরী তার ছেলেবেলার বন্ধু। অমিতাভ জানতে চেয়েছিল ভবিষ্যতের ভিত্তিতে আজকের দিনের সমস্যা নিয়ে কী কথাবার্তা হয়েছে, নেতাদের মনোভাব কী—নিছক কৌতূহল নয়, জানবার তাগিদেই জানতে চেয়েছিল। কিন্তু আলোচনা আরম্ভ হতে না হতে ফিরে গেল অতীতের ব্যর্থতার ব্যাখ্যায়, বেশি দূর অতীত নয়, এই সেদিন আকস্মিক রাশ টানায় গতিশীল জাতীয়তার গাড়িটা যে দুর্ঘটনায় উলটে গেছে। অমিতাভ চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল আগ্রহে কান পেতে শোনে কে কী বলছে। বিয়ের আসরের নানাবিধ গান-গল্প হাসি-তামাশা আর ঘরোয়া আলাপের সঙ্গে সঙ্গে না হোক, পাশে পাশে না হোক, ফাঁকে ফাঁকেও কেউ কি সাধারণ দুটো চারটে কথা বলবে না, যে কথা খাঁটি হোক ভেজাল হোক অন্তত দেশের কথা, দশের কথা, বাঁচার কথা ? স্বদেশি একটা ডাকাতি যে হয়ে গেল শহরে কদিন আগে, শহর তোলপাড় হল কদিন ধরে, পুলিশ তছনছ করল চারিদিক, তা নিয়েও কি দুটো কথা বলাবলি করবে না কেউ ? বিয়ের আসরও কি অন্তত কয়েকজনের কাছেও চুলোয় যায় না এই বিবেচনায় যে একজনের মেয়ে বড়ো হয়েছে বলে তার বিয়ে দেবার সামাজিক বাস্তব প্রয়োজনের কল্যাণে তারা একত্র হয়ে সুযোগ পেয়েছে অজস্র বলাবলির ? বেঁচে থাকার সহজ সরল তাগিদও কি এ ভাবে তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে যাওয়া সম্ভব প্রত্যেকের বাঁচার কথা মুলতুবি রাখার অর্থহীন অপরিসীম ব্যাকুলতায় !

আলো জেলে শামিয়ানা টাঙিয়ে আসর সাজিয়ে সানাই বাজিয়ে উলুধ্বনি তুলে সবাই কি জেনে থেকে ঘুমোবে ?

বিয়ের আসরে অমিতাভ খুঁজে বেড়ায় পরাধীনতার বেদনার, প্রতিবাদের চিহ্ন : একটুখানি প্রতীক-চিহ্ন, ইঙ্গিত। বিয়ের আসরে কি স্বাধীন হয়ে গেছে ছ-সাতশো লোক সকলেই, বিলাতি বুটের ছ্যাঁচার জ্বালা মিলিয়ে গেছে ?

খালি যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছ অমিত ? দেখাচ্ছ নাকি যে খুব খাটছ ?

চপলা বলে প্রায় সামনে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে। তার দেশি মিলের মিহি থানে প্রায় সাদা সিল্কের জলুশ, হাতকাটা শেমিজে সাদা আরও গাঢ়, গায়ের রং আশ্চর্য রকম ফরসা। পতিহীনতায় তিনি যেন বিশেষভাবে মহীয়সী।

না। দেখছি। দেখে বেড়াচ্ছি।—অমিতাভ বলে।

ফাঁকি দিচ্ছ তো ? তা বাবা আমার একটা কাজ করে দাও। মেয়েটাকে খুঁজে পাচ্ছি না, খোঁজও পাচ্ছি না। বেঁচে আছে, নিরাপদে আছে শুধু এই খবরটা তুমি আমায় এনে দাও।

চপলা নির্ভয় অব্যাকুল শান্ত হাসি হাসে। সে ভুবনের দ্বিতীয় পক্ষের বউ, বি-এ পাস, নাম-করা মৃত বৈজ্ঞানিক স্যার রাধাদুলালের স্ত্রী।

আপনি না কথা কইছিলেন ওর সঙ্গে ?

তারপর থেকেই তো খুঁজে পাচ্ছি না, একটু থতোমতো খেয়ে চপলা বলে, কোথায় যে গেল !

অমিতাভ মজা বোধ করে না। দশ মিনিটের অদর্শনে মেয়ের জন্য চপলার ব্যাকুল হবার ভানকেও ভান হতে দেয় না, বলে, ডেকে দিচ্ছি। বইটা পড়েছেন মাসিমা ?

কোন বইটা বাবা ?

মাত্র চার-পাঁচদিন আগে বাড়ি এসে বইটা পড়তে নিয়েছে, চপলার মনেও নেই।

আইরিশ রিভোলিউশনের সেই বইটা নিয়ে গেলেন না ?

ও ! প্রতিমা পড়ছে। আমি কি পড়াশোনার সময় পাই ?

প্রতিমাকে খোঁজ করতেই পাওয়া যায়।

মা আমাকে খুঁজছে ? আশ্চর্য হয়ে প্রতিমা অমিতাভের মুখের দিকে কয়েকবার তাকায়, মুখের ভাবের ভাষা পড়বার জন্যই তাকায়, বয়স বেশি না হলেও এ মুখখানা সে অধ্যয়ন করে আসছে অনেক দিন, ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছে অনেকখানি।

মার শরীর ঠিক আছে তো ?

ঠিক থাকবে না কেন ?

তাই জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ যদি শরীর খারাপ হয়ে থাকে ?

মাদ্রাজি একখানা শাড়ি পড়েছে প্রতিমা, খানিটা রাজপুতানা ধরনে। বর্গে বর্গি নাটকে নিখিল ঘোষালকে যে বেশে মেয়ে সাজতে দেখে তার ঈর্ষা জেগেছিল তারই অনুকরণে।

মাসিমা নীচে আছেন, দেখা করে এসো।

কী আবার দেখা করব !

খুঁজছেন তোমায়।

খুঁজছে না হাতি। এটুকু বুঝতে পার না ?—প্রতিমার দাঁতগুলি সুন্দর, হাসিটি ভারী মিষ্টি।—সেই কবে এসেছ কলকাতা থেকে, অ্যাদ্দিনে একবার দেখতে এলে না জ্যান্ত আছি না মরে গেছি। মার ভাবনা হবে না ?

অমিতাভের নীরবতায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে একেবারে মরে যায় প্রতিমার মিষ্টি হাসি।

কী ভাবছ ?

কিছু না।

কী ভাবছিলে ? বলো আমায় কী ভাবছিলে, বলতে হবে। অমন করে তাকিয়ো না বলছি। কেমন যে কর তুমি !

কী হল তোমার ? অমিতাভ বিপন্ন হাসি ফুটিয়ে বলে, রাগছ কেন ?

চেপে গেলে তো ? বেশ। যা শুরু করেছ, আমি বলে কথা কইলাম, আর কেউ হলে—

উদ্‌বেগের ব্যাকুলতায়, উদ্‌বেল অভিমানে, বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করা ভয়ে চপলার মতো মুখখানা দেখায় প্রতিমার। না জেনে না বুঝে কিছু যাতে বলে না ফেলে সে সংযম বজায় রাখার চেষ্টাটুকু কষ্টটুকুও অনুভব করা যায়। মায়া বোধ করে অমিতাভ, জোরালো মায়া। হাসি মুখে মিষ্টি কথা বলার দুরন্ত সাধ জাগে। মনে হয়, মেয়েটাকে বড়ো আঘাত দেবার চরম সংকল্প খাড়া রেখেও বুঝি এখন ওর এইটুকু দুঃখ অভিমান উপেক্ষা করার মতো জোর সে খুঁজে পাবে না। তাই, নিজেকে একান্ত নিরুপায় ও অসহায় বোধ করায় অকারণ অর্থহীন কঠোরতার সঙ্গে ধমকের সুরে বলে, এখানে এখন ঝগড়া কোরো না প্রতিমা।

প্রতিমা যেন ঝগড়া করছে !

তাই প্রতিমার ভয় ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েই আবার বলতে হয়, কাল তোমাদের বাড়ি যাব, কথা আছে।

কী হয়েছে ? আবার ধরবে নাকি তোমায় ?

না না, তা নয়। বলবখন কাল।

কখন যাবে ?

সকালে।

আধঘণ্টার মধ্যে প্রতিমা তাকে খুঁজে বার করে।

মা চলে গেছে। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ভুবন তখনও যায়নি, তার বাড়ির ছেলেমেয়েরাও আছে। সে কথা তোলে না অমিতাভ, লাভ কি ?

এখনই যাবে ?

হ্যাঁ যাই চলো।

এবার সহজভাবে বলে অমিতাভ, সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরছে না বুঝি ?

না, তা নয়।—একটু ভাবে প্রতিমা, আচ্ছা বিয়েটা দেখেই যাই। বাড়ি পৌঁছে দেবে কিন্তু।

বাড়ি পৌঁছে দেব ? বাড়িতে খেয়ে ফেলবে না ?

খেয়ে ফেলুক ! দু চোখ জ্বলে ওঠে প্রতিমার, সুন্দর দু সারি দাঁত টুক করে আওয়াজ তুলে ঠুকে যায়, তুমি আজ আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে। বল পৌঁছে দেবে, কথা দাও। নইলে এখানে আমি কেলেঙ্কারি করব।

তবে এখুনই চলো।

না। বিয়ে দেখে যাব।

৩

কালীনাথ বলে অমিতাভকে, তুমি যে মুষড়ে গেলে একেবারে ? এ তো জানা কথাই, হতাশা থেকে অবসাদ আসবে, প্রতিক্রিয়া আসবে। একটা কথা ভুলো না অমিত, এ কিন্তু একেবারে হাল ছেড়ে দেবার হতাশা নয়, রোগীর মতো নির্জীব দুর্বল হবার অবসাদ নয়। মনটা শুধু সবাই গুটিয়ে নিয়েছে, সরিয়ে ফেলেছে। আর কিছুই করার নেই তাই। নেতাদের যেমন ভাব, আমাদেরও তেমনই। স্বাধীনতার কথা, লড়াইয়ের কথা কেউ আলোচনা পর্যন্ত করতে চায় না। সামনে কিছু নেই তো দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা, লড়ায়ের কথা তুললেই পিছনে তাকাতে হয়। হেরে গেছে, লজ্জা করে, খারাপ লাগে, কষ্ট হয়। তার চেয়ে যাক বাবা, যা হবার হয়ে গেছে, চুলোয় যাক, এ ভাবে উদাসীন হওয়াই ভালো। কিন্তু আজ তুমি পথ দেখাও, লড়াই বাধাও, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ভড়কে যাবার কিছু নেই। তা, বিশেষ করে বিয়েবাড়িতে তুমি স্বদেশি আলাপ হাতড়ে বেড়াচ্ছ কেন বলো তো ?

আমার বোনের বিয়ে কবে হয়েছিল মনে আছে ? সরলার ? রেগুলেশন জারি করেই প্রথম যে উমেশকে ধরে নিল, তার মাসখানেক পরে। বিয়ের সভায় শহরে ওই একটা অ্যারেস্ট নিয়ে লোকে যে কত কথা বলাবলি করেছিল আর কদিন আগে এত হইচই হল, কেউ একবার উল্লেখ পর্যন্ত করছে না ?

শুনছ নারাণ ? কালীনাথ বলে, ওই এক কথাতেই আসছি আমরা—আসতে হচ্ছে। আজ এই হল রিয়ালিটি ! উমেশের অ্যারেস্টটা কি শুধু শহরের একজনকে অ্যারেস্ট করাই ছিল অমিত ? পিছনে দেশ জোড়া রেগুলেশন আইনটা ছিল না ? আইনটার বিরুদ্ধে তখন লোকের কী রাগ, কী জ্বালা, সেটা ভুলছ কেন ? তখন সময়টাও কী রকম ছিল ভেবে দেখ। চারিদিকে গোলমাল বাড়ছে, লোকের মিলিট্যান্ট ভাব বাড়ছে। সামনে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে ফাইট করতে সবাই পাগল। নয় তো নন-কো-অপারেশন মুভমেন্ট চলত, না, চালাতে ভরসা হত নেতাদের ? আজ অবস্থা অন্য রকম। কিন্তু তাতেও আসত যেত না, যদি নারাণের সেদিনের কাণ্ডটা লোকের কাছে সামান্য বিচ্ছিন্ন ব্যাপার না হত।

মানে ? নারায়ণ বলে মুখ থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে। দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে খোশগল্প করার মতো তাদের কথা চলছিল।

মানে হল, এ ঘটনার পেছনে লোক বড়ো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পুলিশ হইচই না করলে লোকে যেটুকু নজর দিয়েছে তাও দিত না ব্যাপারটাতে। এই কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি নারাণ।

আজ এ সব ছাড়া ছাড়া ছোটোখাটো কাজের বিশেষ কোনো এফেক্ট নেই। তুমি বলছ নলিনীকে মারতে পারলে এফেক্ট হত, সাড়া জাগত। কী এফেক্ট হত ? কতটুকু হত ? দু-চারদিনের জন্য খানিকটা বেশি উত্তেজনা। লোকে আবার ভুলে যেত। লোকে আজ অনেক বড়ো কিছু চায়, ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস, এখানে ওখানে ঘা মেরে গায়ের ঝাল ঝেড়েই তারা সন্তুষ্ট নয় ! নলিনী কেন, আজ লাটসায়েবকে মারো, লোকে চমকে উঠবে, বলবে একটা কাণ্ড হল বটে, বাস, তাবপর চুপ হয়ে যাবে। এ তো শুধু একটা ঘটনা। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের একটা চাকরকে মারলে, গবর্নমেন্টটা তো মরল না ! লোকের মনে যদি বিশ্বাস আনতে পার যে এটা নিছক ঘটনা নয়, এটা বিপ্লবের আহ্বান, প্রস্তুতি, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভের আয়োজন চলছে, এ বকম ছোটো ঘটনার চেহারাও সঙ্গে সঙ্গে লোকের কাছে বদলে যাবে। নারাণের ছেলেখেলাটুকুর মধ্যেও তখন লোকে দেখতে পাবে, তাদের শহরেও বিপ্লবের লড়াই শুবু হয়ে গেছে। বিয়েন আসরে অমিতও শুনতে পাবে লোকে ওই কথা কানাকানি করছে।

লোকে জানবে কী করে বিপ্লবের চেষ্টা হচ্ছে ? নারায়ণ বলে, হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ?

কালীনাথ বলে, দুটো উপায় আছে। চারিদিকে একটার পর একটা ছোটো ছোটো অপারেশন ক্রমাগত চালানো কিম্বা কোথাও বিরাট স্কেলে একটা অপারেশন প্ল্যান করা। শুধু এইভাবে তুমি দেশের লোককে জানাতে পার তোমার রিভোলিউশনাবি প্ল্যান আছে, অর্গানিজেশন আছে, তুমি লড়াই চাও।

তার স্কোপ পাচ্ছ কোথায় ? নারায়ণ বলে, ছোটো স্কেলে অনেকগুলি হোক আব বড়ো স্কেলে একটাই হোক, তার জন্য লোক চাই। দু-একটা নমুনা দেখিয়ে নাড়া দিয়ে সাড়া না জাগিয়ে তুমি লোক টানবে কী করে ?

এটা আপনার ভুল হল, অমিতাভ প্রতিবাদ জানায়, নমুনা যথেষ্ট দেখানো হয়েছে, আমবা যখন আঁতুড়ে তখন থেকে দেখানো হচ্ছে। ক্ষুদিরাম শুবু করে আজ পর্যন্ত কম লোক কম নমুনা দেখাননি।

আজ ও বকম নমুনার দরকার নেই, কালীনাথ জোর দিয়ে বলে, লাভও নেই ওতে। শুধু শক্তি ক্ষয়, কাজের অসুবিধা। বিপ্লব গড়ে তোলার নমুনা দেখাতে পার দেখাও, নয় চুপচাপ থাকাই ভালো।

তোমার ফ্যান্সি-মতো অপারেশন গড়তে যদি দু-চারবছব লাগে ?

লাগবে।

জুড়িয়ে বরফ হয়ে যাবে না দেশটা ? যে কজনকেও পেয়েছ কাজেব জন্য তারা ধৈর্য হাবাবে না ? ঝিমিয়ে পড়বে না ? ছিটকে বেরিয়ে যাবে না অন্য দলে যারা অন্তত হাতেনাতে ছোটোখাটোও কিছু করছে আমার ছেলেখেলার মতো ?

এ যুক্তি উড়িয়ে দেবার মতো নয়, এ সমস্যা কালীনাথকেও বিব্রত ও চিন্তিত করে রেখেছে। বিপ্লবেব জন্য প্রাণ দিতে যে তরুণ এগিয়ে আসে কিছু করার জন্য এমন সে ছটফট করে, কাজ চাই, কাজ, বিপজ্জনক রোমাঞ্চকর গুরুতর কাজ !—প্রাণ দিতে একটু বিলম্ব যেন সয় না। কিছু করার জন্য, তাড়াতাড়ি করার জন্য, দলের এই চাপ বিপন্ন অস্থির করে তোলে নেতাকে। কিছুদিন ঠেকিযে রাখা যায়, আরও বেড়ে যায় সবার উৎসাহ ও আগ্রহ কিন্তু একেবারে কাজের খোরাক না পেলে তারপর ঝিমিয়ে আসে, বাড়ে অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, বিরক্তি, অবসাদ। কেউ কেউ সত্যই দল ছেড়ে দিয়েও চলে যায়। একেবারে বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে নয়, চলে যায় অন্য সক্রিয় দলে, যারা শুধু প্রস্তুতি নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই। কিছু করার অদম্য আবেগকে খানিকটা শান্ত রাখা যায় দলের কাজ দিয়ে, যাতে দায়িত্ব বিপদ আর গোপনীয়তার রোমাঞ্চ আছে। কাজ উদ্ভাবনও করতে হয় কিছু কিছু। তবু আয়ত্তে রাখা কঠিন হয় উৎসাহ।

সেই জন্যই তো আমাদের ঐক্য দরকার, মিলেমিশে প্ল্যান করা দরকার যতটা সম্ভব, ট্রেনিং যাতে আদর্শ আর কাজের সামঞ্জস্য রেখে হয় তাও দেখা দরকার।

এর বেশি আর কিছু বলতে পারে না কালীনাথ। সে জানে না কেন এই আপাতবিরোধিতা, বিপ্লবী কর্মীর আদর্শবোধ ও উদ্দীপনাময় মনের কোন গহনে এই জটিলতার মূল ! দেশের মুক্তি যার যত বেশি কাম্য, স্বাধীনতার আদর্শ যার কাছে যত বড়ো সত্য, যে যত বেশি নির্ভীক, বেশি তেজস্বী কর্মঠ জীবন্ত, সে-ই যেন তত বেশি উন্মাদ বিপ্লবে ঝাঁপ দিতে, প্রাণ দিতে দেরি যেন তারই তত বেশি অসহ্য ! অথচ এ দেরি চাই বিপ্লবী দল গড়তে, অথচ ধীর-শান্ত নিরুদ্‌বেগ অহিংস ভালোমানুষ যৌবনে বিপ্লব নেই। পুঞ্জ পুঞ্জ বোমা গড়ে সঞ্চয় করে রাখা যায় যেদিন খুশি খাটানোর জন্য, তারুণ্যের প্রচণ্ড প্রাণশক্তির জীবন্ত বোমা গড়লে বড়ো হয়ে ওঠে তারই বিস্ফোরণের তাগিদ।

মনটা তার নিজের দেশেই আবদ্ধ। জগতেও যে বিপ্লব ঘটেছে এ ধারণাও তার নেই। রাশিয়ায় যে সার্থক বিপ্লব ঘটেছে অল্পদিন আগে তার কোনো মানেই সে বোঝেনি। প্রাণটা শুধু তার ব্যাকুল হয়েছে। রাশিয়ায় বিপ্লব হল, সে এ দেশে বিপ্লব করতে পারল না, সে একা !

৪

বড়ো অফিসার ও অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তি কজন বেশিক্ষণ থাকে না, প্রায় কিছুই খায় না। সন্দেশের কোনা ভেঙে মুখে দেওয়া তাদের সাধারণ নিমন্ত্রণ রাখার রীতি। শুধুই যে নিয়মতান্ত্রিক বাহাদুরি তা নয়, প্রায় সকলেরই ডিসপেপসিয়া ! মুসলমান নিমন্ত্রিত ছিল মোট পাঁচজন, তার মধ্যে চারজনই অফিসার। তিনজন বড়ো আর একজন সুরেনের সমান দরের মুনসেফ। তার নাম সিরাজুল আলম, অল্প বয়স, হাসিখুশি, মিশুক, কবি ও সাহিত্য-যশপ্রার্থী। অন্যজন একেবারে বাড়ি-ঘেঁষা প্রতিবেশী উকিল মীজানুর রহমান। আর যে দু-চারজন মুসলমান এসেছে, আর্দালি পিয়ন বাজি-পুড়ানেওলা, আসলে তারা নিমন্ত্রিতই নয়। সিরাজুল ও মীজানুর অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকে, সুরেনের কীর্তন শোনে। বড়ো অফিসার না হলে অন্য তিনজনও হয়তো থাকত।

দশটা নাগাদ সুরেন সত্যই কীর্তন আরম্ভ করেছিল, সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে। সরকারি, বেসরকারি উঁচুদরের লোক কজন যতক্ষণ উপস্থিত ছিল, নিজেকে সামলে রাখতে পেরেছিল সুরেন, তারা চলে যাবার পর আর তার ধৈর্য থাকে না। এতগুলি মানুষের এত বড়ো আসরকে মুগ্ধ করার সাধটা তার বহুদিনের, কে জানে জীবনে এ সুযোগ আর আসবে কি না ! যেন আরও যে দুটি মেয়ে আছে সুরেনের, চোদ্দো বছরের ছায়া আর দেড় বছরের খুকি, এর চেয়ে ঘটা করে আরও বড়ো আসর জমিয়ে তাদের বিয়ে দিতে কেউ তাকে বারণ করবে !

আসরের একপাশে কীর্তন আরম্ভ করেছিল রাধাদাস বাবাজী। শুনতে শুনতে হৃদয় আকুল হয়ে উঠল মেয়ের বিয়ের আসরে কীর্তন গাইতে, যেটুকু বাধা নিজের মধ্যে সুরেনের ছিল তাও গেল ভেসে। সে আসরে নামতে রাধাদাস তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল, ঝুপ করে বসে পড়ে নয়নচাঁদের হাত থেকে কল্কিটা কেড়ে নিয়ে সাঁ করে মারল টান।

তা, কীর্তন গায় বটে সুরেন, মধুর, মোহকর—সাংঘাতিক ! দেখতে দেখতে আসর জমে ওঠে, মজে যায়। বাড়ির ভিতরের লোক বেরিয়ে আসে, মেয়েরা এসে জমাট হয়ে বসে, বিয়েবাড়ির কাজে যারা ছুটোছুটি করছিল এদিক-ওদিক, তারাও দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য, সব তাগিদ ভুলে যায়। ওদিকে অন্দরে ঘনিয়ে আসে বিয়ের লগ্ন, এদিকে বাইরে মেয়ে-পুরুষ কাতর হয় রাধার বিরহে, রাখাল কৃষ্ণ রাজা হয়ে রাধাকে ভুলে গেছে। রাধার অবস্থা খারাপ, সখীরা চিন্তাকুলা, কৃষ্ণবিরহে তাদের রাধারাণী কি বাঁচবে ? আবেগে উৎকণ্ঠায় হৃদয়গুলি টনটনিয়ে তোলে সুরেন সখী-পরিবৃতা বিরহিণী রাধার বর্ণনায়, যার জগৎ কৃষ্ণময়, জীবনমরণ বিরহমিলন সবই যার কৃষ্ণ, বিরহে কেন তার জীবন থাকে না, কৃষ্ণের জন্য মরতে বসেও কেন সে বলে দেয় তার দেহটি না পুড়িয়ে জলে

না ভাসিয়ে তমালের ডালে তুলে রাখতে, তারই ব্যাখ্যায়। তার সঙ্গে মনোহর দাসের খোল যেন কথা কয় অস্ফুট বেদনার, সনাতনের করতাল যেন বাজে সুদূর চরণের নূপুরধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো, নয়নচাঁদের বেহালার তারে সুর যেন থাকে কি থাকে না রাধার দেহে নিশ্বাসের মতো।

হরেন অন্দরে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, এমন জানলে এ পাগলের মেয়ে বিয়ের দায় এড়িয়ে চেঞ্জে যেতাম।

অনুরাধা বলে, এমনই ধারা চিরদিন। আমার মরণ নেই !

বিয়ের কনেকে নিয়ে এদিকে আবার আর এক বিপদ ! বর নাকি ভীষণ রোগা, একটু বেশ কালোও বটে। মায়ার দু-তিনটি সখী চুপিচুপি উঁকি দিয়ে দেখে এসে ম্লান মুখে বলাবলি করেছিল, ই কী ভাই, মায়ার জন্য এই কালো একটা কাঠি !

তাই, একবার ফিট হয়েছে মায়ার। মাসির হাত কামড়ে সে রক্ত বার করে দিয়েছে। একটা সংকে সে বিয়ে করবে না, মরে গেলেও নয়। হোক কেলেঙ্কারি, চুনকালি পড়ুক তার বাপ-দাদা খুড়ো-জ্যাঠার মুখে, তার কী! এখুনি সে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। জোর করে ধরে রাখলে, বিয়ের আসরে টেনে নিয়ে গেলে, নিজের মাথা ফাটিয়ে দেবে। সে তো মরতেই চায়, বাপ-জ্যাঠা বলুক না গিয়ে যে হঠাৎ হার্ট ফেল করে মেয়ে মরে গেছে।

বাইরে কীর্তন চলে, বিয়ের লগ্ন ঘনিয়ে আসে, ভয়ে ভাবনায় মাথা ঘুরতে থাকে মেয়ের মা-মাসি আপনজনের।

তখন কুব্জা নাপতিনি বলে, এত অস্থির হচ্ছ কেনে গো মায়েরা বলো দিকি ? বিয়ের রাতে এক-একটা মেয়ে এমনধারা করে। তাও জান না ? থামো না, আমি ঠিক করে দিচ্ছি সব। একটা লোট কিন্তু চাই দশ টাকার।

বিড়বিড় করে মায়াকে কী সব বলে কুব্জা, কাঁসার গ্লাসে খানিকটা কী খাইয়ে দেয় সে-ই জানে। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে মায়া, তার বিদ্রোহ ঝিমিয়ে পড়ে। ঢুলুঢুলু হয়ে আসে আধবোজা চোখ দুটি। ডাকামাত্র বিনা প্রতিবাদে কলের পুতুলের মতো সে গিয়ে বসে পিঁড়িতে, মাসি তাকে ধরে নিয়ে যায়।

কীর্তন এবং বিয়ে তখনও চলছে, মাঝরাতে প্রতিমা বলে অমিতাভকে, এবার যাই চলো। আর ভালো লাগছে না।

তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি প্রতিমা, অমিতাভ সোজাসুজি জানায়, তুমি পাকাদের সঙ্গে যাবে। সুধাদি গাড়ি এনেছেন, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন।

আমি হেঁটে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আসছ, পৌঁছে দিতে।

নিরুপায় অমিতাভ হার মানে, আমি তাহলে আগে রাস্তায় নেমে যাই, তুমি একটু পরে এসো। অনেকে তাকিয়ে আছে, এত লোকের চোখের সামনে—

ছি ! আহত-সাপিনির মতো ফোঁস করে ওঠে প্রতিমা, ভীরু, কাপুরুষ ! কোন মুখে স্বদেশি কর ? বিপ্লবের বই পড় ?

পথের প্রথম অংশটা জানবাজারের ভিতর দিয়ে, এদিকে মুসলমানের বসতি বেশি। বাড়িগুলি অতি পুরানো, অতিশয় জীর্ণ, মধ্যবিত্তের বাস নেই, একেবারে বস্তি অঞ্চল ছাড়া শহরের অনাদৃত গরিব এলাকাতেও দু-চারটি ছোটোখাটো বাড়িতে বা পথঘাটের সামান্য সামান্য সংস্কারে বা মানুষের বেশভূষা চালচলনে একটু যে ঘষামাজার চিহ্ন চোখে পড়ে, এদিকে তার ছাপটুকুও পড়েনি। শুকনো খালের পুলটা পেরিয়ে যেতে হয়। খালটা প্রাচীন, পুলটা নতুন, বছর দশেক আগে একটা গাড়ির

ভারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল পুরানো পুলটা। মাস ছয়েক পরে নতুন পুলটি তৈরি হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের মোটর একদিন আটকে গিয়েছিল, তার দু-মাসের মধ্যে। শহরের বহু নালা নর্দমা নিজেদের ঢেলে দেয় এই খালে, গেঁজলা-ওঠা ঘন সবুজ পদার্থে খালের অর্ধেক এখন ভবাট হয়ে গন্ধ ছড়ায়, বর্ষা নামলে ধুয়ে যাবে, কাংসী নদী জীবন পেলে জলও হবে খালে। রাত্রির আজ অসাধারণ উদারতা, জ্যোৎস্না আর ঘুমন্ত শান্তি ছড়িয়ে রেখেছে চারিদিকে, শিশুর কান্নায়, কুকুরের ডাকে, দু-একটি মানুষের পথ চলায় জীবনের সাড়া। কে যেন এই পুরানো পচা খালের কাছেই কোথায় টিনের বাঁশি বাজাচ্ছে।

কলহের মধ্যেই শুরু হল তাদের বোঝাপড়া। অমিতাভ শুধু বিরক্ত হয়নি, চটে গিয়েছিল।

তুমি কী বুঝবে ? সে ঝাঁজের সঙ্গে বলে, তোমার দায়িত্ববোধ জন্মায়নি। অন্য মেয়ে হলে বুঝতে পারত ভিতরে গুরুতর কিছু আছে, ছ্যাবলামি করে উড়িয়ে দিত না, জিদ করত না।

তোমার লাটসাহেবি দায়িত্ববোধে আমার কাজ নেই। এত বেশি বুদ্ধিও চাই না। ছ্যাবলামি দেখলে আমার, কী চোখ ! অন্য মেয়ে বুঝতে পারত, আমি বুঝিনি গুরুতব কিছু আছে। না বুঝেই অস্থির হয়েছি, সকাল পর্যন্ত থাকতে পারব না বলে ছোটো হয়ে অপমান তুচ্ছ করে পায়ে ধবে তোমায় রাস্তায় টেনে এনেছি।

প্রতিমার সঙ্গে কথায় পারা দায়। এ বয়সে কী-ই বা সে জানে বোঝে জীবনের কতটুকুই বা তার অভিজ্ঞতা, তবু নিজের মধ্যে সে অস্পষ্টতাকে তোয়াজ করে না, যতটা জানে না বোঝে না তা বোধ হয় সরিয়ে রাখে কিশোরী মনের সাধ মিটিয়ে স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা আর রহস্য অনুভবের কাজে লাগাতে, বাকিটুকু করে রাখে স্বচ্ছ, পরিষ্কার। তার কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। সবটা আয়ত্ত করতে না পারে, একটা টুকরো কেটে নিয়ে মীমাংসা করেই সন্তুষ্ট থাকে, তাব পরে আর কথা নেই।

তা নয়, নবম সুরে নামতে হয় অমিতাভকে, আমি যে চাই না আমায় নিয়ে তোমার নামে কিছু রটুক, এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

বুঝিনি ? বুঝেছি বলেই তো।

তার পাকামিতে আবার একটু রাগে অমিতাভ, তা হলে এটাও বুঝেছ তো আমি মন বদলেছি ?

হাঁটতে হাঁটতে কি এ সব কথা হয় ? তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে খালের পুলে উঠে লোহার রেলিঙে হাত রেখে। কিচুক্ষণ চুপচাপ কাটে। বুজি দম বা কান্না আটকে রাখায় কাঁপা কাঁপা কথাগুলি অদ্ভুত শোনায় প্রতিমার, তার কথার ব্যাকুলতায় প্রাচীন খালের নতুন পুলের রং-চটা রেলিঙের লোহাটা অমিতাভের গরম মনে হয় জোরে চেপে ধরার বেদনায়।

একটা কথা বলো, সত্যি বলবে, প্রতিমা বলে, তারপর তুমি চলে যেয়ো। আমি কোনো দোষ করেছি ? না, আমায় তোমার ভালো লাগছে না বলে ?

না না, তা নয়, তাড়াতাড়ি বলে অমিতাভ, ও সব নয়। আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব না। আমার বিয়ে করা চলবে না। আমি এমন একটা কাজ নিয়েছি জীবনে, ব্রত নিয়েছি—

ওঃ তাই বলো। আটকানো দম আর কান্না দুটোই প্রতিমা এক নিশ্বাসে ঝেড়ে ফেলে।—কত কী ভাবছিলাম, মাথা ঘুরছিল। দ্যাখো, হাত দিয়ে দ্যাখো, এখনও বুকটা ধড়ফড় করছে। কিন্তু তুমি কী, অ্যাঁ ! এই কথা বলার জন্যে এত কাণ্ড ? আমি কি ছটফট করে মরে যাচ্ছি বিয়ের জন্যে ? তুমি কী ভাবছিলে জানি। প্রতিমা সহজে ছাড়বে না, একবার যখন বলেছি বিয়ে করব, প্রতিমা কেঁদে কেটে ঘাড়ে ধরে বিয়ে করাবেই। ছেলেরা এমনই ভাবে মেয়েদের। প্রতিমা সে মেয়ে নয়, প্রতিমাকে চিনতে তোমার বাকি আছে।

ক্ষুব্ধ অমিতাভ বলে, তাই দেখছি। শুনে তোমার মনে খুব কষ্ট হবে ভেবেছিলাম।

কষ্ট হচ্ছে না ? প্রতিমা আশ্চর্য হয়ে যায়, তোমার যেমন কষ্ট, আমারও তেমনই। কিন্তু তুমি যদি পিছিয়ে দিতে চাও, কষ্ট সইতে পার, আমিও পারব।

তুমি বুঝতে পারনি পিতু। পিছিয়ে দেবার কথা নয়।

এবার অমিতাভ স্পষ্ট করে বলে প্রতিমা ও আদর্শের মধ্যে একটিকে চিরজীবনের জন্য তার বেছে নেবার কথা, যার মধ্যে আপস নেই, ভবিষ্যতে অদল-বদল নেই। সে স্পষ্ট করে শুধু বলে না কী তার আদর্শ, ব্রতটা কী। তবে মোটামুটি অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না প্রতিমার।

তুমি শেষ এই ঠিক করলে ? এই পথ বেছে নিলে ? দেশের কাজ তো অন্যভাবে করা যায়।

সে আমার কাছে ফাঁকি। আমি যা ঠিক বলে জেনেছি তা-ই আমার পথ।

তারপর তারা ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করে। চলতে চলতে এক সময়ে প্রতিমা বলে, আমরা দুজনে মিলেও তো কাজ করতে পারি ?

মিলে করার কাজ নয়। এ শুধু কাজ।

কয়েক পা হেঁটে আবার বলে প্রতিমা, আমিও তো নিতে পারি এ কাজ ?

মেয়েদেব কাজ নয়।

কী করে জানলে মেয়েদের কাজ নয় ? মেয়েরা মরতে জানে না ?

শুধু মরতে জানলেই কি সব কাজ হয় ?

কোন কাজটা পারে না মেয়েরা ? মেয়েরা যুদ্ধ করতে পারে, মারতে পারে, মরতেও পারে। কেন তোমরা এত অশ্রদ্ধা কর মেয়েদের !

এ তিরস্কার কিছুক্ষণ মূক করে রাখে অমিতাভকে। তার নিজের কাছে এ সমস্যা তেমন স্পষ্ট নয়। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চায়, আগেও চেয়ে এসেছে যে মেয়েদের সঙ্গে নিলে কাজের তাদের ক্ষতি হবার কথা নয়।

তোমাদের অশ্রদ্ধা করে বোধ হয় নয় পিতু। বোধ হয় আমাদের দরকার বলে। আমরা দুর্বল নই, তবে মনটা শক্ত করতেও তো কষ্ট আছে। তোমাদের সঙ্গে জানাশোনা না থাকলে মিছামিছি আমায় এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না।

এ কি একটা কথা হল ? মৃদু প্রতিবাদের সুরে প্রতিমা বলে।

কে জানে ! ঠিক জানে না অমিতাভ। ব্রত ছাড়া কিছুই তো ছিল না কচের। মেয়েরাও তো সবাই দেবযানী নয়। তবু যেন কী একটা অভিশাপ আছে তাদের, বাংলার ছেলেমেয়েদের, অস্পষ্ট অনুভব করে অমিতাভ। মাঝরাত্রির বিদায়-বেদনায় কথা ও চলা দু-ই তাদের আবার থেমে গেছে পথের মাঝে প্রকাণ্ড এক কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায়। তার শুধু মনে পড়ছে যে কত দেশে ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি এগিয়ে গেছে মরণের ব্রত পালনে, তাদের হয়তো ভাববারও দরকার হয়নি হৃদয়ের এই কোমলতার কথা, অকারণ বেদনাভোগের কথা। কেন ভাবা যায় না বাঙালি মেয়েও লোহার মতো কঠিন হতে পারে, কেন এত মায়া ? ছেলেমেয়ে কেন এত নরম হয়, ভাবপ্রবণ হয় পরস্পরের সম্পর্কে ?

তাদের দোষ নেই। তারা এ রকম হয়ে জন্মায়নি, সাধ করে এ রকম হয়নি অমিতাভ জানে। জন্ম জন্ম ধরে এই ভয়ংকর মমতায় উর্বর করা হয়েছে তাদের বুক। আজ তাই তাদের এই শাস্তি।

পিছন থেকে মোটরের আওয়াজ আসছিল, তাদের কাছে এসে গাড়িটা থামে। গাড়িতে সুধা, তার ছোটো ননদ আর পাকা।

সুধা অনুযোগ দিয়ে বলে, আমায় বলে কয়ে রাখলে প্রতিমাকে পৌঁছে দিতে হবে, আর তোমাদের খোঁজ নেই। বলে তো আসতে হয় ? আমি এদিকে ভেবে মরি কোথায় গেল মেয়েটা, কার সঙ্গে গেল, একলাই রওনা দিল নাকি রাত দুপুরে ? যা বেপরোয়া মেয়ে !

ছয়

১

পাঁচুর বাবা আটুলিগাঁর ধনদাসের অবস্থা চাষিসমাজের মাপকাঠিতে ভালোই বলা যায়। জমির আয়ে খোরপোশটা এক রকম চলে, অজন্মার বছরে টানাটানি হয়। একজোড়া বলদ আছে, চাষের কাজেও লাগে, অন্য সময়ে গাড়ি টানে। দুটি গাই, দুধ বেচে কিছু আয় হয়। আগে অর্ধেক দুধ রাখা হত বাড়ির ছেলেপিলেদের জন্য, এখন পাঁচুর পড়ার খরচ জোগাবার দায়ে প্রায় সবটাই বেচে দিতে হয়। বাগানের ফলমূল তরি-তরকারিও হাটে যায়। ছোটোখাটো একটি বাঁশঝাড় আছে। চৈত্র মাসে একবার ডোবাটা ছেঁচে দশ-বারো সের মাছ পাওয়া যায়, তবে তাতে ভাগীদার আছে ধনদাসের খুড়তুতো ভাই যাদব, মাছের ভাগাভাগি নিয়ে প্রতি বছর একবার দুটি পরিবারে মারামারির উপক্রম হয়। গোটা চারেক আম গাছ, তার দুটিতে সুন্দর সুস্বাদু আম হয়। প্রকাণ্ড সতেজ কাঁঠাল গাছটায় অজস্র ফলে কিন্তু কী যেন ফাঁকি আছে গাছটায়, বড়ো হয়ে পাকবার আগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় কাঁঠালগুলি, এঁচড়েই তাই খেতে আর বেচে ফেলতে হয়।

এক শনিবার পাঁচুর সঙ্গে পাকা বেড়াতে এল ধনদাসের বাড়ি। শনিবাব এলেই বাড়ির জন্য পাঁচু উতলা হয়ে ওঠে। পাকা ভেবে পায় না বাড়িতে কী এমন আকর্ষণ থাকতে পারে যে বাড়ির জন্য ছটফট করবে মানুষ, এক শনিবার যেতে না পারলে মনমরা হয়ে থাকবে। বড়ো ভালো লাগে তার আটুলিগাঁ, আর একটা অজানা গাঁয়ে এসে আর একবার ভালো লাগা। ধনদাসের গেঁয়ো চাষাড়ে পরিবারটি তার মনপ্রাণ দখল করে রাখে, উদ্‌বেল করে রাখে সোমবার সকাল পর্যন্ত, আর একবার আর একটি সাদামাটা সংসারে মশগুল হওয়া। কিন্তু তার মধ্যে পাঁচুর অদ্ভুত ঘরটানের সন্ধান নেই।

গোরুর নাম শ্যামা। তাকে দুইছিল ধনদাস। বাছুর ধরে দাঁড়িয়েছিল পাঁচুর পিসি সুভদ্রা। এমন সময় সাইকেল চেপে দুই বন্ধুর আবির্ভাব। বিছানাপত্র জামাকাপড় কিছুই সঙ্গে আনেনি, এক-কাপড়ে রায়বাহাদুর ভৈরবচন্দ্রের ভাগনে এসেছে তার বাড়িতে অতিথি হয়ে, সোমবার পর্যন্ত থাকবে। ভর্ৎসনার চোখে ছেলের দিকে তাকায় ধনদাস। স্কুলে পড়ে কী বিদ্যে লাভ হচ্ছে ছেলেটার ভগবান জানে, বুদ্ধি মোটে হয়নি। আগে থেকে একটা যে খবর দেবে বাড়িতে সে কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নেই।

কত দুধ হয় দুবেলায় ? পাকা জিজ্ঞেস করে।

শ্যামা ছোটোখাটো গাই, সে অনুপাতে দুধ দেয় অনেক, গাঢ় মিষ্টি দুধ, কাঁচাতেই হলুদ আভা। জ্বাল দিতে তলায় লেগে যায়। পাকা সায় দিয়ে বলে, সে ঠিক কথা, দেশি গোরুর মতো দুধ হয় না, পশ্চিমা গাই দুধ বেশি দেয় বটে কিন্তু সে পাতলা দুধ, এমন স্বাদ নেই। দেশি গোরুর জন্য তার গর্ববোধ ধনদাসের অন্তর স্পর্শ করে।

গোরুর দুধ মুখে, ধনদাস বলে, যেমন খাবে, সেবাযত্ন পাবে, দুধ দেবে তেমনই।

বাছুরটি বড়ো আকারের, অন্য ধাঁচের, কিন্তু রোগা কঙ্কালসার।

মিশেল বাছুর, না ? ষাঁড় পেলেন কোথা ?

হাঁ, মিশেল। বিশেষ উৎসাহী মনে হয় না ধনদাসকে, মোদের বড়োকত্তা এনেছিলেন একটা ষাঁড়, বসন্তবাবু। জানাচেনা রইতে পারে, আজকাল শহরে থাকেন বেশির ভাগ। সেবার মেতে গেলেন চাষবাস গাইগোরু নিয়ে, ইস্কুল-টিস্কুল করলেন, চরকা-টরকা কাটালেন মোদের, তখন এনেছিলেন ষাঁড়টা। বুড়ো ষাঁড়, বাঁচবেনি দু-এক বছরের বেশি।

বাছুরটির শোচনীয় অবস্থা দেখে পাকা বলে, বাঁটে বেশি দুধ ছাড়তে হয় এ বাছুরের জন্যে, গাই ছোটো, বাছুর বড়ো কি না।

ছাড়ি না দুধ ? আর কত ছাড়ব ! বাছুর যদি সব দুধ খাবে তো কী করে পোষায় ? মিশেল বাছুরে সুবিধে নেই।

এর জবাব জানে পাকা, আজ ঐ বাছুরকে বেশি দুধ খেতে দিলে বড়ো হয়ে সে সুদে আসলে তা ফিরে দেবে, কিন্তু কিছু সে বলে না। ভবিষ্যতের ভরসায় থাকার সাধ্য যার নেই, একটা বছর টিকে থাকলে তবে যে আর একটা বছর বাঁচার কথা ভাবে, তাকে ও সব কথা বলা মিছে।

সুভদ্রা বলে, একটা পিঁড়ি এনে বসতে দে না পাঁচু, হাঁ করে দেঁড়িয়ে রইলি ?

এখন বসব না, পাকা বলে, গাঁ-টা একটু ঘুরে দেখে আসি সন্ধ্যার আগে।

তবে খেতে দি, সুভদ্রা বলে, ও শাঁখা, আয় দিকিন, ধর দিকিন এঁড়েটাকে, বেরিয়ে আয়, নজ্জা নেই। রাজুর মা, দুটো চিড়ে ধোও।

ছোটো ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসেছিল আগেই, হাঁ করে চেয়েছিল আগন্তুকের দিকে। বউ-ঝিরা জানালায় দরজায় উঁকি দেয়। গ্রামের ঘরে ঘরে পুঞ্জ পুঞ্জ এই কৌতূহল, এ একটা ভাষার মতো। শালবন থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এসে গ্রামে বেড়িয়ে যাক, কেউ হয়তো চোখ তুলে তাকাবে কেউ হয়তো তাকাবে না, বিদেশি মানুষ এলে, হোক সে সাপুড়ে সন্ন্যাসী ফিরিওযালা সায়েব বা ভদ্র একটি কিশোর ছেলে, পরম আগ্রহে গ্রাম তাকে সামনে থেকে আড়াল থেকে চোখ বড়ো বড়ো করে দেখবে। যেন বলতে চায়, আমরা জানি একটা বিরাট অদ্ভুত জগৎ আছে গাঁয়েব সীমার বাইরে, দেখি তো বিদেশি, তুমি কী পরিচয় নিয়ে এলে সেথাকার ?

নাইবি ? পাঁচু বলে, ভালো পুকুর আছে।

ঘাটে কাপড় খুলে রেখে গামছা জড়িয়ে পাকা ঝাঁপ দেয় নন্দীদের দিঘিতে। অপর পাড়ে আরও বড়ো একটি ঘাট দিঘির, শুধু নন্দীদের বাড়ির লোকের ব্যবহারের জন্য, গ্রামের ব্রাহ্মণদেরও ব্যবহার করার অনুমতি আছে। ঘাটের উপর নন্দীদের মস্ত দালান-বাড়ি। চারিদিকে ঘর তোলা ফটকওলা চার-কোনা ছোটোখাটো ইটের দুর্গের মতো, বহুদিন রং বা চুনকাম না হওয়ায় কালচে মেরে এসেছে বাইরেরটা। পাঁচুর সঙ্গে দিঘি তোলপাড় করে পাকা, যেখানে মাচায় বসে চার দেওয়া জলে ছিপ ফেলে বসে আছে বেঁটে মোটা বড়ো নন্দী বসন্ত, সেখানে ডুবে ডুবে পদ্ম তুলতে গিয়ে মাছ ভাগিয়ে দেয়।

লাল চোখে গর্জে ওঠে বসন্ত, হুকুম দেয়, কান ধরে টেনে নিয়ে আয় তো ছোঁড়া দুটোকে, কে আছিস !

ঘাটে দাঁড়িয়ে বসন্তের লোক বলে, এই ছোঁড়ারা, আয়, উঠে আয়, বড়োবাবু চিঁড়ে ভাজা করবে তোদের।

জল থেকে পাঁচু বলে, যা যা, ভাগ। এ কে জানিস ? বলগে যা ভৈরববাবুর ভাগনে নাইছে।

খবর শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় বসন্ত।—রায়বাহাদুরের ভাগনে ? সত্যি নাকি ? বলগে যা, বাবু ডাকছেন, আলাপ করবেন। ভালোভাবে বলিস, সম্মান করে।

পাকা এলে ভৈরবের কুশল জিজ্ঞাসা করে বসন্ত, পাকার নাম বয়স স্কুল ক্লাস বাপের পরিচয় এবং হঠাৎ আটুলিগাঁয়ে পদার্পণের কারণ।

বেড়াতে এসেছে ? তা বেশ, তা বেশ। গাঁ দেখবার শখ হয়েছে বুঝি ? তা বেশ। গাড়িটা রেখেছ কোথায় ? ড্রাইভারকে বলেছ তো গাড়ির কাছে থাকতে ? চারদিকে চোর এ গাঁয়ে, একটু ফাঁক পেলেই যা পাবে সরিয়ে নেবে। চোর-বদমাশ এ গাঁয়ের লোক। সাইকেলে এসেছ ? মোটর সাইকেল নয়, প্যাডেল সাইকেল ? বাহাদুর ছেলে তো !

বসন্ত সংশয়ভরে তাকায়, লোমশ গায়ে হাত বুলোয়, শেষ ফাল্গুনের বৈকালিক বাতাসে তার গা কুটকুট করে, জামা গায়ে দিলে আরও কষ্ট, আরও জ্বালা। কবিরাজ বলে পিত্তের আধিক্য, বসন্ত জানে রক্ত নোংরা হয়ে গেছে, সংশোধন দরকার।

রাত করে সাইকেলে ফিরে যাবে এতদূর ? বসন্ত গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে, তা হয় না বাবা, আমি যেতে দিতে পারি না। না যদি জানতাম, এসেছিলে চলে যেতে, সে হত আলাদা কথা। জেনে তো ছেড়ে দিতে পারি না ! পাশানির জঙ্গলটায় নাকি বাঘ বেরিয়েছে। আজ রাতটা আমার এখানে থেকে যাও, কাল সকালে চা-টা খেয়ে বওনা দিয়ো। রায়বাহাদুর ভাববেন না, আমি খবর পাঠাচ্ছি। ঈশ্বর, অর্জুনকে তলব দে, ঘোড়া নিয়ে আসতে বলবি।

আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, পাকা সবিনয়ে বলে, আমি এদের বাড়ি থাকব। এদের বাড়িতেই এসেছি আমি।

ধনদাসের বাড়িতে থাকবে ?

গাম্ভীর্যের আড়ালে বসে বসন্ত যেন বোমার আওয়াজ শুনে চমকে গেছে।

পাঁচু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার বলে, ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড, একসাথে পড়ি।

২

নেয়ে এসে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে ধনদাসের বাপের আমলের প্রকাণ্ড এক কাঁসার জামবাটিতে দুধ কলা দিয়ে চিঁড়ে মেখে খায় পাকা। বাড়িতে দুটো গোরু থাকলেও দুধ খাওয়া চাষির ঘরে বিলাসিতা। চাষীর ঘরের ছেলে এলে হয়তো তাকে শুকনো করে চিঁড়ে কলা মাখার মতো দুধ দিয়ে সুভদ্রারা ভাবত যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। পাকাকে দিয়েছে অনেক বেশি, পাতলা করে চিঁড়ে কলা মাখতে পেরেছে পাকা। বাড়িতে বাটিভরা দুধ চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখার কথা এখন পাকা ভুলে গেছে। ভুলে না গেলে কি তার এত খিদে পেত, বাটি চেঁছে পুঁছে খেতে পারত আবাত্তি পাকানো টক-টক চাঁপা কলা দিয়ে মাথা মোটা চিঁড়ে, গুড়ে এত পিঁপড়ে থাকা সত্ত্বেও ?

পাকার কথাবার্তা চালচলন আশ্চর্য লাগে ধনদাসের, যেমন হবে ভেবে প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল মোটে তেমন নয়। এ ছেলে হাওয়ায় কথা কয় না, দেখায় না যে অনেক উঁচু থেকে নেমে এসেছি তোমাদের নিচু ঘরে, মায়া করি ভালোবাসি তোমাদের, তোমরা কেমন জানতে বুঝতে এলাম। নিজে থেকে কিছু করে না বা বলে না, উচিত-মতো ঘরোয়া কথা কয়, নয়তো খালি চকচকে দুপাটি দাঁত বার করে গালভরা হাসি হাসে।

বড়ো ভালো লাগে পাকাকে ধনদাসের।

বলতে চায় অনেক কথা, তার বদলে শুধোয়, পাঁচুর লেখাপড়া হবে কিছু ?

কিছু হবে না। ও একটা গোমুখ্যু।

ধনদাস কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে হাসে। উহুঁক, অত মুখ্যু লয়। তুমি কেনে মিশবে উয়ার সাথে গোমুখ্যু হলে ?

আশেপাশের চাষিরা দু-চারজন আসে, জানতে চায় সদর থেকে কে এল ধনদাসের বাড়ি। বসতে বলা নেই, নিজেরাই বসে, বসে নিজেরাই কথাবার্তা বলে নিজেদের মধ্যে, হাত বদল করে তামাক খায়। পাকা স্পষ্ট অনুভব করে ওদের অনেক জিজ্ঞাসা আছে, অনেক কিছু বলবার সাধ, হোক সে ছেলেমানুষ তারই কাছে। ছেলেমানুষই বলেই বোধ হয় আগ্রহটা বেশি, তাকে অতটা ভয় করার সমীহ করার দরকার নেই। তা ছাড়া, সে পাঁচুর বন্ধু, সহপাঠী। কিন্তু কিছু বলতে পারে না কেউ, কথা খুঁজে পায় না, ভাষা জানা নেই। মামুলি আলাপের মধ্যেই হঠাৎ সোৎসাহে কী যেন নতুন কথা বলতে যায় একজন, মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায় তার, গলার কাছ পর্যন্ত বুঝি উঠেও আসে দু-চারটি শব্দ, কিন্তু বলা আর হয় না, খেই হারিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে। ওদের উদ্‌বেগ

আর অস্বস্তি ব্যাকুলতা জাগায় পাকার মধ্যে, ওদেরই মতো যেন কত কী প্রশ্ন আর কত কিছু বলার সাধ চাপ দেয় ভেতরে। কিন্তু মুখ ফোটে না তারও, ধরতে গেলেই পিছলে যায় জিজ্ঞাসা, স্পষ্ট হয় না, শুধু একটা এলোমেলো আকুলি-বিকুলি হয়ে থাকে যত-কিছু যা-কিছু সে বলতে চায়। অশিক্ষিত বোকা গেঁয়ো চাষা ওরা যেমন, ইংরেজি স্কুলে-পড়ুয়া চালাক চতুর শহুরে ছেলে সেও যেন তেমনই বোবা !

ধনদাসের ভাই জ্ঞানদাসের খবর জিজ্ঞেস করে প্রত্যেকে দুয়ারে পা দিয়েই। বলে, ডেকে লিয়ে গেছে শুনলাম নাকি ?

ধনদাস বিমর্ষ ভাবে বলে, ধরে লিয়ে গেছে।

শুনে আপশোশের একটা আওয়াজ করে আগন্তুক। বসে বলে, ডাকলে পরে না গিয়ে উপায় কী !

গোঁয়ার যে, বাঘা গোঁয়ার, মাথা গরম।—ধনদাস বলে ক্ষোভে দুঃখে, বেগারে না যাবি যদি, বললে হয় ব্যারামের কথা, বললে হয় পেট ছেড়েছে, নয় জ্বর এসেছে কাঁপিয়ে। চোটপাট কবিস কেনে তুই, গাল দিস কেনে বোকার মতো ?

হাঁ, তা বটে। তবে কি না তেজি বড়ো।

জন্মো তেজি। জনক জানার ছেলে ছিল মইষাখালির ইন্দ্র জানা, উয়ার ছিল জন্মো তেজ, কিবা বয়েস আঁ ? মরল সেবার তিনটো মেরে জবর লেটেল নাঙ্গিপুতার ব্যাপারটাতে।

মরার কথা, মরার কথা রাখো।

আরে বালাই, মরার কথা কীসের কার, তেজের কথা বলি। জানার আয়ু শত বছর !

সারদা উন্মনা অস্থির হয়ে আছে সন্ধ্যার পর থেকে, বারবার গিয়ে সে দেখে আসে বাইরের দাওয়ায় কে কে আছে। পাঁচুর মাকে সে বলে, এখন তক যে এল না দিদি ?

পাঁচুর মা কী জবাব দেবে, পাঁচুকে দিয়ে ওই কথাই সে জিজ্ঞাসা করে পাঠায় ধনদাসকে।

ধনদাস বলে, বলগে যা আসবে। এখুনি আসবে।

বোবা হয়ে ঘরে থাকা অসহ্য হওয়ায় পাকা বাইরে যায়। পাঁচু সঙ্গে সঙ্গে আসে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, চাঁদ উঠবে সেই মাঝরাত্রে, গাঢ় অন্ধকারে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে, একটা গাছে লাখখানেক জোনাকি। চারিদিকে নজর করে দেখলে হয়তো দু-একটা জোনাকি দেখা যায়, ডোবার পাশের এই একটি শ্যাওড়া গাছে জোনাকির যেন দীপালি। রাজ্যের জোনাকিরা ভিড় করেছে একটি গাছে। পাঁচু বলে, এ রকম রোজ বছর হয়। বৈশাখে চাদ্দিকে দেখবি, এখন এ রকম একটা গাছে ভিড় করে।

তারার আলোর অন্ধকারে পাকা সারা গ্রামে পাক খেয়ে বেড়ায় প্রায় মাঝ রাত্রি পর্যন্ত। এটা তার নিজের অস্থিরতা। গ্রাম ঘুমিয়ে গেছে তার হৃদয়ের জোয়ার-ভাঁটার তোয়াক্কা না রেখে।

পাঁচু বলে, আজকাল কিন্তু সাপ বেরোয় খুব।

দারুণ ক্ষোভে পাকা বলে, কই সাপ ? তোদের গেঁয়ো সাপ বেরোয় না, গর্তে লুকিয়ে থাকে।

পশ্চিম থেকে বাতাস বইছিল দুপুরে, বিকালে থমকে ছিল, এখন দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেশি দূর নয় সমুদ্র, বিশ ক্রোশও হবে না। বাতাসে গা জুড়িয়ে যায়, মন কেমন করে ! চারিদিকে ছড়ানো গাঁয়ের ঘরগুলি কালি-পড়া লণ্ঠন আর বাতাস থেকে আড়াল করা ডিবরির উলঙ্গ শিখা চোখে পড়ে কাছে ও দূরে, এদিকে মাথা উঁচু করে আছে নন্দীদের দোতলা দালান, দু-তিনটে ডে-লাইটের সাদাটে আলো শ্বেতকুষ্ঠের মতো মাখা হয়ে আছে অন্ধকারের গায়ে।

শালবনের প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে তারা ফিরে আসে। ধনদাসের বাড়ির প্রায় কাছে এসে নাগাল ধরে জ্ঞানদাসের, অতি ধীরে ধীরে পা ফেলে সে হাঁটছিল বাড়ির দিকে।

পাঁচু বলে, কাকা ? অ্যাতক্ষণ আটকে রাখলে ?

জ্ঞানদাস কথা কয় না। বাড়ি পৌঁছে নিঃশব্দে মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। মাথাও ঠেস দেয় দেয়ালে। তার গামছা ও কাপড়ে রক্তের দাগ, নাকে মুখে রক্ত জমে আছে।

নিশ্বাস ফেলে ধনদাস বলে, মারধোর করেছে ?

জ্ঞানদাস বলে, হাঁ। বেঁধে রেখেছিল, কাল থানায় পাঠাত চুরির দায়ে।

ছাড়লে যে ?

কে নাকি এয়েছে সদর থে তোমার বাড়ি !

চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে পরিবারটি, স্তব্ধ, বিষণ্ণ।

জল আর মাটির গামলা নিয়ে আসে সারদা। সে রক্ত মুছিয়ে দিতে থাকে, হাত বাড়িয়ে দেড় বছরের ছেলেটাকে জ্ঞানদাস কোলে টেনে নেয়। ছেলেটা কাঁদছিল।

৩

খুব ভোরে পাকার ঘুম ভাঙে, প্রায় শেষ রাত্রে। আধখানা চাঁদ তখনও অস্ত যায়নি। অনেক রাত্রে শুয়েছিল, মশারি খাটিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিল ধনদাস, মশারির মধ্যেও মশার কামড়ে এপাশ ওপাশ করেছে পাকা, বারবার জেগে গিয়ে উঠে বসেছে। ঘুঁটের ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস আটকে এসেছে তার। মশারি কিনে মশা রুখবার সাধ্য নেই এদের, ঘুঁটের সঙ্গে ঝাঁজালো দুর্গন্ধ পানসে গাছের শিকড় পুড়িয়ে এরা ঘুমায়।

সতাই ঘুমায়। মশারা শুষে নেয় অল্প জলো রক্ত, ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করে উপোসি হাড়মাসে ব্যথা আর অস্বস্তিতে, ভগবান অথবা মশাকে গাল দেয় অস্ফুট অশ্লীল শব্দে, তবু প্রাণান্তিক শ্রান্তিতে বিভোর হয়ে ঘুমায়।

অথচ বাইরে সমুদ্রের মধুর শীতল হাওয়া বইছে জোরে। ঘরে না শুয়ে বাইরে শুলে মশা কামড়ায় না, চৈতের দখিনা বাতাস মশা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তবে বাইরে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে মশার হাত থেকে বাঁচলেও ঘুমানো যায় না। পোষা কুকুরটা বারবার শুঁকে দেখতে এসে মুখে গালে চেটে দেয়, পগারের পচা গন্ধ নাকে লাগে, অজস্র পোকামাকড় দল বেঁধে এসে কুটকুট করে কামড়ায়, গায়ে হেঁটে বেড়িয়ে সুড়সুড়ি দেয়।

উঠে বসে থাকে পাকা।

নিজেকে সে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে আটুলিগাঁকে।

সোনার বাংলার সোনার গ্রাম ! এই বয়সেই পুবের গাঁয়ে পশ্চিমের গাঁয়ে অতিথি হয়ে এমনই রাত সে কাটিয়েছে। এমন সে অসহায় নিরুপায় যে এ গাঁগুলিকে শুধু ভালোবাসা ছাড়া কিছুই তার করার নেই। এ ভালোবাসা পাপ, মহাপাপ। এ ভালোবাসার মানে যেন এই রোগে জীর্ণ খিদেয় শীর্ণ শান্তিহীন নিদ্রাহীন হাড়গোড় পিষে-গুঁড়ো-করা গাঁকে বলা যে, তুমি নতুন মামির মতো হৃষ্টপুষ্ট সুগন্ধ সুন্দরী প্রিয়া, তুমি যেমন আছ তেমনই থাকো, আমি তোমায় ভালোবাসি !

ভোর হবার আগেই জামাটি গায়ে দিয়ে পাকা বেরিয়ে যায়, বাড়ির কেউ তখনও ওঠেনি। কাল রাত্রে শালবনের প্রান্ত থেকে ফিরে গেছে, আজ ভেতরে ঢুকবে। ঘুরতে ঘুরতে গ্রাম থেকে অনেক তফাতে চলে যায় পাকা, দেখতে পায় বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় পুরানো একটি ফোর্ড গাড়ি। কিছু দূরে সরকারি রাস্তা, আটুলিগাঁর গা ঘেঁষে এসে এখানে বন ভেদ করে চলে গেছে।

গাড়িটা পাকা চেনে, কালীনাথের শিষ্য শঙ্করের বাবার গাড়ি, শঙ্করও মাঝে মাঝে চালায়। খানিক আগে গুলি ছোঁড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এসেছিল পাকার, অতটা খেয়ালও করেনি,

বুঝতেও পারেনি কী ঘটেছে। এবার সে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। বনের নিজস্ব স্তব্ধতার মতো তার হৃদয়-মনও স্তব্ধ হয়ে গেছে। কালীদার ছেলেরা গুলি চালানো শিখতে এসেছে শহর থেকে এত দূরে আটুলিগাঁর জঙ্গলে, রাস্তা থেকে নামিয়ে গাছের আড়ালে গাড়ি রেখে এগিয়ে গেছে বনের ভেতরে। কে জানে কে কে আছে ওদের মধ্যে। কানাই আছে কি ? হয়তো আছে, হয়তো তার লক্ষ্যভেদের ক্ষমতায় কালীনাথ খুশি হচ্ছে মনে মনে।

কালীদা জানে না তাকে নিলে বন্দুক ছোঁড়া শেখাতে হত না, অর্জুনের মতো সে ডান হাতে বাঁ হাতে বন্দুক চালাতে পারে। তার বাবার তিনটে বন্দুক আছে, রিভলবার আছে, অন্য ছেলেরা যখন এয়ার গান নিয়ে খেলা করে সে তখন আসল বন্দুক চালিয়েছে, বাবার সঙ্গে শিকার করেছে রাঁচির জঙ্গলে। তাকে ঠেকানো যাবে না, লুকিয়ে বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে হয়তো বিপদ বাধাবে, বাবা তাই নিজে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল।

হাত নিশপিশ করে পাকার। যাবে ওখানে ? গিয়ে বলবে কালীদাকে, আমায় একটা দাও, বন্দুক রিভলবার যা তোমার খুশি। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছো, শেখাওনি, কিন্তু তোমার শেখানো ছেলেদের চেয়ে আমি ভালো পারি কি না দ্যাখো ?

কে জানে কী ভাববে কালীদা, অন্য ছেলেরা ! কালীদা হয়তো বলবে, তা নয় হল, আমি তো জানি তোমার অনেক গুণ আছে, কিন্তু তোমার স্বভাব যে খারাপ পাকা ! অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে পাকা।

পকেটে পেন ছিল, বরাবর থাকে, কালি ছিল না। মুখের থুথু দিয়ে পেনের নিব ভিজিয়ে একটুকরো কাগজে সে লেখে :

রাস্তা থেকে আওয়াজ শোনা যায়।

তলায় নিজের নামটা লিখবার লোভের সঙ্গে খানিকক্ষণ রীতিমতো যুদ্ধ চলে তার। পরনের কাপড় থেকে সুতো বার করে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে কাগজটি বেঁধে রেখে রাস্তায় নেমে গাঁর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। হঠাৎ মন অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছে।

৪

শহরে স্কুলে পড়ে, পাকাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তবু পাঁচুর মধ্যে তার চাষি বাপ-খুড়োর জন্য বিশেষভাবে আর সাধারণভাবে আটুলিগাঁর জন্য গর্ববোধ টিকে আছে, যদিও আজকাল একটু স্তিমিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে।

জ্ঞানদাসের জন্যই তার অহংকার বেশি, কাকাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে। খাজনা বন্ধের ডাকে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়েছিল আটুলিগাঁ, সবার আগে ছিল তার বাবা আর কাকা, সকলের চেয়ে বেশি বীরত্ব দেখিয়েছিল জ্ঞানদাস। আজও তার গায়ে পুলিশের অত্যাচারের চিহ্ন আছে, মাথায় লাঠির ক্ষত আর বাঁ উরুতে গুলির ক্ষতের দাগ। হাতের তিনটি আঙুল তার ভাঙা, লক্ষ করলে দেখা যায় সে একটু খুঁড়িয়ে চলে। ধনদাস ধীর শান্ত মানুষ, ধীর শান্ত ভাবেই সে বিলাতি বর্জন, চরকা কাটা এ সব গ্রহণ করেছিল, গায়ের জোরে খাজনা বন্ধের ব্যাপারে তার ছিল দ্বিধা, বিশেষত বসন্ত নন্দী যখন এর বিরুদ্ধে দাঁড়াল, প্রাণপণে ঠেকাতে চেষ্টা আরম্ভ করল, বলতে লাগল, খাজনা বন্ধের হুকুম কংগ্রেসের নেই। বসন্ত এদিকে কংগ্রেসের পাণ্ডাস্থানীয় ব্যক্তি, যে রকম কাজ বা বক্তৃতায় জেল হয় সেগুলি বাদ দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করে, খদ্দর পরে, নেতাদের সঙ্গে মেশে, সভায় সভাপতিত্ব করে, চরকা প্রচারে, নাইট স্কুল চালানোয়, ডোবা পুকুর সাফ করানোর কাজে, কুইনিন বিলানোয়, ভালো

বীজের নমুনা আনিয়ে বিঘাখানেক জমিতে ভালো চাষের নমুনা দেখানোয়, ষাঁড় আনায় সাহায্য ও সহযোগিতা করে। সারা জেলায় আর তার আটুলিগাঁয়ে খাজনা বন্ধের তোড়জোড় দেখে বসন্ত ও তার অনুগত কয়েকজন কংগ্রেস-কর্মী ভড়কে গিয়েছিল। তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে সাধারণ কংগ্রেস-কর্মীদের উৎসাহ ছিল আরও একটা ভয়ের কারণ, এর আগে কখনও তারা এ ভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। আর এমন আশ্চর্য ব্যাপার, বড়োলোক নয়, নাম-করা লোক নয়, গেরস্ত চাষি, ধীর সংযত ধনদাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল আটুলিগাঁর খাজনা বন্ধের নিয়ন্তা। সে যোগ না দিলে ভাগ হয়ে যেত আটুলিগাঁর চাষি সমাজ, অত প্রচণ্ড হত না আন্দোলন, মাথা তুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ফেঁসে যেত।

জ্ঞানদাসের জন্যই ধনদাসকে খাজনা বন্ধে যোগ দিতে হয়। লোকটার ভাই-অন্ত প্রাণ।

অদ্ভুত আশ্চর্য সেই দিনগুলি, ভয়ানক দিনগুলি, মনে গাঁথা হয়ে আছে পাঁচুর। পাকাকে সে ছাড়া ছাড়া ঘটনার গল্প বলে, কোন বাড়ি পুড়েছিল, কার ঘরের লোক মরেছিল, দেখিয়ে দেয়। জ্ঞানদাস এবং ধনদাসও তাকে পাঁচুর মতোই সে সব ঘটনার উলটাপালটা এলোমেলো টুকরো টুকরো বর্ণনা শোনায়। শুনতে শুনতে কল্পনায় সাজিয়ে গুছিয়ে এক বিরাট অবিশ্বাস্য অভ্যুত্থানের, এক আশ্চর্য সংগ্রামের কাহিনি গড়ে তোলে পাকা, শন-খড়-মাটির কুঁড়ে ঘবের এই আটুলিগাঁ ছিল যার আস্তানা, খালি গা খালি পা এই শান্ত নিরীহ মূক চাষিরা ছিল যার অংশীদার। জীবনে আর এমন কাহিনি শোনেনি পাকা। আটুলিগাঁ তার চোখে বদলে যায়।

হয়নি কিছু, ধনদাস বলে নারকেল ছোবড়া পিঁজতে পিঁজতে, তবে হ্যাঁ, মিছে মন কষাকষিটা কমতি দেখা যায়। অতটা কথায় কথায় বিবাদ করা মামলা করা নাই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বলে, মেজাজ খানিক গরম হয়েছে সবার, তেজ বেড়েছে। দুটা চড়চাপড় চুপচাপ সয়ে যাবে তো তিনটে চড় কোনোমতে আর সইবেনি। মোদের চাষিবাসিব মদ্যি গায়ের জ্বালা কম ছিল, শোকতাপে মরি তো গা জ্বলবে কীসে ? জ্বালাটা বেড়েছে ইদানীং, ইদিকে ফের শোকতাপে ঝাঁজ কম, দুঃখু কম।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে মুখ তুলে সে তাকায় ভাইয়ের দিকে। এ ভাষা ভালো বোঝে না পাকা। তবে জানে যে তার কাছে এ সব শব্দ আর সংজ্ঞাগুলির যে মানে, ধনদাসের মানে তার চেয়ে আলাদা। মোটামুটি ওরা কী বলতে চায় সে তাৎপর্যটা সে ধরতে পারে, গভীবতা এড়িয়ে যায় তাকে। জ্ঞানদাসের কথারও অনেকখানি মর্মার্থ দুর্বোধ্য থেকে যায়। বড়ো ভায়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে অথবা সমর্থনে সে ফসলের কথা তোলে সেটাই ধরতে পারে না পাকা।

জ্ঞানদাস বলে, কদিন হল ধান ঘরে তুলেছি মোরা ? এব মদ্যি যেন চুকে বুকে গেছে সব কিছু, যেন বাছুর মরা গাই, বাস্, আর কী রইতে পারে ? তা কী করবে মানুষ বলতে পার ? পেটের তাপে গা জ্বালায় তা শোকতাপ কী, অদেষ্ট কী ভিতরে ঘা, তো বাইরে মলম দিলি জুড়ায় ? ও শান্তির কাজ না।

বটে তো, বটে তো, ধনদাস বলে, তবে কি-না না-হক ঘাঁটায়ে লাভটা কী, তাই বলি। হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না তা সে পয়সা বল, বীরপনা বল ! অন্যায় তো ছিল, আছে, রইবে জগতে, না কি স্বগ্গ হবে পির্থিমি ? সইবে না তো হিসেব কর লাভ কি লোকসান কত, না তো দশটা সইবে আর একটার বেলা সইবো না বলে খেপে ডঠে ক্ষেতি করবে আপনার, উয়া বোকার কাজ, গোঁয়ার্তুমি। যুধিষ্ঠির লড়েনি, মারেনি শত্তুর কুরুক্ষেত্রে ? তা ফের গাল অপমান সয়েও ছিল দুয্যুধনের ঠাঁই ঘাড়টি হেঁট করে।

পাকার মুখের দিকে চেয়ে বলে, ধর না কেনে, মিত্যুভয় নাই, মস্ত সাহসী পুরুষ একজনা— তাই বলে কি খালি হাতে লড়তে যাবে বাঘের সাথে যেচে যেচে ?

না তো কি বাঘে ধরলে নাক কান বুঁজে মরবে চুপচাপ ? জ্ঞানদাস বলে গরম হয়ে।

কথা বোঝে না, রাগে শুধু ! ধনদাস হাসে, বললাম না যেচে যেচে যাবে ? বাঘে ধরলে কথা কি, এমনিও মরবে, ওমনিও মরবে, মরো বাঁচো লড়ো তখন, বাস্। খামোকা বাঘ ঘাঁটাতে গিয়ে মোর কাজ, বাঘ মারার কলকাটি না জেনে ?

অতিথির জন্য ভগা জেলেকে কিছু মাছ দিতে বলেছিল ধনদাস, দাম দেবে, তবে পয়সায় নয়, মাছে। ধনদাসের ডোবাটা কয়েকদিন পরে আরও খানিক শুকোলে যখন ছাঁকা হবে তখন। দুগন্ডা বড়ো বড়ো কই আর মস্ত একটা শোল মাছ দিয়ে গেল ভগা। তার সারা গায়ে চুলকানি। একটু তেল চেয়ে নিয়ে সে গায়ে মাখে। গায়ে তেল মাখার বড়ো শখ ভগার। তার বিশ্বাস, দুটো দিন সারা গায়ে ঘষে ঘষে ভালো করে তেল মাখতে পেলে চুলকানি সেরে যেত।

মাছ নিয়ে যেন ভোজের সমারোহ আজ ধনদাসের ঘরে, অতিথির কল্যাণে প্রাণ ভরে মাছ খাওয়া যাবে। মাছ খাওয়া বিলাসিতা চাষির ঘরে। সুজলা বাংলার নদীময় জলময় পূর্বাঞ্চলেই ভারী মাছ খায় চাষি, এ অঞ্চলে তো তেমনি নদীনালাই নেই, জলাভাব। পাকা খাবে কই, বাড়ির লোক শোলমাছ। ও বেলাব জন্যে জীয়ানো থাকবে কই মাছ, অতিথির কল্যাণে আজ দুবেলাই রান্না। চাষির ঘরে দুবেলা রান্না হয় কদাচিৎ, দুবেলাই যারা খায় টেনেটুনে, তাদেরও নয়। এত শালগাছ গাঁয়ের পাশে বনে, এত কাঠ চালান দেয় পত্তনিদার জানকীরাম, অথচ জ্বালানির অভাব আটুলিগাঁর মাটির ঘরে। বনের পাতা পর্যন্ত কুড়িয়ে এনে জ্বালানো বারণ। কাঠি দিয়ে গোল করে গাঁথা শালপাতা যে চালান যায় রাশি রাশি তাতে ঝরা শুকনো পাতা দরকার হয় না, পরিপক্ক সবুজ পাতাই লাগে, তবু সে তার নিজস্ব শ্রীশ্রীভগবানের সৃষ্টি বনটির ঝরা পাতা গাঁয়ের গরিবদের কুড়িয়ে নিতে দেবে না। পাতা-কুড়ুনিরা অবশ্য পাতা কুড়িয়ে আনে, তাদের ঠেকাবার জন্য পাহারা রাখেনি জানকীরাম, মাঝে মাঝে তার লোক ধরে পিটিয়ে দেয়। রামুর মা আর রামুকে ধরে কাপড় কেড়ে নিয়ে উলঙ্গ করে বনে ছেড়ে দিয়েছিল, পাতা ঝেঁটিয়ে ভরে আনার ছালাটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। সারাদিন বনে কাটিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাদের গাঁয়ে আসতে হয়।

নিছক অর্থহীন বজ্জাতি নয়, মানে একটা আছে,—অধিকার জাহির করা। কয়েক ঘর সাঁওতাল বাস করে গাঁয়ে, সামান্য কিছু জমি আছে, চাষ করে, শিকারে যায়, কুলিও খাটে। বিনামূল্যে শালবনের কাঠের দাবি তুলে ওরা বরাবর গোলমাল করে এসেছে। গত আন্দোলনের সময় সমস্ত আটুলিগাঁ সে দাবি আপন করে নেয়, আপন ইচ্ছায় আপনা থেকে বনে গজিয়েছে গাছ, তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে কেন, আর কিছু না হোক অন্তত জ্বালানি কাঠ তাদের চাই। জোর করে কাঠ কেটে নিয়ে যেত সকলে, ঘরের সামনে এই প্রকাশ্য রোদে শুকোতে দিত, মানুষের এই সামান্য আদিম অধিকারটুকু আদায় করে যেন বড়ো অহংকার হয়েছে ! আসল আন্দোলন বন্ধ হবার পরেও এই হাঙ্গামার জের চলেছিল অনেকদিন।

অত সাধের শোল মাছটি নিয়ে এক হাস্যকর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বিকালেও পিসি খাড়া ছিল, হেঁটে বেড়িয়েছে, সংসারের কাজকর্ম করেছে, সকালে হু-হু কাঁপিয়ে তার এসেছে জ্বর। কাঁথা চাপা দিয়ে তাকে চেপে ধরে আছে শাঁকা, এ ম্যালেরিয়া আসবার সময় এমন কাঁপায় যে প্রথম দিকে একজন ধরে না রাখলে রোগীর যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে মনে হয়। পাঁচুর মা রাঁধছে। মাছ নিয়ে উঠোনে কাটতে গেল সারদা, শোল মাছটা বড়ো দাপড়াচ্ছিল, গলাটা কেটে রেখে সে ছাই আনতে গেছে রান্নাঘরে, দু-দণ্ড বুঝি দেরি হয়েছে আখা থেকে সদ্য টেনে তোলা ছাইয়ের জ্বলন্ত কয়লাগুলি জলের ছিটা দিয়ে নিভিয়ে নিতে, এই অবসরে দিনের বেলা খিড়কি দিয়ে শেয়াল এসে মাছটা মুখে করে নিয়ে পালিয়ে গেল !

পাঁচুর ছোটো ভাই নাচু চেঁচাল : শ্যালে মাছ নে গ্যালো গো !

একটা হইচই হয়। লাঠি হাতে শেয়ালের পিছনে ছুটবার আগে জ্ঞানদাস একটা ছোটোখাটো চড় বসিয়ে দেয় সারদার গালে। পাকা নির্বিকার মুখে তাকিয়ে থাকে। পাঁচু কিন্তু লজ্জায় মরে যায়।

ধনদাস সংক্ষেপে বলে, বীরপুরুষ !

মোর কী দোষ ? ভাসুরের দিকে পিছন ফিরে পাঁচুর মাকে উদ্দেশ করে গলা ছেড়ে চেঁচায় সারদা, হাঁ দিদি, মোর কী দোষ ? ছাই আনতে রসুই ঘরে গেছি—

খানিক পরে মাছটা ফিরিয়ে আনে জ্ঞানদাস। শেয়ালটি কাছেই বাঁশঝাড়ের অধিবাসী, ভাইপো ভাগনে সমেত সদলবলে জ্ঞানদাসকে হইহই করে তেড়ে আসতে দেখে বাঁশঝাড়ে মাছটা ফেলে পালিয়ে গেছে।

হঁাঃ, সারদার সামনে মাছটা ফেলে দিয়ে সগর্বে হেসে বলে জ্ঞানদাস, কার ঘরে মাছ চুরি করতে এয়েছিল শালার শ্যাল জানবে কী !

ধনদাস বলে, অঃ, মস্ত বীরপুরুষ !

মুখখানা খুশিতে ভরে গেছে সারদার, চাপা গলায় সে জ্ঞানদাসকে শুধোয়, দু-ঘা লাগিয়েছ ?

৫

মাছ যখন রান্না চড়িয়েছে পাঁচুর মা, বসন্তের লোক অর্জুন একটা সের তিনেক ওজনের রুই এনে দাওয়ায় ফেলে দেয়। বসন্ত পাঠিয়েছে পাকার জন্য !

ছেলেমেয়েরা কলরব করে ওঠে মাছ দেখে, জ্ঞানদাসের ধমক খেয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে যায়।

বিপন্নের মতো ঘাড় চুলকায় ধনদাস, চোখ তুলে তুলে তাকায় জ্ঞানদাসের দিকে। অর্জুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসে। ধনদাসের বাড়িতে বসন্তের মাছ পাঠানোর মধ্যে যেন তার নিজেরও রসিকতা আছে। তার ভৈরবমামার প্রভাব প্রতিপত্তির বহরে একটু যে গর্ব অনুভব করে না পাকা তা নয়, তবে ঠিক যেন সুখী হতে পারে না। তাকে নিজের বাড়িতে একবেলা খেতে বলতে পারত বসন্ত, বলেনি। ধনদাসের বাড়ির অতিথিকে নিজের বাড়িতে ডেকে খাওয়ালে গাঁয়ের লোকের কাছে মান থাকবে না। তবে মাছ পাঠানো চলে, চাকর দিয়ে একটা মাছ পাঠিয়ে দেওয়া চলে। কাল যে জ্ঞানদাসকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে মারা হয়েছিল সেটা বোধ হয় এ সব গণনায় আসে না ? পাকা জানত না যে শুধু মানের কথা নয়, তাকে ঘরে ডেকে খাওয়ানোর মধ্যে রান্না ভাত খাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে ভদ্রাভদ্র সমাজে। শহুরে বাবুর ঘরের ছেলে সে জাতবিচার মানে না ধরে নিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে চাষিরা, ওপর জাতের কেউ যদি নিজের জাত না বাঁচিয়ে চলে তো ধর্মের কাছে অপরাধের ভয়ে যেচে তার জাত বাঁচাতে তেমন আর তাদের মাথাব্যথা নেই। উঁচু জাতেরা কিন্তু চটেছে গাঁয়ের, সে ভৈরবের ভাগনে বলে মনে মনে আরও বেশি চটেছে। শহরে ফিরে গিয়ে কদিন পরে আবার এ গাঁয়ে ঘুরে এলে পাকার সঙ্গে খেতে সেরা বামুনও আপত্তি করবে না আটুলিগাঁর, ধনদাসের বাড়িতে তার এবারের জাত নষ্ট হওয়াটা ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি হয়ে চাপা পড়ে যাবে, কিন্তু এখন সদ্য সদ্য ধনদাসের বাড়ি থেকে ডেকে এনে তাকে ভোজন করালে নিন্দা হবে বসন্তের ! ধনদাসের চেয়ে জাতে বসন্ত উঁচু নয়, তবু !

পাঁচুর কাছে পাকা পরে এ সব জটিল ব্যাখ্যা ও বিবরণ শুনেছিল।

জ্ঞানদাসের সংযমও আছে। পাকার দিকে চেয়ে সে সশব্দে তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ে, হঠাৎ কিছু বলে না। দু-ভায়ের ভাব দেখে হাসিটা মিলিয়ে যায় অর্জুনের, তামাশার সুরে কথাও বন্ধ হয়।

অর্জুন বলে, দোমনা ভাব দেখি ? ও বুদ্ধি কোরো না বাবু, চাপান দাও, কত্তা নিজে দাঁড়িয়ে মাছ ধরিয়ে পাঠিয়ে দেছেন। শোনো বলি কথা, মন করে কি যে সামলে সুমলে চল যদি দু-ভাই, কত্তা আর পিছে লাগবেন না গায়ে পড়ে। কত্তার মন ভালো।

অর্জুন চলে যাবে, জ্ঞানদাস ডেকে বলে, মাছ নিয়ে যা অর্জুন।

ধনদাস বলে, আঃ থাম না। মাছ মোদের নয়। মোদের পাঠায়নি মাছ।

যাকে পাঠিয়েছে সে তবে নিক। যা খুশি করুক নিয়ে !

জ্ঞানদাস গটগট করে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

অপমান বোধ করে বইকী পাকা। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগে না। ধনদাস ঠিক কথাই বলে, ভাইটা তার গোঁয়ার। ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে মার দিয়ে রক্তপাত করে ছেড়ে দিলেও যার কিছু করার ক্ষমতা নেই, কথায় কথায় তার কেন এত তেজ ? মার সয়ে নিঃশব্দে ফিরে এল, মাছ পাঠানোতে তার অপমান হয়েছে !

অর্জুন, মাছটা ফিরে নিয়ে যাও। দাঁড়াও, একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

পাকা লেখে যে সে আজ শহরে ফিরে যাবে না, কাল যাবে, তাই মাছটা রাখল না। আজ ফিরে গেলে মাছটা নিয়ে যেত। বসন্ত মাছ পাঠিয়েছিল শুনে তার মামা খুব খুশি হবে।

পাকা এ সব ডিপ্লোমেসি জানে। যতই হোক, ভদ্রঘরের ছেলে তো।

চিঠি পড়ে একটু ভেবে বসন্ত সঙ্গে সঙ্গে লোক দিয়ে শহরে ভৈরবের বাড়ির উদ্দেশে মাছটা রওনা করিয়ে দিল।

দুপুরে পাশাপাশি খেতে বসেছে পাঁচু ও পাকা, একটু তফাতে উঁচু হয়ে বসে ধনদাস তাদের খাওয়া দেখছে, জ্ঞানদাস কোথা থেকে এসে কাছের খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে বসে। হঠাৎ মুখ তুলে লজ্জিত হাসির সঙ্গে বলে, তুমি কিছু মনে কোরো না পাকাবাবু !

পাকার মনে ছিল না। সে বলে, কীসের ?

মাছটা নিয়ে মোর চটা উচিত হয়নিকো। ঘাট মানছি, দোষ টোষ মনে রেখোনি। যে মোদের পাঁচু, সে তুমি, ঘরের ছেলে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ধনদাসের মুখ, ভাইয়ের দিকে সগর্বে চেয়ে চেয়ে চোখে তার পলক পড়ে না।

পাকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কাল তোমায় মেরেছিল কেন ?

পাঁচুর কাছে জেনে নেবে ভেবেছিল, জিজ্ঞাসা করতে খেয়াল হয়নি এ পর্যন্ত।

জ্ঞানদাস মুখ খোলার আগেই তার হয়ে ধনদাস বলে, ভোটাভুটি আসছে না ? মোরা পাত্রসা-র জগৎ পান্ডাকে ভোট লাগাব ইবারে, তাইতে কত্তার রাগ। ফের, এ গোঁয়ারটা সমিতিতে ঢুকে গেছে বারণ না মেনে, তাতেও রাগ। আগে থেকেও রাগ ছিল। বেগারের ছুতা করে মারলে কাল ছোঁড়াটাকে। তোমাকে বলি, তুমি বামুনের ছেলে, ভদ্দর ঘরের ছেলে তুমি, ও পাপীটা উচ্ছন্ন যাবে। উয়ার গতি নাই। বদ ঘা হয়েছে পায়ে, সর্বাঙ্গ খসে যাবে উয়ার।

ধীর শান্ত ধনদাসের আকস্মিক রূপান্তর চমকে দেয় পাকাকে। তার উগ্র ভঙ্গি, কথার হলকা কল্পনারও অতীত ছিল। তুচ্ছ হয়ে যায় পাকা। তার লজ্জা করে।

আজ সকালেই ভাইকে ধনদাস যা বলেছিল, সে সব কথা মনে পড়ে। হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না, টাকা পয়সারও নয়, বীরত্বেরও নয় ! বাঘ মারার কলকাটি না জেনে বাঘ মারতে যাওয়া গোঁয়ার্তুমি।

৬

বিকালে বড়ো কুয়াতলায় পালাগানের আসরে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হল পাকার, যাকে শুধু সে মনে রাখেনি, জীবনে পরে খুঁজেও ছিল অনেকবার। একদিনের আলাপে চিরদিনের তার মনে দাগ

কেটে রাখার মতো মোটেই অসাধারণ নয় চেহারা বা কথাবার্তা মানুষটার। তবে ঠিক এ রকম মানুষ পাকা আগে আর দেখেনি। চরিত্রের স্পষ্ট প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য আর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ছাড়াও একটা মানুষ যে মনের মধ্যে স্থায়ী আসন দখল করে নিতে পারে চলতি আলাপে মনের মতো করে অজানা অভিজ্ঞতার কথা টেনে এনে, তখন এটা পাকার জানা ছিল না। পরে জেনেছিল, বড়ো হয়ে। শ্যামল জানা ততদিনে মারা গেছে।

শরীরটা ভেঙে গেছে, দেখেই টের পাওয়া যায়। চাষাড়ে চেহাবার রোগা খাটো মানুষটা পাশে এসে বসলেও পাকাব নজর পড়ত না, কথা যদি সে না বলত নিজে থেকে।

এ অঞ্চলে কেষ্টপালা জনপ্রিয়। কীর্তন জিয়াগান কথকতায় মেশাল দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত, তবে রাধাও নেই, কাঁদুনিও নেই। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পার্থসারথির কাণ্ডকারখানা নিয়ে কাহিনি, গীতার অনেক গূঢ় তত্ত্বকথা পর্যন্ত সহজবোধ্য লাগসই এবং স্বস্তিকর গ্রাম্য দর্শনে পরিণত করা হয়েছে কেষ্টপালায়।

আমি মারি আমি রাখি
আমি দুখী আমি সুখী
আমিই নিমিত্ত সখি—

বিষাদিত অর্জুনকে নয়, উত্তরার গর্ভপাতে শোকাতুরা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বলা। তা হোক, আসল কথাগুলি এক, বরং চাষাভুসোর ভাষায় বলা হয়েছে বলে মর্মস্পর্শী। কেষ্টপালা যাত্রা নয়, কোনো চরিত্রই সেজেগুজে আসরে নামে না, খালি গায়ে কোমরে উড়ানি বেঁধে একজন প্রধান গায়ক আর তার দুজন সহকারী কথায় গানে পুরাণকে রূপ দিচ্ছে, তবু শুনতে শুনতে একটি চাষি-বউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উত্তবার সর্বনাশে ! কে বলবে সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না শাউড়ি দ্রৌপদী ছেলের বউ উত্তরাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে অসহ শোকের অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। চাষি-বউটির নাকে নোলক, চোখে সুর্মা, কণ্ঠা-ঢাকা আঁটো তেরঙা পিরান। আবার অমন যে তার গভীর বুকফাটা সহানুভূতি উত্তরার জন্য তা জুড়িয়ে এল জীবন ও মরণের বড়ো মানের কথা শুনতে শুনতে, দেখা গেল গভীর কৌতূহলের সঙ্গে মশগুল হয়ে সে শুনছে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা !

এ সব ভালো লাগে না ?

পাকা সংশয় ভরে বলে, মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানো—

ও, মেয়েমানুষের কাছে বলে তোমার আপত্তি ! কিন্তু এ তো সে ফিলজফি নয়, অল্পবিদ্যা নিয়ে মুখ্যুকে তাক লাগানো। ওটা আমরা করে থাকি, আমাদের ভদ্রঘরে মেয়েমানুষরা মুখ্যু, আমরা বিদ্বান, আমরা ওটা পারি। এখানে ব্যাপাব কি জানো, এ সব চাষাভুসো পুরুষগুলোও সমান মুখ্যু !—

এই কথাই যেন শুনতে চাইছিল পাকা। মুখ ঘুরিয়ে সটান মুখোমুখি হল সে। অনেক কালের আত্মীয়ের মতো শ্যামল জানা একটু হাসল।

অর্জুন মহাপণ্ডিত, ভগবান আবার এমন পণ্ডিত যে বেদব্যাসও তার কাছে মুখ্যু। অর্জুনের তো কথাই নেই। অর্জুনের কাছে স্বয়ং ভগবান যে ফিলজফি আওড়ালেন সেটা শুধু আমরা একচেটিয়া করে রাখব ? এ সব মুখ্যু চাষাভুসো মেয়েপুরুষ একটু স্বাদ গন্ধ পাবে না ? আমরা তো দেব না, ওরা তাই নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানো নয়, মুখ্যুদের চাহিদা মেটানো—

এ কথাও যেন শুনতে চেয়েছিল পাকা।

—ফিলজফি দরকার বেঁচে থাকার জন্য। সমাজের যে স্তরে যার বাস সে তেমনই করে ফিলজফিকে ঢেলে গড়ে নেয়। আসল জিনিসটা চাপাই কিন্তু আমরা ওপর থেকে।

পাকা কথা কয় না। একজনের কাছে এত কথা শুনে কথা না কওয়াটা তার স্বভাব নয়।

—এদের ফিলজফি অদৃষ্ট। মেয়েরা যত ছেলে বিয়োয় অর্ধেকের বেশি মরে যায় আঁতুড়ে, নয়তো বড়ো হয়ে। আকাশের দিকে চেয়ে পুরুষরা জমি চষে, বৃষ্টি না হলে মরবে, বেশি বৃষ্টি হলেও মরবে। এবার দেখছ তো অবস্থাটা ? বন্যা ঘায়েল করে দিয়ে গেছে। শুধু এ বছর নয়, আর বছরও। বন্যার ধাক্কা সামলে ভালো ফসল ফলাতে একটা বছর বরবাদ যায়।

জীবনে এই বোধ হয় প্রথম পাকা নিজে মুখ না খুলে একজনের কথা শুনে যায়, এই ধরনের কথা ! এটা তার খেয়াল হয়েছিল পরে, শহরে ফিরবার পর, এক অবসর-মুহূর্তে।

শ্যামল জানার খড়ের বাড়ি। দুটি ভিটের ঘর বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে, একটি ভিটের ঘর সে সারিয়ে নিয়েছে মোটামুটিভাবে। জীবনযাত্রা তার সহজ অনাড়ম্বর। একা থাকে, নিকট আপনজন বলতে এক ভাই, যে আজ দশ-বারোবছর চাকরি নিয়ে বর্মায় প্রবাসী। মাঝখানে একবার মাত্র দেশে এসেছিল ছুটি নিয়ে, কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে ছিল। পিসি সম্পর্কে পাড়ার এক প্রৌঢ়া বিধবা রেঁধে দিয়ে যায়, নিজেও খায়। শ্যামলের চেয়ে তার নিজের নিরামিষ রান্নাই বোধ হয় বেশি পদের আর বেশি মুখরোচক হয়। শ্যামলের মধ্যাহ্নের ভোজন হল শুধু জলে সিদ্ধ করা কুচি করে কাটা একটু তরকারি, ছটাক খানেক ছোটো মাছ, দু-তিন চামচ ঘরে পাতা দই আর একেবারে জাউ করে ফোটানো আধমুঠি পুরনো চালের ভাত। রাত্রের ভোজন দুধ আর খই। সন্ধ্যার আগেই পিসিমা ভাগে। এই জেলখাটা খুনের বাড়িতে সন্ধ্যার পর একদণ্ড থাকতে তার ভরসা হয় না।

বেঁচে থাকার জনাই তার এই বিলাসিতা ! বঙ্গ-ভঙ্গ যুগের বোমারু দলের বিপ্লবী, বছর কয়েক আগে সরকার সদয় হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে—জীবন্মৃত অবস্থায়।

পাকা প্রশ্ন করে, কেন ছাড়ল ?

হ্যারিকেনের আলোয় তার পাঁশুটে ঠোঁটের হাসিও যেন ঈষৎ বঙিন মনে হয় : ওরা হিসেব করেছিল, বড়ো জোর পুরো একটা মাস ! ডাক্তার বাজি রেখে বলতে পারত, দু-তিনমাসের বেশি শ্যামল জানা পৃথিবীতে টিকতে পারে না, দুমাস যদি টেকে তো সেটা হবে জগতের আর একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার ! নইলে কখনও ছাড়ে ?

শ্যামল একটু থামে। এটা তার স্বভাব।

দেশ জুড়ে আবার যখন নতুন করে শুরু হয়েছে সেই সময় ? ইংরেজের হৃদয় নেই, ওরা ড্যামকেয়ার করে সেন্টিমেন্ট। ওদের মতো হিংস্র নেই, ধীর শান্ত হিসেবি হিংস্র। ওদের স্বার্থে ঘা দিয়েছিলাম, তেরো বছর ধরে আমায় ভেঙে চুরমার করেছে বলেই ওদের প্রতিহিংসা মিটেছে ভাবো ? তাই ছেড়েছে আমায় ? শ্যামল হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে, যেন সত্যই প্রশ্ন করছে, জবাব চায়।—দু-চারমাসে মরবই না জানলে কখনও ছাড়ত না। মরাই যখন নিশ্চয় বাইরে এসে মরি। উদারতাও দেখানো হবে, বিনা যত্নে বিনা চিকিৎসায় মরলে দেশেও একটা কলঙ্ক হবে।

পাকা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে, শ্যামল যেন তার কথা বলছে। রাজনীতি সে বোঝে না, সম্প্রতি হৃদয় তার পুড়তে আরম্ভ করেছে ব্রিটিশ-বিদ্বেষে শুধু এই জন্য যে হাজার হাজার মাইল দূরের ছোটো একটা দ্বীপের কয়েকটা লোক তার এতবড়ো দেশের কোটি কোটি মানুষকে শাসন করছে, দু-একদিন নয়, দেড়শো দুশো বছর ধরে। স্কুলে ইতিহাস পড়ায়, কিন্তু ইতিহাসের এক কণা মানেও সে বোঝে না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন থেকে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল থেকে, যত কিছু ঘটে এসেছে সব তার কাছে উদ্ভট অবিশ্বাস্য মনে হয়। জাহাজে করে একমাস দেড়মাসের পথ যে ছোট্ট দেশ, সে দেশ থেকে এসে সারা দেশটা তারা দখল করল ! একদিনে কয়েক ঘণ্টায় যাদের এই সামান্য কয়েকজনকে লোপাট করা যেত, খবর পৌঁছে আবার জাহাজে করে যাদের সাহায্য আনতে সময় লাগত দু-চারমাস, তারা খেলার ছলে পদানত করল দেশটা ! তার মানেই আমরা

ছিলাম বুনো অসভ্য, গোরু-ছাগলের মতো, ইংরেজরা ছিল সভ্য বুদ্ধিমান মানুষ। যাই বলি আর যাই করি এ ছাড়া অন্য মানে হয় না। দু-একটা রাখাল যেমন গোরু-ছাগলের পাল চরায়, দু-একজন ইংরেজ তেমনই আমাদের চরাচ্ছে।—কিন্তু বড়ো জ্বালা হয়, অপমান বোধ হয় এ কথা ভাবতে।

অন্য কোনো মানে যদি কেউ তাকে বলে দিত ! শুধু আমাদের অপদার্থতার জন্য ইংরেজ রাজা হয়নি, সহজে হয়নি—অন্য কারণ ছিল, যোগাযোগ ছিল যে জন্য ইংরেজ শাসন কায়েম করতে পেরেছে, পেরেছে অনেক কষ্টে।

ইংরেজকে উঁচুস্তরের জীব ভাবতে বুক পুড়ে যায় পাকার।

শ্যামল বলে, অনেকের বুক পুড়ে যাচ্ছে ভাই। শুধু আজ নয়, বহুকাল থেকে। ইংরেজ সহজে এ দেশে রাজা হয়েছে, গায়ে ফুঁ দিয়ে সহজে রাজত্ব করে এসেছে, এটা মিছে কথা। আমরা মিছে বানানো ইতিহাস পড়ি। সাম্রাজ্য বাগাতে আর সাম্রাজ্য বজায় রাখতে ব্রিটিশ রাজের কতদিকে কতভাবে কী লড়াই করতে হয়েছে, আজও করতে হচ্ছে, সেটা ছোটো হয়ে আছে ইতিহাসে। কিন্তু তাই বলে আমরা যে খুব পিছিয়েছিলাম আর ইংরেজ এগিয়ে গিয়েছিল এ সত্যটা উড়িয়ে দিলে চলবে না ভাই !

কেন, আমাদের ভারতীয় সভ্যতা—

এককালে মহান ছিল। সেই মহত্ত্ব আঁকড়ে থেকে প্রায় অনড় অচল গতিহীন হয়ে পড়েছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে প্রয়োগে আবিষ্কারে প্রকৃতির সঙ্গে জগৎটা দখল করার তাগিদে ও দেশের সভ্যতায় এসেছিল গতির জোয়ার। তাই সাত সমুদ্র ডিঙিয়ে এসে এ দেশ দখল করতে পেরেছিল। এটা মানতে হবে ভাই, দেশকে ভালোবাস বলেই মানতে হবে। আমরা ছোটো ছিলাম, আমাদের জীবনে আমাদের সভ্যতায় ভাটা এসেছিল। এটা যদি না মানো দেশকে ভালোবাসার ঝোঁকে, যদি অপমান বোধ হয় এটা মানতে, তোমার দেশপ্রেম ফাঁকি হয়ে যাবে। জগৎ জুড়ে মানুষ আছে, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায—মানুষের বাঁচা মরার লড়াইটাই আসল কথা, মূল কথা। ভারত বাঁচুক জগৎ চুলোয় যাক, এ কথা যে বলে সে ভারতের শত্রু। সে মানবতার, সে সভ্যতার মানে বোঝে না। কচি শিশু যেমন মায়ের স্তন, মায়ের কোলটাকেই মনে করে জগৎ—সেও তেমনই দেশটাকে মা মনে করে শিশুর মতো মা মা করে কেঁদে জগৎ মাত করে দিতে চায়। দেশে দেশে এগিয়ে পিছিয়ে আঁকাবাঁকা পথে সভ্যতা এসেছে, মানুষের শ্রেণির লড়াই, শ্রেণির আপস-মিলন, ঘাত-প্রতিঘাত, দাসত্ব-প্রভুত্বের ভিত্তিতে। দেশ হিসাবে আমরা পৃথক কিন্তু এ নিয়ম থেকে পৃথক নই।

শ্যামল পাকার অসন্তোষ ভরা মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, পরাধীনতার জ্বালা সয় না, তাই বলে কি যেভাবে হোক এ সত্যটাকেই উড়িয়ে দিতে হবে যে আমরা পরাধীন ! পিছিয়ে ছিলাম, অপরিণত ছিলাম, নইলে পরাধীন হব কেন ? অতীতের বিচার কর, অতীতকে প্রাণের জ্বালা ভুলবার নেশা কোরো না। তার দরকার কী ? ওঠা-নামা এগোনো-পিছানোর জোয়ার-ভাটা আজ তো আমাদের পক্ষে ! আমরা এগোচ্ছি, আমরা উঠছি, আমরা স্বাধীন হতে চলেছি—সাম্রাজ্যবাদে আজ ভাটা শুরু হয়েছে।

বাইরে রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে, গ্রামের রাত্রি। পাকার ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে আটটা। গ্রাম সম্পর্কে যে বুড়ি পিসি শ্যামলের খাবার তৈরি করে দিয়ে যায়, সে একবার ঘরে এসে একটু দাঁড়িয়ে নিজের মনে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়।

রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে শুনেছ নিশ্চয় ? মস্ত এক সাম্রাজ্য শেষ হল, অসংখ্য মানুষ স্বাধীন হল। নিজের দেশের উপরতলার গোটা কত লোকের শাসনও ও দেশে বরবাদ হয়ে গেছে। সারা দেশটা খাটুয়ে জনসাধারণের। ওরা যে ফিলজফিটা নিয়েছে তাই কিছু কিছু পড়ছি। বেশিক্ষণ পড়তে পারি না, চোখ কটকট করে, মাথা ঘোরে। শরীরে কিছু আর রাখেনি। আগে একটানা এক পাতাও পড়তে

পারতাম না, পাতার মাঝামাঝি ঝাপসা হয়ে আসত সব, কপালের এখানটা দপদপ করত। আজকাল তিন-চারপাতা পড়তে পারি।

পড়েন কেন ? এত কষ্ট হয়—

না পড়ে বাঁচতে পারে মানুষ ?

পাকা একটানা আট-দশঘণ্টা পড়তে পাবে। পরীক্ষার দু-তিন সপ্তাহ আগে থেকে সে একরকম দিবারাত্রি পড়ে, দৈনিক ষোলো-সতেরো ঘণ্টার কম নয়। একটু শুধু রোগা হয়ে যায়, নিজের সারা বছরের স্বাভাবিক জীবনটা মনে হয় স্বপ্নের মতো। পরীক্ষার জন্য ছাড়াও, মাঝে মাঝে বিকালে পড়তে শুবু করে ভোর তিনটে চারটে পর্যন্ত পড়ে মোটা নভেল শেষ করেছে। বই পড়া শখের ব্যাপার, খেয়াল—বড়ো জোর, পরীক্ষা পাশের জন্য দরকার। এখন মনে হয়, বই পড়াও যেন বেঁচে থাকার লড়ায়ের অঙ্গ। এ মরণের দিন গোনাগাঁথা হয়ে গিয়েছিল এই মানুষটার কয়েক বছর আগে, চূর্ণ দেহটার খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, হয়তো বা ওঠা-বসাও কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করে সে আসন্ন মৃত্যুকে অন্তত কয়েক বছরের জন্য ঠেকিয়ে রেখেছে। কী দরকার তার লেখাপড়ার, আধপৃষ্ঠা পড়তে যখন জগৎ ঝাপসা হয়ে আসে মৃত্যু ঘনিয়ে আসার মতো ? কিন্তু না, শ্যামল জানার দেহ-মন স্পষ্ট ঘোষণা করছে বই পড়তে পারার সংগ্রামটাও একসঙ্গে না চালালে সে মরে যেত !

পাকা বলে, কোটি কোটি লোক পড়তেও জানে না, অক্ষরও চেনে না। তাদের কেউ কেউ আশি নব্বই বছর বাঁচে তো !

পড়তে জানে না ? কে বলল তোমাকে পড়তে জানে না : একজন পুঁথি পড়ে, রামায়ণ পড়ে, বহু লোক শোনে। ওরা কি পড়ছে না পুঁথি, রামায়ণ ? নিজের চোখ দিয়ে না পড়ুক, আর একজনের চোখ দিয়ে তো পড়ছে ! যেমন ধরো, রাতে আমি ভালো চোখে দেখি না। তোমায় একটা বই দিয়ে বললাম, পড়ে পড়ে শোনাও তো ভাই। তুমি পড়ে শোনালে। বইটা কি শুধু তুমিই পড়লে, আমি পড়লাম না ?

পাকা শুধু মাথা নেড়ে দেয় বুড়োর মতো, কথা কয় না, আরও শুনবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করে। শ্রান্তিতে এদিকে মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে পড়েছে শ্যামল জানা। তার চোখের সামনে দোল খাচ্ছে লণ্ঠনেব আলো আর কিশোর ছেলেটির মুখ। হাতের তালু পায়ের তালু জ্বলে যাচ্ছে লংকাবাটার জ্বালার মতো দুর্বলতার ঝাঁজে। দপদপ করছে বুক। তবু সে কথা বলে। কাজের কথা, বলা দরকার।

একদিন বিপ্লবের কাজ করেছি, আজ শক্তি নেই। কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়েও জানার কাজ তো করতে পারি—জগতে কোথায় বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে, বিপ্লব হয়েছে, কেন হয়েছে, কী ভাবে হয়েছে।

পাকা নির্বাক।

যেখানে চেষ্টা হয়েছে যেখানে সফল হয়েছে—সব আমাদের তন্নতন্ন করে জানা দরকার। কালীনাথ যাই বলুক, তোমাদের এখন থেকে তা অল্পে অল্পে জানবার বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। জগতে একটা নিয়ম আছে ভাই, নানা দেশে সে নিয়মটা নানারকম ঠেকে, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে গেলে—

শ্যামল জানা কাশতে শুবু করে। আরও অনেক কথা সে হয়তো বলতো, কিন্তু কাশিটা তার আয়ত্ত নয়। পাকা বসে থাকে পাথরের মূর্তিব মতো, পিসি এসে শ্যামলকে ধরে শুইয়ে দেয়। বিড়বিড় করে বকে পিসি। অনেক সে পাপ করেছিল, তাই তার এত যন্ত্রণা ! দুধ খাইয়ে সাঁঝে সাঁঝে বাড়ি ফিরবে, তা নয় রাত ভোর করতে হবে তাকে। পুলিশ যদি আসে হঠাৎ ছেড়ে কি কথা কইবে তাকে ?

সকাল শহরে ফেরার পথে পাঁচুর কাছে শ্যামলের সম্পর্কে অনেক কথা শোনে পাকা। ছাগল তাড়াতে পাঁচু ঘনঘন সাইকেলের ঘণ্টা বাজায়। বন ভেদ করা পথ, যে বনে বাঘ থাকে। পথ-ঘেঁষা

এই বনের অংশ পার হয়ে হয়তো সিকি-মাইল আধ-মাইল ফাঁকা প্রান্তর, এই ফাঁকটুকুতে পর্যন্ত মানুষ মাথা গুঁজেছে, জমি চষছে, গোরু-ছাগল পুষছে, কুঁড়ে বেঁধে বসবাস করছে। প্রতি বছর অনেক গোরু-ছাগল বাঘের পেটে যায়, মানুষও যায় দু-একজন, তবু ভোরবেলা এই পথে ঘণ্টা বাজিয়ে ছাগলের পাল ভেদ করে সাইকেল চালাতে হয় স্থানে স্থানে, গোরুর পাল দেখে নামতে হয় সাইকেল থেকে। ফাঁকায় ছড়ানো গ্রামে গোরু ছাগল ছড়িয়ে থাকে, যাব যার তার তার। নিবিড় হিংস্র বনের বুকের মাঝখানে স্বল্প পরিসর ফাঁকায় কয়েকটা গ্রামের গোরু ছাগলকে একত্র দল বেঁধে পাহারায় রাখতে হয়। নয়তো হারিয়ে যায়, বাঘে খায়।

সাত

১

একদিন হঠাৎ চামারদের বস্তিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ঘটনাচক্রের কী বিচিত্র গতি ! একদিন নদীর ধারে অব্যবহার্য পড়ো জমিতে চামড়াব কারখানা বসায়, জঙ্গলে আমবাগানে চামারদের বস্তি গড়ে ওঠায় খুশি হয়ে সীতাপুরের রাজপরিবার ভেবেছিল যে ভগবান সত্যিই দয়ালু, শূন্য থেকে এমনি ভাবে কিছু পাইয়ে দেন টানাটানির রাজভাণ্ডারে। ভীমশ্রীতিলকের বড়ো দরকার ছিল কিছু টাকার, স্থায়ী রোগের মতোই ছিল এই দরকারটা, মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে উঠত। চামড়ার কোম্পানিব কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে ভীমশ্রীতিলক ঝাড়া দেড় ঘণ্টা গৃহদেবতাব পূজা করেছিল।

সেদিন কে. কল্পনা করতে পেরেছিল, লিটন ময়দানের দিকে গড়ে উঠবে শহরের ফ্যাশনেবল কোয়ার্টার, বেড়ে উঠে ছড়িয়ে পড়তে চাইবে, এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যাবে জমিব চাহিদা আর দাম এবং এমন অভিশাপ হয়ে উঠবে ওই মরা নদীর পোড়ো তীরের চামড়ার কাবখানার অস্তিত্ব ! দখিনা হাওয়া একটু পশ্চিম ঘেষা হলেও এদিকে দুর্গন্ধ যায়. যেদিকে বাড়বার জন্য উদ্যত আছে শহরের নতুন ফ্যাশনেবল এলাকা। শুধু এই কারখানাটার জন্য এদিকে ছড়াতে পারছে না নতুন শহর, শত শত বিঘা জমি চড়া দামে বিক্রি হতে পারছে না, নগদ টাকা আসছে না রাজকোষে !

বাবা শালার বুদ্ধি ছিল না মোটে !

জয়শ্রীতিলক বলে। সে-ই এখন রাজা সীতাপুব এস্টেটের।

কোম্পানির নিরানব্বই বছরের লিজ !

মোটে একশো বিঘার লিজ।

এবং চামড়ার কারখানা খুলবার, চালাবাব, বাড়াবার স্পষ্ট ঢালাও অধিকার সমেত লিজ। এই একশো বিঘার আধ মাইলের মধ্যে কোনোদিন যে কখনও জমির চাহিদা হবে তাও কল্পনাতীত ছিল এক যুগ অর্থাৎ মোটে বারো বছর আগেও। অমন কত অজস্র জমি, ঢাল, লালমাটির পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি শত শত বছর ধরে পড়ে আছে।

একশো বিঘা নয় বরবাদ গেছে জলের দামে। কারখানার গন্ধে আরও হাজার-বারোশো বিঘা যে স্বপ্নের দামে বিক্রি হবার সম্ভাবনা নিয়েও বিক্রি হচ্ছে না, হবার আশাও নেই, এ জ্বালা কি সয় ?

কারখানার মালিক কানপুরের মহম্মদ আলি আবদুরী ঈষৎ ভুঁড়িযুক্ত রোগা লম্বা পাকা ব্যবসায়ী, ব্যাপারের গতি চেনে। জানে যে তাকে শেষ পর্যন্ত সরাতে হবেই কারখানা, কারণ নতুন যে শহর গড়ে উঠছে তার পিছনে বেশ জোরালো সরকারি সমর্থন আছে, বাড়ি যা হচ্ছে তার প্রায়

অর্ধেক বড়ো বড়ো সরকারি চাকরের এবং সরকারের পেয়ারের নেতাদের। শেষ পর্যন্ত লিটন টাউনের বিস্তার কোনোমতেই ঠেকানো যাবে না। মহম্মদ আলি আবদুবী তাই জানিয়েছেন ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনায় হিসাবমতো যথোচিত মূল্য পেলে এবং কারখানা সরিয়ে নেবার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে উদারভাবে ন্যায্য দাবি ত্যাগ করতে সে রাজি আছে।

সুবিধা পেয়েছে, সে ছাড়বে কেন ! এ অন্যায় শুধু যে অসহ্য ঠেকে জয়শ্রীতিলকের তা নয়, বড়ো বড়ো সরকারি অফিসার ও নেতাদের পর্যন্ত রাগ হয়। আইন যাদের তারাই যে মালিক আইনের—সেটা খানিক জেনেও অতটা স্পষ্ট জানত না মহম্মদ আলি আবদুরী।

তিনমাসের চেষ্টায় তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট হার্টলিকে শিকারে নিয়ে যেতে পারল জয়শ্রীতিলক—অর্থাৎ তার এস্টেটি কারবার যারা চালায় তারা। এত সময় লাগল এই জন্য যে আগে থেকে কার্লটনের মন ভিজিয়ে কাজ আদায়ের যথোচিত চেষ্টা হয়নি। অতটা ধরতেই পবেনি কার্লটনকে কেউ। চুপচাপ থাকে, আড়ালে থাকে, নিজে সোজাসুজি ঘা মারার বদলে নলিনীকে দিয়ে বা দেশি কোনো অফিসারকে দিয়ে আঘাত হানে,—গোড়ায় সত্যই অতটা বুঝে উঠতে পারেনি সকলে। নিজেব ক্ষমতা নিজের হতে খাটানোর সুখ যে কেউ কর্তব্যের খাতিরে বাদ দিতে পাবে—এটা ক্ষমতা খাটাবাব সুখের মত্ততায় খেযাল হয়নি কারও।

মন্ত্রী নয়, উকিল ব্যারিস্টার নয়, ডবল এম, এ, সেক্রেটারি নয়, এটা প্রথম খেয়াল কবল জয়শ্রীতিলকের ভূতপূর্ব গৃহশিক্ষক ইন্দ্র চক্রবর্তী। গৃহশিক্ষক হিসাবে ঢুকে ইন্দ্র নিজেকে স্থাপিত করেছে, ছ-সাতবছর তার কোনো আইনসঙ্গত, স্বীকৃত বা ঘোষিত পদ নেই, তবু সে পিছনে থেকে প্রত্যেক পদস্থ লোকের কাজ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করে। লোকে, নিন্দুক লোকে, এক অদ্ভুত কাহিনি বলে, কুৎসিত কাহিনি। জয়শ্রীতিলক খুব খাতির করত কিন্তু ভীমশ্রীতিলক লাথি মেবে দূব কবে দিয়েছিল ইন্দ্র চক্রবর্তীকে। অল্পবয়সি অত্যন্ত সুন্দরী একটি বোন ছিল ইন্দ্রের, এখনও আছে। ইতিমধ্যে বিয়েও তার হয়েছে ঘটা করে, কিন্তু স্বামীর খোঁজ কেউ রাখে না। জয়শ্রীতিলক কোনোদিন ইন্দ্রকে ত্যাগ করেনি, বাপ মরা মাত্র সগৌরবে ফিরিয়ে এনেছে।

কিন্তু সে যাই হোক, শুধু বোনের রূপ দিয়েই ইন্দ্র যে এতদিন নিজের এই খাতির বজায় রাখতে পারেনি, বিশেষত বড়ো বড়ো এত শত্রুর বিরুদ্ধে, তাতে সন্দেহ নেই। একটা মেয়ের রূপ, তা সে রূপ যতই অসাধারণ হোক, এতগুলি বছর কোনো রাজার ছেলেকে বাগিয়ে রাখতে পারে না। ইন্দ্রের মাথাটা ধূর্ত বুদ্ধিতে সত্যই অতিশয় শাণিত, তার বাস্তববোধ প্রায় মাড়োয়ারি ব্যাবসাদারদের মতো।

ঘুষ দিয়ে কাজ আদাযের কায়দা, সরকারি কর্তাব্যক্তি বাগাবার কৌশল ইত্যাদি অনেক অনেক নিগূঢ় ব্যাপারে তার পরামর্শ ছাড়া জয়শ্রীতিলকের চলে না।

হার্টলিকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না দেখে সবাই যখন চিন্তিত, ইন্দ্র বলল, কার্লটন ব্যাটাকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না। ওর হাতেই সব চাবিকাঠি। হার্টলি নতুন এসেছে, চোখ কান বুজে ওর কথা শুনে চলে। কার্লটনকে ডিঙিয়ে হার্টলিকে ধরা যাবে না।

দেখা গেল তার কথাই ঠিক।

কার্লটনের জন্য শিকারের আয়োজন করে শিকারে যোগ দেবার জন্য হার্টলিকে নিমন্ত্রণ করায় দুজনকেই পাওয়া গেল।

কার্লটন পাকা শিকারি। পদেও সে হার্টলির চেয়ে অনেক বড়ো। শিকারের ব্যবস্থাটাও তারই জন্য। কিন্তু—

তবে বাঘের বদলে কার্লটনের হরিণ শিকারের কারণ সেটা নয়। হার্টলির মানটাও তো তাকে বজায় রাখতে হবে !

সারাদিন মহাসমারোহে শিকারের পর আপ্যায়নের মহাসমারোহ। সর্বোত্তম স্কচ হুইস্কি থেকে সর্বোত্তম অনেক কিছু দিয়ে দেবতার পূজা—বরপ্রার্থনায়।

শিকারে এসে হার্টলি দু-দুটো বাঘ মারল। একটা আসল বড়ো বাঘের ছোটো বাচ্চা, আর একটা সদ্য-প্রসবা স্ত্রীজাতীয় চিতাবাঘ, প্রায় পৌনে চার ফিট। এ সময় মারতে হলে এ রকম বাঘই মারতে হয়।

কার্লটন মারল মোটা দুটো হরিণ। এ সময় পাকা শিকারির পক্ষেও এই খানিক রক্ষিত খানিক অরক্ষিত, খানিক আসল খানিক নকল জঙ্গলে হরিণ শিকার করা বাঘ হাতি কুমির শিকার করার চেয়ে বাহাদুরির কাজ। কার্লটনের জন্যই পোষা কয়েকটা হরিণ হরিণী মাসখানেক আগে বনে ছেড়ে দিয়ে শিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিন্তু কারখানায় তারা কোনো মতেই আগুন লাগাতে পারল না। কারখানার কয়েকটি দালাল শ্রমিককে বাগিয়ে একটা গোল বাধাবার চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে নিয়েই কারখানায় আগুন দেবার চেষ্টা হল বাইরের ভাড়াটে লোকদের নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল মহম্মদ আলিও কম চালাক নয়।

রাত প্রায় আড়াইটের সময় খুবই ধীর শান্তভাবে কার্লটন চামড়ার কারখানা সম্পর্কে ইন্দ্রকে ব্যবস্থার কথা বলেছিল। না বলে পারেনি, যতই হোক, সেও তো মানুষ !

এদিক থেকে খানিকটা চাপ দিতে হবে।

কী রকম চাপ ?

এই কারখানাতে ফাইট হল, ফায়ার টায়ার লেগে গেল, দু-চারটা মার্ডার জখম হল, লাইক দিস। ঠিক আছে ?

ইউ আর গ্রেট !

কারখানায় আগুন দেবার ব্যবস্থা করেছিল ইন্দ্র।

কিন্তু দেখা গেল মহম্মদ আলিও কম চালাক নয়। সেও ইতিমধ্যে লিটন-ফন্ডে আরও এক হাজার টাকা দান করে স্বয়ং কার্লটনের কাছে মজুরদের হাঙ্গামা ও আক্রমণ থেকে কারখানার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবেদন করেছে। কার্লটনের সঙ্গে দেখা করে সে নিজেও অবস্থাটা খুলে জানায়। কারখানা সরিয়ে নেওয়া হবে, অনেক মজুর ছাঁটাই হবে, বস্তি তুলে দেওয়া হবে, এ সব গুজব শুনে মজুররা খেপে উঠেছে। এই সুযোগে ওদের মধ্যে কয়েকজন লোক সরকার-বিরোধী প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

কার্লটনের বুক কেঁপে যায়। কী সর্বনাশ ! ইন্দ্রকে কারখানায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে বলার সময় সে তো তাদের সাবধান করে দেয়নি যে, মজুরদের যেন খেপানো না হয়।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে কার্লটন বলে, ও সব বাজে গুজব। তোমার কারখানা ঠিক থাকবে। আমি হার্টলিকে চিট্ পাঠাচ্ছি যেন পুলিশ দিয়ে তোমার কারখানা প্রোটেক্ট করে।

বলে বেয়ারাকে ডেকে মহম্মদ আলিকে এক কাপ চা এনে দেবার হুকুম দিয়ে বলে, বেশ বেশ। কথাটা হল কি, তুমি নাকি লিগের বিরুদ্ধে যাচ্ছ, কংগ্রেসিদের পক্ষ নিচ্ছ ?

ঝুটা বাত।

ঠিক আছে।

মহম্মদ আলিকে এ ভাবে ভজিয়ে কার্লটন সত্যসত্যই হুকুম দিল যে, মহম্মদ আলির কারখানায় পুলিশ এবং দরকার হলে মিলিটারি প্রোটেকশনের ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করা হয়।

দালালদের নিয়ে কারখানায় আগুন দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল ইন্দ্রের পক্ষে।

কার্লটন প্রকারান্তরে বলে পাঠাল যে কারখানার বদলে বস্তিতে আগুন দিলেও আসল কাজ হাসিল হবে।

দুটো জ্যান্ত মানুষ আর কিছু চুরি করা চামড়া পুড়ে উৎকট গন্ধ ছড়াল অগ্নিকাণ্ডে। শহরে গুজব রটল কাজটা মহম্মদ আলির নিজের। কারণটা মালিক শ্রমিক বিরোধ নয়, মহম্মদ আলি ওদের মুসলমান করার চেষ্টা করছিল, ওরা রাজি না হওয়ায় আক্রোশে বস্তিতে আগুন দিয়েছে।

যোগাযোগটাই বা কী আশ্চর্য ! সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখল শহরবাসি—কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে, সাংঘাতিক দাঙ্গা। মসজিদের সামনে বাজনার ব্যাপার নিয়ে শুরু।

প্রায় চমকের মতোই মোচড় খেয়ে সাম্প্রদায়িক আশঙ্কার শিরাটি টনটন করে উঠল শহরের মনে। কোথাও কিছু নেই, আচমকা। এবং অর্থহীন না হলেও উদ্ভট !

ভৈরব যেন ওত পেতে ছিল, সখেদে ঘোষণা করল, আমার অস্পৃশ্য হরিজন হিন্দু ভাইগণ--

নিজে তদন্তে এল কার্লটন। মহম্মদ আলিকে জানাল যে ব্যাপার খারাপ দাঁড়িয়েছে, আরও গুরুতর দাঁড়ানোর সম্ভাবনা। কারখানার হরিজনদের ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য তার জবরদস্তির বিরুদ্ধে আগেও বেসরকারিভাবে নালিশ এসেছে গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে। রাজা জয়শ্রীতিলক স্বয়ং এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছে।

মহম্মদ আলি বলল, তুমি জানো মিঃ কার্লটন—

জানে বইকী কার্লটন, মহম্মদ আলি নিজেই তো তাকে জানিয়েছিল। রেভা: স্টিফেনকে তার কারখানার লোকের কাছে যখন ঘেঁষতে দেবে না বলেছিল, তখন জানিয়েছিল শুধু পাদরি নয়, কোনো মৌলবি মোল্লাকেও তার কারখানা বা বস্তির এলাকায় ঢুকতে দেবে না। কাজে সে কী করেছে কে জানে !

মহম্মদ আলি বোকা নয়, সেও তো মানুষ ভাঙিয়ে পয়সা করেছে, আরও পয়সা করার আশা রাখে। সে টের পায় তাকে সরতে হবে কারখানা গুটিয়ে শহরের সম্প্রসারণ ও আধুনিক-করণের খাতিরে এবং আপসে মীমাংসা করতে হবে মূল্যাদি ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে।

কিন্তু এ প্যাঁচ কেন ? একখানা চিঠিতে শহর-সম্প্রসারণের প্ল্যানের কথা উল্লেখ করে তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতার আবেদন জানালেই সে ব্যাপার আঁচ করে কারখানা সরাবার আয়োজন করত, সে ক্ষেত্রে এত খাপছাড়া কাণ্ড ফাঁদা কেন ? হিন্দুপ্রধান জেলা, শহরে কিছু মুসলমান আছে, বেশির ভাগ যেমন গরিব তেমনি মূর্খ—একটু যারা ভালো অবস্থায় আছে, গুনতি দু দশজন, তারাও এই গরিব মূর্খ কটার ঘাড় ভেঙে চালায়, অন্য কোনো বিও প্রায় নেই। এটা খুব গরম জেলা। নেতারা হরতাল করবার অনুরোধ জানালে লোকেরা সারাদিন সভা করে, শোভাযাত্রা করে, বিলাতি কাপড়ের স্তূপ পোড়ায়, কোর্ট আদালতে আগুন দিতে চায়। চাষারা কথায় কথায় খাজনা বন্ধ করে।

কিন্তু প্যাঁচের মানে কী ? কার্লটন কিছু বাগাতে চায়, মোটা কিছু ? ওর মেমটা কলকাতায় থাকে, ভীষণ খরচে। ঘর সামলাতে না পেরে মোটারকম কিছু দরকার হয়েছে কার্লটনের ? কথাটা জোর পায় না মহম্মদ আলির মনে। ছোকরা ডেভিসের সম্পর্কে এটা ভাবা চলত, সে আচমকা বদলি হয়ে গেছে, ছোকরা হার্টলি এসেছে তার জায়গায়, ব্যক্তিগত অস্থায়ী লাভের হিসাব এদের একজনের কাছেও বড়ো কথা নয়, এরা স্বদেশপ্রেমিক খাঁটি ইংরেজ, এ তো সম্ভব নয় যে মোটা ঘুষের খাতিরে হাজার হাজার মাইল দূরের ইংল্যান্ডের স্বার্থ এরা কেউ ছোটো করবে ! এমনি যত দাও তত নেবে, হাঁস মুরগি বোতল। কার্লটনের মতো লোক বোঝাপড়া করে ঘুষ তো নেবে না সোজাসুজি !

তবু একবার চেষ্টা করে মহম্মদ আলি, জগতে অসম্ভব কী ? মিঃ কার্লটন, তোমার পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙাতে নাকি হাঙ্গামা হচ্ছে ? কোন ব্যাঙ্ক বলো তো, তোমার চেক ভাঙাতে হাঙ্গামা করে ? এ সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না, আমরা বিজনেসম্যান, আমরা বুঝি। বলো তো কালকেই টাকাটা ক্যাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি, ও চেক আমি ঠিক করে নেব।

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে কার্লটন বলে, কীসের চেক ?

সুতরাং মহম্মদ আলি বুঝেই উঠতে পারল না কার্লটনের চালটা কী।

সেদিন মঙ্গলবার। পরের রবিবার একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন প্রায় এক মাস আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল শহরে, একজন ভারতবিখ্যাত হরিজন-নেতা, সামঞ্জস্যপন্থী ত্রিপুরারি হাড়ি, গান্ধীজির আশীর্বাদ নিয়ে আসবেন। এ জেলায় হরিজনেরা সংখ্যায় ভারী। বাংলায় কেন, ভারতেরও কোনো জেলায় এত হরিজন নেই। চামার বাগ্‌দি নমশূদ্রে জেলাটা ঠাসা।

তা সম্মেলনটা হতে পারল না। হিন্দু-মুসলমানের হানাহানির ভয়ে পাঁচজনের একত্র হওয়াই নিষিদ্ধ হয়ে রইল, পাঁচ-সাতহাজার হরিজনের একত্র হওয়ার কথাই ওঠে না। তারা অবশ্য মানুষ নয়, জন নয়, নিছক হরিজন।

২

জরুরি বৈঠক বসে ভৈরবের বাড়িতে। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে হঠাৎ সরকারের এ উগ্রতার মাথামুণ্ডু তাদের কারও মাথায় ঢুকছে না, অনন্তকে ডেকে শোনা উচিত সে কী বলে।

উগ্রতা ? পাকা ভাবে। মনের ধাঁচটা তার সাধারণ মানুষের। সঙিনের খোঁচা আর রেগুলেশন লাঠির পিটুনি আর মাঝে মাঝে উৎসবের মতো গুলিবর্ষণ যার রীতিনীতি, এ তার কীসের উগ্রতা ! ধীর শান্ত পরিণত মনগুলির চিন্তা করার রকম-সকম ধরা গেল না মোটেই, বোঝা গেল না পরিস্থিতিটা কী ! পোড়া বস্তির চামারদের সম্পর্কে কথা উঠল না একবারও। দাঙ্গা হতে পারে কী পারে না তা নিয়ে মাথা ঘামালো না কেউ। শুধু আগামী নির্বাচন সম্পর্কে উদ্‌বেগ, আশঙ্কা, অস্বস্তি !

আর মৃত নেতার জন্য আপশোশ—আন্তরিক আপশোশ। আন্তরিকতার কারণটা যাই হোক। আজ যদি সে সব মানুষ থাকত—কত সহজ হত নির্বাচন-তরঙ্গ উতরানো। দেশে সাড়া নেই, চারিদিকে চাপা বিরক্তি, অবিশ্বাস। বুকে কেউ জোর পাচ্ছে না। আর খুঁটির জোর হারিয়ে সরকারের প্রত্যেকটি চাল শঙ্কিত করছে।

দেশবন্ধুকে স্মরণ করে সখেদে বলে, আজ যদি বেঁচে থাকতেন !

অনন্তেরও এই একটা বিশেষত্ব ছিল—এখনও আছে কি-না পাকা জানে না—জীবিত অপেক্ষা মৃত নেতাদের মত ও পথ এবং মহত্ত্ব সম্পর্কে তার উচ্ছ্বসিত ভক্তি। দেশবন্ধু সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি, কারণ অতি সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন। সভাসমিতিতে এমন ভাবে স্বর্গীয় নেতাদের কথা অনন্ত বক্তৃতায় টেনে আনে যে মনে হয় অন্তরালে থেকে তাঁরা প্রত্যেকটি কথা সমর্থন করছেন।

পাকাকে অনন্ত গত আন্দোলনের কাহিনি শোনাত, মৃত নেতাদের তেজবীর্য বীরত্ব মহত্ত্বের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিত। পাকা শুনত মুগ্ধ হয়ে, চোখ তার জ্বলে উঠত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রেরণায়।

এটা পছন্দ হত না সুধার। অনন্তের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলত :

নমস্য ছিলেন, বাস্, তার বেশি আমাদের দরকার নেই। তুমি পড়াশোনা করবে, শান্ত হবে, কথা দিয়ে এনেছি কিন্তু পাকা তোমায়--আমার মুখ রাখতে হবে কিন্তু।

তীব্র বিতৃষ্ণা বোধ করত পাকা। ইচ্ছা হত মারতে—নতুন মামিকে মারতে !

সুধা বোধ হয় টের পেত তার মনের ভাব, তাই অনেক রাতে তার মনটা বদলাতে আসত। পাকার ঘরে পড়ার টেবিল, বইয়ের সেল্‌ফ, বিছানা—যত দামি, যত সংক্ষিপ্ত, যত বেশি ঝকঝকে তকতকে করা সম্ভব সুধা তা করেছে। পাকা আরামে পড়বে, আরামে ঘুমাবে, তার বেশি আর কিছু যে সুধা চায় না ঘরটা যেন তারই সুস্পষ্ট ঘোষণা। আলো জ্বালিয়ে পাকা আধঘণ্টা পড়ত পড়ার বই--তারপর নিষিদ্ধ বই। সুধা তা জানত।

ঘরে এসে চেয়ারের পিছন থেকে তার গলা জড়িয়ে মাথায় গাল রেখে বলত, তোকে নিয়ে আমি কী করি বল তো !

পাকার মনে হত, এ আক্রমণ, অন্যায় আক্রমণ। তার প্রতিরোধ করা উচিত, অপমান করা উচিত নতুন মামিকে। কিন্তু ছেলেমানুষ মনটা তার দেখতে দেখতে গলে যেত, তথাকথিত আক্রমণে যেমন ঘৃতকুম্ভ গলে যায়।

নতুন মামির গায়ের গন্ধ তখন মিষ্টি ছিল। স্নো পাউডার ঘামের একটা অদ্ভুত মেশাল গন্ধ।

এবার শোও।

শুই।

বাথরুম ঘুরে এসে এক গ্লাস জল খেয়ে কাপড় ছেড়ে পায়জামা পরে পাকা বসত খাটের বিছানায় পা ঝুলিয়ে। পাশে বসত সুধা।

মন কেমন করছে ?

হুঁ।

সুধার বুকে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসত পাকা। এক হাতে তাকে বুকে চেপে আর এক হাতে সুধা তার ঘাড়ের ঘামাচি মারত, মাথা তোকিয়ে দিত।

তাকে শুইয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে সুধা চলে গেলে আবার যেন ছায়ার মতো কারা সব ভেসে আসত তার আধঘুমের ছন্নছাড়া জগতে, ভাষায় ছন্দে নাচত। মারো কাটো, ফাঁসি লটকাও, বিদায় দে মা ঘুরে আসি, বানচাল করো, ফাঁকি ওড়াও, ধর্মঘট করো !

মহম্মদ আলি হঠাৎ আসে ভৈরবের বাড়িতে—রাত এগারোটার সময়। দিনের আলোয় আসতে সে সাহস পায়নি, বেশি রাতে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে এসেছে। উকিল রহমান আর শিক্ষক জামান খান আজ সন্ধ্যায় মহম্মদ আলির কাছে এসেছিল। শহরের মুসলমানরা আক্রমণের আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়ে আছে। মহম্মদ আলির কারখানায় আক্রমণ হতে পারে, তার বাড়িতেও—হিন্দু এলাকায় মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মহম্মদ আলি বাস করে।

ভৈরব এটা প্রত্যাশা করেনি যে হাঙ্গামার রাশ আলগা হয়ে যাচ্ছে বলে, মজুর খেপে উঠছে বলে, মহম্মদ আলি যেচে তার বাড়িতে আসবে। মজুর খেপলে অবশ্য তাদের দুজনেরই বিপদ—কিন্তু কার্লটনের কাছে না গিয়ে সোজাসুজি তার কাছে মহম্মদ আলির পরামর্শ করতে আসা কল্পনাতীত ছিল ভৈরবের। সে তাই খুব সাবধানে কয়।

শুধু যে হিন্দুরা আক্রমণ করতে পারে তা নয়, তার চেয়ে বেশি ভয় কারখানার চামারদের হানা দেবার। তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তাদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ, তারা প্রায় খেপে আছে।

খেপাচ্ছে ভুবন, সামনে রেখেছে বিশ্বম্ভর নাথকে।

ওই বিশুকে ?—ভৈরব হাসে।

জোর চালিয়েছে মোশা। ফুলিশ বটে লোকটা, একদম গাধাকা মাফিক ফুলিশ, বাট তাগদ আছে।

শ পাঁচেক দিয়ে দিন, ঠান্ডা হয়ে যাবে।

পাঁচশো কেন আরও বেশি দিতে মহম্মদ আলি রাজি, কিন্তু ডেকে পাঠালেও এবার বিশ্বম্ভর আসেনি। গতবার আর একটা হাঙ্গামার সময় ডেকে পাঠানো মাত্র বিশ্বম্ভর হাজির হয়েছিল, অল্পেই মিটে গিয়েছিল হাঙ্গামা। এবার তার কী হয়েছে কে জানে !

ভুবন এবার পেছনে আছে।

হাঁ, ঠিক।

ভৈরব পুলিশ প্রোটেকশনের কথা উল্লেখ করতে কানপুরের মহম্মদ আলি আবদুরি মুখ বাঁকিয়ে ঘরেই থুক্ করে থুতু ফেলতে গিয়ে সামলে নিয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে থুতু ফেলে আসে।

শালা পুলিশকা বাত বোলবেন না মোশা !

মহম্মদ আলি চিঠি পাঠিয়েছিল সকাল এগারোটা নাগাদ। কোনো সাড়া শব্দ মেলেনি। না আসে জবাব, না আসে পুলিশ। বেলা তিনটেয় এল—লিটন মেমোরিয়াল ফান্ডের চাঁদার খাতা, পাঁচ হাজারের অঙ্কপাত করা আছে, রসিদও কাটা আছে, সম্পাদক কার্লটিনের নামে। এ শহরের পুরানো শহিদ ম্যাজিস্ট্রেট লিটনের নামে বিরাট ময়দানটির নামকরণ করা হয়েছিল, সেখানে লিটন টাউনের নামে বিরাট ময়দানটির নামকরণ করা হয়েছিল, সেখানে লিটন টাউনের পত্তন হয়েছিল, তাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল তখন। আবার নতুন করে সাদা সরকারি কর্মচারীব ওপর সন্ত্রাসবাদীদের হানা শুরু হওয়ার পর শহরের বুকে বিরাট সুদৃশ্য এক স্মৃতিসৌধ স্থাপনের জিদ জেগেছে নতুন করে—বিশেষভাবে কার্লটিনের।

কলকাতার মনুমেন্ট নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনুকরণে লিটন মেমোরিয়াল সৌধ গড়ার পরিকল্পনা আছে—যদিও অনেক ছোটো স্কেলে।

এদের হয়ে এসেছে মোশা। আগে নেভার এইসান পাগলামি করত। আগে হলে মোকে ডেকে নিয়ে একটো খানা খাইয়ে দিত, হাসিখুশিসে বলত যে মহম্মদ আলি আবদুরি, লিটন সাব কো মেমোরিয়াল ফন্ডমে পাঁচ হাজাব রুপেয়া ই দিয়া ? আজকে শালা লোককো মাথা বিগড়ে গেছে মোশা।

কার্লটিন বাড়াবাড়ি করছে।—ভৈরব ব চিন্তিত ভাবে, খুব মদ খাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। মেমটা এসে থাকলে ভালো হত। সে মাগিটার আবার কলকাতায় হইচই না করলে দিন কাটে না। এ দেশে ইংরেজগুলো, জানো মিস্টার আবদুরি, মেমগুলোর জন্য এমনই খ্যাপাটে বনে যায়।

আবদুরি একগাল হাসে।

ভৈরব সংশয় ভরে প্রশ্ন করে, এ সব দিকে খেয়াল নেই, না ? কার্লটিনের ?

আবদুরি মাথা নাড়ে। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প শোনায় ভৈরবকে। খাদ্য ও মদ্যের মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে ভেট দিতে চেষ্টা করার গল্প—রাজা জয়শ্রীতিলক সে চেষ্টায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। কার্লটিন আর সব নিয়েছিল, মেয়েটিকে গ্রহণ করেনি।

যাই হোক, ভৈরব বলে, অনন্তর একবার আসা দরকার। কাল সকালেই টেলিগ্রাম করব ভাবছি।

হাঁ, হাঁ, আবদুরি উৎসাহিত হয়ে ওঠে, অনন্তবাবুকো লে আইয়ে। আপনাকে মোশা সচ বাত বলি, বংগালি আদমি বহুৎ ইয়ে হ্যায়, লেকিন অনন্তবাবু—

বাঙালির অপমানটা খেয়াল যেন হয় না ভৈরবের, অনন্তের প্রশংসা তার ভালো লাগে। অনন্ত তাকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দেবে। অনন্তের সাহায্যে সে মালসিও হতে পারবে হয়তো।

কিন্তু অনন্তও যেন আজকাল কেমন এক উদ্ভট বাঙালি-প্রীতি আমদানি করছে তাব কথায় ব্যবহারে কাজে। বাংলাদেশ আর বাঙালিকে সে যথেচ্ছ গালাগালি দেয় তার প্রত্যেক বক্তৃতায়, কিন্তু অবাঙালি কেউ বাঙালির বিরুদ্ধে কথা বললেই সে যেন খেপে যায়। একেবারে উলটো সুর গাইতে আরম্ভ করে। বাংলা ভারতের মস্তিষ্ক, বাংলা ভারতের হৃৎস্পন্দন। বাংলা যা করে আর ভাবে ভারত তাই করে আর ভাবে। বাঙালির তুলনা নেই !

একজন অবাঙালি উগ্র হিন্দু, তার নাম মোহন দাস, চরকা কেটে আর জেল খেটে চল্লিশ বছর বয়সে সে প্রায় আশি বছরের স্থাণুত্ব পেয়েছে, বলেছিল, পলাশী বংলামে থা, পহেলে বংলা বুট জুতামে পালিশ লাগায়া !

অনন্ত রেগে টং হয়ে গিয়েছিল।

অকালবৃদ্ধ মোহন দাস আবার বলেছিল, বংগালিকো বহুৎ বেশি মা-বোহিন ছিন লেকে নিকা করতা নবাব আউর চাষি। রাজা মহারাজাকো বংগালি ভেট্ দেতা মা-বহিন, দু-চার রুপেয়া মিল যাতা মুফতমে !

অনন্ত খেপে গিয়েছিল। মোহন দাস নীরব হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য,—চিতায় না কবরে কেউ তা জানে না। ক্ষমতা আছে অনন্তের। সে তাকে চেয়ারম্যান অনায়াসে বানিয়ে দেবে। মালসিও হয়তো বানিয়ে দেবে অনায়াসেই।

৩

পুব আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সঞ্চার, জমজমাট গুমোট, মাঝে মাঝে আকাশে দিক কাঁপানো গর্জন। আজ অপরাহ্ণেও বুঝি বৈশাখের ঝড়-বাদলের দাপট। তা, জোরালো বাতাস উঠে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল এত মেঘ আর এত আয়োজন, বৃষ্টিহীন শুকনো ঝড়ে মিনিট পনেরো শাখা পাতা ঝাপটালো গাছগুলি, তারপর ডুবন্ত সূর্যের রঙিন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল আকাশ। যাক গে। কাল মাঝরাতে তো কালবোশেখি এসেছিল চৈতের দারুণ খরার পর পরিপূর্ণরূপে, কুঁড়ের চাল উড়িয়ে নিয়েছে, গাছপালা উপড়ে ফেলেছে, ঝাড়া তিনঘণ্টা চালিয়েছে বর্ষার ঝাপটা।

আগের রাতে যদি আসত এই ঝড়-বাদল। একদিন পরে যদি আগুন লাগত চামারদের বস্তিতে। বৃষ্টিতে নিভে যেত, গলে যেত সেই অপবিত্র আগুন।

রং চাপালে, আগ দিলে !—বুড়ো নাঙির উদ্দাম রূপ বেপরোয়া বিষম মূর্তি !

ইংরেজ রানির আইন চালু, খেটে খাই না কি চুরি করি, মাগো রানি !—ই কাম কি বজ্জাতি ? মার ই ইয়া-কে, মার ! মার ! মার ! রং চাপালে, আগ দিলে !

গিধর পুড়ে মরেছে, কারকির পুরুষ। আর নবাগত একটি জোয়ান ছোকরা, কানাইয়ার বউ কাতার মামা, বাঙকা। বেখরচায় পেয়ে দুজনে বেহিসেবি চোলাই খেয়ে কাত হয়েছিল সবার আগে, তাতে ওদের ওপর গভীর অবজ্ঞা জন্মেছিল অন্য সকলের—আধচেনা বাইরের একজন গুপ্তধন পাওয়ার খুশিতে উৎসব করার জন্য চোলাই খাওয়ার ঢালাও আয়োজন করছে বলেই এমন ধৈর্য হারিয়ে খেতে হবে—রাম রাম ! ধিক ! অবজ্ঞাভরে কয়েকজন মিলে সাপটে তুলে তাদের আবর্জনার মতোই শুইয়ে রেখে দিয়ে এসেছিল সমবুর পরিত্যক্ত কুঁড়েটার ভেতরের আবর্জনার মধ্যে। তার অনেক পরে মাঝরাত্রি। তখন অনেকের প্রায় ওদের মতোই অবস্থা, বাকিদের কাছাকাছি। এ সময় হঠাৎ আট-দশটা ঘর জ্বলে উঠলে কারও কি অত খেয়াল থাকে যে বেখরচা নেশায় ওই মরো মরো অবস্থাতেও মা ভোলেনি তার বাচ্চাকে ঘর থেকে তুলে আনতে, বাপ ভোলেনি চোখের সামনে অচেতন ছেলেকে হেঁচড়ে টেনে তফাতে নিয়ে যেতে, বউ ভোলেনি পুরুষটার প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজন, এক ঘণ্টা আগে যে নেশার ঝোঁকে তাকে খুন করতে চেয়েছিল, পিঁড়া-কাঠটা তুলে এক ঘায়ে দাঁত ভেঙে রক্ত ঝরিয়েছিল। প্রত্যেকে বিষে মরো মরো, তবু তারা নিজেকে বাঁচাতে ছুটে পালায়নি, সকলকে আগুন থেকে বাঁচিয়েছে—সকলকে ! আগুনকেও গ্রাহ্য করেনি। চৈতের খরায় শুকনো চালা দাউদাউ করে জ্বলছে, পাঁচ-সাতহাতের মধ্যে গেলে আঁচে গা যেন ঝলসে যায়, তবু তাও অগ্রাহ্য করে কারকি শেষ মুহূর্তে ছুটে গিয়ে ওনার এগারো বছরের হাবা ছেলেটাকে বার করে এনেছিল। চুল ঝলসে গিয়েছে কারকির। অথচ, খানিক আগেও কারকি টলছিল। কারও যদি একবার খেয়ালও হত যে ওই ভূতুড়ে চালাটায় দুটো মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে আছে, টেনে না আনলে পুড়ে মরবে !

অন্য চালা হলেও হয়তো তাদের খেয়াল হত। সমবুর চালার ব্যাপারটা আলাদা। সব চালাতেই মাথা গুঁজে থাকে একজন, তার সঙ্গিনী এবং হয়তো বা ছেলেমেয়ে। সে চলে যায়, সে মরে যায়। আর একজন এসে মাথা গোঁজে সে চালাতে। সমবুর চালাটা ছিল অন্যরকম। ভূতপ্রেতের সঙ্গে কারবার ছিল সমবুর। সে নিজে স্বীকার করত, গর্ব করত, বকবক করত, ওযুধ দিত, ধুঁকত আর জোয়ান কচি মেয়েদের বলত তার রঙিন কাঁচের পুঁতি কোথায় বাঁধতে হবে, শিকড়গুলি বেটে কখন কী ভাবে খেতে হবে, তার প্রলেপ লাগাবার কায়দা কী।

সমবু মরার পর ও চালায় কেউ থাকেনি। সমবুর কুকুর বাচ্চা বিইয়েছিল, একটাও বাঁচেনি, মরেছে নয় শিয়ালের পেটে গেছে।

কে খেয়াল রেখেছে ওই চালাতেই দুজন নেশায় বেহুঁশ মানুষকে তারা শুইয়ে রেখেছিল নেশার ঝোঁকে।

জবর নেশা হয়েছে আজ, খাপছাড়া অদ্ভুত নেশা ! এমন নেশা তারা কদাচিৎ পায়।

যে এনেছিল এ নেশা, বন্ধু ভাবে প্রিয় ভাবে আত্মীয় ভাবে, সে গেল কোথা ? এ আগুনে তাকে যদি তারা পুড়িয়ে মারতে পারত—পোড়া বাঁশের জ্বলন্ত ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চালার আগুনে শিকার সেঁকার মতো উলটে পালটে মারতে পারত !

কারও বুঝতে বাকি নেই যে গুপ্তধন পাবার কাহিনি মিথ্যা, বস্তিতে আগুন দেবার সুবিধার জন্য তাদেব নেশায় মাতিয়ে রাখতেই লোকটা এসেছিল বন্ধু সেজে। তাদের নিজেব জাতের লোক—দালাল। ঘৃণা উথলে ওঠে সবার বুকে, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

কাবখানা বন্ধ। এদিক-ওদিক ছড়ানো ছোটো ছোটো বস্তির চামাররাও এসে আমবাগানের ছায়ায় জড়ো হয়েছে।

শহবের ধাঙড় ঝাড়ু দাররাও এসেছে ঝেঁটিয়ে। এদিকে ভুবনের প্রতিভা আছে, হাঙ্গামা ফেনিয়ে তুলতে সে ওস্তাদ, সুযোগ একটা পেলেই হল, কোনো একটা ছুতো। ক্লাবের লাইব্রেরিয়ান রাখালের সঙ্গে পাকার সামান্য বিবাদকে উপলক্ষ করে সে শহব তোলপাড় করেছিল, শহরের গণ্যমান্যদের ডেকে ভৈরবকে অপদস্থ করার জন্য। তবে শুধু বাধায় নিছক হাঙ্গামা, নিজের বাঁকা উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য, এই যা বিপদ। নতুবা অর্থ প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা ক্ষমতা সব দিক দিয়ে ভৈরবের চেয়ে অনেক ছোটো হলেও খেটেখুটে কৌশল বিস্তাব করে সংঘাত সৃষ্টির শক্তিতে সে ভৈরবকে হার মানাতে পারে।

বিশ্বম্ভরকে পেয়ে তার বিশেষ সুবিধা হয়েছে। জেলায় হবিজন আন্দোলন গড়বার চেষ্টা সে করছে অনেক কাল থেকে—প্রথমে কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে আন্দোলন গড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু মতবিরোধের ফলে আমল পায়নি।

ভুবনের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। পোশাকে চেহারায় মানুষটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁটেল মাটির কাদার মতো মোলায়েম মেটে রং, বেঁটে আঁটো চেহারা, কদমছাঁটা শক্ত চুল, নিকেলের চশমা।

গতরাত্রের বর্ষণে ভেজা পোড়া বস্তি থেকে উঠছে অল্প অল্প ধোঁয়া আর বাষ্প। ক্রুদ্ধ অশান্ত স্ত্রী-পুরুষ, কিন্তু কী করা উচিত জানা না থাকায় একটু বিমূঢ়। বিশ্বম্ভর বিষোদ্গার করে চলেছে উগ্র উদাত্ত কণ্ঠে : ভুলো না তোমরা হিন্দু। হিন্দুর স্বার্থ তোমাদের স্বার্থ, হিন্দুর ভবিষ্যৎ তোমাদের ভবিষ্যৎ। কংগ্রেস মুসলমানের খাতিরে তোমাদের জবাই হতে দেবে—দ্বিধা করবে না। কী দিয়েছে কংগ্রেস তোমাদের ? কতটুকু করেছে তোমাদের জন্য ? কংগ্রেস বর্ণহিন্দুর স্বার্থ দেখে, বড়োলোকের স্বার্থ দেখে, তোমরা মরবে কী বাঁচবে কংগ্রেস ভাবে না। ভুলো না তোমরা হিন্দু...

সত্য মিথ্যা আবেগ উন্মাদনা ইত্যাদির এই খিচুড়ি ভাষণে উত্তেজনা বাড়ে কিন্তু নির্দিষ্ট রূপ পায় না। কারণ বুদ্ধির যত দৈন্য থাক, বাস্তববোধ তাদের খাঁটি ও শক্ত। কারখানার মালিক হিসাবে নয়,

মুসলমান মালিক হিসাবে, অবাঙালি মুসলমান হিসাবে, মহম্মদ আলি তাদের আঘাত হেনেছে—ভুললে চলবে না তারা হিন্দু। কংগ্রেসি বড়ো বড়ো হিন্দুর সঙ্গে তার দহরম মহরম, ভৈরবের সঙ্গে তার গোপন বোঝাপড়া—গরিব অস্পৃশ্য হিন্দু তারা—তাদের ঘা দিতে, ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে তার সাহস হয়। কেন এ স্পর্ধা ? সে জানে কংগ্রেস তার পক্ষে। কংগ্রেসে যে বড়ো বড়ো হিন্দু নামধারী পান্ডা আছে, তাদের এই শহরেও আছে, তারা কথাটি বলবে না অস্পৃশ্য হিন্দুদের ওপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে, চুপচাপ হজম করে যাবে।...এমন করে বললে বক্তব্যটা শিশুও বুঝতে পারে। কিন্তু সকলের ঠেকছে অন্য জায়গায়। মহম্মদ আলিই যে তাদের বস্তিতে আগুন দিয়েছে এই মূল কথাটাতেই তাদের সন্দেহ আছে এ সময় এ ভাবে বস্তিতে আগুন দেবার কোনো মানেই হয় না মহম্মদ আলির। শান্ত নিরঙ্কুশ ভাবে কাজ চলছে, তাদের সঙ্গে কোনো খিটিমিটি নেই, সে কেন বস্তিতে আগুন দিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে নিজের ক্ষতি করবে ?

মহম্মদ আলির লোক যে বস্তিতে আগুন দিয়েছিল তারও কোনো প্রমাণ নেই।

তাদের আঘাত হানার জন্য উদ্যত ক্রোধ তাই অনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাতড়ে ফিরছে এখনও।

শহরে একশো চুয়াল্লিশ, তা সত্ত্বেও যখন আমবাগানে চলছে এই জমায়েত, তখন এক ঘটনা ঘটেছিল শহরের অন্য এক পাড়ার রাস্তায়। ঝাঁকায় গোস্ত নিয়ে গিয়ে আবদুল মুসলিম অঞ্চলে ফিরি করে--কাপড়ে ঢাকা থাকে গোস্ত।

ফ্যাল্ ঝাঁকা—ফ্যাল্ ওই নর্দমায়।

অনেক অনুনয় বিনয় কাঁদাকাটার পর ঝাঁকাটা ফেলতে হয়েছিল।

ব্যাটা তুই গোরুর মাংস নিয়ে এ রাস্তায় হাঁটিস !

কত মার খেতে হত, মরত কী বাঁচত কে জানে লোকটা, অমিতাভ এবং পাকা ছুটে এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুদূর তারা এগিয়েছে, দারুণ আক্রোশে পিছন থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, রাত দুপুরে মেয়ে চরিয়ে বেড়াও, তাই করলেই হয় !

আর একজন বলল, লোকটা প্রতিমা দেবীর ভাই নাকি হে অমিতাভ ?

জানা ছিল না তো ?

অমিতাভ এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গেল, শক্ত করে পাকার হাত ধরে তাকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে।

পাকা আশ্চর্য হয়ে যায়। এ অপমান নীরবে সয়ে যাবে অমিতাভ, তাকেও কিছু করতে দেবে না !

কিছু বলবেন না ওদের ?

কিছু বলার নেই।

বলার না থাক, করার তো আছে। পায়ে ধরে মাপ চাওয়ানো তো যায়।

না ভাই, কিছু করার নেই। তুমি বুঝবে না।

কিছু করার নেই। চুপ করেই চলে যেতে হবে তাকে। ওদের শিক্ষা দেওয়া যায় না এই কুৎসিত মন্তব্যের জন্য। নিজের এই অপমান, প্রতিমার এই অপমান সয়ে যেতে হবে তাকে, নিষ্ক্রিয়ভাবে, বিনা প্রতিবাদে। কী তার বলার আছে ? রাত দুপুরে নির্জন রাস্তায় তাকে তার প্রতিমাকে সত্যই তো আবিষ্কার করেছিল সুধা।

আরও কে কে দেখেছে কে জানে ! এদের শিক্ষা দিতে গেলে, হাঙ্গামা করলে, আরও বেশি ঘোঁট হবে প্রতিমার নামে।

ক্ষোভে বুক জ্বলে যায়, হাসিও পায় অমিতাভের। তাকে কদর্য ইঙ্গিত শোনাবার সাহস হল এই বাঁদর কটার প্রতিমার নাম জড়িয়ে, সে মাথা নিচু করে শুনে গেল ওদের ধূলিসাৎ করে কাঁদিয়ে ক্ষমা না চাইয়ে !

এরা শুধু প্রতিধ্বনি, অনেক প্রতিধ্বনির মধ্যে দু-চারজন। যে মৃদু ধ্বনিটি সুধা সরল মনে না জেনে না বুঝে উচ্চারণ করেছিল গল্পচ্ছলে মেয়েমহলে, শহরের মেয়ে-পুরুষ ভদ্র সমাজে তা মৃদু নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

মেয়ে-মহলে গল্প করেছে সুধা, বিয়েবাড়ির গল্প। সুরেনের মেয়ের বিয়ের দেওয়া-থোয়া আয়োজন-পত্র, আদর-অভ্যর্থনা, অন্যায়-অব্যবস্থা, বরের চেহারা, মেয়েদের সাজপোশাক দেমাক-বোকামি, মেয়ের কেলেঙ্কারি কাণ্ড—এমনই সব অজস্র কাহিনি বর্ণনা ও সমালোচনার মধ্যে প্রতিমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যাপারটা। দুপুর রাত। মেয়েটাকে নিয়ে মোটরে উঠবে, তাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ি ফিরবে, ওমা, মেয়ের পাত্তাই নেই ! একা একাই বাড়ি চলে গেল নাকি, কী কাণ্ড আঁ্যা ? অমিতাভ নিজে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে মেয়েটাকে ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছে দেবার—বাড়ি সে ঠিকমতো পৌঁছেছে কি-না না জেনে বাড়ি ফিরে তো ঘুম হবে না সুধার। প্রতিমার বাড়ির দিকে তাই গাড়ি চলল। ওমা, ভাঙা পুলের ওপর গিয়ে দেখে কী, দুজনে কোন ফাঁকে বেরিয়ে এসে—

সুধাকে দোষ দেওয়া যায় না। এ জগতে কাউকেই বোধ হয় দোষ দেওয়া যায় না। অকারণ বজ্রপাতের মতো একটা দুর্ঘটনা যেন ঘটে গেল তার জীবনে। এর একমাত্র প্রতিকার চিরকালের জন্য তার দগ্ধ হয়ে যাওয়া। সেই শুধু থামিয়ে দিতে পারে কদর্য কলরব, তার পক্ষেই সম্ভব প্রতিমার মিথ্যা কলঙ্কের উদ্দাম সত্যরূপকে বাতিল করা। আর কেউ পারবে না, আর কোনো উপায় নেই। আগামী যে জীবনটা তার আছে, যে জীবনকে সার্থক করার রসায়িত করার যে পরিকল্পনা আর সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছে, ভাঙা পুলে ব্যক্তিগত আকাশ-বাতাস কামনা-বাসনা আনন্দ-বেদনা বাতিল করে প্রতিমাব কাছে আদায করে নিয়েছে মরণের সঙ্গে কারবার করে জীবনের দাবি প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি,—সে সমস্ত বাতিল করে, উলটে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রতিমাকে বিয়ে করে সে থামিয়ে দিতে পারে সর্বনাশা কুশ্রী গুঞ্জন।

পাকা মূক হয়ে পথ চলে। অমিতাভের মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। সে জানে প্রতিমা আর অমিতাভের নামে সারা শহরে কুৎসা রটেছে। শুধু যে জানে তাই নয়, উৎসাহের সঙ্গে এই মুখরোচক খবরটা তাকে জানাতে এসেছিল বলে একজন সাধারণ ভক্ত বন্ধুর গালে সে একটা থাপ্পড়ও কষিয়ে দিয়েছে। সে ভেবে পায় না অমিতাভ কী করে এমন অহিংসপন্থী হয়ে উঠল যে মিথ্যা বদনাম নিয়ে বিশ্রী তামাশা শুনেও তার রক্ত গরম হয় না !

চলতে চলতে হঠাৎ সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, আমায় বলুন, বলতে হবে। ওদের মারলেন না কেন ? নিজে থেকে অনেক কথা বুঝিয়েছেন, এটাও আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে। আমি ছেলেমানুষ বলে যদি উড়িয়ে দেন অমিতদা—

পাকা অবশ্য বলে না ছেলেমানুষ বলে তাকে উড়িয়ে দিলে সে কী করবে, তবু অমিতাভেব চমক লেগে যায়। চোখের পলকে সে বুঝতে পারে, তাদের বদনামটা সত্য কী মিথ্যা সে জন্য পাকার এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। সে কেন ছেলে কটাকে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দিল না, এই সমস্যা বড়ো হয়ে উঠেছে পাকার কাছে।

তুমি সত্যি বড়ো বেশি রকম পেকে গেছ পাকা, অমিতাভ ক্ষোভের সুরে বলে, বুঝিয়ে বললেও কি তুমি বুঝবে ? রাত দুপুরে ফাঁকা রাস্তার ধারে গাছতলায় সত্যিই তো আমরা কথা কইছিলাম। তুমিও তো গাড়িতে ছিলে, দেখেছ। আরও হয়তো দেখেছে কেউ কেউ। তুমি আমায় চেন, তুমি খারাপ কিছু ভাবলে না। কিন্তু লোকে তো খারাপ মানেটাই করবে !

করুক না ? তাতে কী বয়ে গেল ?

শহর জুড়ে কলঙ্ক রটা তার আর প্রতিমার পক্ষে, তাদের আত্মীয়স্বজনেব পক্ষে কী ভয়ানক সমস্যার ব্যাপার, পাকার কাছে সেটাও বড়ো নয়।

বয়ে যায়, অমিতাভ বলে, মেয়েদের পক্ষে খুব বেশি বয়ে যায়। ভুলটা কবেছি আমি, অত রাত্রে ও ভাবে প্রতিমার সঙ্গে কথা না বলাই আমার উচিত ছিল। পরদিন কি কথা বলা যেত না ? মিথ্যে হলেও দুর্নামটা সত্যি হয়ে গেছে। আমিই তাই প্রায়শ্চিত্ত করছি, টিটকারি সয়ে যাচ্ছি। নইলে মিথ্যা নিন্দাটাকেই বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

মিথ্যাকে মেনে নিলে মিথ্যার জোর কমে ?

প্রতিমার কথাটা ভাবতে হবে তো !

প্রতিমাদির জন্য মিথ্যাকে মানতে হবে !

মানলাম কই ?

মানলেন না ? গাল শুনে চুপ করে রইলেন !

অমিতাভের রাগ হয় কিন্তু পাকাকে ধমক দিতে পাবে না। সত্য কথা বলতে কি, টিটকারি শুনে চুপচাপ পালিযে আসা উচিত কি অনুচিত হয়েছে, এ বিষয়ে তার নিজেব মনেই সংশয় ছিল। নইলে পাকাকে সে কী প্রশ্রয় দিত ! তার পাকামিভবা কথা শুনেই ধমক দিত প্রচণ্ড :

আমি কিন্তু তা বলিনি অমিতদা।

অমিতাভ একটা নিশ্বাস চেপে যায়। আদর্শের জন্য কাজ করা, মরা কী কঠিন ! বয়সেব কত আর তফাৎ হবে তার আর এই পোক্ত ছেলেটার মধ্যে, বড়ো জোর, বারো-তেবো বছর। তবুও যেন ওর মধ্যে নতুন একটা জগৎ জন্মেছে, তাব জগতের চেয়ে বড়ো হয়েছে।

দুআনার মুড়ি-মটরশুঁটি ভাজা কিনুন না অমিতদা. খিদেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছে। পয়সা আছে তো পকেটে ? বেন্দাব দোকানে চায়ের সঙ্গে খাই আসুন।

আর তো পয়সা নেই।

হোগলাব চালা তুলে, হাইস্কুলের দুটো চোবাই ডেস্ক বেঞ্চ সস্তায় কিনে, বেন্দা এক চা-বিস্কুট পাউরুটির দোকান দিয়েছে। বেন্দা ছিল এই ছোটো শহরের বড়ো জেলের একজন সাধাবণ ওয়ার্ডাব। জেল থেকে একদিন দুজন কয়েদি পালিয়ে যায়, রাজনৈতিক কয়েদি, অবশ্য কংগ্রেসি নয়। আগের দিন বেন্দা ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল, তাব বউ একটা মবোমরো ছেলে বিয়োতে গিয়ে নিজেও মরতে বসেছে বলে। বউ বাঁচেনি। এ রকম অবস্থায় বউরা এ দেশে বাঁচেও না। শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে বুকিয়ে দিতে মোটে তিনদিন লাগিয়ে ফিরে এসে শোনে কী যে সে ছাঁটাই হয়েছে, কয়েদি পালানোব জন্য তাকে দায়ি করে তাকে কয়েদি বানাবার চেষ্টাটা উপরওয়ালাদের দয়ায় শুধু বাতিল হয়েছে।

বেন্দা দরখাস্ত ঝেড়েছিল। বড়োকর্তার কাছে। বড়োকর্তা বেন্দার এতদিনের চাকরিটা বজায় রাখার কথা কিছুই বলেনি, শুধু বেন্দার নামে মামলাটা তুলে নিয়ে বেন্দাকে এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করার হুকুমজারি করেছে।

তাই অবিবেচক খেয়ালি সরকারের উপর বেন্দা ভীষণ চটে গেছে।

সরকারকে সে গাল দেয়। কড়া বা নরম বা মিষ্টি ভাষায় যে সরকারকে গাল দেয় তাকেই বেন্দা আদর করে চা খাওয়ায়, তিন পয়সা কাপের দাম ধরে এক পয়সা। কখনও দাম ধরেই না।

বেন্দার দোকানে বসে পাকা বলে, সত্য হোক মিথ্যা হোক লোকের কী ? আপনারা বড়ো হয়েছেন, যখন খুশি যেখানে খুশি যাবেন, যা খুশি করবেন। অন্য কারোর ক্ষতি তো করছেন না !

এবার অমিতাভও একটু হাসে।

পাকা বলে যায়, লোকের পছন্দ না হয়, নিন্দে করুক, নিজেরা নিজেরা নিন্দে করুক আর ঘরের ভাত বেশি করে খাক। সামনে কিছু বলতে এলে গাঁট্টা মেরে ঠান্ডা করে দেব। আপনি নিন্দাকে ভয় করলেন, তাই ভীরুর মতো ছোঁড়াগুলোব যা-তা কথা শুনেও চুপ করে থাকতে হল।

কে জানে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

যে রেটে কুৎসা ছড়িয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। মহাসমারোহে প্রচার চলছে অমিতাভ ও প্রতিমার নামে ফেনানো বানানো কাহিনির। সত্যই প্রচার, কারণ এই সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে অমিতাভদের সকলকে —ওরা এই রকমই, ওরা করবে দেশোদ্ধার !

অমিতাভ খারাপ এবং সে একটা দলের ছেলে। সুতরাং দলের সকলেই তার মতো খারাপ !

চা খেয়ে তারা উঠতে যাবে, সর্বাঙ্গে মটকার চাদর জড়িয়ে কালীনাথও চা খেতে দোকানে ঢোকে। তারা ওঠে না। দোকানে বাঁশের বাতার বেঞ্চ। কালীনাথ সামনে মুখোমুখি বসে বলে, চা আর টোস্ট দিয়ো।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কেটে যায়।

কালীনাথ সখেদে নিশ্বাস ফেলে। অমিতাভের বোমাব বারুদের ফরমুলা নিজেব হাতে ঘেঁটে দেখতে গিয়ে হঠাৎ বারুদ জ্বলে উঠে বাঁ হাতটা তার ঝলসে গেছে। যন্ত্রণার ছাপ তার মুখে ছিল না, এখন আপশোশ ও তিরস্কারে ভাব মুখের চেহারা বদলে যায়। কথা সে কম বলে চিরকাল, আজই বোধ হয় প্রথম অমিতাভ তার মুখে এত কথা একসঙ্গে শোনে।

অমিত, এই জন্যই মেয়েদেব বাদ দিয়েছি, মেলামেশা সম্পর্কে কড়া নিয়ম করেছি, এ সব ঘটে বলেই। আমি জানি এ জন্য বরাবর তোমাব মনে ক্ষোভ ছিল, প্রতিবাদ ছিল। মেয়েরা কি মানুষ নয় ? আসল কথাটাই তোমরা বুঝতে পারনি, বুঝবার চেষ্টাও করনি। সহজ কথা তোমরা সহজভাবে নিতে পার না, ঘুরিয়ে জটিল করে তোল।

ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে অমিতাভ। দোষ তার ? সে-ই তবে দোষী ?

কালীনাথ বলে, বাদ দেওয়া হয়েছে কি মেয়েরা মন্দ বলে ? মানুষ নয় বলে ? এ কথা কেন তোমাদের মনে হয় ! কেন মনে হয় না, আমাদের কাজে মেয়েদের দরকার নেই, ওদের আনলে গোলমাল হয়, শুধু এই জন্যেই ওদের দূরে রাখা হয়। যার যা কাজ, সে কাজ তাকে দিলে ভালোভাবে সে তা করবে। অন্যে পারবে না। আমার মা মেয়ে ছিলেন, জীবনে এক পয়সা রোজগার করেননি, বাবার রোজগারের পয়সায় সংসার চালিয়েছেন, ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন। বাবার কাজ মা করেননি বলে কি তিনি ছোটো ছিলেন, তুচ্ছ ছিলেন ?

মায়েরা কিন্তু একটু ছোটো হয়েই থাকেন কালীদা। বাপেদের অধীন হয়েই থাকেন।

কী বলতে চাচ্ছ ?

বলছি, কিছু রোজগার করতে দিলে মায়েরাও একটু উঁচুস্তরের মানুষ হতে পারতেন। মা হিসেবে যেমন হোন, মানুষ হিসেবে মায়েরা তেমন কিছু নন কালীদা।

একটু উত্তেজনা এসেছিল কালীনাথের, হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে যায়। মৃদুস্বরে বলে, তোমার মনটা এমন বাঁকা কেন অমিত ? ও কথা তো আসে না, আমি তো তা বলিনি। সমাজ-ব্যবস্থায় কী দোষত্রুটি আছে তাই নিয়ে কি তর্ক আমাদের ? আমার কথার মানে কি এই যে, সব বিষয়ে মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার পাওয়া উচিত নয়, তারা অন্দরে থাকবে, রোজগার করবে না ? এ ভাবে ধরলে সব গুলিয়ে যাবে অমিত। মেয়েদের কী হওয়া উচিত আমরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসিনি, আমরা নারীমুক্তি আন্দোলন করছি না, সমাজ-সংস্কারের কাজে নামিনি। আমাদেব উদ্দেশ্য ইংরেজকে মেরে

তাড়ানো, দেশটাকে স্বাধীন করা। আমাদের একমাত্র বিবেচ্য এ কাজে মেয়েদের নেওয়া যায় কি না ! আমরা দেখছি কাজটা মেয়েদের শুধু অনুপযুক্ত নয়, ওদের সংস্রবে এলে পর্যন্ত হাঙ্গামা হয়, কাজ পণ্ড হতে বসে।

কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে আসে কালীনাথের, একটু থেমে আবার সে বলে, অন্যরকম সমাজ হলে, মেয়েদের অবস্থা অন্যরকম হলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক অন্যরকম হলে কী করা হত, সে কথা আলাদা। ভবিষ্যতের তাকে তুলে রেখে দেবার কাজ আমাদের নয়, আমাদের কাজ বর্তমানে। মেয়েদের কথা ভেবে চোখের জলে বোমা বারুদ ভেজাবার সময় আমাদের নেই। যারা কাব্য করে ওটা তারাই করুক।

অমিতাভ বলে, প্রতিমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াই করে এসেছিলাম কালীদা।

কালীনাথের কথার ধারে আহত হয় অমিতাভ। একটু আশ্চর্যও বোধ করে সেই সঙ্গে। মেয়েদের সম্পর্কে বিধিনিষেধের আসল কারণ তার জানা ছিল অন্য, সাধকের দেহমনে ব্রহ্মচর্য পালনের পুরানো সংস্কার, নারীকে নরকের দ্বার মনে করে চলার জের। এ রকম সোজাসুজি বাস্তব একটা হিসাবও যে আছে কালীনাথের সেটা অমিতাভের ধারণা ছিল না। হিসাবটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আজ কোনোমতেই নয়। একদিন অসময়ে একটি ছেলে আর মেয়েকে পথ চলতে চলতে ভাঙ্গা পুলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল শুনে অশ্লীলতার তুলো ভানছে শহরের জিভ। দেশের জন্য ছেলেটির প্রাণ দেবার আর কি বিশেষ কোনো মূল্য থাকবে লোকের কাছে ? কেউ কি উদ্‌বুদ্ধ হবে ?

কালীনাথ বলে, এখনও উপায় আছে, এখনও সামলানো যায়।

কী করে ? সাগ্রহে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

এই মুহূর্ত থেকে শক্ত হও সমস্ত যোগাযোগ ছেড়ে দাও পিতুর সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে যাবে। একটিবারও যদি তোমাদের কাছাকাছি না দেখা যায়। আস্তে আস্তে গুজব ঝিমিয়ে পড়বে, মরে যাবে।

যাবে কি ? কে জানে !

কালীনাথ প্রতিমার দূর সম্পর্কের মামা। অথচ প্রতিমার দিকটা সে ভাবছে না।

পিতুর দিক ?

ভাবনা তো ওকে নিয়েই। এ কেলেঙ্কারি ভুলবে না কেউ। আমার বেলা হয়তো উদারভাবে তুচ্ছ করে দেবে, কিন্তু পিতুকে রেহাই দেবে না। সবার কাছে ওর পরিচয় কি হবে জানো কালীদা ? আমি শাঁসটুকু চেঁছে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দিয়েছি। এখন সবটা রসালো মজার ব্যাপার, সবাই বিয়ের দিন গুনছে, যেই আমি ছিটকে সরে যাব—

তবে বিয়ে করো।

কী করে করব ? বিয়ে করে সংসারী হবার জন্য—

গলা বুজে যায় তার কালীনাথের ভেসলিন-মাখা ঝলসানো হাতের দিক চেয়ে। এ দুর্ঘটনার জন্যও হয়তো সে দায়ি। নানা চিন্তায় অন্যমনা থেকে কি এ সব ঠিকমতো হয় ?

ব্যাকুল হয়ো না অমিত, কালীনাথ ভেবেচিন্তে বলে, আমি পিতুর সঙ্গে কথা কয়ে দেখি। ব্যাপারটা সে কী ভাবে নিয়েছে জানা দরকার।

না কালীদা, তুমি এ ব্যাপারে হাত দিয়ো না।

কালীনাথ আশ্চর্য হয়ে যায়।—কেন ?

এটা অন্যের কাজ নয়। যা ঠিক করার আমরাই করব।

কালীনাথ গম্ভীর হয়ে যায়। যে কাঠিন্য ফুটে ওঠে তার মুখে তার সঙ্গে অমিতের পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

সতেরোই কিন্তু বাতিল হবে না অমিত। তুমি সরে গেলেও নয়।

সরে যাব কেন ?

দরকাব হতে পাবে না ? তোমরা কী ঠিক করবে আমি জানি না, কিন্তু যদি ঠিক কর পিতুর সুনাম বাঁচানো তোমার কর্তব্য, সতেরো তারিখের রিস্ক নেবে কি করে ? কত কী ঘটতে পারে, তুমি সবে যেতে পার, জেলে যেতে পার পাঁচ-দশবছরেব জন্যে।

ভুলিনি কালীদা।

আজ বারো তারিখ।

তাও মনে আছে।

সরকারি ভান্ডার লুঠের পরিকল্পনা অনেক দিন পিছিয়ে দিতে হয়েছিল নারায়ণের একগুঁয়েমির জন্য, নলিনী দারোগার বউয়ের সামান্য কিছু গয়না নাটকীয়ভাবে কেড়ে নেবার জিদ বজায় রাখায়। নলিনীও বহাল তবিয়তে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে। নারায়ণের অনুমান সফল হয়নি, বউয়ের গয়না ডাকাতি হবার রাগে দিশেহারা হয়ে চারিদিকে অনাচার অত্যাচার চরমে তুলে মানুষের ছড়ানো ঘৃণা স্পষ্ট পুঞ্জীভূত করে তুলবার আয়োজন শুরু হয়েই থেমে গিয়েছিল। রায় বাহাদুর এসে শুধু সরকারি তাণ্ডব নয়, নলিনীকেও শান্ত করে দিয়েছিল। নলিনী ছুটি চেয়েছিল তিন মাস, ছুটি পায়নি। বদলি হতে চেয়েছিল, বদলি হয়নি। কড়া ধমক আর ঝাড়া দু ঘণ্টা উপদেশ শুনে ধীর শান্তভাবে দৈনন্দিন কাজ শুরু করেছিল।

এদিকে টাকা ছাড়া কাজ চলে না কালীনাথদের, কিছু কবা যায় না—সংগঠন, অস্ত্রসংগ্রহ, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ, আঘাত হানার কার্যকর পরিকল্পনা। নারায়ণের সঙ্গে মিলেমিশে সরকারি টাকা লুটের ব্যবস্থা করার চেষ্টা আর একবার হয়েছিল, ফল হয়নি। একটা নিষ্ঠুর সত্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে এই চেষ্টার মধ্যে। দুটি বিপ্লবী দল, তাদের আদর্শ এক, উদ্দেশ্য এক, পণ এক, কর্মপন্থা এক, কিন্তু দুটি দলের মধ্যে মিলন হওয়া প্রায় অসম্ভব। দেশের মুক্তির জন্য তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু একসঙ্গে দেবে না।

আট

১

নাই-বা দিল একসঙ্গে প্রাণ ? প্রাণ দেওযাটাই আসল কথা।

প্রতিমা মৃদুস্বরে বলে।

বলে অমিতাভকে, সে বোঝাপড়া করতে এলে, তাকে চা আর পাঁপড় দিয়ে। এমনই অভ্যাস হয়েছে তাদের, প্রতিমারও। আলোচনা তাদের দুজনের ব্যক্তিগত, প্রণয়গত ও আদর্শগত সাংঘাতিক পরিস্থিতি নিয়ে, কিন্তু কথা শুরু হয় প্রাণোৎসর্গের মধ্যেও অনৈক্যের সমস্যা নিয়ে। গুপ্তকথা বাদ দিয়ে সাধারণভাবে প্রতিমাকে অনেক কথা শুনিয়ে এসেছে অমিতাভ। শোনার আগ্রহ প্রতিমার দিন দিন বাড়ছিল।

তবে, আজ অবশ্য অমিতাভ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে দিল সমস্যাটা, তার ও প্রতিমার সমস্যাটা, আগাগোড়া খোলাখুলি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়ে। তা আসলে তার প্রাণটাকে পণ করাটাই

তো আসল সমস্যা। নইলে আর ভাবনা কী ছিল। তাপ কিছু কম নয়, পুড়িয়ে দিচ্ছে দুজনকেই। ব্যবহারিক, পারিবারিক বা সামাজিক প্রতিবন্ধক কিছু নেই, উদ্যত ব্যগ্র আশীর্বাদ।— বর্তমানে উদ্‌বিগ্ন, সন্ত্রস্ত।

ইতিমধ্যে আরও টের পাওয়া গেছে প্রতিমার দুর্নামের বহর। শহরে যেন একটা অবৈধ প্রেম বিরোধী আন্দোলনই শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়ের সঙ্গে, ঘরে বাইরে পথে ঘাটে জিহ্বায় ছি ছি উচ্চারণ, আপশোশ আর নোংরা টিটকারি। এ শহরেরর সুপবিত্র ভদ্রসমাজের ইতিহাসে আর যেন ঘটেনি বিয়ের বয়সি সোমথ ছেলেমেয়ের কেলেঙ্কারি। এই প্রথম ঘটল সৃষ্টিতে অনাছিষ্টির মতো চলতি জীবনে বিপ্লবের মতো, সমাজ সংস্কার ধ্বংস করে পৃথিবী ওলট পালট করে দেবার মতো ভীষণ কাণ্ড। বোঝা যায়, প্রচণ্ড প্রচার চলেছে, প্রচুর অধ্যবসায়ের সঙ্গে, পেছনে আছে সংঘবদ্ধ জ্বালা আর দুরভিসন্ধি। প্রচার খুব স্পষ্ট –অমিতাভের মতে ছেলেগুলির নাকি এই ব্যাবসা। তাদের স্বদেশি করার মানে এই। ভদ্রঘরের মেয়ে বাগিয়ে নষ্ট করা। প্রতিবেশী মায়েরা এসে চৌকাঠের এপাশ থেকে প্রতিমার মাকে বলে গেছে বলিনি তোমায় আমরা, বলিনি ? এখন সামলাও। বাপেরা বলেছে প্রতিমার বাবাকে, বাপ হয়ে স্বদেশি ছোঁড়াকে মেয়ে ঘুষ দিয়ে স্বদেশি করা, ইলেকশনে ভোট বাগানো ? পথে-ঘাটে খেলার মাঠে ক্লাব লাইব্রেরি-দাওয়ায় বৈঠকে জগতের এই কুৎসিততম বীভৎসতম কাণ্ডের রসালো বর্ণনাযুক্ত ছাপা হ্যান্ডবিল নিয়ে হাসাহাসির সীমা নেই।

হাঁ, ছাপা হ্যান্ডবিল বেরিয়ে গেছে। রাতারাতি বাড়ির সামনে দেয়ালে ও দুয়োরে আঠা দিয়ে আঁটা হয়ে গেছে, বাড়ির প্রত্যেকের নামে লেখা খামে এসেছে বিনা মাশুলে। প্রতিমার নামের খামের কাগজটির উলটো পিঠে আবার একটি কালি দিয়ে ছবি আঁকা। ছবিটা ঝানু আর্টিস্টের সন্দেহ নেই, প্রতিমা আর অমিতাভের মুখ কার্টুনের মুখের মতো কয়েকটা আঁচড়ে স্পষ্ট। বাকিটা চরম গা ঘিন ঘিন করিয়ে ছাড়ে দেখা মাত্র।

আমারও সবাই ভালো।— প্রতিমা বলে অমিতাভের গুছিয়ে বলার চেষ্টার শুরুতেই। আলোচনাও তাই আপনা থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে আসল কথায়।

জানলার শিকে বাঁধা রঙিন পাড়ের টুকরোটা বাতাসে উড়ে উড়ে আছড়ে পড়ে। একটু জোরেই বইছে বাতাস। চোখের জলের বালাই মিটিয়ে দিয়ে অসহ্য প্রতিবাদ যেন লালচে হয়ে গেছে প্রতিমার চোখ, বন্ধ হয়েছে পলক পড়া। নাকের ডগায় বড়ো ঘামাচির মতো ছোটো ব্রণটি টুকটুকে হয়ে পেকেছে। সমস্ত পাংশু মুখে যেন জ্বালাই লেপা আছে, শুধু ওই ব্রণটুকু তার ব্যথার প্রতীক।

আমি চারিদিক বিবেচনা করেছি পিতু, সব কথা।

তাড়াতাড়িতে বলে অমিত।

করেছ ?

সে কথাই বলছিলাম তোমাকে-

জেঠিমা আচমকা ঘরে আসে, প্রতিমার জেঠিমাই সংসারের কর্ত্রী। রোগা ফরসা শুদ্ধ মূর্তি, চ্যাতালো মুখখানায় ভদ্রঘরের গৃহিণীপনায় প্রৌঢ়া হবার ভ্রান্ত বিষাদের সৌম্যতা, কপালে ডগডগে লাল সিঁদুরের মস্ত ফোঁটা, চুল ওঠা সিঁথিতে কিন্তু সিঁদুর প্রায় নেই। সিঁদুর লেগে চুল ঝরে যায়— কার কাছে এ কথা শোনার পর থেকে সিঁথির সিঁদুর কপালের ফোঁটায় নামিয়ে জেঠিমা চুলকে রেহাই দিয়েছে। ঘরে ঢুকে সে দেখতে পায় মেয়ে তার তাকিয়ে আছে জানলার দিকে, টিপয়ে এলানো পিতুর বাঁ হাতের আঙুলগুলি অমিতের থাবার আঙুলে আটকানো। এই হাতে মেলানো হাত স্থগিত করে দেয় তার রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, মুখোমুখি খোলাখুলি প্রচণ্ড আক্রমণে অমিতাভকে ঘায়েল করা।

অমিত যে ! কখন এলে, কেমন আছ বাবা ? ওমা, দুধের কড়া চাপিয়ে এসেছি উনুনে !

হার মেনে নয়, জয়ের আশায় জেঠিমা যেন পালিয়ে গেল তাদের ছেড়ে।

আমি সব ভেবেছি পিতু। চারিদিক বিবেচনা করে আমি শেষ সিদ্ধান্ত করেছি। সব কথা ভেবে চিন্তে–

আমার কথাও ?

জানালার বাইরে জোর বাতাস দোল খাওয়া গাছপালার দিক থেকে এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে লালচে চোখে এমনি কটমট করে তাকায় প্রতিমা পেছনে মাথা হেলিয়ে আঘাত করার উদ্যত ভঙ্গিতে যে মুগ্ধ হয়ে মাথা গুলিয়ে যায় অমিতাভের।

তাই বলে প্রতিমা বেয়াত করে না, ঘা মারে। কী তিক্ত তার গলার আওয়াজ, ওই সুঠাম গলা, ঘাড়ে নামা বাঁকের মাঝামাঝি যেখানে তার একটি আঁচিলের মতো নীল জন্মচিহ্ন।

আমার কথাও তুমিই ভেবেছ ! ভেবে চিন্তে তুমিই ঠিক করেছ আমাকে কী করতে হবে শোনাও হুকুম, শোনাও !

এত বেশি বাড়াবাড়িতে একটু তখন চটে যায় অমিতাভ। হাতে গাঁথা হাত দুটি পড়ে আছে টিপয়ের আশ্রয়ে, অ্যাসট্রেতে নামিয়ে রাখা জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা যে কোনো মুহূর্তে লাগতে পারে তাদের যে কোনো জনের হাতের চামড়ায়। তবু কী আশ্চর্য কথা অমিতের মনে হয় দ্যাখো এই বদ্ধমুষ্টির দিকে চেয়ে। সমান নয়, শক্ত নয়, অনেক ছোট্ট, অনেক কোমল, স্পর্শরূপী লাবণ্যভরা থাবা প্রতিমার। মাখনে গড়া, তবে ভেতরে হাড় আর বাইরে চামড়া দিয়ে ঠেকানো হয়েছে থেবড়ে যাওয়া, গলে যাওয়া।

সে মরিয়া হয়ে বলে, হ্যাঁ, ঠিক করেছি, তুমি কী করবে তাও আমি ঠিক করেছি। হুকুম দিতেই এসেছি। শোনো আমার হুকুম— তুমি যা করতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

তার মানে ?

আমি ঠিক করেছি, তুমি যা বলবে তাই হবে। তোমার কথাই শেষ কথা। তারপর আর কোনো তর্ক নেই, বিচার বিবেচনা নেই।

প্রতিমা ভড়কে গিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু ভাবে।

আমি যদি বলি

তার অসমাপ্ত কথাতেই সায় দেয় অমিত, তাই হবে। আমি ভেবেচিন্তে কি দেখলাম জানো ? আমি এমন একটা মহাপুরুষ নই যে আমাকে ছাড়া বিপ্লব হবে না। বোকার মতো সত্যি তাই আমি এ্যাদ্দিন ভেবেছিলাম পিতু। আমি যদি করি তবেই দেশোদ্ধার হবে নইলে হবে না, আমি বাদ পড়লে কালীদাদের চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে ! আমি অবশ্য চাই

নিজের কথাও অসমাপ্ত থেকে যায় অমিতের।

আমি কী বলব ? কাতরভাবে বলে প্রতিমা।

তুমিই বলবে।

তিনটে বাজে, চা আনি চা খাও।

চা বরং পরে খাব —

চা খাও।

স্টোভ ধরিয়ে চা করে আনতে পনেরো বিশ মিনিট লেগে যায়, সেই অবসরে ধীরে ধীরে শান্ত হয় অমিতাভ, প্রতিমাকে নতুন করে শ্রদ্ধা করার আরও একটা কারণ পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার হিসাবও আসে, সহজ বাস্তব বিচার। প্রতিমা একটা মেয়ে। কালীদা বলে, মেয়েরা বিপ্লব-প্রচেষ্টায় বাধা। প্রতিমা তার বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সাবাড় করেছে। চা করে আনতে গেছে গোছগাছ হয়ে

আসার জন্য সন্দেহ নেই। কি, তার কথাই শেষ কথা, এই চরম ক্ষমতা মেয়ের মতো কীভাবে করুণ কোমল শরম-শালীন অসহায়তার রূপে খাটানো যায় তার কায়দা ঠিক করতে গেছে তাতেই বা সন্দেহ কী!

চিনিকাটা চা করে আনে প্রতিমা। খাওয়া চলে, তবে কিনা মিষ্টিতে স্বাদ গুলিয়ে যায়।

প্রতিমা বলে, শোনো। তুমি যা বললে আমি তাই মানলাম। আমার কথাই শেষ কথা।

অমিত অসহায়ের মতো বলে, নিশ্চয়।

প্রতিমা বলে, আমার কথা এই, তুমি বলো আমবা কী করব। আমি সত্যি বুঝে উঠতে পারছি না কী করা উচিত।

মিষ্টি করে হাসে প্রতিমা তার কাঁদা চোখ আর পাংশু মুখে,—তুমিই বলো।

অমিত বলে, আগে সুপুরি এলাচ কিছু দাও।

আবার অশান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ভেতরটা। কর্তব্য স্থির করার দায়িত্ব ফিরে এল। প্রতিমার রায় বিনা তর্কে মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করে সে আত্মলোপের এক আশ্চর্য শান্তি অনুভব করেছিল। তার যা খুশি করার স্বাধীনতা আছে, সে বেছে নিতে পারে। প্রতিমার সে জোর নেই, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা তবেই খাটে দয়া করে যদি সে তা মেনে নেয়। সে যেচে না এলে তার নাগালও প্রতিমা পেত না। দুর্নাম রটেছে দুজনেরই, কিন্তু ঘায়েল যদি হয় তবে শুধু প্রতিমাই হবে। সতীশ নাগের মেয়ে করুণা বিষ খেয়ে মরেছিল, কতদিন আগে ? তিন বছর হবে ? অমিত ভোলেনি। ভূতনাথের কিছুই হয়নি, রোমাঞ্চকর উপন্যাসের বীর নায়কের মতো ঈর্ষার গোপন পূজাই যেন সে পেয়েছিল। চাকরি নিয়ে বিয়ে করে সে সুখী হয়েছে, সমাজে তার স্থানটুকু সঙ্কুচিত হয়নি। তাই অমিত ভেবেছিল, প্রতিমাকেই শেষ সিদ্ধান্তের অধিকার দেওয়া কর্তব্য। এটা খেয়াল হয়নি, যার জোর নেই তার অধিকার খাটাবার জোরও থাকে না। প্রতিমার পক্ষে সত্যই সম্ভব নয় শেষ কথা বলা।

তবে দেখা যায় ঠিক অতটা অবলা নয় প্রতিমা। তাদের সারা জীবন সম্পর্কে শেষ কথা বলতে না পারুক, আজকের শেষ কথাটা সে বলতে পারে।

বলে, আজ থাক। আজ আমরা কিছু ঠিক করব না অমিত। তুমিও না, আমিও না।

বেরোতে পাব বাড়ি থেকে ? অমিত প্রশ্ন করে,—মা, জেঠিমা, সুষমাদি এঁরা শেষ জবাব না শুনে ছাড়বেন ?

প্রতিমা ভেবে-চিন্তে বলে, হাসিখুশি মুখ নিয়ে বেরিয়ে যাও। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে, পিতু জানে, পিতুর কাছে শুনবেন।

তুমি কী বলবে ?

বলবখন।

যাওয়ার আগে অমিত বলে, কালীদা বলছিল ও দুটো নিয়ে যেতে। দরকার আছে।

নিরাপদে রাখার জন্য দুটি পিস্তল প্রতিমার হেফাজতে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিমার মুখে হাসি ফোটে।—স্যুইসাইড করতে পারি ভয় হচ্ছে ? নিয়ে যাবে নিয়ে যাও কিন্তু তোমাদের রিভলবার দিয়ে স্যুইসাইড করব, অত বোকা ভেবো না। ওর দাম জানি। মরি যদি এমনি মরব, আরও ঢের উপায় আছে, মরব তো তোমাদের রিভলবার দুটো ধরিয়ে দিয়ে শত্রুতা করে মরব কেন ?

তবে এখন থাক।

কতক্ষণ মানুষ মাথা ঘামাতে পারে নিজের ব্যাপাব নিয়ে, যত তা গুরুতর হোক ? এই অস্থায়ী ব্যবস্থায়, বিচার বিবেচনা সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখায়, কী যে স্বস্তি পায় অমিতাভ ! আজ পনেরো

তারিখ, পরশু সতেরো। ওইদিনের পরিকল্পনার সাফল্যের উপর কত কিছু নির্ভর করছে। দলের ভবিষ্যৎ, সংগঠনের দৃঢ়তা, আরও অস্ত্রশস্ত্র, প্রবলতর বিপ্লবী সংগ্রাম, রক্তের বর্ষণে মাটি ভিজিয়ে স্বাধীনতার ফসল গজানো। ভালো কি লাগে এ সব ঝঞ্ঝাট, হৃদয়ের এই ক্ষুদ্রতার বালাই এই একটা মেয়েকে ভালোবাসা, একটা মেয়ের সুনাম দুর্নামের ভাবনায় বিব্রত হওয়া ? হঠাৎ যদি অসুখ হয়ে মরে যেত প্রতিমা—

না, স্যুইসাইডের সে পক্ষপাতী নয়, ওটা ঘৃণ্য কাজ—একমাত্র দলের জন্যে বিপ্লবের প্রয়োজনে ছাড়া। ধরা পড়তে পুলিশের অসহ্য নির্যাতনে, দেহমনে অমানুষিক পীড়নে ভেঙে পড়তে বা উন্মাদ হতে হবে এটা এড়াবার জন্যও সে আত্মনাশ সমর্থন করে না। হোক পীড়ন, চুরমার হয়ে যাক দেহের হাড়, মনের গঠন, ওই পীড়ন দেশে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাবে। তবে অসুখ হয়ে প্রতিমা যদি হঠাৎ মারা যায়, কারও কিছু বলার বা করার থাকে না। পুলিশের গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে মরার আশায় ওই মরণের শোক সে তুচ্ছ করতে পারে।

অন্তত পারে কি না পারে দেখা তো যায়, যখন আর প্রতিবাদ বা প্রতিকারের উপায় থাকে না।

অমিতাভ অনুভব করে, সারা জীবনের আত্মজ্ঞান আর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তার এতদিনে এই প্রথম ওলট-পালট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। বিপ্লবী দলে যোগ দিতে তাকে বদলাতে হয়নি, তারই সঞ্চিত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত আক্রোশ তাকে এদিকে ঠেলে দিয়েছে। বিদ্রোহের পথে, দলের শিক্ষায় বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশায় শুধু কঠোর হয়ে জমাট বেঁধেছে সেই ঘৃণা, দৃঢ় হয়েছে বিশ্বাস, কঠিন হয়েছে পণ। নিজের সঙ্গে বিরোধিতায়, বোঝাপড়ার দরকার হয়নি। আজ প্রথম প্রচণ্ড আত্মবিরোধী লড়ায়ে কেমন যেন নতুন মনে হচ্ছে জীবন আর জগৎ। বাতিল করা স্নেহ-মমতা আশা-কামনা স্বপ্নগুলি যেন যেমন সে ভেবে রেখেছিল তেমন ছিল না কোনোদিন, আজ তাই প্রহরে প্রহরে দিনে দিনে তাকে আশ্চর্য হয়ে যেতে হচ্ছে—নিজের ওই রূপগুলির নতুন নতুন চেহারা দেখে।

মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন, পথে লোক চলাচল কমে গেছে, কাঙালিটোলার গা-ঘেঁষে ছোটো বাজারটা এক রকম বসেনি। শহরের শঙ্কা আর চাপা উত্তেজনার শান্ত রূপ ঝাপটার মতো চোখে লাগে। সোনাতুল্লার একতলা জীর্ণ বাড়ির আলকাতরা মাখানো কালো দরজায় মরচে ধরা তালা আঁটা। মরচে ধরাই ছিল তালাটায়, দরজায় তালা পড়েছে কাল। সোনাতুল্লার সঙ্গে দরকার ছিল অমিতাভের। ওকে খুঁজে বাব করতে হবে মুসলমান মহল্লায়।

২

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল কালীনাথের মুখ। এত কাছে ঘনিয়ে এসেছে নির্দিষ্ট দিন, সতেরোই তারিখ, এখন আবার ভাবতে হচ্ছে সমস্ত পরিকল্পনা স্থগিত করাব কথা। এ যেন ভাগ্যের পরিহাস—যে ভাগ্য তাদের বৈপ্লবিক কাজে বাধার পর বাধা সৃষ্টি করতে কোমর বেঁধে লেগেছে গোড়া থেকে। সতেরোই তারিখের চার-পাঁচটি দিন বাকি—কোন রহস্যময় অন্ধকার থেকে মাথা তুলল এই হিন্দুপ্রধান শহরে হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামার আশঙ্কা। ছোটোখাটো হাঙ্গামা হয়েও গেল দু-একটা। একগাদা বাড়তি পুলিশ এসেছে, একশো চুয়াল্লিশ টাইট হয়েছে, থমথম করছে শহর। সাধারণ বিশৃঙ্খলায় খুশি হত কালীনাথেরা, অন্যদিকে নজর থাকত সরকারের পুলিশের, কিন্তু এই অসাধারণ অবস্থার জন্য স্বাভাবিক ঢিলেমি ঝেড়ে ফেলে ম্যাজিস্ট্রেট থেকে লাঠিধারী কনস্টেবল পর্যন্ত সবাই সতর্ক, সজাগ—একদল সশস্ত্র পুলিশও এসে ভিড় করেছে শহরে। নারায়ণের কাণ্ডের

ফলে যা হয়েছিল প্রায় সেই অবস্থা, শুধু সরকারের এই সজাগ দৃষ্টি তাদের দিকে নয়। কী উদ্ভট, অসঙ্গত, অর্থহীন এই হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ! এই সেদিন দেশের মুক্তি আন্দোলনে এই শহরের হিন্দু-মুসলমান কোলাকুলি করেছে, হিন্দু জল খেয়েছে মুসলমানের হাতে, মুসলমান বলেছে বাজাতে চাইলে বাজাও বাজনা মসজিদের সামনে, তুমি আমার ভাই।—কটা বছর কেটেছে তারপর ? এ তো মোটে ছাব্বিশ সাল !

কালীনাথের সতেরোই তারিখটির একটা ইতিহাস ও তাৎপর্য আছে, শুধুই ডাকাতির পরিকল্পনা নয়।

আঠারোই লিটনের মৃত্যুতিথি, যার পুণ্য অথবা অন্যরূপ স্মৃতিতে শহরের একাংশ লিটন টাউন নামে খ্যাত। লিটন নিহত হয় এক ছেলেমানুষের কাঁচা অপটু হাতের হোমমেড জবরজং অস্ত্রে। মসার বা রডা পিস্তলের গুলিতে নয়, চলনসই রকম বোমাতেও নয়, কলোরাপটাশ অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরেট আর মোমঝাল মিশিয়ে কালীপূজার রাত্রে ফাটাবার যে পটকা বানাবার বারুদ ছোটো ছেলেরাও তৈরি করতে জানে, সেই বারুদে তৈরি দু সের আড়াই সের ওজনের দেশি বোমায়। সবু পাটের দড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ানো বস্তুটি দেখে কারও কল্পনা করার সাধ্য ছিল না সেটা বোমা হওয়া সম্ভব, জগতে যখন ডিম্বাকৃতি ছোটো কালো প্রচণ্ড বোমাব আবিষ্কারও পুরানো হয়ে গেছে।

দুটি দিন নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করে লিটন মরেছিল। তার হত্যাকারী ছোকরাটিও অবশ্য ওই বোমাতেই আহত হয়ে জেল-হাসপাতালে অনেক দিন ছটফটিয়ে বেঁচে উঠে তারপর ফাঁসি গেছে। কিন্তু অত অল্পে কী শোধ হয় লিটন সাহেবের মৃত্যুঋণ ! ধরপাকড়, জেল, বিনা বিচারে আটক, নির্যাতন, এ সবেও নয়। সেই কর্তব্যপরায়ণ ভারত-প্রেমিক ম্যাজিস্ট্রেটের স্মৃতিকে সম্মান দেখাতে হয়েছে কালো শহরবাসীদের।

শহরের সেরা আধুনিক অংশকে লিটনের চিরস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত করে পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট ব্যান্ডেল সন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কার্লটনের মন ভরেনি। বিশেষত সারা দেশে, আর এই শহরে যখন আবার গোপন ষড়যন্ত্র ভয়ানকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে অসহ্য স্পর্ধায়। শহরের লোক তো লজ্জা দুঃখ ভয়ে কাতর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষার তাগিদে স্বেচ্ছায় লিটন টাউনের নামকরণ করেনি, ও নাম চালু হয়েছে ব্যান্ডেলের প্রীতিপূর্ণ কঠোর বেসরকারি এবং স্বীকৃত সরকারি ভাষারই ঘোষণাতে। ও রকম সরকারি ভাবে নয়, বেসরকারি দেশি ভাবে দেশি লোকের উদ্যোগে দেশি লোকের চাঁদায় লিটনের জমকালো স্মৃতিরক্ষার জিদ কার্লটনের। শহরবাসীর অনুতাপের, প্রায়শ্চিত্তের, রাজদ্রোহীদের প্রতি তিরস্কারের রূপধরা প্রতীকের মতো সে স্মৃতিসৌধ চিরদিন শহরের বুকে বিরাজ করবে।

তাই, লিটন মেমোরিয়াল ফান্ডের যে কমিটি তা খাঁটি বেসরকারি, প্রেসিডেন্ট থেকে সভ্যেরা সকলে নেটিভ, বেসরকারি নেটিভ। কার্লটন নিজে সাধারণ সভ্য পর্যন্ত নয় সে কমিটির। তবে দুঃখের বিষয় কোনো দেশি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যেচে এক পয়সা চাঁদা দেয়নি ফান্ডে, ত্রিশ হাজার টাকা যে উঠেছে তার প্রত্যেকটি পাই কার্লটনের খাতিরে দেওয়া। কার্লটন তা জানে, জেনে সে অসুখী নয়। এও তো জয়, এও তো প্রতিপত্তি, এও তো মর্যাদা।

প্রথমে ডেকেছিল ভৈরবকে, সে প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হয়নি। আগামী নির্বাচনের অজুহাত তুলে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিয়ে সরে গিয়েছিল। রাজি হয়েছিল ভুবন, ভৈরবের রায়বাহাদুরত্ব তার মাথা হেঁট করে রেখেছে অনেকদিন, আগামী বছর সেও রায়বাহাদুর হবে। কার্লটনও চেয়েছিল এ রকম লোক, কমিটির সভ্যের তালিকাও তৈরি করেছিল সে, কার্লটন বললে ভুবন কমিটির মিটিং ডাকে, কার্লটন যে প্রস্তাব আর পরিকল্পনা দেয় তা পাশ করিয়ে দেয়, কার্লটনের সঙ্গে পরামর্শ করে চাঁদার জন্য বাছা লোককে সময় মতো সুযোগ মতো ধরে, কাজ এগিয়ে নেয়—কার্লটন কোনোদিন কমিটি মিটিংয়ে

উপস্থিত হয়নি বা ভুবন ছাড়া কোনো সভ্যের সঙ্গে ফান্ড সম্পর্কে আলাপ করেনি। ম্যাজিস্ট্রেট কার্লটন নয়, শহরের এই বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভদ্রলোক কজন লিটনের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করছেন।

আঠারোই লিটনের মৃত্যুতিথিতে, সকালে সাধারণ সভা ডেকে লিটন মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি পত্তনের অনুষ্ঠান পালন করা হবে। ত্রিশ হাজার একাশি টাকা যে চাঁদা উঠেছে ফান্ডে, সেই টাকা থরে থরে সাজানো থাকবে সভাপতির সামনে টেবিলের ওপর সকলের দর্শনীয় হয়ে। এটাও কার্লটনের আইডিয়া। টাকার অঙ্কটা সভায় ঘোষণা করলেই চলবে—ভুবনের এ প্রস্তাবে সে আপত্তি করেছে। সবটাই লোক দেখানো ব্যাপার, বাইরের ভুয়ো নাটকের ভুয়ো অভিনয়, দেশি লোকের কমিটি থেকে শুরু করে চাঁদা তোলা পর্যন্ত লিটনের স্বদেশি স্মৃতি-তর্পণের আগাগোড়া সমস্ত আয়োজনটাই, কার্লটনের তাই বোধ হয় স্তূপাকার টাকা দেখিয়ে নেটিভদের তাক লাগাবার শখ হয়েছে।

কার্লটন এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারিরা সভায় যাবে কর্তা হিসাবে নয়, অতিথি হিসাবে। এও অসাধারণ ঘটনা, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত থাকতে সভায় প্রিজাইড করবে সাধারণ বেসরকারি লোক।

শুধুই কি নৈতিক প্রতিশোধ চায় কার্লটন, প্রকাশ্য ঘোষণা চায় যে টেররিস্টরা যাকে হত্যা করে, দেশের লোক তাকে দেয় শ্রদ্ধা সমবেদনার পূজা ? তাই তার এত উদ্যোগ আয়োজন, শুধু এই কারণে ? টেররিস্ট দমনের আন্তরিক উগ্র প্রতিজ্ঞা তো তার আছে, এদিকে তার সক্রিয় উৎসাহ আর কার্যকর পরামর্শ বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে সর্বোচ্চ স্তরে, এও কি তার সেই মনোবাসনারই অঙ্গ ? কার্লটন নিজেও বোধ হয় তা জানে না। তার ছাঁচে ঢালা অসীম আত্মসন্তুষ্টিতে পরিপুষ্ট মন এ ধরনের আত্মচিন্তায় নিজেকে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টা করতেও জানে না। মাঝে মাঝে সে শুধু ভাবে ভবিষ্যতের কথা। উঁচুতে উঠিয়ে কলকাতায় তাকে নিয়ে যাবে গবর্নমেন্ট, স্থায়ীভাবে নিয়ে যাবে, মফস্বলে জীবনের অভাবের জন্য তাকে ছেড়ে একা কলকাতায় বাস করার কষ্ট আর মার্জোরির করতে হবে না। তার কলকাতার বাড়িতে তার ঘরে তার শয্যায় তার সঙ্গে মার্জোরির রাত কাটবে। উচ্চপদ ! খুশি মার্জোরি ! ব্রিটেনকে সে ভালোবাসে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য সে প্রাণ দিতে পারে। সেটা জানা কথাই।

সতেরোই মেমোরিয়াল ফান্ডের টাকাটা ভুবন বাড়িতে এনে রাখবে, টাকাটা দরকার হবে পরদিন সকাল আটটায়। এই টাকাটা রাতারাতি লুট করার ইচ্ছা কালীনাথদের। টাকার দরকার তো তাদের আছেই, এমন ডাকাতি করার উপযুক্ত টাকা আর কোথায় পাবে ! কার্লটনকে জানিয়ে দেওয়া হবে অত্যাচারী বিদেশি হাকিমের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিবাদও করে দেশের লোক।

ভুবনেরও হয়তো চৈতন্য হবে আশা করা যায়। দেশের লোকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় এতটা উৎসাহ হয়তো ভবিষ্যতে সে দেখাবে না।

সতেরোই তারিখ পিছিয়ে দেবার প্রশ্ন তাই নেই, ওই দিনই হয় ভুবনের বাড়ি চড়াও হবে, না হয় বাতিল করবে সমস্ত পরিকল্পনা আর আয়োজন।

সতেরোই তারিখ কি আবার পেছিয়ে দিতে হবে ? নেতাদের মধ্যে কথাটা উঠেছিল বেশ জোরের সঙ্গেই। সে এক স্মরণীয় বিতর্ক গোপন বৈঠকের পাঁচজনের পক্ষে, গভীরভাবে আত্মবোধ নাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতার মতোই বহুদিন চারজনের মনের মধ্যে গাঁথা হয়েছিল। বেঁচে থাকলে পঞ্চম জনেরও মনের ভবিষ্যৎ আলোড়নে সেদিনের ওঠা ঢেউয়ের রেশ থেকে যেত সন্দেহ নেই। পনেরোই বিকালে কলকাতা থেকে সেজদা আসে, অমিতাভ তখন প্রতিমার কাছে। এ বছর বীরেন সেনের এ শহরে আসা এই প্রথম, দলের অনেক তরুণ সভ্যই সাক্ষাৎভাবে তাকে চেনে না। সেজদা বিদেশে গিয়েছিল জার্মানি ঘুরে আসবার চেষ্টায়, সম্ভব হলে বিপ্লবোত্তর অজানা অদ্ভুত রহস্যময় রাশিয়ায়। ইংল্যান্ডে পা দেওয়া মাত্র তার পাসপোর্টটি পরীক্ষা ও ভুল সংশোধনের ছুতোয় রহস্যভাবে

তলিয়ে গেল সরকারি দপ্তরে, এমন সব গুরুতর আর মারাত্মক সে সব ভুল যে ইন্ডিয়ার দপ্তরের সঙ্গে লেখালেখি করে সংশোধন করতে দুমাস কেটে গেল। তারপর মিলল শুধু সোজা দেশে ফেরার ছাড়পত্র। নির্দোষ কৃষিবিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাভের যে প্রকাশ্য ছুতো নিয়ে সে বেরিয়েছিল সেটা কিঞ্চিৎ জুটল আর লাভের মধ্যে হল কয়েকজন বিশেষ লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় পশ্চিমের গোপন সাহায্য সহযোগিতা-সহানুভূতির চেয়ে বাস্তবরূপে পাওয়া সম্ভব হবার আশা। সেটাও কম কী।

প্রতিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অমীমাংসিত সমস্যার ভারে বিব্রত বিচলিত অমিতাভকে এক রকম সটান আসতে হল বৈঠকে, খবর সে পেল পথেই।

কীভাবে কেন নাড়া খেল সমাজ ধর্মবিশ্বাস সংস্কারের চেতনা, অতীত ভবিষ্যতে সুদূরপ্রসারী সমস্যার ছায়াপাত ঘটল তারিখ পিছিয়ে দেবার তর্কে, তখন চিন্তা করার অবসর ছিল না। জীবনের বিচিত্র বিরাট আশ্রয়-ভিত্তির বিনাশ বিকাশ রূপান্তর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যাকুল জিজ্ঞাসু হৃদয়মন আজও মানে খুঁজে খুঁজে চলেছে যে ভাবসংঘাতের, অন্য আলোচনা-প্রসঙ্গে তারই প্রায় অচেতন ভূমিকা অভিনয় করে গেল বিপ্লবী পাঁচজন মানুষ। দুজনের মত হল তারিখ পিছিয়ে দেওয়া। কেন ? না, এত যখন দেরি হয়ে গেছেই, আরও কিছুদিন দেরি হোক। শহরের এই অবস্থায় অ্যাকশন স্থগিত করাই উচিত। এই কোথাও কিছু নেই হঠাৎ খাপছাড়া ব্যাপার ঘটে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে অ্যাকশনে, এর মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে, ঘটনাচক্রের পিছনের দুর্বোধ্য কোনো শক্তির নির্দেশ আছে। তাদের সাবধান করে দেবার জন্যই হয়তো চামড়ার বস্তি পুড়েছে, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি হয়েছে !

ঠিক এমনি করে না বললেও মোটামুটি এই ছিল দুজনের যুক্তি। এদের দুজনেব আগে যোগ ছিল পুরানো দিনের বিপ্লবী দলের সঙ্গে।

কালীনাথের মুখ বিদ্যুৎভরা মেঘের মতো। তার চুপ করে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় সে রাগছে, ভয়ানক রাগছে।

মা কালীর পা ছুঁয়ে বোমা করতে নামিনি মেঘেন। সে যুগ নেই, পার হয়ে এসেছি, জগতে ঢের লোক বিপ্লব করেছে, মাকালী-ফাকালীর নামও তারা শোনেনি।

মানে কি হল ? প্রশ্নটাও ক্রুদ্ধ

জবাবটা হয় কটু।—মা কালীকে সেলাম ঠুকে এক সঙ্গে বোমা-সাধনা আর কুমাবী-সাধনা আজকাল চলে না।

এটা বাড়াবাড়ি কালীনাথের, কুমারী-সাধনার কথাটা। কবে দু-একজন কে বিপ্লবের নামে মেয়ে নিয়ে মজেছিল সেটুকু ভেজাল প্রমাণই করে বিপ্লবীদের কঠোর নিষ্ঠার খাঁটিত্ব। নিয়মভাঙা বাধাহীন উগ্র তপস্যার যাযাবর জীবনে কবে একজন অসাধারণ যোগাযোগের বিহুল রাত্রে আত্মহারা হয়ে প্রমাণ করেছে সেরা বিপ্লবীও বাস্তব মানুষ, আগুনের রাস্তা ছেড়ে ভোগের রাস্তায় নেমে কে অতীত গৌরবের গল্পে মিশিয়েছে প্রেমের কাহিনি, সে অপরাধে বিপ্লবীদের অপবাদ দেওয়া হাস্যকর। কিন্তু ওটাই তো আসল কথা নয় কালীনাথের। তা হলে হয়তো আরও কটু আরও অশ্লীল ভাষাতেই অপবাদ দিত। কুমারী-সাধনা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, তাতে তন্ত্র-মন্ত্র আছে, অধ্যাত্ম জগতের অতল অন্ধকার আর রহস্যের ঐতিহ্যে শব্দটা টোল টোল। বিশ্বাসের যত তফাত থাক, পাঁচজন তারা জীবন-মরণ সমান করা জীবনবাদী। তাই কালীনাথের অন্যায় মন্তব্য নিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কথা কাটাকাটি, ছোটো নোংরা মানে ছেড়ে ওই আসল সংঘাতের দিকেই আলোচনা মোড় নেয়। সকল আদর্শ সকল বিশ্বাসের, জগতের ইতিহাসে সকল অকাতর আত্মদানের যা উৎস তাকে অস্বীকার করে কোন আদর্শ টিকবে, কোন বিশ্বাসের দৃঢ়তা আসবে ?

সুরেন বলে, তাই যদি না হবে তবে একটা কথার জবাব দাও। মুসলমান নেই কেন আমাদের মধ্যে ? কেন তারা আসে না ? বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে শওকতের মতো ছেলে, কেন তার মন বিগড়ে যায়, আমাদের পথ ঠিক নয় বলে কেন সে মাথা ঘামাতে বসে রাশিয়ায় কী হচ্ছে, মার্কস লেনিন কী বলেছে তাই নিয়ে ? ওরা একদিন রাজা ছিল এ দেশে, ওদের গা জ্বালা করে না কেন, ইংরেজ না তাড়িয়ে ঘুমোয় কী করে ?

আপনি উলটোপালটা কথা বলছেন, অমিতাভ বলে, গত আন্দোলনে ওরা যোগ দিয়েছে।

নিরামিষ আন্দোলন ! কান্নাকাটি উপোস করার আন্দোলন ! মেঘেন মুখ বাঁকায়।

এটা তাদের সকলেরই মনের কথা। আন্দোলনটার বিরাটত্বের জন্য কিছুকাল আগে পর্যন্ত মনে যে কিন্তু কিন্তু ভাবটুকু ছিল তাদের, তাও দ্রুত উপে যেতে আরম্ভ করেছে। বরং দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগার জন্য আন্দোলনটার বিরাটত্ব, আন্দোলনের ব্যর্থতা বিবুদ্ধ মনোভাবটাই উগ্র করে তুলেছে।

আমরা ওদের টানবার চেষ্টা করি না বলেই হয়তো ওরা আসেনি। আমরা হিন্দু ছেলেই দলে টানি—আমাদের কে টেনেছিল ? শুধু আমাদেরই কেন মাথা ব্যথা ? আমাদের ধর্মে, আমাদের সভ্যতায় এমন বিশেষ কিছু না যদি থাকবে এতকাল ধরে শুধু আমাদেরই বোমার দল হত না কালীনাথ।

এ সব কথা তলিয়ে কেউ ভাবেনি, বুঝবার চেষ্টা করেনি কোনোদিন। আজ কিনা তাদের সতেরোই তারিখের অনেক কষ্টের আয়োজন বাতিল হয়ে যেতে বসেছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায়, আজ কিনা কথা উঠেছে বিপ্লবীর ধর্ম-বিশ্বাসের, আজ এই ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যটা রূঢ়ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে যে হিন্দু-মুসলমানের এ দেশটার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের দল গড়ছে শুধু হিন্দু ! কল্পনায় আর পরিকল্পনায় আছে অনেক কিছু, দেশের যে যুবশক্তির ব্যাপক বিদ্রোহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ইংরেজের শাসন তার জাত ধর্ম প্রদেশ থাকবে না, স্বাধীনতা আসবে না বিশেষভাবে এর জন্য অথবা ওর জন্য,—কিন্তু আগুন জ্বালাবার ভূমিকা তো শুধু তাদেরই দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হয় ? কী মানে এই অসঙ্গতির ? অস্পষ্ট জিজ্ঞাসার অসীম গুরুত্ব অনুভব করে তাদের হৃদয় উতলা হয়, মনে হয় জীবন দিতে এগিয়েও অনেক কিছু ভাবা হয়নি। জীবন এত বৃহৎ, এমন ব্যাপক আর সামঞ্জস্য-বিরোধিতায় এত বেশি দুর্বোধ্য তার সমগ্র মূর্তি যে তাদের মতো দু-চারশোর দু-চার হাজারের জীবন-পণ ব্রতপালন সেই বিস্তৃতিতে দু-চারটি ঢেউ ছাড়া কিছু নয়।

এ চিন্তা বড়ো ক্লেশকর তাদের পক্ষে। বৃহতের চিন্তা কেন উদ্‌বুদ্ধ করার বদলে হতাশা অবসাদ ঘনিয়ে আনে কে জানে !

মেঘেন যেন সুযোগ বুঝেই গোড়ার কথায় ফিরে আসে, মা কালীকে অত তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়ো না কালীনাথ। সবই বুঝি, তবু সোজা কথাটা কী জানো, এমনই কথায় কথায় একটা প্রতিজ্ঞা করায় আর গভীর রাত্রে নির্জন মন্দির ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করায় তফাত আছে। মানুষ তো আমরা।

বীরেন বলে, থাকগে ও সব কথা, কাজের কথায় এসো। যা বুঝি না সে সব ইঙ্গিত সংকেত নয়, মুশকিলটা কী, সব বানচাল হবে কিনা হিসাব করে দেখা যাক।

আমার হিসাব করা আছে। কালীনাথ বলে

তার হিসাবে, অসুবিধা যা দাঁড়াচ্ছে তা আর কিছু নয়, টাইম ফাক্টরের অসুবিধা, শহরে অফিসার ও সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা বেড়েছে, পুলিশ অনেক বেশি সতর্ক, খবর পেলেই ছুটে যাবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত। সাধারণ অবস্থায় ভুবনের বাড়িতে মাঝরাতে হানা দিতেই চারিদিকে সোরগোল উঠলেও, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিতে লোক ছুটে গেলেও, টাকাটা বাগিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার যথেষ্ট সময় তারা পেত। এখন তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি পুলিশ এসে পড়বে। সৈদবাজারের মোড়ে যে আর্মড পুলিশের ঘাঁটি পড়েছে সমাদ্দারদের বাইরের দালানে, সেখানে আজ

মোট এগারোজন পুলিশ আছে খবর জেনেছে কালীনাথ, সতেরোই তারিখেও সম্ভবত মোটামুটি তাই থাকবে, ওই ঘাঁটিটাই সবচেয়ে কাছে ভুবনের বাড়ির। তবে হইচই হলেই শব্দ শুনে ছুটে আসবার মতো কাছে নয়। তাদের বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ আর সোরগোলের অল্প যে আওয়াজ পৌঁছাবে, তাতে বড়ো জোর কান খাড়া করে থাকবে। বিশেষত ভুবনের বাড়ি যেখানে সে এলাকায় কোনো হাঙ্গামা নেই, হাঙ্গামা হবার আশঙ্কাও কেউ করে না। তবে থানার চেয়ে ওদের খবর দেওয়া যাবে আগে, থানার পুলিশের চেয়ে ওরা এসে পড়তে পারবে কম সময়ের মধ্যে।

কাজেই তাদের নতুন সমস্যা শুধু এই যে সময় তারা পাবে কম। তা ছাড়া আর কোনো বিশেষ মুশকিল ঘটেনি। বাড়িতে চড়াও হয়ে যারা টাকাটা লুট করে কাজের শেষে পালাবে তাদের কিংবা টাকাটা নিয়ে যারা শহরের বাইরে সরে পড়বে তাদের পক্ষে শহরেব যেদিকে হাঙ্গামা তাব ধারে কাছেও ঘেঁষতে হবে না। সেদিক দিয়ে কোনো নতুন অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। তবে এরাও সময় পাবে আগের হিসাবের চেয়ে কম। সময়ের সমস্যাটাই গুরুতর।

তবে সে জন্য আটকাবে না, কালীনাথ সাবধানে হিসাব করে দেখছে, শুধু স্পিড তাদের বাড়াতে হবে খানিকটা, আগের পরিকল্পনাকে কঠোর নির্মমভাবে সংশোধন করতে হবে একটু। যেমন, আগে যে ঠিক ছিল একেবারে চরম প্রয়োজন উপস্থিত না হলে কাউকে গুলি করা হবে না, ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখিয়ে বুঝিয়েই কাজ হাসিলের চেষ্টা করা হবে শেষ পর্যন্ত, এ নিয়ম বদলাতে হবে। কেউ বাধা দিলে অসুবিধা সৃষ্টি করলে একবার সাবধান করেই গুলি করা হবে, মেরে ফেলার জন্য অবশ্য নয়, জখম করতে। দারোয়ান জগজীবন সত্যই দুঃসাহসী বেপরোয়া লোক, একনলা বন্দুক নিয়ে সে খুব সম্ভব বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করবে, ওব সঙ্গে সময় নষ্ট করা চলবে না। ভুবনকে বুঝিয়ে বলাব চেষ্টা যে আমরা দেশের জন্য টাকা তুলছি ভুবনবাবু, লিটনের স্মৃতিরক্ষার চেয়ে টাকাটার সদ্‌ব্যয হবে, দরজা দিয়ে লাভ নেই—আমরা দরজা ভাঙব, সিন্দুকের চাবির মায়ায় কেন মরণ ডেকে আনছেন, চাবিটা দিন, এ সব বিস্তারিত মার্জিত ভদ্র পন্থা চলবে না। সংক্ষেপ করতে হবে সব।

পালানোর সময় সংক্ষেপ করার কথাও ভেবেছে কালীনাথ। ঠিক ছিল যে কাজের শেষে পাড়াব বাইরে থেকে গতিবিধি গোপন হয়ে হারিয়ে যাবে লোকের কাছে। কয়েকজন তলিয়ে যাবে শহরেই এদিক ওদিক, একটি ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করবে বিছানাপত্রের বান্ডিল নিয়ে, সেই গাড়িতে কয়েকজন ঠিক বারোটা দশের গাড়িটা ছাড়ার সময় স্টেশনে পৌঁছে সাধারণ যাত্রীর মতো টিকিট কেটে গাড়িতে উঠবে। দুজন টাকার পুঁটলি নিয়ে গেঁয়ো লোকের বেশে অপেক্ষা করবে পলাশপুরের রাস্তায়, শেষ ট্রেনের যাত্রী নিয়ে যে বাস ছাড়বে স্টেশন থেকে সেই বাসে উঠে ঝাউতলাব শালবনের ধারে নিতাইনী গাঁয়ের কাছে নেমে যাবে। এখন এ অবস্থা চলবে না। কাল চুরি হবে শঙ্করের বাবাব ফোর্ড গাড়িটা, শঙ্করের সাহায্যেই হবে। ওটা চেনা গাড়ি তো বটেই, মোটর গাড়ির চলাফেরার শব্দ লোকে শোনে, চেয়ে দেখে এবং মনে রাখে বলে মোটরে চেপে হানা দেবার কথা পুরানো পরিকল্পনায় ছিল না। নতুন অবস্থায় মোটরে চেপেই হানা দিতে হবে। টাকা লুটে নিয়ে মোটরেই পালাতে হবে সকলের, এখানে ওখানে নির্জন নির্দিষ্ট স্থানে একে ওকে নামিয়ে দিতে দিতে, যারা ডুব মারবে শহরের ঘরে ঘরে ছড়ানো জীবনে। টাকা নিয়ে তিনজন মোটরে যাবে ঝাউতলার বন পর্যন্ত, দুজন নেমে যাবে টাকা নিয়ে, একজন মোটর হাঁকিয়ে চলে যাবে রূপসা নদীর তীর পর্যন্ত। সেখানে মোটর গাড়িটি ফেলে রেখে নৌকায় পাড়ি দেবে গোপনতায়।

রাত এগারোটা পর্যন্ত আলোচনা হয়, কালীনাথের পরিকল্পনাই মেনে নেয় সকলে। রাত্রি বারোটা দশের গাড়িতে বীরেন ফিরে যায় কলকাতায়। গায়ে ফতুয়া, কাঁধে চাদর, গলায় কণ্ঠি, হাতে ভাঙা ছাতা, বগলে কাঁথা জড়ানো পুঁটলি দেখে কে ভাবতে পারবে সে অল্পদিন আগে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল, বিলাত-ফেরত লোক।

একটা নিশ্বাস ফেলে কালীনাথ, একবার হাই তোলে। দেহের মনের কী খাটুনি তার যাচ্ছে বোঝা যেন যায় তাকে দেখে, কিন্তু সীমাহীন ধৈর্যের কাছে শ্রান্তি ক্লান্তিও তার হার মেনেছে, বিরক্তি বিতৃষ্ণার ছাপটুকুও নেই তার মুখে।

সে অমিতাভকে প্রশ্ন করে, কী হল ভাই ?

আমি রেডি আছি কালীদা। অমিত শান্ত কণ্ঠে বলে। তারও যেন জীবনের চরম দুর্দশার সমস্যা সরল হয়ে গেছে গত কয়েক ঘণ্টার বৈপ্লবিক আলোচনায়।

কী ঠিক করলে ?

আমি রেডি আছি।

বেশ, সায় দিয়ে বলে কালীনাথ, বেশ তো।

৩

অ্যাকশনের পরিকল্পনায় কালীনাথের ভুল ছিল না, কেবল একটা দিক থেকে সে হিসাব ধরেনি, ধরাটা সম্ভবও ছিল না। শহরে অশান্তি ও আতঙ্ক, এ অবস্থায় হঠাৎ কারও বাড়িতে স্বদেশি ডাকাত পড়লে, পাড়ার লোকের প্রতিক্রিয়া যে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অন্যরকম হতে পারে, তাদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, এটা খেয়ালে আসেনি। বাড়ির সামনে কর্তার দেওয়া মস্ত যাত্রার আসর পর্যন্ত বিনা প্রতিবাদে স্বদেশি ডাকাতদের মেনে নেয়, কর্তার হা-হুতাশ বৃথা যায়, এই তাদের জানা ছিল। প্রথমে কিছু ডাকাডাকি চেঁচামেচি শুরু হতে পারে আশেপাশে, তারা কে টের পাওয়া মাত্র সব চুপ হয়ে যাবে, মনে হবে ভুবনের বাড়ি ছাড়া সমস্ত পাড়া আবার ঘুমিয়ে গেছে। এত বেশি হইচই হবে, এমন দলবদ্ধ প্রতিরোধ আসবে কাজ যখন অর্ধেক এগিয়েছে, ছাদ থেকে ভাবী বেঞ্চ ও তক্তাপোশ ফেলে গাড়ির রাস্তা আটক করবে, ভোজালিব খোঁচায় ফাঁসিয়ে দেবে গাড়ির টায়ার, কালীনাথেরও তা ধারণাতীত ছিল। বারবার ঘোষণা শুনেও যেন ওরা বদ্ধমূল বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারে না, বুঝে উঠতে পারে না যে সত্যসত্যই কসাইপাড়ার মুসলমানরা হানা দেয়নি, তারা স্বদেশি বিপ্লবী, লিটন মেমোরিয়েলের কলঙ্ক থেকে শহরকে তারা বাঁচাতে এসেছে। সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, অনেকগুলি মনের একটা ধারণা বদলে আর একটা ধারণা আনতে বিশৃঙ্খলা জাগে, সময় লাগে, তাবা স্বদেশি বুঝেও যেন সকলে সংশয়ভরে ইতস্তত করে, ঠিক করে উঠতে পারে না কর্তব্য কী ! তারই মধ্যে সংকেত আসে পুলিশের আগমনের, প্রায় শেষ মুহূর্তে, টাকার বান্ডিল বাগিয়ে যখন ভেতর থেকে দলের লোক বেরিয়ে আসছে, বেঞ্চ চৌকি সরিয়ে পথ করা হচ্ছে গাড়ি চলার, তারা যে স্বদেশি এ বিষয়ে সংশয় ঘুচে যাওয়ায় যখন পাড়ার বাসিন্দাদের প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকায় পরিণত হয়েছে। শহরের এটা পুরানো অংশ, দোতলা তিনতলা পাকা বাড়ির এলাকা হলেও রাস্তাটা সংকীর্ণ।

ভাগ্যক্রমে পুলিশ আসে গাড়ির পিছন দিক থেকে, এ রাস্তায় গাড়ি ঘোরানো যেত না। পুলিশ তফাতে থাকতেই এরা গুলি চালায়, বুটের আওয়াজ তুলে ছুটে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ায় পুলিশের দল, জবাব দেয়। সংঘর্ষ চলতে চলতে তারা আয়োজন শেষ করে পালাবার। একজন ফাঁসিয়ে দেয় পিছনের চাকার ভালো টায়ারটি, একটা ভালো আর একটা চুপসানো চাকার চেয়ে এ ভাবে গাড়ি ভালো চলবে।

দুদিকের বাড়ির রোয়াক বারান্দা দেয়াল ঘেঁষে গুলি চালাতে চালাতে পুলিশ এসেছে বরাবর। ওদের হাতে রাইফেল, সংখ্যাও অনেক বেশি, এদের শুধু পিস্তল।

তিনজন আহত ও তিনজন সুস্থ ডাকাতকে নিয়ে ফাটা চাকার গাড়িটা তারপর বিপজ্জনক বেগে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় রাস্তায় এদিকের মোড়ে, কালীনাথের হুকুমে অন্য চারজন আগেই

এদিকে দৌড়ে যেতে যেতে দুদিকে গলি ঘুঁজিতে মিশিয়ে গিয়েছে। এদিকে একজন পুলিশ হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে রাধানাথের বাড়ির রোয়াকে, আর একজন দুহাতে পায়ের হাঁটু চেপে ধরে বসে কাতরায়। তার আঘাত গুরুতর নয়।

প্রতিমাকে দেখে আশ্চর্য হয় না কালীনাথ। এটা জানাই ছিল যে তাদের অনেক গোপন খবর প্রতিমা জানে, অস্ত্রশস্ত্র গোপন রাখার মতো কাজে পর্যন্ত বাইরের যারা তাদের সাহায্য করে তারাও যে সব বিষয়ের হদিস পায় না। পুরানো নীতি বাতিল করে প্রতিমাকে দলে নেওয়া নিয়ে দলের মধ্যে অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক হয়ে গেছে।

প্রতিমার মুখ কঠিন, ব্যথা-কাতরতার ছাপ সে মুখে নেই দেখে স্বস্তি বোধ করে কালীনাথ।

শেষরাতে না এসে সকালে এলেই হত !

তুমি থাকো কী না থাকো।

মুখ কঠিন হোক, প্রতিমার গলা বেশ ভারী।

আমার সঙ্গে তোমাদের এ রকম করা অন্যায় ছোটোমামা। শঙ্কর কিছুতে বলবে না অমিতকে কোথায় রেখেছ, রাত দুটো পর্যন্ত সাধলাম। তুমি না বললে সে বলতে পারবে না। তুমি কোথায় আছ তাও বলবে না। শেষকালে যখন বললাম তোমার খবর না দিলে সোজা থানায় গিয়ে যা জানি সব প্রকাশ করে সুইসাইড করব, তখন জানাল। এ সব কী ছোটোমামা ? আমি কি তোমাদেব পব ? তোমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা কিছু নেই ! যাকে বিশ্বাস করতেই হবে জানো তাকেও অবিশ্বাস কব। কী লুকানো আছে আমার কাছে ?

শঙ্করের দোষ নেই। আমিই বারণ করেছিলাম, দু-চারদিন তোকে যেন কিছু না জানায়। কদিন পরে সব কিছুই তুই জানতে পেতিস পিতু।

মৃদুস্বরে ভীরুর মতো কথা বলে কালীনাথ, প্রতিমার মুখেব দিকে তাকায না, সে যেন পিস্তল বাগিয়ে রাইফেলের সঙ্গে লড়াই করা শক্ত কঠোর মানুষটি নয়। হৃদয়মনের এ কোমলতা তাব কেন আছে, কী করে থাকে কালীনাথ জানে না। বিপন্ন বিচলিত হয়ে থাকে। কী করে এখন যে মেয়েটাকে জানায়, জগতের সব বীরত্ব সব পৌরুষেব পালা শেষ হয়ে গিয়ে যখন শেষরাতটা মড়ার মতো নিঝুম হয়েছে, স্পষ্ট শুধু অনুভব করা যাচ্ছে প্রতিমার বুকের ধুকধুকানি।

কদিন পরে কেন ছোটোমামা ?

এ অসহ্য হয়ে ওঠে কালীনাথের। তাই যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে অল্পে অল্পে সইয়ে বলবে ঠিক করেও আগুয়ান পুলিশদের লক্ষ্য করে যেমন দ্বিধামাত্র না করে আচমকা বুলেট ছুঁড়েছিল, তেমনই সাদামাটা বাস্তব ঘোষণার মতো সে সোজাসুজি খবরটা বলে বসে, অমিত মারা গেছে।

বলে যেন বাঁচে। নিজেকে ফিরে পায়। এই ভালো। এমনি করে বলাই উচিত হয়েছে, একটা মরণের খবর জানাতে সে-ই বা কেন বিব্রত হবে, খবর শুনে প্রতিমাই বা কেন ব্যাকুল হবে ?

প্রতিমা ব্যাকুল হয় নিশ্চয়, তবে তার ব্যাকুলতা দিয়ে মোটেই বিব্রত করে না কালীনাথকে। বরং পাথরের মূর্তির মতো অনড় অচল হয়ে বসে থাকার জন্যই কালীনাথ বিব্রত বোধ করে বেশি।

কোথায় আছে ? শেষে এই প্রশ্ন করে প্রতিমা।

তা জেনে কী করবি ? টাউনে নয়।

একবার দেখব।

কে তোমাকে এখন নিয়ে যাবে ? কী করে নিয়ে যাব পাঁচ মাইল রাস্তা ? তাকে নিরস্ত করার জন্যই বুঝি কঠোর ভাবে কথা বলে কালীনাথ।

তোমায় নিয়ে যেতে হবে না। কোথায় রেখেছ দয়া করে বলো, আমি নিজেই যেতে পারব ছোটোমামা। আরও কঠোরভাবে জবাব দেয় প্রতিমা।

শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসছিল কালীনাথের শরীর, কিন্তু প্রতিমাকেও আর না বলা চলে না। ভেবে-চিন্তে তাকে সে পুরুষের বেশ ধরতে বলে, ভোররাত্রে এতবড়ো মেয়েকে রডে বসিয়ে সে পাঁচ মাইল সাইকেল চালাতে পারে না। কালীনাথ ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, ধুতি শার্ট আর একটা কোট দিয়ে যায়। বুক বাঁধার জন্য গামছাটা প্রতিমা নিজেই পেড়ে নেয় দড়ি থেকে, নির্জন ঘরে বসে ওই গামছাটা দিয়েই প্রথমে শুকনো চোখ দুটো কয়েকবার ঘষে নিয়ে যত জোরে পারে বুক বেঁধে নেয়। ভেতর থেকে যত কিছু অসহ্য চাপ দিচ্ছিল তাও যেন সে বাইরে চেপে গামছা বেঁধে ঠেকিয়ে রাখবে, বুকটা যাতে বোমার মতো না ফেটে যায়।

নয়

১

এইভাবে মৃত অমিতকে দেখতে গেল প্রতিমা। শালবন ঘেঁষা গাঁয়ের প্রায় বনের মধ্যে গ্রাস করা অংশটুকুর মাটির ঘরটিতে পাকা এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল। দলের লোক ও দলের বন্ধু। পুলিশেব সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় শহরেব অনেক বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুর সাহায্য কালীনাথদের নিতে হয়েছে। পাকা বাদ পড়েনি।

দলের ভিতরকার খবরাখবর পাকা মোটামুটি বরাবরই জানে। একটু তফাত থেকে দলের কার্যকলাপ কিছু কিছু লক্ষ করা, একে ওকে সতর্কভাবে অনুসরণ করা এ সব রোমাঞ্চের লোভ সে সামলাতে পারেনি। তার শুধু জানা ছিল না যে তাব এই গোপন গতিবিধি কালীনাথদের কাছে মোটেই গোপন নেই, আটুলিগাঁর জঙ্গলে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে তাদের সাবধান করে বেনামি স্লিপটি কে লিখেছিল তাও নয়। তার এই আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষ করে তাকে আর একটা সুযোগ দেবার কথাও কালীনাথ ভাবছিল।

পাকাও সারারাত জেগেছে কিন্তু তার চোখে ঘুম ছিল না। এ অবস্থায় ঘুম থাকার কথাও নয়। কিন্তু ভিতরের আলোড়ন আর কষ্টটা তার অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। এমন গৌরবময় মহান মরণকে সরকারি বন্দুকের গুলি কী কুৎসিত করে এঁকে দিয়েছে অমিতাভের সুশ্রী মুখখানার বিকৃতিতে তা চোখে দেখার পর থেকে তীব্র ক্ষোভের জ্বালা তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এ তার অবুঝ ছেলেমানুষি ক্রোধ নয় যে, মানুষ যুদ্ধে মরলেও তার অমিতদার মুখশ্রীর কেন হানি হবে, মৃত্যুর এই বাহ্যরূপের মধ্যে তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে এ ভাবে প্রাণ দিতে বাধ্য হওয়াটা কি অসহ্য অন্যায়, এই অকথা অনিয়ম ! একদিকে বিদেশি দানবের কুৎসিত জবরদস্তি, অন্যদিকে সারা দেশটার তাই মেনে নেবার কলঙ্ক। দেশের বিরুদ্ধেই আজ পাকার জ্বালাটা বেশি, কত দূর তারা অপদার্থ, এ ভাবে যাদের জাগাতে হয় ! পাকার শোকাতুর হবার অবকাশ নেই, কার জন্য কীসের জন্য শোক সে জানে না, হয়তো সংসারের সাধারণ জীবনে আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে মাঝে মাঝে নিজেকে একা বোধ করার যে অসহ্য উদাস বেদনা অনুভব করে সেই রকম কোনো অবসরে অমিতদার কথা ভেবে কান্না আসবে। কী যেন এক সংশয় আর হতাশা এখন তাকে কাবু করেছে। অমিতাভকে দেখে যত তার মনে হয় এমন চরম অন্যায় এমন পাশবিক হত্যা জগতে আর ঘটেনি, যত তীব্র হয়ে ওঠে তার ক্ষোভ আর আক্রোশ, কেমন এক অসহায়তা বোধ করার কষ্ট তত বেশি উগ্র হয়ে উঠে তাকে আত্মহারা করে দিতে চায়।

এইটুকু সে টের পায় আর এটা তার কাছে অদ্ভুত লাগে যে এ সমস্ত ঘটনা, ষড়যন্ত্র আয়োজন সংঘর্ষ মৃত্যু, এ সবের সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রতা তাকে পীড়ন করছে। তার অসন্তুষ্ট মন আরও বিরাট আর ব্যাপক লড়াইয়ের অভাবে হাহাকার করছে। একজন অমিতাভ আর একটা পুলিশের মরণ নয়, এমন একটা লড়াই যাতে একটা পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ও রকম লড়াই হলে তার পক্ষটা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাতেও পাকার আপত্তি নেই। সেও তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর সবার সঙ্গে।

মনের এই অবস্থায় পুরুষবেশী প্রতিমাকে দেখে পাকার যেন চমক ভাঙার মতো চমক লাগে। আশ্চর্য অভিভূত হয়ে সে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে প্রতিমার দিকে। খানিকক্ষণ সে যেন বুঝেই উঠতে পারে না অনেক দিনের জানা চেনা প্রতিমার আবির্ভাবকে। অবাস্তব কল্পনার যে উগ্র স্তরে উঠেছিল তার কিশোর চেতনা, সেই স্তরের আর একটা স্বপ্ন যেন বাস্তব রূপ ধরে এসে তার চেতনাকে গ্রাস করেছে।

একসঙ্গে মেকি আত্মীয়তা, পচা ভদ্রতা, মার্জিত ঝলমল কুরুচি আর দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে অবাধ্য খেয়ালে বিদ্রোহ করে আসা অস্থির ছেলেমানুষি মন !—এ মন সব পারে, এ মনের সব সহ্য হয়।

তবে কি না, সাধারণ বেশে এলেও প্রতিমার এই অভিসারের গভীর শোকাবহ দিকটা তার কাছে মামুলি মনে হত। মানুষকে মরতে দেখে তার কান্না পায়, যন্ত্রণা দেখে তার বুক টনটন করে, মৃতের জন্য শোক তার ধাতে নেই। তার মায়ের মরণ হয়তো জগতের চরম ও শেষ মৃত্যুর মতো পরবর্তী সমস্ত মরণকে তার কাছে অর্থহীন করে দিয়েছে।

নিজের বিপরীত অভিমানে গড়া নিদারুণ এক আত্মিক নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তির স্বাদে সে এক অপরূপ সুস্থতা বোধ করে নতুবা এই পরিবেশে প্রতিমা যখন অপলক চোখে অমিতাভকে দেখছে তখন এ ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকা অশ্লীল হয়ে দাঁড়াত। অন্দরে ড্রয়িংরমে বা প্রকৃতির রোমান্সময় লীলাভূমিতে কোথাও ভদ্র সমাজের ভালো-মন্দ সরল-চালাক কোনো মেয়েকে পাকা কখনও ভালো চোখে দেখতে পারে না, ওরা সবাই ন্যাকামি আর হীন ছলনা চাতুরীতে ভরা কদর্য, কুৎসিত ওদের হৃদয়মন। ওদের ভাবালু চোখ, মিহি কথা, কোমলতা, হাবভাব সব কিছু মুখোশ, সমস্ত ভান। ভাবকল্পনার মানেই শুধু বোঝে না তা নয়, মনে মনে হাসে। ওদের ভেতরটা ফাঁকা বাইরেটা ফাঁকি। ফুলের মতো বা পরির মতো সুন্দরী ভদ্র মেয়েদের মধ্যে পাকা চেয়ে দেখার বা তারিফ করার মতো রূপ খুঁজে পায় না, সাজগোজ আর স্বভাবের ন্যাকামির মতো এ রূপলাবণ্যও তার বিতৃষ্ণা জাগায়।

রুক্ষ মলিন ফুল, চাঁপা, বেঙিরা বরং তবু চেয়ে দেখার মতো, ওরা তবু মনে তার একটু প্রীতি ও কামনার তাপ আনতে পারে।

কিন্তু আসলে সে তো আর সত্য নয়। ভদ্র জীবনের বিজাতীয় আত্মবিরোধিতা থেকে মুক্তিলাভের ছটফটানি অত সরস প্রক্রিয়া নয় যে ভদ্র জীবনকে সোজাসুজি ঘৃণা করে অভদ্র অসভ্য জীবনকে ভালোবেসে ফেললাম। এক মিথ্যাকে অস্বীকার করতে অন্য মিথ্যা আসে, এক বিকার বর্জন করতে অন্য বিকার প্রশ্রয় পায়। মোহই যদি না থাকবে পাকার বাবু-মেয়েদের জন্য, এত তার রাগ কীসের, এমন গায়ে পড়া জ্বালাবোধ ? এদের নিয়ে গড়ে তোলা বাবু-ধর্মী কাব্য-কল্পনার নির্যাস থেকেই যদি তারও অপার্থিব মানসী না সৃষ্টি হয়ে থাকবে, এরা কী আর কীসের মতো নয় বলে কেন তার এত জ্বালা, আপশোশ, অভিমান ? নতুন মামির আদর-যত্নের আবেগ-ব্যাকুলতা কী করে তাহলে আকর্ষণ-বিরাগের জটিল আবর্ত সৃষ্টি করে, মনের মধ্যে থাকে এক নতুন মামি, তাকে নিয়ে একা একা অবাধ স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে বিভোর হয়ে যাওয়া চলে, বাইরের নতুন মামি সামনে এলে টের পাওয়া যায় এ একেবারে অন্য মানুষ।

এ বিকার ছাড়া কিছু নয়। পাকার এইটুকু বয়সে অনেক অস্থিরতা, অশান্তি বিরোধ, অনেক খ্যাপামি অন্যায় আচরণ নতুবা অর্থহীন হয়ে যেত। পাকার জগতের কোনো ছেলে কমবেশি এ বিকার থেকে মুক্তি পায় না। কেউ মানিয়ে নেয় আপস আর আত্মসমর্পণে, কারও বিকার চাপা থাকে অন্য জগতের সংস্পর্শে না আসায়, শান্তশিষ্ট নিরীহ হয়ে থাকে নৈতিক আত্মপ্রবঞ্চনা আর দুমুখো জীবনের নিয়ম-অনিয়ম সব মেনে নিয়ে। শুধু পাকার মতো পেট ভরে যত খুশি দুধ—খাওয়া-জীবনীশক্তি শাসনের জাঁতায় মুষড়ে না গিয়ে পরিণত হতে পারে তেজে, অবাধ বিচরণের অভিজ্ঞতায় তুলনামূলক বাস্তব বিচারবুদ্ধি, আর আদরে প্রশ্রয়ে গড়া একগুঁয়েমি থেকে হয় বিদ্রোহের সূত্রপাত, তাদের মধ্যেই উৎকট হয়ে প্রকাশ পায় এই ভাবগত বিকার।

যা চাই যেমন চাই তা-ই আমার পাওয়া চাই, সব কিছু গন্ডগোলের মূল তো শুধু এই। আঁতুড় থেকে জীবন তাকে শিখিয়েছে অসম্ভব স্বপ্নকল্পনাও জীবনেরই অংশ, আকাশেব ওই চাঁদকে হাতে পাওয়া যায়। এ শিক্ষা যাতে বিভ্রাট না ঘটায় সে জন্য তাই দরকার হয় ছেলেমেয়ের গড়ে ওঠার এত নিয়ন্ত্রণ, এত নৈতিক শিক্ষাদীক্ষার সমারোহ। চোখের সামনে দেখা যায় এ সব ছাড়াই চাষাভুসোর ছেলেমেয়ে চিরদিন ঢের বেশি নীতিপরায়ণ হয়ে আসছে, তবু। দাবি করতে শিখেই ভদ্র ছেলেরা স্বভাবতই চাঁদকে চেয়ে বসে হাতেব মুঠোয় কিন্তু ইতিমধ্যে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়াও শুরু হয়ে গেছে তাদের শিক্ষা যে না পেয়েও পেয়েছি ভেবে কীভাবে নিজেকে ঠকাতে হয়। চাঁদ না পেয়ে তাই শুধু আসে হতাশা আর বিষাদ, শুধু বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকে জীবনটা বাস্তব রঙের অভাবে, ব্যর্থতার বেদনাকে রাঙাতে খরচ হয়ে সাদাটে হয়ে যায় সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জগৎটুকু। কিন্তু যে ছেলে মোটামুটি এড়িয়ে গেছে ওই নিযন্ত্রণ আব নৈতিক গড়নের প্রক্রিয়া, সে কেন মানবে চাঁদকে না-পাওযাব পরাজয়, জ্যোৎস্না দিয়ে ক্ষতিপূরণের ধাপ্পা ! স্বপ্নকে সে চেয়েই যাবে বাস্তব পাওয়ার মধ্যে তার জন্মগত দাবিব মতো, না পেযে বেড়েই যাবে তার রাগ অভিমানের জ্বালা, ভেঙে সে চুরমার কবে দিতে চাইবে তার জগৎকে আঘাত হেনে হেনে।

কেন্দ্র সে নিজেই, সমালোচনা বিদ্রোহ আর মুক্তি কামনাব। অন্য এক জগতে, বাস্তব জগতে মুক্তি খোঁজার মধ্যেও তাব আত্মগত অনেক বিবোধ।

এটা না হয় হল যে ভদ্র মানুষের প্রকাশ্য আব অপ্রকাশ্য জীবনের উৎকট পার্থক্য, বাড়ি-ঘর আসবাব-পত্র সাজ-পোশাক খাওয়া-দাওয়া আনন্দ-উৎসব সামাজিকতার রং আলো রূপ শোভা বুদ্ধি ও মাধুর্যের শোভন সুন্দর উপস্থিত সমারোহের সঙ্গে সঙ্গে কদর্য কুৎসিত হিংসা দ্বেষ হীনতা দীনতা স্বার্থপরতা নির্মমতার সমাবেশ, সুখ শান্তি হাসি আনন্দের আবরণের নীচে অতল গভীর দুঃখ বেদনা হতাশার অভিশাপ—সব কিছু মিলে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল তাদের কাছে যাদের জীবনযাপনে বা হৃদয়মনে অন্দর-বাহির নেই। কিন্তু অন্দর-বাহির একাকার হওয়াটাই তো সব নয় তার কাছে, আত্মবিরোধিতা কম হলেই তো নোংরা নিঃস্ব বঞ্চিত ব্যাহত জীবন সুন্দর সার্থক জীবন হয়ে ওঠে না।

এ জগতে আশ্রয় আর ও জগতে মুক্তি, এর মধ্যে না আছে আশ্রয় না আছে মুক্তি। এ অমিলের সামঞ্জস্য খোঁজার মতো মারাত্মক কিছু নেই। এ জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে মনের খিদে আর ও জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে পেটের খিদে তবু সয়, ভরা পেটের মনের খিদে কী করে মেটাবে পেটের খিদেয় ভরা জীবনের মন ! তাই, দুটো জগৎ সে আত্মসাৎ করতে চায় তার চেতনায়। সযত্ন প্রসাধনে ও বেনারসির আবরণে গৌরাঙ্গী নতুন মামি আর তাড়ির নেশায় আলুথালু ছেঁড়া গামছার বেঙির টানাটানিতে নানা বিপর্যয় ঘটবেই। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব খ্রিষ্টান সহজিয়ার মেশালে হবে ভাবরাজ্যের আবর্ত, পাক খাবে মাঝি চাষি কেরানি ব্যারিস্টার কামার চামারের মেয়ে-বউ থেকে বাজারের রহস্যময়ী বেশ্যাকে ঘিরে, বছর ষোলো বয়স হতে হতে !

এ সব পাকারই জীবনের এক পরবর্তী অধ্যায়ের চিন্তা। এ দিনটির অভিজ্ঞতা বারংবার ঘুরে ঘুরে তার মনে পড়েছে বরাবর। দুটি বিশেষ কারণে অমিতাভের মৃতদেহের সামনে বসে গভীর হতাশার সঙ্গে জীবনে প্রথম এক অদ্ভুত অসহায়তা বোধ করে উতলা হওয়া আর ধুতি ও শার্ট কোট পরা মাথায় পাগড়ি বাঁধা প্রতিমাকে দেখে সমস্ত দেহে মনে মনোরম এক উত্তাপের সঞ্চারে উষ্ণ ও আনন্দিত হওয়া।

২

দেখা-শোনা সেবা-যত্ন যা-কিছু করার করছে শ্যামল জানার পাতানো পিসি। বয়সে সে শ্যামলের সমান হবে। কাল থেকে পিসি অবিরাম বিড়বিড় করে বকেছে আপন মনে, কাপের পর কাপ চা তৈরি করে দিয়ে মাছ তরকারি রেঁধে বেড়ে খাইয়েছে। হাসপাতাল হয়েছে বাড়িতে, খুনে ডাকাত কুটুম এসে ভিড় করেছে খুনেটার ঘরে। পুলিশ এবার ধরে নিয়ে পিসিকে নিশ্চয় ফাঁসি দেবে। কিন্তু এতদিনের নিয়মভঙ্গ করে পিসি কাল সন্ধ্যা হতে বাড়ি যায়নি। ভোর ভোর এসেছিল কাল পিসি, প্রায় রাত থাকতে। কাশতে কাশতে আগের দিন একটু বেশি কাবু হয়ে পড়েছিল শ্যামল।

শ্যামলকে বিছানায় শুইয়ে খানিকক্ষণ গোমড়া মুখে তাকিয়েছিল। তারপর নিজেই বলেছিল, না, আমি রইবনি। করব কি রয়ে ? কেশে কেশে মরো নয়তো বাঁচো যদি মরণ ঠেকাতে পাবব ? মোর বাপু বেতো ব্যারাম।

শ্যামল কেশে কেশে রাতারাতি মরছে না বেঁচে আছে জানতে বুঝি সকাল হওয়ার তব সয়নি পিসির। এসে রাতারাতি বাড়িতে ব্যান্ডেজবাঁধা কেষ্ট ও অমিতাভ এবং আরও তিনজন অতিথির সমাগম হয়েছে দেখে তার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। আর ঠান্ডা হয়নি।

সন্ধ্যার পর শ্যামলের মৃত স্তিমিত চোখে নতুন প্রাণের দীপ্তি দেখে বলেছিল, ফুর্তি কীসের শুনি ? খুনে ডাকাত কুটুম সাঙাত পেয়ে ? এ মায়ের বাছাটার যে জ্ঞান হল না খেয়াল আছে ? বেঁতে রইতে হবে তো মোকে ? রইব না, মোর গরজ নেই !

কিন্তু পিসি রয়েছিল। নিজের গরজে।

পিসি চা এনে দেয়। প্রতিমার বেশ তার চোখে পড়ে না। কেউ কাঁদছে না দেখে তার অসহ্য ঠেকে। কেন, আপনজন কি কেউ আসেনি যে ছেলেটার জন্য একটু কাঁদে, এমন বেঘোরে বেকায়দায় যে ছেলেটা মারা গেল ? এ সব বাবু বোঝে না সে, সজল চোখে পিসি জানায়। ইংরেজরাজ সবাইকে নিত্যি চোখের জলে ভাসায় বলে ইংরেজ মারতে খুনে হয়েছে, তাই বলে কি আপনার লোক মরলে পরেও চোখের জল ফেলা বারণ ! বীরত্ব করে কেউ মরেছে বলে কাঁদতে পাবে না তার আপনজন !

মরেনি পিসি, এ ছেলেরা মরে না। মরলে পরে দুদিন কেঁদে ভুলে যেত, এ ছেলেকে কেউ কোনো দিন ভুলবে না। এখানে তীর্থ হবে, দূর থেকে লোক ভিড় করে দেখতে আসবে।

শ্যামল বলে কথাটা। ভাবাবেগের সঙ্গেই বলে, কারণ জেলে জেলে আর আন্দামানে জীবনের সঙ্গে তার ভাবপ্রবণতাটাই সব চেয়ে বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে। শক্তি থাকলে সে আকুল হয়ে কাঁদত, কারণ কান্নায় তার দুর্বলতার লজ্জা নেই, হৃদয়কে দমন করার কঠোর সংযমের প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে।

তবে তার কথায় সবার রাঙাটে চোখগুলি জলে ভরে যায়, কালীনাথের চোখ পর্যন্ত। প্রতিমার গাল বেয়ে ধারা নামে। বোঝা যায় গেঁয়ো পিসির মূল্যবিচার অভ্রান্ত, খুনে বিপ্লবীদেরও একটা দিক নরম থাকে, মানুষ থেকে গিয়ে যা কঠিন করা অসম্ভব।

এটা যেন পাকার জিদের জয়।—সে ভাবে, হুঁঃ নইলে তোমাদের এত কড়াকড়ি কি জন্যে শুনি কালীদা ? আমার তোমরা নাম কেটে দাও। আমার মনের জোর নেই।

এখনও পাকা জানে না কালীনাথ তাকে আর একটা সুযোগ দেবার কথা ভাবছে।

কেষ্ট বলে, ক্যামেরাটা আনতে যদি তোর খেয়াল হত পাকা !

পাকা বলে এখানে জোগাড় করা যায়।

সে কালীনাথের দিকে তাকায়। কালীনাথ মাথা নেড়ে বলে, না, ক্যামেরা দরকার নেই।

সাইকেলে গিয়েও আনতে পারি আমারটা।

না। সোজা টাউনে ফিরে যাবে, এদিকে আর আসবার দরকার নেই।

বেলা বাড়লে কালীনাথ শান্ত শক্ত সুরে বলে, পিতু, এবার যেতে হবে। পাকা, তুমিও পিতুর সঙ্গে যাও। হেঁটে গিয়ে বড়ো রাস্তায় এগারোটার বাস ধরবে। সাইকেল থাক।

প্রতিমা বলে, যাই মামা, কিন্তু—

কিন্তু কেন আবার ?

পলকহীন চোখে তাকিয়ে অমিতাভের দেহটা দেখিয়ে বলে—কী করবে ?

যদ্দিন পারা যায় গোপন রাখতে হবে পিতু। অমিত কলকাতায় ফিরে গেছে।

বুঝলাম। কী করবে বলো না ?

বনে লুকিয়ে ফেলা হবে, মাটির নীচে।

ঘড়ি দেখে কালীনাথ আবার বলে, দেরি কোরো না, বাস চলে যাবে।

পিসি বলে, বোসো, ওরা খেয়ে যাবে।

বাস পাবে না।

পাবে পাবে, দুকুরের বাস পাবে। ছিষ্টি উলটে যাবে না ওরা দুকুরের বাসে গেলে। অত তুমি হুকুম ঝেড়ো না বাপু !

শাড়িটা মাথায় পাগ্‌[illegible] করে এনেছিল, প্রতিমা বেশ বদলায়। পিসির রাঁধা ডাল-তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে দুপুরবেলা বনের একটু ঘুর পথে বড়ো রাস্তার দিকে চলতে চলতে পাকা হঠাৎ বলে বসে, তোমায় সুন্দর দেখাচ্ছিল পিতুদি, অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

প্রতিমা ছিল আনমনা।—কি বললে ?

না, কিছু বলিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে আবার বলে, বলছিলাম কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পিতুদি। এতে কি হবে ? এ সব করে ?

কীসে ? ও ! এখন ও সব তর্ক থাক পাকা।

তর্ক নয়, কালীদা যে বলে জেনে শুনে দশজনে জাগবে, পথ পাবে। সবাই বিদ্রোহ করবে কিন্তু লোকে তো কিছু জানতেই পারছে না। অমিতদা প্রাণ দিল, সেটাও গোপন রাখতে হবে।

এ সব কথা থাক পাকা। গোপন কিছু থাকবে না, গোপন কি থাকে ?

তার এই কথাকে প্রমাণ করার জন্যই যেন পুলিশ তাদের ঠেকাল। স্টেশনে বাস থেকে নেমে দুজনে তারা একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করে উঠে বসেছে, হাড়-বের-করা রুগ্ন ঘোড়া দুটো চাবুক খেয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় গাড়িটা টানতে শুরু করেছে, একসঙ্গে দুদিকের পাদানিতে উঠে দাঁড়াল দুজন লোক, রিভলবার বাগিয়ে। সঙ্গে তাদের আট-দশজন পুলিশ, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে।

এ রকম জবরদস্ত বাহিনী ছাড়া একটা ছেলে আর মেয়েকে ওরা ধরতে পারে না, এমনই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে ওদের কাছে টেররিস্টরা।

শুধু পাকাকে ওরা চাইছিল, পাকার সঙ্গে থাকায় প্রতিমাকে ধরেছে। পাকাকে পুলিশের দরকার হয়েছিল বিশেষ কারণে, ফাঁসিতে লটকাবার জন্য নয়। পাকা দলের ভেতরে নেই, হাতেনাতে কার্যকলাপে যোগও দেয় না, অথচ সে অনেক খবর রাখে—এটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পুলিশের। পাকার মতো খামখেয়ালি ছেলের কাছ থেকে সহজে খবর আদায় করা যাবে এ রকম একটা ধারণাও তাদের হয়েছে। এটা হয়েছে রায়বাহাদুর এন এন ঘোষাল গতবার কলকাতা ফেরার সময়। পাকার ওপর একটু নজর রাখতে বলে যাবার ফলে। পাকার এলোমেলো খাপছাড়া চালচলন তাদের নজরে পড়েছে।

এটা যে পাকার নিজস্ব ব্যক্তিগত দিক, গঙ্গা কামারের কামারশালায় দু-চার ঘণ্টা বসে থাকা, টো টো শহরে পাক দেওয়া, দুপুর রাতে চামার বস্তিতে আড্ডা দেওয়া বা নির্জন প্রান্তরে ঝরনার ধারে বসে কাব্য করার সঙ্গে স্বদেশি দলের ভেতরের খবর জানার কোনো সম্পর্ক নেই, এটা জানা ছিল না পুলিশের। সত্য কথা বলতে কী, স্বদেশি দলের বোমা তৈরি-টৈরির মতো দু-একটা কাজ ছাড়া সব কিছু যে কত দূর সাধারণ আর স্বাভাবিক ভাবে চলে, সে ধারণাই তাদের ছিল না। স্বদেশিদের গভীর গোপন মারাত্মক ষড়যন্ত্র ঘিরে ঘিরে তাদের কল্পনায় গড়ে উঠেছিল উদ্ভট রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা। স্বদেশি দমনে সে-ই বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে এ কল্পনা যার ভোঁতা ছিল, অনুর্বর ছিল মায়ামমতাব মতো ; যে জানত গোপনীয়তা যত বেশি মিশ খেয়ে যাবে চারিপাশের প্রকাশ্যের সঙ্গে সে যে তত দুর্ভেদ্য, প্রকাশ্যে চা খেতে খেতে বা তাস পিটোতে যে খোশগল্পই করতে হবে, লাট মারার পরামর্শ চলবে না এমন কোনো কথা নেই, দৈনিক হাজার হাজার লোকের মধ্যে হাজারটা সাধারণ জিনিসের হাতবদলের মতো তুচ্ছ সাদামাটা ভাবে পিস্তলের মতো মারাত্মক জিনিসেরও হাতবদল অনায়াসে হতে পারে, স্বদেশির ভয়ও সে করত তত বেশি। কারণ, স্বদেশিরা যে তাকে এতটুকু ভালোবাসবে না এই বাস্তব সত্যবোধের মধ্যেও তার কল্পনার এতটুকু ভেজাল মেশাবার উপায় ছিল না।

ছ্যাকড়া গাড়ি চলছে। পাদানির দুজন ভেতরে বসেছে, সামনাসামনি।

কোথা থেকে এলে ?

তুমি বলছ কাকে ? পাকা ফোঁস করে ওঠে।

আহা চটেন কেন ! কোথায় গিয়েছিলেন জিগ্যেস করছি।

প্রতিমা জবাব দেয়, জোড়াগড়ের রাজবাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম।

পাকা ভাবে, প্রতিমার সত্যি বুদ্ধি আছে। বাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রেন এসেছে বটে স্টেশনে। বাসের কথা বললে ড্রাইভার কন্ডাক্টারকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যেত তারা কোথায় উঠেছিল। জোড়াগড় স্টেশনের কাছে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের জঙ্গল ঢাকা ধ্বংসস্তূপ আছে।

শেষে দুজনকেই নিয়ে যাওয়া হল রায়বাহাদুর এন এন ঘোষালের দরবারে।

ঘোষাল উঠে দাঁড়ায়, প্রতিমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আসুন।

পাকাকে বলে, আরে তুমিই প্রকাশ না কি ? কী আশ্চর্য, আমি তোমার ভালো নামটা ভুলেই গেছলাম। তাই তো এ কী রকম হল !

৩

গভীর মনোযোগের সঙ্গে দু-চার মিনিট এ-ও ফাইল দেখার বিরাম দিয়ে দিয়ে ঘোষাল তাদের সঙ্গে সাময়িক ভাবে আলাপ চালিয়ে যায়, ভৈরবের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করে, প্রতিমার কাছে জোড়াগড়ের ভগ্নস্তূপের বিবরণ ও ইতিহাস শোনে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে নিজের মত শোনায়, কাজের কথায় আসে না। কার্লটন একবার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট তার সঙ্গে কথা বলে যায়,

একনজরের বেশি তাকায় না পাকাদের দিকে। এমনই তার আশ্চর্য সংযম ! অথবা ? পাকা ভাবে। ঘোষাল তাদের চা খাওয়ায়, চায়ের সঙ্গে লোচন ময়রার বিখ্যাত সন্দেশ। চায়ের সঙ্গে সন্দেশ ছাড়া মানাবে কেন ?

দেওয়ালের নীচের দিকটা আলকাতরা রং, মাথার ওপরে নিশ্চল পাখা, মেঝের মাঝখানে ভারী মোটা সরকারি টেবিল চেয়ার ছাড়া এতবড়ো ঘরটাতে শুধু রুক্ষ শূন্যতার গাম্ভীর্য—দেওয়ালে ক্যালেন্ডার পর্যন্ত ঝোলানো নেই। জানালা দিয়ে চোখে পড়ে কম্পাউন্ডের সদর গেটে পাহারায় ও সশস্ত্র সিপাহির কোমর থেকে ওপরের অংশটা, রাস্তার ওপারে উঁচু দেয়াল ঘেরা মেটে লাল রঙের জেলের বাড়ির ওপরের দিকটা। কী রকম চেহারা জেলের ভেতরটার ? সাইকেলে, পায়ে হেঁটে কত শতবার জেলটার সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু ভেতরে কী আছে দেখবার সাধ তো কখনও পাকার হয়নি !

নলিনী চুপচাপ বসিয়ে রেখেছিল দুঘণ্টা, এখানেও ঘণ্টাখানেক কাটল। কি বিশ্রী শান্তশিষ্ট ভদ্রভাবে এ রকম প্রতীক্ষা করা ! জেলটার পেছনে সূর্য আড়ালে পড়েছে।

আমাদের ধরেছেন কেন ?

আমি ঠিক জানি না। আমি আজ মোটে এসেছি।

পাকা জানে এটা মিছে কথা। ঘোষাল এবং আরও অনেককে নিয়ে কলকাতা থেকে কাল ভোরে স্পেশাল ট্রেনের আবির্ভাব তাদেব অজানা নয়।

প্রতিমা সবিনয়ে বলে, আমি একটু ইয়েতে যাব।

বেশ তো, বেশ তো !

ঘোষাল আর্দালি ডেকে হুকুম দেয়। আর্দালির শুধু উর্দি সম্বল, অস্ত্রশস্ত্রের বালাই নেই। দরজার কাছ থেকে তাই আরও একজন প্রতিমার সঙ্গে যায়। সে অস্ত্রধাবী।

তুমি একটু বসো পাকা।

ঘোষালও উঠে যায়। যায় নলিনী দারোগার ঘরে। নলিনী তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটাকে ছেড়ে দিন। জেরা করে নেবেন, যদি কিছু বলে ফেলে। তবে ছুঁড়িটুঁড়িকে ওরা আসল কারবারে টানে না।

ইয়েস সার।

ছেলেটাকেও ছাড়তে হবে।

নলিনী শূন্যদৃষ্টিতে তাকায়।

আজ নয়, কাল। যদি না কনফেস করে। ভৈরব চাপ দেবে, ওপরে গিয়ে চাপ দেবে, তালুতে। বুঝলেন ? আসল কাউকে পেলেন না, ওই রেকর্ডে এইটুকু একটা বাচ্চাকে আটকেছেন জানলে ওপর থেকে জুতো আসবে, আস্ত জুতো। বুঝেছেন ?

ছোঁড়াটা জানে সার, অনেক খবর জানে।

বার করুন খবর। আমি দেখছি চেষ্টা করে। আমায় কিছু না বললে আজ রাতটা পাবেন, আপনারা চেষ্টা করে দেখুন। কাল ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।

ঘোষালকে এক মুহূর্ত আনমনা দেখায়। মনে হয় কাব্যচিন্তা করছে।—কিন্তু মরে যেন না যায়। বাইরে যেন জখম না হয়। বুঝলেন ?

ইয়েস সার।

প্রতিমার ডাক পড়ে নলিনীর কাছে। আর সে ফেরে না।

ঘোষাল কথা বলে পাকার সঙ্গে, তার ছেলেবেলার কথা, তার মার কথা। সেই পুরনো কথা, আরও বিস্তারিত, রং ছড়ানো—কত নিবিড় স্নেহভরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল পাকার মার সঙ্গে

ঘোষালের, কত যত্নে কতরকম আচার করে, খাবার করে সে খাওয়াত ঘোষালকে। পাকা জানে তার মাকে টেনে আনবার মানে। মার কথায় সে ছেলেমানুষ বনে যায় এটা ঘোষাল টের পেয়েছিল গতবার ভৈরবের বাড়িতে যখন দেখা হয়। ফাঁপর ফাঁপর লাগে, অসহ্য ঠেকে। কিন্তু এটা ভৈরবের বৈঠকখানা নয়। হিসেবি সতর্ক হয়ে গেছে পাকার মন। সেও খানিকটা অভিনয় করে। একটু অভিভূত হবার ভাব দেখায়।

তারপর এক সময় নলিনী ঘরে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে চুপিচুপি কথা হয় ঘোষালের। কথার শেষে চিন্তিত গম্ভীর দেখায় ঘোষালের মুখ।

বড়ো মুশকিলে ফেললে পাকা তুমি। মেয়েটিকে এরা ছেড়ে দিচ্ছে। প্রতিমা নাম নয় মেয়েটির ? প্রতিমা সব কথা খুলে বলেছে।

কীসের কথা ?

এতক্ষণে তবে কাজের কথা উঠল, আক্রমণ শুরু হল ! ভেতরটা শক্ত হয়ে যায় পাকার। ভয় করে। অসাবধানে কিছু বলে ফেলার ভয়, বোকামি করে সন্দেহ জাগাবার ভয়। প্রতিমাকে ছেড়ে দিয়েছে, কী দেয়নি—কে জানে ! তাকে তফাত করা হয়েছে। একা করা হয়েছে। এবার একা তাকে সামলাতে হবে সব।

ঘনিষ্ঠ, আপন হয় ঘোষাল। বলে যে পাকাকে সে বাঁচাবে যে করে হোক। সে ক্ষমতা তার আছে। পাকার বাবা ঘোষালের আপন বড়ো ভাইয়ের মতো—ছেলেবেলা থেকে পরিচয়। স্নেহ দিয়ে পাকার মা ঘোষালকে চিরদিনের জন্য বেঁধে রেখে দিয়ে গেছে। কিন্তু খুলে বলতে হবে সব কথা পাকাকে। না বলার কোনো মানে নেই। প্রতিমা সব বলে দিয়েছে। পুলিশও জানে। পাকা সব জানাক ঘোষালকে, নিজের দায়িত্বে সে তাকে ছেড়ে দেবে। নয়তো কী যে বিপদে পড়বে পাকা, সে যদি বুঝত—

কী বলব বলুন না ? খালি বলছেন বলতে হবে। আমি কিছু করিনি, মিছিমিছি আমায় ধরে এনে—

পাকা নিজেই বোঝে তার অভিনয় ভালো হচ্ছে না, একটু কেঁদে ফেলতে পারলে হত। কিন্তু কান্না না এলে উপায় কী ! তা ছাড়া এরা যদি বুঝতেও পারে সে না জানার ভান করেছে তাতেও বেশি কি এসে যাবে ! তাকে বেশ সন্দেহ করেই ধরেছে, মিছিমিছি নয়। হয়তো অনেক কিছু জেনে শুনেই ধরেছে। সে কিছু বলবে না এটুকু অন্তত বুঝুক।

বাইরে আলো ম্লান হয়ে আসছে। আর্দালি ঘরে একটা আলো ঝুলিয়ে দিয়ে যায়, টেবিলেও একটা আলো দেয়।

ছেলেবেলা আমায় একজন গাঁজা খেতে শিখিয়েছিল পাকা। তাকে কাকা বলতাম—কাকাই বটে ! কী ভক্তিই যে করতাম ! তোমার মতোই বয়স হবে। বাবা একদিন টের পেয়ে বললেন : তুমি ছেলেমানুষ, তোমার দোষ নেই, তোমায় কিছু বলব না। কে তোমায় শিখিয়েছে তার নামটা বলো। কী বোকাই তখন ছিলাম ! বাবাও ছাড়বেন না, আমিও কিছুতে বলব না। শেষে দড়ি দিয়ে আমায় বেঁধে—মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে ঘোষাল তার বাবার অতীত কর্তব্য পালনে সায় দেয়।—বাবা সত্যি আমায় বাঁচিয়েছিলেন। নয়তো গাঁজা খেয়ে কী হতাম কে জানে ! যে মুহূর্তে নাম বললাম, বাবা আমায় ছেড়ে দিলেন।

গাঁজা খেতেন ? ছি ছি ! আমি হলে বাবা জিজ্ঞেস করা মাত্রে বলে দিতাম কে খেতে শিখিয়েছে।

সে সময়কার ঘোষালের মুখ পরবর্তী জীবনে অনেকবার মনে পড়েছে পাকার। বিশেষভাবে মনে পড়েছে যখন হঠাৎ ঠান্ডা লেগে বা আনমনে শক্ত কিছুতে কামড় দিয়ে জোড়া লাগানো ভাঙা চোয়ালদের হাড় টনটন করে উঠেছে। তিনটি আঙুলের একেবারে কদাকার নখ চোখে পড়েছে।

পরবর্তী জীবন, সে রাত্রির পরের।

যন্ত্রণার এক অজানা নতুন জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রাত্রি। কতটুকু আঙুল মানুষের, দেহের কতটুকু অংশ ! সেই আঙুলের নখের নীচে একটা ছুঁচ ঢুকতে থাকলে জগৎটা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়, কিন্তু যায় না। ক্ষুদ্র গোপন অঙ্গটি পিষ্ট হলেও তাই। চেতনার সীমায় তোলা যাতনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সেই অনুভূতির জগতে সর্বাঙ্গ একাকার। এই অসহ্য অদ্ভুত জগতের সঙ্গে সে রাত্রির ঘনিষ্ঠতা ছাড়া, শুধু ও রকম নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছাড়া যে জগতের কোনো মানে মানুষের কাছে থাকে না, চেতনাকে কোনোদিন পাকা এমন অন্তরঙ্গভাবে চিনতে পেত না। মনে হয়তো কাব্য আর কল্পনা হয়েই থাকত চিরদিন, মনের জোরে মানুষের যন্ত্রণা জয় করাকে একটা দুটো মানুষের খেলো নাটুকে বাহাদুরি বলেই জেনে রাখত। মনের জোর যেন দু-চারজন মানুষের একার সম্পত্তি, কোটি কোটি দুর্বল মনের ব্যতিক্রম, যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধে মানুষ হার মানবে এই নিয়মের অনিয়ম। যন্ত্রণাকে জয় করাই স্বভাব মানুষের, তার চেতনাটাই যন্ত্রণার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে চেতনাও, আয়ত্তে রেখে রেখে ব্যথাতেই কেন্দ্রীভূত হতে থাকে ছড়ানো জগৎ থেকে সরে এসে এসে, যন্ত্রণাহীন অকাতর বলে জগৎ থাকে না, জীবন থাকে না, জীবন থাকে না, কিছুই থাকে না। যন্ত্রণাই অস্তিত্ব, যন্ত্রণাই সব। যন্ত্রণার যত উন্মত্ত আক্রমণ, সেই আক্রমণেই তত ভোঁতা হয়ে যায় যন্ত্রণাবোধ। একটা সীমার পর চেতনা নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মানে হারিয়ে মিথ্যে হয়ে যন্ত্রণা।

ভয়ানক বলে কোনো ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই। কোনো মানুষ কোনোদিন ভীষণ কষ্ট পায়নি, পাবে না। ভয়ানক শুধু ভয়টা। যন্ত্রণা পাবার আগে মিথ্যা কল্পনার মিথ্যা যন্ত্রণা। যন্ত্রণার শেষ কথা মরণ। শুধু ভয়ের ফাঁকিতে যন্ত্রণা আর মরণ মানুষকে কাবু করে রেখেছে।

ভয় মানুষের তৈরি, স্বার্থপর মানুষের। ঘুমোতে না চাইলে পাকার মা পর্যন্ত পাকাকে ভয় দেখাত। মার কি ভয় ছিল না যে ঘুমিয়ে অসুখ করে পাকা মরে গেলে আদর করার সোহাগ করার বুকে করে মেতে থাকার কেউ থাকবে না ? পুতুল হারানোর ভয়ে মাও যদি ছেলের জন্য ভয় সৃষ্টি করে, কানাকড়ি হারানোর ভয়ে মানুষ কেন পরের জন্য ভয় সৃষ্টি করবে না ?

হঠাৎ একদিন চরম দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে পাকা বীরত্বের মর্ম বুঝেছে, জেনেছে যে যন্ত্রণা আর মৃত্যুকে জয় করা মানুষেরই বাস্তব জীবনের সাধারণ বাস্তব ধর্ম।

যাই হোক, নির্যাতনের ফলে একটা উপকার হয়েছে। মনের গতিটা ঘুরেছে পাকার। দ্রুত অনিবার্য বেগে অন্তর্জগতে একটা বিপ্লব ঘটার মতো। জ্ঞান ফেরার পর তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে, প্রতিমা খানিকটা উদ্‌বেগের সঙ্গেই শুধিয়েছিল, কিছু বলেছ কি-না মনে আছে ?

বলিনি।

তখনও একটা অস্পষ্ট স্বস্তি অনুভব করেছিল। না বলাটা তার বাহাদুরি হয়নি, একটা বিচ্ছিন্ন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি তার জীবনে, মানুষের একটা রীতি, সাধারণ নীতি পালিত হয়েছে মাত্র— অনির্দিষ্ট মানুষের মধ্যে নিজের ছড়িয়ে যাওয়া এই অনির্দিষ্ট অনুভূতিতে যেন মোটামুটি একটা মীমাংসা হয়ে গেছে তার মর্মান্তিক বিরোধের, সারা জগতের সঙ্গে একা ঝগড়া করার। এ সব অনুভূতি নিজে বুঝবার মতো পুষ্ট হতে দানা বাঁধতে বহুকাল লেগেছিল, কিন্তু অভিশপ্ত শত্রু-জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা তার শুরু হল জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে। পচা আবদ্ধ ভদ্র জীবনের ওপর রাগ করে বেচারি মরিয়া হয়ে রীতি-নীতি নিয়ম-কানুন বাধা-নিষেধের দেয়াল শুধু ভেঙেই চলেছিল, নিজের ঘৃণা আর জ্বালার চাবুকে পাগল হয়ে বাড়িয়েই চলেছিল দিশেহারার মতো ছুটে বেড়াবার

জন্যে আরও বড়ো—আরও বড়ো জগৎ : জগৎ যত বড়ো হয়েছে, চলাফেরা মেলামেশার জগৎ, দিবারাত্রির জগৎ, নিয়মহীনতার জগৎ, তত তাকে গুটিয়ে আসতে হয়েছে নিজের মধ্যে। ভদ্র স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে কী হবে, কী হবে মিষ্টি হাসি গান গল্প গন্ধ শোভা ভরা সাজানো ঘর ছেড়ে পথে পথে ধুলোয় হেঁটে, নরম বিছানার স্বপ্নালু ঘুমের বদলে চামার বস্তিতে হইচই করে, সাপ জঙ্গলের ঝরনার ধারে একার ভাবরাজ্য গড়ে তুলে, সাইকেলে দূর গাঁয়ে পাড়ি দিয়ে, বিপজ্জনক মরণব্রতে অংশ নিয়ে, কাউকে যদি সে আপন না করে, কাউকে ভালো না বাসে ! নিজেকে না দিলে কে তাকে আপন করবে, কার সাধ্য আছে : কীসে তার সাধ মিটবে, শুধু তারই জন্য জগতে কে আছে !

ভীরু আত্মীয়বন্ধুরা পাকার খবরও নেয় না, দেখতেও আসে না। সে বিপজ্জনক হয়ে গেছে। গবর্নমেন্ট। ভদ্রতা বা আত্মীয়তা রাখতে গিয়ে কীসে কী হবে কে জানে, যখন খুশি যাকে খুশি যে কারণে খুশি ধরে নিয়ে যতদিন খুশি আটক রাখার যা খুশি করার আইন পর্যন্ত আছে। শত্রু হলেও অহিংস কংগ্রেস সম্পর্কে গবর্নমেন্ট বরং অনেকটা উদার। পাকার মতো মারাত্মক জীবদের যারা ছায়া মাড়ায় তাদেরও গবর্নমেন্ট ক্ষমা করে না।

তা হোক, জগতে সবাই ভীরু নয়, ভীরুই জগতে সব চেয়ে কম। পাকা কাউকে ভালো না বাসুক, তাকে অনেকে ভালোবাসে। শুধু তার অশান্ত অবাধ্য উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণটুকু, তেজি প্রাণটুকু কত প্রাণে টান জন্মিয়েছে সে হিসাবও পাকা কখনও রাখেনি, পাকাকে যাদের আপন ভাবাব অধিকার তারাও ভাবেনি। ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ এত লোক তাকে দেখতে আর খবর নিতে আসে, জাত-বেজাতের লোক, যেন খাপছাড়া ঠেকে ব্যাপারটা সবার কাছে। সংখ্যায় তুলনায় কম হোক, ভদ্র জাতও অনেকে আসে। সংখ্যার স্বল্পতাটা ফাঁপিয়ে দেয় স্কুল-কলেজের ছাত্ররা—স্কুলের ছেলে পাকার যে এত কলেজীয় বন্ধু আছে কে তা জানত ! দোকানি মিস্ত্রি ফিবিওয়ালা আসে—গঙ্গা কামার সপরিবারে, বাচ্চাকে পর্যন্ত কাঁধে চাপিয়ে। খবর পেয়ে চামার-বস্তি ফাঁকা হয়ে এসে নিঃশব্দে জমা হয় ভৈরবের বাড়ির সম্মুখে, বেজি জেনে নেয় পাকা বেঁচে আছে এবং অবশ্য অবশ্য বেঁচেই থাকবে, চুপচাপ সকলে আবার বস্তিতে ফিরে যায়। আটুলিগাঁর মতো আরও কতকগুলি গ্রাম পাকার কুশল চায়। এত তাড়াতাড়ি কী করে চারিদিকে খবর ছড়াল কেউ ভেবে পায় না।

অমিয়া প্রতিমাকে বলে, দেখেছ কাণ্ড ?

চোখের নীচে কালি পড়েছে নতুন মামির। পাকার মাথায় আইসব্যাগ চেপে ধরে সে থাকে প্রতিবাদের হতাশার প্রতিমূর্তির মতো, পাকার গরম মাথা বরফ দিয়ে ঠান্ডা করার ভরসা যেন তাব চিরতরে মুছে গেছে, এ শুধু নিয়ম পালন।

প্রতিমাও কম আশ্চর্য হয়নি। পাকাকে সে ছেলেমানুষ বলেই জানত। কোন ফাঁকে সে এত বড়ো হয়ে গেছে টেরও পাওয়া যায়নি। আজ এ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তারও প্রথম খেয়াল হয়েছে অমিতাভের চেয়েও পাকা বেশি ঢ্যাঙা।

দশ

১

পরের বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় বসন্তকাল এল। দখিনা আর কোকিলের কলরব তো বটেই, গুটি বসন্তের একটু উগ্রতর মহামারি নিয়েও। পরীক্ষা দিয়ে পাঁচু ফিরেছে আটুলিগাঁ। পাকা গিয়েছে দেশভ্রমণে, অনন্ত আর নতুন মামির সঙ্গে। ভ্রমণে নতুন মামির শ্রান্তি এলেই পাকার কেটে পড়ার ইচ্ছা। একা খুশিমতো বেড়াবে। ভারতের এদিক ওদিক।

এতকাল পরে পাকার বাবা আর একটা বিয়ে করেছে। ছেলের স্বদেশিওলাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তার চাকরির দারুণ অবনতি ঘটেছে। ভবিষতে কী আছে কে জানে ! অবাধ্য বিপথগামী ছেলে মন ভেঙে দিয়েছে। বিয়ের কারণ অবশ্য সেটা নয়।

পাকা বলেছিল পাঁচুকে, বয়ে গেল। সৎমা তো আর মা নয়। বাবার শখ হয়েছে বিয়ে করেছে, আমার কী ?

কিন্তু পাঁচুর কাছে পাকা প্রায় স্বচ্ছ। তার আঘাত আর অপমান পাঁচুর কাছে গোপন থাকেনি।

লেখাপড়ার লম্বা ছুটি, পাঁচুর কাজের অভাব নেই। ভাবনা চিন্তা মানস-কল্পনার অভাবও ঘটে না। গেরস্ত চাষির বড়ো সংসার, জমিজমা গোরু-বাছুরের সম্পদ কম। কম বলেই ছোটোবড়ো খুঁটিনাটি সব কাজ নিজেদের করতে হয়, লোক রাখার সাধ্য নাই। ঘরের কাজ, মাঠের কাজ, বাজারের কাজ, হাটবাজারের কাজ—সব কিছুরই অংশ পাঁচুর জুটে যায় পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। চিঠি আর দরখাস্ত লেখবার জন্য অনেকে আসে, বাড়িতে ডাকে। পাঁচুর হাতের লেখা মুক্তার মতো সুন্দর, চিঠি লিখতে এক পয়সা ও দরখাস্ত লিখতে দু-পয়সা মজুরি নেয় পাঁচু। লেখাপড়া শিখতে অনেক খরচ, বড়ো কষ্টের পয়সা খরচ।

পরীক্ষার খরচ জোগাতে পাঁচুর মার একটি গয়না গেছে। রুপোর গয়না, ওইটিই তার শেষ সম্বল ছিল।

পরী. ' দিয়েই যেমন তেমন সাময়িক একটা চাকরি করার সাধ ছিল পাঁচুর, ধনদাস রাজি হয়নি। তাছাড়া, চাকরিই বা কোথায় ! তার চেয়ে ঢের বেশি পাশ করা ঢের ছেলে বেকার বসে আছে। দেশের হালচাল বড়ো খারাপ। অনেককাল চাকবি করছে এমন অনেকের চাকরি পর্যন্ত খসে যাচ্ছে।

আর কি লেখাপড়া হবে ? মাঝে মাঝে এ ভাবনাটা পাঁচুর মনে আসে, তেমন জোরালো আকাঙ্ক্ষার রূপে নয়। লেখাপড়া শিখে বড়ো হবার উগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার জন্য নয়, ও সব কামনার শিকড় তার জীবনেও গভীর স্তরে পশে না, রস পেয়ে পুষ্ট হয় না। জজ ম্যাজিস্টর অন্য জগতের জীব, অন্য জগতের জীবনের সার্থকতা, তার জগতেব নয়। লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজিস্টর হওয়ার সাধ বা স্বপ্ন তার জগতে এত কৃত্রিম যে রাজা হওয়ার আশীর্বাদটা বরং ঢের বেশি বাস্তব আর স্বাভাবিক শোনায়।

তবে কলেজে পড়ার ইচ্ছা পাঁচুর হয়। পাশ করে পাকা নিশ্চয় কলেজে ভরতি হবে। পাকার সঙ্গে পড়তে পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাতেও ওই জগতান্তরিত হবার দরকার থাকার অসুবিধা। কলেজে পড়তে এদিকে বাপখুড়োকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হবে। যেমন আশা কবেছিল, পরীক্ষা তত ভালো হয়নি, পাঁচ-দশটাকা বৃত্তি যদি পাওয়াও যায়, বাড়ির অবস্থা কাহিল হওয়া তাতে ঠেকবে না। তার চেয়ে বড়ো কথা, ও রকম সর্বস্ব পণ করে লেখাপড়া শিখতে গেলে শুধু আর একটা পাশ করে থেমে যাওয়ার মানে হয় না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে শেষ করা যায়, চাকা এক পাক ঘুরল, তার সমাজ সংসারে গণ্য হওয়ার মতো মূল্য বাড়ল। চাকা আবার ঘোবালে অন্ত বি.এ. পাশ পর্যন্ত আর একটা পুরো পাক ঘুরতে দেওয়া চাই। চার বছর পড়া, চার বছর পড়ে অন্য সমাজ সংসারের মানুষ হয়ে যাওয়া, কারণ ওখানে ছাড়া তার আর তখন নিজের জগতে মূল্য নেই, সে সীমা পার হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের জগৎ সম্পর্কে পাঁচুর যথেষ্ট মোহ আছে। কিন্তু চাষাভুসোর জগৎ তার এমন আপন, এত প্রিয় যে তাকে বিগড়ে দেওয়া সামান্য মোহের কাজ নয়।

যেটুকু ঘষামাজা পেয়েছে তাতেই তার চোখে তার জগৎ বেশ খানিকটা নিঃস্ব অর্থহীন কুৎসিত হয়ে গেছে তবু। কী যে তার অবস্থা হত কে জানে, হয়তো গাঁয়ের চাষির জীবন আর চাষি আত্মীয়বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা অশ্রদ্ধায় বিষিয়ে যেত, পাকা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভদ্রজীবনে পাকার বিদ্বেষ, অমার্জিত চাষাড়ে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য তার ব্যাকুলতা এ খড়ের বাড়িতে

এসে তার মূর্খ নোংরা গরিব বাপখুড়ো পিসিমাসি ভাইবোনদের মধ্যে বিনা সমালোচনায় সহজ শ্রদ্ধা সহজ আনন্দে বাস করা, পাঁচুর নজরকে নতুন ভঙ্গি দিয়েছে। তার কাকা একগুঁয়ে জ্ঞানদাসের গেঁয়ো উগ্রতাকে বিদ্রোহের মর্যাদা দিয়ে চিরদিনের জন্য পাঁচুকে পাকা আত্মমর্যাদার ভিত্তি দিয়ে গেছে।

মনে মনে সে কাকার পরম ভক্ত, মাঝখানে শুধু কিছুদিনের জন্য একটা খটকা লেগেছিল। কাকা বুঝি তার শুধু মাথা গরম গোঁয়ার, দেশও বোঝে না, স্বাধীনতাও বোঝে না, ষাঁড়ের মতো শিং নেড়ে শুধু গুঁতোতে জানে। পাকা জ্ঞানদাসকে খাঁটি বীরের সম্মান দিয়ে তার মনের সংশয়ের মেঘ কাটিয়ে দিয়ে গেছে।

দেশ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিখ্যাত কত ভদ্র নেতার সম্পর্কে পাকার সাংঘাতিক অভক্তি আর কটূক্তি পাঁচুকে চমকে চমকে দিত। সেই পাকা জ্ঞানদাসকে—তার গোঁয়ার-গোবিন্দ কাকাকে—শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে গেছে। পাঁচুর কি আর সংশয় থাকে !

ঝাড় থেকে বাড়তি বাঁশ কাটা হয়েছে গোটা দশ-বারো। কাল হাটবার, গাড়িতে হাটে বেচতে পাঠাতে হবে। পাঁচুও হাত লাগিয়েছে। ধারালো দা দিয়ে কাটা বাঁশের কঞ্চি সাফ করতে করতে তার মনে হল একটা কথা। হাটে না পাঠিয়ে—

আঁ ?

হাট দুকোশ তো ? সদর সাত কোশ। হাট থে বাঁশ লেবে লোচন রসিক না তো খলিমুদ্দীরা। ফের সদরে চালান দেবে, লাভ করবে। তার চেয়ে মোরা যদি—

হাঁ ?

বসন্তের কাছারি-বাড়ি সংস্কারের জন্য দুটি বাঁশ দিতে হবে, ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

ধনদাস ঠেক্‌না বাঁশের লাঠি কাটছিল। ডগার সরু দিক থেকে বা শাখা থেকে লাঠির মতো একরকম ঠেক্‌না নিতে হয়, মাথায় বাঁশ বইতে হলে, দম ফুরিয়ে গেলে একটু থেমে জিরোবার সময় মাথার বদলে এই ঠেক্‌না লাঠিতে দিতে হয় বাঁশের ভার। দুটি বাড়তি সবুজ বাঁশের ওজন কত সে-ই জানে যে বাঁশের জোড়া মাথায় চাপিয়ে বয়। পুষ্ট মোটা তিনটি বাঁশ বইবার সাধ্য জোয়ান মন্দেরও হয় না। দম ফেটে যাবে, ঘাড় বেঁকে যাবে। হাট-বাজারে মাথায় যারা বাঁশ বয়ে নেয়, দুটির বেশি বাঁশ বড়ো দেখা যায় না।

সদরে দরটা কেমন ?

তা কে জানে ! পাঁচুকে মানতে হয়, তবে কিনা হাট থে কিনে সদরে তো চালান দেয়। মোরা যদি সদরে যাই—

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না ধনদাস আর জ্ঞানদাস। একজন বাঁশ-ঝাড়টার দিকে, আর একজন বাতাবি লেবু গাছের বাড়তি রংলাগা ফলটার দিকে দু-চারক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারাই খরচ করে পাঁচুকে সদর স্কুলে পড়িয়েছে, তারাই যদি এখন পাঁচুর মতামতকে যথেষ্ট পরিমাণ মর্যাদা না দেয় তা হলে চলবে কেন !

কথাটা মন্দ নয়।

জ্ঞানদাস প্রথম সায় দেয়। কী মৃদু তার কথা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, মায়া-মমতায় কী স্নিগ্ধ সুমিষ্ট তার উচ্চারণ ! এই জ্ঞানদাস নাকি জমিদার বসন্তের প্রাপ্য খাতির দেয় না, বেকার খাটতে ডাকলে কর্কশ জবাব দেয়, বসন্তের লেঠেলের মাথা ফাটিয়ে রক্তপাত করে।

ধনদাস শুধু বলে, তা দেখি একবার। তোমরা বলছ।

সেদিন তারা সপরিবারে এই নতুন প্রচেষ্টার রোমাঞ্চ ভোগ করে। বড়ো একটা শোল মাছ ধরে ঝাল রান্না হয়। মাছটা ধরে আনে পিসি সুভদ্রা। পরের পুকুরে দুবছর ধরে পোষা মাছ, এমনই দরকারের জন্যই বুঝি সুভদ্রা এঁটোকাঁটা ভাতের কণা কুড়িয়ে দুবছর প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পর

ডোবার ঘাটে গিয়ে বাঁ হাতে জলে ছলছল শব্দ করে ডান হাত জলে ডুবিয়েছে—হাত ঠুকরে ঠুকরে শোল মাছটা খাবার খেয়ে গেছে। আজ খপ করে কানকোর নীচে চেপে ধরে তাকেই অনায়াসে ধরে এনে সুভদ্রা মাছের ঝাল রান্না করল।

ভোর রাত্রে যাত্রা। অন্ধকার থাকতে। দ্যাখো, আটুলিগাঁর আকাশেও আজ চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। চাঁদের অস্ত যাওয়ার মহিমায় ভোর রাত্রির প্রবাদবাক্যের অন্ধকার আজ আম, জাম, বকুল, পলাশের দীর্ঘ ছায়ায় ঠাঁই পেয়েছে। গাছ যেন রোদেই ছায়া দেয়, দিনের বেলায়। সবাই যখন সজাগ। ভোর রাত্রের ঘুম-কাতর চোখকে যেন গাছের ছায়া আশ্রয় আর বিশ্রাম দেয় না।

গোরুর গাড়িতে সদর বাজারে বাঁশ বিক্রি করতে গেল খুড়ো-ভাইপো। মন্থর, দীর্ঘপথ, সাইকেলেও সদর এত দূর নয়। পৌঁছতেই দুপুর হয়ে গেল, বাজার তখন ভেঙে গেছে। এদিকে রাত দুপুরে রওনা দেওয়া উচিত ছিল। অতুলের বাঁশকাঠের আড়ত পাঁচুর জানা ছিল। দর সুবিধে পাওয়া গেল না। সে বেলার মতো বাজার ভেঙে গেছে বলে নয়। মাছ-তরকারির মতো বাঁশের বাজারের এ বেলা ও বেলা নেই, দরটাই পড়ে গেছে এ সব জিনিসের, মাটিতে যা জন্মায়। গাঁয়ের হাটে আট ন আনা পেত, সদরে এসে গড়ে এগারো আনা। তারই জন্য দুটো মানুষ দুটো গোরুর দিন ভোর খাটুনি।

না, বাণিজ্য তাদের পোষাবে না। গাড়িটা পুরো বোঝাই বাঁশ এনে বেচলে কিছু হত, দশটা-বারোটা বাঁশ এনে ব্যবসা হয় না।

ফেরার আগে বিকালের দিকে পাঁচু ভৈরবের বাড়িতে পাকার খবর আনতে যায়। এ বাড়িতে সে অচেনা নয়, কিন্তু পাকা নেই, কে আদর করে বসাবে ! পাকা ? পাকা নেই। কোথায় আছে ? কে জানে, কদিন আগে শ্রীনগর থেকে একটা চিঠি এসেছে।

সাইকেলের দোকানে কানাই কেরোসিন তেলে ফ্রি-হুইল সাফ করছিল। পরীক্ষা দিয়ে সেও দোকানের কাজে বেশি মন দিয়েছে। তারও লেখাপড়া সম্ভবত এই ম্যাট্রিকুলেশনেই সমাপ্তি। নলিনী দারোগার বউয়ের গয়না-ডাকাতির ব্যাপারে মারধোর খেয়ে কানাইয়ের জ্বর এসেছিল, ডাকাতির ধাক্কাও গেছে তার ওপর দিয়ে। মার খেয়েছে, মাস দুই আটক থেকেছে, এখন আছে নজরে নজরে, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাক পড়ে। শুধু সন্দেহ, সন্দেহজনক গতিবিধি আর মেলামেশা ছাড়া তার রেকর্ড নির্দোষ, নিষ্পাপ। তার চেয়ে বরং পাকার রেকর্ড খারাপ ছিল। অথচ পাকাকে শুধু দলের বন্ধু বলা যায়, দলের ঘনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী। কানাই শান্ত শক্ত, চাপা ছেলে। যেটুকু তার ছেলেমানুষি ছলকে বেড়ানো, সে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য, তার দলের খাতিরেই। দলের জন্য উপযুক্ত ছেলের প্রাথমিক খোঁজ আর বাছাই তার কাজ। এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও এ জন্য পাকা তাকে কখনও বুঝতে পারেনি, একসঙ্গে বিড়ি তামাক টেনে আড্ডা মারার মধ্যেও তার চরিত্রের একটা গোপন কঠোরতা তাকে পীড়ন করেছে, তাকে ত্যাগ করে দূরে সরে যাওয়ার জ্বালায় জ্বালায় কাবু হয়েছে। কোন গুণে কানাইকে কালীনাথ তার চেয়ে বিশ্বাস করেছে, বেশি মূল্য দিয়েছে পাকা কখনও ভেবে পায়নি।

কিন্তু পাঁচু খানিকটা অনুমান করতে পাবে। ভাবপ্রবণতায় তার বিচার-বুদ্ধি ঝাপসা নয়। তা থেকেই এসেছে সংসারে সাধারণ চালচলনের রীতিনীতিবোধ। কানাইয়ের গোপন বিপ্লবী জীবন একটা আছে আন্দাজ করেও কোনোদিন সে তাকে কোনো প্রশ্ন করেনি।

আজ বিচার বিবেচনা করে সে শুধায় : কালীদা ধরা পড়েনি, না ?

না।

অন্য নতুন কেউ ?

না।

আর কিছুই সে জিজ্ঞাসা করে না এ বিষয়ে। তার এ স্বাভাবিক সংযম জানে বলেই কানাইও এমন জবাব দিয়েছে যার স্পষ্ট মানে এই যে কালীনাথদের খবর সে রাখে। নয়তো সে শুধু বলত : আমি কী জানি ?

কানাইয়ের ন-বছরের নোলকপরা বোন রাধি দুটো কাঁসার বাটিতে তাদের মোয়া দিয়ে যায়। হাত না ধুয়ে দু পরল কাগজ দিয়ে ধরে কানাই মোয়া খায়, বলে, শ্যামলবাবু আছে কেমন ?

তেমনই আছে।

শ্যামলের খবরটা তার নিজে থেকে দেওয়া উচিত ছিল, পাঁচু ভাবে। এদের জগতের লোক সে। কবে শেষ হয়ে গেছে শ্যামলের বিপ্লবী জীবন, ক্ষীণ অশক্ত শরীর নিয়ে কোনোমতে সে টিকে আছে একটা গাঁয়ের একপ্রান্তে, তবু তার কুশলটাই কানাইদের কাছে মূল্যবান, সে তাদের আপনজন, একদিন সে বিপ্লব করেছে। কাঞ্চনপুর থেকে কেউ আটুলিগাঁয়ে তাদের বাড়ি এলে সে যেমন জিজ্ঞাসা করত তার মামার খবর, আটুলিগাঁ থেকে সে এসেছে বলে তেমনিভাবে কানাই জিজ্ঞেস করছে শ্যামলের কথা। কানাইয়ের কাছে আটুলিগাঁয়ে একজন মানুষ থাকে, পুরানো বিপ্লবী শ্যামল।

তাই বটে। আত্মীয়তার মানেই তাই।

এই রাধি লো ! জল দিবি নে ?

মুখচোখ কুঁচকে ফোকলা দাঁত বার করা একরাশি হাসি দিয়ে এই ত্রুটি ঢেকে রাধি জল আনে। ধনদাস সম্প্রতি পাঁচুর বিয়ের কথা বলছে, এই বয়সি এই রকম একটি মেয়ের সঙ্গে, হয়তো দুধে দাঁত খসে এমনি ফোকলাও হবে। ভাবলে পাঁচুর গা ঘিনঘিন করে না। আত্মীয়-কুটুম-স্বজাতির ঘরে ঘরে এই বয়সের কেন, এর চেয়ে কচিকচি বউ দেখাই তার অভ্যাস, সংস্কার। তবে কি-না বিয়ের সাধ তার নেই। জ্ঞানদাসেরও অমত। বিয়ে কি পালায় বেটাছেলের ? যাক না কিছুকাল. সাত-তাড়াতাড়ি বাঁধনের কী দরকার !

আজকেই ফিরে যাবি ? কানাই বলে।

নইলে থাকব কোথা ?

এখানে থাক না আজ।

কথাটা বড়ো ভালো লাগে পাঁচুর। পাকার মধ্যস্থতায় তার কানাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব। পাকা না থাকায় আজ সে দূরত্ব বোধ করছিল, বন্ধুর কাছে এসেও বন্ধুকে না পাওয়ায় কষ্ট বোধ করছিল। এক মুহূর্তে সে খুশি হয়ে উঠল।

দাঁড়া তবে বিদেয় করে আসি কাকাকে।

বন্ধুর বাড়ি একটা দিন কাটাবার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় পাঁচুর। পাঁচ ঘণ্টা থানায় কাটিয়ে আটুলিগাঁ ফিরতে হয়। হয়রানির একশেষ।

২

থমথমে মুখে জুলজুলে চাউনি, তাতে আবার ঘনঘন নিশ্বাস। দেখেই ধনদাসের টের পেতে বাকি রইল না ছেলেটার বেজায় জ্বর এসে গেছে—ম্যালোরি। জ্ঞানদাস আন্দাজ করল, জ্বরজারি সাধারণ ব্যাপার নয়, কিছু একটা ঘটেছে, ঘা খেয়ে জখম হয়েছে পাঁচু। দেহমন দুয়েই জখম হয়েছে, নয়তো এমন হত না। দাঁতে দাঁতে ঠুকে যায় জ্ঞানদাসের, দুচোখ জ্বলে ওঠে। রও রও তোমার সাথে বোঝাপড়া হবে জ্ঞানদাসের, যে তুমি এমন করে ঘা দিয়েছ তাদের পাঁচুকে। তা হও গে সে তুমি দারোগা জমিদার লাটসায়েব ! আগে একবার শুনতে দাও ব্যাপারটা।

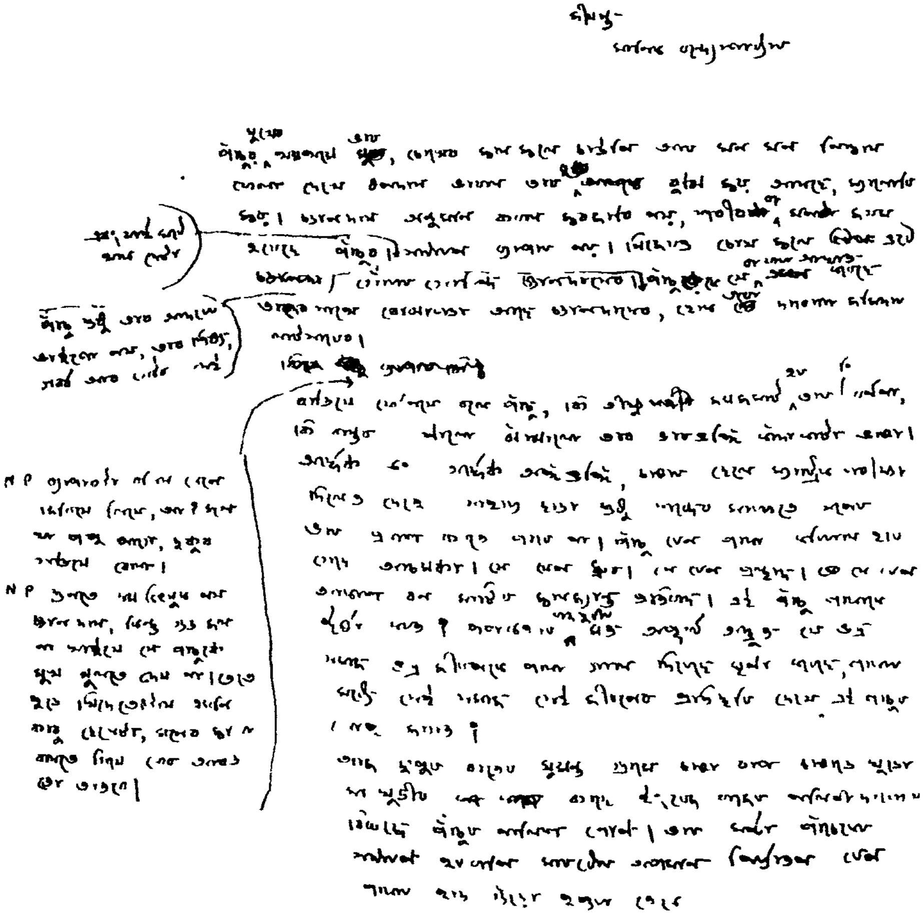

জীবন্ত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

কিন্তু না, এক খাবলা গুড় আর কলসির ঠান্ডা জল না খাইয়ে পাঁচুকে সে মুখ খুলতে দেয় না। তেতে পুড়ে খিদে তেষ্টায় এমনই কাতর ছেলেটা, মনের জ্বালা মুখে প্রকাশ করতে গিয়ে আরও তো তাতবে।

বলিস কেনে জিরিয়ে লিয়ে ? মিঠে আর জলটুকু খেয়ে নে আগে। দুকুর গড়িয়ে গেছে বেলা, গরম কত !

ঠান্ডা হয়ে বাড়িতে ফেনিয়ে রোমাঞ্চকর বিবরণ দেয় পাঁচু, কথা আর অঙ্গভঙ্গি মিলে কী যে জমজমাট প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার বর্ণনা। তার প্রাণ থেকে যে তীব্র ঝাঁজ আর উগ্র ক্ষোভ উথলে বেরিয়ে আসতে থাকে সোজা স্পষ্ট গেঁয়ো ভাষায় শুনলে নলিনী দারোগারও চমক লেগে যেত। পাকার কথা ধরাই চলে না, কানাইয়ের তুলনায়ও তার পাঁচ ঘণ্টার নির্যাতন এক রকম কিছুই নয় বলা চলে। কিন্তু ওদের চেয়ে তার যেন শতগুণ বেশি রাগ। চাষার ছেলে ভীরু নরম হয়, পাঁচুর রকম দেখে এ ধারণা আর টিকিয়ে রাখা যায় না। পাঁচ ঘণ্টা সে কেন তবে মুখ বুজে সব সয়ে গিয়েছিল, একবারও ফোঁস করে ওঠেনি ! ওটাও রীতি চাষার ছেলের, অত তার ফাঁকা ভাবোচ্ছ্বাস থাকে না, আলগা হয়েও থাকে না হৃদয় মনের ছিপি যে মিছামিছি বেহিসেবি ফুঁসে উঠবে। মাটি তাকে ধৈর্য শেখায়।

ঘরের দাওয়ায় এখানে বিপদ নেই বলে যে প্রাণ খুলে ছাঁকা মিথ্যে আওড়াচ্ছে তাও সত্য নয়। যতটা সে বলতে পারছে তার চেয়ে অনেক বেশিই বরং তার অন্তরের বিক্ষোভ, খাঁটি জ্বালা। কারণ, এ তো শুধু তার উপর নির্যাতনের কথা নয়। এক রাত্রির অত্যাচারে মরতে মরতে বেঁচে উঠে পাকা না হয় একা সে অত্যাচারের জ্বালা নিজের বুকে পুষে সামলে উঠতে দেশভ্রমণে গেছে, সে ভদ্রঘরের ছেলে, তার দরাজ বুক। এর আগে সরকারি দাপটের টোকাটিও পাঁচুর গায়ে কখনও সরাসরি লাগেনি, তার জীবনে থানায় গিয়ে নলিনী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গের কানমলা চড়চাপড় গালাগালি গায়ে মাখা এই প্রথম। তাই বলে দেশজুড়ে অন্যায়ের জগদ্দল চাপ কি জন্ম থেকে তার বুকে চাপ দেয়নি ? গাঁয়ে তার আপন কাকা জ্ঞানদাস আর শহরে তার আপন বন্ধু পাকা ও কানাই কি শুধু তাকে জ্বালা জুগিয়েছে ? জ্ঞান হয়ে থেকে হৃদয় মন জ্বালা করার অসংখ্য কারণ দেখে আসছে, শুনে আসছে—বইয়ে অনাচার অত্যাচারের বিবরণ পড়ে রক্তে আগুন ধরে গেছে। রাগ তাই পাঁচু কম সঞ্চয় করেনি এই বয়সে। স্কুলে পড়লেও মনের চাষাড়ে ভোঁতা গুণটা রয়ে গেছে বলে, যা নিছক সহনশীলতা—সয়ে সয়ে সব কিছু সয়ে যাবার বংশগত অভ্যাস, নিজে ঘা খাওয়ার আগে রাগটা তাই এমনভাবে ফেটে পড়েনি।

ও শালাকে তুমি ঘায়েল করো কাকা, এসো মোরা মারি ওটাকে।

পাঁচু এমনভাবে কাঁদে যেন ফুসফুসে তপ্ত বাষ্প ছাড়ছে, এমনভাবে থরথর করে কাঁপে যেন আঘাত হানার উদ্দাম কামনাই দেহটা নাড়ছে। বাঁশের ঠেঙ্গা লাগান শালের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছিল প্রথমে, কথা শুরু করে সিধেই উঠেছিল, এখন একেবারে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার উগ্রমূর্তি দেখলে ভয় করে।

ভয় করে এই জন্য যে, এ তো বাপখুড়োর সামনে হাম্বিতাম্বি করা নয় যে ঘরের দাওয়ায় রাগ ঝেড়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে। ফোঁসফোঁসিয়ে জ্বালা উপে যায় না তাদের, বুকেই থাকে,—ভাষার সঙ্গে সারা দেহটা লাগিয়ে প্রকাশ করার এমনই ব্যাকুল চেষ্টায় না কমে বেড়েই যায়।

সুভদ্রা ডুকরে কেঁদে ওঠে : ও কথা বলিস নে বাপ ! মোদের পাঁচুকে তোমরা সামলাও না গো, ঠান্ডা করো।

পাঁচু চোখ পাকিয়ে ধমকায় : চুপ মার পিসি, চুপ মেরে যা। মেয়েলোক তুই কথা কইতে আসিস নে মোদের ব্যাটাছেলের কথায় !

না সোনা, এ সব্বোনেশে কথা মুয়ে আনিস নে তুই !

রা কাড়িস নে পিসি, মেরে মুখ থেঁতলে দেব।

মারের ভয় কি পিসি মানে, পাঁচু তার মারমূর্তি হয়ে দারোগাকে মারতে চলেছে—চলেই বুঝি গেল !

কী যন্তনা, কথার কথা কইছে বই তো না ? বুড়িয়ে গেলি তোর জ্ঞানগম্মি হল না সুভদ্রা মোটে !

সুভদ্রাকে থামিয়ে ধনদাস ছেলেকে শান্ত করার একমাত্র অস্ত্র খাটায়, জ্ঞানদাসের বেলাতেও সে এ অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে, টিটকারি দিয়ে বলে, বীরপুরুষ ! কেরদানি দেখাচ্ছে ! সে রইল সে সদর থানায়, দাওয়ায় এর লম্ফঝম্প ! একদম মেরে টেবে কম্মো সেরে এলেই হত ? হাটে চাটে সেপাইয়ের জুতো, ঘরে মারে মাগকে গুঁতো। বীরপুরুষ !

তুমি তো কেঁচো, কী জানবে ? বাবুরা অমন কত দারোগা ম্যাজিস্ট্রেট মারছে !

ক্রুদ্ধ অপমানিত পাঁচু কটমটিয়ে চেয়ে থাকে, বাপ না হলে মেরে বসত ধনদাসকে। দুচোখ ভরা স্নেহ আর শ্রদ্ধামর্যাদা ধনদাস ছেলের সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিতে থাকে, মুখে কিন্তু তেমনই টিটকারির সুরেই বলে, অ্যাং* যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে মুইও চলি ! বাবুরা বোমা পিস্তল দে সাহেব মারে, তুই দা নিয়ে ছোট্, দারোগা মেরে আয়।

এ তো শুধু টিটকারি নয়, বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধির কথাও বটে। যে এ ভাবে লাঞ্ছনা করেছে তাব পাঁচুকে তা'কে যদি উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় ধনদাস খুশিই হবে, কিন্তু শিক্ষা দেওয়া যায় কি-না সেটা তো দেখতে হবে ! একজন অকারণে ছ্যাঁচা দিয়েছে বলেই তো রাগের মাথায় দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাথরে মাথা ঠুকে মরা যায় না, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া যায় না। সাধ হলেই তো প্রতিশোধ নেওয়া যায় না সদর থানার প্রবল প্রতাপ দারোগার ওপর। শুধু তাই নয়, আরও হিসাব আছে। অসম্ভব সাধকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে পাগল হওয়া, প্রতিকারহীন জ্বালায় নিজে জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া, স্রেফ বোকামি। রাগের জ্বালায় এ রকম পাগলের মতো যে করছে পাঁচু, গায়ে কি আঁচড়টি লাগছে নলিনী দারোগার, কোনো দিন লাগবার সম্ভাবনা আছে ? এ সব কথা মুখ ফুটে বলতে হয় না ধনদাসকে, পাঁচুরও ভালো করেই এ সব জানা আছে, ধনদাসের টিটকারি শুধু মনে পড়িয়ে দেওয়া বই তো নয়। পাঁচুর উগ্র প্রচণ্ড রূপ ঝিমিয়ে আসে, সে গুম খেয়ে থাকে, কিন্তু ক্ষোভ তার কমে না, তার উতলা ভাব যায় না। সে শান্ত হবে, তার রাগ জুড়িয়ে যাবে, এ আশা অবশ্য ধনদাসও করেনি !

মোর যা হবার হবে। নয় মরব। মরলে কী হয় ?

কী হয়। কচু হয়। জ্ঞানদাস ভারী গলায় নিবিড় সহানুভূতির সঙ্গে বলে, মরা কিছু লয় বাপ ! মরণকে সবাই ডরায়, আঁধারকে ডরায় না ? দরকার পড়লে ঘোর আঁধারে বনবাদাড়ে যায় মানুষ, মরণকেও বরণ করে। ফল যদি হয় তো মর না কেনে তুই, হাজার বার মর্‌গে যা, কে বারণ করেছে ? আর কিছু হোক বা না-হোক উয়ার গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে তো মরবি, না কি ? বোকার মতো মরাই সার হবে, সেটা কাজের কথা লয়।

মনে মনে উদ্‌বিগ্ন হয়েছে ধনদাস, গভীর দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে এসেছে। কে জানে বাবুদের বিদ্যা সংসারের সহজ সরল হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে কি-না পাঁচুর ! জ্ঞানদাসকেও চিন্তিত দেখায়। ভাই তার যাই ভাবুক, ফাঁকা নিষ্ফল গোঁয়ার্তুমির পক্ষপাতী সেও নয়, নিছক ঝোঁকের বশে আত্মনাশের মানে সেও বোঝে না। কড়ায়-গণ্ডায় মরণের মূল্য আদায় না করে ভাবের বশে প্রাণ দিতে তার সায় নেই। তার ছেলেমানুষ পাঁচু শহরের স্কুলে পড়ে হয়তো অন্য হিসাব শিখেছে। নলিনী দারোগাকে শুধু তেড়ে

*অ্যাং—লেটা মাছের মতো লালচে মাছ।

মারতে গিয়ে বিপদে পড়াটা হয়তো যথেষ্ট প্রতিশোধ, উচিত কাজ ভেবে নেবে ? অনেক বিষয়ে অনেক কথা পাঁচু বলে যার উদ্দেশ্য এমনই শূন্য, মানে এমনই ফাঁকা !

৩

চাষি সমাজ বর্ষার পথ চেয়ে আছে, বৃষ্টি শুরু না হওয়ায় ইতিমধ্যে উদ্‌বেগ বোধ করছে। প্রতিদিন তা শঙ্কায় পরিণত হবার দিকে বেড়ে চলে। অবস্থা এমন যে মারাত্মক অনাবৃষ্টির কথা ভাবাই যায় না, প্রকৃতির সাধারণ সামান্য অনিয়ম ব্যতিক্রমের ফলে খুব কম অনিষ্ট হলে তাই মারাত্মক হয়ে ওঠে অনেকের পক্ষে। একটা বছর আংশিক অজন্মার ধাক্কা সামলানো পর্যন্ত অসাধ্য হয়ে গেছে। বনের জন্য স্থানীয়ভাবে আগে একটা বিশেষ বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হত, বনের সঙ্গে সে বর্ষণও কমে গেছে। বর্ষা নামতে দেরি হলে বিপদ অনিবার্য ; হয় খরা নয় বন্যা। সময়ের নিয়ম একবার লঙ্ঘন করা হয়ে গেলে এই দুটি চরম ছাড়া আকাশ আর সামঞ্জস্য জানে না।

কিছুদিন মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে, জল নামার অপেক্ষায় থাকা ছাড়া এখন আর কাজ নেই, সাময়িক আলস্যে পাঁচুর ক্ষোভ আর অসন্তোষ তাকে অস্থির করে রাখে। ধনদাস ও জ্ঞানদাস দুজনেই সেটা লক্ষ করে, মেয়েদের কিছু না জানিয়ে শুধু তারা দুভাই পাঁচুর বিয়ের কথাটা নিজেদের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। কালটির বৃন্দাবনের মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, ঘরের দিক থেকেও অসমান নয়, শুধু পাঁচুর হিসাবে বয়সটা বেমানান, এগারো হবে। আটের বেশি বয়সের মেয়ে, পাঁচুর সঙ্গে মানায় না, বড়ো মেয়ে আনলে পাঁচু যখন হবে বাইশ চব্বিশ বছরের হালকা জোয়ান, পরিবার তার হয়ে দাঁড়াবে রসঘন হয়ে আসা থমথমে সোমথ ভারিক্কি যুবতি। সে বড়ো মারাত্মক যোগসাজস, ভাগ্যক্রমে উতরে যদি যায় তো ভালো, নয় তো সব বিগড়ে যায়। তবে যে জন্য তারা তাড়াতাড়ি পাঁচুর বিয়ে দেবার কথা ভাবছে তাতে বাড়ন্ত তৈরি মেয়ে হলেই ভালো।

পাঁচুর বিয়ে দেওয়া সম্পর্কেই জ্ঞানদাসের একটা খটকা আছে, সে খেদের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ওতে মন জুড়ায় না গো, সে আশা মিছে। তবে হাঁ, বাঁধন পড়ে একটা, নিরুপায় করে দেয় খানিকটা। মনের জ্বালা মনেই পুষে রাখতে হয়, হঠাৎ যে ঝাঁপ দেবে তার জো রয় না। ফের ইদিকে কিন্তু—

এ সব কথার মর্ম ভাসা ভাসা বোঝে ধনদাস, পাঁচুর অনেক কথার মতো বস্তুহীন হাওয়া নিয়ে কারবারের মতো ঠেকে। বউ এনে যদি ঠেকানোই যায় পাঁচুর হঠাৎ সাংঘাতিক কোনো কাণ্ড করে বসার বিপদ, গরম যদি নরম হয় পাঁচুর, তবে তো সার্থক হয়েই গেল এখন বিয়েটা দিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য। এর মধ্যে আবার মনের হিসাব আসে কীসে ?

এটা ছাড়া জ্ঞানদাসের আরও খটকা আছে শুনে ধনদাসের আরও অসহায় মনে হয় নিজেকে।

ফের ইদিকে কিন্তু তোমার আমার মতো নয় পাঁচু, ওর ধারা ভিন্ন। আটক বাঁধন মানবে কি-না কে জানে বল ?

তবে ? তাই যদি না মানে পাঁচু তবে আর তার বিয়ের কথা ভেবে লাভটা কীসের ? মাঝে মাঝে যে কথা অনেকবার অনেক কারণে মনে হয়েছে ধনদাসের আজ আরও জোরের সঙ্গে সেই কথা মনে হয়,—ছেলেকে শহরে পড়তে দেওয়া বুঝি ঝকমারি হয়েছে ! জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরা ছোঁয়া যায় না, তার ঘরে নইলে কি এমন সমস্যা সৃষ্টি হয় ! প্রায় এমনই অবস্থায় সে জ্ঞানদাসের বিয়ে দিয়েছিল, পাঁচুর মতোই তার ছটফটানি এসেছিল। স্বভাব যায়নি জ্ঞানদাসের, গোঁয়ারই সে রয়ে গেছে ! তা থাক না। তার স্বভাব তো আর বদলাতে চায়নি ধনদাস বিয়ে দিয়ে, বিয়ে করে নাকি কারও স্বভাব পালটায় ! সাময়িক যে উন্মত্ততা এসেছিল, পুরুষ মানুষ কেন, তার শান্তশিষ্ট গাইটা

পর্যন্ত যে স্বাভাবিক অবস্থায় দড়ি ছিঁড়ে চার পা তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করে, সেটা তো কেটেছিল জ্ঞানদাসের। যাই বলুক আর যাই করুক, ভালো থেকে সুখে দুঃখে ঘরকন্না সে করছে না ? সাত বছরের মেয়ে সে এনেছিল জ্ঞানদাসের বেলা। পাঁচুর বেলা বৃন্দাবনের ওই বাড়ন্ত মেয়েটা এনেও ফল হবে না ? এ কোন দেশি রীতিনীতি হিসাবনিকাশ কে জানে, মাথায় ঢোকে না ধনদাসের।

মাঝে হঠাৎ পাঁচু একবার সদরে গিয়েছিল, শ্যামলের একটা দরকারি ওষুধ আনতে। সদরে যাওয়া কী আর এমন ব্যাপাব, মাসে দশবার খুশি হলে ঘুরে আসা যায় অনায়াসে। এবার শহরের ওপর দারুণ একটা বিরাগ জন্মেছে, সদরে নলিনী দারোগা থাকে। সদরে যে তার জানাচেনা বন্ধুও শত শত থাকে, কানাই আর নোলক-পরা ফোকলামুখ রাধি থাকে, এক নলিনী দারোগার সদরে বাস করাটা তাদেব সবার উপস্থিতিকে ছাপিয়ে উঠেছে। ঘৃণার কী আগুনটাই জ্বলেছে পাঁচুর মনে ! নলিনী ইতিমধ্যে আবার এ আগুনে নতুন ইন্ধন জোগাবার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। কালীনাথের ওপর আর এক চোট নির্যাতন বর্ষণ হয়ে গেছে, সরকারি হুকুমে সে এখন ঘরবন্দী। কালীনাথের মতো চাঁইদের এত চেষ্টাতেও ধরতে না পেরে ইংরেজ সরকার খেপে গেছে, কার্লটনকে মারার একটা চেষ্টা প্রায় শেষ মুহূর্তে ঠেকানো গেছে কিন্তু নিছক ষড়যন্ত্রটা ছাড়া ষড়যন্ত্রকারীদের একজনকেও ধরা যায়নি। সাগব পারের শিখব থেকে গাঁয়ের থানার শেকড় পর্যন্ত সবকারি দপ্তরে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে নিষ্ফল আক্রোশের, এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা এমন বিরাট আয়োজন সব কিছুকে তুড়ি দিয়ে যদি স্বদেশি ছোকরারা এ ভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে পারে, কদিন টিকবে ইংরেজ রাজস্ব ? যে ভাবে পাব ধ্বংস করো বিদ্রোহ।

কানাইয়ের যোগাযোগ আছে এটা পুলিশের জানা ছিল কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও বাব করা যায়নি যোগসূত্রটা কী। কোনোমতেই কানাইয়ের চব্বিশ ঘন্টার গতিবিধির হদিস রাখা যায়নি, এক্সপার্ট নজরও হার মেনেছে। তিনদিন হয়তো সে সাইকেল দোকানে ঠুকঠুক মেরামতি কাজ করে বাজারে গিয়ে মাছ-তরকাবি, দোকানে গিয়ে সওদা আনছে, আর কোথাও যায় না, কিছুই করে না। পবদিনও তেমনই বাজারে গিয়ে সে হারিয়ে গেল, ঘণ্টা চাবেক পাত্তা নেই। এমনি জেরা করা যায় না, টেব পাবে কড়া নজর আছে, সাবধান হয়ে যাবে, হয়তো যোগাযোগ ঘুচিয়েই দেবে ভয় পেয়ে। চেনা লোককে দিয়ে সাধারণ কথাবার্তার মারফতে জানার চেষ্টা করতে হয়।

মাধব ধীরে ধীরে তাব সঙ্গে পরিচয় গড়ে তুলছে। পিছনের চাকার ভাল্‌ভটা নিজেই খুলে ফেলে সাইকেল নিয়ে দোকানে গিয়ে ভাল্‌ভ লাগিয়ে দিতে বলে মাধবকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করতে হয়, কোথা গিয়েছিলে কানাই ?

বেলতলায় কীর্তন শুনে এলাম। আঃ, ফাইন কীর্তন দিয়েছে !

শয়তান ছেলে ! যেখানে ভিড়, যেখানে যাচাই করা যাবে না সে সত্যই গিয়েছিল কি-না এমনি সব জায়গা ছাড়া সে কোথাও যায় না ! একবার সুনিশ্চিত জানা গেল দুটি পিস্তল কানাইয়ের হাতে পৌঁছেছে, হানা দিলে মেরামতি দোকানেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ সুসংবাদ, পিস্তল কানাই যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। তাড়াতাড়ি দেবে, তাকে সন্দেহ করা হয় জানে, নিজের কাছে বেশি সময় রাখতে সাহস পাবে না। অবিলম্বে আঁটঘাট বাঁধা হয়ে গেল, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হল কানাই আর তাদের দোকানবাড়ির ওপর, এবার আর ফসকালে চলবে না। সামনে সাইকেল মেরামতের দোকান, পিছনে কানাইদের বসবাস। বাড়িটার পিছনে একটা পুকুর, ওপারে কুমোরপাড়া—পিছনেও কড়া নজর রইল।

যথাসময়ে কানাই দোকান বন্ধ করল, ভেতরে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া সারল। তাবপর গরমের দুপুরে বাড়ির লোকের একটু তন্দ্রার ভাব এলে অন্দরের যে জানালাটা পাশের বাড়ির অন্দরে খোলে এবং যে জানালা মারফতে দুই অন্দরের মেয়েরা কোন বাড়িতে কী রান্না হয়েছে থেকে জগৎ-সংসারের সব বিষয় নিয়ে আলাপ করে, সেই জানালাটি খুলে শিস দিয়ে ধরে দিল বেসুরো গানের সুর।

ঠিক যেন ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনা, খানিক পরে সত্যি সত্যি একটি কিশোরী মেয়ে এসে দাঁড়াল জানালার ওপারে। কানাই তাকে জন্মাতে না দেখলেও আঁতুড়ঘরে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে দেখেছে, কানাইয়ের নিজের বয়সও অবশ্য তখন ছিল বছর চারেক।

ভাগ্যিস তুই ঘুমোসনি ঘেঁটু !

আহা, আমি যেন দুকুরে কত ঘুমোই !

নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্যাকেটটি কানাই তার হাতে দেয়। পাংশু মুখে কড়া চোখে তাকায় ঘেঁটু।

ফের তুমি এ সব করছ ? এত তোমার পয়সার খাঁকতি !

নে নে হয়েছে। নিজের ভাগটি তো ঠিক বুঝে নাও !

আচ্ছা, সত্যি এতে কী আছে কানাইদা ? চুপিচুপি একদিন খুলে দেখতে হবে।

ঘেঁটু ফিক করে হাসে।

কানাই উদাসভাবে বলে, দেখিস। একটি সুতোর গিঁট দুবার লাগানো হলে ওরা টের পেয়ে যায়। লুকিয়ে এ সব ব্যবসা যারা করে এমনি তারা ভালোমানুষ, পিছনে লাগতে গেলে মজা টের পাইয়ে দেবে। এখান থেকে জিনিসটা একটু ওখানে পৌঁছে দেবার জন্যে এমনি কেউ অতগুলি টাকা দেয় ?

আপিম-টাপিম হবে বোধ হয় অ্যাঁ ? তুমি নিশ্চয় আমায় ঠকাও কানাইদা, কম টাকা দাও।

যা পাই তার আদ্দেক দি। আমি দশ টাকা পেলে তোকে পাঁচ টাকা দি। যা এখন, লুকিয়ে ফেলবি যা।

ভোরে স্কুলে যাবার পথে ঘেঁটুর কাছ থেকে প্রতিমা জিনিসটা নেয়।

আপনি কত পান ?

তোমায় বলব কেন ?

যথাসময়ে তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয় কানাইয়ের দোকান আর ঘরবাড়ি। তারপরেই ঘরবন্দীর হুকুম জারি হয়। তবে কানাইয়ের সঙ্গে যে-কেউ দেখা করতে আসতে পারে, তাতে কোনো নিষেধ নেই। কানাই বাইরে যাদের সঙ্গে যোগ রাখত, তারা কেউ যদি কানাইয়ের সঙ্গে যোগ রাখতে আসে কখনও, এই আশা।

একবারে বুঝি শিক্ষা হয়নি ?—কানাই বলে পাঁচুকে, বন্ধুকে পেয়ে সে খুশি হয়েছে বোঝা যায়। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে থাকতে দম আটকে আসছিল। কেউ বড়ো একটা আসে না এ বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনও একরকম বর্জন করেছে। দোকানে কাজকর্ম নেই, ভয়ে কেউ সাইকেল সারাতে আসে না, রসিক একলাটি চুপচাপ দোকানে বসে থাকে। পাঁচুর সঙ্গে এবার কানাই আশ্চর্যরকম খোলাখুলি ভাবে কথা বলে। ঘেঁটুর মারফত পিস্তল দুটি সরানোর গল্পও সে-ই নিজে থেকে পাঁচুকে শোনায়। গতবার তাকে যে থানা হয়ে গাঁয়ে ফিরতে হয়েছিল এ খবর কানাইকে কে দিল পাঁচু প্রথমে ভেবে পায়নি, দেখা যায় শ্যামলের কাছে তার ঘনঘন যাতায়াতের খবর কানাই জানে। বন্ধুর প্রতি তার ভালোবাসার সঙ্গে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর শ্রদ্ধাভক্তির ভাব এসে মেশে। বিপ্লবীদের মধ্যে বন্ধুর যে তার এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে তাতে পাঁচুর বিশেষ গর্ব খর্ব হয়। কানাইয়ের আত্মবিশ্বাস, সাহস, শক্তি আর শান্তভাব তাকে মুগ্ধ অভিভূত করে রাখে।

কানাই ভণিতা করে না, সোজাসুজিই বলে, শ্যামলদা তোর খুব প্রশংসা করেছে। তুই যদি ইচ্ছা করিস পাঁচু, আমাদের সঙ্গে ভিড়তে পারিস।

কদিন ভেবে দেখে বলব।

নিশ্চয়, এ তো ছেলেখেলা নয়। সব সুখের আশা ছেড়ে জেল ফাঁসি সব কিছুর জন্যে তৈরি হয়ে আসতে হবে। বরং না আসা ভালো, এসে ভড়কে গেলে চলবে না।

এ বয়সে মনের এমন ভারিক্কি গড়ন কানাই কোথায় পেল কে জানে ! এমনিভাবেই কি শিখিয়ে পড়িয়ে ছেলেদের গড়ে নেয় বিপ্লবীরা ? কাজের মধ্যে নিজের যে পরিচয় সে দিয়েছে কথাগুলি তারই প্রতিরূপ বলে বেমানান শোনায় না, মনে হয় বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষের মতো কথা বলার অধিকার তার আছে।

বোধ হয় এখানে থাকব না ভাই।

কেন ?

মিছামিছি বাড়ির সবাই জুলুম সইছে। দোকানের রোজগার একদম বন্ধ। এমনি আটকে থেকেও লাভ নেই।

পালাবি ?

তাই ভাবছি।

এগারো

১

পাঁচুও ভাবে।

কানাই আর এক পথের সন্ধান দিয়েছে। মরিয়া হয়ে শুধু নলিনীকে ঘা মারার চেয়েও চরম পথ, ইংরেজ গবর্নমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়া। পাঁচু জোরালো আকর্ষণ অনুভব করে, এমন বিরাট আয়োজন যাদের—সৈন্য পুলিশ কামান বন্দুক—তাদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ায়ে নেমে কানাইয়ের মতো বিপজ্জনক জীবন গড়ে তোলা, দাসত্বের মধ্যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া।

কিন্তু মনের মধ্যে কীসে যেন বাধা দেয়।

নলিনীকে খুন করে ফাঁসি যাবার মানে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওটা তার নিজের ব্যক্তিগত অসহ্য জ্বালার ব্যাপার। ওই বিদ্বেষ আর ওই আঘাতটা সৈন্য-পুলিশ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাট-বড়োলাটের প্রকাশ্য গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার কল্পনা তাকে উদভ্রান্ত করে দেয়, ব্যাপারটা মনের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারে না। কত তফাত শক্তির—একদিকে কত বড়ো গবর্নমেন্ট, অন্য দিকে কতটুকু কানাইয়ের দল ! ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মাইনে করা লাখ লাখ সৈন্যরাও তো যুদ্ধে প্রাণ দেয়, এদিকে কত চেষ্টায় কত খুঁজে পেতে কত বাছবিচার বাছাই করে কানাইদের এক একটি ছেলে জোগাড় করতে হয়। কানাইয়ের মতো বিশেষ গুণ না থাকলে কাজেও লাগে না।

কী করে কী হবে ? সে যে বুঝতে পারে সেটা নিশ্চয় তার দোষ। নলিনীর কথা ভাবলে পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তার জ্বলে যায়। ওটাকে সাবাড় করে এখুনি সে হাসিমুখে ফাঁসি যেতে পারে, কিন্তু সারা গবর্নমেন্টের কথা ভাবলে তো এ রকম নাড়া লাগে না। একটা গভীর অতল অসন্তোষ মনটা ভারী করে দেয়, ক্ষোভের জ্বালা ধিকি ধিকি জ্বলে।

ইংরেজ গবর্নমেন্টের চেয়ে বরং বসন্তবাবুদের উচ্ছেদ করে মেরে দেশছাড়া করার কল্পনায়ই উৎসাহ জাগে বেশি।

কেউ যদি পাঁচুকে বলে দিত।

শ্যামল বলে, বলে দেবার লোকের অভাব নেই ভাই। আমিও এককালে সবাইকে বলতাম, আমার কথা শোনো, মঙ্গল হবে। আজ আমি বলি, যেটুকু বুঝেছ সেইটুকু নিয়ে কাজে নামো। কাজ করো আর সেই সঙ্গে আরও বোঝবার চেষ্টা করো। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজে তুমি যা বুঝবে কারও বাবার সাধ্য নেই মুখের কথায় তোমাকে তার চেয়ে বেশি বুঝিয়ে দেয়।

পাঁচু সংশয় ভরে বলে, কিন্তু মোটামুটি একটা আদর্শ না ধরে, একটা পথ ঠিক না করে—

শ্যামল বলে কর্ম আর চেতনার সমন্বয়ের কথা ভাবছিলাম কদিন থেকে। আদর্শ আর কর্মের সমন্বয় ছাড়া পথ নেই। বসে বসে আদর্শ নিয়ে শুধু ভাবলে আদর্শ গুলিয়ে যায়, ঝোঁকের মাথায় শুধু কাজ করে গেলে কাজ পণ্ড হয়।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু আদর্শ তো থাকা চাই একটা যাতে বিশ্বাস করি ? নইলে কাজে নামব কী নিয়ে ?

শ্যামল একটু চুপ করে থাকে।

গীতার কর্মযোগ নিয়ে সারা জীবন মারামারি করেছি—গীতা পড়েছ তো ? সারা জীবনের কর্মফল যোগ করে আজ ভাবছি, অত মারামারি নাই-বা করতাম ! ভাব-ভাবনার কথা নিয়ে মারামারি করতে হয়, নইলে মন ঠিক হয় না, ঠিকমতো কাজ কবা যায না। কিন্তু শুধু ভাবনা নিয়ে মেতে থাকলে চলে ? ভাবনার তাতে পুষ্টি হয় ? চিন্তারও তো খোবাক চাই, কাজ হল সেই খোরাক। যখন সমস্যা আসে কী কবব, এটা করব না ওটা করব, তখন দুদিন চারদিন দুমাস চারমাস ভাবা উচিত। কিন্তু অ্যাদ্দিন তুমি কী করেছ সেটা স্রেফ বাদ দিলে কি চলে ভাবনা থেকে ? আজ কী কবব এই যে চিন্তা সেটা আসলে এসেছে অ্যাদ্দিন কী করেছি তাই থেকে—

পাঁচু বোকার মতো হাসে, বলে, শরীরটা আজ ভালো আছে, না শ্যামলদা ? বাইরে রোয়াকে পাটি পেতে বসি আসুন। আসুন না ? শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়বেন, মাথা ঘামাবেন, তাতে কি শরীর টেকে ?

শ্যামল ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। গ্রামপ্রান্তের কুঁড়েঘরে রোগশয্যায় জীবনকে শুধু ধরে রাখাব সংগ্রাম চালাতে চালাতে সে আব সকলের জীবনে কিছু অনুপ্রেরণা আনার চেষ্টা করছে, তাকে এমন রূঢভাবে বাইরেব রোয়াকে বসে সূর্যের আলো খোলা হাওয়া সবুজ শোভা থেকে বাঁচার প্রেরণা সংগ্রহ কবতে বলা !

পরেব জন্যই শ্যামল বহুকাল বেঁচেছে, আন্দামানেও সে পরের জন্য ভাবত, ভারতবর্ষের কোটি কোটি পর। উনিশ শো পাঁচ সালে বাংলাদেশটা ভাগ হওয়াব ব্যাপার নিয়ে সাবা ভাবতেব পরকে যে সে আপন করেছিল তার জেব টেনে টেনে।

অথচ পাঁচুর কথায় সে ঘা খায়। একটা অদ্ভুত বিরোধ আছে তাদের মধ্যে, থাকে থাকে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। কীসে সে ঠোক্কর খেল টের পায় না কিন্তু বেশ একটু লাগে, পথ চলতে হোঁচট খেয়ে আঙুল ছড়ে যাওয়ার মতো—মনের অমিল, হাওয়ার বিরোধ নয় মোটেই। সম্পর্ক তাদের জমে উঠেছে পরীক্ষা দিয়ে পাঁচু গাঁয়ে আসার পর থেকে, শেষ জীবনে শ্যামল যেন শিষ্য পেয়েছে মানসপুত্রের মতো প্রিয়, এমন তারা মশগুল হয়ে যায় কথায় যে দেখে মনের সুখেই পিসির চোখে জল আসে। তফাতে উবু হয়ে বসে সে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে দুটির মিল।

শিষ্য বটে, অনেক গুরু তপস্যা করে জীবনে এমন একটি শিষ্য পেলে যমের মতো ধন্য হয়ে যায়। তা যম এসে শিয়রে বসেছে শ্যামলের কিছুকাল হল, নতুন যুগের বামুন-ঋষি চাষি জাত থেকেই উঠে এসেছে কিশোর নচিকেতা পাঁচু। হাটে বিকানো একখানি যেন টিনে-মোড়া আধাস্বচ্ছ ছোটো আয়না, দামি দর্পণের মতো প্রতিফলনে স্তবস্তুতির মতো সব ফিরিয়ে দেয় না। নিজের মনে যা স্পষ্ট নয় পাঁচুকে তা সাড়ম্বরে শোনাবার সাধ্য শ্যামলের নেই, পাঁচুব মধ্যে অবোধ জিজ্ঞাসু নিজেকে শ্যামল নিজেরই লজ্জার মতো দেখতে পায় · ফাঁকি দিচ্ছ ?

কারণ, মুখ দিয়ে যখন তার খই ফোটার মতো অনর্গল বার হতে থাকে নিজের জীবনের মূল্যে যাচাই করা স্বচ্ছ স্পষ্ট সত্য, মেরুদণ্ড সিধে হয়ে যায় পাঁচুর, আলগা তারের মতো তার ঢিলে শিথিল দৃষ্টি মোচড়-কষা সঙ্গতিতে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ; দুটি প্রাণে যেন বৈদ্যুতিক ছোঁয়াছুঁয়ি চলতে থাকে, অনবরত চমক দিতে থাকে বোঝানো আর বোঝার চেষ্টার মিল, গুরুশিষ্যের আত্মীয়তা !

সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। প্রণয়লীলার মতো তা আনন্দঘন।

পাঁচুই আবার কথা তোলে। বলে, আদর্শের জন্য মরতে পারি।

মরা কিছু নয় পাঁচু। বেঁচে আছি তাই না মরার দাম ? বাঁচাই যখন মরার বাড়া হয়, অন্যের হজম করা ফাঁকা বাতিল জীবনের মতো, মানে মলের মতো তুচ্ছ হল বাঁচাটা, মরাকে তখন কেয়ার করে কে ? আমি আর কটা দেখেছি, অমন কত আছে, কত ছিল, কত হবে। শুধু এ দেশে ? সারা জগতে এরা গন্ডা গন্ডা জন্মাচ্ছে। একটা আদর্শ সামনে ধরে দাও, কীসের জীবন কীসেব কী, চলো মরি, মরে বাঁচি, মরে বাঁচাই ! তবে ওটা হওয়া চাই, জীবনের দাম কষাটা। বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে আর সে তুলনায় কী বাঁচাটা বাঁচছি ! ওটা ছাড়া হয় না, আগে নালিশ চাই, বুকফাটা নালিশ। নইলে শুয়োরের মতো পাঁকে ময়লায় বেশ কেটে যায়, যেমন আছি সেটুকু বাঁচি বাবা, বেশি চেয়ে এটুকু খুইয়ে লাভ কী। কর্মযোগ মানে লড়াই, কুরুক্ষেত্রে তাই গীতার জন্ম। আত্মরক্ষা কি মানুষের জীবন ? পশু আত্মরক্ষা করে বাঁচে, কৃমিকীট আত্মরক্ষা করে বাঁচে, মানুষ নয়। মানুষ যুদ্ধ করে, বাঁচার জন্যে মরে। বাঁচার দফা নিকেশ করেছে বলেই না তুই আমি সায়েব মেরে ফাঁসি যাই। কেন যাই ? আমরা টের পেয়েছি, আমরা ফাঁসি গেলে অন্য সবাই টের পাবে, ওদেব ফাঁসি দেবে। এমনি হয়, জানিস, এই দুনিয়াব রীতি। আগে একটা কবি ওঠে, একটা পাগল ওঠে, দশটাকে পাগল করে, তারা দেশটাকে খেপিয়ে দেয়। কীসে ? আগুন ছড়িয়েই থাকে ভাগে ভাগে, কম কম, ঠাহর হয না কী ব্যাপার জ্বালা কীসের ! একজনেব বুকে আগুন জ্বলে, দাউদাউ জ্বলে, সে ঠাহব পাইয়ে দেয় জ্বালা কীসের ! না কি বলিস তুই ?

বলে, ও দেশের কথা বলছিলাম, রাশিয়ার কথা। ঠিক কী হল ব্যাপারটা ভালোমতো জানা যায়নি, খবর আসে কম। যা বলে মোটামুটি বুঝি, ওই বাঁচাব কথা। মজুর গরিবের বাঁচাব কিছু নেই, শুধু খাটুনি, সবার চেয়ে মবতে ওদেব ভয়ডর কম। ওরা খেপলে কারও সাধ্য নেই ঠেকায়। এটা সোজা ব্যাপার, পরিষ্কাব বুঝি। আমাব ঠেকছে কোথায় জানিস ? ওদেব খেপাবে কে, কীসে খেপবে ?

বলে, কালীনাথ আমায় পাগল বলে, মাথা নাকি খারাপ হয়েছে তাই এ সব বলি। সব কথাব জবাব দিতে পাবি না এই হয়েছে মুশকিল। বুঝি যে জবাব আছে। ওদেব দেশে যখন এমনি ভাবেই সত্যিসত্যি ঘটেছে ব্যাপারটা, কেন ঘটল কী করে ঘটল জবাব আছে নিশ্চয়।

ও দেশের গরিব-মজুব হয়তো এ দেশের মতো নয়।

কালীনাথও তাই বলে।

পিসি মাঝে মাঝে লাগসই সুযোগ পেলে এদের কথার মধ্যে ছড়া কাটে, বলে, ও ছাই বলে। খেতে পায় না গরিবদুখি, তার আবার এ দেশ ও দেশ ! গতব সবাব গতব বাবু, পেটের খিদে খিদে, তার এ দেশ ও দেশ কি ?

কালীনাথরা কয়েকজন একদিন গোপনে শ্যামলের এখানে জড়ো হয়, সঙ্গে প্রতিমাও আছে। সন্ধ্যাব পর আচমকা হাজির হয়ে টের পেয়ে পাঁচু উঠোন থেকে ফিরে আসছিল, প্রতিমাই তাকে ডাকল। সেদিন কানাইয়ের খোলাখুলি কথা বলার চেয়েও আজ বিনা ভূমিকায় তার সঙ্গে এদের সহজ কথা ও ব্যবহার পাঁচুকে আশ্চর্য করে দেয়। বিনা আড়ম্বরে আজ তাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়। পাঁচু পারবে কি রাত জেগে বড়ো রাস্তার কাছে পাহারা দিতে, কোনো মোটর গাড়ি যদি আসতে দেখে টুক করে সিধু ঘোষের আমবাগানের পেছন দিকে কয়েক আঁটি খড়ে আগুন দিয়ে সরে যেতে ? খড়ে কিছু কেরোসিন ঢেলে রাখলে ভালো হয়।

ঘুম পেলে চলবে না কিন্তু।

ঘুম পাবে, ঘুমোব কেন ?

পাঁচু তখনই উঠে আসতে যায়, কালীনাথ বলে, বোসো, অত তাড়াহুড়ো নেই। খেয়ে দেয়ে গাঁ একটু নিঝুম হলে পাহারা দিতে যেয়ো। পাকার সঙ্গে তোমার ভাব ছিল, না ?

এ রোমাঞ্চকর স্বপ্নাতীত ঘটনা পাঁচুর জীবনে। মনের রহস্যলোকের অংশে ভক্তিশ্রদ্ধার আবেগ যে একজন মানুষকে কোন আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে কাছাকাছি এসে আজ এটা সে ভালো করে টের পায়। এদের তুলনায় কত তুচ্ছ জ্ঞানদাস, তার সরল সহজ বিদ্রোহপনা। একটু ব্যথা পায় পাঁচু। সপরিবারে নিজেকে ছোটো মনে হয়।

পাকার কথা আরও জিজ্ঞাসা করে কালীনাথ, প্রশ্ন করার সুরে মন্তব্য করে, চরিত্র ভালো ছিল না পাকার, খারাপ পাড়ায় যেত ?

পাকার চরিত্র ? এদেব সান্নিধ্যে অভিভূত হয়েছে পাঁচু মনে মনে, জিভে নয়—পাকার চরিত্র আপনারা কি বুঝবেন ? তেজের চোটে ছটফটিয়ে বেড়ায়, সব জায়গায় যায়। কারও হয়তো বিপদ হয়েছিল, উপকার করতে যেত, নয় তো অন্য কোনো খেয়ালে যেত। কোনো কিছু মানে না, কাউকে কেয়ার করে না, তাই বলে খারাপ হবে কেন ?

তাই নাকি !

পাঁচুর মুখ কঠিন হয়ে আসে, আপনারা খেদিয়ে দিলেন, আপনাদের জন্য মরতে বসেনি ? বলে দিতে পারত সব কথা। আপনারা অন্যায় করছেন পাকার ওপরে—

সবাই চুপ করে থাকে, কারও মুখে এতটুকু ভাবান্তর নেই। এ কাঠিন্য ধাত ফিরিয়ে আনে পাঁচুর। তাই বটে, এদের কাছে তুচ্ছ মান-অভিমানের মানে নেই, এরা ভয়ঙ্করের সাধক। বাইরে অন্ধকার গাঁয়ের পথে ঘরের দিকে চলতে চলতে পাঁচুর মন কানায় কানায় ভবে থাকে গর্বে আর সার্থকতাবোধে। এদের বিশ্বাসের পাত্র বলে কানাই সম্প্রতি কত বড়ো হয়ে উঠেছে তার কাছে, সেই বিশ্বাস আজ সেও পেল। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ।

কালীনাথ আর প্রতিমা ছাড়া অন্য তিনজনকে সে চেনে না। শুধু একজনকে সদরে দু-চারবার চোখে দেখেছে। কে জানে ওরা কারা ?·

পরদিন আরও কথা হয়, গীতার কথা, কর্মযোগের কথা, বিপ্লবী বই পড়ার কথা। কাল বিনা শর্তে পাঁচুকে রাত জেগে গ্রামপ্রান্তে পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আজ গীতা স্পর্শ করিয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করানো হয় যে, যেটুকু সে জেনেছে ও শুনেছে বা জানবে ও শুনবে, দেহে প্রাণ থাকতে কখনও প্রকাশ করবে না। দলে ভরতি হোক বা না হোক দলের প্রতি পাকার মতো এ বিশ্বাস সে রক্ষা করবে। পাকার নামোল্লেখ পাঁচুর কাছে চমকপ্রদ লাগে।

সে নিজে থেকেই জানায়, পাকার একটি চিঠি পেয়েছে দুদিন আগে। ঢাকায় বাবার কাছে আছে পাকা। তাকে একবার বেড়াতে যেতে লিখেছে।

প্রতিমা সাগ্রহে বলে, যাও না ?

পাঁচু বলে, ভাবছি একবার ঘুরে আসব। গতর খাটিয়ে খরচটা তুলতে হবে, দেরি হবে কটা দিন।

কালীনাথ বলে, গেলে একটা কাজও করতে পার। পাকার বাবার দুটো রিভলবার আছে, চুপি-চুপি অন্তত একটা পাকা সরাতে পারে। কীভাবে কী করবে পরামর্শ করে ঠিকঠাক করে আসতে পার, আনাবার ব্যবস্থা করব। যাতায়াতের খরচ পাবে।

পাঁচু আশ্চর্যই হয়ে যায়। একেবারে মশগুল হয়ে আছে এরা, এক মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো চিন্তা নেই। কালীনাথ যেন ওত পেতে ছিল পাকার বাবার একটা রিভলবার বাগাতে, সুযোগ টের পাওয়া মাত্র ব্যবস্থা করছে। যোগসাধনা ছাড়া কি এ রকম একাগ্রতা হয় ?

২

পাকা লিখেছে : বুড়ো মানুষটা ঝোঁকের মাথায় একটা বিয়ে করে পস্তাচ্ছেন, বাবার কথা বলছি। কিছু বলেন না কিন্তু বেশ টের পাই। নতুন বউকে নিয়ে হঠাৎ সেকেন্দ্রাবাদে গিয়ে হাজির, আমি গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, নতুন মামি কান ধরে আটকে দিল। বলল কি জানিস, বাপ কি তোর চাকর, না তুই তোর বাপের চাকর ? তুই চলিস তোর বাপের হুকুমে যে বাপ তোর মন জুগিয়ে চলবে ? আমি ভেবে দেখলাম যে সত্যি, আমার কী এসে গেল ? দুদিন কথাটথা বলিনি মোটে, যতই হোক বিচ্ছিরি লাগে না মানুষের ? পরদিন সে কী কাণ্ড, সকালে বেড়াতে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে খেয়াল থাকেনি, বাড়ি ফিরতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি বাবার নতুন বউ হাউমাউ করে কাঁদছে, পাগলির মতো চেহারা, বাবা টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছেন চুপচাপ। নতুন মামি সেদিন যা আমায় একচোট নিলে, যেন ঠিক পাগল হয়ে গেছে, বন্দুক এনে বললে আমায় গুলি করে মারবে। বাবার পায়ে ধরিয়ে আমায় ক্ষমা চাওয়াল তবে ছাড়ল। আমার কী দোষ বল দিকি ? এ সব পাগল মানুষকে বোঝার সাধ্য কারও নেই। পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইছি, বাবা পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন। বাবা চিরকাল এমন গম্ভীর মানুষ, আবোল-তাবোল কী যে সব বলতে লাগলেন ছেলেমানুষের মতো ! আমার অবস্থাটা বুঝে দ্যাখ। নতুন মামি ধরে বেঁধে এখানে এনেছে, এক মাস থাকতেই হবে, মরি বাঁচি। আমি যেন কচি খোকা মাঝে মাঝে এমনই আদর-যত্ন করতে চায়, নইলে বাবার নতুন বউ লোক বেশ ভালো—

একবার যাওয়ার জন্য তাগিদটা করুণ, ফাঁদে পড়ে পাকা যে কত বিপন্ন সেটা খুবই স্পষ্ট। চিঠির সঙ্গে গাঁথা দশ টাকার নোট দুটি পাঁচু তাই প্রসন্ন মনে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। গিয়ে এই নোট দুটিই পাকাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পাকা এমন ব্যাকুলভাবে যাবার জন্য আবেদন জানায়, এমনভাবে চিঠি লেখে, তাকে !

ধনদাস বলে, না গিয়ে বরং চিঠি লেখ একটা, জবাব এলে যাস।

জ্ঞানদাস বলে, না, তুই যা পাঁচু, আজকালের মদ্যি যা। কেনে না, ব্যাপার সুবিধে নয়। বড়োঘরের বন্ধু যেচে এমন পত্তর লেখে কখন ? যখন তার মনের বিষম দায়। না তো জগতে তার কত বন্ধু, কত আপনজন, সবার বদলি খেয়াল হল তোকে ? নিচু হবার কথা না, না গেলে নিচু হবি তুই, বিশ্বাসঘাতক হবি।

সুভদ্রার উৎসাহ দেখে মনে হয় পাঁচু এই দণ্ডে ঢাকা রওনা হলে সে হরির লুট দেয়। পাঁচু তার দারোগা মারার পণ করেছে, এই বুঝি মারতে গেল, তার চেয়ে ঘুরে আসুক ঢাকা থেকে, ঠান্ডা হয়ে আসুক।

সদরে কলকাতার ট্রেন রাত দশটায় ছাড়ে, ভোরে পাঁচু রওনা দেয়। বাড়ির মানুষ, বিশেষ করে সুভদ্রা, টুকিটাকি অনেক জিনিস সঙ্গে দিতে চেয়েছিল, পাঁচু সব বাদ দিয়েছে। বিশেষ একটি বিলাসের কাঁথা সেলাই করছিল সারদা, তিন-চারবছরের ছেঁড়া শাড়ির পাড় জমিয়ে, তাতে তার সম্বল একটি বাড়তি শার্ট, পুরনো একটি সুতির কোট আর দুখানা ধুতি, কিছু চিঁড়ে আর এক টুকরো পাটালি বেঁধে ছোটোখাটো পোঁটলাটি বগলে করে সে রওনা দেয়। রাধানগরের হাটের কাটে সাতটায় সদরের বাস মেলে।

কানাইয়ের বাড়িতে দিনটা কাটিয়ে রাত দশটায় ট্রেন ধরবে, এই উদ্দেশ্য। কানাই এবারও খুশি হল। পালিয়ে যাবার সাধ সে দমন করেছে, কালীনাথের বারণ। দুদিন আগে হঠাৎ ঘরবন্দীর হুকুম তুলে নেওয়া হয়েছে, সকাল-বিকেল থানায় শুধু হাজির দিতে হবে। কাজটা নাকি পাকার। নতুন মামির যোগাযোগে সে অনন্তের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে, তার বন্ধুর ওপর মিছেমিছি জুলুম হচ্ছে।

ভেতরে ভেতরে খবর নিয়ে অনন্ত কোথায় কী কল টিপেছে সেই জানে, শিথিল হয়ে গেছে বিনা বিচারে মানুষের জন্মগত অধিকার খর্ব করার নির্লজ্জ বাঁধন।

দেখলি তো ? পাঁচু খুশি হয়ে বলে, পাকার সত্যি টান আছে।

কানাই কিন্তু খুশি নয়, তাকে স্বাধীনভাবে শহরে চলাফেরা করতে দেখে সাইকেলের দোকানে খদ্দের আসতে আরম্ভ করছে, তবু কানাই এতটুকু কৃতজ্ঞ নয়। বলে, সব ব্যাপারে ন্যাকামি, সেনটিমেন্টাল ভূত! কে বাবা তোকে মাথা ঘামাতে বলেছে আমার জন্যে ?

পাকা আর জাতে উঠল না কানাইয়ের কাছে। মুখ বুজে থাকার জন্যে মার খেয়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েও নয়, ওটা যেন কানাইয়ের কাছে সাধারণ স্বাভাবিক কাজ। মুখ খুললে অমানুষ পশু হয়ে যেত পাকা, সে তা হয়নি, শুধু এইটুকু ! পাঁচুর কাছে পাকার বিচার অন্য মাপকাঠিতে, কানাইয়ের কঠোরতা তাই তাকে আহত করে না, মুশকিলেও ফেলে না। দুরন্ত অবাধ্য বেপরোয়া পাকার কাছে কঠিন সংযম চাইতে পারে কানাই, পাঁচু চায় না। ভাবপ্রবণ ! হৃদয় থাকলেই মানুষ ভাবপ্রবণ হয়। তাকে ন্যাকামি বলে না। পাকার সম্পর্কে কালীনাথ-কানাইদের বিচার পাঁচু সোজাসুজি অগ্রাহ্য করে, পাকাকে এরা জানে না বোঝে না, বিচার করবে কী ! তবে পাকার মতো স্বাধীন একগুঁয়ে ছেলে নিয়ে এদের যে কাজ চালানো মুশকিল, এটা পাঁচু মানে। তাই পাকার দিকে টানলেও তার পক্ষ নিয়ে ঝগড়াও সে করে না।

পাশের বাড়ির সেই ঘেঁটু এসেছিল। পাঁচুর সে একেবারে অজানা নয়, আগেও সে কয়েকবার তাকে এ বাড়িতে আসতে যেতে দেখেছে। কানাইয়ের মা আর দিদির সঙ্গে খানিক আড্ডা দিয়ে ঘেঁটু একখানা বই চাইতে আসে।

একটা বই দেবে কানাইদা ?

বই নেই।

ঘেঁটুকে দেখেই কানাইয়ের মুখভঙ্গি ক্রুদ্ধ কঠোর হয়েছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে প্রায় ধমকের মতো জবাব দেয়। পাঁচু অবাক হয়ে ভাবে, ব্যাপার কী !

বই নেই তো নেই, কদিন ধরে এমন করছ কেন ? কথা কইলে খেঁকিয়ে ওঠ !

কথা না কইলে হয়। যে মেয়ে বিশ্বাস রাখে না তার সঙ্গে কথা কওয়া পাপ। প্যাকেট খুলেছিলি জানি না ভাবছিস আমি ? আমি সব জানি।

পাঁচুর দিকে চেয়ে ঘেঁটু সভয়ে বলে, আঃ, কানাইদা ! মুখ তার সাদাটে হয়ে গেছে।

ন্যাকামি করিস নে ঘেঁটু। যা, পুলিশকে বলবি যা, অনেক টাকা দেবে।

বলেছি পুলিশকে আমি ?

বিশ্বাস কি ? সামান্য বিশ্বাস যে রাখে না, সে সব পারে।

ছেলেমানুষ মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। রাগে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে পাঁচু। কানাই হঠাৎ তার চোখে ছোটো হয়ে যায়, বুদ্ধিহীন বর্বর হয়ে যায়। ঘেঁটু চলে যাবার পরে সে খানিকক্ষণ বিচলিতভাবে ছোটো ছোটো নিশ্বাস ফেলে। ভালো করে সব কথা না জেনে না বুঝেও তার ধারণা জন্মে গেছে কানাই কাণ্ডজ্ঞানহীন, তার মাথা বিগড়ে গেছে অনেকখানি। সেদিন বিপ্লবী দলের বিশ্বাস, তেজ, একাগ্রতা আর আত্মবিশ্বাসের জন্য ক্লাসফ্রেন্ড কানাইকে মনের মধ্যের মহাপুরুষের আসনে বসিয়েছিল। দু-চার মিনিটে ঘেঁটু আসনটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভালো কী মন্দ জানে না পাঁচু, কানাইয়ের মন স্বাভাবিক নেই। পাঁচু যে জগৎকে আর জীবনকে জানে, তার গাঁয়ের মানুষ, শহরের মানুষ, দেশের মানুষ—সবাইকার মোটমাট মনটা যেমন, কানাইয়ের মন তেমন নয়। একটা উগ্র সুরে বাঁধা হয়েছে কানাইয়ের মন, সে শুধু তার নিজের মনের মতো করতে চায় সবাইকে, সে নিজের মস্ত বড়ো চাওয়ায় নিজেই একা সার্থক হতে চায়।

ও সব বোলচাল না দিয়ে, পাঁচু তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলে, খুলে সব বললেই হত ঘেঁটুকে। নাই বা করতিস নাটক। তুই ভাবিস কানাই, তুই একাই শুধু দেশকে ভালোবাসিস, আর কেউ ভালোবাসে না।

বুঝিস নে কিছু, চুপ করে থাক।—কানাই গম্ভীর কিন্তু অমায়িক মাস্টার মশায়ের মতো বলে, মিছেমিছে রাগ দেখালাম। কাল ফের আসবে, খানিকটা বুঝিয়ে দেব। অ্যাদ্দিন না বুঝে কাজ করছিল, এবার বুঝে করবে।

গোড়া থেকে বুঝিয়ে করালেই হত।

তাই কি সবাই বোঝে ?

পাঁচু আরও রেগে বলে, কেউ কিছু বোঝে না, তুই একা সব বুঝিস ? বোঝাটা তোর একচেটিয়া, না ? কেউ যদি কিছু না বোঝে তোর কাজ নেই কিছু বুঝে, নিজের চরখায় তেল দে। আমরা সবাই ঘাস কাটব, একা তুই দেশোদ্ধার করবি !

রাগে পাঁচুর মেটে তেলা রং বাদামি হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে দেখে কানাই যেন আমোদ পায়, বলে, তোরও একটু ন্যাকামি আছে, কী বুঝবি ! জগতে কত মজা আছে, খবর রাখিস ? বড়োসড়ো মেয়ে দেখেই চোখ কপালে উঠেছে। ওর কি রকম টাকার খাঁকতি ছিল জানিস ? এইটুকু বয়েস থেকে ওর মা এ-বাড়ি ও-বাড়ি চার আনা আট আনা ধার চাইতে পাঠাত। এমন স্বভাব বিগড়ে ছিল, সুযোগ পেলেই চুরি করত। আমায় একটু ইয়ে করে, চুরির স্বভাবটা শুধরেছি, টাকার লোভ যায়নি। নইলে ওরকম গাঁজাখুরি গল্প বানিয়ে টাকা দিয়ে ওর হাতে মাল সরাই ?

পাঁচু জল হয়ে যায়, লজ্জা পায়। বলে, ও বাবা, এমন মেয়ে !

ওই তো, কানাই বলে, ফের উলটো বুঝলি। এমনি মেয়ে খারাপ নয়, বাড়ির দোষে একটা দোষ পেয়েছে। তাও শুধরে আসছে আস্তে আস্তে।

সারা পথ মনটা তরফাতে থাকে পাঁচুর, বেলে ঘুমিয়ে কাটে, স্টিমারে দিনের বেলা নিজের ওপর বিরাগ নিয়ে কাটে। স্কুলে যেমন এখনও তেমন, বারবার তার কাছে স্পষ্ট হয় পাকাদের কানাইদের সঙ্গে কাপে কাপে খাপ খায় না, সে অযোগ্য। স্টিমার যেমন বিশাল নদীতে ভেসে চলে, অজানা আশ্চর্য নদী, মন তার তেমনই ভেসে চলেছে চিন্তা-সাগরে। সাগর কি-না কে জানে, হয়তো পুকুর হবে কিংবা ডোবা, মুখ্যু চাষার মুখ্যু ছেলে সে। নিজের দীনতায় হীনতায় পাঁচু কাতর হয়ে থাকে। শুধু শ্যামল যেন সেই আটুলিগাঁর বনের ধারের মাটির ঘর থেকে মানুষ-বোঝাই নদীর জাহাজে তাকে অনুসরণ করে। কাজ বল, পড়াশোনা বল, শ্যামলকে তো কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, কালীনাথ বা কানাই। রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই শ্যামল তাকে বুঝতে শিখিয়েছে, কী আগ্রহে শিখিয়েছে ! কেন সে তবে কিছুই বুঝবে না ?

আসলে এটা তার পাকার কাছে শেখা, আত্মগত এই প্রক্রিয়াটা, মনগড়া আত্মচিন্তার এই ব্যাকুলতা যে তার ওদেরই কাছ থেকে ধার করা, যাদের কাছে সে তুচ্ছ বলে ভাবছে নিজেকে, তাও পাঁচু জানে না। পাকার এ রকম সর্বদাই ঘটছে। পাঁচুর মাঝে মাঝে হয়। কানাই উগ্র বিদ্রোহ নিয়ে মরিয়া হয়ে কেটে বেরিয়ে গেছে, সে বলে, আমার বয়ে গেল। বলে, যা করব ঠিক করেছি, যা শুরু করেছি, তাই করে যাব—চুলোয় যাক দ্বিধা সংকোচ ভাবনা চিন্তার দোদুল দোলা !

স্কুল-জীবনের নিত্যকার সমীকরণের মধ্যেও তিনবন্ধু এই রকমই ছিল, তাদের বন্ধুত্বের জমাট করা মোট রূপটা ছিল এই দিয়েই গড়া। স্কুলের বাঁধন আর প্রতিদিনের মেলামেশা শেষ করে নিজের নিজের কেন্দ্রে কিছুটা তফাত হওয়া মাত্র তারা পরস্পরের পরিচয় প্রতিফলিত করছে। তাদের যোগসূত্র অবশ্য দেশজোড়া সন্ত্রাসী আন্দোলন, তাদের ঘনিষ্ঠতাও ওই অসহ্য ক্ষোভের চরম প্রকাশেরই আর একটা রূপ। তা না হলে, কে পাকা, কে কানাই, কে পাঁচু, কীসেই বা তাদের বেঁধে

রাখত, কোথায় ছিটকে চলে যেত তারা জীবনের বিভিন্ন গতির টানে ! তিনু যেমন গেছে, ধনেশ মুদির ছেলে তিনু। সেও আছে এই শহরেই, অত তার বন্ধুপ্রেম, তিনবন্ধুকে দোকানের লজেন্স বিস্কুট তামাক খাওয়াতে অত তার ব্যাকুলতা, কিছুই তো তাকে ধরে রাখতে পারল না বন্ধুচক্রে। তিনজনেই ভালোবাসত তিনুকে। অথচ পাকাকে এত অপছন্দ করলেও, পাকাকে বর্জন করলেও পাকার সঙ্গে নিবিড় যোগ কানাইয়ের রয়েই গেছে : তিনজনের কারও আজ মনে পড়ে না এই সেদিনও তাদের যে আর একজন প্রাণের বন্ধু ছিল, সেই তিনু গেল কোথায় ?

সাধারণ বন্ধুত্ব সুযোগ সুবিধার ব্যাপাব। বিপ্লব বন্ধুত্ব গড়ে অন্যরকম। নতুবা জগতে বিপ্লবী হত কে ?

৩

পাকার সৎমার নাম সরমা। সতেরো বছর বয়স, গরিবের মেয়ে। এখানকারই গরিব স্কুলের গরিব মাস্টার সারদাচরণ তার বাপ। সৌন্দর্য চলনসই, স্বাস্থ্যটা সুন্দর। স্কুল মাস্টার বাপ, তাব ভাতে এমন শরীর এ দেশে গড়ে ওঠে না। বাড়তি খাদ্য সংগ্রহের একটা আশ্চর্য প্রতিভা ছিল সরমার, পেযারা পাঁপর ছোলা চানাচুর বাদামভাজা তো বটেই, স্বভাবগুণে কয়েকটা বাড়িকে বশ করে মেয়েব মতো হয়ে ভালো খাদ্যও সে পেত। পাড়ার পাতানো মাসি পিসি খুড়ি জেঠি দিদি বউদিরা তাকে দেখেই খুশি হত, শান্ত নরম স্বভাব, হাসিমুখে কথা বলে, দুঃখে কষ্টে দরদ দেখায়, সুখে সৌভাগ্যে আনন্দ পায়,—সবচেয়ে বড়ো কথা, বাড়িতে এসে যেটুকু সময় সে থাকে, বাড়ির মেয়েব মতো না-বলতে সংসারের ঝঞ্ঝাট লাঘবে হাত লাগায়। ছেলেটা ধরা থেকে ভাতের হাঁড়িটা নামানো, ঘবটা ঝাঁট দেওয়া থেকে চট করে দুটো বাসন মেজে ফেলা, কোনো কাজ করতেই তার অহংকার নেই তাই শুধু নয়, নিজে বুঝে নিজে এগিয়ে নিজে থেকে করে দেয়। মাছ মাংস দই মিষ্টির ভাগ তাকে না দিয়ে খেতে কয়েকটা পরিবারের রীতিমতো মন খুঁতখুঁত করত। বিশেষ কিছু রান্না হলে সে হাজির না থাকলেও ছোটো ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনা হত : ও সরমা, আমি ডাল রেঁধেছি, দ্যাখ তো খেয়ে হয়েছে কেমন ?

বাড়ির কাজে ফাঁকি পড়ত, বাড়ির মানুষ খাপ্পা হত, কিন্তু কোনো শাসন মানত না সরমা। তার দারুণ খিদে, পেট ভরে না, বড়ো বড়ো কথা বললে চলবে কেন ! যতটুকু খেতে দেবে ততটুকু খেটে দেব, ঘর-পর নেই।

না জেনে বুঝে ভদ্র সমাজের সব নিয়ম রীতি স্নেহ প্রীতির বাঁধন বজায় রেখে তারই মধ্যে এই নীতি গড়ে তুলে মানিয়ে চলা একটি মেয়ের পক্ষে সহজ প্রতিভার কথা নয়।

অরবিন্দের বয়স নিয়ে দারুণ ক্ষোভ হয়েছিল অবশ্যই। শত গরিবের মেয়ে হোক, বুড়োর কাছে বলি দেওয়াটা সব মেয়েই বোঝে, হোক সে বড়ো সরকারি চাকুরে, মস্ত পয়সাওলা লোক। এ বাড়িতে মাছ দুধ খাবার-দাবারের অঢেল ব্যবস্থায় সরমা গোড়ার দিকে মরমে মরে গিয়েছিল। চিরদিন তার খিদে বেশি, তাই যেন সে প্রচুর খাদ্য পেল বরের বদলে। কিছুদিন কোনো জিনিস তার মুখে রোচেনি, খেতে বসে ঠেলে ঠেলে দিয়েছে সব। তাতে একদিকে ভালোই হয়েছে। নতুন বউয়ের পক্ষে মানানসই ব্যবহার হয়েছে। খিদে কদিন বিগড়ে না গেলে প্রথম থেকে সে যদি খিদে মিটিয়ে খেত, অন্যে তো হাসাহাসি করতই, অরবিন্দেরও লজ্জা হত। খিদে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সরমার যথাসময়ে, কিন্তু সে তখন বাড়ির গিন্নি, কী সে খায়, কত খায়, কবার খায় কে তা দেখতে যাচ্ছে ঝি-চাকর ছাড়া, বিশেষত যে বাড়িতে খাদ্যের ছড়াছড়ি, এমনই কত নষ্ট হয়, ফেলনা যায় !

অনায়াসে সুখী হত সরমা, পাকা যদি না ছেলে হিসাবে পাগল হত সবদিক দিয়ে আর অরবিন্দ যদি না পাগল হত ছেলের সম্পর্কে। এত বড়ো ছেলে থাকার অসুবিধা সরমা সামলে নিত যে ভাবেই হোক, ও বিদ্যা বাঙালি মেয়ের জানাই থাকে, কিন্তু কেউ তাকে সে সুযোগ দিলে তো ! ছেলেকে সরমা চোখে দেখার আগেই পাকা পাকা করে, কী হবে কী হবে করে, বিয়ে করার জন্য হাহুতাশ পর্যন্ত করে, অরবিন্দই সরমাকে ভয়ে দুশ্চিন্তায় পাগল করতে বসেছিল। তারপর আচমকা তাকে নিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ ছোটা, সারাপথ কত উপদেশ কত সাবধান করা, এবং তারপর সেকেন্দ্রাবাদে ওইসব খাপছাড়া কাণ্ড। এখানে অরবিন্দ এক ঘরে শোয় না, সহজে কাছে আসে না, কথা বলে না, প্রায় তাকে বর্জন করেছে। পাকার সঙ্গে আপস না হলে, পাকা অনুমোদন না করলে, সে যেন গায়ের জোরেই বাতিল করে রাখবে বিয়ে করাটা যতদূর তার সাধ্য, বিয়ে করা জলজ্যান্ত বউটা বাড়িতে বর্তমান থাকলেও।

সরমা অগত্যা পাকার দয়া-মায়া বিবেচনাই জীবনের আশাভরসা করে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। তোমার বাবা বিয়ে করেছে, তোমার বাবার বউ হয়েছি, মা হয়েছি সেই সম্পর্কে তোমার,—অমার্জনীয় অপরাধ করেছি, মারো কাটো যা খুশি তোমাব করো।

নতুন মামি সামলে সামলে শুধরে শুধবে চলে, সে একবকম সত্যিই কান ধরে পাকাকে ঢাকায় এনেছে, তার আপসহীন বিরোধকে সংযত করেছে, অনেকখানি ভেঙেও ফেলেছে।

যতই হোক, :" :তা ? নতুন মামি বলত।

মা ? ও তো বাবার ইয়ে।

আজ আর পাকা এ ধবনেব কথা · । না। তবে মা বলেও ডাকে না সরমাকে। সুধা ছিল বলে আব অতি সম্প্রতি সে হাড়গোড় ভাঙ :বো মরো ছেলেটাকে ছা-ব মতো বুকে রেখে সারিয়ে তুলে একেবাবে বশ কবে ফেলেছিল বলে, নয়তো এ জীবনে হয়তো অরবিন্দ আর নাগাল পেত না ছেলের। সুধার প্রভাব দেখে ঈর্ষায সরমার বুক জ্বলে যায, জীবনে সে এই প্রথম জেনেছে চাপা হিংসাব জ্বালা কাকে বলে, যে হিংসা আগুনেব মতো পুড়িয়ে দিয়ে চলে। সম্পর্কে ছেলে, সে অন্যের বশ, এ জন্য তার হিংসা নয়। হঠাৎ-পাওয়া এত বড়ো ধেড়ে ছেলের জন্য অত তার মাথাব্যথা নেই। তার জ্বালা এই জন্য যে স্বামী বল, সংসার বল, মানসম্মান সুখশান্তি বল, সব ওই ছেলেটার মর্জি দাঁড়িয়েছে বলে।

পাঁচুকে সে আদর-যত্ন কবে, পাকার সে বন্ধু। শুধু সেইটুকুতেই একটা অঘটন ঘটে যায়। তার বন্ধুকে খাতির করায় পাকা এবাব দয়া করে মোটামুটি ক্ষমা করে বসে নতুন মাকে, এতদিনের চেষ্টায় নতুন মামিও যা ঘটাতে পারেনি।

সুধা সরমাকে দিয়ে পাকার সেবা করিয়ে এসেছে, পাকা চেযেও দেখেনি। চা খাবার সামনে দিয়ে দেখেনি। চা খাবার সামনে দিয়ে গেছে, পাকা মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে থেকেছে অন্যদিকে। চা খাবারটা খেয়ে শুধু ধন্য করেছে সরমাকে নতুন মামির খাতিরে। পাঁচুর ও সব বাধা নেই, প্রথম দিন প্রথম বারেই সে সরমার সঙ্গে সম্মান করে কথা বলেছে, অত খেতে পারব না, কমিয়ে দিন। ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করে সরমা আলাপ গড়ে তুলেছে, জেনে নিয়েছে তার গাঁয়ের খবর, ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজনের বিবরণ। দারিদ্র্য সরমা ভালো করে চেনে, সাধারণ অবস্থায় অরবিন্দের ঘরে এলে দারিদ্র্যকে সে আরও বেশি ঘৃণাই করত, কিন্তু অরবিন্দের প্রশ্রয়ের অভাবে আর পাকার লাঞ্ছনায় অবস্থা তার শোচনীয়। পাঁচুর সেবাযত্নে, তার সঙ্গে ভাব করায়, তার তাই বাধো বাধো ভাব আসে না, বরং পাকার বন্ধু এবং চাষার ঘরের হলেও ছেলেটি যে ভালো এটা জানা মাত্র তার উৎসাহ যায় বেড়ে।

দুদিন এটা দেখে পাকা একেবারে বদলে যায়। যেচে সে প্রথম কথা বলে সরমার সঙ্গে, সন্ধিঘোষণা করে বলে, নতুন মা, তুমি পিঠে বানাতে পার ?

পারি। কী পিঠে ? গলা কেঁপে যায় সরমার।

পাঁচু পিঠে ভালোবাসে। নতুন মা বলে ডেকে সরমাকে পাকা পাঁচুর জন্য পিঠে করতে বলে, এও নাকি সংসারের অঘটন হয়ে ওঠে বিশেষ অবস্থায় ! পাঁচু সেটা টের পাচ্ছিল। বাড়িতে পারিবারিক জীবনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পাকাকে সে আগে কখনও দেখেনি। কানাইয়ের কথা তার মনে পড়ে। পাকার সত্যি পাগলামি আছে। খাপছাড়া পাগলামি।

সরমা অরবিন্দকে জানায়, পাকা আমায় মা বলে ডেকেছে, হাসিমুখে কথা কয়েছে।

রাজা করেছে ! বাড়ি থেকে ওকে দূর করে দেওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ অরবিন্দকেও সেদিন প্রফুল্ল প্রাণবন্ত দেখায়, অনেকদিন পরে অন্দরে তার এদিক ওদিক চলাচল ঘটে, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বউ আর ছেলে দুজনকেই তার চাই, তাই এত অনায়াসে তার এমন বেহায়াপনা, দুজনের একটু মিল হয়েছে শুনেই ঘোষণা করে যে সে খুশি হয়েছে।

সুধার পছন্দ হয়নি পাঁচুকে। তাকে না জানিয়ে পাকা বন্ধুকে আসতে লিখেছে এতেই প্রাণে আঘাত লেগেছে সুধার। কত ছোটো ব্যাপারে কত বড়ো সত্যের ইঙ্গিত পায় একাগ্র উচ্চকিত প্রাণ ! এখনও শরীর ভালো সারেনি পাকার, সুধার মতে মোটেই সারেনি, এরই মধ্যে একান্ত সুধার হয়ে বেঁচে থাকতে তার হাঁপ ধরেছে, সে অন্য সঙ্গী চায়, বাইরের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন চায় ! এত তাড়াতাড়ি ? চপল দুরন্ত পাগল ছেলে, কারও আঁচল ধরে সে থাকবে না, সে যেই হোক, সুধা তা জানে। একা সে পাকাকে বেঁধে রাখতে চাইবে কেন ? কিন্তু এ তো নিয়ম নয়, এখনও তো সময় হয়নি ! সে তবে কী ? সে কি হাসপাতালের নার্স যে এত সস্তায় পাকা তার পাওনা মিটিয়ে দেবে ? রাত নটা বাজতে না বাজতে সুধা পাঁচুকে বলে, ওকে আর রাত জাগিয়ো না। ওর শরীর ভালো নয়।

বেশ কড়া সুরেই বলে।

পাকা বলে, আমার ঘুম পায়নি।

শুলেই ঘুম পাবে।

পাকাকে শুইয়ে দিয়ে একদৃষ্টে তার মুখখানা দেখে। চোয়াল ভেঙে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল পাকার মুখ, ডাক্তার যতখানি পারে সোজা করে দিয়েছে। কোমল হাতে ম্যাসেজ করে করে বাকিটুকু যদি সুধা ঠিক করতে পারে, নইলে কোনো উপায় নেই। দিনে চারবার সুধা আধঘণ্টা করে ম্যাসেজ করে। প্রতিরাত্রে পাকাকে শুইয়ে এমনই আগ্রহে চেয়ে দেখে, কতটা উপকার হল।

পাকার দু-গাল হাতের তালুতে আস্তে চেপে ধরে সুধা বলে, সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে কী হয় ? আগের চেয়ে বরং সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার মুখ।

বিশ্রী দেখালে বয়ে গেল।

তোমার তো বয়েই যাবে। নিজের মুখ নিজে তো দেখতে পাও না ! একটা চিঠি এসেছে তোকে দেখাই।

অনন্তের চিঠি। সে কড়া ভাষায় সুধাকে যেতে লিখেছে, জানতে চেয়েছে সারা জীবনটা সে কি এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরেই কাটাবে ? বোঝা যায় কাজের ফাঁকে তাড়াতাড়িতে লেখা চিঠি, তবু রসালো করে কিছু ভালোবাসার কথা লেখার চেষ্টা অনন্ত করেছে, একটা মন্ত্রীত্বের জন্য তার প্রাণপাত চেষ্টার মধ্যে। বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে সুধা চিঠিটা আগাগোড়া পাকাকে পড়ে শোনায়, অনন্তের প্রেমপত্র যেন তার দাম বাড়াবে।

যাবে নাকি ?

যাব না ? আজ কতকাল হয়ে গেল কলকাতা ছেড়েছি !

পাকার কাছে আরও দাম বাড়াতে চায় সুধা। বাড়াতে বাড়াতে কোথায় গিয়ে ঠেকাবে তা সে জানে না, কিন্তু অন্য উপায়ও তার নেই। শুধু দাম বাড়ানো, নিজেকে দামি করা। সুদে আসলে সব

উশুল করে নেবার সাধ্য তার আছে, কিন্তু সাধ্যে বোধ হয় কুলিয়ে উঠবে না আর কোনোদিন। আজকাল কতবার কত বিহ্বলতা আসে পাকার, কতবার হাত ধরে শাড়ি ধরে টানে, আচমকা গলা জড়িয়ে ধরে। সেটা সুধাকেই পরিণত করতে হয় ছোটোছেলের মায়ের হাত ধরে টানায়, মায়ের গলা জড়ানোয়। কী রকম থমথমে মুখে স্নেহার্ত গাঢ় চোখে শান্তভাবে চেয়ে ধীরে ধীরে পাকার কপালে হাত বুলিয়ে দিলে, ছোটো একটি চুমু খেলে পাকা শিশুর মতোই ঝিমিয়ে যায়, তার চেয়ে কে ভালো করে জানে ?

মাঝে মাঝে তাই অসহ্য জ্বালায় অদম্য আক্রোশে সুধা জ্বলে পুড়ে ফেটে যেতে চায়। কেন শান্ত হয় পাকা ? সব দিকে দুরন্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল, কোনো শাসন, কোনো বাঁধন মানে না, বয়সের সীমা পার হয়ে অভিজ্ঞতার দূর দূরান্তরে রহস্য আবিষ্কার করতে ছটফট করে, একদিনও কি সে অবাধ্য হতে পারে না তার স্নেহের, অমান্য করতে পারে না তাকে ?

আমি তবে কাল-পরশু চলে যাই ?

ইস্ !

তেমনই পরিচিত বিহ্বল দৃষ্টি, কামনার অতল স্বপ্ন। সুধার স্পষ্ট মনে হয়, এ সময় পাকা যেন একেবারে ভুলে যায় সে কে এবং সুধাই বা কে ! দু-হাত ধরে এত জোরে তাকে টানার মতো স্পষ্ট বাস্তব চাওয়াও তার তাই এত অনুগ্র, তার ব্যাকুলতা এত নিস্তেজ। এর মানে সুধা জানে না, বোঝে না। তার বুক ফেটে কান্না আসে।

ইস্, যেতে দিলে তো ?

কে যাচ্ছে ? তোকে ছেড়ে যেতে পারি পাগল ? সুধা নত হয়ে তার কপালে গাল রাখে, মাথা তুলে বলে, ঘুমোবি না ? কপালে চুমু খেয়ে বলে, এবার ঘুমো ?

মশারি ফেলে আলো নিভিয়ে সুধা চলে যায়, পনেরো মিনিট পরে এসে দেখে পাকা ঘুমিয়েছে। পাঁচুর সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে এই শরীরে, ঘুম তো আসবেই।

সে এখন করে কী, তার তো ঘুম আসবে না অর্ধেক রাত, হয়তো সমস্ত রাত ! কাল সে করবে কী, পরশু, তার পরের দিন ? আলো জ্বেলে মশারি তুলে পাকার সর্বাঙ্গে চোখ বুলায় সুধা, কপাল থেকে এলোমেলো চুল সরিয়ে দেয়, সন্তর্পণে স্পর্শ করে দেখে বাঁ চোয়ালের যেখানটা আজও একটু ফুলে আছে। উঠছে পড়ছে ঘুমন্ত পাকার বুক। কী হবে তবে, কী করা যাবে ? সে বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে, সুধা ভাবে। কিন্তু পাগল যদি হয়েই থাকে, ভুলতে কেন পারে না যে এই তার পাকা, তার এই পাকার সারা জীবনটা সামনে পড়ে আছে। কেন শুধু মনে থাকে যে বিপ্লব করতে গিয়েছিল বলে পুলিশ থেঁতলে দিয়েছিল বলে পাকাকে বুকের মধ্যে পাওয়া গেছে, নইলে ওকে ধরার সাধ তার স্বপ্ন থেকে যেত। সংসারে কত রকম মেয়েপুরুষের কতরকম ভালোবাসা হয়, কে না জানে বয়সের হিসাব সম্পর্কের হিসাব কত শতবার সংসারে ভেসে গেছে, কত শতবার ভেসে যাবে। তারও ভেসে গেছে ও সব তুচ্ছ হিসাব, কী গ্লানি কত অনুতাপ কোন যাতনায় সারা জীবন দগ্ধে দগ্ধে মরবে সে জানতেও চায় না। কত নরকের কীট জন্মেছে সংসারে, সেও নয় আর একজন হল। সব সে মেনে নিতে রাজি, শত শতবার রাজি। জগৎ সংসার চুলোয় যাক। পাকার বাকি জীবনের হিসাব কেন তবে তাকে এমন ব্যাকুল করে, তার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিতে চায় ? এ তো নিয়ম নয়, সঙ্গত নয় ! তার মতো সংসারের অভিশাপ হতে চেয়েই পাগল হয়েছে, কেউ তারা এই বিপরীত হিসাব কষেনি। তার এ কী হল ?

এই সেদিনও পাকা মরণাপন্ন হবার আগে, বুঝি সম্ভব ছিল ভাবা যে কিছু হবে না পাকার, একদিন ভুলে যাবে সব, মনে তলায় চাপা পড়ে যাবে জীবনের একটা পুরানো অধ্যায়, মাঝে মাঝে শুধু নতুন মামিকে মনে পড়ে হয়তো একটু ব্যাকুল, একটু আনমনা হয়ে যাবে।

আজ ওই ভুলে যাওয়া সহজ নয়, ভুলে যাওয়ার ভয়ংকর মানে তার আতঙ্ক এনে দেয়। খেলা আর উন্মাদনা দুদিনের বেশি টানা যাবে না, তারা ফুরিয়ে যাবে, তাদের ছাড়াছাড়ি হবে, এ সব সবাই জানে, সবাই বাতিল করে উড়িয়ে দেয়। আজ এই তাৎপর্যটাই বড়ো হয়েছে, ভোলা যায় না, তুচ্ছ করা যায় না। পাকাকে নিয়ে সে যদি দেশ ছেড়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তেও পালিয়ে যায়, দুদিন পরে তারা ফুরিয়ে যাবেই। তা যাক। কিন্তু তার পাকার তখন হবে কী !

কী হল তা, কেন এমন ভাবে সব গুলিয়ে যায়, সে তো এমন ছিল না ! ছেলেবেলা থেকে মানুষের মন ভুলানো শিখে এসে এসে ছেলেখেলা হয়ে গিয়েছিল জীবন, একটি কিশোর তার মন ভুলিয়েছে জেনে জীবনের প্রথম কী বিস্ময় কী রোমাঞ্চ জেগেছিল, কী পুলকের স্বাদ পেয়েছিল ! তারপর থেকে শুধু জয় করেছে, বশ করেছে ওই কিশোরটিকে, জগৎ সংসার সব ভুলে থেকেছে। তার এত বূপ এত মায়া তবু পাকা সাড়া দেয় না বলে তার বেঁচে থাকার বুচি ছিল না, কষ্টে পাগল হতে বসেছিল। আজ সেই বিহ্বল ব্যাকুল চোখে তাকায়, হাত ধরে আঁচল ধরে টানে, গলা জড়িয়ে ধরে। আর সে তাকে আজ শিশুর মতো স্নেহে ভুলিয়ে শান্ত করে ঘুম পাড়ায়।

চলে যাবে ? কাল সকালেই বিদায় হবে চিরদিনের মতো, আর যাতে পাকার সঙ্গে দেখা না হয় ? কিন্তু পাকা যদি মুষড়ে যায়, ওই অভিমানী পাগল ছেলে ? স্নেহ মমতা যত্নের অভাবে যদি মরে যায় অন্য কাণ্ড করে ?

মশারির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সুধা নিঃশব্দে কাঁদে। আলোটাও নেভায় না। তার বূপ তাব শাড়ি ঝলমল করে আলোয়। মোটরে সোফায় পালঙ্কে ঘরকন্নার হাসি গান আনন্দে উজ্জ্বল যে ছিল আর যার জীবনটা মানুষের চোখ আর মনকে ঝলসে দিত।

৪

পাঁচু পিস্তলের কথা বলে। পাকা সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

দুটোই নিয়ে যাস।

পাঁচু বুঝিয়ে বলে যে দুটো নিয়ে কাজ নেই, বিশেষভাবে একটার কথাই যখন বলা হয়েছে, নির্দেশটা মেনে চলাই ভালো। তার নিয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে সে চলে গেল তার এদিকে পিস্তল চুরি গেল—

সে আমি সামলে নেব। এক মাসের মধ্যে বাবা টের পাবে না।

একটা পিস্তল তোলা থাকে, সেটা পাকা অনায়াসেই দিতে পারবে। সহজে কারও খেয়াল হবে না ওটা চুরি গেছে। নেহাত যদি ধরাই পড়ে, পাঁচুর ওপরে যাতে সন্দেহ না হয় পাকা সে ব্যবস্থা করতে পারবে। এত ভাববে কেন পাঁচু এই সামান্য ব্যাপারে ? কালীদাদের কত দরকার পিস্তলের, পাকা দিতে চায় তবু পাঁচু নিয়ে যাবে না ? কীসের ভয় এত ? দিন দশেক পাঁচু এখানে থাকে। এ বাড়ির অনভ্যস্ত জীবন তাকে পীড়ন করছিল। পাকাকে অবলম্বন করে বেশির ভাগ সময় কেটেছে তার, নইলে দুদিনও সহ্য হত না, যদিও এক নতুন মামি ছাড়া বাড়ির লোকের ব্যবহার হয়েছে নিখুঁত। সুধাও তাকে অবজ্ঞা অপমান করেনি, শুধু অভাব ঘটেছে তার সদয় ব্যবহারের। তাকে যেটুকু দেখেছে শুনেছে পাঁচু তাতেই তার মনে এক রহস্যময় ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। রানির মতো এত জমকালো বূপ এমন মহারানির মতো চলনবলন, পাকার মশারির পাশে একা দাঁড়িয়ে সে কাঁদে !

গল্প করে রাত জাগবে বলে অসুখের অজুহাতে সুধা তাদের দু বন্ধুকে এক ঘরে শুতে দেয়নি। পাকাকে একটা কথা বলতে গিয়ে পাঁচু সুধাকে পাকার বিছানায় মশারির নালে ঠায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত

এক বিকৃত মুখভঙ্গি করে কাঁদতে দেখে ভড়কে গিয়ে পাকার ঘরের দরজার কাছে থেকে ফিরে এসেছিল।

পরে সে পাকাকে প্রশ্ন করেছে।

কাঁদছিল। সত্যি ? আমি তো জানতে পারিনি !

আর কিছুই পাকা বলেনি।

দুজনে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে মফস্বলে নদীতে নৌকায়, আগের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে পাক খেয়ে বেড়ানোর চূড়ান্ত করে কিন্তু নয়। পাকাকে এমন শান্ত, এত নিস্তেজ পাঁচু আর দেখেনি। যে অস্থিরতা আছে আগের তুলনায় তা কিছুই নয়। তবে শরীরটা তার সত্যই সারেনি, দুর্বলতা রয়ে গেছে। মনটাও সামলে উঠতে পারেনি টের পাওয়া যায়। এ যেন সবার সেরা প্রমাণ যে শুধু প্রাণটুকু রেখে কী অমানুষিক নির্যাতনটাই করা হয়েছিল, পাকার মতো ছেলে এতদিন পরেও গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারছে না। পাঁচুর ক্রোধ আর বিদ্বেষ নাড়া খেয়ে গুমড়ে গুমড়ে ওঠে। এই কারণেও মনটা তার আরও ছটফট করে ফিরে যেতে। নলিনীর কিছু করা হয়নি, দিন এদিকে চলে যাচ্ছে একে একে।

পাঁচু ভাবে, তাদের শহরে ফিরে গেলে হয়তো তাড়াতাড়ি পাকা সেবে উঠত।

পাকা বলে, যেতে দেবে না।

শুনে পাঁচু স্তম্ভিত হয়ে যায়। যেতে দেওয়া হবে না বলে পাকা কোনো জায়গায় যাবে না, করতে দেওয়া হবে না বলে পাকা কোনো কাজ করবে না, পাকার মুখে এক রকম বশ্যতা বাধ্যতার কথা সে এই প্রথম শুনল।

পাঁচু একটি পিস্তল নিয়ে যায়। সঙ্গে নেবার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়নি, পাকার উৎসাহে এটুকু নিয়ম সে ভঙ্গ করে। কিন্তু দুটি নিয়ে যেতে রাজি হয় না, পাকা ভীরু বলে গাল দেওয়া সত্ত্বেও।

বাক্‌সো তোলা পিস্তলটি নিয়ে পাঁচু চলে যাবার এক সপ্তাহেব মধ্যে কালীনাথের কাছ থেকে আর একজন আসে পাকার কাছে। পাঁচুর কাছে শোনা গেছে পাকা দুটি পিস্তলই দিতে পারে বিশেষ হাঙ্গামা না করে। তা কি সম্ভব ? বিনা দ্বিধায় পাকা অরবিন্দের ড্রয়ার খুলে দ্বিতীয় পিস্তলটি চুবি করে এনে দেয়।

কিছু টাকা এবং খানকয়েক গয়নাও দেয়।

পাকা সরমাকে বলে, নতুন মা, তুমি দেশকে ভালোবাসো ?

ওমা, দেশকে কে না ভালোবাসে !

মুখে তো সবাই ভালোবাসে। সত্যিকারের ভালোবাসা আছে ? ত্যাগ করতে পার দেশের জন্যে ?

কেন পারব না ? বলো কী করতে হবে, করছি।

তোমার কয়েকটা গয়না দাও, স্বদেশিদের জন্য পারবে দিতে ? ওরা প্রাণ দিচ্ছে, তুমি কটা গয়না দিতে পারবে ?

সরমার মুখ হাঁ হয়ে যায়, বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ পলক পড়ে না, কয়েকবার সে ঠোঁট চাটাচাটি করে। তারপর বলে, দিচ্ছি।

দু-একখানা গয়না নয়, ট্রাঙ্ক খুলে গয়নার বাক্‌সোটা সরমা পাকাকে এনে দেয়। বলে, নাও, আমার যা ছিল সব দিলাম। তুমি আমায় যেমন ভাব, আমি তেমন নই পাকা। আমিও মানুষ। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে সরমার।

পাকা অভিভূত হয়ে বলে, বাক্‌সো শুদ্ধু যে দিলে, বাবা টের পেলে কী হবে ?

সে হবেখন। গয়না কি কারও চুরি যায় না ?

সরমা জলভরা চোখে মুচকে হাসে। পাকার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে যায়।

পরদিন সকালেই অরবিন্দ পিস্তলের অন্তর্ধান টের পায়। ড্রয়াবে ছিল সরকারি রিভলবার, এটা অরবিন্দের সঙ্গেই থাকে, সেটাই নিয়ম। অন্য ড্রয়ারগুলি খুলে, আলমারি হাতবাক্সো খাটের তোশকের তলাটা একবার খুঁজে দেখে খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়েই গম্ভীর কালো মুখে সে ভাবে। অনেকক্ষণ ভাবে। মাঝখানে শোবার ঘরে গিয়ে বাক্সো খুলে দেখে আসে, অন্য পিস্তলটিও সেখানে নেই। ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে বিরাগে তার গা কাঁপে, দাঁড়াতে না পেরে চেয়ারে বসে সে ভাবে।

সফল সার্থক তার জীবন, কত বড়ো চাকরি করে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, আগের এক স্ত্রী, তার ছেলে, নতুন দ্বিতীয় স্ত্রী, কত কিছু নিয়ে তার জীবন। আজ একদিনে একমুহূর্তে তাসের ঘরের মতো সব ভেঙ্গে পড়েছে। পাকা তার ছেলে। একমাত্র ছেলে। ছেলে যার শত্রু হয় সে কেমন করে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবন ?

চুপ করে বসে থাকে অরবিন্দ। সারাজীবন সে নিয়ম মেনেছে, আইন মেনেছে। সরমাকে সে ঘরে এসেছে আত্মীয় বন্ধু সমাজ ধর্মের রীতিনীতি নিয়ম সমর্থনে। বিরোধ কবেছে শুধু পাকা।

নেয়ে খেয়ে নেওয়ার তাগিদ এলে অরবিন্দ বলে, আপিস যাব না। শরীর খারাপ।

ড্রাইভার গাড়ি বার করেছিল, যথাসময়ে গ্যারেজে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি এসে সেলাম করে ধমক খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমে বলে, শালার মর্জি নাই আপিস যাবার, আগে বললেই হত।

নেয়ে খেয়ে শোয় অববিন্দ। ছুটির দিনে স্বামীকে দুপুরের সেবা দিতে গিয়ে সরমা ঝাজালো ধমক খায়। সমান ঝাঁজে জবাব দিয়ে সরমা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা চারটে নাগাদ অরবিন্দ পাকাকে ডেকে পাঠায়। গড়গড়ায় নল ধবে সে খাটে বসে ছিল, পাকা ঘরে এলে বলে, চেয়ারটা টেনে এনে বোসো।

পাকা নীরবে আজ্ঞা পালন করে। আজ সে ভালো ছেলে। অববিন্দ বলে, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। জবাব দিতে না চাও দিয়ো না, কিন্তু মিথ্যে কথা বোলো না।

আমি মিথ্যে বলি না বাবা।

মিথ্যে বলে না ! তার মানে যদি সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আমার পিস্তল চুরি করেছ ? পাকা বলবে, হ্যাঁ চুরি করেছি !

তারপর কী হবে ?

তারপর কি করবে অরবিন্দ ?

গড়গড়ার নল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অরবিন্দ বলে তুমি অপদার্থ হয়ে গেছ, অধঃপাতে গেছ একেবারে। দুদিন পরে তুমি কলেজে ভরতি হবে, আজও ঠিক করলে না আমায় জানালে না, আর্টস পড়বে না সায়ান্স পড়বে ?

কেন ? সেদিন যে বললাম আমি সায়ান্স পড়ব ?

বলেছিলে নাকি ? মনে নেই।

পবদিন অরবিন্দ মফস্বলে যায়। কয়েকদিন পরে ফিরে এসে সে রিপোর্ট দাখিল করে যে সোনাগাঁর কাছে ডিঙি-নৌকায় নদী পার হবার সময় ডিঙি উলটে সে নদীতে পড়ে যায়, অতি কষ্টে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু সরকারি রিভলভারটি নদীতে খোয়া যায় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে। সরকারের সে বিশ্বস্ত কর্মচারী, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তাকে জানাতে হচ্ছে যে চলাচলের এমন অবস্থার মধ্যে তাকে কাজ করতে হয় যে শুধু স্বাস্থ্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে না, প্রাণ নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি পড়ে।

অরবিন্দ বুঝতেও পারেনি যে চিন্তায় ভাবনায় দিশে হারিয়ে কী কড়া আর ঝাঁঝালো রিপোর্ট সে পেশ করেছে ডিঙি উলটিয়ে নদীতে পড়ে রিভলভার হারানোর গল্প ফেঁদে। দপ্তরে সাড়া পড়েছে। ওপরওয়ালাকে নাড়া দিয়েছে। একুশ বছরের ব্রিলিয়ান্ট সার্ভিস, একুশ বছরের কর্তব্যপরায়ণ দায়িত্বশীল নিখুঁত চাকর। কত ফাঁকিবাজ রায়বাহাদুর হয়ে গেছে, অরবিন্দ আজ পর্যন্ত কোনো পুরস্কার পায়নি। রিপোর্টের জবাবে হঠাৎ এক মাসের মধ্যে অরবিন্দ উচ্চতর গ্রেডে উঠে গেল। নববর্ষের লিস্টে সে রায়বাহাদুর হয়ে গেল।

কীসে কী হয় !

বারো

১

সত্য কথা বলতে কী, ঢাকার অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি পাঁচুর পক্ষে। ঢাকার জন্য তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। সে টের পেয়েছে পাকা অসুস্থ, তার শরীর মন এখনও ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। শুধু তাই নয়। একেবারে সেই চুর্ণবিচুর্ণ অচেতন অবস্থা থেকে সে আটকা পড়েছে ন্যাকামির ফাঁদে, যাতে আহ্লাদি ন্যাকা পুতুল তৈরি হয়। নমুনা দেখে এসেছে পাঁচু। আগেকার পাকাকে যা নাগাল পায়নি, যার ছোঁয়াচ পেলে পাকা হাঁসফাঁস করত, কাবু অবস্থায় পেয়ে পাকাকে তাই আচ্ছন্ন করেছে। এ ব্যাপাব পাঁচু জানে, বড়োলোকেব ঘরে একচেটিয়া হলেও গরিবের ঘরে যে একেবারে হয় না তা নয়। যেমন কায়েতপিসির ছেলে রতন। নিজে প্রাণপাত কষ্ট করে ছেলেটাকে হাবা করেছে। বিশ বাইশ বছরের ছোকরা, আজও পিসি তাকে চোখের পলকে হারায়। মায়ের আঁচল ছাড়া রতনেরও চলে না, বোকার মতো কী ভোঁতা মিনমিনে তার কথা আর হাসি, আপিমের নেশায় যেন ঝিমিয়ে আছে সর্বক্ষণ !

পাকাকে যদি এবা তাড়াতাড়ি দলে টেনে নিত, ছিনিয়ে আনত ওই নতুন মা নতুন মামিদেব কবল থেকে !

শ্যামল হাসে। অত ভাবছ কেন ? ডানপিটে ছেলে, দুদিন আদব খেয়ে ও ছেলে কখনও বিগড়ে যায় ? গায়ে জোর হলেই ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। দুদিন থাক না ওষুধ।

মাঝখানে একটু ভালো হয়ে শ্যামলের শরীর আবার খারাপ হয়েছে। ভাটার অবস্থাই শরীবের, ওর মধ্যে একটু উনিশ-বিশ। মনের জোর ? মনের জোর কি শরীর জোরের ওপর নির্ভর করে ? তেজের জন্য পালোয়ান হতে হয় না, পাঁচু তা জানে, সে কথা নয়। এই রোগজর্জর দুর্বল ভাঙা শরীরে জীবন ধীবে ধীরে অস্ত যাচ্ছে শ্যামলের, তার তবে এত মানসিক শক্তি আসে কোথা থেকে ? হয়তো শ্যামলের সঙ্গে পাকার তুলনা হয় না। সারাজীবন একটানা প্রতিরোধের মধ্যে শ্যামলের মনের জোর গড়ে উঠেছে, পাকা এখনও যে সুযোগ পায়নি। একদিকে একভাবে শক্ত কঠিন হয়নি তার মন, এখনও নড়বড়ে হয়ে আছে, কাদায় পোঁতা খুঁটির মতো এদিক-ওদিক উলটে-পালটে হেলে পড়ে চাপ লাগলে।

তাছাড়া শ্যামলেরও দুর্বলতা আছে। সেটা যে নিছক দৈহিক দুর্বলতার জন্যই, পাঁচু ক্রমে ক্রমে তা টের পাচ্ছিল।

তার নিজের দুর্বলতা ?

এই একটা মজা হয়েছে পাঁচুর বেলা। চাষার ঘরে জন্ম, সেই ঘরেই বসবাস, চাষাদের সঙ্গেই নাড়ির যোগ, এদিকে জীবনের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত, একেবারে দেশের বিপ্লবী-জীবনের অগ্রগণ্য

চেতনার প্রান্ত ছুঁয়ে। ডোবা হয়ে নালা বেয়ে সাগর ছুঁয়েছে, ওই অসীম অগাধ জীবনের জোয়ার-ভাটা তার জীবনেও বয়। শহরে পড়তে গিয়ে অন্যজাতের কজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলে খুব বেশি আসে যায় না। চেনাজানা অভ্যস্ত পুরুষানুক্রমিক ছোটো হেঁটো ডোবায় ডুবে থাকলে কোনো হাঙ্গামা নেই। গাঁয়ের আরও দু-চারটি চাষির ছেলে খানিক লেখাপড়া শিখেছে, পাঁচু একা নয়। একটু অন্যরকম, একটু খাপছাড়া হলেও তারা মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে, লেখাপড়া ভুলেটুলে গেছে, বেনো জল ঝেড়ে ফেলেছে। পাঁচুর হয়েছে এই মুশকিল যে চুঁইয়ে গড়িয়ে আসা জল যেন নয়, জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গ এসে হানা দিয়েছে তার ডোবায়—বেচারি ছেলেমানুষ, জমি-চষা চাষির ছেলে। স্রেফ সে ভুলে গেছে নিজের কথা। নইলে এত বৈচিত্র্য, এত রোমাঞ্চ, এত অর্থকরী সম্ভাবনার ইঙ্গিতগুলির সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারত না। সে সবল কী দুর্বল, বাহাদুর কিংবা সামান্য, বিচার-বিবেচনার অধিকারী অথবা বেয়াদপ, সব ভাববারও তার সময় নেই, দ্বিধা সংশয় প্রতিক্রিয়াও নেই। কদাচিৎ তার যে আত্মবোধ জাগে বিষাদ বেদনার গ্লানির রসে টইটম্বুর হয়ে পাকার আহ্বানে ঢাকা যাবার সময় স্টিমারে এবং ঘুমন্ত পাকার খাটের মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে নতুন মামির আলুথালু বেশে কান্না দেখার রাত্রে, তাও আসলে পাঁচুর নিজের কথা ভেবে নিজে বিচলিত হওয়া নয়। তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই, সে কেন ও রকম নিদারুণ মনোকষ্ট পারে পরের জীবনের বিরোধ আর জটিলতায় ! জীবনে যত নতুনত্ব এসেছে ওটা তার সে সব আয়ত্ত করারই প্রক্রিয়া। কালীনাথ বল, শ্যামল বল, পাকা বল, কানাই বল—আত্মচিন্তা ওদের পাগল করেছে, আমিত্বের পরাধীনতা ওদের বেঁচে থাকাই ব্যর্থ বিশ্রী বেদনাদায়ক করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলে ঝুলে মরাকেও বড়ো করেছে। ওদের সংস্পর্শে এসে এই জ্বালার ভাগও পাঁচুকে নিতে হয়—বিরোধী জগৎকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে ফেলার যে আকাশ-ছোঁয়া স্পর্ধা পাকার, সে স্পর্ধার সামান্য অংশটুকু পেতে হলেও জগৎকে বিরোধী করার যে দারুণ মনোকষ্ট তারও একটু ভাগ না নিয়ে উপায় কী !

গাঁয়ের সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে পাঁচুর ঘনিষ্ঠতার প্রবল জোয়ার-ভাটা ঘটে থাকে। শহরে থাকার সময় দূরত্ব আসে, লম্বা ছুটিতে গাঁয়ে এলে প্রথম কিছুদিন অসুবিধার পর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত খানিকটা ব্যবধান থেকেই যায়। একেবারে কেঁচেগণ্ডুষ করার সাধ্য পাঁচুর আর নেই। তাদের সমাজের আরও দু-চারটি ছেলে স্কুলে পড়েছে, দুবছর আগে রাধানাথ ম্যাট্রিকও পাস করেছে। স্কুলের বিদ্যার যে মানে নেই, নিছক ফাঁকি, ওরা তার প্রমাণ। গাঁয়ে সমাজে পরিবারে নিজেদের ঠাঁই করে নিতে সব বিদ্যা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছে, কোনো কাজেই লাগে না। একটা অকাজে লাগে, সেটা অহমিকা,—আমার পেটে বিদ্যা আছে, আমি স্কুলে পড়েছি ! চিঠিপত্র লেখার কাজ পর্যন্ত হয় না ওদের দিয়ে, চর্চা নেই, ভয় পায়, ভুল হবে, ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে ! রাজেন ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিল, তার বাবা চিঠি লেখাতে আসে পাঁচুকে পয়সা দিয়ে।

পাঁচুও হয়তো ওদের মতো হত। কিন্তু তার অন্য জগতের ছোঁয়াচ লেগেছে। শুধুই সে বিদ্যা লাভ করেনি।

এবার পাঁচুর বিদ্যালাভের কাজ থেকে ছুটিটা সুদীর্ঘ, হয়তো বা চিরদিনের জন্যই। নিজের অজান্তে নিজেকে কেন্দ্র করে আটুলিগাঁর চাষাভুসো ছেলেদের একটা দল পাঁচু গড়ে তুলছিল। এ রকম একটা সংগঠন গড়ার কথা সে ভাবেনি, সংগঠন যে গড়ে উঠেছে নিজে সে এটা টেরও পায়নি, মন তার ছিল অন্যদিকে। হাটে ঘাটে মাঠে এই সব ছেলেদের এর ওর তার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা হয়, ইয়ার্কি ফাজলামি চলে, হাসাহাসি ঝগড়াঝাটি রাগারাগি হয়,—দেশের কথা ওঠে।

দেশের কথাটা উঠবেই।

যেমন, রাজেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে গোয়ালপাড়ায়। রাজেন এসেছে বাছুর নিতে, তাদের গোরুটার বাছুর গেছে মরে, দুধ দুইতে বাছুর লাগে। নিজের বাছুর পরের বাছুর সোনা বোঝে না,

যে কোনো বাছুর সামনে পেলে তার গা চেটে সে বাঁটের দুধ খুলে দেয়—বাছুর ছাড়া বাঁটে হাত দিতে গেলে শিং নেড়ে পা ছুঁড়ে লাফিয়ে সোনা হুলুস্থুলু বাধিয়ে দেয়।

পাঁচু এসেছে যাঁড় খুঁজতে, দেশি ছোটো যাঁড়। মেজোবাবুদেব খেয়ালের যাঁড়ের মিশেল বাছুরটা বিয়োতে আর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে লক্ষ্মীর প্রাণান্ত হয়েছে—তাকে পোষাটাই দাঁড়িয়েছে লোকসানে। গাই-বলদকে লোকসানে পুষতে হলেই হয়েছে চাষির নিজেব বেঁচে থাকা ! লক্ষ্মীর এবার ছোটোখাটো দেশি বাছুর হোক, আর মিশেলে কাজ নেই।

এই ভাবে দেখা। কী উদ্দেশ্যে দুজনের গোয়ালপাড়ায় আসা প্রথমে সেটা জানাজানি হল। চাষাড়ে টিপ্পনি হল গোরু বাছুব মানুষ মিশিয়ে : মেজোবাবুর সেজোবউ নিজের বাচ্চা হারিয়ে গরিব চাষির বাচ্চাদের জন্য গাঁয়ে শিশু-নিকেতন খুলছে, ছোটো একটা আটচালায়। এবং শিকারের ছুতায় যে বিলাতি সায়েবটা ঘনঘন আসে তার কল্যাণে মেজোবাবুর নিরুদ্দেশ মেজো ছেলেব বউ মিশেল বাচ্চা বিয়োতে গেছে হাসপাতালে। এই সব রসালো আলোচনা।

কলকাতায় কী করে জানিস ? পাঁচু রহস্যের সুরে শুধায়।

কী করে ?

বাছুর মরে গেলে চামড়াটা খড়ে জড়ায়। তাই সামনে ধবে গোবু দোয়।

কলকাতায় সব ফাঁকিবাজি, চোবের আড্ডা। কাকার সেবার গাঁট কাটলে, পুলিশ একটা টাকা নিলে কাকার ঠি.. ' চোর ধরলে খবর দেবে।

হবে না ? ইংরেজ আছে মোদের গাঁট কাটতে, যেমন কত্তা তেমনি চাকর।

যে কথাতেই শুরু হোক, দুই কিশোবের আলাপে ইংবেজ আসবেই, ইংবেজ এলেই আসবে আনুষঙ্গিক শোষণ পেষণ দাবিদ্র্য দুর্ভিক্ষ মহামারির কথা এবং তারপব সহজে সস্তায় পরাধীনতাব অভিশাপ যে ঘুচবে না এই সিদ্ধান্ত।

এই সাতাশ আটাশ সালেব দেশ-জোড়া দুর্দিনে এ দেশেব কোনো ছেলেবুড়োর আলাপে এ সব কথা না উঠে পারে ? আঁতুড়েব শিশুও টেব পায় তার সর্বাঙ্গীণ অভিশাপের কারণ কী। কিন্তু পাঁচুর আলাপটা ঠিক তেমন নয়। একুশ সালের উদগত আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, বোমাবুদের অদ্ভুত দুঃসাহস ছাড়া চারিদিকে নিষ্ক্রিয় ক্ষোভ, কলকারখানায় ধর্মঘটের শ্রীবৃদ্ধিতে স্বাধীনতার ইঙ্গিত সবার চোখে পড়ছে না। বিদেশির শাসন আর নিজের দেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয় অবসাদের অফুরন্ত আলোচনা শেষ হচ্ছে হতাশায়। নাঃ, এ দেশের স্বাধীনতা সহজে নয়, সস্তায় নয়। তাব মানে কিন্তু মানুষ এই বুঝছে না যে মুক্তি সহজে যখন হবে না তখন সে জন্য কঠোর লড়াই করি, সস্তায় যখন হবে না তখন চরম মূল্য দিই—সবার ভাবখানা এই যে কী আর করা যাবে, আমাদের মন্দ কপাল ! কে জানে কবে কীভাবে দেশের ভাগ্য ফিরবে ? অন্য অঞ্চলের অন্য জেলায় গ্রাম আরও ঝিমিয়ে গেছে। পাঁচুদের এগুলি লড়ায়ে গ্রাম, খাজনাবন্ধের তুমুল সংগ্রাম হয়ে গেছে এদিকে, আজও ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ে। এদিকের হতাশায় রীতিমতো বুক পুড়ে যায়, খুচখাচ আন্দোলনের নামে দারুণ অবজ্ঞা জন্মায়—তার চেয়ে কিছু হবে না ধরে নিয়ে দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানাই ভালো।

পাঁচু কিনা সংস্পর্শে এসেছে, একটু ছোঁয়াচ পেয়েছে তাদের, একুশের·জোয়ারান্তিক ভাটাব আদর্শের এই চরম টানের দিনে একমাত্র যারা প্রাণের নাও-কে স্রোতের বিপরীতে টেনে নিতে প্রাণপণ করেছে, পাঁচুর কথাবার্তা তাই আশা ভরসা বিশ্বাস উদ্দীপনা জাগায়। গাঁয়ের শিথিল মন্থর নিঃস্ব জীবন চাষি কিশোরের, বাঁশঝাড় শালবন আম কাঁঠালের আদিম রহস্য-ঘেরা ডোবাপুকুর, গোয়াল কুঁড়ে, হপ্তা হাট, জমিদারের দিঘি-দালান, দিনের দেবতা, রাতের অপদেবতা নিয়ে দিনরাত্রি। তবু পাঁচুর আলগা ছাড়া ছাড়া আলাপ শুনলে কালীনাথেরও মনে হত পাঁচু বুঝি দলের প্রচার চালাচ্ছে !

চাষি কিশোর গা চুলকে খড়ি তুলে বলে, বাস্ রে, ইংরেজের সৈন্য কত !

পাঁচু বলে : বাঃ, বেশ বলছিস তুই হাঁদার মতো ! সৈন্য আছে তো হয়েছে কী ? কামান বন্দুক আছে তো আছে, তাতে কী ? এ দেশে লোক যে কোটি কোটি ! সেটা মনে আছে ? এ দেশে কত গাঁ কত শহর তার হিসাব রাখিস ! সবাই খেপে গেলে সৈন্য দিয়ে কামান বন্দুক দিয়ে করবে কী ? ধর না কেন আমাদের এই গাঁ-টা। ধর একশো সৈন্য এল, দু-চারটে কামান আনল, তিন চারশো বন্দুক আনল। আমরা বললাম, বটে ? আচ্ছা, রোসো, মজা দেখাচ্ছি। কানাই মনাই যত কামার আছে সবাই রাত জেগে দিশি বন্দুক বানাল, আমরা সবাই কোলোরাপটাস মোমঝাল দিয়ে দিশি বোমা বানালাম, বর্শা শড়কি লাঠি দা কুড়োল সব বানালাম। তিন-চার হাজার মেয়েপুরুষ একসাথে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। ওই একশোটা সৈন্যের দামি দামি বন্দুক কামান কবার গর্জাবে, কতক্ষণ গর্জাবে ? মোদের দু-একশো মারতে মারতে মোরা ওদের কচুকাটা করে—

হায় রে কিশোরের কল্পনা ! গান্ধীর সেই পুরানো স্বপ্নবৎ জনগণ-আন্দোলনের সঙ্গে ভাবতের মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীর আন্দোলনকে মিলিয়ে গড়ে তুলেছে প্রাকৃতিক অভ্যুত্থান ! ভুলে গেছে যে ইংরেজের পাঁচটা রাইফেল গর্জিয়ে হাজার লোকের অহিংস সভা ছত্রখান করে দিয়েছে। কিন্তু তাতেই বা কী এসে যায় ! পাঁচু তো আর ঘোষণা করছে না যে কাল এ রকম সর্বভারতীয় বিরাট অখণ্ড অভ্যুত্থান ব্রিটিশরাজের সৈন্যসামন্ত কামান বন্দুক উড়িয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করবে। পিসি কী পাঁচুকে বূপকথা বলত এই জন্য যে ঘুম ভেঙে উঠেই সে কাল্লু মিয়ার খোঁড়া বুড়ো দেশি ঘোড়াটায় চেপে ইংলন্ডে মেম বিয়ে করতে পাড়ি দেবে ! কী ভাবে কোন কথাটা বলা হল সেটা ধরা চাষি ছেলে বুড়ো মেয়ে মরদেব স্বভাব নয়, কথার তারা মর্মটা নেয়। সে হিসাবে কি আব এমন খাপছাড়া অদ্ভুত কথাটা পাঁচু তাদেব বলেছে ? দীনহীন নরম অহিংস গোবেচারি সেজে কিছু হবে না, বাপ-পিতেমোর আমল থেকে বিদেশির যত লাথি ঝাঁটা জমা হয়েছে সব সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই—এ তো সহজ সরল বাস্তব কথা।

চাষি ছেলেরা এ সব কথা শুনতে চায় পাঁচুর কাছে। তারা পাঁচুকে ঘিবে নিজেদের গ্রথিত করে। একটা বিশেষ ঘটনায় জন পনেরো ছেলে এক সঙ্গে তার পরামর্শ চাইতে এলে পাঁচু আশ্চর্য হয়ে প্রথম টের পায় যে দলটা গড়ে উঠছে এবং এখন নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে।

২

ঘটনা সেই চিরকেলে অনাচার।

গরিব চাষির মেয়ে দেখে বড়োলোক জমিদার বা তার ছেলের লোভ। এ ক্ষেত্রে মেয়েটি গণেশ সাঁতরার, ছেলেটি মেজোকর্তার। কলকাতার উঁচু পরীক্ষা দিয়ে হেমন্ত দেশে এসেছে। গোবরে যত পদ্মই ফুটুক, দুকলি তেমন সুন্দরী নয়। তবে লোভ থাকে পুরুষের চোখে এবং মনের মধ্যে মেয়ের জন্য কত চেষ্টা চরিত্র আর হাঙ্গামা ঝঞ্ঝাটের বালাই দরকার হিসাব থাকে তার। শায়া ব্লাউজ ঢাকা যাদের দেখা অভ্যাস হেমন্তের, তারা কেউ এমনি শুধু একফেরতা একটি শাড়ি পরে সামনে এলে দুকলি কোথায় উড়ে যায়, কিন্তু তাদের রুচি আলাদা। বাপ হলে চর পাঠাত, হেমন্ত একেলে ছেলে, নিজেই গেল সাঁতরাদের বাড়ি। উদারভাবে সাঁতরাদের কৃতার্থ করার জন্য গায়ের জোরে ঢোকার বদলে একটা ছুতো করে অন্দরে ঢুকে জাঁকিয়ে বসে বলল, ক-বিঘে জমিতে নতুন ধরনে চাষের পরীক্ষা করব গণেশ, আমার অনেক দিনের শখ। তুমি খেটেখুটে দেবে, দেখাশোনা করবে। তোমার ঘরদোরের অবস্থা তো—

আজ্ঞে এ বর্ষায় গলে যাবে।

সেদিন হাত ধরা পর্যন্ত। দুকলি হাঁ না জোর করে বলতে ভরসা পায়নি। বলা কী যায়। মেজোকর্তার বড়ো ছেলে ! যার শখ হলে গরিব মানুষের ঘর জ্বলে যায়, মানুষ এ পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস টেনে স্বর্গে গিয়ে সেই নিশ্বাস ফেলে। অন্য কোনো ফাজিল ছোঁড়া হলে কি উচিত দুকলিকে বলে দিতে হত না, এ বজ্জাতটার কথা ভিন্ন এর ক্রোধ আর প্রতিহিংসা কে ঠেকাবে, কীসে ঠেকাবে, ভিটেমাটি ছাড়া করে সপরিবারে তাদের উচ্ছন্নে দেওয়া এর পক্ষে কত সহজ ! অন্যদিকে, ভাঙা ঘর দুয়ার যদি নতুন হয়, বাঁধা জমিটুকু যদি ছাড়ানো যায়, পেট ভরে যদি দুটো খেতে মেলে, গায়ে যদি দুটো শাড়ি গয়না ওঠে--এ সব তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়াও তো তাদের পক্ষে সহজ নয় !

গণেশের ভাঙা কুটির ঘিরে সে রাতটি নামে বিহ্বল, ক্লেদাক্ত, ভয়ানক। অন্ধকার রাত্রির অতল রহস্যের মতোই পুঞ্জীভূত ভয় ও লোভের সঙ্গে অসহায় একটি দীনহীন পরিবারের চরম সংগ্রামের রাত। এ জগতে এমন অদ্ভুত এত অসঙ্গত ঘরোয়া সংগ্রামও চলে অনুভব করতে পারলে অ্যাটম বোমার সংগ্রামী জগতেরও রোমাঞ্চ হত। লাভের হিসাব দূরে থাক, একদিকে প্রায় সর্বনাশের সম্ভাবনা, তবু সেই সর্বনাশের দিকে ঝুঁকে সুনিশ্চিত লাভ ও নিরাপত্তার ভরসার সঙ্গে লড়াই করা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বরাবর তারা প্রণাম ঠুকেছে, দেবদেবীকে পুজো দিয়েছে, স্বর্গ আর নরক ছাড়া কোনো ভবিষ্যৎ তারা জানে না, অথচ সেই বিরাট ঈশ্বরের সেই নিখুঁত বিধি-ব্যবস্থা তাদের এতটুকু কাজে আসে না। সর্বশক্তিমান মেজোকর্তার ছেলের ভোগে দুকলিকে লাগাবে কী লাগাবে না সে পরামর্শে ঘৃণাক্ষরে ভগবানের নাম পর্যন্ত তারা উচ্চারণ করে না। তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে, জমিদারের ছেলে তাদের মেয়েটাকে ভোগ করতে চায় এই সমস্যার বিচারে, পাপপুণ্যের হিসাব তারা তোলেই না। তারা যেন টের পেয়ে গেছে ও ঈশ্বর বল আর পাপপুণ্য বল—ও সব তাদের জীবন-মরণের হিসাব-নিকাশে আসে না।

শুধু সমাজ আর অভিজ্ঞতার হিসাব দিয়ে তারা আজ রাতের নৈতিক যুদ্ধ মাত করতে চায়। দুকলি প্রায় নির্বাক, মাঝে মাঝে দু একটি কাটা কাটা কথা শুধু বলে, আলোচনার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। দুকলি শুধু তাদের মনে পড়িয়ে দেয় যে সেও আছে, সেও একটা রক্তমাংসের মানুষ। তাতেই কাজ হয়।

গোমড়া মুখে ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করে, না এ পথ ভালো নয়। এতে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল হয় না।

গাঁয়ে দৃষ্টান্ত আছে, মেজোকর্তার নিজের নজর পড়েছিল ঘোষেদের বিনির ওপর। কী হল কী এল কী গেল দুদিন ভালো ঠাহর হল না, কোথায় রইল মেজোকর্তার শখ, কোথায় রইল বিনি, সমাজ গেল ধর্ম গেল। বিনি আজ ঘুঁটেকুড়োনির বাড়া।

বড়ো ক্ষণস্থায়ী বড়োর এই চোখের পিরিতি, হয়তো তিন রাত্রি মিলন সইবে না, বিষিয়ে যাবে। হেমন্তের মনে হবে, কেমন যেন পচা পচা গন্ধ দুকলির গায়ে, খসখসে চামড়া, ভোঁতা হাবা কথা, টনটনে আদায়ের বুদ্ধি। বাবুদের ছেলেমেয়ের ফাঁকা পিরিত তবু দুটো মাস একটা বছর চলে তবে ফাঁকিতে দাঁড়ায়, চাষির মেয়ে বাবুর ছেলের দুদিনের বেশি ভর সয় না। মেয়েপুরুষের তফাত শুধু নয়, আকাশ-পাতাল তফাত। খিদের সময় যেমন হাঁসটা মুরগিটা দেখে প্রাণটা হঠাৎ চনমনিয়ে ওঠে, দুকলিকে দেখে মেজোকর্তার ছেলের হয়েছে তাই, এ ফাঁদে ধরা দেওয়াটা উচিত হবে না।

হেমন্ত এসে শুনল, দুকলি মামাবাড়ি গেছে।

কদিন বাদেই এসবে আজ্ঞে।—ভয়ে ভয়ে গণেশ জানাল।

কী নির্লজ্জ বীভৎস হিংসা বংশানুক্রমিক জমিদারের ! একেবারে তো প্রত্যাখ্যান করেনি, মুখে লাথি মেরে তো জবাব দেয়নি জঘন্য প্রস্তাবের, আচমকা আত্মসমর্পণ করতে ভরসা না পেয়ে ছল

করে দুদিন শুধু সময় চেয়ে নিয়েছে। শুধু এই জন্য এমন দিশেহারা অত্যাচার ! মনগড়া অপরাধের দায়ে গণেশকে বেঁধে এনে বেদম মার, মহাজন ত্রৈলোক্যকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমি বে-দখলের মামলা বুজুর শাসানি, গভীর রাত্রে লোক পাঠিয়ে হানা দিয়ে ভাঙা ঘর দুয়ার তছনছ করা ! এ সব কি তবে দুকলির জন্যে, বালবিধবা কচি চাষাড়ে মেয়েটার জন্য হেমন্তের উন্মাদ ভালোবাসার প্রমাণ ? আগের দিন চোখে দেখে পরের দিন হাত ধরে টেনে এতই সে ভালোবেসে ফেলেছে মেয়েটাকে যে কলকাতার উচ্চশিক্ষা ভুলে ভালোবাসার নিয়মকানুন ভুলে যে ভাবে হোক মেয়েটাকে পাওয়ার জন্য যাচ্ছেতাই কাণ্ড আরম্ভ করেছে ?

পাড়ার নকুল দাস, আগে সে পুলিশের জমাদার ছিল, এখন বুড়ো বয়সে ঘরে বসে খায়, সে যেচে আপসের দায়িত্ব নেয়। গণেশকে ভর্ৎসনা করে বলে, যে ছেলে খুশি হলে মেম বিয়ে করতে পারে, সে ছেলে তোর মেয়ের দিকে কেন তাকিয়েছে বুঝতে পারলি না হারামজাদা—মেয়েকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিলি ? বালির বাঁধ দিয়ে তুই সাগর ঠেকাবি ? কাল মেয়েকে নিয়ে আয়গে যা। আমি এদিক সামলে নিচ্ছি।

সকালে গিয়ে হেমন্তকে কুঁজো হয়ে প্রণিপাত জানায়, মুচকি হেসে সবিনয় ভর্ৎসনার সুরেই বলে, করছেন কী ছোটোবাবু, মশা মারতে কামান দাগছেন ? হারামজাদা গণেশ আজ মেয়েকে আনতে ভিন গাঁ গেছে, নইলে ওর কান ধরে টেনে এনে নাকে খত দেওয়াতাম।

মেয়ে আনতে গেছে ?

আজ্ঞে আনতে গিয়ে সেখান থেকে না ভাগে। বড্ড ভয় পেয়ে গেছে। যা দাবড়ানিটা দিলেন !

কোথা ভাগবে ?

স্বজন আছে, কুটুম আছে, তীর্থ বিদেশ আছে। দেনায় ঘরদোর জমিজমা মাথাটি বিকানো। শালার কি আছে, গাঁয়ে কোন লোভে ফিরবে ?

হেমন্তকে চিন্তিত দেখে নকুল মুচকে হাসে, বলে, আপনি ভরসা দিলে ফিরিয়ে আনতে পারি। খরচাপত্র করে গিয়ে পড়ি একবার, কি বলেন ? নগদ টাকা কিছু গুঁজে দিই হাতে !

দুকলি কোথাও যায়নি, মামাবাড়ি থাকলে তো যাবে ! বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল। পাঁচুর কাছে যারা আজ এসেছে পরামর্শের জন্য, চেঁচামেচি শুনে এই ছেলেরা হইচই করে গিয়ে হাজির না হলে মাঝরাত্রে মেয়েটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত। এরা গণেশকে ভরসা দিয়েছে। মাঝখানে নকুল আপসে সব মিটিয়ে দেওয়ায় হয়েছে মুশকিল। গণেশ আর চায় না যে ছেলেরা তাকে রক্ষা করুক। চিরদিনের রক্ষাকর্তা জমিদার, সেই জমিদারের ছেলে ভবিষ্যৎ জমিদার হেমন্ত, তার রক্ষণাবেক্ষণেই গা ঢেলে দিতে গণেশ রাজি হয়ে গেছে।

এখন পাঁচু কী বলে ?

আমি বলি কী, দুকলিকে শুধানো যাক, সে কী বলে !

ষোলোটি ছেলে চমৎকৃত হয়ে যায়, চুপ করে থাকে।

পাঁচু মর্মে মর্মে টের পায় নেতৃত্ব দেওয়া কী কঠিন কাজ ! তার কথার মর্মই কেউ ধরতে পারেনি।

পাঁচু এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থাকে, দুবার গলা সাফ করে। মুখের ভাব কঠিন করে। ধীরে ধীরে বলে, খানিক সত্যি শুনি, খানিক গুজব শুনি। এলোমেলো আবোল-তাবোল কত রকম কত কথা ! আসল ব্যাপার জানি কি ? তলে তলে কত কিছু ঘটতে পারে, গণেশ সাঁতরা বানিয়ে রটাতে পারে দশ কথা। তবে কি-না, দুকলি যদি বলে তার মন নেই, সে বাঁচতে চায়, সে ভিন্ন কথা। তাই ওকে শুধানো।

হারাণের ছেলে দানু বলে, তা বটে, তুই ঠিক বলেছিস পাঁচু ! ও ছুঁড়ি যদি তলে তলে বজ্জাতি করে থাকে, তবে মোরা এর মধ্যে নেই। ওকে শুধোলে হবে কী ?

পাঁচু বলে, উঁহু, তা নয়। বজ্জাতি করেছে না করেছে সে মোরা দেখতে যাব না। বড়োলোকের ছেলে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে নষ্ট করে থাকে মেয়েটাকে, সে ওরা বুঝবে। জবরদস্তি অত্যাচার মোরা ঘটতে দেব না—বাস্। না কি বলিস ?

সকলের উৎসাহ অনেক কমে গেছে টের পাওয়া যায় ! পাঁচু নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে, ওটা বললাম কথার কথা, মেয়েটা খারাপ হয়েছে এমন তো নয় ! মোর মন বলে, ও খাঁটি আছে। নয়তো ওই শালার পো হাঙ্গামা করবে কেন ? তবু একবার শুধিয়ে রাখা, পরে না বলতে পারে মোদের ব্যাপারে তোমরা এস নি !

এ যুক্তি সকলের মনে লাগে। তাই বটে, গণেশ বা দুকলি তো তাদের কাছে ধন্না দিয়ে বলেনি, মোদের বাঁচাও !

পাঁচুকেই দুকলির মনের ভাব বুঝতে যেতে হয়। মেয়েদের মন বোঝার বিদ্যাও সে যেন শহরেরর স্কুলে আয়ত্ত করেছে। তবে চাষি মেয়েরা মোটে রহস্যময়ী নয়, ওতে তাদের লাভ নেই, পোষায়ও না। তখন বেলা হয়েছে, মেঘহীন আকাশে ঠাটাপোড়া রোদ। দুকলির মা শাক বাছছিল, উনোনের তোলা কাঠ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। রান্নাঘরটা পড়ে গেছে সাঁতরাদের, শোবার ঘরের দাওয়াব এক পাশে বেড়া দিয়ে রান্না হয়।

দুকলিব মা বলে, পোড়াকপালে মেয়ে রে বাবা, ঘর না পুড়িয়ে কি ছাড়ে ? সোয়ামিকে যেদিন খেলো হারামজাদি, সেদিন জানি ও মেয়ে নিয়ে মোর মরণ হবে।

তেমন ঝাঁজ নেই, জ্বালা নেই তার কথায়। নকুলের সঙ্গে গণেশের কত্তাবাড়ি দরবারে যাওয়ার খবর পাঁচু জানত। আধ-অন্ধকার ঘরে গণেশ শুয়েছিল, সেখান থেকে তার গর্জন আসে, মেয়ে তোর করল কী, মেয়ে ? বাগানে বেগার খাটা নিয়ে গন্ডগোল, তাতে তুই মাগি তোর মেয়েকে টানিস কেন রে ? ফের রা করবি তো মুখ থেতলে দেব।

দুকলির দোষ কি সাঁতবা পিসি ? পাঁচু বলে।

কে জানে বাপ কার দোষ ?

পাঁচুকে উদ্দেশ করে গণেশ বলে, হেমন্তবাবুর শখ চেপেছে ফল-সবজির বাগান করবে, মোকে বলে বেগার খাটতে। না বলতে খাপ্পা হয়েছিল, আপসে চুকেবুকে গেছে। বড়োলোকের রাগ কতক্ষণ রয় ?

তা বটে। বড়োলোক রেগেই রয়, আরও বেশি রাগ হলে সেটা বড়োলোকেরও বেশিক্ষণ সয় না। দুকলির সঙ্গে আর মোকাবিলা না করলেও হয়, ব্যাপার বোঝা গেছে। গণেশ সোজা পথ ধরেছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দুকলি তাতে সায় দিয়েছে। মেয়ের জন্য তাই লাঞ্ছনাব ভয় নেই গণেশের, আগামী পুরস্কার মেয়ের কল্যাণে তার কপালে ঝুলছে। দুকলি আড়ালে গেছে—সামাজিক ভাবে।

সেটা অভ্যাস করতেই বোধ হয় ছেলেমানুষ পাঁচুর জন্য পর্যন্ত ঘরে আধ-অন্ধকারে দুকলি গা ঢাকা দিয়ে আছে।

সবাই জানবে, ঘোঁট পাকাবে, টিটকারি দেবে, কিন্তু তার বেশি যেতে কেউ সাহস পাবে না, না ব্যক্তিগত ভাবে, না সামাজিক ভাবে। কেউ বাড়াবাড়ি করলে হেমন্ত তাকে টিট করে দেবে।

তবে একটা স্পষ্ট বোঝা যায়, মনটা এদের খুশি নয়, নেহাত নিরুপায় হয়েই গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তা, মানতে হলে শক্তিমানের দাপটকে এমনি করেই মানুষ মানে। তাতে হেমন্তের জবরদস্তি, কুৎসিত অত্যাচার কাটানো যায়নি, নিছক মন্দ মেয়ের কলঙ্ক বা মা-বাপের মেয়ে বেচার কেলেঙ্কারি হতে চলেনি ব্যাপারটা। কিন্তু তবু এ অবস্থায় অন্যায়টা ঠেকাতে এগুনো মুশকিল। বড়োদের বা ছেলেদের সহানুভূতি জাগবে না, যার সর্বনাশ তার যদি প্রতিরোধ না থাকে তো দশজনের কীসের

গরজ ? গণেশ নিজেই হয়তো গাল দিয়ে বসবে দশজনকে, একেবারে অস্বীকার করবে কারও কোনো কুমতলব আছে তার মেয়ের সম্পর্কে !

কাকা মোকে শুধোতে পাঠাল, পাঁচু বলে, বলল কী, পাঁচু, তোর সাঁতরা পিসেকে শুধিয়ে আয়, ব্যাপার কী ! বাবুরা যদি বাড়াবাড়ি করে, গাঁয়ে কি মানুষ নাই ? সয় বলে কি সব অন্যায় সইবে গাঁয়ের লোক ? গাঁয়ের ছেলে বুড়ো পক্ষে দাঁড়ালে গণেশ সাঁতরার ভয়টা কী ?

তোর কাকার বড়ো দয়া। দয়া করে পাঠিয়ে দেছে, যা রে পাঁচু শুধিয়ে আয়, ব্যাপার কী !

এর পর কথা চলে না। পাঁচু বিব্রত বোধ করে এক ঘটি জল চেয়ে খায়। জল দেয় দুকলির মা, দুকলি যে ঘরে তার কিন্তু প্রমাণ মেলে এবারে ! চাপা গলায় গণেশের সঙ্গে সে কথা কইছে, দু-একটা ধারালো কথা পাঁচুর কানে আসে। নিমেষে পাঁচু চাঙ্গা বোধ করে। বাঁচবার উপায় থাকলে দুকলি যদি বাঁচতে চায় তবে আর কীসের পরোয়া করে পাঁচু ! হেমন্তের বাবারও সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে।

কিন্তু বৃথাই আশা, অপমান ঠেকাবার পণ নিয়ে দুকলি রুখে উঠে বিদ্রোহ করে না। ঘরের মধ্যে কলহের গুঞ্জন থেমে যায়, দুকলি কাঁদছে কি-না বাইরের থেকে ঠিক ধরা যায় না। হাজার কাঁদলেই বা কী আসে যায় ! নিজের মান বাঁচাবার যত সাধই তার থাক, মরি বাঁচি গোঁ ধরে তেজের সঙ্গে নিজে যদি সে রুখে না দাঁড়ায়, এমন একটা সুযোগ পেয়েও মরিয়া হয়ে ঘরের আড়াল ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এসে জোর করে মনের কথা না বলতে পারে, ঘরের কোণেই সে কেঁদে বুক ভাসাবে আর বাপের দুটো যুক্তি আর একটা ধমকে এমনি এলিয়ে যাবে বাঁচাব সাধ। দুকলি যদি দোমনা হয় কার কী করার আছে ? মন খারাপ করে পাঁচু বিদেয় হয়ে আসে।

৩

খান দুই বাড়ি আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে পাঁচু খানিকটা এগিয়েছে, পিছনে দুকলির ডাক শোনে—অ পাঁচু, পাঁচু ! একটু দাঁড়া না !

পাঁচু দাঁড়াতে দাঁড়াতে দুকলি এসে তার নাগাল ধরে। পায়ে চলা সরু মেটে পথটা এখানে দুপাশের বাঁশঝাড় হেলে পড়ে ঢেকে রেখেছে। পাঁচুর হাত চেপে ধরে দুকলি ব্যাকুলভাবে বলে, কী বলছিলি পাঁচু ?

কদিনের ভয়-ভাবনায় দুকলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কালিমারা মুখে তার রাজার ছেলের সঙ্গে পিরিতের সুখকল্পনার চিহ্নও নেই। পাঁচু নিজেকে ধিক্কার দেয়। হাঃ, কালীনাথের দলের সে বিশ্বাস পেয়েছে, পাকা কানাইরা তার বন্ধু, তাই মগজে তার সব সময় মস্ত মস্ত চিন্তা গিজগিজ করে, সোজা কথা সহজভাবে আর ঢোকে না মাথায়। এমন একটা ব্যাপারে গাঁয়ের ছেলেরা উৎসাহী হয়ে যেচে এল তার কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে, সে গা ভাসিয়ে দিল চিরকেলে ঝিমানো ভীরুতায়, সাবধানে চুলচেরা হিসাব করতে বসল, এতে ওই হয়, ওতে ওই হয় ! একটা কুৎসিত অন্যায় ঘটতে যাচ্ছে, ছেলেরা কোমর বেঁধেছে সে অন্যায় ঠেকাতে, সে কোথায় উৎসাহের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে কাজে, তার বদলে তার শুধু মাথাব্যথা অন্যায়টা ঠেকানো উচিত কী উচিত নয় ! অত্যাচার প্রতিরোধের প্রথম শর্ত যেন কেউ অত্যাচার চায় কী চায় না স্থির করা। ছি, পাঁচু ছি !

বলছিলাম, বাবুদের ভয়ে পাঁক গিলতে হবে ? গাঁয়ে মানুষ থাকে না ? তিন গুঁতোতে ভাঙা যায় না হারামজাদার ছিঁচলেমি ? তা তোরাই যদি না চাস তো—

না চাই কী গো ! কে বললে চাই না ?

তোর বাপ যে গাল দিলে মোকে ?

বাপ না বাপ, মাথা ঠিক আছে ? ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে গেছে পেটের মধ্যে।

পাঁচু বলে, বটে ? তা দানু বললে, তোর নাকি ফুর্তি খুব, কলকাতা যাবি, মোটর চাপবি !

দানুর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব। ছোঁড়া মোর ফুর্তি দেখেছে, না ? ওর বোনকে বাঘে ধরুক ঘোগে খাক, ও যাক ফুর্তি দেখতে !

তা, তোমার মনের খবর কে জানবে বলো ? বাঘে ধরলে তো চেঁচায় মানুষ, দশটা আপন জনকে তো ডাকে যে, মোকে বাঁচাও গো।

তোর বউকে বাঘে ধরলে দেখিস কত চেঁচায়, গলা দিয়ে কত আওয়াজ বেরোয় দেখিস ! তোর বউকে যেন দশটা বাঘে ধরে পাঁচু, তার মধ্যে যেন কটা সাহেব বাঘ থাকে।

পাঁচু তখন খুশি হয়ে তাকে ভরসা দিয়ে বলে, আচ্ছা যা, বাঘে তোকে ধরবে না দুকলি, ভয় নেই। বাঘ আমরা জব্দ করব।

দুকলি মিনতি করে বলে, ছায়ায় একটু বসি আয় পাঁচু। আড়ালে বসে কটা কথা কই।

পাশের বাঁশবন প্রায় ছুঁয়েছে, তার মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্তরাল ও ঘন নিবিড় ছায়া। কথা বলবার তাগিদ পাঁচুও বোধ করছিল। শক্ত হওয়ার মর্মটা দুকলিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। কীসে তার সত্যিকারের ভরসা সে ধারণাও হয়তো তার নেই।

পাঁচুকে দুকলি জঙ্গালের গভীর গহনে টেনে নিয়ে যায়, আচমকা শান্তিভঙ্গে মস্ত একটা বিষাক্ত সাপ কয়েক হাত তফাত দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে পালিয়ে যায়, এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ানোর বেশি গ্রাহ্যও করে না। মানুষের ভয়ে দুদিন চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে কী যেন হয়েছে দুকলির, মানুষের চোখ কানের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েও তার স্বস্তি নেই, আরও সে নিরাপদ আড়াল চায়।

কোথা চলেছ ?

ওই হোথা বসিগে চ।—দুকলি জঙ্গালের আরও ভেতরের দিক দেখিয়ে দেয়। বাঁশবনের সেই দুর্গম নির্জন স্থানটিতে পৌঁছে পাঁচু দেখতে পায় কয়েক হাত জায়গা সাফ করে একটি চাটাই বিছিয়ে রাখা হয়েছে, কাছে আছে একটি সরা-চাপা মাটির কলসি।

দুকলি বলে, চুপিচুপি জায়গাটা খুঁজে রেখেছি, বাড়িতেও বলিনি। মুখপোড়া এলে টুক করে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইতাম।

ছোটো ছোটো নিশ্বাস ফেলে দুকলি। পাঁচু অভিভূত হয়ে থাকে। এবার তার দুকলির কাছে নিজেকে ছোটো মনে হয়, একটা মেয়ের কাছে !

এসো মোরা বসি।

চাটাইয়ে বসে হেসে কেঁদে কত কথাই দুকলি তাকে বলে, রাত্রিবেলা ভয়ে আঁতকে আঁতকে ওঠার কথা বলতে বলতে সে গা ঘেঁষে আসে পাঁচুর। জগৎ-সংসার যখন তার ঘাড় মটকে দিতে উদ্যত হয়েছে, একজনকে খুঁজে পায়নি ভরসা করে যার মুখের দিকে তাকাতে পারে, তখন একা সে সাপখোপের এই ভয়ানক জঙ্গালে আত্মগোপনের স্থানটি খুঁজে বার করেছিল—আজ এখন সেইখানে সে বন্ধু পেয়েছে একজন, পৃথিবীতে তার একমাত্র আপনজন ! কিশোর প্রাণের অতল কৃতজ্ঞতায় কখন সে পাঁচুর গলা জড়িয়ে ধরে।

পাঁচু সাহস দিয়ে বলে, ভয় কী, আমি তো আছি !

তাই বটে। চাষার ছেলে পাঁচু থাকতে রাজপুত্রে দুকলির কীসের ভয়, কীসের লোভ ?

আকাশের মাঝামাঝি সেই সূর্য, তেমনই প্রচণ্ড রোদ। আটুলিগাঁর মেটে পথ কুঁড়েঘর বনবাদাড়, কর্তাদের দোতলা দালান, শালবনের সবুজ ঢাল, সব তেমনই আছে বাঁশবনের সোঁদাগন্ধি নিবিড় ছায়ায়। নতুন একটা পৃথিবীর জন্ম হল পাঁচুর জন্য ! অথবা তার কিশোর জীবনের সমস্ত শোভা

সমস্ত আনন্দ সব তেজ সব উদ্দীপনার সামঞ্জস্য ঘটেছে। এই চড়া রোদে ঘামতে ঘামতে বাড়ির পথে হেঁটে চলায় তাই দিগ্‌বিজয়ী নাচের আমেজ বোধ হয়। প্রথমেই মনে হয়, পাকা কী ভাববে ? এ কৌতূহল এত প্রচণ্ড, পাকার মনোভাব আন্দাজ করতে এমন আগ্রহ বোধ করে পাঁচু যে, তার ইচ্ছা হয় এখুনি আবার ঢাকা রওনা হয় পাকাকে শুধু এই কথাটা জিজ্ঞাসা করে আসতে। পাকা নিশ্চয় হাসবে, নয় ছি ছি করবে। পাকা ভালোবাসার কাব্য জানে। তার কাব্যের জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে। ভালোবাসার অনেক প্রস্তুতি, অনেক আয়োজন, অনেক হাঙ্গামা। বলা নেই কওয়া নেই আচমকা বাঁশঝাড়ের পচা হাওয়ায় কি প্রেমের আনন্দ সৃষ্টি হয় ?

পাঁচুর মুখে একটু দুষ্টামিভরা মুচকি হাসি ফুটে থাকে। পাকার সঙ্গে তার তর্ক নেই। তার শুধু জানার ইচ্ছা পাকা কী বলবে !

৪

বেলা থাকতেই গণেশ নিয়ে হেমন্তের দরবারে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। তার মুখের ভাব করুণ, চোখ প্রায় ছলছল করছে।

বলতে ভরসা পাইনে ছোটোকত্তা ! কাল বাগানের কাজ শুরু করতে লাড়ব।

কেন ?

আজ্ঞে মামাবাড়ি গিয়ে মেয়েটা জ্বরে পড়েছে। দেখতে যাব।

অপমানে ফরসা মুখ রাঙা হয়ে যায় হেমন্তের। নকুল বলল রাজি হয়েছে, আবার বিগড়ে গেল গণেশ ? ঘরের কোণে দোনলা বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রাখা ছিল। সেটা হেমন্ত হাতে তুলে আনে। ছাইবর্ণ হয়ে যায় গণেশের মুখ।

তুই শালা ইয়ার্কি পেয়েছিস আমার সঙ্গে ? পাখি মারতে গিয়ে খানিক আগে দেখে এলাম মেয়ে তোর জল আনছে, মামাবাড়ি গিয়ে জ্বরে পড়েছে ? তোর কগণ্ডা মেয়ে রে হারামজাদা ?

মাথা হেঁট করে থাকে গণেশ। ভয়ে লজ্জায় তার বুক ফেটে যায়। এমনই বাঁকা বাঁকা ভাষা আড়াআড়ি কথাবার্তাই হয়েছে তার হেমন্তের সঙ্গে। হেমন্ত কখনও বলেনি তোমার মেয়েকে আমার চাই গণেশ, সেও কখনও বলেনি মেয়ের বদলে আমায় কী দেবে। মেয়েটা তার উহ্য থেকেছে তাদের দরদস্তুরে। খুঁজে পেতে এ মেয়ের সে বিয়ে দিয়েছিল। জামাই তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত, মাথা নত করে তার প্রীতিবাক্য সদুপদেশ শুনত। এ ছোঁড়া তাকে শালা হারামজাদা বলে গাল দিচ্ছে ! সে কি-না দরদস্তুর করেছিল, অসামাজিক উপায়ে মেয়ের বয়সকালের সাধ-আহ্লাদের রফা সামঞ্জস্য করবার সঙ্গে মোটা কিছু পণ বাগাবার চেষ্টা করেছিল, তাই আজ তার এমন লাঞ্ছনা !

জমি নিয়ে খাজনা নিয়ে বেগার খাটা নিয়ে তাকে বেঁধে এনে হেমন্ত মুখে থুতু দিলে বুকে লাথি মারলে তার এতটা লাগত না। সে আলাদা ব্যাপার, সে ব্যাপারের আলাদা রীতি, আলাদা নিয়ম। নির্জন ঘাট থেকে পথ থেকে দুকলিকে হেমন্ত যদি ধরে নিয়ে যেত গায়ের জোরে, সেও হত আলাদা কথা। সামাজিক বিয়ের জন্য হোক বা না হোক, মোটামুটি তার মেয়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়তে তার সঙ্গেই বোঝাপড়ায় নেমেছে হেমন্ত, কিন্তু এ পর্যন্ত তার বাপের মর্যাদা বরবাদ করেনি। সে-ই আজ সব আড়াল তুলে দিয়ে শালা হারামজাদা বলে গাল দিচ্ছে মুখোমুখি।

চালাকি ছাড়, গণেশ ! দশখানা করকরে নোট গুনে নিয়ে এখন বজ্জাতি ?

নোট ?

ওরে শুয়ার ! এখন আকাশ থেকে পড়লি ? নকুল তোকে টাকা দিয়ে আসেনি ?

বাগানো দুনলা বন্দুকের দিকে চেয়ে গণেশ ধীরে ধীরে বলে, না, কেউ মোকে টাকা দেয়নি। তোমার টাকা আমি চাই না।

শুনে হেমন্ত তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে যায়। বন্দুকটা টেবিলে রেখে বলে, নকুলটা তা হলে বজ্জাতি করেছে, টাকা তোমায় দেয়নি ? দাঁড়াও ওকে ডেকে আনাচ্ছি। তোমার সামনে ওর দুটো কান যদি আমি কেটে না নিয়েছি—

সে তুমি কেটো। গণেশ বলে, কান কেন, গলা কেটো। আমি তোমার টাকা চাইনে। একশো কেন, লাখ টাকা চাইনে।

এমন আবেগময় ব্যাপার, অথচ জমিদার-বাচ্চা হেমন্তের কাছে কোনো মূল্যই পেল না। তার হল শুধু জ্বালা ! সে জ্বালা নিবারণ করতে গভীর রাত্রে জন কতক লোক নিয়ে সে চড়াও হতে গেল গণেশের ভাঙা কুঁড়েতে। আহা, যেন রূপকথার রাজকুমার চলেছেন দৈত্য-দানবের কবল থেকে রাজকন্যার উদ্ধারে !

চাষি ছেলেদের হাতে নিদারুণ মার খেয়ে তারা ফিরে এল। এমনটা তারা অবশ্য ভাবতেও পারেনি, আগে জানলে প্রস্তুত হয়েই যেত।

হেমন্তকে নাকে খত দেওয়াল ছেলেরা। টিকলো নাক আর চেরা থুতনির খানিকটা চামড়া উঠে গেল। হেমন্ত সত্যই রূপবান, সুন্দর ছাঁচে ঢালা তার মুখখানা, বনেদি জমিদারের ঘরে বংশানুক্রমে রূপসি মেয়ে কেনার ফলে সাধারণত যেমন হয়। লণ্ঠনের আলোয় বীভৎস কুৎসিত দেখাল হেমন্তেব মুখ। ভেতরের এক কদর্য বোগই যেন ফুটে বেবিয়েছে।

রাত্রেই চারিদিকে জানাজানি হয়ে যায়। ঘুম স্থগিত রেখে আটুলিগাঁ উত্তেজিত জটলা চালায়। রাগে দুঃখে বুক ফেটে যায় মেজোকর্তা বসন্তের, হাত-পা কামড়ে তার মরতে ইচ্ছা কবে। অত রাত্রে হাতের কাছে কেউ নেই, তাই হেমন্তের মার উপরেই একচোট ঝাল ঝাড়ে। একটা চাষার মেয়ে বাগাতে কেলেঙ্কারি করে, বংশের নাম ডোবায় এমন হতভাগা অপদার্থ ছেলে সে বিইয়েছে কেন, এই হল হেমন্তের মাব অপরাধ ! বদ বংশের মেয়ে না হলে তার পেটে এমন ছেলে জন্মায় ?

তোমাদের কাছেই শিখেছে অকাজ কুকাজ। যেমন বাপ ছিল, তেমনই ছেলে হয়েছে।

শিখেছে ? নাকে দড়ি দিয়ে যাদের টেনে আনবে তাদের কাছে কানমলা খাওয়া শিখেছে ?

বহুদিন পরে বসন্ত আজ আবার হেমন্তের মাকে মেরে বসে। তার জমিদারিতে বাস করে তাকে প্রজারা অবজ্ঞা করছে এই মনঃপীড়া নিয়ে আজকাল তাব দিন কাটে, নিজের ছেলের এই আত্মসম্মানবোধের অভাবে যেন তার চরম হল। প্রজার ঘরে এদিক ওদিক দুটো একটা ফুল ফুটলে, চোখে পড়লে জমিদারের, জমিদারের ছেলের পূজায় তা লাগে। কিন্তু এই কি তার প্রক্রিয়া ? হেমন্ত কি গাঁয়ের সাধারণ বখাটে ছোঁড়া যে কাঙালের মতো পিবিত করতে চাষার বাড়ি যাবে, চোরের মতো মার খেয়ে নাকখত দিয়ে বাড়ি ফিরবে ? সামান্য চাষার তুচ্ছ একটা মেয়ে ! হুকুম দিয়ে ডেকে পাঠালে যে আসে, না এলে যাকে বাপ-দাদা সমেত পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে আনা যায়। গায়ের জোরে মেয়েটাকে ধরে আনিয়ে হেমন্ত যদি কেলেঙ্কারি করত তাতেও গৌরব ছিল বসন্তের।

এখন শুধু ভরসা, হেমন্ত প্রচণ্ড প্রতিঘাত হানবে। ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে সমস্ত লজ্জা অপমান কলঙ্ক। আতঙ্কে গলা বুজে যাবে আটুলিগাঁর, বুক ছোটো হয়ে যাবে—আজ রাত্রির ঘটনা তুচ্ছ হয়ে তলিয়ে যাবে ভয় ও ভক্তিতে। সকালে তাই শত শতবার বসন্তকে নিজের মৃত্যু কামনা করতে হয়, অসহ্য ক্রোধের জ্বালার মধ্যে আসে অকথ্য যন্ত্রণাবোধ, হতাশা। ভোরে আটুলিগাঁর কাক ডাকবার আগে হেমন্ত শহরে পালিয়ে গেছে।

আটুলিগাঁর মেজোকর্তার ছেলে চাষার হাতে মার খেয়ে রাতারাতি ভেগেছে কলকাতায়।

আমার ছেলে নয়, মধু। অনেকবার সন্দেহ জেগেছে, আজ প্রত্যয় হল। ছোটোলোক চাকর-মুনিশ কেউ ওর জন্ম দিয়েছে। দ্যাখো, ও যখন ওর মার পেটে এল আমি বেশির ভাগ সময় সদরে, নয় কলকাতায় থাকতাম—

হেমন্তের মাকে মাঝে মাঝে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেওয়ার জন্য ছাড়া কোনোদিন যে খটকা বসন্ত কারও কাছে প্রকাশ করেনি, মনের মধ্যে পুষে রেখেছে, আজ তা বেরিয়ে আসে। মধু ভটচাজ অবশ্য বহুকালের ইয়ার স্তাবক, এ রকম মানসিক অবস্থায় এ সব লোককেই বেশি অন্তরঙ্গ মনে হয়। বাপ ছিল এ অঞ্চলের বিখ্যাত উকিল, মধু কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিল, চিকিৎসা পেশা করে গাঁয়ে আছে। বাপের জমিজমা কিছু অবশিষ্ট আছে, টাকা-পয়সা-সম্পত্তির বেশির ভাগ উড়ে গেছে বয়সকালে। লোকটা ঝানু।

মধু বলে, মাথা বিগড়ে গেছে ? যা-তা বলছ কেন ? অন্যের কাছে তোমার চেহারা পেয়েছে, না ?

যাই বল মধু, আমার ছেলে ভয়ে পালিয়ে যেত না।

মধু মৃদু হাসে।—ভয়ে ? এত বড়ো জমিদারি চালালে কি হবে, তোমার ভাই এ সব বুদ্ধি কম। লজ্জায় পালিয়েছে ছেলেটা, ভয়ে নয়। একালের ছেলে, শহরে পড়েছে, ঘষামাজা পেয়েছে, এই যাকে বলে কি-না মার্জিত রুচি। একটা ছুঁড়ির সঙ্গে ফচকেমি করতে গিয়েছিল, লোকে কী ভাবছে, কী করে সবাইকে মুখ দেখাবে, এই সব ভেবে লজ্জায় পালিয়েছে। বুঝলে না ?

আবার বলে মধু, ছেলে যাক না শহরে, কী হয়েছে ? এ ব্যাপারটা না ঘাঁটাই তো ভালো। যতই হোক, মেয়ে নিয়ে ব্যাপার, লোকের মনটায় নানা রকম হয়। শাস্তি দিতে চাইলে কি ছুতোর অভাব ঘটে ? ওই গণেশটাকে, ছোঁড়াগুলোকে, ছুঁড়িটাকে ঠুকে ঠান্ডা বানিয়ে দাও। হুকুম দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।

ছোঁড়াগুলো কে জানো মধু ?

জানি বইকী। বুড়োগুলোকেও জানি।

বয়স্করা কিন্তু ছেলেদের মতলব জানত না, পিছনে ছিল না। জ্ঞানদাস পর্যন্ত ভাসা ভাসা জেনেছিল। ঘটনার পর শুধু সে আর তারই মতো দু-চারজন গোঁয়ার কাজটা পছন্দ না করেও সমর্থন করেছে। সাধারণভাবে বয়স্কদের সমাজ চমকে গেছে ছেলেদের কাণ্ডে, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এ নিছক গোঁয়ার্তুমি ; শোচনীয় অবিবেচনা। এ ছাড়া কি আর উপায় ছিল না হেমন্তকে ঠেকাবার, যাতে চারিদিক বজায় থাকত, কর্তাবাবুরা আহত অপমানিত ও কুপিত হত না ? জমিদারের ছেলেকে ঠেঙানো ভালো, কিন্তু ঠেঙিয়েই কি পার পাওয়া যায় ? জমিদারও ঠেঙাবেই, সেটা কি এখন ঠেকাতে পারবে ছেলেরা ? আঘাত যে ব্যাপকভাবেই আসবে, দোষী নির্দোষ নির্বিশেষে শাস্তি পাবে, নাস্তানাবুদ হবে, তাও জানা কথাই।

এখন কোন দিক দিয়ে কী ভাবে অত্যাচার আসে, বড়োদের তাই ভাবনা।

বসন্তের ছেলে না হয়ে সাধারণ কেউ হলে এ ব্যাপার নিয়ে সামাজিক মজলিশ বসত, ব্যাপারটার সঙ্গতি-অসঙ্গতি এবং কী করা-না-করা নিয়ে। রসালো মজাদারও হত মজলিশটা, ঠাট্টা তামাশা, কথা কাটাকাটি রাগারাগি এবং হয়তো বা ছোটোখাটো দু-একটা হাতাহাতিতে এবং মিটমাট হত জোড়াতালি দেওয়া মীমাংসায়। কিন্তু জমিদারের ছেলে-ঘটিত এ ব্যাপারে প্রকাশ্য মজলিশ অসম্ভব। কে ঘাঁটতে যাবে বিষয়টা, কে ঘোষণা করবে যে সে জানে কী ঘটেছিল, সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা তো দূরের কথা।

হাটে মাঠে ঘরের দাওয়ায় দু-চারজনের মধ্যে সাবধানে ঘরোয়া আলাপ আলোচনাই চলে। সেই গুজবেই মুখরিত হয়ে থাকে আটুলিগাঁ।

জ্ঞানদাস আপশোশ করে বলে, আগে একটু পরামর্শ করলি না পাঁচু !

কী পরামর্শ ? ঘরে ডাকাত পড়েছে তার পরামর্শ কী ?

মেয়ে নিয়ে কাণ্ড, এ বড়ো ঝকমারি কাজ। লোকে এগোয় না মোটে, সায় দেয় না। খাজনা বন্ধের ব্যাপারে দ্যাখ, বুক ঠুকে সব ঘাড় তুলে দাঁড়িয়েছিল। এতে মন করবে কী, নোংরা ব্যাপার ওতে গিয়ে মোর কাজ নাই। ঠেঙিয়েছিস আচ্ছা করেছিস, ওর বাপ শালাকেও ঠেঙানো দরকার। তা ঠেঙালেই তো হয় না, আঁটঘাঁট বাঁধতে হয় আগে।

কী আঁটঘাঁট বাঁধব ?

পাড়ায় গাঁয়ে ঘোঁট পাকাতি আগে সে সবাই দ্যাখো গরিবের পরে কী অত্যাচার। বাবুদের ছেলে জবরদস্তি মেয়েছেলের ধর্ম নষ্ট করেছে। দু-চারজন ভদ্দরলোককে মধ্যস্থ মানতি। তাতেই ভড়কে যেত বজ্জাতটা, মিটে যেত ব্যাপার। তবু যদি আসত জোর খাটাতে, তখন পিটিয়ে দিতি। ব্যাপার হত কী, আগে থেকে হইচই করা থাকলে দশজনকে পিছনে পাওয়া যেত। রাগ হত সবার।

খুব সহজ রাজনীতি। পাঁচুও বোঝে। কিন্তু বাঁশবনে দুকলি তাকে রাজনীতি ভুলিয়ে দিয়েছে। আগে ঘোঁট পাকালে হেমন্ত যদি ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে যেত, তাকে আঘাত করার, ঘাড় ধরে তাকে উঠানে নাকে খত দেওয়ানোর সুযোগও তাহলে যে ফসকে যেত ! আগে পাঁচু জানত না, দুকলি নিজে জানিয়ে দিয়েছে সে সত্যই কত ভালো, কত ভীরু, কত অসহায়। টাকার জোরে বা গায়ের জোরে হোক, দুকলিদের নিয়ে যারা খেলা করে তাদের মতো পাষণ্ড জগতে নেই। পাঁচুর আগের হিসাব পালটে গেছে। স্বেচ্ছায় খুশি হয়েও যদি কোনো দুকলি কোনো হেমন্তের সঙ্গে ভাব করে, পাঁচু তাকে এতটুকু দোষ দেবে না, মন্দ ভাববে না। মন্দ শুধু হেমন্তেরা, সব দোষ ওই এক পক্ষের। ওদের ফাঁসি দিতে হয়।

শ্যামল তাকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। বলে, তা বইকী, যা অন্যায় অত্যাচার সেটা তাই থাকে, হাসি মুখে খুশি হয়ে একজন মেনে নিলেই সেটা শুদ্ধ হয়ে যায় না।

যেহেতু গুরু-শিষ্য দুজনেরই মনে উঁকিঝুঁকি মারে তাদের বোধগম্য এই কথাটার পিছনের প্রকাণ্ড সত্যটা যে জগতে যত পাপ যত অনাচার সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনবান শক্তিমানদের সৃষ্টি, দুজনেই তারা অস্বস্তি বোধ করে। কৃতকার্যের জন্য পাঁচুর মনে কোনো ক্ষোভ, কোনো আপশোশ নেই। নলিনী দারোগাকে মারবার সাধটা নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে তার মনে অসহ্য চাপ দিচ্ছিল। দুকলির মান বাঁচাতে হেমন্তকে শাস্তি দেওয়ার প্রতিক্রিয়ার সাময়িক ও আংশিক একটা শান্তি এসেছে। বড়ো চিন্তা তাই একটু পীড়া দেয়, অস্বস্তি দেয়। একদিকে মনে হয়, কত কথা চিন্তা করার ছিল, কিছুই হল না। অন্যদিকে সেই সঙ্গে মনে হয়, নিজের কাজের যেন অজুহাত খুঁজছে, কৈফিয়ত সৃষ্টি করছে।

বিকেলে আকাশ ছেয়ে ঘনকালো মেঘ ঘনিয়েছে। মেঘ ঘনাবার সমারোহ মাথায় নিয়েই পাঁচু শ্যামলের কাছে এসেছে। জানা কথা যে আজ দারুণ বর্ষা নামবে। এত দেরি করে যখন এসেছে, মাঠের অর্ধেক ফসল জ্বালিয়ে দিয়ে একেবারে বন্যা বইয়ে দিয়ে ছাড়বে এবারেব বর্ষা। তাই নিয়ম।

বৃষ্টি নামবে। বাড়ি যাও।

যাই।

যাই বলেও পাঁচু যায় না। বন্ধুর জন্য তার মন কেমন করছিল। শ্যামলের সঙ্গে অনেকটা বন্ধু-সঙ্গ মেলে, যতই সে বুড়ো হোক। আনমনে সে বলে, এমনই মেঘ দেখলে পাকা কি করে জানেন ? গুম খেয়ে যায়।

গুম খেয়ে যায় ?

হাঁ। মেঘ হলে ওর নাকি মিছিমিছি মন কেমন করে, গান শুনতে সাধ যায়, ভয়ানক কষ্ট হয়। নিজেকে তাই ধিক্কার দেয়।

লণ্ঠনের আলোয় শ্যামলের মুখচোখের কৌতূহল সবটা ধরা যায় না।—ধিক্কার দেয়, না ?

পাকা বলে, এই তো প্রমাণ ভেতরে ভেতরে আমি ভদ্দরলোক। মেঘ হয়েছে বৃষ্টি হবে, প্রতি বছর মেঘ হয়, প্রতি বছর বৃষ্টি হয়। মেঘ হলে আমার এমন বিশ্রী লাগবে কেন ? জানিস পাঁচু, আমি ঢং করি তোদের সঙ্গে। ভেতরে ভেতরে আমি ওই খাঁটি ন্যাকা হাঁদা ভদ্দরলোকের বাচ্চা। এমন করে পাকা বলে, যদি শুনতেন !

বাইরে টপটপ মোটা মোটা জলের ফোঁটা পড়তে শুরু হয়েছে। শ্যামল বলে, পাকার একটা খবর পেয়েছি, তোমায় বলিনি।

পাঁচু সাগ্রহে বলে, পাকার খবর ?

পাকাকে দলের সভ্য হতে বলা হয়েছে। পাকা রাজি হয়নি।

রাজি হয়নি ! পাকা ?

কালীনাথ ওকে একদিন বাতিল করেছিল। কালীনাথ নিজে ঢাকায় গিয়ে পাকাকে জানিয়েছে তার নাম কাটা ভুল হয়েছিল। সেদিন রাত্রেই কালীমন্দিরে শপথ করিয়ে তাকে একেবারে দলের মেম্বার করা হবে। পাকা নাকি কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল, আর তা হয় না কালীদা। অনেক বুঝিয়েও কালীনাথ তাকে রাজি করতে পারেনি।

তলিয়ে না জানলেও পাঁচু মোটামুটি পাকার দুঃখ জানত। এই সেদিনও সে শ্যামলের এই বাড়িতে কালীনাথদের সঙ্গে পাকাকে নিয়ে ঝগড়া করেছে, বলেছে পাকাকে তারা কেউ বোঝে না। ঢাকায় পাকার রকমসকম দেখে পাঁচু খুশি হতে পারেনি, কিন্তু বলা মাত্র বাপের রিভলবার ও সৎমার গয়নার বাক্সো বিপ্লবের জন্য দান করে পাকা সেটা পুষিয়ে দিয়েছিল। তবু কালীনাথ নিজে গিয়ে বলাতেও পাকা রাজি হল না দলে আসতে ?

পাকা কারণ দেখায়নি ?

দেখিয়েছে। ওর নাকি ব্রহ্মচর্য নেই। ছেলেটা একটু পাগলাটে।

পাঁচুর মনে পড়ে। ব্যায়ামাগারে পাকার সেদিন নাম কাটা গিয়েছিল। খেদের সঙ্গে পাকা বলেছিল, চরিত্র কাকে বলে জানিস পাঁচু ? গা বাঁচিয়ে চলার শুচিবাইকে। চাদ্দিকে গোবর ছড়া দিয়ে মাঝখানে বসে থাকলে চরিত্র ঠিক থাকে, বিধবারা নইলে চরিত্র ঠিক রাখে কী করে বল ? গোবরের গণ্ডি পেরোলেই চরিত্র নষ্ট হয় ! ব্রহ্মচর্য কাকে বলে শুনবি ? যে বাড়িতে মেয়েলোক থাকে সে বাড়ির চৌকাঠ না ডিঙোনোতে। মেয়েলোকের ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলেই ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়।

৫

বৃষ্টিতে [illegible] বাড়ি ফেরে। গণেশের বাড়ি হয়ে আসে। এগারোটি ছেলে আজ রাত্রে গণেশের উত্তর ভিটেয় আধ-ভাঙা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘরের অর্ধেকটা জলে ভেসে গেছে। সমস্ত ঘরটা গলে যাওয়া আশ্চর্য নয়। ঘরের মেঝেতে বাঁশ পুঁতে যেদিকে বৃষ্টি পড়ে না সেদিকে মাচা তৈরি করে ছেলেরা জড়াজড়ি করে শুয়েছে। কাঠ বাঁশের অভাব তাড়াতাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি, মাচাটির যায় যায় অবস্থা।

অন্য ঘরটি বর্ষায় বাসের একেবারে অযোগ্য। অত বড়ো চালায় খড় তুলবার সাধ্য গণেশের হয়নি, বুদ্ধিমানের মতো দাওয়ার কোণটা [illegible] সেইটুকু চালা সে মেরামত করেছে। হাত চারেক

লম্বা হাত দুই চওড়া ঘর, তবে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না। গুটিসুটি হয়ে গাদাগাদি করে শুয়ে বসে সুখে রাত কাটাও।

বাড়িতে সবাই অন্ধকারে জেগেই ছিল, সুভদ্রা লণ্ঠন জ্বালে। বিকালে মেঘ ঘনাবার আগে গোবিন্দ পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। আজ তার এ পাড়ায় চিঠি বিলি করবার দিন নয়, কৌতূহলের খাতিরে নিজের গরজেই এসেছিল। পাকার চিঠি, ইতিমধ্যে খাম খুলে পড়া হয়েছে। ধনদাস আর জ্ঞানদাস চেষ্টা করে সাধারণ চিঠির মোটামুটি পাঠোদ্ধার করতে পারে।

ধনদাস বলে, কী ঠিঠি লেখে তোর বন্ধু, মানে বোঝা দায়। বিষয়টা কী ?

আগে পড়ি।

বিষয়টা গুরুতর, কিন্তু লম্বা চিঠিতে এখানে ওখানে শুধু ছুঁয়ে গেছে পাকা, বাকি সব মনের কথা, জল্পনা-কল্পনা। তবে সে জল্পনা-কল্পনার মানেও পাঁচু আন্দাজ করতে পারে, পাকার বর্তমান মনের ভাবটা চিঠিতে বেশ ফুটেছে। পাপ-পুণ্য উচিত-অনুচিত তা পাকা বলছে না, কিন্তু সকলের বেলা তো এক নিয়ম খাটে না, মানুষ তো স্বাধীন। যেমন ধর, কারও প্রাণ বাঁচাতে যদি কেউ চুরি করে, সেটা কি পাপ ? কারোর ক্ষতি যদি সে না করে তবে যা খুশি করার অধিকার পাকার নিশ্চয় আছে। আমি মরি বাঁচি গোল্লায় যাই নরকে ডুবি অন্যেব তাতে কী এল গেল, খুশি হলে আমি তো আত্মহত্যাও করতে পারি ? আইনে অবশ্য বলে পারি না, কিন্তু আইন যারা করেছে তারা মূর্খ, যে আত্মহত্যা করবে সে নাকি আইনের ধার ধারে ! অন্যের অনিষ্ট না করে নিজেকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার নিশ্চয়ই মানুষের আছে, নইলে স্বাধীনতা কীসের, নইলে তো শুধু অন্যের ইচ্ছায় চলতে হয়।

এ সব কথা কীসে উঠল কেন উঠল পাকা তা লেখেনি, অনুমান করতে যদিও পাঁচুর কষ্ট হয় না। ঢাকায় কটা দিন সে চোখ কান বুজে ছিল না। পাকার মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে সুধাকে কাঁদতে দেখার, ওভাবে কাঁদতে দেখার মানে বুঝতে, চাষাভুসোর ছেলে সে, তার মাথা ঘামাতে হয় না। সে না হয় হল, জগতে কারও ক্ষতি না করো পাপ করার অধিকার না হয় পাকা দাবি করল, কী করেছে না জানিয়েও পাঁচুর কাছে কৈফিয়ত দাখিল করল যা খুশি করার স্বাধীনতার, কিন্তু আত্মহত্যার কথা লেখে কেন পাকা ? শুধু কি যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছে, না অন্য কিছু আছে পাকার মনে ? আরও অনেক কথা পাকা লিখেছে। তার জীবনে সব উলটো হয় কেন পা।। বুঝতে পারছে না। যেদিকে যাদের সঙ্গে যাবার জন্য সে ব্যাকুল হয়েছিল তারা একদিন বিনা দোষে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ যখন তাদের সঙ্গে ভিড়বার উপায় নেই, নিজেই সে আধকার নষ্ট করেছে, তখন আবার তার কাছে ডাক এল ! পাঁচু জানে না, এমনই হয়েছে চিরকাল, যখন যা চেয়েছে পাকা, এমনিভাবেই সব গোলমাল হয়ে গেছে। কোনদিকে কাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল পাকা, আজ ডাক এলেও যাদের সঙ্গে ভিড়তে পারছে না, সে সব কিছু লেখেনি। পাঁচুর বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

বিষয়টা কী ? ধনদাস প্রশ্ন করে।

আবোল-তাবোল লিখেছে খেয়ালের কথা।—নিজের মাথায় আঙুলের টোকা দিয়ে পাঁচু বলে, মাথাটা এখনও ঠিক হয়নি।

অ !

ধনদাসকে বুঝিয়ে এড়াবার জন্য শুধু নয়, পাঁচুর সত্যই ধারণা হয়েছে যে পাকার মাথা বিগড়ে গেছে। সে পাকাকে জানে, ভালোবাসে, তাই তার এলোমেলো ভাসাভাসা চিঠিখানার মধ্যে বেদনা ও হতাশার গভীরতা সে ধরতে পাবে। আত্মহত্যার উল্লেখটা তাকে দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে শুয়েও অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই দুশ্চিন্তা নেড়েচেড়ে জেগে থাকে। একবার ভাবে, এ

অসম্ভব, সে মিছে ভাবছে, পাকার পক্ষে আত্মহত্যার কথা মনে আনাও সম্ভব নয়। আবার ভাবে, পাকার পক্ষে অসম্ভব কিছু আছে কি ?

মাথা ঠিক থাকলে, বিবেচনার শক্তি থাকলে, একটা ব্যাপারকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে এত বড়ো করে তুলতে কি পারত পাকা, এমন কিছু সৃষ্টি ছাড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার যা নয় ? সারা জীবন তছনছ হতেই হবে, উদ্দেশ্য আদর্শ কাজকর্ম সব পন্ড হয়ে যাবেই যাবে, আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভাবতে হবে ! এমন ভয়ংকর যদি এ ফাঁদটা, একবার পা দিলে জীবনে আর সামলে নেবার সাধ্য থাকে না, সংসারে তবে ব্যাটাছেলের তো বাঁচাই কঠিন !

তারা কি ফচকে ফাজিল ছোঁড়া, শুধু বজ্জাতি করে বেড়ায়, অসামাজিক ঘটনাচক্র তৈরি করার ফিকির ছাড়া জীবনে আর কিছুই নেই তাদের যে ওরকম কিছু ঘটলে চিরদিনের জন্য পাপী অভিশপ্ত হয়ে যাবে ? পাকা কি তার নতুন মামিকে তৈরি করেছে, না ঘটনাগুলি সৃষ্টি করেছে ? তাছাড়া, সে-ই যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে রসাতলে পাঠাল, এত বাড়াবাড়ি কেন পাকার !

ভালোবাসা ? এই যদি ভালোবাসা হয়, এত কষ্টকর আর এমন সর্বনাশা ভালোবাসা মাথায় থাক পাঁচুর। জগতের কোটি কোটি পুরুষ মেয়ের সাধারণ ভাবে সাধারণ পিরিত হলেই তার যথেষ্ট হবে। কোনো মেয়েছেলের জন্য কোনো ব্যাটাছেলে আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শ-পরিকল্পনা কাজকর্ম সব চুলোয় দিয়ে গুমরে গুমরে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবে, ভাবতেও পাঁচুর গা ঘিনঘিন করে।

দুদিন ক্রমাগত বর্ষণের পর সকালের দিকে আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আসে। বিকালে আর এক দফা শুরু হয়ে রোদ ওঠে পরদিন। গ্রামের চিরকেলে জোড়াতালি দেওয়া শ্রীহীন বঞ্চিত জীবন বর্ষাকালে পাশবিক কদর্য হয়ে ওঠে। বহুযুগ পিছনের পুরনো পচা সভ্যতা-ভব্যতার একটু যে আবরণ থাকে অন্য সময়, পশুর জীবন থেকে যা খানিকটা তফাত করে রাখে মানুষের জীবনকে, বর্ষায় যেন তাও ধুয়ে মুছে যায়। মনে করাও কঠিন হয়ে পড়ে যে এই মাটির পৃথিবীতে মানুষ স্থানে স্থানে শহর বানিয়েছে, কলকারখানা চালিয়েছে, শক্ত স্থায়ী পথে পথে যানবাহনের চাকা ঘুরিয়েছে, বৃষ্টিতে ইট পাথরের শুকনো আশ্রয় বানিয়েছে, দোকানে খাদ্য বস্ত্র আরাম সাজিয়ে রেখেছে স্তরে স্তরে, মানুষ আর বুনো নেই, সভ্য হয়েছে।

শ্যামল হাসে। ওয়াড়হীন তেলচিটে বালিশে ভর দিয়ে মাটির দেওয়ালে বসানো জানলার কাঠের গরাদের ফাঁকে সে বাইরের থইথই জল দেখছিল, একটা মরা বাছুর ভেসে এসে জানলার নীচেই বকুল চারার ডালে ঠেকে আছে। গরাদের আলকাতরা উঠে গেছে বহুকাল, পোকায় খেয়ে কাঠ জীর্ণ করে ফেলেছে। এবার শ্যামলের ঘরে জল পড়বে না আশা করা গিয়াছিল। প্রথম দিকে জল পড়েনি, তারপর টিপটাপ টুপটাপ ফোঁটা পড়তে শুরু হয়েছে, চৌকি পাতার জায়গা মেলেনি। হোগলা এনে তার চৌকির ওপর টাঙিয়ে ঢাকতে হচ্ছে। বর্ষা শ্যামলের সয় না, অল্প অল্প জ্বর হয়েছে। নিরুপায় হয়েই সে দু-একমাস শহরে গিয়ে থাকতে রাজি হয়েছে। বর্ষণ স্থগিত হলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রতিহিংসাও বৃষ্টি ধরবার অপেক্ষায় ছিল।

কত ভেবে কী ভাবে ছকে নিয়ে প্রতি-আঘাতের ষড়যন্ত্র ও আয়োজন হয়েছিল প্রথমে ধরাও গেল না, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হল। বিপিন ঘোষের বাড়ি ডাকাতি হল, শোনা গেল নগদে গয়নায় বেশ কিছু গেছে। বিপিন অবস্থাপন্ন লোক। কারও বাড়িতে ডাকাত পড়া আশ্চর্য নয়, গাঁয়ের লোক আশ্চর্য হয়ে গেল এই জন্য যে ডাকাত পড়ার হইচইটা তেমন ভাবে তারা টের পেল না। ডাকাতি হলে রাতারাতিই সমস্ত গ্রাম টের পায়, হুলস্থূল হয়, ডাকাতির সময়েই অথবা ডাকাতরা চলে গেল। গ্রাম

দূরে থাক, পাড়ায় সব লোকে ভোরের আগে জানতে পারেনি রাত্রে পাড়ায় একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, অনেকে শুধু একটা গন্ডগোল টের পেয়েছিল।

জল্পনা কল্পনা বিস্ময় প্রকাশের সুযোগও ভালোরকম পেল না আটুলিগাঁর অধিবাসীরা। এগারোটা নাগাদ সদর থেকে পুলিশ এসে গাঁ ছেয়ে ফেলল। তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল চারিদিকে।

একটা ডাকাতি নিয়ে সরকারের এত মাথাব্যথা হয়, পুলিশের এমন তৎপরতা দেখা যায়, আটুলিগাঁর জানা ছিল না। চিরদিন গাঁয়ের লোকেরাই দল বেঁধে পারলে ডাকাতি ঠেকায় না, না পারলে ডাকাতরা লুটেপুটে সরে পড়ে। ধীরে সুস্থে মন্থরগতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি তদন্ত ও প্রতিবিধানের মোটামুটি প্রহসন চলে। লোকবিশেষ ও অবস্থাবিশেষে কিছু ব্যতিক্রম হয়, এইমাত্র। বিপিন এমন কী বিশেষ লোক, স্বদেশি ডাকাতির মতো এমন কী বিশেষ অবস্থা যে সরকারের এত বেশি টনক নড়ল !

আটুলিগাঁর সাধারণ মানুষ বোকা হাবা নয়, এক দুপুরের ঘটনার গতি আর ঘটনাগুলি ঘটাবার কাজে উৎসাহী মানুষগুলির যোগাযোগ দেখে ব্যাপারটা তারা বিকালবেলাই মোটামুটি আঁচ করে নেয়। মধু ভটচাজ, তারিণী পাঁজা প্রভৃতি অনেকেই নাকি জানে, কারা ডাকাতি করেছে। তারা আটুলিগাঁয়েরই একদল কিশোর ও জোয়ান ছেলে এবং দু-চারজন বয়স্ক লোক। এগারোটা নাগাদ পুলিশ আসে, বারোটা নাগাদ গণেশ আর ধনদাসের বাড়ি খানাতল্লাশ আরম্ভ হয়, তারপর চাষিপাড়ার আরও অনেক বাড়ি। প্রথমেই গ্রেপ্তার হয়েছে গণেশ আর ধনদাস। জ্ঞানদাস আর পাঁচুকে পাওয়া যায়নি।

গণেশের বাড়িতে সাতজন ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা অবশ্য ছেলেমানুষ। এক দুপুরে একুশটি ঘর লন্ডভন্ড করে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষকে লাঠির গুঁতো মেরে ডাকাত খোঁজা হয়েছে। হাতকড়া পড়েছে একুশজনের হাতে। খাজনা বন্ধের বদনামি আটুলিগাঁর চাষিপাড়া ! এত বছর পরেও পোড়াভিটের কলঙ্কচিহ্ন আঁকা আটুলিগাঁ !

নলিনী তদন্তের ভার নিয়ে এসেছে।

পুলিশ এসেছে শুনেই পাঁচুকে একরকম বগলদাবা করে জ্ঞানদাস খিড়কি পথে ডোবার ধারের বাঁশবন দিয়ে সরে পড়েছিল। কর্কশ থাবা, মোটা মোটা আঙুল, তাই দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে পাঁচুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, পাঁচুর কোনো কথা কানে তোলেনি।

শেষে মুক্ত হাতে একটা পলাশগাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে পাঁচু প্রতিরোধ করায় সে থেমেছিল, মুঠি শিথিল করেছিল।

বুঝিস নে কেন বোকা হাঁদা, হট্টগোলের মধ্যে পেলে তোকে যে মেরেই সাবাড় করবে। তুই তো আসল আসামী।

কীসের আসামী ?

পাঁচু তখনও ব্যাপার বোঝেনি। একুশ সালের গাঁ-জ্বালানোর অভিজ্ঞতা জ্ঞানদাসের, তারপর থেকে এতগুলি বছর অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা সে চট করে যা আন্দাজ করে ফেলেছে পাঁচুর তা বোঝার ক্ষমতা নেই।

হেমবাবুকে মেরেছিলি। এটা তার উশুল শুরু বুঝিস নে তুই ? এ জন্য বলছিলাম অত বাহাদুরি করিস নে পাঁচু, করিস নে। খুদ্দুর প্রাণী তুই, বল বুঝে না কাজ করলে খতম হয়ে যাবি। সাধ করে খতম হতে তোর ব্যগ্রতা কেন রে হারামজাদা, কীসের শখ অত ?

তবু পাঁচু মুখ গোমড়া করে থাকে, চারিদিকের জঙ্গলের মতো।

উদিকে দুকলিকে বুঝি লোপাট করলে এতক্ষণে !—জ্ঞানদাস ধিক্কার দিয়ে বলেছিল।

তখন গা ঝাড়া দিয়েছিল পাঁচু, জ্ঞানদাসের সঙ্গে প্রায় উড়ে গিয়েছিল গণেশের বাড়ির পিছনের শুকনো মরা পাটখেতে। গণেশের হাতে তখন হাতকড়া পড়েছে, তার বাড়িতে প্রলয় চলছে। পাঁচুকে পাটের আড়ালে দাবিয়ে রেখে জ্ঞানদাস একা গিয়েছিল। দুকলির জন্য জ্ঞানদাসকে বাহাদুরি করতে হয়নি। বাড়ির পিছনে ডাঁটা-শাকের খেতে মাকে সঙ্গে নিয়ে দুকলি দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির সামনে পুলিশ এলেই গাঁয়ের মেয়েরা খিড়কি দিয়ে পিছিয়ে যায়। যাতে দরকার হলেই পুকুর ডোবায় নেমে জলের নীচে ডুবে আত্মগোপন করা চলে। দেশে যখন বর্গিরা আসত তখন থেকে বাংলাদেশের মেয়েরা এটা অভ্যাস করেছে।

জ্ঞানদাস বলে, দুকলি, মোর সাথে আয়।

দুকলি বলে, মা ?

মার ডর নেই, তুই আয়।

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান রচনাসমগ্রের অন্তর্গত গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের মূলপাঠে, শিরোনামসহ সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির চবিত্রনামের ক্ষেত্রে আদি বানানের বূপান্তর ঘটানো হয়নি। কেবল গ্রন্থপরিচয় অংশের আলোচনাকালে, গ্রন্থসমূহ এবং অন্তর্গত রচনাবলির শিরোনাম, প্রথম প্রকাশকালে যেমন ছিল, তেমনিই বক্ষা করা হয়েছে।

মূলে কোনো চরিত্রের লিখিত জবানিতে (যেমন 'চিন্তামণি' উপন্যাসে চিন্তামণি-র দিদির লেখা পত্রাদির ক্ষেত্রে) লেখকের স্বেচ্ছাকৃত ভাষা-ত্রুটি বা বর্ণাশুদ্ধি থাকলে তারও কোনো সংস্কার করা হয়নি।

লেখকের একাধিক গ্রন্থে সংলাপের জন্য উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহারে অভিন্ন রীতি লক্ষিত হয় না। এমন কী স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপিতেও সংলাপে উদ্ধৃতিচিহ্ন কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও হয়নি। মানিক রচনাসমগ্রে এই ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন রীতি রক্ষার প্রয়োজনে সংলাপে কোনো উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি।

আদায়ের ইতিহাস

'আদাযেব ইতিহাস' মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের উপন্যাস-তালিকায ষোড়শ গ্রন্থ। মুদ্রিত গ্রন্থতালিকায় আদাযের ইতিহাসের অবস্থান অষ্টাবিংশতিতম। উপন্যাসটিব নির্ভুল প্রকাশ তারিখ পাওযা যায না। অনুমান ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত, প্রকাশক এস সি সবকার অ্যান্ড সন্স লি. কলকাতা; পৃ ২ + ৮২, মূল্য দেড় টাকা। সম্ভবত গ্রন্থটি দীর্ঘকাল অমুদ্রিত ছিল। ১৩৬৮ (১৯৬১ খ্রি) বঙ্গাব্দে বিভূতি প্রকাশন কলকাতা কর্তৃক এব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয। মূল্য এক টাকা পঁচাত্তর নযা পযসা। প্রথম সংস্করণে প্রচ্ছদশিল্পীব নাম অনুল্লেখিত ছিল, দ্বিতীয় সংস্কবণের প্রচ্ছদশিল্পী কানাই পাল। মানিক রচনাসমগ্রে প্রথম সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে।

কলকাতাস্থিত গ্রন্থপ্রকাশ সংস্থা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনতিদীর্ঘ কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি উপন্যাস' নামে একটি উপন্যাস সংকলন প্রকাশ করেন। তাতে 'ধরাবাঁধা জীবন' (মানিক রচনাসমগ্র ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত), 'প্রতিবিম্ব' (মানিক রচনাসমগ্র ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত), 'চিন্তামণি' (মানিক রচনাসমগ্র ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত) উপন্যাস তিনটির সঙ্গে 'আদায়ের ইতিহাস' উপন্যাসটিও ছিল।

উপন্যাসাকারে প্রকাশের পূর্বে মতিলাল রায় সম্পাদিত 'প্রবর্তক' পত্রিকার ২৬শ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যায় অসম্পূর্ণভাবে পাঁচ কিস্তিতে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিস্তিগুলি যথাক্রমে ১৩৪৮ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই পাঁচ মাসে প্রকাশিত হয়। তারপর যে কোনো কারণেই হোক 'আদায়ের ইতিহাস' প্রকাশ বন্ধ থাকে। ২৮শ বর্ষের অর্থাৎ ১৩৫০ সালের বৈশাখ থেকে উপন্যাসটি আবার গোড়া থেকে প্রকাশিত হতে শুবু করে। প্রবর্তক বৈশাখ ১৩৫০ সংখ্যায় আদায়ের ইতিহাসের এই পুনঃসূচনাকালে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল এইবূপ :

> "১৩৪৮ সনে প্রবর্তকে আদায়ের ইতিহাস আরম্ভ মাত্রই হইয়াছিল, কিন্তু লেখকের সদিচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কতকগুলি অপরিহার্য কারণে উহা এতদিন অনাদায়ই রহিয়া গিয়াছে। এ জন্য প্রবর্তক পাঠক-পাঠিকার যে অসুবিধা হয়, তাহাতে মানিকবাবু এবং আমরা আন্তরিক দুঃখিত। উপন্যাসখানির রসসৃষ্টি বিঘ্নিত না হয় ইহা বিবেচনায় 'আদায়ের ইতিহাস' পুনরায় গোড়া হইতেই শুবু করা হইল।"

১৩৫০ বৈশাখ থেকে আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন এবং ১৩৫১-এর বৈশাখ এই দশ সংখ্যায় সমগ্র উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির এক-একটি পৃষ্ঠায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনো গল্পেব প্লট বা সংকেতসূত্র হিসাবে কিছু কিছু মন্তব্য টীকা পাওয়া যায়। তারই অন্তর্গত একটি অনুচ্ছেদে 'আদায়ের ইতিহাস' শব্দের পাশে কিছু প্লটের হদিস আছে। কিন্তু অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন ''আদাযেব ইতিহাস' (১৯৪৭) নামে লেখকের একটি ছোট উপন্যাসেব সঙ্গে উল্লিখিত প্লটের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই'।

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায, পৃ ৩৩৯ ৪০)

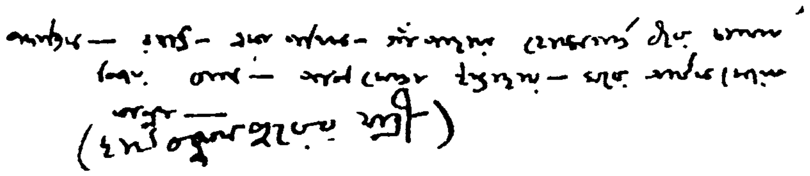

প্রবর্তকে প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত পাঠেব সামান্য হেরফেব লক্ষিত হয়। যথা, উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়েব প্রথম অনুচ্ছেদ, পত্রিকাব পাঠে ·

> ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিষ্টুপেব দিন কাটিতে লাগিল। জীবনটা মনে হইতে লাগিল একঘেয়ে। একটি দিনকে অবিকল আব একটি দিনেব মতো মনে কবা নয়, কতকগুলি দিনেব সমষ্টিগত পবিবর্তনহীনতা সম্বন্ধে সচেতন হওযা। একান্ত একঘেযে জীবন যাব, নিছক পুনবাবৃত্তি মাত্র, তাব কাছেও ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেকটি দিন এক বকম হয না। কালেব ঘুম ভাঙ্গা আব আজেব ঘুম ভাঙ্গা কাবও এক নয, এক নয কালেব ভোঁতা আনন্দ আব বিষাদ আজ আবাব অনুভব কবা। মানুষ হিসাবে না ধবুক, খুঁটিনাটি বৈচিত্র্য প্রতিদিনই আসে অজস্র। একটি পিঁপড়ে যে আজ আমাব পা বাহিযা উঠিতেছে, সে কি নূতন কিছু নয ? কাল তো পিঁপড়ে ছিল না।
>
> (প্রবর্তক, শ্রাবণ ১৩৫০, পৃ ১৮৯)

উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে এই অংশ বর্জিত হয়েছে। এতদ্‌ভিন্ন পত্রিকাব পাঠ ও গ্রন্থাকাবে মুদ্রিত উপন্যাসের পাঠে প্রভার স্বামীব নাম একবার মিহির আর একবার ভ্রমক্রমে বমেশ বলে উল্লিখিত হযেছে। শেষোক্ত নামের সর্বাধিক উল্লেখের কাবণে বচনাসমগ্রের পাঠে সেইটিকেই বহাল রাখা হয়েছে।

পত্রিকা ও গ্রন্থের পাঠে আরও কিছু অসংগতি বা অস্পষ্টতা লক্ষিত হওয়ায সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধিত বা নিরাকৃত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদেব অংশ বিশেষকে ঘটনার স্বাভাবিক পবিণামের বিবেচনায় বিভক্ত কবে যষ্ঠ পরিচ্ছেদরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

খতিয়ান

'খতিয়ান' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাদশ সংখ্যক গল্পসংকলন ও উনত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। এর প্রকাশকাল ১৩৫৪, প্রকাশক ভারতী ভবন, কলকাতা, পৃ ২ + ১৪৯, মূল্য আড়াই টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী সূর্য রায়।

প্রথম সংস্করণের মোট গল্পসংখ্যা ছিল দশ ; গল্পগুলির শিরোনাম যথাক্রমে : খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, গুণ্ডামী, কানাই তাঁতী, চোরাই, চালক, টিচার, ছিনিয়ে খায়নি কেন, একান্নবর্তী।

লেখকের জীবদ্দশায় বা পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থটির সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডের জন্য প্রথম সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির যে কযটিব পত্রপত্রিকাব প্রকাশসূত্র পাওয়া গেছে, কালানুক্রমিকভাবে তা নিম্নরূপ :

চালক	দেশ	শাবদ ১৩৫৩
একান্নবর্তী	যুগান্তব	শাবদ ১৩৫৩
টিচাব	বসুমতী	শাবদ ১৩৫৩
চকান্ত	কথাশিল্প (গল্পসংকলন) সম্পাদনা বাধাবানী দেবী ও নবেন্দ্র দেব	আশ্বিন ১৩৫৩
চোবাই	গল্পভাবতী	শীতেব অর্ঘ্য ১৩৫৩
গুণ্ডামী	নতুন লেখা (গল্পসংকলন) ১ম খণ্ড সম্পাদনা সাধনাকান্ত চৌধুবী	ডিসেম্বব ১৯৪৬
ছিনিয়ে খায নি কেন	পূর্ণিমা	?
ছাঁটাই বহস্য	রূপান্তব	?

'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায' গ্রন্থে ১৯৪৫ ডাযেবি অংশে বিচ্ছিন্ন কিছু প্লটেব উল্লেখ থেকে 'ছিনিযে খায নি কেন ?' গল্পটিব প্রাবম্ভিক খসড়া এইরূপ

প্লট দুর্ভিক্ষপীড়িতেবা লুটে খায়নি কেন ?—তাবা অহিংস একথা ভুল—না খেয়ে দুর্বল ভোঁতা হযে পড়েছিল - যে তেজ লুট কবাব প্রেবণা দেয় তা ছিল না—

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায, পৃ ৮৩)

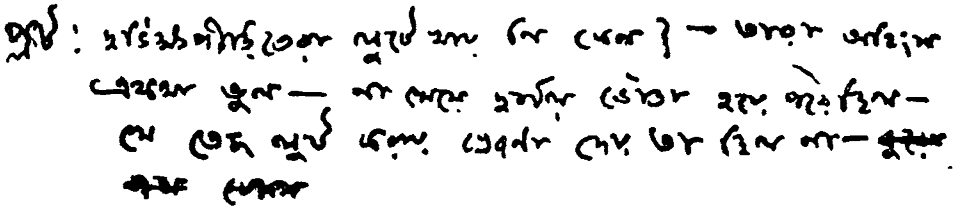
প্লট: দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা লুটে খায় নি কেন? — তারা অহিংস একথা ভুল — না খেয়ে দুর্বল ভোঁতা হয়ে পড়েছিল — যে তেজ লুট করার প্রেরণা দেয় তা ছিল না —

'পূর্ণিমা' নামক কোনো সামযিক পত্রে গল্পটিব প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য লেখকেব নিজস্ব নোট থেকেই জানা যায়। সেখানে গল্পটিব জন্য পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা প্রাপ্তিবও উল্লেখ আছে।

'ছাঁটাই বহস্য' গল্পেব প্রাক্‌রূপও ডায়েবিতে পাওয়া যায।

ছাঁটাই কোম্পানীব মালিকেব যুদ্ধেব জন্য বেশি লোক নেবাব সমযেই ঠিক কবেছিল প্রত্যেককে পার্মানেন্ট বলে কম মাইনেতে নেবে—যুদ্ধেব পব কোন ছুতো দেখিয়ে একে দুযে ববখাস্ত কববে নিজেব বেলায এটা ঘটায শৈলেন প্রথমটা বুঝতে পাবে নি—পবপব কযেকজনেব বেলা এটা ঘটায বুঝতে পাবল—সকলে মিলে প্রতিবাদ

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায, পৃ ৮৩)

'চক্রান্ত' গল্পের প্লট সংকেত

তবুও—চাকবী কবা মেযে—বেকাব প্রেমিক ধবে ফিবল—পুরুষ যদি উপার্জনহীনা মেয়েকে বিয়ে কবে সংসাব কবতে পাবে সুখে, মেয়েবা কেন বেকাব পুরুষকে বিয়ে কবে সংসাবী হতে পাববে না ?—ছেলেটি বাজী—কিন্তু একদিন আঁতুড়েব সংস্পর্শে এসে বিগড়ে গেল—পালিয়ে গেল—

'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায' গ্রন্থেব সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "মার্জিনে লেখা লেখকের নিজস্ব 'নোট' থেকে জানা যায়, আলোচ্য প্লটটিব পবিণত রূপ 'চক্রান্ত' নামক গল্প। বর্তমান খসড়ার সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির সাদৃশ্য সামান্য—প্রায় মেলানোই যায় না।"

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায, পৃ ৩৬৫)

এই গল্পটির জন্যও ৫০ টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্তির উল্লেখ আছে ডায়েরিতে। 'চক্রান্ত' গল্পটিতে কিছু নতুন বাক্য-যোজনার ইচ্ছা ছিল লেখকের। ডায়েরিতে আছে :

পুস্তকে দেবার সময় গল্পের যেখানে প্রতিমা আপিস থেকে বাড়ি ফিরছিল সেখানে এই লাইন যাবে .

"ফিরবার সময় প্রতিমার বাস বুভুক্ষু শ্রমিকের এক গতিশীল সুদীর্ঘ মিছিল অতিক্রম করে যায়—ধর্মঘটী শ্রমিকের মিছিল। বড় বড় পোস্টারে ওদের দাবী লেখা। বাঁচবার জন্য একটু বেশী মজুরি মাগ্‌গী ভাতা চায়, ঠিকমত রেশন চায়, অন্যায় ছাঁটাই বন্ধ করতে চায়।"

গল্পের শেষে আহ্লাদীর সঙ্গে কথা বলার সময় এ রকম লাইন যাবে : "প্রতিমা ভাবে, মজুরদের ওই মিছিলে কি আহ্লাদীর স্বামী ছিল ?"

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮৭)

যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "গল্পটি 'খতিয়ান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার সময় বর্তমান অংশ দুটি শেষ পর্যন্ত সংযোজিত হয়নি।" (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩৬৬)

'চালক' গল্পটি (শারদীয় 'দেশ'-এ প্রকাশিত) সম্পর্কে ডায়েরির উল্লিখিত প্লট-সূত্র নিম্নরূপ :

"মধ্যবিত্ত ছেলে—দেড়শো টাকার চাকরী—গতিশীল যন্ত্রকে ভালবাসে—মোটর চালানো শিখে ক্লিনার থেকে ড্রাইভারি— দোতালা বাস চালানোর আনন্দ....."

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮৭)

'চালক' গল্পটির কিছু সংস্কার করে লেখক 'ছোট বড়' নামক গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ Why Didn't They Snatch and Eat থেমা প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের Selected Stories (১৯৮৮) সংকলনে স্থান পেয়েছে, অনুবাদ মালিনী ভট্টাচার্যের।

কথাশিল্প গল্পসংকলনে ব্যবহৃত শিরোনামচিত্র

ছোট বড়ো

'ছোট বড়' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশ সংখ্যক গল্পসংকলন ও ত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৪৮ (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), প্রকাশক পূরবী পাবলিশার্স, কলকাতা ; পৃ ৬ + ১৫৩, মূল্য আড়াই টাকা ; প্রচ্ছদশিল্পী মণীন্দ্র মিত্র।

মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে প্রথম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। সংকলন গ্রন্থটির পরবর্তী কোনো সংস্করণ বা মুদ্রণের তথ্য পাওয়া যায় না।

এই গল্পসংকলনের গল্পসংখ্যা চোদ্দ, শিরোনাম যথাক্রমে : ভালবাসা, তথাকথিত, চালক, ছেলেমানুষি, স্থানে ও স্তানে, ষ্টেশন রোড, পেরাণটা, দীঘি, হারাণের নাতজামাই, ধান, সাথী, গায়েন, নব আলপনা এবং ব্রিজ।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গ্রন্থভুক্ত যে গল্পগুলির ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকার প্রকাশসূত্র পাওয়া গেছে, কালানুক্রমে তা নিম্নরূপ :

চালক	দেশ	শারদ ১৩৫৩
হারাণের নাতজামাই	পূর্বাশা	মাঘ ১৩৫৩
স্থানে ও স্তানে	পূর্বাশা	ভাদ্র ১৩৫৪
ছেলেমানুষি	ভারত	শারদ ১৩৫৪
তথাকথিত	দেশ	শারদ ১৩৫৪
ধানের গোলার টান [ধান]	স্বরাজ	শাবদ ১৩৫৪
গায়েন	যুগান্তর	শারদ ১৩৫৪
পেরাণটা	পূর্বাশা	পৌষ ১৩৫৪
ব্রিজ	অগ্রণী (নব পর্যায়)	বৈশাখ ১৩৫৫
ষ্টেশন রোড	নতুন সাহিত্য প্রথম বার্ষিক সংকলন	১৩৫৫

লেখকের পূর্ববর্তী 'খতিয়ান' নামক গল্পসংকলনভুক্ত 'চালক' গল্পটি ঈষৎ সংস্কার-সংশোধন-পরিমার্জনসহ এই সংকলনেও গৃহীত হয়েছে। মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে গল্পটি খতিয়ান গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত করেই সংকলিত হয়েছে। তবে খতিয়ান সংকলনভুক্তি কালে লেখক ভাষাগত যে সব পবিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, সেগুলি নির্দেশিত হল :

চালক

খতিয়ান-অন্তর্গত	ছোটোবড়ো-অন্তর্গত
গাড়ির ঝাঁকানি, স্টিয়ারিংয়েব কাঁপুনি, ইঞ্জিনের গর্জন তার মধ্যে অপূর্ব আনন্দেব আলোড়ন তোলে, নারী-সঙ্গের জীবন্ত পুলকেব মতো যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে পৌরুষের সার্থকতা,	গাড়ির ঝাঁকানি, স্টিয়ারিংয়ের কাঁপুনি, ইঞ্জিনের গর্জন আর গুরুগম্ভীর ভারিক্কি গতি তার মধ্যে অপূর্ব আনন্দের আলোড়ন তোলে, সর্বাঙ্গ দিয়ে সে অনুভব করে, পৌরুষের সার্থকতা,
দাঁড়ানো গাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনটার একটানা দাপড়ানিতে,.. মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯২	স্টার্ট দিতে, গাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনটাব একটানা দাপরানিতে,..
নিজেও সে যে কয়েকবছর ধরে একতলা বাস চালিয়ে এসেছে কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, ও রকম একটা ভাঙা পুরানো নড়বড়ে বাস নিয়ে কে পাড়ি দিত শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা, তা যেন সে ভুলেই গেছে একেবারে। মন তাব চিরদিন ছিল দোতলা বাসের দিকে, এত দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার উসকানিতে দোতলা বাস হাঁকাবার স্বপ্নই সে দেখে এসেছে বরাবর। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯২	নিজেও সে যে কয়েকবছর ধরে একতলা বাস চালিয়ে এসেছে কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, তা যেন সে ভুলেই গেছে একেবারে। মন তার চিবদিন ছিল দোতলা বাসের দিকে, স্বপ্নসফল হওয়ামাত্র একতলা বাসের দিনগুলি তুচ্ছ নগণ্য হয়ে গেছে তার কাছে।
সিনেমার স্টপে অনেক হবু প্যাসেঞ্জার...	সিনেমা সামনের স্টপে অনেক হবু প্যাসেঞ্জার..
এখানেই গাড়ি প্রায় ভরে যাবে তার, ট্রিপটার প্রথমদিকে। সাবা ট্রিপটা চলবে বোঝাই গাড়ি...	সারা ট্রিপটা চলবে বোঝাই গাড়ি...
ছুটির দিন বলে, অফির-ফেরতারা নেই বলে, ভাবনার কিছু নেই।	ছুটির দিন হলেও প্যাসেঞ্জারের অভাব ঘটে না,
খানিক দূর থেকে সিনেমার সামনে...	তফাত থেকে সিনেমার সামনে...

মীনা ! খুকু ! বায়স্কোপ দেখতে এইছিস ? উঠে পড় ! উঠে পড় ! বিনা পয়সায় মজাসে বাস চড়বি ! মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯২	মীনা ! খুকু ! বায়স্কোপ দেখতে এইছিলি ? উড়ে পড় ! উঠে পড় !
বাড়িতেও যে চেষ্টা করার ফলাফলের কথা দোতলা বাস চালাতে শুরু করার পরেও সে ভুলতে পারেনি, নিজেকে অপমান করতে চায়নি। সত্যি কথা বলতে কী, অজিত স্বীকার করে নিজের কাছে, ওদের কাছে সে ছোটোলোক। ভাবনার মধ্যেই মাঝবয়সি হাবা ভদ্রলোকটাকে ব্রেক-কষা স্টিয়ারিং ঘোরানোর কৌশলে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়। সে ভেবেছিল তাকে এমন একটা বিরাট বাস চালাতে দেখে অবজ্ঞা করার বদলে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে, সম্মান করবে তাকে। ভেবেছিল মানে আর কী, ওদের দেখে হঠাৎ-জাগা উল্লাসে কথাটা চিড় খেয়ে গিয়েছিল মনের ভিটেয়। যাকগে। মরুকগে। চুলোয় যাক। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৩	বাড়িতেও যে চেষ্টা করার কথা দোতলা বাস চালাতে শুরু করার পরেও সে ভাবতে পারেনি ? মাঝবয়সি হাবা ভদ্রলোকটিকে ব্রেক-কষা স্টিয়ারিং ঘোরানোর কৌশলে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়ে, সে ভেবেছিল তাকে এমন একটা বিরাট বাস চালাতে দেখে অবজ্ঞা করার বদলে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে, সম্মান করবে তাকে। চুলোয় যাক।
সে জন্য কিছু আসে যায় না। কাল দরকার হলে ইন্দ্রজিৎ তার হয়ে একটা বেশি ট্রিপ দেবে। এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে তারা কামড়া-কামড়ি করে না। ইন্দ্রজিৎ হাসিমুখে স্টিয়ারিং ছেড়ে পাশে সরে বসে। বাড়ির গলিটার মুখ পর্যন্ত বাস চালিয়ে নিয়ে গিয়ে অজিত নেমে পড়ে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৩	ইন্দ্রজিৎ পথেই গাড়িতে ওঠে বাড়ির গলিটাব মুখ পর্যন্ত বাস চালিয়ে নিয়ে অজিত নেমে যায়।
পয়সা গুনে নিয়ে হেসে বলে, ক-টা চাপা দিলে ? মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৩	পয়সা নিয়ে হেসে বলে, ক-টা চাপা দিলে আজ ?
বাড়ি পৌঁছতে যেন তার অনিচ্ছা আছে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৩	হাড়ভাঙা খাটুনির পরও বাড়ি পৌঁছতে যেন তার অনিচ্ছা।
টানাটানির সংসারে তামাক খেয়ে, গয়া বিষ্টুপুর মেশানো দুটাকা সের তামাক খেয়ে, মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৪	টানাটানির সংসারে তামাক খেয়ে, দুটাকা সের তামাক খেয়ে,
পৃথিবী চুলোয় গেলেও সেও তো জানা কথা। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৪	পৃথিবী চুলোয় গেলেও সেও তো জানা কথাই। কলকি সস্তা।
তার জন্য, অপদার্থ অপাংক্তেয় তারই জন্য, বড়ো প্রাণ কাঁদে বুড়ো বাপটার। তার কামনা.. মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৪	তার জন্য বড়ো প্রাণ কাঁদে বুড়ো বাপটার। তিনি চান...
তাই তার চেয়ে অনেক বেশি দেবার কথা স্থির করা থাকলেও... মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৪	তাই তার চেয়ে প্রত্যেকের অনেক বেশি দেওয়া উচিত হলেও...

ব্যাঙ্কে টাকা জমানোটা একটু কমালেই অনায়াসে দিতে পারে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৪	ব্যাঙ্কে জমানোটা একটু কমালেই দিতে পারে।
কিন্তু আজ যেন কেমন... মুখ হাত ধুয়ে চা-টা খেয়ে আয়। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৪	মুখ হাত ধুয়ে চা-টা খেয়ে আয়। আজ যেন কেমন.. ।
নয়তো কবে তোমায় ওরা ভিন্ন করে দিত। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৫	নইলে কবে তোমায় খেদিয়ে দিত।
কাল পয়লা না ? হ্যাঁ, কালকেই পয়লা। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৫	কাল পয়লা না ?
তোমার দুশোর ওপর আয় বেড়েছে শুনে থেকে ভাবছি এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৫	তোমার আয় বেড়েছে শুনে থেকে ভাবছি।
কী বলছ ? জিজ্ঞেস কবে অজিত, আপশোশের সুরে। ওমা ! ন্যাকা যেন। [illegible] গরম বাড়ে। কেন কী অপরাধ করেছি আমি ? ভেসে এসেছি নাকি ? লক্ষ্মী কাঁদে। ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে, বাইশ টাকার তাঁতের শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে, বাঁকা হয়ে বসে লক্ষ্মী কাঁদে। অজিত মনে মনে বিবেচনা কবে যে ফুলবিবির রেশনের সস্তা ছাপা শাড়ি পরে পরে খুলে খুলে তাকে ভুলাবাব চেষ্টাটা এর চেয়ে অনেক ভদ্র ছিল। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৬	কী বলছ ? জিজ্ঞেস করে অজিত, আপশোশের সুরে। বলছি গো, বলছি। মুখ হাত ধুয়ে এস না ? জামাকাপড় ছেড়ে
খোকা ঘুমিয়েছে। সারাদিন দুষ্টুমি কবে এইমাত্র ঘুমোলো। এত দুষ্টু হয়েছে কী বলব। খেটে খেটে মবলাম। তুমিও তাকাও না আমার দিকে। জামা কাপড় ছেড়ে .. মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৭	
তোমার নাকি দুশো টাকা মাইনে হয়েছে দোতলা বাসে ? মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৭	তোমার নাকি ভাসুরঠাকুরের সমান মাইনে হয়েছে ?
তার মাইনে নেই, কমিশন ব্যবস্থা। কিন্তু মাসকাবারি বাঁধা মাইনের হিসাব ছাড়া এরা বোঝে না। অজিত বলে, মাসে তিনশো-চারশো দাঁড়াবে সবসুদ্ধ। . মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৭	দাদাব মাইনের সমান দাঁড়াবে।
বউ যার রোজ কাঁদে যে এর চেয়ে একটা হিজড়ের সঙ্গে বিয়ে হলে— মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৭	বউ যার রোজ কাঁদে যে এর চেয়ে একটা হিজড়ের সঙ্গে বিয়ে হলে অন্তত কোর্টে গিয়ে নালিশ ফ্যাসাদ করে—
মুখ্যু হও আর যাই হও।... তিন-চারশো টাকা। ভাসুরঠাকুর আড়াইশো মাইনে পান, তাতেই দিদির এত গর্ব। তোমার চেয়ে বিশ বছরের বড়ো তো ভাসুরঠাকুর। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৯৭	মুখ্যু হও আর যাই হও।...

উল্লেখ্য যে 'নব আলপনা' এবং 'ব্রিজ' গল্পদ্বয় 'খতিয়ান'-এর অব্যবহিত পরবর্তী গল্পসংকলন 'মাটির মাশুল'-এর সূচিভুক্ত হয়েছিল। 'নব আলপনা' গল্পটির পুনঃপ্রকাশকালে লেখক যে সব সংস্কার ও পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, মাটির মাশুল আলোচনাপ্রসঙ্গে সেগুলি নির্দেশিত হয়েছে।

ছোট বড় গল্পসংকলনের সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণের অনুকূলে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

ছোট বড় সংকলনভুক্ত আরও কয়েকটি গল্পের পত্রিকা-প্রকাশিত পাঠ ও গ্রন্থপাঠের পার্থক্য সংকলিত হল।

তথাকথিত

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
যে বাঁচবে যে মরতে পারে, যে মরবেই—সবাই।	কাল যে মরবে—সবাই। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১২৩
যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করে	সযত্নে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১২৩
আর হয়তো ফিরে আসে না।	আব ফিরেই আসে না। মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ১২৩
মানুষটা একটু ভীরুও বটে মতি ডাক্তার।	মানুষটা একটু ভীরুও বটে সে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১২৪
[পত্রিকাপাঠে ছিল না]	হুকুমের মতো শোনায়। কিন্তু উপায় কী ? চাটুজ্যেরা বড়োলোক, তাদের প্রতিপত্তি আছে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১২৪
[পত্রিকাপাঠে ছিল না]	সবাই যদি এমনিভাবে ভোগে, কী করবে সে ত্র্যম্বককে ভালো করে তুলে ? মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১২৭
[পত্রিকাপাঠে ছিল না]	তার হাতযশ ত্র্যম্বককে পর্যন্ত ? মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১২৯

স্থানে ও স্থানে

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
দু একজন বিশ্বাস করে।	দু-একজন তাকে যারা ভালো করে চেনে। বিশ্বাস করে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৩৮
[পত্রিকাপাঠে ছিল না]	ঠিক ওখানে দুটি স্টেশনের মাঝামাঝি ওই নির্জন জায়গায়। গাড়ির গতি এ রকম কমে যাওয়ার কৈফিয়ত পরে দিতে হবে, এটুকু ভাবনাও নেই গাড়ি যারা চালায় তাদের। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৩৮
ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই ?	ব্যাটারা ট্রাম চালু রেখেছে চাদ্দিকে। নরহরির মনে হতে পারে না ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই ? মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৪০
আমরা তোমাকে ছেঁকে ধরব।	আমরা তোমাকে ছেঁকে ধরব। এ রাজনীতি নরহরি জানে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৪০

অমল আগাগোড়া চুপ করেছিল। সে একটু একটু প্রগতিমূলক ও রাজনীতি চর্চা করে বলে সে মুখ খুললেই	অমল আগাগোড়া চুপ করেছিল। সে মুখ খুললেই মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৪১

ষ্টেশন রোড

সেটাই কারণ ষ্টেশন ঘেষে ষ্টেশন রোডের এই নোংরা ঘিঞ্জি বাজারের সমৃদ্ধির।	স্টেশন ঘেঁষে স্টেশন রোডের এই নোংরা ঘিঞ্জি সমৃদ্ধির সেটাই আসল কাবণ। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৪৪
তাছাড়া আছে অসময়ের যাত্রী	তাছাড়া প্রতিদিনই থাকে কমবেশি একদল অসময়ের যাত্রী। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৪৪
সেই গানটা শোনা দিকি—ঢোকের সঙ্গে 'বাবুদের' কথাটা গিলে—এনাদের। পয়সা না পাই পুণ্যি আছে।	সেই গানটা শোনা দিকি। পয়সা না পাই পুণ্যি আছে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৪৫
ডাক্তারখানায় না থেকে আড়ালে চলে গিয়েছিল দরকারি ওষুধের মোটা স্টক	ডাক্তারখানার আলমারি থেকে আডালে চলে গিয়েছিল দরকাবি ওষুধের মোটা স্টক মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৪৬

পেরাণটা

একা নয়, দুই বিবির সাথে বসে মুর্গিব ঝোল দিয়ে ভাত খায় এন্তেআলি	একা মাংসভাত সাবাড় করে না, দুই বিবির সাথে বসেই মুর্গির ঝোল আর ভাত ভাগাভাগি করে খায় এন্তেআলি মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৫৩
[পত্রিকাপাঠে ছিল না]	মবণ মোর ! ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। মুর্গি মারার জন্যে যে এ গঞ্জনা সে তা বোঝে। ফুলবানু মুষড়ে গেছে। খেয়ে উঠে তামুক না পেয়ে মুষড়ে যায় এন্তেআলি। আবার সে তাই গঞ্জনা দেয়, একটুকু তামুক আনতে নারে, মুর্গি কেটে খায়। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৫৩
[পত্রিকাপাঠে ছিল না]	বড়ো বিবি কিছু বলে না। এন্তেআলির কথাটা সে ভাবছিল, মানুষটা সত্যিই কি তার সাথে শোবে আজ রাতে ? বড়ো বিবির বয়স গড়িয়ে যায়নি, মনে মেয়েমানুষের সাধ আহ্লাদ আছে, ফুলবাবু আসার পর এটা একরকম ভুলেই গেছে এন্তেআলি। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৫৪
যদিও পেট ভরেনি, ভাত ছিল কম।	যদিও টানাটানির ভাত কটা ভাগাভাগি করে খেয়ে মোটেই পেট ভরেনি। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৫৪
পাঁচীর পিসি বলেই বসে	তোরাফের পিসি মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলেই বসে মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৫৪
ভাতমাংস খেয়ে ফেলার খুতটা এত বড় করার কারণটা	সাধু শেখের জন্য রাঁধা ভাতমাংস খেয়ে ফেলার খুঁতটা এত বড়ো করে ধরার কারণটা মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৫৪

মোদের কথা মানবে না ? কটা দিন ডুব মেরে কাটিয়ে দিলে আর ভয়টা কি ? তবু গোড়ায় পেরাণটা কেমন করল।

মোদের কথা মানবে তো বটে, আজ না তো কাল ? না মানবে না ? তাই মন করলাম কটা দিন ডুব মেরে কাটিয়ে দিলে আর ভয়টা কী ?

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৫৫

হারাণের নাতজামাই

উর্ধ্বশ্বাসে একটানা ধানকাটার

পালা করে জেগে ঘাটির ঘরের পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার...

উধাও [হয়ে] যেত, অতি সহজে, অনায়াসে পায়ে খুঁ দিয়ে। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে কিছুতেই ধরাতে চায় না, হঠাৎ হানা দিয়ে পুলিশ কখনো তার পাত্তা পায় ? দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি।

উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটাব পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল।

পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার...

উধাও হয়ে যেত। গাঁ-সুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬১

বোঝা গেল আটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল। ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে...

খবর তবে গেছে তার পরে।

চোখ জ্বলে ওঠে অনেক চাষির।

জানা যাবে, সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল জানা যাবে। গোপন থাকবে না। দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালি।

খবর যাক, খবর পেয়ে আসুক, ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না

বোঝা গেল আটঘাট বাঁধাই ছিল। খবর পেয়ে এসেছে। ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে, খবর দিয়েছে কেউ। আজই বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে হঠাৎ, সন্ধ্যার পরে..

খবর তবে গেছে ভুবন হারানের ঘরে যাবার পরে।

চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের,

জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না। দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালি বলে, দেইখ্যা লমু কোন হালা পিপড়ার পাখা উঠছে। দেইখ্যা লমু।

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না...

চোখ কচলে উঠেই লাঠি সড়কি দা' কুড়ুল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে, সালিগঞ্জে দেখা দেয় সাঙ্ঘাতিক সম্ভাবনা।

শীতে আর ঘুমে অনশনপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬১

দেখা যায় কয়েকজন পুলিশ সশস্ত্র।

দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশি বন্দুক।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬১

হারাণ দাসের কোন বাড়ি ?

হারাণ দাসের কোন বাড়ি ?

তার পাশের বাড়ির হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গন্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পালটা প্রশ্ন করে আজ্ঞা কোন হারাণ দাসের কথা কন ?

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে এমন ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে

যে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোকা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয় একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে।

হারাণ বলে, হায় ভগবান।

এদিকে হারান বলে হায় ভগবান
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬১-১৬২

হাসির কথা নয়।

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, হাসির কথা না।
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬২

একটা কুপি জ্বালে

হারাণকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতেব আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে।
মেয়ের দিকে তাকিয়ে

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে। ময়নার মা হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে।
তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬২

প্রথম প্রৌঢ় বয়সেই তার বিধবার চুলছাঁটা মুখখানিতে দুঃখদুর্দশার ছাপে ও রেখায় কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে।

প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখদুর্দশার ছাপ ও রেখা কী রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতিপরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬২

ভুবন বলে, সারছে। দশ বিশটা খুনজখম হইব নির্ঘাৎ। আমি যাই সামলাই। র'ন র'ন ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কি হয়। আপনি তো আছেন।

ভুবন বলে, তবেই সারছে। দশবিশটা খুনজখম হইব নির্ঘাৎ। আমি যাই, সামলাই গিয়া।
থামেন আপনে, বসেন। ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কী হয়।
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬২

হাকিমের দস্তখতি পরোয়ানা নিয়ে...

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতি পরোয়ানা নিয়ে...

এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়।

হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বেআইনি কাজ হবে সেটা।
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬৩

আচ্ছা, আচ্ছা। মন্মথ বলে ভড়কে গিয়ে, ঘর তাল্লাসে তোমার আপত্তি নেই ? সদর দিয়া আইছে।

আচ্ছা আচ্ছা। মন্মথ বলে, ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিয়ো।
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬৩

সদর দিয়া আইছে।

সদর দিয়া আইছে ! তোমাগ একটা মাইয়ার সাতটা জামাই চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে !

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল হেঁকে
একটা কাটাছাটা ঠেকানো আংটাক আর্তশব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মতো।

গৌর আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে।
একটা আর্তশব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মতো।
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬৩

চাষি মেয়েটার অনাবৃত স্তনটি।
বি এ ফেল মন্মথর কাছে

চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা।
বি এ পাশ মন্মথের কাছে,
মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৬৩

মাটির মাশুল

'মাটির মাশুল' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রয়োদশ গল্পসংকলন এবং একত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই, লেখকের যে সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা আছে তাতে আশ্বিন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ তারিখটি পাওয়া যায়। তদনুযায়ী মাটির মাশুলের সম্ভাব্য প্রকাশকাল ১৯৪৮ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। প্রকাশক বিমলারঞ্জন প্রকাশন, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ + ১৬৩, মূল্য দুটাকা বারো আনা। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম অনুল্লেখিত।

প্রথম সংস্করণের মোট গল্পসংখ্যা ছিল পনেবো, গল্পগুলির শিরোনাম যথাক্রমে : মাটির মাশুল, ঘর ও ঘরামি, পারিবারিক, ট্রামে, ধর্ম, দেবতা, নব আলপনা, ব্রিজ, ভযঙ্কর (নাটিকা), আপদ, পথান্তর, সিদ্ধপুরুষ, হ্যাংলা, বাগ্দীপাড়া দিয়ে।

গ্রন্থসূচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকাস্বরূপ লিখেছিলেন :

"কয়েকটা গল্প কয়েক বছব আগে লেখা। অন্য গল্পগুলি, যেমন 'আপদ', 'বাগদীপাডা দিযে ' ইত্যাদি এই বছবেব মধ্যেই লেখা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
আশ্বিন, ১৩৫৫"

সম্ভবত লেখকের জীবৎকালে গ্রন্থটির নতুন কোনো সংস্কবণ হযনি। বলা বাহুল্য মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডের জন্য প্রথম সংস্করণের পাঠই গৃহীত হযেছে।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযাযী গ্রন্থভুক্ত ছটি গল্পের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশসূত্র কালানুক্রমিকভাবে নিম্নরূপ :

ভয়ঙ্কব (নাটিকা)	রূপমঞ্চ	শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১
সিদ্ধপুরুষ	বংমশাল	বৈশাখ ১৩৫৩
ব্রিজ	অগ্রণী (নবপর্যায়)	বৈশাখ ১৩৫৫
আপদ	চলন্তিকা	ভাদ্র ১৩৫৫
বাগদীপাড়া দিযে	চলন্তিকা	আশ্বিন ১৩৫৫
ধর্ম্ম	লেখন	প্রথম খণ্ড

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মাটির মাশুল গল্পটিরও পত্রিকায প্রকাশের একটি পূর্বসূত্র পাওয়া যায। মাসিক বসুমতী-র কয়েকটি সংখ্যায় লেখকেব 'মাটি' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়। যথাক্রমে ১৩৫৩-র অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুনে তার প্রথম তিনটি কিস্তি এবং ১৩৫৪-ব বৈশাখে চতুর্থ কিস্তি মুদ্রিত হয়েছিল। 'মাটির মাশুল' গল্পটি উক্ত 'মাটি' গল্পেরই সংহত রূপ। 'মাটির মাশুল' গল্পের দুটি ভাগ। মাসিক বসুমতী-র ১৩৫৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম কিস্তিটি হয়েছে 'মাটির মাশুল' গল্পের প্রথম ভাগ এবং পত্রিকার ১৩৫৩ ফাল্গুনে প্রকাশিত তৃতীয় কিস্তিটি 'মাটির মাশুল' গল্পের দ্বিতীয় ভাগ। মাসিক বসুমতীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ কিস্তি বর্তমান গল্পে পরিত্যক্ত হয়েছে। 'মাটি' গল্পটি সম্পূর্ণ আকারে মাসিক বসুমতী থেকে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে। 'মাটির মাশুলে' যে দুটি কিস্তি গৃহীত হয়েছে তাতে কিছু পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

'মাটির মাশুল' সংকলনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'ছোট বড়' গল্পসংকলনে (আগস্ট ১৯৪৮) 'নব আলপনা' এবং 'ব্রিজ' গল্পদুটি স্থান পেয়েছে। মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে 'ছোট বড়' সংকলনে সে দুটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'মাটির মাশুলে' আর অন্তর্নিবিষ্ট হয়নি। কিন্তু উক্ত সংকলনের প্রকাশকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

'ভয়ঙ্কর' নামে 'ভেজাল' সংকলনভুক্ত যে গল্পটি 'সম্প্রতি' নামক বার্ষিক ১৩৪৯-এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'মাটির মাশুল'-ভুক্ত 'ভয়ঙ্কর' সেই একই কাহিনি। কিন্তু পৃথক রীতিতে

রচিত। 'ভেজাল'-এর গল্পটি বিবৃতিমূলক রীতিতে রচিত, আর 'মাটির মাশুল'-এর গল্পটি নাট্যরূপাশ্রিত। নাট্যরূপে এটি প্রকাশিত হয় 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ এই শারদ সংকলনে। 'ভেজাল' গল্পে চরিত্র তিনটি : প্রসাদ আশা ও ভূষণ। নাট্য-কাহিনিতে প্রসাদ নামটি রক্ষিত, অন্যনাম হয়েছে দিগম্বরী ও বিশ্বম্ভর : প্রসাদের প্রেমিকা ফুলি ও ফুলির বাবা গজেন নতুন চরিত্র।

মানিক-সাহিত্যের পাঠক লক্ষ করেছেন, লেখক তাঁর কোনো কোনো গল্পকে একাধিক গল্প সংকলনে স্থান দিয়ে থাকেন। পুনর্ভুক্তিকালে সে গল্প কখনও অবিকৃতভাবে, কখনও অল্পাধিক সংস্কারে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাগদীপাড়া দিয়ে' গল্পটি 'মাটির মাশুল' ও পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' উভয় সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'আপদ' গল্পটিকে 'লাজুকলতা' ও 'মাটির মাশুল' উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মানিক রচনাসমগ্রে গৃহীত গল্পের ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর পরিবর্তন না থাকলে, প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

মাটির মাশুল গল্পের প্রাক্‌রূপ মাটি গল্পটি সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুগান্তর চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, "মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত কিস্তিবন্দি মাটি গল্পের সম্পূর্ণ প্রথম অনুচ্ছেদ এবং পরিবর্তিত রূপে বাকি কিছু অংশ 'ইতিকথার পরের কথা' (ভাদ্র ১৩৫৯) উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে।" (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬, পৃ ৩৬৬)। উক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী আরও জানা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৪৫ সালের ডায়েরিতে ১৯৪৭ সালের উল্লেখ করে 'মাটি' নামের লেখাটির (মাসিক বসুমতী-র পাঠ) প্রসঙ্গে একটি খসড়া আছে। খসড়াটিতে চরিত্রলিপি এবং কাহিনির সামান্য আভাসও আছে। (পৃ ৮৮) প্রাসঙ্গিক অংশ এরূপ :

মাটি
গাঁ সোনামাটি
ভূষণ — ৫টি স্ত্রীলোক একা পুরুষ — ছেলে ছোট
রসিক — ভূষণের বোনাই
তোরাব — বউ আসন্নপ্রসবা — চাল নেই —
ধবণী তরফদার : জোতদার . দীঘিপাড়ায় ভাগ্নে :
কানাই : চাকর : ছেলে
লোচন সরকার : কেরানি
রঘু
বিষ্ণু
পিনাক সামন্ত অকালবৃদ্ধি
কৈলাস — ঐ ছেলে : শ্বশুরের দুটি মাত্র মেয়ে
ইন্দ্র শাসমল : দীঘিপাড়াব জোতদার
আশু পট্টনায়ক : জোতদার
রাজেন দাস — একটু ভালো অবস্থার চাষী
কান্নু } উৎখাত চাষী
ফকির }
শ্রীনাথ মাইতি : আধিয়ার
মদন শাসমল : রামপুরের পাওনিদার : ভাইপো খুন :
রাখাল
তিনু
পুলিন জানা : নরম প্রকৃতি, ভীরু স্বার্থপর—
ফজলু মিঞা : জোতদার
[ডায়েরি ১৯৪৫]

এবার পাঠান্তর বা পাঠভেদ প্রসঙ্গ।

পত্রিকায় বা অন্যত্র প্রকাশিত গল্পের পাঠের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত পাঠের পরিবর্তন কোথাও কোথাও খুবই সাধারণ স্তরের, তাই সেগুলির উল্লেখ বাহুল্য। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তা বোঝা যাবে। যেমন 'ধর্ম' গল্পের কতিপয় পাঠসংস্কার নিম্নরূপ :

ধর্ম

তমসার বেশি।	তমসার বেশি হয়।
(অংশটি নেই)	তমসা বেশ ফরসাই
ভিতরে যেন সাপ আছে।	ভিতরে যেন সাপ আছে, ঝগড়া করছে সেই সাপ দুটি, তারা নয়।
	মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২২৮
ও পাশের ভাড়াটে নির্মল দস্তিদার।	ও পাশের বাড়িতে নির্মল দস্তিদার থাকে।
আপনি যদি মুখ্যুসুখ্যু হতেন দিদি।	আপনি যদি মুখ্যু হতেন দিদি।
	মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২২৯

(শুভেন্দু ঘোষ সম্পাদিত লেখন ১ম খণ্ডভুক্ত 'ধর্ম' গল্প)

নবপর্যায় 'অগ্রণী' বৈশাখ ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ব্রিজ' গল্পের পাঠ 'মাটির মাশুলে' যথাযথ গৃহীত হয়েছে। 'চলন্তিকা' ভাদ্র ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আপদ' গল্পের পাঠ প্রায় অপরিবর্তিত। 'রংমশাল' বৈশাখ ১৩৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সিদ্ধপুরুষ' গল্পের ঈষৎ পাঠান্তর এইরূপ :

সিদ্ধপুরুষ

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
নিখিলও বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতে আজ রওনা হয়েছে। এটুকু জানাই আমাদের যথেষ্ট।	বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতেই নিখিল আজ রওনা হয়েছে। আজকের দিনটা ওখানেই থাকবে।
	মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৫৮
তাদের ওখানে গিয়ে থাকবার জন্য বলেছিল, একসঙ্গে হই চই করে পুজোটা কাটবে।	তাদের ওখানে কীভাবে কাটে তার বিবরণ শুনিয়ে রেখেছে, নিখিলের আশা হয়েছিল এবার নতুন রকমের পুজোটা কাটবে।
	মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৫৮
নিখিল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল যাবার জন্য। কিন্তু মুস্কিল বাধল মা-বাপকে নিয়ে।	নিখিল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার এ উৎসাহে বাড়ির মানুষ গোড়ায় একেবারেই সায় দিতে চায়নি।
	মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৫৮

এই অংশটি মূলে ছিলই না :

পুরো আধঘণ্টা হেঁটেও কিন্তু হালিয়া পাওয়া যায় না।

চাপরাশি আবার বলে, ওই তো হালিয়া বাবু।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৫৯

পত্রিকার লেখাটিতে হালিয়া যাওয়া হয়েছে পুরোটা নৌকোয়। গল্পগ্রন্থে নৌকা এবং পদব্রজ দুয়েরই উল্লেখ আছে। আরও দু-চারটি শব্দ বা বাক্যের ক্ষেত্রে সংস্কার ঘটেছে।

'চলন্তিকা' আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাগদীপাড়া দিয়ে' গল্পের পত্রিকা পাঠ ও গল্পগ্রন্থ পাঠে সামান্য কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষিত হয় :

বাগদীপাড়া দিয়ে

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
বাগদীপাড়ার মেয়েমদ্দ কারো আর না খেটে রেহাই নেই।	বার্গদিপাড়াব সব মদ্দ পুরুষকে খাটতে হবে মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৭
গুড়মুড়ি দেয়নি। এত বেলায় এসে তাকে বসিয়ে রেখে নিজে আরামে নাইতে খেতে গেল। তা হবে বৈকি, বেলগাছের দেবতার মতই এরা নিষ্ঠুর।	গুড়মুড়ি দেয়নি। বেলগাছের দেবতার মতোই এরা নিষ্ঠুর। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৭
মাথায় ঝাঁকি দিয়ে দুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বলে...	[অংশটি নেই]
শ্রীমন্ত দারুণ আতঙ্কে বলে বসে	শ্রীমন্ত অত্যন্ত মিষ্টিগলায় বলে .
বলে,—একদল বদ-বেজাত যে বাগদীপাড নষ্টাৎ কবে দিচ্ছে—সেদিকে তুমরা গা করবে না ? কাবখানায় খাটতে যায় সব্বনেশেগুলে', ং .িসমাজ ছাবখাবে দিলে। কি বসে শুনবে ?	বলে, একদল বদবেজাত, যারা কারখানায় কাজ করতে যায় না ? বাগদিপাড়া ওরা নষ্টাৎ করে দিচ্ছে। কী বলে শুনবে ? মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৮
শ্রীমন্ত একটা আহ্লাসূচক আওয়াজ কবে বলে	শ্রীমন্ত ব্যঙ্গ করে বলে মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৯
প্রার্থনা জানায়—সজ্জাত যারা তাব শত্রু তারা ধ্বংস হয়ে যাক ; দেবতার রোষ পিতৃপুবুষের কোপ জমিদাব পুলিশের ক্রোধ হয়ে এসে তাদেব ধ্বংস করে দিক। মনে মনে দুলে অনেক কিছু মানত কবে।	প্রার্থনা জানায়। বলি মানত করে। মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৯
বহুকাল আগে বাগদীরা যখন রাজার হয়ে লড়াই কবত তখন রাজা-জমিদারের প্রজা লেঠেল-পুলিশ আর বেগারদারি. .	গোড়ায় বাজা-জমিদারের প্রজা-ঠেঙানো লেঠেল-পুলিশি আর বেগারদাবির. মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৯
পচাই-খাওয়া. মেয়েপুবুষে যথেচ্ছাচারী, ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু..	পচাই খাওয়া মেয়ে পুরুষকে, যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণের ছায়াভীরু. . মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৭০

এই পরিবর্তনে, বাগদিসমাজের যে গুণগুলি ছিল একান্ত তাদেরই নিজস্ব, তার একটিকে বাগদিদের কাছ থেকে তুলে এনে ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষণ করে দিয়েছেন। তাই এই পরিবর্তনটি মনোযোগ দাবি করে। দুলারী নামের বাগদি মেয়েটি কারখানায় খাটতে গিয়ে শরীর দিতে বাধ্য হয়েছে। এ কথা বলার পর গ্রন্থভুক্ত পাঠে আছে 'উথলে উঠেছে তার যৌবন'। পত্রিকার পাঠে বাক্যটি ছিল না। কোথাও কোথাও লেখক শব্দসংকোচনও ঘটিয়েছেন।

'ভয়ঙ্কর' নাটিকাটি 'রূপমঞ্চ' পত্রিকায় শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ সংখ্যায় যেমনভাবে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থে সেভাবেই গৃহীত হয়েছে। সামান্য দু-একটি সংলাপগত সংস্কার ছাড়া অন্য পরিবর্তন নেই বললেই হয়। তবে পত্রিকায় মঞ্চনির্দেশ ছিল না, মঞ্চ থেকে সকলে নিষ্ক্রান্ত হলে "কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টির বর্ষণ ও ভেকের ডাক শোনা যাবে" এইরূপ লেখা ছিল। গল্পগ্রন্থে মঞ্চনির্দেশ আছে—"বিস্তৃত পেনোর মাঠ। দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। প্রসাদ একা। ভয়ে ভাবনায় তার থমথমে চেহারা।" পত্রিকায় একস্থানে দৃশ্যান্তর লেখা, গল্পগ্রন্থে শব্দটি নেই, কেবল স্পেস নির্দেশ করা আছে।

Stories of Rural Bengal নামে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাংলা গল্পের একটি অনুবাদ সংকলনে (১৯৪৪) গৃহীত The Hutmaker's Romance গল্পটি মাটির মাশুল গ্রন্থের ঘর ও ঘরামি গল্পের অনুবাদ, অনুবাদক করালীকান্ত বিশ্বাস। সংকলনটির প্রকাশক পূর্বাশা প্রকাশন সংস্থা।

১৯৮৪ সালে 'বাগদীপাড়া দিয়ে' গল্পটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল ; প্রযোজক লাবণ্য চিত্রম, পরিচালক মিহির চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা কর্তৃক এ কাহিনির নাট্যরূপায়ণের সংবাদও পাওয়া গেছে।

'নব আলপনা' গল্পটি পূর্ববর্তী 'ছোট বড়' এবং 'মাটির মাশুল' দুটি গ্রন্থেই আছে, মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে 'ছোট বড়' গ্রন্থেই সেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে 'মাটির মাশুল' সংকলনে আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি। তবে লেখক মাটির মাশুল সংকলনভুক্ত করার সময় গল্পটির বহু সংশোধন-পরিমার্জন করেছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে পূববর্তী পাঠের সঙ্গে তার পাঠভেদগুলি নির্দেশিত হল :

নব আলপনা

ছোটোবড়ো - অন্তর্গত	মাটির মাশুল - অন্তর্গত
যা সময়মতো পরিমাণমতো খেলে হাড়মাস চর্বি... মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৫	যা ঠিক ঠিক সময়মতো ঠিক ঠিক পরিমাণমতো খেলে হাড়মাস চর্বি .
চলতে ফিরতে ললিতার সর্বাঙ্গে লাবণ্য দোল খায় আর সেই গর্বে ফেটে পড়া ওর চলনে মেয়ে মাত্রের গা জ্বলে। শ্রীমতীর মেজদাও নির্লজ্জের মতো ওকে নিয়ে আত্মহারা। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৫	চলতে ফিরতে ললিতার সর্বাঙ্গে লাবণ্য দোল খায় আর সেই গর্বে ফেটে পড়া ওর চলন কী ! মেজদাটা অমার্জিত গুন্ডা, ওকে নিয়েই আত্মহারা
হ্যাঁ, শ্রীমতীদের পাড়াতেও বস্তি আছে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৫	হ্যাঁ, শ্রীমতীদের পাড়াতেও বস্তি আছে, কলকাতা অদ্ভুত শহর।
ধূলোমাখা ছিবড়ের মলিন বস্তির দারিদ্র্যজাত রুক্ষতা সব নষ্ট করে দিয়েছে। শ্রীমতী ভাবে, লাবণ্য দিয়ে ও মেয়েটা করবে কী, কী কাজে লাগবে । মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৫	ধূলোমাখা ছিবড়ের মলিন রুক্ষতা সব নষ্ট করে দিয়েছে। শ্রীমতী এই ভাবে ভাবে, উপোসি বস্তির মেয়ের রূপলাবণ্য নষ্ট হবার দিক থেকে। অবশ্য এ জন্য তার আপশোশ কিছু নেই। লাবণ্য দিয়ে ও মেয়েটা করবে কী, কী কাজে লাগাবে ।
উলটে পালটে ভাঙে ও গড়ে ইতস্তত সঞ্চালিত হয়। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৫	উলটে পালটে ভাঙে গড়ে নড়েচড়ে।
উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে চশমাপরা বেঁটে বাবুটা কখন এসে দাম না শুধিয়েই থলে বাড়িয়ে বলবে, চার ঝুড়িই ঢেলে দে। আজ কত নিবি ? দু-চারআনা বেশি দিয়েই চলে যায়। লোকটা এক নম্বর বোকা আর একনম্বর বজ্জাত। চুণো জানে, বস্তির কোনো মেয়ের কাছেই এদের চালচলন অজানা থাকে না। মনটা তার ভিজিয়ে রাখছে, দরকারমতো ইশারা করবে। মনে মনে লোকটা ভাবছে সে কত যে ভালো ভাববে বাবুকে, গলে জল হয়ে থাকতে বঁড়শি ছাড়া আলগা টোপ গিলে গিলেই। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৫	মনটা উৎসুক হয়ে থাকে চশমাপরা বেঁটে বাবুটা কখন এসে দাম না শুধিয়েই থলে বাড়িয়ে বলবে, চার ঝুড়িই ঢেলে দে। কত ? দু-চারআনা বেশি দিয়েই চলে যায়। লোকটা বোকাবজ্জাত। মনটা তার ভিজিয়ে ভিজিয়ে রাখছে, দরকারমতো ইশারা করবে। ভাবছে যে বড়ো সে ভালো ভাববে বাবুকে, গলে জল হয়ে থাকবে বড়শি ছাড়া আলগা টোপ গিলে গিলেই। ভাবে ভাবুক, মন্দ কী, এখন এলে হয় মুখটাতে আলগা হাসি ফুটিয়ে

তলার কম কয়লার টুকরি একটা নিতে হবে। অনেকেই কয়লা কিনতে চায়,

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৬

তলার একটা নিতে হবে। অনেকে কিনতে চায়,

...ভাত চড়বে না।

কিনতেও পারে না, চলে যেতেও পারে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসাব করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই দুমুখো সমস্যার হিসাব—আটআনার কয়লায় যে দুবেলার বেশি তিনবেলা চলবে না অথচ এদিকে আবার কয়লা ছাড়া যে ভাত সিদ্ধ হবে না, কয়লা না কিনলে আটআনা দিয়েই। মীমাংসা কী ?

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৬

ভাত চড়বে না খেয়ে কাজে যাওয়ার।

তাই চলে যেতে পারে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসাব কষে মনে মনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক হিসাব—আটআনার কয়লায় যে দুবেলার বেশি তিনবেলা চলবে না ! আবার কয়লা ছাড়া যে ভাত সিদ্ধ হবে না। কী করা যায় ?

শহরে কয়লা নেই। গলিতে ঢুকে বাঁয়ে দরজাবন্ধ আড়ত।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৬

কয়লা নেই শহরে। রাঁধবে না খাবে না লোকে ? গলিতে ঢুকে বাঁয়ে দরজাবন্ধ আড়ত

সামনে টুকরি সাজিয়ে, ক্রেতা যে আসছে খেয়াল রেখে চুণো স্বপ্ন দ্যাখে...

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৬

এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখা, সামনে টুকরি সাজিয়ে, খেয়াল রেখে কে আসছে ক্রেতা।

ঘিঞ্জি করা ঘরগুলির মধ্যে তাদের একখানি ঘর, আবছা আঁধারে চুণো একলাটি বসে। তার মা গেছে ঝি-এর কাজে, ভাই গেছে কারখানায়।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৬

তার বস্তির ঘর ওই ডানদিকের ওই ঘরের ঘিঞ্জির মধ্যে, সেখানে কে একলাটি। তার মা ভাই গেছে কাজে অকাজে কে জানে কোথা।

না, চুণোর স্বপ্ন দেখা হয় না সব ভিড় হয়ে যায়। কোথায় যায় কুঞ্জ আর তার খাবারের ঠোঙা, ফাঁকা ঘবের নিরালা অবসর,

মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৬

না, চুণোর স্বপ্ন দেখা হয় না ভিড় ছাড়া। কোথায় থাকে কুঞ্জ আব খাবারের ঠোঙা অপ্রাপ্য অসম্ভব নিরালা অবসরের সঙ্গে,

মিথ্যা স্বপ্ন ভেঙে যায়, শুরু হয় চুণোর আসল স্বপ্ন। ওই হাটবাজার শাসন গালাগালি হট্টগোল জড়ানো কল্পনাই যেন তার জমে, নিত্যকার ঘটনাই যাত্রা থিয়েটারের মতো রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। কুঞ্জ এসেছে বইকী তার কাছে, মস্ত এক ঠোঙা খাবার নিয়েই এসেছে। সকলে দেখেছে, জেনেছে, হইচই করে উঠেছে। কী এসে যায় তাতে ? কুঞ্জর গায়ে জোর নেই ? কুঞ্জ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে। কুঞ্জ দাঁতে দাঁত ঘষছে রাগে, ভাইকে ঠেলে দিয়েছে উঠোনের নর্দমায়, এক ধাক্কায় হটিয়ে দিয়েছে মাকে। চকচকে ছোরা বার করে কুঞ্জ বলছে, আয় শালা, আয় শালি, কে আছিস আয় !

চুণো হাত ধরেছে কুঞ্জর। চকচকে ছোরাধরা হাতটা ধরে সামলাবার চেষ্টা করছে কুঞ্জকে।

উঃ ! যদি হত !

চশমাপরা বেঁটেবাবুটি মন্থরপদে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।

কীরে, কয়লা দিবি নাকি ?

তবে তাতেই কী আর ভাঙে, চুণোর স্বপ্ন। ওর মধ্যেই তার কল্পনা, ওর সঙ্গেই জড়ানো, ওই কঠোর নিষ্করুণ হাটবাজারি শাসন গালাগাল হট্টগোল, বরঞ্চ সত্যি সত্যি ওইখানেই যেন আসল স্বপ্ন শুরু। কুঞ্জ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে, কুঞ্জ দাঁতে দাঁত ঘষছে রাগে দিশে হারিয়ে, ভাইকে ঠেলে দিয়েছে উঠোনের নর্দমায়, এক ধাক্কায় লুটিয়ে দিয়েছে মাকে। চকচকে ছোরা বার করে কুঞ্জ বলছে, আয় শালা, আয় শালি, কে আসবি আয়।

চুণো হাত ধরেছে কুঞ্জর, চকচকে ছোরা ধরা হাতটা, সামলাবার চেষ্টা করছে কুঞ্জকে।

উঃ যদি হত !

নটুক যখন গাড়ি চাপা পড়ল সরকারি রেশনশপের সামনে, গুরুভার গাড়িটা তরুণ বটগাছটার তলায় খেলাঘরের মতো দুহাত উঁচু মন্দির চুরমার করে শিবলিঙ্গ ভেঙে নর্দমায় ছিটকে ফেলে দুশো গজ দূরে সামনে মানুষের বাধা পেয়ে বাঁয়ে মসজিদের রেলিং ভেঙে থামল আর জ্বলে উঠলো, আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা, ভিড়

নে যাও।

আজ থলি আনতে গেলাম। এক কাজ করবি, পৌঁছে দিয়ে আসবি ? কাছেই বাড়ি, বেশি দূরে নয়। চুণো নির্বোধের মতো চেয়ে থাকে, মনে মনে বলে, বাড়ির মানুষ বুঝি তোমার কোথাও গেছে আজ, খালি বাড়ি পড়ে আছে।

পয়সা বেশি নিস না হয় ! কিন্তু চুণো তো উঠতে পারবে না আজ এখান থেকে। আরেকদিন দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে আসবে, আজ নয়।

একটা ছেঁড়া বস্তায় বেঁধে দি ?

থাক, আজ কয়লা নেব না।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা।

নটুক যখন গাড়ি চাপা পড়ল সরকারি রেশনশপের সামনে গুরুভার গাড়িটা তরুণ বটগাছটার তলায় শিবলিঙ্গ ভেঙে ছিটকে ফেলে দুশো গজ দূরে সামনে মানুষের বাধা পেয়ে বাঁয়ে মসজিদের রেলিং ভেঙে থামল। ভিড় বলা যায় না মানুষের বাধাকে, পঁচিশ-ত্রিশজনের বেশি ছিল না।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৬-৮৭

বলা যায় না মানুষের বাধাকে, পঁচিশ-ত্রিশজনের বেশি ছিল না।

তবে স্টিয়ারিং ছিল কালো আব্বাসের হাতে, মার্কিন সোলজারটার হাতে ছিল স্টেনগান। আব্বাস কালো মানুষের দেওয়াল ভেদ করে গাড়ি চালাতে শেখেনি। জনতা আগুন দেয় গাড়িতে, ধরে নামায় ইউনিফর্ম পরা ঢ্যাঙা সাদা মার্কিন সৈনিক আর উর্দিপরা আব্বাসকে।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৭

গাড়ি আপনি চলে না, মানুষ চালায় বলে বুঝি থামতে হয় উর্দিহীন শার্টহীন আধ-ন্যাংটো কিছু মানুষেব পাতলা দেয়ালে। তাবাই আগুন দেয় গাড়িতে, ধরে নামায় ইউনিফর্ম পরা সাদা মার্কিনি চালক আব উর্দিপবা তাব কালো সহকারী আব্বাস খাঁকে।

কোমল হাতেব তালুতে, রেলিংটা আগুনের মতো গরম লাগে এত জোরে সে আঁকড়ে ধবে রেলিংটা।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৭

রেলিং-এব ডগায় মেহগিনি কাঠেব কঠোবতা যেন অত্যাচার করে কোমল হাতের তালুতে, এত জোবে সে আঁকড়ে ধবে রেলিংটা।

আতুড়ে তাকে প্রথম কাঁদন কাঁদাতে গিয়ে চুণোব পিসি এক আছাড়ে একটা পা তার ভেঙে দিয়েছিল। আরেক আছাড়ে কী হত কে জানে।

বিয়োনোর ব্যথা বেদনা ভুলে...

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৭

আঁতুরে তাকে আস্তে আছাড় দিয়ে প্রথম কাঁদন কাঁদাতে কী ঘেন্না জন্মেছিল দুলুর পিসির যে সে এক আছাড়ে একটা পা ভেঙে বেঁকিয়ে দিয়েছিল নটুকেব।

বিয়োনোর বেদনা মূর্চ্ছনা এড়িয়ে..

ওরা কি জানে যে ওই সম্মান দেখানো টিটকারি, পালানোটা ব্যঙ্গ ? জানে কি যে রাইফেল স্টেনগানধারী তাদের মর্যাদাই যদি এরা জানত, সম্মানবোধ থাকত, ট্রাক বোঝাই হয়ে তারা আসবে জেনেও তা হলে কখনও ট্রাক পুড়িয়ে দিত না। এতদিনেও কি নিরস্ত্র জনতার চালচলন আচার ব্যবহারের মানে স্পষ্ট হতে বাকি আছে ! ছত্রভঙ্গ হয়ে সবার ছুটে পালানো তাদের ভয়ে নয়, যাদের হাত খালি তাদের মধ্যে যে উৎকট তামাশাবোধ আছে, হাস্যকর বীভৎসতা আছে, অস্ত্রধারী তাদেরই শোচনীয় ভীরুতা আর আতঙ্কের প্রমাণ আছে, সেটা স্পষ্ট করে তোলার জন্যই জনতা পালায়। পাগলা কুকুর খ্যাপা হাতি দেখেও এমনি পালানোর ব্যঙ্গই তারা করে।

বোধহয় জানে বলে ওই সম্মান দেখানো টিটকারি, পালানো ব্যঙ্গ ? জানে বলে যে রাইফেল স্টেগানধারী তাদের মর্যাদাই যদি জানত, সম্মান বোধ থাকত, ট্রাকবোঝাই হয়ে তারা আসবে জেনেও ট্রাক পুড়িয়ে দিত না, ঘাড়ে লুটিয়ে দিত না তাদেরই একজনের মাথাটা, বোঝে বলে যে ছত্রভঙ্গ হয়ে সবার ছুটে পালানো তাদের ভয় নয়, যাদের হাত খালি তাদের মধ্যে এত রাইফেল স্টেনগান নিয়ে হানা দেবার মধ্যে যে উৎকট তামাসা আছে, হাস্যকর বিভৎসতা আছে, অস্ত্রধারী তাদেরই শোচনীয় ভীরুতা আর আতঙ্কের প্রমাণ আছে, তাই স্পষ্ট করে তোলার জন্য ?

তা এটা চুণোও জানে বোঝে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৭-১৮৮	তা এটা চুণোও জানে।
আড়াল থেয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয় চুণোকে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৮	আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখতে হয় চুণোকে, তফাত থেকে দেখতে হয়।
মোড়ের মাথায় কুঞ্জর শুখো এবং বিড়িপাতা বেচার ছোটো ঘর, মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ১৮৮	মোড়ের মাথায় কুঞ্জর শুখো, বিড়ির পাতার ছোটো দোকান ঘর,

ছোটবকুলপুরের যাত্রী

'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশ সংখ্যক গল্পসংকলন এবং দ্বাত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৫৬, প্রকাশক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লি, কলকাতা, পৃ ৬ + ৯২, মূল্য দুটাকা, প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী।

লেখকের জীবৎকালে বা পরেও দীর্ঘকাল ছোটবকুলপুরের যাত্রী পুনর্মুদ্রিত হয়নি। সম্প্রতি একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন প্রা. লি, কলকাতা। প্রকাশকাল আষাঢ় ১৪০৬ (জুন ১৯৯৯) পৃ ৬ + ১০৫, মূল্য তিরিশ টাকা, প্রচ্ছদশিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত।

মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে ছোটবকুলপুরের যাত্রী প্রথম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে।

এই সংস্করণের মোট গল্পসংখ্যা ছিল আট, গল্পগুলির শিরোনাম যথাক্রমে : ছোটবকুলপুরের যাত্রী, বাগদীপাড়া দিয়ে, মেজাজ, প্রাণাধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নিচু চোখে দুআনা আর দুপয়সা। নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা। সূচিপত্রের সঙ্গে মূল গল্পের শিরোনামে ঈষৎ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। উল্লেখ্য 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালেও প্রথম গল্পের ক্ষেত্রে এই 'আর' শব্দটি ছিল। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ (কার্তিক ১৩৬৪) সংকলনে গৃহীত এই উভয় গল্পের ক্ষেত্রেই 'আর' এবং 'একটি' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে।

এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থভুক্ত যে ক-টি গল্পের পত্রপত্রিকায় পূর্ব প্রকাশের সূত্র পাওয়া গেছে, কালানুক্রমিকভাবে তা নিম্নরূপ :

নিচু চোখে দুআনা আব দুপয়সা	চতুরঙ্গ	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫
ছোট বকুলপুরের যাত্রী	সংবাদ	শারদীয় ১৩৫৫
বাগদীপাড়া দিয়ে	চলন্তিকা	শারদীয়া আশ্বিন ১৩৫৫
মেজাজ	অরণি	শারদ ১৩৫৫
প্রাণাধিক	বসুমতী	শারদীয় ১৩৫৫
সখী	পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা	শারদ্ ১৩৫৫

'নিচু চোখে দুআনা আর দুপয়সা' গল্পের একটি পরিবর্তিত রূপ দুআনা আর দুপয়সা ছোটোদের পত্রিকা 'মৌচাক'-এর মাঘ ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে পত্রিকাটির অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের কথা ভেবে ভাষাগত কিছু সরলীকরণ করা হয়েছিল।

ছোটবকুলপুরের যাত্রী যে 'সংবাদ' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সে তথ্য লেখকের ডায়েরি থেকেই জানা যায়, পত্রিকার সংখ্যাটি সংগ্রহ করা যায়নি। লেখক ১৯৪৮-এর ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের দিনলিপিতে গল্পটির জন্য পঞ্চাশ টাকা সম্মানদক্ষিণা প্রাপ্তির উল্লেখ করেছেন। (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৩৭৩)। এই প্রসঙ্গে অপ্রকাশিত মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়, লেখকের ১৯৪৫ সালের ডায়েরিতে উক্ত গল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া ও 'পদাতিক' এই প্রস্তাবিত নামের উল্লেখ আছে। ১৯৫০-এর ডায়েরিতে উল্লেখিত হয়েছে যে গল্পটি ১৯৪৭-এ লিখিত হয় অর্থাৎ ডায়েরিটি ১৯৪৫-এর হলেও গল্পের খসড়াটি ওই ডায়েরির পাতায় লেখা হয় ১৯৪৭-এ :

৪১ ॥ পদাতিক—রাত্রি—একা পথিক—গাঁ পাহারা—হোমগাড ধরে চালান নিয়ে গেল—পান মোড়া ইস্তাহার—ঘরে আটক মেয়ের কান্না—
(ছোটবকুলপুরের যাত্রী)
[ডায়েরি ১৯৪৫। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য-অনুযায়ী, ১৯৪৭-এর লেখা।]

FEBRUARY **TUESDAY 6** **1945**

Samvat—9 Phagun (Badi), 2001. *Bengali*—24 Magh, 1351.
Fulee—9 Phagun, 1352. *Hijri*—22 Safar, 1364.

কোনো কোনো গবেষকের মতে, ১৯৪৮-৪৯ সালের তেভাগা আন্দোলনের সময়ে বড়াকমলাপুরে সংঘটিত পুলিশি সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই ছোটবকুলপুরের যাত্রী গল্পটি লিখিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কৃতি আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা ও কর্মী চিন্মোহন সেহানবীশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড়াকমলাপুরে গিয়ে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের অনুরোধ করেছিলেন। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত উক্ত অঞ্চলে স্বয়ং যাননি। হয়তো এমন একটি গল্প পরোক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে লেখক মনে মনে আগে থেকেই নির্মাণ করছিলেন, ১৯৪৭ সাল থেকেই। মালিনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত রচনার ইংরাজি অনুবাদ Selected Stories (Thema, 1988) ভুক্ত Travellers to Chhoto Bakulpur-এর ভূমিকায় এই বিষয়ে নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় :

> In 1948-49 severe repression was unleashed by the newly-formed national government on the popular upsurge which had started in various parts of the country, even in 1946, before the transfer of power. Written against this background, 'Chhoto Bakulpurer Jatri' is one of the best known and most popular stories of Manik Bandyopadhyay. Parts of the countryside still reverberated with echoes of the Tebhaga movement. There was also a great deal of labour unrest. The Communist Party was under a ban and those leaders who had not gone into hiding, had been put in jail
>
> The ultra-left political line taken by the Party at this time was reflected in the cultural movement as well ; and there was a strong trend of thought within it that writers and intellectuals, in in order to do their own work well, must participate directly in peasants' and workers' movements. 'Why do you not go to Bara Kamalápur (an actual village) and get some first-hand experience of the police repression going on there ?' Chinmohan Sehanobis, a Communist and a leader of the cultural movement, had exhorted Manik Bandyopadhyay, 'Go at least as a Communist if not as a writer !' The latter did not agree with the point of view

> implicit in this that a Communist writer has actually to experience personally all that he wishes to present in his writing. 'Chhoto Bakulpurer Jātri was written without visiting Bara Kamalāpur. But the atmosphere of terror is so graphically presented in it that Chinmohan Sehanobis who was in jail when he read the story had to agree that Manik Bandyopadhyay had proved his point.

বাগদীপাড়া দিয়ে ছোটবকুলপুরের যাত্রী (আষাঢ় ১৩৫৬) সংকলনভুক্ত হলেও ইতিপূর্বে প্রকাশিত লেখকের ১৩তম গল্পগ্রন্থ মাটির মাশুল (আশ্বিন ১৩৫৫) সংকলনের শেষ গল্পরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সখী গল্পটি পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশকালে বানান ছিল সখি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য লেখকের 'ফেরিওলা' নামক গল্পসংকলনে (ক্যালকাটা পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬০) সখী গল্পটি কিছু পরিবর্তনসহ পুনর্বার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কয়েকটি গল্পের পত্রিকাভুক্ত পাঠের সঙ্গে গ্রন্থগৃহীত পাঠের সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়।

মেজাজ

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
তাই নিয়ে হল আরেক দফা জেল।	এই নিয়ে হল আরেক দফা জেল। এবং একটা সামাজিক হাঙ্গামা। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৮২
সহজে তাকে কেউ ঘাটাতে চায় না।	সহজে তাকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না [গ্রন্থভুক্ত গল্পে এই বাক্যের পর সংযোজিত কয়েকটি বাক্য] তাই থেকে একটা সিদ্ধান্ত বোধহয় করা চলে। যতই মনে হোক যে মেজাজটা তার একেবারেই অন্ধ ও বেহিসেবি, জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় যা খুশি কাণ্ড করে বসে, ঠিক অতটা হয়তো সত্য নয়, মানুষ যে তাকে ভয় করে, সহজে তার পেছনে লাগতে চায় না, এটা বোধহয় সে বোঝে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৮২
গুণ্ডারা ঐ একই জাত।	গুন্ডারা ওই একই জাত। মনোরঞ্জন একটু ভেবে বলে, তাই কি ? কে জানে ? মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৮৩

সখী

ওদের বৃহত্তর যোগাযোগ	ওদের যোগাযোগ অনেক বেশি মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৯৭

নিচু চোখে দুআনা আর দুপয়সা

আধঘন্টার মধ্যে সে যখন	এতটুকু সময়ের মধ্যে সে যখন
নিজে চটাচটি করলেন	নিজে ভুল করলেন, নিজে চটাচটি করলেন মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩০৮

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে বাগদীপাড়া দিয়ে গল্পটি অব্যবহিত পূর্ববর্তী মাটির মাশুল গ্রন্থে এবং সখী গল্পটি পরবর্তী ফেরিওলা (১৩৬০) গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিকালে উভয়তই ভাষাগত কিছু সংস্কার ঘটেছে। বাগদীপাড়া দিয়ে গল্পের সংস্কার পরিবর্তন নিম্নরূপ :

বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে

মাটির মাশুল - ভুক্ত	ছোটবকুলপুরের যাত্রী - ভুক্ত
কত তেল আর কত স্নেহে পাকানো এই লাঠি, রক্তও যে মাখেনি কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে এমন নয়।...	অনেক তেল আর অনেক স্নেহে পাকানো সেই লাঠি, কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে রক্ত মেখে পোক্তও যে হয়নি এমন নয়।
পুবের গাছের মাথা ঘেঁষা সূর্য মাথার উপরে চড়া পর্যন্ত..	পুবে হেলানো গাছের মাথা ঘেঁষা সূর্য তাব মাথার উপবে আকাশের মাঝখানে চডা পর্যন্ত...
গ্রামের বাইরে যেখানে গোল হয়ে বাঁক নিয়েছে নদী...	গ্রামের বাইরে যেখানে মেয়েদেব পায়েব আধখানা মলেব মতো বাঁক নিয়েছে নদী...
কষ্টে তার মাথা ঘুরছে।...	খাটুনি খিদে আর মনের কষ্টে তার মাথা ঘুবছে।
বেলগাছের দেবতার মতোই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচারী বলেই তো এরা দেবতা ! তাই হবে ! মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৭	এত বেলায় এসে তাকে বসিয়ে বেখে নিজে আবামে নাইতে খেতে গেল। তা হবে বইকী, বেলগাছের দেবতাব মতোই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচাবী বলেই তো এরা দেবতা !
...বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে—তবে তুমি ঘুমোতে যাও। নালিশ শুনে কাজ নেই। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৮	...বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোল জাল মুডি দিযে—মাথায় ঝাঁকি দিয়ে দুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বলে, তবে তুমি ঘুমোবে যাও, নালিশ শুনে কাজ নেই।
শ্রীমন্ত হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বলে, রাগিস কেন ? তুই আর আমি কি তফাত ? তুই আমার পুত্রতুল্য ! কী বলছিস বল। বলব কী ? দারুণ অভিমানে লাঠি আবার শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে দুলে বলে, একদল বদবেজাত যারা কারখানায় কাজ করতে যায় না ? বাগ্‌দিপাড়া ওরা নষ্টাৎ করে দিচ্ছে। কী বলে শুনবে ? বল না শুনি। বলে, মোরাও মানুষ। রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ, মোরাও মানুষ। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৮	শ্রীমন্ত হঠাৎ দাবুণ আতঙ্কে বলে বসে, রাগিস কেন ? তুই আর আমি কি তফাত ? তুই আমাব পুত্রতুল্য ! আমি হলাম তোর বাবা। বাপের পরে কি গোসা করে রে বেটা ? কী বলছিস বল। বলব কী ? দারুণ অভিমানে লাঠি আবাব শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে দুলে বলে, একদল বদবেজাত যে বাগ্‌দিপাড়া নষ্টাৎ কবে দিচ্ছে সেদিকে তুমরা গা করবে না ? কারখানায় খাটতে যায় সবেবানেশেগুণো, বাগ্‌দিসমাজ ছারখারে দিলে। কী বলে শুনবে ? বল না, শুনি। বলে, মোরাও মানুষ ! রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ ! মোরা ছোটো কীসে ?
শুধু কিছুদূর তফাতে সরে যায় মাত্র। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৮	শুধু কিছুদিনের জন্য খানিকটা সরে যায়।
পাড়ার মধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে। শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে। ঠাকুরের থান তো বেগার খাটা তেভাগা নয় ? মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৮	পাড়ার মধ্যে ঢুকে জমা হতে শুরু করেছে। ঠাকুরের বেদি জল আটকানোয় জমিদারের কী লাভ হয়েছে সেটা প্রত্যক্ষ, সবাই জানে, তবে এ সব ব্যাপার জেনেও না জানাই নিয়ম। বাগ্‌দিপাডাব জঙ্গলের জন্যই

খরচপত্র করে জমিদার ঠাকুরের থান বানিয়ে দিয়েছে এটা সত্য বলে মানাই নিয়ম।

শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে

ঠাকুরের থান তো বেগার তেভাগা নয় ?

নিজের চুল ছিঁড়ছে, বাগ্‌দিপাড়ার অবাধ্যতার রাগে।

নিজের চুল ছিঁড়ছে।

বাগ্‌দিপাড়ায় আবার বিদ্রোহ !...

দুলের বিবরণ শুনে বিশেষ সে বিচলিত হয় না। বাগ্‌দিপাড়ায় আবার বিদ্রোহ ?

মাতব্বর নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে অনুগত রাখে। দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দরকার।...

মাতব্বর নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে অনুগত রাখে। সেজন্য দুলের নালিশের প্রতিকারের ব্যবস্থা একটা করতে হবে। কিন্তু দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দরকার। মাতব্বরের এতটা নরম হলে কি চলে ?

ব্যঙ্গ করে বলে,...

শ্রীমন্ত একটা অবজ্ঞাসূচক আওয়াজ করে বলে,

সে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা। কে কে পাণ্ডা নাম বলতো। বিশে, শিবু ?—.

সে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা। সে হবেখন। ভারী সব মস্ত মস্ত লোক, তার আবার বিহিতের ভাবনা। কে কে পাণ্ডা হয়েছে নাম বলতো ? বিশে ? শিবু ?...

তার দেবতা অপদেবতাদের কাছে দুলে মাথা কপাল খুঁড়ে প্রার্থনা জানায়। বলি মানত করে।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৯

তার সমস্ত দেবতা অপদেবতাদের কাছে দুলে মাথা কপাল খুড়ে প্রার্থনা জানায়—সজ্ঞাত যারা তার শত্রু তারা ধ্বংসে হয়ে যাক, দেবতার রোষ পিতৃপুরুষের কোপ জমিদার পুলিশের ক্রোধ হয়ে এসে তাদের ধ্বংস করে দিক, মনে মনে দুলে অনেক কিছু মানত করে।

গোড়ায় রাজা জমিদারের প্রজা-ঠেঙানো লেঠেল-পুলিশি আব বেগারদারির বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৬৯

বহুকাল আগে বাগ্‌দিরা যখন রাজার হয়ে লড়াই করত, তখন রাজা জমিদারের প্রজা ঠেঙানো লেঠেল-পুলিশ আর বেগারদারির বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, নামমাত্র একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্‌দিপাড়ার পচাই খাওয়া মেয়ে পুরুষকে, যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল...

তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্‌দিপাড়ার পচাই খাওয়া, মেয়ে পুরুষে যথেচ্ছাচারী, ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু, অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল...

লাঠি হাতে খুন করতে...

রাজার জন্য লাঠি হাতে খুন করতে...

তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে, মুক্তি কামনায়।

তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে।

এই তেজের প্রমাণ দুলে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক...

আজকেই এই তেজের প্রমাণ দুলে প্রত্যক্ষ করে। দুপুরে এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক...

...জাত-ধর্ম সব নষ্ট করেছে। উথলে উঠেছে তার যৌবন। খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, আরে বুড়া তোর মরণ নাই ? খপর দিচ্ছিস ?

খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৭০

...জাত-ধর্ম সব নষ্ট করেছে, খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, আরে বুড়ো তোর মরণ নাই ? খপর দিচ্ছিস ? বজ্জাতি করে খপর দিচ্ছিস ?

দুলালীর খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে।

নামে উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছিল। নামটি আমার পছন্দ না হওয়ায় শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করি। ভুলক্রমে বাতিল নামটিই ছাপা হয়ে যায়। গোড়াতেই বাধা পড়েছে, উপন্যাসটি নিশ্চয় উৎরোবে। লেখক।"

গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় যে শেষ পাঁচ কিস্তি লেখক কর্তৃক বর্জিত হয় তার পূর্ববর্তী বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫ পরিচয়ের সংযুক্ত সংখ্যার কিস্তির শেষে যথারীতি 'ক্রমশ' লেখা ছিল। বর্জিত পাঁচটি কিস্তির প্রথম কিস্তির শেষে (পরিচয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৫) 'আগামীবারে সমাপ্য' কথাগুলি লিখিত ছিল। আবার চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যায় সমাপ্ত লেখার পর 'প্রথম ভাগ' কথাটি লেখা আছে। হয়তো কাহিনির পরবর্তী খণ্ড লেখার পরিকল্পনা ছিল।

আলোচ্য উপন্যাসে পাকা, পাঁচু ও তার স্ত্রী দুকলি শহরে জীবিকাসন্ধানে এসেছে এবং পাকা ও পাঁচু দুজনেই কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। পাঁচুর কাজ কারখানায়, সে পাকাকে বলেছে, 'ছিলাম চাষা, হলাম মজুর'। বর্জিত অংশে লেখক পাকা ও পাঁচুর চরিত্রের একটা পরিবর্তন দেখিয়েছেন।

বর্জিত পাঁচটি কিস্তি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল।

পত্রিকায় প্রকাশিত ও গ্রন্থে গৃহীত পাঠেও যথেষ্ট সংশোধন-পরিমার্জন লক্ষিত হয়।

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
বড় ক্লাব ঘরটাতে	বড়ো হলঘরটাতে
সংঘ মানে নাকি অ্যাসোসিয়েশন, বিশেষ কোন আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যে সংঘ চালাবার আয়োজন করা হয়,—এটা হল ক্লাব, পরিচয় শারদ ১৩৫৩, পৃ ২২০	সংঘ বলতে নাকি রাজনৈতিক গন্ধ এসে যায়। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবাব উদ্যেশ্যেই সংঘ কবা হয়, এই শহরেই যেমন দু-তিনটি আছে। এটা হল বিশুদ্ধ ক্লাব, মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩১৭
জেল-টেল নয়, ওসব শাস্তি দেবার কোর্ট এটা নয়। যদিও দুজন ছোটদরের হাকিম ও একজন মুন্সেফ, ক্লাবের তাঁরা সভ্য, উপস্থিত আছেন। কান ধরে বেত মারা হবে, নয় শহর থেকে দূর করে দেওয়া হবে অন্য কোথাও—এই ধরনের শাস্তির কথা উত্তেজনা প্রবণ উৎসাহী সভ্যেরা কেউ কেউ ভাবছেন। শাস্তি যা দেবার ভৈরববাবুই দেবেন ; তাঁর ভাগ্নেকে অন্যে কেন বেত মারবে, তাড়াবে শহর থেকে ? ভৈরববাবু না নিয়ে এলে এ বেসরকারী আদালতে ছোঁড়াকে বিচারের জন্য হাজির করার ক্ষমতাই বা ছিল কার ? তাহলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হত। ভৈরববাবু নিজেও টের পেতেন এত বড় ব্যাপারটা উপেক্ষা করার মজা। এরকম দু'একজন যারা ভুবনবাবুর কাছে বসেছেন নীচুগলায় জোর দিয়ে তারা ভুবনবাবুকে বলছেন, সহজে ছাড়বেন না কিন্তু ! তফাৎ থেকে উঠে এসেও দু'একজন তাঁকে প্রায় এই কথাই বলে যাচ্ছেন। আগেও অনেকবার বলেছেন। পৃ ২২১	শাস্তি যা দেবার সেটা অবশ্য ভৈরব নিজেই দেবে , তাঁর ভাগ্নের কান মলতে বা তাকে বেত মারতে অন্য কেউ হাত তুললে সেটা উলটে হবে ভৈরবের অপমান। ভৈরব না নিয়ে এলে এ বেসরকাবি আদালতে বজ্জাত ছোঁড়াকে বিচারের জন্য হাজির করবার ক্ষমতাই বা ছিল কার ? ভৈরব ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হত। ভৈরব নিজেও টের পেত এত বড়ো ব্যাপারটা উপেক্ষা করার মজা। ভৈরব আর ভুবনের মধ্যে আছে সামাজিক মন-কষাকষি। মান থেকে মন। যারা ভুবনের কাছে বসেছে, নিচুগলায় জোর দিয়ে তারা বলে, সহজে ছাড়বেন না কিন্তু। ঘা-টা যেন ভৈরবেরও লাগে। তফাত থেকে উঠে এসেও দু-একজন তাকে প্রায় এই কথাই বলে যাচ্ছে। আগেও অনেকবার বলেছে। মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩১৭-৩১৮

স্বদেশী বই আর সেক্সের বই—খানিক চুপ করে থেকে অনন্ত আরেকবার আরও স্পটে ভাষায় প্রশ্ন করলে, প্রকাশ বলে মরিয়া হয়ে, মাথা হেঁট করে।

কি বই ? অনন্ত প্রশ্ন করে।

আগে থেকে শেখানো-পড়ানো আছে, তবু প্রকাশ এবার রেগে যায়, আপনি জানেন না ? বুখে উঠে পাল্টা প্রশ্ন করে প্রকাশ, পঁচিশ ছাব্বিশখানা প্রেসক্রাইবড় বই লাইব্রেরীতে আছে ? আর সেক্স-সাইকলজীর কুড়ি বাইশটা বই আছে ? সেক্রেটারীর পারমিশন ছাড়া ওসব বই ইস্যু করা বারণ না ?

পৃ ২২৩

পাকা চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকে।

খানিক চুপ করে থেকে অনন্ত আরেকবার আরও স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করলে প্রকাশ মরিয়া হয়ে বলে, কতকগুলি উপন্যাস আর সেক্সের বই।

কী কী বই ?—অনন্ত প্রশ্ন করে।

আগে থেকে শেখানো-পড়ানো আছে, তবু প্রকাশ এবার রেগে যায়, আপনি জানেন না ?

অনন্ত ধমক দিয়ে বলে, আমার জানার কথা হচ্ছে না প্রকাশ। তুমি কী জান বলো।

প্রকাশ একটু চুপ করে থেকে কলের মতো বলে যায়, পঁচিশ-ছাব্বিশখানা খারাপ ধরনের বই লাইব্রেরিতে আছে, আর সেক্স সাইকলজির কুড়ি-বাইশটা বই আছে। সেক্রেটারির পারমিশন ছাড়া ও সব বই ইস্যু করা বারণ।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২০

রাখাল বলল, শালার ব্যাটা শালা

পৃ ২২৩

রাখাল বলল, যা যা ফচকে ছোঁড়া, লভের বই পড়তে হবে না।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২০

....পঞ্চাশ ষাটখানা বিশেষ বই দাবী করে বসবে। তিনি ভেবেছিলেন, দু'একখানা ভালমন্দ বই হয়তো পাকা লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়তে চায়। মাঝে মাঝে পাকার বই পড়ার ঝোঁক চাপে, দিনরাত সে বইয়ে মাথা গুঁজে থাকে, ভৈরব তা জানতেন। মামার সঙ্গে এ ছলনাটুকু সে করেছিল।

পরিচয়, কার্তিক ১৩০৩ পৃ ৩০২

....পঞ্চাশ ষাটখানা বিশেষ বই দাবি করে বসবে। মামাব সঙ্গে এ ছলনাটুকু সে করেছিল।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২২

কমিটির মেম্বার হলেও ভুবন এবং আরো কয়েকজন কোন আইনে রাখালের পক্ষ নিয়ে তাকে ধমকাতে আসবেন ?

পৃ ৩০২

ভৈরবের চিটি নিয়ে এলেও ভুবনবাবু এবং আরও কয়েকজন কোন আইনে রাখালের পক্ষ নিয়ে তাকে ধমকাতে আসবে ?

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২২

তা তো চলবে না। ভোরে উঠতে পারবে না, ব্যায়াম করবে, তার মানে হয় না। আজ তোমার মনের জোর দেখে ভারি খুশী হয়েছি ভাই। অনেক ছেলে ও অবস্থায় নার্ভাস হয়ে পড়ত। কাল আসবে ?

কাল ? কাল নয় কালীদা, পরশু, পাকার সুরটা অনুমতি চাওয়া মিনতির।

পৃ ৩০৫

ঘুম ভাঙেনি। এ তো চলবে না পাকা। আমার ক্লাবের ছেলে তুমি, ভোরে তোমার ঘুম ভাঙে না। কাল আসবে ?

কাল ? কাল নয় কালীদা, পরশু।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৪

বাবুর এদিকে বড়াই হচ্ছিল বক্সিং শিখছেন, এক ঘুষিতে কুপোকাৎ। তাই তো বলি ?

পৃ ৩০৫

পাকা মোদের বক্সিং শিখছেন, এক ঘুষিতে কুপোকাত। তাই তো বলি।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৪

কানাই লম্বা, কালো, রোগা, কম কথা কয়, কৌতুকবোধটা চোখা, সব সময় সব কিছুতে এমন হাসি হাসি মুখ করে থাকে যেন মজা লাগছে।

পৃ ৩০৬

কানাই লম্বা, কালো, রোগা। কম কথা কয়

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৫

বন্ধুত্বের কুঁড়ি জন্মে ফুল ফুটে ফল পাকতে তাদের মাসখানেকও লাগেনি।

পৃ ৩০৭

বন্ধুত্ব জমাট বাঁধতে তাদের মাসখানেকও লাগেনি।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৫

এখানে ওখানে ভুর করে ছড়ানো পুরাণো সহরের প্রাচীনতাই যেন এগুলি।

পৃ ৩০৭

শহরের প্রাচীনতাই যেন এভাবে স্তূপাকার হয়ে স্থানে স্থানে পড়ে আছে।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৫

ছোট একটা রাস্তার ভেতরে ধনেশের দোকান। এই রাস্তার ও মাথার দিকে সরু একটা গলির মোড়ে পাকাকে ছেলেবেলা কুকুর কামড়েছিল। মার সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল মামাবাড়ী। বাড়ীর কাছে মুড়িওয়ালী কালীদাসী, ভাব হয়েছিল তার মেয়ের সঙ্গে। তার চেহারাটি আজও স্মৃতিতে স্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে। একদিন মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে গজা কিনতে এসেছিল এই রাস্তারই আরও ওদিকের বুড়ো ময়রাটার দোকানে। দোকানটা আজও আছে, বুড়ো ময়রা আরও বুড়ো, আরও বাঁকা অন্ধ হয়ে গেছে, দোকান চালায় তার অদ্ভুত রকম মোটা ছেলেটা। ফিরবার সময় উই ধরা মোটা কালো কাঠের থামওয়ালা জীর্ন পুরাণো বাড়ীটার সদর রোয়াক থেকে তেড়ে এলো থ্যাবড়ামুখো প্রকাণ্ড বুড়ো মোটা কুকুরটা। পরিষ্কার মনে আছে কুকুরটাকে, ছেঁতলা-পড়া দাঁতগুলি পর্যন্ত। মুড়িওয়ালীর মেয়েটাকে পিছনে আড়াল করে সে দু'হাতে ঠেকাতে গিয়েছিল কুকুরটাকে, ঠোঙ্গার গজাগুলিরও মায়া করেনি। কোথায় গেছে কি হয়েছে ওদের খোঁজ নেবার কথা তো মনেও হয়নি একবার।

শুধু ওরা কেন, কারো কি খোঁজ-খবর নিতে মনে থাকে তার? এই সেদিন ঢাকা থেকে এল, সেখানকার খোঁজ সে নিয়েছে?

এটা বড় অন্যায় হয়ে গেছে। এখানে এসে থেকে দেড়বছরের মধ্যে ঢাকার কারো কাছে একখানা চিঠি লেখা হয়নি। সতীশ, নুরুল, সদাগরের কাছেও নয়, রাঙা বৌদির কাছেও নয়, মীনার কাছেও নয়। চাঁদমাঝিকে টাকা পাঁচটাও পাঠানো হয়নি। ফুলকে একটা ডুরে শাড়ী কিনে দেবার টাকা। মীনাকে চিঠি না লেখা বোধ হয় ভালই হয়েছে। সদর হাকিমের ফিটফাট ফাজিল মেয়ে, ওর কি আর মনেও আছে কে একদিন তার সঙ্গে, একসাথে গলা মিলিয়ে গান গাইত; বাঁশী বাজাত তার গানের সঙ্গে? বন্ধুদের কাছে লেখা উচিত ছিল। ফুলের জন্য টাকাটা পাঠানো উচিত ছিল। স্কুল ফাঁকি দিয়ে চাঁদ মাঝির নৌকায়

ধনেশের বাড়ির দেয়াল কাঁকর-মেশানো মাটির, পাথরের মতো শক্ত, ছাত টিনের। সামনের বারান্দা ঘিরে একাংশ মুদির দোকান করা হয়েছে। মুদিখানার এদিকের অংশটা ফাঁকা, শুধু পুরানো ভারী তক্তাপোশ পাতা আছে। তিনু তাড়াতাড়ি পাটি বিছিয়ে দেয়। হুঁকোতে জল বদলে রান্নাঘরের আখা থেকে জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তামাক সেজে আনে। হুঁকোটা নতুন, তাদের ব্যবহারের জন্যই তোলা থাকে। ধনেশ নিজেই দোকান থেকে হুঁকোটা দিয়েছে তাদের জন্য। দুদিন বাদে তিনু ম্যাট্রিক দেবে, পাকাব মতো উঁচুঘরের ছেলেরা তার বন্ধু, গর্বে ধনেশের বুক আজকাল দশ হাত হয়ে থাকে। পাকা তামাক টেনে চলেছে একমনে, ভাবে বিভোব হয়ে। কালি-পড়া লণ্ঠনটার মৃদু লালচে আলোয় মনে হয়, সে যেন এখানে নেই, হারিয়ে গেছে।

একাই ফুঁকে দিবি নাকি? কানাই বলে শেষ পর্যন্ত।

পাকা চমকে ওঠে। আজ চটে না, লজ্জা পেয়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয়। তিনু জানায় যে অনেকটা তামাক দিয়েছে, সহজে ফুরোবে না। ফুরোলে আর এক ছিলিম সেজে আনবে, সামান্য তামাক তো?

কী ভাবা হচ্ছিল ভাবুকমশায়েব? নরেশ বলে খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে।

তা দিয়ে দরকার কী বাবুমশায়ের? পাকা বলে মুখ বাঁকিয়ে।

কি ছোটোলোকের মতো তামাক টানা! শেষ করে যাই চল।

আমরা ছোটোলোক; তামাক টানি। তুই যা নরেশ।

নরেশ সরকারি ডাক্তার ধরণী গোস্বামীর ছেলে।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৫-৩২৬

লম্বা পাড়ি দিয়ে এসে যেদিন ফুলুকে চুমু খেয়েছিল, নিজেই সেদিন বলেছিল তাকে সুন্দব একটি ডুবে শাড়ী কিনে দেবে। চুমু খেতে দেবার দাম হিসাবে নয় অবশ্য। আনবে বলে গিয়েও সেদিন চাঁদ তাব কাপড় আনেনি, বায়না ধরে দাপাদাপি আবম্ভ কবায় চাঁদ তাকে মেবেছিল এক চড়, ফুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল জাল রাখা আঁধাব কুঁড়েঘবটাতে ঢুকে। কে জানে কি ভেবেছে মেয়েটা। হয়তো ভেবেছে ভদ্দবলোকেব ছেলেরা এমনিই হয়।

এদিকে চাববন্ধু উসখুস কবে। পাকাব এবকম তন্ময় ভাব দেখলে তাদেব অস্বস্তিব সীমা থাকে না কিন্তু কথা বলে তাকে সচেতন করতেও ভবসা পায় না। ডাকলে পাকা চমকে ওঠে, কখনো চটে যায়, কখনো বিষন্ন, নিশ্চুপ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। ধনেশেব বাড়ীব দেওয়াল মাটিব, পাথবেব মত শক্ত, ছাত টিনেব। সামনেব বারান্দার সদব দরজার একপাশেব অংশ টিন দিয়ে ঘিরে কবা হয়েছে। তাব একটু লম্বাটে ধাঁচেব মুদীখানা। এ অংশটা ফাঁকা, এখানে পাতা পুবাণো ভাবি তক্তপোষে তাবা বসেছে। তিনু তাড়াতাড়ি হুঁকো‑ জল বদলে বান্নাঘবেব আখা থেকে জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তামাক সেজে এনে দিয়েছে। হুঁকোটা নতুন তাদেবি জন্য তোলা থাকে, ধনেশ নিজেই দোকান থেকে হুঁকোটা দিয়েছে তদেব ব্যবহাবেব জন্য। কমদামী হুঁকো কল্‌কি টিকে তামাকও সে কিছু কিছু দোকানে রাখে। পাকা তামাক টেনে চলেছে একমনে, বিভোব হয়ে। কালি-পড়া লণ্ঠনটাব মৃদু লালচে আলোয় মনে হয়, সে যেন এখানে নেই হাবিয়ে গেছে।

একাই ফুঁকে দিবি নাকি ? কানাই বলে শেষ পর্যন্ত, পাকা লজ্জা পেয়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয়। তিনু জানায় যে অনেকটা তামাক দিয়েছে, সহজে ফুবোবে না। ফুবোলে আবেক ছিলুম সেজে আনবে। তামাক তো।

কি ভাবা হচ্ছিল ভাবুকমশায়েব ? নবেশ বলে খানিকটা বিবক্তিব সঙ্গে। চটপট টেনে নিয়ে চলো যাই এবাব ?

কোথা ?

এই ইদিক সিদিক যেথা হোক।

নবেশ সবকাবী ডাক্তাব ধবণী উকিলেব ছেলে।

পৃ ৩০৭-৩০৮

সকালেই ছুটে যায় পাকাব কাছে। বলে, সেদিন যে বললি শরৎবাবুব নতুন বইটা পড়তে দিবি—

মুখভবা খোঁচা খোঁচা গোঁপ দাড়ি নিয়ে আটহাতি ধুতিপবা ধনেশ

পৃ ৩০৮

মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে পাকাব কাছে ছুটে যায়। পাকা কড়া কথা বললে পাংশু বিবর্ণ হয়ে যায় তাব মুখ। দেখে বোধ হয় খুশিই হয় পাকা।

ছেলেব বন্ধুদের তামাক টানাব আসরে ধনেশ এসে উঁকি দেয়। তাব মুখভরা খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, কোঁচা দিয়ে আটহাতি ধুতিপরা।

মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৬

সকালে উঠে ভাল লাগেনি।

পিছনে বহুদূরে যাদের এলে ছেড়ে
তাদের ফিরে যদি চাই।
সাগর তীরে এসে করুণ হাসি হেসে
সাঁঝের প্রভাতী যদি গাই।
ফেণার হাসি তুলে সাগর পদতলে
আছাড়ি দেবে টিটকারি।
পরম অভিসার মিলন আনিবার
অতল কালো জল তারি।

ছাই কবিতা, বাজে। মাঝে মাঝে ঝোঁক এলে লিখবার সময় বেশ লাগে লিখতে, এই যা। কেউ তো আর পড়ছে না তার কবিতা সে নিজে ছাড়া।

পৃ ৩১১

সকালে উঠে ভালো লাগেনি।

তাতে আপশোশ নেই। কেউ তো পড়ছে না তার কবিতা, সে নিজে ছাড়া!

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৮

কানাই এসে পাশে বসলে সে কথা বলে যায়, আগের কথায়ই জের টেনে এটার কেন, ওটার মানে, সেটার কারণ। একটানা বলে যায়, কানাইকে শোনাচ্ছে না নিজেকে বলছে, নিজের কাছে কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে নিজেই ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করছে, ঠিক বোঝা যায় না। এক প্রসঙ্গ থেকে এমন অনায়াসে কি করে আরেক প্রসঙ্গে চলে যায়, কেন যায়, ভাল করে মাথায় ঢোকে না কানাই-এর। বিশেষত নিজের কথা বলতে বলতে যখন টেনে আনে ভদ্র জীবনের ফাঁকে মিথ্যা নোংরামির কথা আর হঠাৎ সুরু করে যৌন-বিজ্ঞান আর টেনে আনে নন্দ পুরুতকে। স্বাভাবিক ইচ্ছা জোর করে চাপলে সেটা যে অস্বাভাবিক ইচ্ছা হয়ে ফুঁড়ে উঠবেই—এ থেকে আনে নন্দ পুরুতের দু'আনা দক্ষিণা কম পড়ার জন্য তিনুর বাবার সঙ্গে বচসা, ধোঁকা দিয়ে মেয়েদের কাছে প্রণামী আদায়ের চেষ্টা করার কথা। টাকা চাওয়া স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষের, টাকা মানে টাকা নয়, সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকা, কষ্ট না পাওয়া।এ ইচ্ছাটা চেপে দেওয়ায় এবং শুদ্ধাচারী নিরীহ ভালমানুষ নন্দ ঠাকুরের একদিকে গরীবানার জন্য গর্ব, অন্যদিকে দিন রাত চিন্তা ভুলিয়ে ভালিয়ে ফাঁকি দিয়ে কেঁদে কঁকিয়ে ভিক্ষে চেয়ে কি করে বেশী পয়সা আদায় করবে। মোটারকম চুরি করতে পারলে চোরের যেমন গর্ব আর আনন্দ, ওভাবে মোটা প্রণামী আর দক্ষিণা আদায় করতে পারলে নন্দ ঠাকুরেরও তেমনি গর্ব আর আনন্দ ঠিক না কানাই? ঠিক বৈকি, কানাই নন্দ ঠাকুরের উদাহরণটা মেনে নেয়, কিন্তু স্বাভাবিক ইচ্ছা দমন না করার প্রশ্নে টেনে আনে একেবারে ছেলেদের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা। নারীসঙ্গমের ইচ্ছা দমন করবে না ছেলেরা, বদ নোংরা অভ্যাস? কালীদা ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেন, তার একটা মানে বুঝতে পারে পাকা। কিন্তু কানাই তার সঙ্গে একা আলাপ করতে বসলেই কেন যে

কানাই এসে পাশে বসলে পাকা কথা বলে যায়, আগের কথারই জের টেনে। এটার কেন, ওটার মানে, সেটার কারণ। এই বয়সেই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাব যেন সীমা পরিসীমা নেই তার। সংসারে সব সে জেনে গেছে! মেয়েদের পর্যন্ত! একটানা বলে যায়, কানাইকে শোনাচ্ছে না নিজেকে শুনিয়ে বলছে, নিজের কাছে কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে নিজেই ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করছে, ঠিক বোঝা যায় না। নিজের কথা বলতে বলতে সে টেনে আনে ভদ্র জীবনের অজস্র ফাঁকি মিথ্যা ও নোংরামির কথা আর হঠাৎ শুরু করে যৌন-বিজ্ঞান।

পাকার এই পাকামি ছেলেদের কাছে তাকে প্রায় মহাপুরুষ করে দিয়েছে। গোপনে গোপনে কথা তারাও বলে—এত বেশি বলে যে শুনলে বড়রা থ বনে যেত। বড়ো হয়ে মানুষ ছেলেবেলার কথা ভুলে যায়। মেয়ে-পুরুষের রহস্যময় ব্যাপার এবং তার নানারকম বিকার নিয়ে কিছু জানা কিছু শোনা আর বানানো আলাপে ছেলেরা পারিবারিক জীবনের কত দৈন্য আর কৃত্রিমতা যে ফুটিয়ে তোলে! ফ্রয়েডীয় অপব্যাখ্যার বদলে সামাজিক মানে খুঁজলে ভদ্রসমাজকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হত।

পাকার গোপনতা নেই, যেন কৌতূহলও নেই। প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে চুপিচুপি যে আলাপে অন্যের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়, তার দশগুণ নিগূঢ় কথা পাকা নির্বিচারে বলে যায়। যেন, শুধু জানে বোঝে নয়, জানা বোঝারও অনেক উর্ধে উঠে গেছে।

কানাই বলে, নরেশকে নিয়ে এত কথা কেন? ও রকম কত ছেলে আছে।

আছে বলেই তো।

তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

ছেলেরা বিগড়ে যাবে, মাথা ব্যথা হবে না?

যখন তখন কথাটা টেনে আনে। পাকা জবাবে বলে যে কানাই বড় বোকা, এ সহজ কথাটা তুই বুঝিস না কেন ? বোঝে না কানাই। সে বলছে স্বাভাবিক ইচ্ছার কথা। ছেলেদের সঙ্গমের ইচ্ছা, নোংরা ইচ্ছা কি স্বাভাবিক ?

কানাই বলে, হুম। তুই জানিস না কত ছেলে বদ অভ্যাস করে, রোগটা কি ছোঁয়াচে ছেলেদের মধ্যে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পাকা অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকায় কানাই-এর দিকে আরেক চুমুকে কাপটা শেষ করে বলে, জানি। তোর চেয়ে বেশী জানি, ভদ্রলোকের ছেলেদের ওসব কত ব্যারাম আছে। সেই কথাই তো বলচি আমি। ভদ্রলোকদের ওরকম ফ্যাকড়া থাকবেই। কিন্তু চাষাভুষো ছেলেদের ওসব নেই। আমি জানি, ভাল করে জানি। নরেশ তিনু পাঁচুকে ধর। আমায় নিয়ে ওরা কেমন করে দেখিস তো ? কিন্তু নরেশের ভাবটা কি বিচ্ছিরি ? তিনুরটা অন্য রকম, পাঁচুরটাও। তিনু মুখ্যু মুদীর ছেলে, তিনু চাষীর ছেলে, আমি মন খুলে সমানভাবে ওদের সঙ্গে মিশি, আমাকে তাই ওদের ভাল লাগে। ভদ্রঘরের ছেলেরা বাজে, পচা, ওঁচা।

কানাই মাত্র দু'এক চুমুক চা খেয়েছে। পেয়ালায় চা জুড়িয়ে ওপরে পাতলা সর পড়তে শুরু করেছে। তার মুখে নেমেছে কালো গম্ভীর ছায়া, চোখে আগুন। পাকা আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। কানাই-এর এ ভাব সে কখনো দ্যাখে নি।

ভদ্ররা ছেলেবুড়ো পচা বাজে ওঁচা, না ? গত মুভমেন্টটা চালালো কারা ? জেলে গেল কারা দলে দলে ? দেশকে স্বাধীন করতে প্রাণ দিয়েছে কারা, ফাঁসিতে ঝুলেছে ? তুই উজবুক পাকা, উজবুক। চাষাভুষোর ছেলে স্বাধীনতা চায় ? ভাবে স্বাধীনতার কথা ? বোঝে স্বাধীনতা কি জিনিষ, কি করে তা আনতে হয় ? তোর ওই পচা বাজে ওঁচা ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলেরাই—

কানাই-এর গলা চড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাল লাগছিল পাকার দেখতে ও শুনতে। অমিতাভ নাম ধরে ডাকতেই কানাই থেমে গেল।

কানাই, কাল আমার একটা সাইকেল ভাড়া চাই ভাই—সারাদিনের জন্যে।

সাইকেল ভাড়া চাই ? ও। আচ্ছা।

একটু চুপচাপ কাটে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কানাই বলে, চলি।

পাকার সঙ্গ যে তার ভাল লাগে না, সহ্য হচ্ছে না, সেটা একরকম স্পষ্ট ঘোষণা করেই কানাই পা বাড়ায়। তাকেই যেন শুনিয়ে পাকা হাঁকে, বনমালী, আরেক কাপ চা দেবে বাপধন ?

অমিতাভ উঠে এসে তার পাশে বসে।—আমাকে ,ক কাপ খাওয়াবে ভাই ?

কী করবি তুই ? নিজে খাঁটি থাকলেই হল।

না। যতটুকু পারি করব। একটা ছেলেকেও যদি বাঁচাতে পারি সেটা কি কম হল ?

যেমন নরেশকে বাঁচিয়ে মানুষ করছিস ? যতক্ষণ ভালো লাগবে ততক্ষণ পা চাটতে দিবি, খুশি হলে তাড়িয়ে দিবি। এমনি করে যদি ছেলেদের মানুষ কবা যেত, কালীদাকে একটা ছেলে তৈরি করতে এত কাণ্ড করতে হত না।

পাকা বুড়োর মতো হাসে।

কালীদা বেছে বেছে মনের মতো ছেলে নিয়ে ক্লাব করেছেন। একটু দুর্বল ছেলে এলেই সে বাতিল। এই ছেলেদেব কী হবে ? এদের অ্যাব্‌নরম্যালিটি এদের গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে যে ? এদের যদি কিছু করতে পারতেন কালীদা, বুঝতাম।

অমিতাভ শুনছিল। পাকারও তা অজানা নয়। কানাই গম্ভীর হয়ে বলে, এদের জন্যই করছেন কালীদা।

তাই এত বাছবিচার ? এত কড়াকড়ি ?

হ্যাঁ, তাই এত বাছবিচার, এত কড়াকড়ি। তুই ভাবছিস একটি দুটি ছেলের কথা, তোর দু-একজন বন্ধুব কথা, কালীদা ভাবছেন সব ছেলের কথা, সারা দেশেব সমস্ত মানুষের কথা। দেশটাই অ্যাবনরম্যাল, তুই কটা ছেলের অ্যাবনরম্যালিটি ঘুচাবি ?

পাকা চুপ করে থাকে। কানাই বুড়োর মতো কথা বলছে। কালীদার মতো।

কানাই বলে, দেশ স্বাধীন না হলে ভালো শিক্ষাব ব্যবস্থাও হয় না, কিছুই হয় না। বাছা বাছা ছেলে নিয়ে গড়তে পাবলে তারাই দেশকে স্বাধীন করতে পারে। কালীদা তাই—

অমিতাভ, ডাকে, কানাই !

কানাইয়ের গলা চড়ে গিয়েছিল। ভালো লাগছিল পাকার তাকে দেখতে ও তার কথা শুনতে। অমিতাভ নাম ধরে ডাকতেই কানাই থেমে যায় ; চায়ের দোকানে লোক ছিল না তবু কালীনাথের নাম ধরে এত জোরে এ সব কথা বলা উচিত হয়নি, পাকাও বুঝতে পারে। অমিতাভ যেভাবে সতর্ক করে দেয় আর কানাই অপরাধীর মতো থেমে যায়, সেটা আশ্চর্য করে দেয় পাকাকে। সে বুঝতে পারে, কানাই তার চেয়ে বেশি জানে কালীনাথদার সম্পর্কে। এতদিন এটা ঘুণাক্ষরে টের পাওয়া যায়নি।

অমিতাভ বলে, কানাই, কাল আমার একটা সাইকেল ভাড়া চাই ভাই—সারাদিনের জন্য।

সাইকেল ভাড়া চাই ? আচ্ছা।

একটু চুপচাপ কাটে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কানাই বলে, চলি।

এবার আর মনে হয় না অমিতাভ দাদাত্ব করছে। সহজ সাধারণভাবে আলাপ করে পাকার মামাদের কতা জিজ্ঞেস করে, শহরের দু-একটা সাধারণ খবর জানতে চায়। প্রসঙ্গক্রমে জানায় যে কালীনাথের কাছে পাকার কথা সে শুনেছে। নয়নতারা ক্লাবের ব্যাপারটা মন দিয়ে শোনে। তার সঙ্গে অমিতাভের ভাব করার আগ্রহটা পাকা টের পায়। সে খুশি হয়। অমিতাভকে তার ভালই লাগছে এখন ! না লাগার কোন কারণ ছিল না। পনের বিশ মিনিট আগে একজনের একটা ভাব বিরক্তিকর ঠেকেছিল বলেই তাকে আর পছন্দ হবে না, তার কোন মানে নেই।

বাড়ি যাবে না ? চলো একসাথেই যাস কোতোলী পর্যন্ত।

পাকা একটু দ্বিধা করে।

আপনি এগোন।

কয়েক মিনিট করেই সে পথে নেমে যায়, একা।

পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৩, পৃ ৩১২-৩১৪

পাকার সঙ্গ যে তার ভালো লাগছে না, সহ্য হচ্ছে না, সেটা একরকম স্পষ্ট ঘোষণা করেই কানাই পা বাড়ায়। তাকে শুনিয়ে পাকা হাঁকে, বনমালী, আর এক কাপ চা দেবে বাপধন ?

অমিতাভ উঠে এসে তার পাশে বসে।—আমাকে এক কাপ খাওয়াবে ভাই ?

এবার আর মনে হয় না অমিতাভ দাদাত্ব করছে। সহজ সরলভাবে আলাপ করে, পাকার মামাদের কথা জিজ্ঞেস করে, শহরের দু-একটা সাধারণ খবর জানতে চায়। প্রসঙ্গক্রমে জানায় যে কালীনাথের কাছে পাকার কথা সে শুনেছে। নয়নতারা ক্লাবের ব্যাপারটা মন দিয়ে শোনে। তার সঙ্গে অমিতাভের ভাব করার আগ্রহটা পাকা টের পায়। সে খুশি হয়।

বাড়ি যাবে না ? চলো একসঙ্গেই যাই কোতোয়ালি

আপনি এগোন। আমার মনটা ভালো নেই।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩২৯-৩৩১

ফুলের তীব্র সুগন্ধ তার নাকে লেগেছে একটা মনোরম মাদক আঘাতের মতো। সখ বোধহয় নতুনমামীর ননদ বা ভাসুরঝির, নতুনমামী তো থাকেন কলকাতায়। নতুনমামীর ননদ ও ভাসুরঝিদের মতোই আধচেনা, দূর দূর ঠেকছিল মিষ্টি মিহি ফুলের গন্ধটা তার কাছে। এখানকার এই জোরালো গন্ধটা নতুনমামীর মতোই তার চেনা, আপন, নিকট। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি ভুঁইচাপা নিশ্চয় ফুটেছে দেয়ালের ওধারের গাছে, নইলে রাস্তায় এমন গাঢ় হত না গন্ধ তার, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি স্মৃতির মতো, আনন্দ-বেদনার স্বাদের মতো। আশ্চর্য ফুল, ছোট কটি সবুজ কাঁচা পাপড়ি, পাতার আড়ালে কোথায় লুকিয়ে থাকে খুঁজে পাওয়া ভার, ঘন গন্ধে ম' ম' করে চারিদিক। তুলে নিয়ে রেখে দিলে ফুল শুকিয়ে যায়, গন্ধ থাকে দিনের পর দিন। পাকার স্কুলের প্রত্যেক বইখাতার পাতায় চেপ্টে লেপ্টে এ ফুল দু-চারটে থাকেই। বড় ভাল ফুল, রংচং-এর বালাই নেই, তেজি স্থায়ী ঘন গন্ধ, একটুতে মরে পচে গলে যায় না, শুকনো হয়েও গন্ধ বিলোয়।

পরিচয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ ৩৫০-৩৫১

ফুলের তীব্র সুগন্ধ তার নাকে লেগেছে একটা মনোরম মাদক আঘাতের মতো। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি ভুঁইচাঁপা নিশ্চয় ফুটেছে দেয়ালের ওধারের গাছে, নইলে রাস্তায় এমন গাঢ় হত না গন্ধ যে দম নিতে তার কষ্ট হয়। এত প্রিয় এই গন্ধ তার, অভিজ্ঞতা অনুভূতি স্মৃতির মতো আনন্দ-বেদনার স্বাদের মতো।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৩৩৫

তুমি যা বুঝবে কারো বাবার সাধ্য নেই মুখের কথায় তোমাকে তার চেয়ে বেশি বুঝিয়ে দেয়। কার্লমার্কসের যে দর্শন নিয়ে রুশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে, তাতে বলে কর্মশক্তি থেকে চিৎশক্তি আসে। গোড়ায় অন্ধভাবে কর্ম করতে করতে মানুষের চেতনা এসেছিল, সেই চেতনা দিয়ে সে কর্মের সংস্কার করেছিল, এমনিভাবে—

পাঁচু বোকার মত হাসে।

নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজে তুমি যা বুঝবে কারও বাবার সাধ্য নেই মুখের কথায় তোমাকে তার চেয়ে বেশি বুঝিয়ে দেয়।

পাঁচু সংশয়ভরে বলে, কিন্তু মোটামুটি একটা আদর্শ না ধরে, একটা পথ ঠিক না করে—

শ্যামল বলে, কর্ম আর চেতনার সমন্বয়ের কথা ভাবছিলাম কদিন থেকে। আদর্শ আর কর্মের সমন্বয় ছাড়া

শ্যামলও হাসে, বলে, না দাদা, আমিও ভাল বুঝিনা ব্যাপারটা। তবে কিনা কথাটা মনে লাগে।

পরিচয় ফাল্গুন ১৩৫৪, পৃ ১৭১

পথ নেই। বসে বসে আদর্শ নিয়ে শুধু ভাবলে আদর্শ গুলিয়ে যায় ঝোঁকের মাথায় শুধু কাজ করে গেলে কাজ পণ্ড হয়।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু আদর্শ তো থাকা চাই একটা যাতে বিশ্বাস করি ? নইলে কাজে নামব কী নিয়ে ?

শ্যামল একটু চুপ করে থাকে।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৪২৯-৪৩০

ওদের ক্ষেপাকে কে, কিসে ক্ষেপবে ? মুক্তির আদর্শ বোঝার মত শিক্ষাদীক্ষা কই, মনের গড়ন কই ? ওদের অবস্থাই যে ওদের মেরে রেখেছে, পশুর মতো খাটে পশুর মতো থাকে ভাবনা চিন্তা বোধ সব ভোঁতা—বলে, কালীনাথ আমায়...

পরিচয় চৈত্র ১৩৫৪, পৃ ২৩৩

ওদের খেপাবে কে, কীসে খেপবে ?

বলে, কালীনাথ আমায়...

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৪৩২

পাঁচুর বুঝতে অসুবিধা হয না।

পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫ পৃ ৩৪৭

পাঁচুর বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৪৫৭

গগনের বাড়ীতে সাতজন ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে।

পৃ ৩৪৯

গণেশের বাড়িতে সাতজন ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে।

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৪৫৯

কিসের শখ অত ? অহিংসা মার্কা বাবুদের ছেলে তুই না কি ?

পৃ ৩৫০

কীসের শখ অত ?

মা রচনাসমগ্র-৬ পৃ ৪৫৯

সম্পাদকমণ্ডলী

শারদীয় স্বরাজ (১৩৫৪)-তে প্রকাশিত 'ধানের গোলার ধান' গল্পের শিরোনাম চিত্র। এই গল্পটি পরে 'ধান' নামে ছোটবড়ো গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরিশিষ্ট

মূল গ্রন্থের বর্জিত পাঠ

মাটী : মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থে বর্জিত দুটি কিস্তি

জীয়ন্ত : পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থে বর্জিত পাঁচটি কিস্তি

মাসিক বসুমতী ২৫শ বর্ষ পৌষ ১৩৫৩-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় কিস্তি।

মাটী

বটে না কি ? মুচকে হাসে ধরণী, তুমি দেখছি নেতা হয়ে উঠেছ তোবাব। তা হম্বিতম্বিটা ফজলু মিঞার হোতা করলে হত না ? জাতভাই ছিল তারিফ করত ?

গরীব চাষার জাতভাই।

তোবাবের এই কথার পিঠে কথা চাপিয়ে খোঁচা দেবার স্পর্দ্ধায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ধরণী দু'বার গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীব মুখে তামাক টানতে থাকে, তাব ভাবটা এই যে, এতই যদি তেজ তোমাদের, আমার কাছে এলে কেন বাপু ?

এক কাজ কেনে কবেন না বাবু, বাজেন দাস বলে মধ্যস্থের ভঙ্গিতে, দু'আনা মেনে নেন। আপনার কথাও থাক, মোদেব কথাও থাক।

বাজারে যেন দর কমছে জিনিষের।

তোমাব কাছে দু'আনা কিছু না রাজেন দাস, রাখাল বলে, তোমার ভাত খায় কে। ওই দু'আনায় মোদের মবণ-বাঁচন।

নিতে আব কি, সোজা কাজ, তিনু বলে, দিতেই যে শ্বাস ওঠে রে দাদা।

পুলিন বলে, কত্তা যদি দয়া কবেন—

কচকচিতে কাজ কি ? হাকিমের রায় দেবার সুরে বলে ধরণী, হাট না বাজার পেলে তোমরা এটা জিগ্যেস করি ? দরাদবি কোরো না বাপু ধানেব দবে টাকাব সুদে না তো বেড়ার নেও তো নেবে, নয় এসো গে ভালয় ভালয়। সোজা কথা।

এরপর আর কথা কি। মুহ্যমানের মত তারা বসে থাকে। তোবাব ভাবে বাহারনের কথা, ভরা মাসের উঁচু পেটে দু'রোজ অন্ন পড়েনি। চেষ্টা করে উচিত সুদে ধান মিলল না, আবও যদি চেষ্টা করে দেখতে চায়, আরও দু-এক রোজের উপোস কি সইবে বাহাবনেব ? ওর কিছু হলে তখন বিনা সুদে ধান পেলেই বা কি লাভ হবে তার। ভূষণ ভাবে রোগা ছেলেটার কথা, প্রথম বিয়ানী মেয়েটাব কথা, তাকে নিতে কাল জামাই এসে দুদিন থেকে যাবে, সে কথা, রসিক হিসেবী, সে ভাবে, চাব বিঘেব বিশ-বাইশ মণেব আধা দশ-এগার মণ থেকে আবোয়াব আদায় বাদে থাকবে সাত-আট মণ, আগের কর্জ্জা বাবদ যাবে সাড়ে তিন মণ সুদে আসলে, দু-এক মাস বাদে ভিটে বাঁধা না দিলে মরণ নির্ঘাৎ—দেড়বাড়িতে আজ ধান কর্জ্জ নিলে নয় আগেই বাঁধা দিতে হবে ভিটেটা, এখন তো বাঁচবে ফসল তোলা তক্। রাখাল ভাবে, বেশী খেটে, খবচা কমিয়ে, কম খেয়ে নয় পুষিয়ে নেবে বাড়তি সুদটা উপায় কি। তিনু ভাবে, আচমকা লাফিয়ে উঠে তরফদারের টুঁটিটা যদি কামড়ে ধরে, মবণ-কামড় দেয় একেবারে, নিজে মরবে তবু ছাড়বে না এমনি কামড়, তরফদার কি মরবে, না শুধু তার মবণ-খাটুনিই সার হবে ? সবাই ভাবে এমনি ভাবে, ক্ষোভে হতাশায় জ্বলে যায় সবার বুক, এক সুরে অভিশাপ বাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণগুলিতে : মবুক, মরুক তরফদার, শকুনে ছিঁড়ে খাক তাকে।

এতগুলি মানুষের তীব্র প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে এতটুকু অদল-বদল এদিক ওদিক হয় না ধরণীর বার কাছারির আদালতী চাল-চলন ঠমক আর কার্য্যপদ্ধতি। ধবণী তরফদারেব বার কাছারিতে তার বিধান ছাড়া রীতিনীতি নেই, তার চালবাজি ছাড়া গতি। চাষীরা রাজার আদালতও জানে, জোতদারের কাছারিও জানে—একটু বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জানে, প্রজাদের মনে হয় সে যেন খুনি আসামী। ফাঁসির দড়িটা দেবার দিনটা ক'দিন পিছিয়ে দেওয়াই অসীম দয়া হাকিম আর জোতদারের।

ঢিমে তালে কাজ চলে। শ্রীনাথ মাইতি লোচন সরকারের হাতে বৌয়ের মল দুটি তুলে দিয়ে ঠায় বসে থাকে এক ঘণ্টা, তারপর দয়া করে কটা টাকা তাকে দেওয়া হয়, দু'মাসের সুদ কেটে রেখে শতকরা পঁচিশ হিসাবে।

আগের বার আগাম সুদ তো কাটেন নি কত্তা ? শ্রীনাথ নিবেদন জানায় সবিনয়ে।

আগের বার জানতাম সুদ দিতে পারবে তাই কাটিনি, ধরণী তাকে বুঝিয়ে দেয়, আসল টাকাটা এবার মারা যাবে কিনা খটকা আছে বাপধন।

খানিক চুপচাপ মাথা খাটিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে হয় শ্রীনাথের। রূপার মল বাঁধা দিয়েছে, বোধ হয় আর্ধেক দামে। আসল না দিক, রূপার মল দুটো তো থাকবে ধরণীর। তবে তার লোকসানের ভয়টা কিসের ?

মল তবে ফেরত দেন কর্ত্তা,—এক টাকার নোট ক'টা শ্রীনাথ বাড়িয়ে দেয় লোচনের দিকে, মলটা বেচেই দেব সুধী কামারকে, আর বাঁধা রেখে কাজ নেই।

আর হয় না, লেখাপড়া হয়ে গেছে, ধরণী বলে গম্ভীর আওয়াজে, বেচে দিলেই পারতে ? গোড়ায় বললেই হত ?

রাজেন দাস বলে, অনভিজ্ঞ বোকার মতই বলে, শ্রীনাথের পক্ষ নিয়ে ! ভুল করে বাঁধা দিয়েছে, ছাড়িয়ে নিতে চায়।

নিক। উদাসভাবে অনুমতি দেয় ধরণী।

মল ছাড়িয়ে নাও না শ্রীনাথ ? এতো সোজা পথ।—রাজেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু তা তো হয় না। মল বাঁধা রেখে এখুনি যে টাকা পেয়েছে শ্রীনাথ, সে টাকা দিয়ে তো ছাড়ানো যাবে না মল, লেখাপড়া হয়ে গেছে। দু'মাসের সুদের টাকাটা না দিলে ও আইনসঙ্গত আদালতী লেখাপড়া বাতিল হতে পারে না।

উকিলবাবুকে ফি দিলে না শ্রীনাথ, এমন পেটোয়া পরামর্শ দিল ? ওকালতি করলে তোমার ভাল পশার হত রাজেন। ধরণী বলে হাসিখুসী ভরা ব্যঙ্গে, তারপরেই গর্জে ওঠে, যাক্ যাক্। ছিনাথের দু'টো রুপোর মল নিয়ে আমি রাজা হব। লোচন, মল ফিরিয়ে দাও। লেখো যে সুদ সমেত কর্জের টাকা পরিশোধ করায় মল ফেরত দেওয়া হইল। টিপ-সই ছিনাথের যে মল ফেরত পেল, আর তোমাকে বলি ছিনাথ, ফের যদি তোমাকে দেখি এখানে, কান ধরে জুতো মেরে দূর করে দেব।

শ্রীনাথ সকাতরে বলে, মাপ করেন, পা-ধোয়া জল খাই, মাপ করেন।

কিন্তু কেউ আর তাকায় না তার দিকে, গর্জন করে যে হুকুম দিয়েছে ধরণী তা পালন করতে চরম গাফিলতি দেখা যায় লোচন সরকারের, অথচ তার সামান্য একটি ইঙ্গিত মানতে পর্যন্ত সে কখনো ভুল করে না। অগোচরে কোনো ইঙ্গিত বা সঙ্কেতই বুঝি করে থাকবে ধরণী লোচনকে।

অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থেকে শ্রীনাথ তাগিদ দেয়, মলটা দেন। টাকাটা সে বাড়িয়ে দেয়।

খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই লোচন ফ্যাঁচ করে ওঠে, দাঁড়াও বাবু, নুলো বাড়িও না। দেখছ না ভিড় ?

অন্যদের আবেদন-নিবেদনের ফাঁকে কান্নু আর ফকির তাদের প্রার্থনা জানায়, কেউ কান দিচ্ছে মনে হয় না। ধরণী কয়েক মুহূর্ত নির্লিপ্তভাবে তাকায় তাদের দিকে, তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, মনে হয় ধরণী বুঝি শুনছে তাদেব কথা। তেমনি নির্লিপ্ত ভাবেই চোখ ফিরিয়ে নেয় ধরণী। পিনাক সাহস করে সামনে এগিয়ে যায়, মোব একটা বিহিত করেন কত্তা, তুমি ধম্মোবাপ, মশাটারে মারতি নীলামের নুটীশ কেনে, ডাকিযে এক থাপড় দিতেন, তোমার সাথে বিবাদ করে বুকের পাটা কার ?

তুমি কে বটে ? তাকে চিনতে পারে না ধরণী।

পিনাক সামন্ত, হুজুর।

তাকে না চেনা হাস্যকর হত অন্য অবস্থায়, এখানে বেশ মানিয়ে যায়, জোতদার রাজার অবজ্ঞা আর চাষী প্রজার হা-হুতাশ ঠাসা এই কাছারি সভায়।

কৈলেশের বাপ—মহেন্দ্র আরও চিনিয়ে দেয়। মহেন্দ্র ধরণীর লোক, বিশেষ কোন দরকার বা দরবার তার নেই, এমনি এসে বসে আছে একপাশে উঁবু হয়ে, আনুগত্য জানাতে।

তোমার ও নীলামের আমি কিছু জানি না সামন্ত। যা বলার অশ্বিনীকে বোলো।

অশ্বিনী সিকদার ধরণীর কর্মচারী, সে যে হাজির নেই লক্ষ্য করেছিল সবাই। এতক্ষণে সকলের খেয়াল হল যে বেলা হয়ে গেছে অনেক, আবেদন নিবেদন দরবারের ঘটা চলছে রোজকার মতই কিন্তু কাজ বিশেষ এগোয়নি। যা হয়েছে সাদামাটা কাজ, ঘটি-বাটিটা বাঁধা রাখা, সুদ জমা নেওয়া অনুগ্রহ মঞ্জুর পেয়েও যারা ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছে তাদের দু'-একজনের নিষ্পত্তি করা। তোরাবদের দেড়বাড়ি আর শ্রীনাথের মল বাঁধার টাকা থেকে আগাম সুদের টাকা কেটে রাখার প্রতিবাদ ছাড়া কোন বিশেষ বা নূতন নালিশ প্রার্থনার মীমাংসোর রায় দেয়নি ধরণী। সোনার নাকছাবিটি হাতেই আছে জৈনুদ্দীনের। আগামী ফসলের ভাগ বেচে দিয়ে আজই নীলমণি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, পড়তা বা দর কিছুই সে জানতে পারেনি এখনো। ধরণীর সর্ত্তেই আপোষ চেয়ে বসে আছে গড়পা'র বিষ্টু মালিক আর কান্দুলির সোনামুদ্দি সরদার। সর্ত্ত দূরে থাক আপোষ মানবে কি না ধরণী তাও তারা জানে না।

সিকদার মশাই এসবেন না সরকার মশায় ?

এসবে এসবে।

কুয়াসার চিহ্ন নেই বাইরে, শীতের তাজা চনমনে রোদ। নতুন বাছুরটা থেকে থেকে তড়পাচ্ছে সামনের মাঠে, গায়ে যেন তার সাদা লোমের ফেণা মাখানো। বন্যা ঝড় মন্বন্তরে চাকা ভাঙ্গা জীবনযাত্রার চাষাড়ে যানটি প্রায় অচল হয়েছে শোষণ আর অব্যবস্থার পাহাড়ে ঠেকে, এইখানে যাত্রা শেষ কি না, জানে না কেউ, আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত হয়ে আছে বুকগুলি, সর্বদা জ্বলে। ধরণী এই কাছারিতে অন্ন প্রত্যাশা নিয়ে এসে বসে থাকতে থাকতে সমস্ত আশা-ভরসার লেশটুকু পর্যন্ত উপে গিয়েছে ভগবান এবং আল্লাও যেন এই তাজা রোদের উজ্জ্বল সকালে অস্ত গেছেন চিরতরে। তবু কাছাকাছি এসে বসেছে যখন, নিজেদের মধ্যে ধীরেসুস্থে তারা আলাপ করে নিবুত্তেজ শান্ত কণ্ঠে, ধৈর্য্যের যেন তাদের সীমা পরিসীমা নেই। পরস্পরের ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা। ফসলের কথা।

তার মধ্যে অল্পে অল্পে আলাপের বিষয়টা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে রামপুরের ঘটনায়। সকলেই উৎসুক কৌতুহলী হয়েছিল ও ব্যাপারে। অভাব অনটন রোগ শোক দুর্ভাবনার কথা যেন ক্রমে ক্রমে চাপাই পড়ে যায় রামপুরের ঘটনাটার

আলোচনায়। ওই নিয়েই বলাবলি করে সকলে, বন্যা বেশী লোনা করে দিতে পারেনি প্রতাপ দিঘীর জল। দীঘি বলা হলেও আসলে সেটা প্রকাণ্ড একটা বিল, এক ক্রোশ চওড়া দেড় ক্রোশ লম্বা হবে। কবেকার দীঘি, কোন রাজা বা নবাব বানিয়েছিল অথবা প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি করেছে, কেউ জানে না। বিলের চারিদিকে ঘুরলে বোঝাও যায় না মানুষ কোনদিন বাঁধ দিয়েছিল কিনা অথবা এমনিই উঁচু হয়ে আছে বিলের চারিদিকের জমি। বর্ষার জলে থৈ থৈ করছিল বিল যখন সর্বনাশা লোনাজলের বন্যা এল। প্রায় সমতল হল দিকদিগন্তে ছড়ানো অথৈ বন্যা আর বিলের জল, কিছু লোনা জল ঢুকল বিলে, বেশী নয়। পরের বর্ষায় প্রায় কেটে গেল বিলের জলের অল্প লোনা স্বাদটুকু।

ডোবা পুকুর দীঘি ভাসিয়ে সাফ করে নিয়ে গেছে বন্যা। মাছ গিজ গিজ করছে প্রতাপবিলে। মানাজোরের রাজার অধীন বৃষদলের জমিদারের কাছে বিলটা জমা নিয়েছে মদন দাস, সে আবার বিলটা বিলি করে দিয়েছে জেলেদের কাছে মোটা সেলামী আর চড়া বন্দোবস্তে, নগদ পেয়েছে খুব কম, কারণ জেলেদের তখন আধা পয়সা নগদ দেবার সাধ্য ছিল না কয়েকজন ছাড়া। তাতে ক্ষতি বা আপত্তি ছিল না মদন দাসের—নগদ যে বেশী পায়নি সেটা ভাল করেই পুষিয়ে নিচ্ছে।

এদিকে জলের অভাবে ফসল বাঁচে না চারি দিকের শত শত বিঘায়। আগের বছর উর্ব্বরা ক্ষেতকে বন্যা মেরেছে, পরের বছর মেরেছে সুদের দাপট, এ বছর মারতে চাইছে কৃপণ আকাশ, পক্ষপাতী ইন্দ্র। তা' চাষীরা ভাবে কি, দেবতা এক হাতে বজ্রের কারবার করুক, আরেক হাতে করুক অপ্সরাদের বস্ত্রহরণ, তাদের একটু জল পেলেই হয়। লাখো লাখো সবুজ চারা শীষ বিয়োতে উদ্যোগী হয়েও রসের অভাবে বিবর্ণ হতে হতে বাতাসে দুলছে, শুকিয়ে মরবে না মা হবে কতগুলি জীবন্ত দানাব ? বিলের কিছু জল পেলে তারা বাঁচে—বাঁচাতে পারে কয়েক জন মানুষকে।

তাই, চাষীরা চাইল, প্রতাপ বিলের জল কিছু তাদের ক্ষেতে আসুক। মদন দাস বলল, বিল থেকে এক ফোঁটা জল অপচয় হলে হাজার হাজার টাকাব মাছ প্রাণত্যাগ করবে ! জল দেওয়া চলতে পারে না।

চাষীরা বলল, ধম্মোবাপ। এক হাত দেড় হাত জল নামা হলে কি হবে মাছের ? জলের খাজনা নেন, জল দেন।

কিন্তু বিলের মাছদেব প্রতি বড়ই দরদ মদন দাসেব, জল কমিয়ে তাদের অসুবিধা ঘটাতে সে রাজী নয়। তার খাস জমিতে আর তার বর্গাদারের জমিতে বিল থেকে জল সেঁচে দেওয়া হচ্ছে, অন্যের জমিব ফসল নিয়ে তার মাথা-ব্যথা নেই।

সে বলল, জল কি আমার ? জেলেদের জমা দিয়েছি, ওবা জলের মালিক।

মরিয়া চাষীরা এক দিন পাড় কেটে বার করতে গেল জল। জেলেদের দিক থেকে বিশেষ বাধা এল না, মদনের আদায়ের বহরে মাছ ধরে তাদের বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। মাছ ধরার সর্ত্ত ব্যবস্থার অদল বদল চেয়ে বার বার ধর্ণা দিয়ে ফল পায়নি। মদনের ভাগ্নে বীবেন আর চোপীন জেলের উস্কানিতেও কয়েক জন ছাড়া জেলেরা হাত গুটিয়ে রইল। মারামারি হল এক রকম মদনের লোক আর চাষীদের মধ্যে। কিন্তু সরকারী হিসাবে সেটা দাঁড়াল চাষী ও জেলেদের মধ্যে দাঙ্গা। খবরের কাগজে বিপোর্টও বার হল সেই ভাবে।

এ সব জানা কথা। টাটকা খবর হাসপাতালে আহত বীবেনের মৃত্যু আব বলা নেই কওয়া নেই রামপুর ছেড়ে পুলিশের অন্তর্দ্ধান।

তিনু বলে ভূষণ আব তোরাবকে, বিত্তান্ত শুনি নাই সব। চাষী আর জেলেরা না কি একজোট হয়েছে এই মাত্তর খবব।

ভূষণ বলে জৈনুদ্দীনকে, চাষী আর জেলেরা না কি একজোট হয়ে আপোষ-টাপোস কি করে ফেলেছে।

জৈনুদ্দীন জানায় বিষ্টুকে, মিটমাট করিয়েছে বুঝি চাষী জেলেরা একজোট হয়ে—চেপেছে মদনকে। তাই সরে গেছে পুলিশ।

মুখে মুখে জানাজানি হয় যতটুকু জানা গেছে। মুখ মুখে বলাবলি হয় অনুমান।

তা যা বলেছ। গাঁয়ের মানুষকে জোট বাঁধতে দেখলে আর থাকে ?

বাবা ভোলে নাই তো সে সনের শিক্ষে।

চটপট পালিয়েছে ল্যাজ গুটিয়ে। কি জানি কি হয়।

অনুমানটাই স্পষ্ট রূপ নিতে নিতে প্রায় সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে যায় যে রামপুরের চাষী আর জেলেদের জোট বাঁধতে দেখে পুলিশ ভয়ে সরে পড়েছে গাঁ থেকে।

তার পর আসে অশ্বিনী। গাঁয়ে পুরোনো র‍্যাপার, মাথায় কানঢাকা গোল উলের টুপি, মোজাপরা পায়ে ধুলিধুসর চটি জুতো। মানুষটা রোগা, মুখ একটা যাতনা ভরা বিমর্ষতার চিরস্থায়ী ছাপ।

তাকে দেখেই সাগ্রহে শুধায় ধরণী, হল ?

—না বাবু।

শুনে বিমর্ষ হয়ে যায় ধরণী।

নিজের যায়গায় বসে অশ্বিনী, ধরণীর ডান পাশে সামনের দিকে অল্প তফাতে, তার দিকে পাশ করে। এ ভাবে বসে কাজের সুবিধা হয়। বাঁয়ে মাথা ঘোরালে ধরণীর সঙ্গে মুখোমুখি হয় অথচ মুখটা প্রায় চোখের আড়াল হয় উপস্থিত লোকদের, ডাইনে মুখ ঘোরালে মুখোমুখি হয় ওদের সঙ্গে। ধীরেসুস্থে ঢিমে তালে প্রায় যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই সে চটপট কাজ সারে কোন বিষয়ে তার দ্বিধা সংশয় নেই। মাঝে মাঝে কিছু বলার আগে হয় তো দু-একটা কথা বলে নেয় ধরণীর সঙ্গে, হয় তো শুধু একবার তাকিয়ে নেয় চোখে চোখে।

নীলমণি মিনতি জাগায়, সিকদার মশায়, আইজ বেলাবেলি রওনা না দিলে মারা পড়মু।

অত তাড়া কেন হে বাঙ্গাল, অশ্বিনী বলে টেনে টেনে, বেলা যায় নাই। দেন তো ওর হিসাবটা মিটিয়ে সরকার মশায়। চার দেড়ে দু'মণ, তিনের দরে আঠার টাকা। কাটাই মাড়াই খরচ খরচা বাদে চোদ্দ টাকা দেন রসিদ নিয়ে।

ইটা কি কন ? নীলমণি বলে ভড়কে গিয়ে, বিঘায় দেড় মণ ধবলেন আধা ভাগ, পাঁচ-ছয় মণ ফসল হয় ? দব দিলেন তিন টাকা, বার টাকা তের টাকায় ধান বিকায়।

তোমার দেখি মাঠে ফসল গোঁফে তেল। অশ্বিনী বলে, ভগবান না কি তুমি পাকতে পাকতে কিছু হবে না ফসলেব জেনে রেখেছ ? দর কি দাঁড়াবে তাও জেনেছ / ঠিকানা রেখে যাও, ধান বেশি হয়, দর বেশী হয়, পাওনা টাকা মনিঅর্ডারে পাবে।

পাবে কি ? সেই তো ভাবনা নীলমণির।

হাসপাতাল হয়েই বাড়ী ফেরে ভূষণ। এক ক্রোশ দূরে বৃষদলের হাসপাতাল, একটি পাকা ঘব ও একটু চালা। ওষুধ বা পরামর্শ কিছুই পাওয়া গেল না, সময় পার হয়ে গেছে। আটটার আগে না এলে ও-সব মেলে না।

বেদম জ্বরটা ছাড়ছে ডাক্তাব বাবু, বড় বেশী রকম ছটফট করছে—

কাল এসো, কাল।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে ভূষণ মড়া-কান্না শুনতে পেল। কয়েকটি স্ত্রীলোকেব গলাব মধ্যে তাব বৌয়েব গলাটি সব চেয়ে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট।

[ক্রমশ]

'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জীয়ন্ত' উপন্যাসের শেষ পাঁচটি কিস্তি অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, পৌষ ১৩৫৫, মাঘ ১৩৫৫, ফাল্গুন ১৩৫৫, চৈত্র ১৩৫৫, যা মূল গ্রন্থে বর্জিত হয়েছিল, সেগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া হল :

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

দু'কলির মা মৃদু উঁউঁ উঁউঁ সুরে কাঁদছিল। তার মধ্যেই ঝগড়াব সুরে ঝেঁঝে বলে, দরদ দেখিয়ে কাজ নাই তোব, শতেকখোয়ারী। চটপট যা দিখি তুই, চোখের আড়াল হ। ধড়ে মোর প্রাণ আসুক।

মেয়েকে ভাগাতে পারলে সে বাঁচে। যার জন্য এত কাণ্ড, সর্বনাশের এত তোড়জোড় করে আগমন, তিল থেকে তাল, সে বাঁচলেই এখন সবদিক রক্ষা হয়। দু'কলি কিন্তু হাবা নয়, সে জানে তার মায়ের ছেলেবেলায় এসব ব্যাপার যে ভাবে ঘটত মোটেই সে ভাবে তাকে নিয়ে এ ব্যাপারটা ঘটছে না। সে দিনকাল আর নেই। সরলা আজও বেঁচে আছে, গাঁয়েই আছে। মেজকর্তার বড় ভাই, নীচেব অঙ্গ অবশ বলে চাকাওলা গাড়ীতে বসিয়ে চাকরেরা যাকে বাবুদের দীঘির চারদিকে হাওয়া খাওয়াত শিশুকালে দুর থেকে দু'কলি দেখেছে, সরলাকে সে প্রথম বয়সে হরণ করেছিল। মা-মাসীর কাছে সে কাহিনী শুনেছে দু'কলি। বাড়ীর মেয়ে বৌ বড়কত্তার নজরে পড়লে আর তাকে বাঁচানো যেত না। মেয়ে বৌ নিয়ে যে পালিয়ে যেত সে যেত, অন্যে সাময়িক রোগব্যারাম দুর্দৈবের মত চুপচাপ মেনে নিত অদৃষ্টের ফের বলে, সামাজিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাবার ভয়ে টুঁ শব্দটি করত না। জানাজানি হোক, ঘোট না হয়।

—হাঁ মা, সে কি রকম রে ? জানাজানি হলে একঘরে করত না ?

—কে করবে বল, কার অত বুকের পাটা ? মাংস ভোগ পেয়ে বাঘ সদয় রয়েছে, যে গোল পাকাতে যাবে তাকেই থাবা মারবে না ! তাইতো সবাই জানত, সমাজ জানত না।

তবে বাপ-ভাই গোল করলে ঘোঁট হত এবং তখন সমাজ বাধ্য হয়ে মানত যে হ্যাঁ, এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যার সামাজিক বিধান দরকার। ফলে, বাপ-ভাই-এর কপালে বড়কর্তার গুঁতোও জুটত, সামাজিক শাস্তিও জুটত।

প্রতাপ যে তখন বেশী ছিল তা নয়, গরীব প্রজার জোট ছিল না। সরলার বাপ ছিল খানিকটা গোঁয়ার, পালিয়ে না গিয়ে সে দশজনকে জোট বাঁধিয়ে গায়ের জোরে বড়কর্তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অতটা বাড়াবাড়ি করতে কেউ সাহস করে নি, গোপনে পরামর্শ করে একটা কায়দা করে চাল মেরে বাজী মাৎ করতে চেয়েছিল। রাতারাতি হারাধনের ছেলে বটুকের সঙ্গে সরলার বিয়ের ব্যবস্থা স্থির করে শেষরাতে দুবাড়ীতে শানাই-এর বাজনা সুরু করেছিল, সকাল থেকে বিয়ের সমারোহ। প্রকাশ্য সামাজিক শুভকর্ম, গাঁ-শুদ্ধ লোকের চোখের সামনে ঘটছে, হাঙ্গামা করতে বড়কর্তা ভরসা পাবে না।

সন্ধ্যার পরে বিয়ে হতে যাবে, ঘাটের মড়া যদুকে বর সাজিয়ে বড়কর্তা কনের বাড়ী হাজির। নিজে দাঁড়িয়ে বটুকের বদলে যদুর সঙ্গে সরলার বিয়ে দিল, বাজনা বাজিয়ে মহা সমারোহে বর-কনে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির বার-মহলে তুলল। সিঁড়ির নীচের ঘরে পাটিতে শুয়ে যদু সারারাত কাসল, দোতলায় কনের সাথে বাসর যাপন করল বড়কর্তা।

তারপর সরলা যদুর ঘরে ফিরে গেছে। যদু বছরখানেক বেঁচে ছিল। যদু যতদিন বেঁচে ছিল চাষী সমাজ সামাজিক ভাবে তাদের বর্জন করেছিল। যদু মরলে কেউ পোড়াতে এগোয় নি। কিন্তু যদু মারা যাবার পর সরলার সম্পর্কে নীতি বদল করেছিল। তাকে সমাজ গ্রহণও করে নি, বর্জনও করে নি। পীতাম্বরের বাড়ীর কাজে তাকে ডাকা হয় নি, কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে নিজেই যেন যায়, না ডাকা হলেও যেন যায়। সেই থেকে এই অদ্ভুত নিয়মটা চলে আসছে। কোন সামাজিক ব্যাপারেই সরলাকে ডাকা হয় না, সে যেচে যায়। গেলে তাকে বাদ দেওয়া হয় না।

আজ আর সেদিন নেই। দু'কলিকে নিয়ে সুরু হয়ে থাক, প্রতিহিংসা তাকে বা তার মা-বাপকে ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাপার আর তাদের ঘরের নয়, ছোট পাড়াটিরও নয়, গাঁয়ের সারা চাষী-সমাজের। রাজায় প্রজায় ঠোকাঠুকি। চাষীর ঘরের অল্পবয়সী মুখ্যু মেয়ে সে, সেও এটা টের পেয়ে গেছে। এখন আর সবার বাঁচা-মরা তার বাঁচাতে নয়, মরাতেও নয়। কিছু মানুষের হাড়গোড় ধাড়মাথা চুর না হয়ে, কয়েকটা চালা না পুড়ে এর শেষ হবে না।

শাকের ক্ষেতে মাকে রেখে পালিয়ে যেতে প্রাণটা তাই ছিঁড়ে যায় দু'কলির। মনে হয় এই বুঝি শেষ বিদায়। কনে সেজে দোলায় চেপে হেসে কেঁদে কত মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যায়, কবে ফিরবে দিনপ্রহর গোনে, গাঁয়ে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে সে চোরাই মালের মত খিড়কি দরজা দিয়ে চালান হয়ে যাচ্ছে বনবাদাড়ে। কেন, কি সে অপরাধ করেছিল কার কাছে ? কি অপরাধ করেছিল তার ঘরের লোক গাঁয়ের মানুষ ?

ওদিকে কলরব বাড়ছে শোনা যায়। আতঙ্কে পাগল হয়ে দু'কলির মা গাল দেয় মেয়েকে—তবু দৌড়িয়ে ঢং করছিস, বাপখাকী তোর মরণ নেই ? নাগাল পেলে দশটা ডাকাত যে ছিঁড়ে খাবে লো তোকে !

তা বটে। অত্যাচারের সে বীভৎস রূপ তাদের শুধু কল্পনা নয়। ওর চেয়ে মরণ ভাল। গুঁইরামের ছেলের বৌকে আমবাগানেই ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল, সকালে সে আর ঘরে ফেরে নি। কুয়ায় ঝাঁপ দিয়েছিল।

দু'পা এগোতেই ঝোপঝাড় বাঁশবনের আড়াল, পায়ে পায়ে অস্পষ্ট পথের রেখা। ওদিকে কলরব বাড়ছে, যার অর্থ গাঁয়ের লোক, গাঁয়ের চাষাভূষো, পাড়ার লোক, ঘরে ঘরে লুকিয়ে না থেকে এসে জমছে। নিজেদের মধ্যে কলরব করছে অথবা আগন্তুকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি জুড়েছে যে আচমকা এত অনুগ্রহের কারণ কি, গাছপালার আড়ালে দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে সেটা ধরা কঠিন।

—কাকা, বাধবে ?

জ্ঞানদাস মাথা নাড়ে।

—বলা কি যায় ? সবে তো সুরু, কোনদিকে গতি নেয় এখন। তবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নেই, আওয়াজ উঠেছে। লোকে খুব বেশী সইবে নি।

—তখন কিন্তু মোটে সইত না।

পাঁচু একুশ সালের কথা বলে। সাত বছর আগের কথা, পাঁচু তখন বালক। যেটুকু নিজে দেখেছিল, শুনেছিল এবং বুঝেছিল তা খুব সামান্য, জ্ঞানদাস নানা ব্যাখ্যা নানা কাহিনীর মধ্যে এতকাল বুঝিয়ে শুনিয়ে না এলে ক্ষীণ একটা স্মৃতি হয়েই থাকত। পাকা ঝোঁকের মাথায় এসে ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে যাবার সময় নানা স্মারক-চিহ্ন দেখিয়ে আটুলি গাঁ'র চাষাভূষো সমাজের অদ্ভুত লড়ায়ের যে সব কাহিনী সে তাকে শুনিয়েছিল, সবই জ্ঞানদাসের কাছে শোনা। এই ধারণাই তার মনে গাঁথা হয়ে আছে যে ওপরওলা দল বেঁধে অন্যায় করতে এলেই তার গাঁয়ের চাষাভূষো সমাজ দল বেঁধে তাদের নস্যাৎ করতে নেমে পড়বে।

জ্ঞানদাস বলে, আরে পাগলা, তখন আর এখন কি ফারাক ব্যাপারটার ? তখন বলে না এখন বলে না, সে ব্যাপার এ ব্যাপার আলাদা।

চলতে চলতেই ইতিহাস ব্যাখ্যা করে জ্ঞানদাস। ইতিহাস কি রকম দু'রকম ঘটনা আশ্রয় করে চলে। তার একটা হল বাঁচন মরণ সব জড়ানো সর্বাঙ্গীন ব্যাপার, ভবিষ্যতের ভালমন্দের ব্যাপার, ভবিষ্যৎ নইলে আর কি করে বাঁচা মরার ব্যাপার সর্বাঙ্গীন হয়, কাল মরতে হলে আজ বাঁচাই বা কি মরাই বা কি। আরেকটা হল, ছাড়া ছুটকো আলাদা মত ব্যাপার।

—সীতাহরণ ধর না কেনে।

রামরাজ্য রাবণরাজ্য একসাথে চলে না, একটা রেখে আরেকটা নস্যাৎ করায় জীবন বা মরণ। তা, রামরাজার অযোধ্যার রাজপুরী থেকে সীতাকে রাবণ হরণ করে নিলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত, রাম মরত কি রাবণ। যেই মরুক, প্রজার হত মজা, শ্রাদ্ধে মণ্ডা মিঠাই ভোজন পেত। রাবণ যে সত্যিকারের পাপী হবে সেজন্য আগে রামের বনবাস, একদম সর্বহারা হয়ে জঙ্গলে গিয়ে হাড়িডোমের চেয়ে ছোট হয়ে কুঁড়ে বাঁধা। ওই কুঁড়ে থেকে সীতাহরণ হল বলে না জগৎ সংসারের গরীব প্রজারা প্রাণ খুলে অভিশাপ দিল রাবণকে, তার মরণ চাইল—আজও অভিশাপ দেয়, মরণ চায়।

—তার মানেটা কি বল্ দিকি ?

—তুমিই বল না।

জ্ঞানদাসের মতে, তার মানে হল এই যে, গরীবের কুঁড়ে থেকে লক্ষ্মী গায়ের জোরে হরণ হল, সকলের বাঁচন-মরণের সমস্যায় জড়িয়ে গেল। সীতাকে যদি রাবণ হরণ করে, তোমার আমার ঘরের লক্ষ্মী হরণ করতে কতক্ষণ ? প্রতিকার যদি না হয় সীতাহরণের, কিসের ভরসায় ঘর বেঁধে সংসার করা ?

—দু'কলির বাপ কি রাজা, না ওদের ঘরটা রাজপুরী ?

জ্ঞানদাস এর জবাব দেয়। বলে, কোনো কথার মর্ম বুঝতে শেখেনি পাঁচু, শুধু তর্ক শিখেছে এই তো আপশোষ। অন্যায় বল অত্যাচার বল সবাই যাতে দাঁড়িয়ে আছে তাতে যদি ঘা না লাগে তবে সবার টনক নড়বে না। কিন্তু অত্যাচার কি হলেই হল, সবার জীবনের ভিত্তিতে আঘাত লাগলেই হল ? সবার সেটা টের পাওয়া চাই না ? অনুভব করা চাই না ? সীতা শুধু সীতা নয়, রামচন্দ্রের বৌ নয়, সবার সে ঘরের লক্ষ্মী। আগে জন্মালে এই জ্ঞান, তবে না জগৎ সংসার একবাক্যে ধিক্কার দিল রাবণকে, অভিশাপ দিল। চাষীর মেয়ে আগেও হরণ হয়েছে। ভয়ে না হয় লোভে চাষী জুলুম মেনে নিয়েছে, সয়ে গেছে। যে মানেনি সেই বা কি করেছে ?—

—বলেছে, আমার এই বিপদ গো, তোমরা এসো ! আমার বিপদ তো সবার কি ? দশজনে আপশোষ করলে, চুকে গেল। নিজেই যদি না জানলাম বুঝলাম এ জুলুম মোর একার পরে নয়, জানতে বুঝতে গবজ পড়েছে দশজনার ! এ যদি সবাই জানত এটাও আসলে জুলুমবাজীর রকমফের, আসলে সবি বলাৎকার—ক্ষেতের ফসলে বা ঘরের মেয়েতে—অ্যাতক্ষণে আগুন জ্বলে যেত একুশ সালের মত, তেমনই ক্ষেপে যেত মানুষ।

তাই, পাঁচু যেমন আশা করছে অত সহজে বাধবে না। জ্বালা কারো কম নয়, একুশ সাল থেকে সাত বছর প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে জমাট ক্ষোভ বেড়েছে বই কমে নি। কিন্তু হলে কি হবে, জ্ঞানের সে পলতে যে নেই যা এই সব ছাড়া ছাড়া ব্যাপারের আগুন সেই জমাট করা বারুদে নিয়ে পৌঁছে দেবে। সহ্যের সীমা কি ছাড়িয়ে আছে আজ, বহুযুগ থেকে। অসহ্যেরও সীমা ছাড়িয়ে গেছে, নয় তো গান্ধীজির অত নরম ডাকে এত জ্বালা ফেটে পড়ল কি করে, গাঁগুলি ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজ-শাসন নস্যাৎ করতে লড়াই চালাল যখন কংগ্রেস থেমে গেছে তখনও ? কিন্তু সে হল ওই সবার সব-জড়ানো বাঁচন-মরণের ব্যাপার নিয়ে পাগল হওয়া, আজের নয় কালের নয়, চিরদিনের বাঁচন-মরণ। ভয়ভাবনা ভুলিয়ে নিমেষে উন্মাদ করে দিতে পারে এত ক্ষোভ বুকে নিয়েও দু'কলিকে নিয়ে আজকের হাঙ্গামায় গোড়ার দিকে আঁটুলিগাঁর চাষাভুষো মানুষ ভয় পেয়েছে, বিরক্ত হয়েছে। এ আবার কি বাড়তি বিপদ ঘাড়ে চাপল ! সবাই চাইবে যত সহজে ঝঞ্ঝাট মিটে যায়, যত অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই মেলে। তবে আজ যদি আবার নতুন করে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, অত্যাচারের দাপটে যদি সবার মনের এ-ব্যাপারকে পৃথক বিচ্ছিন্ন ভাবটা ঘুচিয়ে দেয়, ওরাই যদি পলতে দিয়ে জুড়ে দেয় আজকের রাগের আগুনের সঙ্গে বুকে বুকে জমা করা চিরদিনের বারুদ-গাদা—

—তা দেবে নি কাকা ? এমনি এয়েছে কষ্ট করে ? এত তোড়জোড় মিছে করবে ?

—কি জানি। মোদের নাখান বোকা তো নয়, ওরা ভারি চালাক, ভারি চতুর। মোদের ধাত যদি না জানবে তবে পায়ের নীচে দাবিয়ে কি করে রেখেছে বল ? তবে মাথা ওদের গরম বটে, ভারি গরম। কিন্তু কি জানিস বাপ।—

জ্ঞানদাস একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মুখ দেখে পাঁচু আর দু'কলি দু'জনেই নিশ্বাস রোধ করে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে।

—কি জানিস পাঁচু, ওই ভরসা করতে মোর বুক ফেটে যায়। এর চেয়ে মোদের আর বড় লজ্জা কিসে আছে ? মোদের রাগাতে, মোদের চেতন করাতে আশা করব ঘরের চালাতে আগুন দিক, ক্ষেতের ফসলে ঘরের মেয়েতে বলাৎকার

হোক। কেন, মোরা মানুষ নই ? ঘরপোড়া গরু সেও সিঁদুরে মেঘ চিনতে পাবে, এত পোড়া খেয়েও মোদেব ফের আগুনে না দঞ্চালে চেতন হয় না ?

আবার তারা চলতে আরম্ভ করে। বৃষ্টিতে এখনো গাছের পাতা ভিজে আছে, পায়ের নীচে মাটি নরম। গাছপালার আড়ালে চোখে পড়ে পুবো দমে চাষের কাজ সুরু হয়ে গেলেও ক্ষেতে এখন চাষীরা বেশী নেই। হাঙ্গামার খবর পেয়ে সবাই গাঁয়ে ছুটে গেছে।

নীরবে কয়েক পা এগিয়ে জ্ঞানদাস আবার নিজের কথার জের টেনে বলে, এই কথাটাই বলছিলাম তোদের গোড়া থেকে। শুধু দু'কলিকে নিয়ে সোরগোল করিস না, ঘটনাকে শুধু ঘটনা রাখিস না। সবাইকে টের পাইয়ে দে আজ এ অনাচাব সইলে পরে কাল ফসল যাবে ক্ষেত যাবে মান যাবে প্রাণ যাবে। তা, দশজনার ধাত বুঝে তোরা কি চলবি !

দু'কলি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে মুখ খোলে।

—মোরা চলেছি কোথা ? যমের বাড়ী ?

জ্ঞানদাস বলে, হাঁ, ঠিক কথা। পাঁচু তুই ওকে নিয়ে সিধে ঘনাদা'র বাড়ী চলে যা। মোর কথা শুধোলে বলবি—পারি তো ওবেলা আসব, নয় তো কাল।

ঘনশ্যাম জ্ঞানদাসের বিশেষ বন্ধু। পাশের নটুবনী গাঁয়ে বাড়ী সামান্য চাষবাসের সঙ্গে গুড় তৈরী করে বেচে সংসার চালায়। দুই বিয়ে, মস্ত সংসার, শান্ত গোবেচারী মানুষ।

—তুমি যাবে না ? পাঁচু শুধায়।

—মোকে গাঁয়ে ফিরতে হবে পাঁচু।

এবার পাঁচু চটে গিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

—মোকে ভাগিয়ে দিয়ে তুমি মজা লুটবে মতলব করেছ, না ?

—মজা লুটব ? মজা লুটব কি রে পাগলা ?—জ্ঞানদাসের হাসি পায়—ছেঁচে গিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে মজা লুটব !

বলেই জ্ঞানদাস টের পায় কথাটা ভুল করে বলে ফেলেছে। গাঁয়ের অবস্থা কত গুরুতর আর গাঁযে ফেরা তাব পক্ষে কত দরকার বুঝিয়ে বলতে গিয়ে গোঁয়ার ছোঁড়াটাকে একেবারে চরম মজা লুটবার লোভটাই দেখিয়ে বসেছে।

তুমি নে যাওনা উয়াকে ঘনাদার বাড়ী ?

বলে পাঁচু প্রায় দৌড় দিয়েছিল আঁটুলিগাঁর দিকে, জ্ঞানদাস থাবা বাড়িয়ে খপ কবে তাকে ধরে ফেলে। ছাড়া পাবাব জন্য পাঁচু টানা হ্যাঁচরা সুরু করলে তাব গালে একটা চড়ও বসিয়ে দেয়।

—কথা শোন্ পাঁচু। থিব হয়ে কথা শোন্।

কথা ? বেশ বলুক জ্ঞানদাস কি বলার আছে, কথা শুনতে পাঁচু রাজী আছে। কিন্তু ফাঁকি চলবে না পাঁচুর সঙ্গে, কথায় ভুলিয়ে ফাঁকতালে তাকেও যে জ্ঞানদাস দু'কলির সঙ্গে গাঁয়ের বাইরে চালান করে দেবে, তা চলবে না। ছেলেব দল হয় তো ওদিকে তাকে ইতিমধ্যেই ধিক্কার দিতে আরম্ভ করেছে।

—তোর চেয়ে মোর গাঁয়ে ফেরা জরুবী পাঁচু। হাঁ কি না ?

—হাঁ। তাই কি ? মোর ফেরা জরুরী নয় ?

—এ মেয়াব দায়িক তুমি। একে ঘনাদা'ব ঘরে পোঁছে দিলে তোমার ছুটি। তাবপর যা খুশি কর, যেথা খুশি যাও।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি অনুসরণ করে পাঁচু দূরে তাকিয়ে দেখতে পায় কতগুলি তালগাছের মাথার পাশ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া আকাশে উঠছে। এটা চোখে পড়েছে, তাই আচমকা জ্ঞানদাসের এত গাঁয়ে ফেরার তাগিদ !

—কি বলিস্ ?

—বেশ !

জ্ঞানদাস একমুহূর্ত দাড়ায় না। লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে যায়। মনে হয় দৌড়চ্ছে।

পাঁচু ব্যাকুল হয়ে বলে, পা চালিয়ে চ দু'কলি, অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

দু'কলি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, বড্ড বোঝা ঘাড়ে চেপেছি, না গো ?

—এটা তোর রাগারাগির সময় হল ?

—কিসের রাগারাগি ? দু'কলি ফোঁস করে ওঠে, বলছি কি যে তোমাব খুড়োর ওই ঘনাদা'র ঘর ছাড়া কি মোব ঠাঁই নাই ? ঘাড়ে করে অদ্দুর কেন নিয়ে যাব !

—কোথা যাবি ?

—মোকে বোকা বাগ্দীর ঘরে রেখে তুমি ফিরে যাও।

কথায় বলে বামুন-বাগ্দী। গ্রামের জীবনের চরম এদিক চরম ওদিক। ঠাকুর ঘর আর আস্তাকুঁড়। গাঁয়ের সমাজের যত কড়া মোটা নোংরা খাটুনি, ঘরের দেয়ালের মাটি ছানা থেকে ক্ষেতমজুরি, জঙ্গল কাটা থেকে লাঠি ঘাড়ে দাঙ্গা করা,

তার জন্য এত শস্তায় খেটে মরবার লোক আর মিলবে না। গত কাল সারা দুপুর বোকা ম্যালেরিয়ার দাপটে কেঁপেছে আর জ্বরের ঘোরে বেঁহুস হয়ে থেকেছে। এখন কাঁথা জড়িয়ে দাওয়ায় বসে ধুঁকছিল।

শুধু বোকা বাগ্দী নয়, বাগ্দীপাড়ার মরদরা প্রায় সকলেই পাড়ায় জমায়েৎ।

পাঁচু আশ্চর্য হয়ে বলে, মেজকর্ত্তা ডাকেনি তোমাদের ?

বোকা মুখ বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে চেয়ে বলে, মোদের ডাকবে ? বন্দুক বাগশন* লাঠির ব্যাপারে মেজকর্ত্তা মোদের ডাকবে ? সুরোর মা সেজে গিয়ে মেম ডাইনী নাড়ী কার্টেনি মেজকর্ত্তার।

পাঁচু বলে, অ।

গায়ের কাঁথা ঝেড়ে ফেলে বোকা খিঁচিয়ে ওঠে, বুঝে গেলে সব ? মেজকর্ত্তা কেন ডাকে নি আন্দাজ করে ফেললে ?

পাঁচু জবাব দেয় না। কোমরে তার ছোট এক দলা দা-কাটা কড়া তামাক ছিল, দুপুর বেলা ডোবার ধারে বাঁশ বনের ছায়ায় নতুন নেশার আমেজটা তার ভারি জমে। তামাকের গোলাটা বার করে দিয়ে সে বলে, তামুক খাও বোকা।

বোকার বৌ বানশী বাঁশ ও শ'লের বাড়তি ডালপালার কুঁড়ে ঘরটার অন্দরে ছিল, প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এসে তামাকের দলাটা ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। খানিক পরে বেরিয়ে এসে জ্বলন্ত কলকেটা পাঁচুর দিকে বাড়িয়ে দেয়। তামাক সেজে টান দিয়ে বানশী একেবারে ধরিয়ে এনে দিয়েছে।

তামাক টানার কঠোর আরামটুকুতে চোখের পলকে বোকা যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, নিমেষে তার মেজাজ শুধরে যায়।

বলে, ইসব ব্যাপারে কর্ত্তা মোদের ডাকতে নারাজ। লাঠি হাতে দেঁড়িয়ে রইব, ঘাড় মাথার বদলিতে ভুঁয়ে মাচায় লাঠি পিটব, লুটের বেলা ভাগ বসাব, কাজ কি বাবা মোদের ডেকে!—ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বোকা হাসে,—মোট কথা কি, খাজনা বন্ধ, মেয়েছেলে চুরি, ইসব ব্যাপারে গরীব দুঃখী পেরজা ঠেঙাতে কর্ত্তা মোদের পরে ভরসা রাখে না। মোরা নাকি মায়া করি, বেয়াৎ করি হুটে আসি ! ফাঁকি লাগাই।

—লাগাও নাকি ?

বোকার মুখে মেঘ নেমে আসে।

—ফাঁকি ? ফাঁকি মোরা জানি না গো। ও বিদ্যে শিখি নি। বুখে এসে মারতে এলে মোদের লাঠি কথা কয় বাগ্ডা বক্তে চান করে। মেজকর্ত্তা চায় যে নিরীহ জনার মাথা ফাটাও। বুড়া হোক মাগী হোক বাচ্চা হোক যাকে পাবে তার মাথায় লাঠি চালাও। বাপ্ রে বাপ ! তা করলে বক্ষে আছে ? এ অপকম্ম লাঠির সয়, না, হাতের সয় ? যে তোকে মারতে আসেনি এক ঘা তাকে মার দিকি, লাঠি তোর নরম হয়ে বেঁকে যাবে, হাত পক্ষাঘাতে অবশ হবে।

পাঁচু বলে, বোকা মোকে এবার যেতে হচ্ছে। এ মেয়াটাকে তোমার জিম্মা করে দিয়ে যাই। ওর ভালমন্দের দায়িক তুমি।

বোকা সায় দিয়ে বলে, মোরা ব্যাপার জানি গো।

পাঁচু বলে, একটু সাবধানে রইবে বোকা। ও যে হেথা আছে জানাজানি হলে—

দু'কলি এবার ফোঁস করে ওঠে, মাতব্বরি রাখো দিকি। বোকা জানে না ?

—আমি তবে কেটে পড়ি ?

—এসো গে যাও।

ফোঁস করে ওঠা ঝাঁঝালো গলা নিমেষে জুড়িয়ে ভারি হয়ে গেছে। আপন জনকে চিরতরে বিদায় দিতে মা বৌদের যেমন চোখ সজল হবার আগে গলা ভিজে যায়। মেয়েছেলে তো।

—একটা কথা শুনে যাও।

পাঁচু কয়েক পা এগিয়েছিল, ফেরে না, দাঁড়ায়। দু'কলি এগিয়ে কাছে যায়। মেয়েছেলে তো।

—গোঁয়ার্তুমি করবে না বল ?

—ঢং জুড়লি নাকি ?

—ঢং কি আবার ?—তিরস্কার ভরা চোখে দু'কলি তাকায়, যা খুশি কর না তুমি, মোর বয়ে গেল। শুধু বলছি কি, মাথা তোমার গরম কিনা, মাথাটা ঠাণ্ডা রেখো। সস্তায় প্রাণটা নিতে দিও নি। হলেই বা চাষার ছেলে। প্রাণটা তো কেউ কিনে রাখে নি তোমার ?

পাঁচু বলে আঁ ? কি বলছিস ?

—তোমার খুড়োই বলছিল। মোর কথা নয়।

—অ।

দু'কলিকে জ্ঞানদাসের সুরে কথা বলতে শুনে পাঁচু সত্যিই থ' বনে গিয়েছিল। ব্যাপার বুঝে সে স্বস্তি পায়। কিন্তু দু'কলির বক্তব্য না শুনে চলেও সে যেতে পারে না। এমন সহজ সরল বোধগম্য স্পষ্ট ভাষায় দু'কলি কথাগুলি বলছে।

—ফাঁকির কথা নয়। আজ দিনে কি জগৎ সংসার ফুরিয়ে যাবে ? মেজকত্তার সেপাই পুলিশ কাল থেকে বইবে নি ? হাঙ্গামা হবে নি আর ? তুমি তেড়েমেরে গিয়ে পরাণটা দিলে সব ঝঞ্ঝাট চিরতরে চুকে যাবে ?

পাকা যদি এখন এভাবে এইখানে বোকা বাগ্দীর ঘরের কাছে পচা ডোবার পেছন মাটির তালে দাঁড়িয়ে দু'কলিকে এসব কথা বলতে শুনত ? পাঁচুর হঠাৎ এই উদ্ভট কল্পনাটা মাথায় আসে। বিজ্ঞান [বিধান] বুদ্ধিমান শত্রুরে বন্ধু পাকাকে মনের আষ্টেপৃষ্ঠে কি ভাবেই সে বেঁধেছিল !

দু'কলি আবার বলে, ঝোঁকের মাথায় পরাণটা দিলে কি কচু হয় ?

পাঁচু জবাবে বলে, গুঁতো সয়ে লাথি সয়ে কেঁদে ককিয়ে পরাণটা টিকিয়ে রেখে কি কচুপোড়া হয় ?

—ওমা, গুঁতো লাথি সইতে বলছে কে ? কেঁদে ককিয়ে টিকতে বলছে কে ? মরতে তোমাকে বারণ করছি নাকি ? তাই ভাবলে তুমি ! মরতে আমি কাতর নাকি যে তোমায় বলব মোরো না গো ? বলছি কি, বন্দুক বাগিয়ে রয়েছে দেখে দিশে হারিয়ে পাগল হয়ো না। ফাঁকা বাহাদুরী করে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে বোলো না—বুক পেতে দিয়েছি মার দিকি গুলি তুই কেমন মারতে পারিস ? তার চেয়ে কায়দা করে লেংগড় মেরে কুপোকাৎ করে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে উল্টে বাগিয়ে ধরলে ঢের বেশী বাহাদুরী হয়। শস্তায় প্রাণটা না দিয়ে, শত্তুরের প্রাণটা নেয়া যায়। তাই বলি কি, সারা জীবনটা তো পড়ে আছে, কাজের কিছু কমতি নেই—

দ'কলির গালে হঠাৎ একটা ঠোনা মেরে পাঁচু বলে, সামলে থাকিস। তোর সাথে মোর ঢের কথা আছে, ঢের কাজ আছে। যাই তবে ?

—এসো গে যাও।

তৃষ্ণায় পাঁচুর ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। পাশেই বাগ্দীপাড়ার পা-ধোয়া কচুরি পানায় ভরাট ডোবা। কী ঘন সবুজ সতেজ দীঘল জীয়ন্ত পানাগুলি, সমস্ত জলটা জুড়ে কী টানাটানি গাদাগাদি করে অদ্ভুতভাবে গজিয়েছে। বাঁশ দিয়ে ঠেকিয়ে দু'তিন হাত জায়গা মুক্ত [illegible] কবা হয়েছে। তালের গুঁড়ির ঘাটটাতে বসে দু'হাতের আঁজলা ভরে সবুজ দুর্গন্ধ জল তুলে পাঁচু পান করে। তারপর ধীরপদে আঁটুলিগাঁর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে।

এদিকে দু'কলি কিছুই আর করার না থাকায় চিরকেলে মেয়েলি স্বভাবের বশে বোকা বাগ্দীকে দলে টানার চেষ্টা সুরু করে দেয়।

বলে, গাঁ জ্বলে পুড়ে যাক, তোমরা ঘর আগলে বইবে ? ছি !

বোকা জবাব দেয় না। এ ধরনের অনুযোগ আগেও সে শুনেছে। গোবর-লেপা দাওয়ায় কলকেটা উপুড় করে থুতু দিয়ে সে পোড়া তামাকের আগুন নেভায়। থাবা দিয়ে ছেঁচে গুলটা গুঁড়ো করে তার সঙ্গে বুনো গাছের কয়েক টুকরো শুকনো পাতা মিশিয়ে শাল পাতার মোটা একটা বিড়ি বানায়।

বিড়ি ধরিয়ে টান দিয়ে বলে, কাদের গাঁ জ্বলেপুড়ে গেল গো মেয়া ? মোদের তো গাঁ নাই ! মোরা নীচ জাত হাড়হাবাতে চোরছ্যাঁচড়।

—না না, কে তা বলে ?

বোকা নীরবে শালপাতার বিড়িটা টেনে যায়। বিড়ির দুর্গন্ধ পচা ডোবার দুর্গন্ধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারিদিক আচ্ছন্ন করে যেন জমাট হয়ে উঠতে থাকে। বান্শী চুল পিঠে ছড়িয়ে খোলা বুক নাভি পর্যন্ত উদলা করে দু'কলির কাছে এসে বসে।

—চুল জট কেনে ? উকুন বাছি আয়।

দিন চারেক চুল বাঁধে নি দু'কলি, মা মাসী কেউ মাথার উকুন বাছে নি। মাথায় যেন লাঙল চষে চামড়া তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল। চুল ফাঁক করে বান্শী চটপট উকুন বেছে বেছে তোলে আর নখে নখে পিষে পট পট করে মারে। দু'কলি ভাবে, এই বাগ্দীপাড়ার মরদগুলিকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচু যদি যুদ্ধে যেতে পারত !

কানাই হাপরের আগুনে তাতিয়ে হাতুড়ি পিটে সাইকেলের একটা বাঁকা চাকাকে সোজা করছিল। সকালবেলা সদরের মানুষ তখন বাজার করতে যাচ্ছে, মুদীখানা মনোহারী দোকানে বেচা-কেনা জমে উঠছে। নাথহরি গরু নিয়ে গিয়ে ডেপুটিবাবুর বাড়ীর সামনে দুধ দুইয়ে দিয়ে রোগা আধমরা বাছুরটা দু'হাতে বুকে ধরে বয়ে আনছিল। কানাইয়ের সাইকেল মেরামতের দোকানের সামনে বাছুরটাকে নামিয়ে দিয়ে সবে সে দম নিচ্ছে, এজমালির ডবল ঘোড়ার ছ্যাকড়া গাড়ীটা গরুবাছুর সমেত নাথহরিকে হটিয়ে দিয়ে দোকানের সামনে থামল।

গাড়ী থেকে নামল জ্ঞানদাস, পাঁচু আর দু'কলি। দু'কলির মাথায় ঘোমটা তবে নামমাত্র ঘোমটা বলে সীঁথি আর কপালে সিঁদুর স্পষ্ট দেখা যায়।

কানাই তাতানো সাইকেলের চাকা আর হাতুড়ি রেখে উঠে এসে সমস্ত মুখ দিয়ে আনন্দের হাসি হেসে বলে, আয়। ভাবছিলাম যে বিকালে আসবি তোরা।

জ্ঞানদাস বলে, এরা আসবে জেনে কাল রাতে ওরা ফের একটা হাঙ্গামা বাধাবার মতলব করেছিল। ব্যাপার জেনে রাতারাতি বেরিয়ে পড়লাম সেবারে গুঁতো খেয়ে মনমরা হয়ে আছে, ছিঁচকেমি করবে। কাজ কি বাবা তোদের বজ্জাতির শখ মিটিয়ে ? আসব যখন, রাতারাতি চলে এলাম। বৌ-ভাত হয়নি কিন্তু ভাই।

কানাই সংক্ষেপে বলে, এখানে হবে। আয় পাঁচু, ঘরে আয়।

কুমড়ো ডগার মরীচ-ঝোল, লাউ দিয়ে মটর ডাল আর বড়ি দিয়ে রাঁধা বোয়াল মাছের ঝাল দিয়ে সবাই সে বেলা পেট ভরে খায়। পাড়ার চারজন বৌ-ভাতের এই ভোজ খেতে আসে, তাদেব দু'জনই দু'কলির চেয়ে কমবয়সী মেয়ে। অন্য দু'জন সদরের নতুন জলের কলের কারখানার মিস্ত্রী।

[আগামী বাবে সমাপ্য]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২য় কিস্তি

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

এবার কানাই আর পাঁচু যেন এঁটে যায়। সাইকেল মিস্ত্রির শহুরে সাইকেল-মিস্ত্রি ছেলে কানাই আব শহুরে চাষীব ছেলে পাঁচু। মেয়ে-পুরুষ যেমন আঁটে, বাঁশ বনেব গায় ছায়ায় শুঁয়োপোকা পিঁপড়ে ছড়ানো হলদে পাতাব শয্যাতে পাঁচু আব দু'কলি যেমন এক হয়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে যেন বজ্র-আঁটুনি। তারাই কি জানত যে তাবা এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু । পাকা বরাবর মাঝখানে ছিল, সরে গিয়ে সে বুঝি ক্যাটালিটিক এজেন্ট হয়েছে।

পাকা সরে গেছে তাদের চেতনা থেকে ? কানাই নয় তাকে বর্জন কবেছিল আগেই।—নিষ্ঠুর ক্ষমাহীনভাবে। পাঁচুব মনেও তার স্থানাভাব ঘটল ? তা ছাড়া আব কি বলা যায়। দ্বিতীয় দিন তাদের পাকার কথা মনে পড়ে। তাও তাদের আবেক বন্ধু তিনু আসায়।

মুদী দোকান বন্ধ করে দুপুরে তিনু আসে। পড়া ছেড়ে দোকানেব কাজে লাগতে তিনু কেঁদেছিল, ধনেশ একটা সাইকেল কিনে দিয়ে তার মন আর মান দুই বজায় রেখেছে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সাইকেল কানাইকে সাবাতে দিয়েছিল, দুপুবেব অবসবে সেটা নিতে তিনুর আগমন। তিনটে বাজলে আবার দোকানের ঝাঁপ খুলবে। পাকার কথায় তিনু বলে—

ওবেলা দোকানের মাল কিনে নিয়ে ফিরছি, মোটর চেপে হুস করে সামনে দিয়ে বেবিয়ে গেল। দেখলে ঠিক, চিনলে না।

বলে তিনু হাসে। নিরভিমান বিদ্রুপরহিত হাসি, যা ঘটা উচিত সংসারে তাই ঘটেছে, কেমন, ঠিক নয় ?

সঙ্গে তিনি ছিলেন না ?

না তো কি !

পাকা এখানে নাকি ? পাঁচু বলে।

কানাই বলে, এসেছে কিছুদিন। কিসের নাকি অসুখ, পাশে বসিয়ে সেই মামীটা দুবেলা হাওয়া খাওয়ায়। নরেশ বাড়ীতে গেছল, পাকা বাগানে ঘুরছিল, ওকে দেখেই সটান বাড়ীর মধ্যে । মামীটা এসে শুধোল, কাকে চাও ? না, আমি পাকার ক্লাস-ফ্রেণ্ড, আমায় চিনতেন আপনি, ডাকুন না পাকাকে ? মামীমা বললে, ওরে বাবা, পাকার বড্ড মন খারাপ ভাই, ওকে জ্বালাতন কোরো না !

পাকার সত্যি মন খারাপ। ওর দোষ নেই।

কার দোষ ?

সত্যাই তো, কার দোষে পাকার এমন হল ? ঝাঁঝের সঙ্গে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে কানাই। কানাই নিজেও তার নিজের কথার মানে খুঁজে পায় না। পাকাকে বাতিল করা যায়, ধরা যায় ছেলেটা সংসারের অনেক কিছুর মতই নষ্ট হয়ে গেছে। ভাল দামী জিনিসও পচে যায়। কিন্তু দোষটা কি পাকার ? গভীর খেদের সঙ্গে পাঁচু কানাইকে বলে, তোরা যদি অমন করে বেচারাকে মুষড়ে না দিতিস্—

তিনুর সামনে কানাই কথা ঘুরিয়ে দেয়, তিনু চলে গেলে বলে, কেউ ওকে মুষড়ে দেয় নি। নিজেই বিগড়ে যাচ্ছিল, আমি কম চেষ্টা করেছি ওকে সামলাতে ? কালীদা কম মাথা ঘামিয়েছেন কি করে ওকে গড়ে নেওয়া যায় ? কালীদা মুখে কিছু বলেন না, আমরা জানি কি রকম ভালবাসতেন। ওর জন্য ডিসিপ্লিন যত ঢিল করা হয়েছিল, কারো জন্য তা হয় নি।

কর্তালি ওর ধাতে সয় না।

কর্তালি ? বল্ নিয়ম সয় না। সব সময় উল্টোটা করা চাই।

পাঁচুর আপশোষ তবু বাগ মানে না। বন্ধুকে হারানোর চেয়ে বন্ধুর পরিণতিটা তার কাছে শোচনীয়।

মোদের চেয়ে শতগুণ তেজী ছিল ভাই।

কানাই তা অস্বীকার করে না। বলে, তাই তো কালীদা এতো ভালবাসত। জানিস, শুধু ওর বেলা মত পাল্টানো হয়, আরেকবার সুযোগ দেওয়া স্থির হয়। কালীদা বলেন, ওর তেজটাই ওর নষ্টের কারণ, এ কোনো কাজের তেজ নয়, অস্বাভাবিক বিপরীত তেজ। নাম কাটা যাবার পর থেকে কি অদ্ভুত পরিবর্তন এল দ্যাখ্। কালীদা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। এখন কালীদা বলেন, ওটাই হল ওর চরিত্রের ফাঁকি। নাম কাটা যেতেই রোখ চাপল, কী আমায় তাড়িয়ে দিলে ? দ্যাখো আমি যোগ্য কিনা। বাপের রিভলবার আর গয়নাগুলি দেবার পর যেই জানল ওকে আবার নেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ মনের গতি উল্টে গেল। একদম তলিয়ে গেল স্যুইসাইড করার মত।

তবু পাঁচু বলে, আমরা আরেকটু চেষ্টা করলে হয় তো—

বলে দু'মিনিটে পাকাকে ভুলেও যায়। এ বাড়ীতে পাকার জীবনের ছায়াপাতও নেই যে স্মরণে এনে দেবে। না বাইরের মেরামতি দোকানের শ্রীহীন ছড়ানো রুক্ষতায়, না ভিতরের কড়ামিঠে বাস্তব পাকের জীবনযাত্রায়। মেয়েদের স্নায়ুগুলি নির্ভরযোগ্য, অতটুকু রাধির পর্যন্ত। কানাই আজও বাড়ীতে আটক—আজও দুবেলা, মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে আচমকা তাকে প্রমাণ দিতে হয় মানুষের চেয়ে বড় মানুষের নিয়মের চেয়ে বড় আইনের হুকুম সে মেনে চলছে। ফাঁপর ফাঁপর ভাব কেটে গেছে বলেই হোক, হয়তো আটক থেকেই গোপন মুক্তি, কাজের উপায় খুঁজে পেয়েছে বলেই সরে পড়া মতলব সে কাজে পরিণত করে নি। যেভাবে কালীনাথের নাম করল, যেন আজকালের মধ্যেই দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে তার সঙ্গে। পাঁচু জানতে চায় নি। দোকানের কাজ বেড়েছে, প্রথম ভয়টা কেটে গেছে, লোকে জেনে বুঝে যেচে সাইকেল সারাতে আসে। বয়স্ক লোক অদ্ভুত এক শ্রদ্ধার সঙ্গে কানাই-এর সঙ্গে কথা কয়। বাড়ীতে নজরবন্দী হয়েই ছেলেটা যেন তার মনুষ্যত্ব প্রমাণ করেছে—এত ঘৃণা নৃশংস সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের যে সরকারের পুলিশের কৃপা দৃষ্টি লাভ না করে মানুষ বলে গণ্য হওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে এদেশে !

বিদেশী ইংরেজ আর তাদের দেশী দাসের সরকার ! বিদ্রোহ না করে মনুষ্যত্ব বিকাশের দ্বিতীয় পথ খোলা রাখে নি এদেশে, মাথা নত করে পদানত দাস হও, নতুবা এই সুন্দর পৃথিবীতে আনন্দময় আগামী সবটুকু জীবনকে ধ্বংস কর কোটি মানুষকে মানুষ হতে দিতে। মাঝামাঝি রফা নেই।

ইস্ ! কোটি মানুষ না অযুত, আমার বয়ে গেল। তারা মানুষ হতে পারে না, স্বাধীন হতে পারে না ? আমি কেন মরতে যাব তাদের জন্যে ? তারা আমার জন্যে এতটুকু করবে ?

ঘেঁটু দাঁতে দাঁতে কেটে তপ্ত কথা ছাড়ে। উগ্র অসহিষ্ণু ভাবাবেগকে শান্ত বৈষ্ণবী করতে। বেচারীর প্রায় বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে—আচমকা। বাড়ীতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দী। বড় মনমরা হয়ে গেছে মেয়েটা, কিন্তু কানাইকে প্রতিবাদ জানায় নি, কানাই-এর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে নি। মা মাসী দিদি খুড়ির সতর্ক পাহারা সবদিকে মেনে নিয়েও শুধু একটা বিদ্রোহে নাকচ করেছে : এ বাড়ীতে সে দশবার আনাগোনা করে।

টিউবের ফুটোয় এক টুকরো রবার এঁটে ফুঁ দিয়ে শুকিয়ে কানাই বলে, কোটি লোক তোমার দুয়ারে কবে ধর্ণা দিলে ? কবে বললে মোদের তরে তুমি মর ?

—তুমি তবে মরছ কেন ?

—বাঁচতে চাইলে বাঁচতে পারি, মরতে চাইলে মরতে পারি, তাই মরছি। কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি। তবে কিনা কথা হল, দশজনের জন্যে মরতে না চেয়ে বাঁচতে পারি না যে। মুস্কিল তো ওইখানে।

তোমার মনগড়া মুস্কিল। সবাই দিব্যি আছে সুখে শান্তিতে, তোমার যত পাগলামি।

কথার মাঝখানে এসে পড়ে এমনিভাবে ঘেঁটু ফোঁড়ন কাটে। ইতিমধ্যেই কয়েকবার পাঁচু এটা ঘটতে দেখেছে। যার সঙ্গে যে কথাই কানাই বলুক, সংসার ও স্বার্থের যে চলতি যুক্তিগুলি সবাই জানে আর সর্বদাই শোনে তাই দিয়ে কানাই-এর কথা ভেস্তে দিতে চায়। তার ইচ্ছা ঝগড়া বাধুক, কানাই রাগুক, একটা রাগারাগি হোক। দুঃখের বিষয়, কানাই অতদূর এগোয় না, চুপ করে যায়। সত্যিই এটা দুঃখের বিষয়, অন্তত পাঁচু আর দু'কলির কাছে। রাত্রে তাদের এ বিষয়ে তাই অনেক মাথা-ঘামানো গভীর আলোচনা হয়।

—কিগো তোমার ও কানাইটা ? মাথা ভরতি গোবর নাকি ? চুকিয়ে দিলে চুকে যায় ঝগড়াঝাঁটি গালমন্দ করে দিলে, ঘরে গিয়ে মেয়েটা সাধ মিটিয়ে কাঁদতে পারে। মান রাখতে প্রাণে মারা কেনে বাবা এ্যাঁ ?

—মেয়েটারও সরম নাই। গায়ে পড়ে আসে কেন ?

—সরম ! বুকের সাধ তালুতে চড়লে সরম ! সরমে কাবু বলেই না মেয়েটা শুধু আসে যায় চুপ মেরে রয়। আমি হলে কামড়ে দিতাম না !

—তোর কথা আলাদা, সরমভরমের বালাই নাই। কথা নাই কিছু নাই পেলি তো গলা জড়িয়ে ধরলি।

—না ধরবে নি ! সব মোর যায় যায়, তখন মোব লেগে যে মজেছে তাকে ছেড়ে দিয়ে সরম ধুয়ে জল খাবে। মনে তোমার ইদিক ওদিক খুঁতখুঁতানি ভাব রইলে মোরও লজ্জা হত। মন জানাজানি হয়ে গেছে যখন, তখন মরণ বাঁচন, কিসের তখন লজ্জা গো ? ন্যাংটো হয়ে ঘোমটা টানা সরম নাকি ? ঢং !

—মন জানাজানি হয় নি বুঝি তবে।

—বাকী আছে ! পো এসে গেল মেয়ার পেটে, মন জানাজানি শিকেয় তোলা রইল।

—মিছে বলছিস দু'কলি তুই !

কানাই ? পাকাকে যে এক কথায় ত্যাগ করেছিল, সেই কানাই ? আজও যে তেমনিভাবে তাকায়, সেই সুরে কথা কয়, কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করার স্বভাবটা সেইরকম হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার মতই বজায় আছে মনে হয়, টোল না খেয়ে বরং কাঠখোট্টামি ঘষায় মাজায় আরও যার ঝকঝকে হয়েছে ? সংসারে তবে পাঁচু আর কার ভরসা করবে ? কিসের হিসাবে দাম কষবে ভাল কাজ মন্দ কাজের ? পাঁচুর মন বিশ্বাস করতে চায় না। দারুণ আক্রোশী ক্রোধ ঠেলে ঠেলে ওঠে আর তার জ্ঞানবুদ্ধিকে মথিত করে পাক খায় · সত্য হলেও সে বিশ্বাস করবে না, আরও কিছু আছে এর মধ্যে, সত্যের চেয়েও বড় সত্য ! কি আছে ? এটা যে সহজ সাধারণ ছোট উচিত-অনুচিতের কথা পাঁচু, এর মধ্যে বড় কথা কি টেনে আনা সম্ভব যার বড়ত্বে ছোট সত্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে ? পাঁচুর বিবেচনা শক্তি এইখানে মুস্কিলে পড়ে। দু'জনের মন জানাজানি হয়ে থাকে, সব জানাজানি হয়ে থাকে, পাঁচুর বয়ে গেল। সে বলবে, যা না হয়েছে, নপুংসক বুড়ো আর শাস্তরের পিণ্ডিদানের ব্যবস্থা করেছে, জয় হোক কানাই আর ঘেঁটুর। রাধাকৃষ্ণের শাপ তাদের লাগে নি, সাতপুরুষের বিয়ের নেশা কাটিয়েছে। তারপর ঘেঁটুকে যদি অন্যের ঘরে যেতেই হয়, তাও নয় সে যাবে। কানাই-এর দেশ আছে, জীবনটা সে দেশকে আগেই দিয়ে দিয়েছে বলে হোক, সমাজ সংসারের বাধা আছে বলে হোক কিংবা সবটাই তাদের ভুল হয়েছে মন জানাজানি থেকে সুরু করে, এজন্যেই হোক। তাও পাঁচু মেনে নেবে। কিন্তু মেয়েটার যে বিপদ ঘটেছে ? পাঁচুর চাষাড়ে প্রাণের নতুন নীতিবোধ এইখানে এসে ঠেকে যায়। মনের পাল্লায় একদিকে শুধু দেশ বা স্বাধীনতা নয়, সমাজসংসার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছু চাপিয়ে ঘেঁটুর ওজন পায় না, একটি মেয়ের দিকেই পাল্লা ঝুঁকে থাকে।

তুলনায় ছোট দায়িত্ব, তুচ্ছ কর্তব্য। একটা ঘেঁটুর দাম কতটুকু ? বাড়ীর লোক ধরে বেঁধে যার ঘাড়ে তাকে চাপিয়ে দিচ্ছে সে যদি বিয়ের রাতে তাকে লাথি মারে, বাজারে যদি ঘর বাঁধে ঘেঁটু, নয় রাস্তায় ভিক্ষা করে জীবন কাটায়, কি তাতে এসে যায়—কানাই যদি তাকে ছেড়ে জীবন দিয়ে দেশটাকে বাঁচায় ? কিন্তু না, পাঁচুর কাছে এসব বাবুয়ানি ফাঁকি অচল। পাকার এককালীন ভক্ত, কানাই-এর বন্ধু আর শ্যামলের শিষ্য হয়েও সে পাশের দু'কলির গায়ে মাটির গন্ধ পায়। আদর্শের স্বর্গ থেকে মাটির দিকে যুক্তি নামাতে সে জানে না, তার যুক্তি মাটিতে গজিয়ে আকাশে মাথা তোলে।

দেশ বড় যুক্তি আরও বড়। এ তো সে কথা নয়। দেশ বড় না ঘেঁটু বড় এ প্রশ্নই তো এতো নেই। এ শুধু সোজা সরল কথা : ছোট দায়িত্ব যে পালন করতে পারে না, বড় দায়িত্বে তার কিসের অধিকার ? তুলনায় তুচ্ছ বলে একটা কর্তব্য যে এড়িয়ে যায়, গুরুতর কর্তব্যের তার যোগ্যতা কই ? একটা মেয়ের মান যদি কানাই রাখতে না পারে, সে রাখবে দেশের মান ! পাঁচু অন্তত কানাকড়িও দাম দেবে না কানাই-এর জীবনের, কাল যদি সত্যিই সে হাসি-মুখে ফাঁসির কাঠে জীবনটা দেয়।

তাই বিশ্বাস হয় না পাঁচুর। মেঘলা নিশীথে হাওয়া উঠেছে, কিছুক্ষণ আগেও মনে হচ্ছিল এ বুঝি তার আর দু'কলির গায়ের জোরে জড়াজড়ি করে মনের সাধে এক হয়ে যাবার একটিমাত্র আদি ও অকৃত্রিম রকমসকমে বাইরের পৃথিবীর বিস্ময় ও আমোদে কানাকানি ফিসফিসানি। দু'কলির দিকেও আর মন যায় না।

—হল কি বল দিকি ? ছটফটানি কিসের এতো ?

—তুই তামাসা করেছিস বৌ। মিছে বলছিস।

—মা গো মা ! ওই কথা ভাবছ তুমি ? মিছে হোক সত্যি হোক, হবে'খন কাল বিয়ানে। বন্ধুকেই নয় শুধিও ব্যাপার কি।

—এখুনি শুধিয়ে আসি !

—মাঝ রাতে ? ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলে ?

—হোক গে মাঝ রাত। সত্যি হলে এখনই মোরা বেরিয়ে যাব দু'কলি, এই দণ্ডে।

দু'কলি উঠে বসে হাই তোলে।

—তাতে হবে কি ? অঘটন পাল্টে গিয়ে সুঘটন হয়ে যাবে ? ইস্কুলের ভাল বিদ্যে পেটে ঢুকেছিল বাবা তোমার !

কানাই বিছানায় নেই। ভিতরের উঠোনের দিকের ভেজানো দরজা একটু ফাঁক হয়ে ছিল। উঠোনে নেমে অস্পষ্ট কথার আওয়াজ শুনে পাঁচু সেদিকে এগিয়ে যায়।

কানাই বুঝি চোখ রেখেছিল, বলে, পাঁচু ? শো গে যা পাঁচু।

এগোনো উচিত নয় টের পেয়ে পাঁচু অন্য সময় ফিরে আসত, এখন সোজা এগিয়ে যায়।

—তোর সঙ্গে কথা আছে।

—শুবি যা। খানিক পরে আসছি।

—তোদের সবার সামনে বলব।

ঢেঁকি ঘরের কোণে বুঝি আড়াল করা প্রদীপ জ্বলছে, ভেতরে ক্ষীণ আবছা আলো, এত কাছে না এসে বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। এক মুহূর্ত স্তব্ধতার মধ্যে কাটে। তারপর ভেতর থেকে কালীনাথের মৃদু গলা শোনা যায়, কেমন আছ পাঁচু ?

—ভাল আছি। আপনাদের সামনে কানাইকে একটা কথা শুধোব। নয়তো মোর একদণ্ড টেকা ভার হয়েছে।

—বেশ তো, বলো না। শুধোও না কি শুধোবে।

উবু হয়ে বসে ঠাহর হয়ে আসায় পাঁচু প্রতিমা আর শঙ্করকে চিনতে পারে। আরও দু'জন ঢেঁকিটাতে পা ঝুলিয়ে বসেছিল, তারা তার অচেনা। কালীনাথ একটা পিঁড়িতে বসেছে।

প্রতিমা মিষ্টি সুরে বলে, আমাদের সময় বড় কম ভাই।

পাঁচু বলে, কানাই, ঘেঁটুর এ দশা করলে কে ? তুই দাগিক ?

কানাই বলে তা দিয়ে তোর দরকার ? একথা জিজ্ঞেস করতে উঠে এলি ? তুই পাগল নাকি পাঁচু ?

পাঁচু বলে, হবও বা, পাগল নয় তো ছাগল। কথাটার জবাব দে, আমি ঠিক করে ফেলি তোর ঘরে রইব না বৌয়ের হাত ধরে এই দণ্ড বেরিয়ে যাব। কালীনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, পাবাকে আপনারা বিনা দোষে খেদিয়েছিলেন। কানাই দোষী হলে ওকে সাথে রাখলেন কি করে ? আমি শুধিয়ে খালাস বলেন বলবেন, না বলেন নাই। কানাইকে জবাব দিতে হবে। জবাব নিয়ে তবে আমি উঠব, ও বোমা পিস্তলকে ডরাই না আমি।

তার উত্তেজনা কয়েক মুহূর্ত সকলকে অভিভূত করে রাখে কারণ সেটা সরল স্পষ্ট কথাগুলির মধ্যে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা[র] স্পষ্ট হয়ে থাকে।

প্রতিমা বলে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না পাঁচু, অত গণ্ডগোলের ব্যাপার নয়। দু'কলি ছেলেমানুষ, এর কাছে ওর কাছে পাঁচরকম পাঁচটা কথা শুনে কি বলতে তোমায় কি বলেছে।

বলে সে একটু হাসে। পাঁচু চুপ করে চেয়ে থাকে।

প্রতিমা আবার বলে, ঘেঁটুর এ দশার জন্য যে দায়ী, তার সঙ্গেই ওর বিয়ে হচ্ছে।

পাঁচু এবার বোকার মত বলে, অ !

—আর আমাদের কানাই চেষ্টা করে এটা ঘটিয়েছে।

এবার একেবারে বোকা চাষার বোকা ছেলের মতই পাঁচু বলে, তাই নাকি ? অ !

বলে আচমকা সে উঠে দাঁড়ায়। পালাতে পারলে বাঁচে।

কালীনাথ বলে, পাঁচু, একটা কথা শোনো।

কড়া গলা কালীনাথের। বজ্রের আওয়াজ যেন নিজেকে চেপে মৃদু হয়েছে।

—তুমি বোমা পিস্তলকে ডরাও না, ভালই। আমরাও কিন্তু আত্মীয়বন্ধুর দুর্বলতা বরদাস্ত করি না। আমাদের এখানে দেখেছো, কারো কাছে এটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ কোরো না পাঁচু।

পাঁচু আহত হয়ে বলে, আমি তেমন নই কালীবাবু।

কালীনাথ বলে, তা জানি, নইলে তোমায় ডেকে বসতে বলি ? কিন্তু তুমি তো আর একা এখন নও, দুজন হয়েছ। কারো কাছে বলবে না মানে দু'কলির কাছেও নয়।

—সে বিশ্বাস রাখতে জানে।

—না, জানে না। বিশ্বাস রাখতে চাওয়া আর বিশ্বাস রাখতে জানা আলাদা জিনিস পাঁচু। বৌ তোমার খুব ভাল, তার নিন্দে করছি না। কিন্তু তোমার পর্যন্ত যে শিক্ষা হয় নি, সে বেচারা সেটা কোথায় পাবে ? তুমি পর্যন্ত ভাবছিলে কতক্ষণে গিয়ে দু'কলির কাছে আমাদের কথা গল্প করবে ! বুঝতে পেরেছ ?

—পেরেছি কালিদা। আমি শুধু কানাই-এর সঙ্গে কথা কয়ে গেলাম, ঘেঁটুর কথা। আপনাদের চোখেও দেখি নি।

একটু মুষড়ানো মন নিয়ে পাঁচু ঘরে ফিরে যায়। দু'কলির যে আরেকটা দিকও আছে, সে শুধু সাথীই নয় একটা বোঝাও বটে একদিকের হিসাবে, এই প্রথম তার একটা অস্পষ্ট অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে। ঘরে গিয়ে দ্যাখে দু'কলি

ঘুমিয়ে গেছে, বন্ধুর সঙ্গে এতবড় একটা ব্যাপারের কি সিদ্ধান্ত করে আসে পাঁচু এই কৌতূহলও তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে নি। অবস্থার ফেরে যতই পেকে গিয়ে থাক, বয়স কী মেয়েটার। সে হিসাবে পাঁচুও সবে একটি পা বাড়িয়েছে জীবনের যে বড় নৌকায় সে এখন যাত্রী। কৌতূহল কেন, দু'জনের তপ্ত প্রেমের জাগরণ পর্যন্ত কতবার ঠাণ্ডা হবার আগেই কখন গাঢ় ঘুমে জুড়িয়ে গেছে দু'জনে টেরও পায় নি, সকালে ঘুম ভেঙে চোখে চোখে চেয়ে হেসেছে।

আজ পাঁচু একা খানিক জেগে থেকে ভাবে। জীবন তবে ভাগ করা? প্রিয় আর পরিবারে এবং সংগ্রামে, বিদ্রোহে ? চল্‌তি সাধারণ একঘেয়ে জীবন আর জীবন্ত যুদ্ধের জীবনে। দু'কলির সঙ্গে সারাটা জীবন কাটবে, তাকে আজ ভরসা করে বলা যায় না সামান্য একটা খবর ! সত্যই যায় না, এটা পাঁচু বুঝেছে, যতই সে ভাল জানুক দু'কলিকে। তবে উপায় ।

দু'কলিকে যদি গড়ে তোলা যায়। সে বিশ্বাস পেয়েছে, আরও পাবে এই তার আশা, এখন দু'কলিকে যদি এ বিশ্বাসের যোগ্য করে তোলা যায়। তার ফলে এদিকটা বরবাদ হবে, এত কাণ্ডের পরেও সে যে ঘর সংসার পাতার কথা ভাবছিল, ইতিমধ্যেই যা নিয়ে তাদের অসংখ্য খুঁটিনাটি পরামর্শ একটানা চলতে সুরু করেছে।

আর দু'কলিকে যদি গড়া না যায় ?

অগত্যা দু'কলিকেই তার ছাড়তে হবে। তা ছাড়া আর কি উপায় আছে ? পাঁচু ঘুমন্ত দু'কলির শিয়রে বসে নিজের মনে মাথা নাড়ে।

না, আর কোনো উপায় নেই।*

[ক্রমশ]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

* গত সংখ্যায় ভুল করে লেখা হয়েছিল "আগামী সংখ্যায় সমাপ্য"। পাঠকরা ত্রুটী মার্জনা করবেন। —লেখক

৩য় কিস্তি

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

বড় ও ছড়ানো হলেও এটা মফস্বলেরই শহর। ছোট ছোট কারখানা কয়েকটার মধ্যে আবদুরীর শ'দেড়েক মজুরের চামড়ার কারখানাটি সব চেয়ে বড়, মজুরদের বেশীর ভাগ অস্পৃশ্য। ন'মাইল দূরের রেলওয়ে কলোনিটা বরং এ শহরের তুলনায় ঢের বেশী ঘনবদ্ধ, আলোয় ঝলমল এবং সুন্দর পথঘাটে আধুনিক। সেখানে বহুদিন বিদ্যুতের আলো জ্বলছে, এ শহরে বিদ্যুতের আবির্ভাব এই সেদিন, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাজা জমিদার প্রভৃতির কয়েকটি বাড়ীতে আর শুধু প্রধান রাস্তায় দূরে দূরে মিট মিট করে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার নিস্তেজ অনিচ্ছুক তাগিদের মত।

সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যে শহরের কোথাও পাকার সঙ্গে পাঁচুর সাক্ষাৎ হবে সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। স্টেশন একটাই। সেখানে।

জ্ঞানদাস পাঁচুদের দেখতে এসেছিল। ওটা ছলনা, আসলে দু'চার দিনের বেশী গাঁয়ের খবর না পেয়ে পাঁচু পাছে আচমকা গিয়ে হাজির হয় এই ভয়ে তার আগমন। গাঁয়ে নানারকম ঘোঁট চলেছে, মাথা গরম পাঁচুকে জ্ঞানদাস তার মধ্যে চায় না। তার চেয়ে বড় কথা, পাঁচুকে খুন করার জন্য ওৎ পেতে আছে মেজকর্তার গুণ্ডারা। গাঁয়ে পাঁচুকে সামলে রেখে বাঁচানো দায় হবে, অনায়াসে খুন হয়ে যাবে। হাঙ্গামার ফলে আইন তাদের পক্ষে নেই, দিনের আলোয় পথে ঘাটে দশজনের সামনে তাকে ঠেঙিয়ে মারলেও বিচার পর্যন্ত হবে কিনা সন্দেহ, খুনেদের শাস্তি তো দূরের কথা। মেজকর্তার ভাড়াটে লোকেরা তাই বড়ই সাহসী।

পারলে জ্ঞানদাসকেও তারা সাবাড় করে দেয়। কিন্তু লড়াই করে তার হাড় পেকেছে, তাকে বাগে পাওয়া শক্ত। পাঁচুর এখনও সামলে চলার বুদ্ধি গজায় নি।

রেলে গাঁয়ের কাছাকাছি স্টেশনে নেমে সেখান থেকে হেঁটে জ্ঞানদাস গাঁয়ে ফিরবে। ভোর সাতটার গাড়িতে তাকে তুলে দিতে পাঁচু এসেছে সঙ্গে। দ্যাখে, ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটার ফোকরের সামনে দাঁড়িয়ে পাকা একা টিকিট কাটছে ! গাড়ীর খানিক দেরী ছিল।

টিকিট কেটে পকেটে রেখে পাকা পাঁচুর পাশ দিয়ে প্লাটফর্মে চলে যায়, পাঁচুকে দেখতে পায় না। সত্যই দেখতে পায় না, পাঁচু সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারে। দেখেও না দেখা নয়, ইচ্ছে করে না চেনা নয়। পাঁচু তো ব্যাকুল আগ্রহে তীক্ষ্ণ উৎসুক দৃষ্টিতে তার মুখ দেখেছে, তার স্থির ভাবাতুর চাউনি দেখেছে। ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা হলে বোঝা যেত।

কিরকম শুকনো শীর্ণ লম্বাটে হয়ে গেছে পাকার মুখ। কি নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ তার চোখ। আগেও সে বড় চুল রাখত কিন্তু এমন এলোমেলো চুল তার পাঁচু আগে কখনো দ্যাখে নি।

জ্ঞানদাস থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটতে যায় পাঁচু একটু ঠায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মের পাথর বাঁধানো প্রান্তে দাঁড়ানো পাকার কাছে যায়।

পাকা বলে, পাঁচু?

বলে আচমকা খুশির আবেগে পাঁচুর হাত চেপে ধরে। এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে বসে পাঁচুর সম্বন্ধে পাঁচ সাতটা খবর।

পাকার শেষ চিঠির কথা পাঁচু কাউকে বলে নি, কানাইকে নয়, দু'কলিকেও নয়। চাষার ছেলের সবল পেটে কথা রাখা দায়, কিন্তু টের যদি সে পায় একবার যে কথাটা এ জগতে বিশ্বাস করে শুধু তাকেই বলা, তার পেট কেটে খুঁজলেও সে কথা বার করতে পারবে না—হৃদপিণ্ড নাড়িভুঁড়ি যেমন স্বভাবতই তার দেহে গোপন হয়ে মিশে থাকে, বিশ্বাসের কথাও তেমনি আপনা থেকে ভেতরে লুকিয়ে মিশে যায়। পাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারবার তার মনে হয় ঘেঁটুর মতই পাকাও যেন বিপন্ন। ঘেঁটুকে ডুবিয়ে দিতে বসেছিল এক দুর্বল-হৃদয় বিপ্লবী, পাকাকে শেষ করেছে সোনার প্রতিমার মত একটি ডাইনী মহিলা। ঘেঁটুর বাপ-দাদা মাসীপিসী আর কানাই আছে, তাকে বাঁচাবার সামাজিক উপায় আছে, কানাই তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে সেই উপায়ে। পাকার কেউ নেই, বাঁচবার উপায় নেই, ভদ্র মহিলা সুধার প্রেমের খিদেয় জীর্ণ হতে হতে এই তাজা ছেলেটা শেষ হয়ে যাবে। এইটুকু শুধু তফাৎ।

—সত্যি হঠাৎ বলো তো তুই কোথা চলেছিস পাকা? এ গাড়ী তো কলকাতার উল্টোদিকে যাবে।

—এমনি বেরিয়ে পড়েছি। ঘুরে আসব।

ভাসা ভাসা ভাবে এই জবাব দিয়ে পাকা তৎক্ষণাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে আবার বলে, ভাল লাগছে না কিছু। ক'দিন ঘুরে আসি এদিক ওদিক।

এক কাপড়ে বিছানাপত্র কিছু না নিয়ে খালি হাতে ক'দিন এদিক ওদিক ঘুরে আসতে বেরিয়ে পড়া। পাঁচু ভরসা করে আর কিছু শুধোয় না। এ জটিলতায় তার প্রবেশ নিষেধ। তাতে হিতে বিপরীত হওয়াই সম্ভব। এ জগতে হয় তো একমাত্র তার কাছেই পাকা আত্মপ্রকাশের সেই চরম পত্রখানা লিখেছিল, কিন্তু তাতেও পাকা তো সোজাসুজি লেখে নি—আমার জীবনে এই ব্যাপার ঘটেছে, এই কারণে আমার মনে ঝড় উঠেছে। সেই ঝড়ে এলোমেলো ভাব-কল্পনার উড়ো কতগুলি চিন্তা শুধু সে তাকে পাঠিয়েছিল। ব্যাপার পাঁচু চোখে দেখে কানে শুনে আঁচ করেছিল বলেই চিঠির মানে সে বুঝতে পেরেছিল নইলে তাতে এমন একটা স্বীকারোক্তিও ছিল না আজ যা ধরে খোলাখুলি কথা বলা যায়।

সে তাই নিজের কথা তোলে বলে, বিয়ে করেছি জানিস?

—বিয়ে? সে কি? এর মধ্যে?

পাঁচু খোলাখুলি ঘটনাগুলির বিবরণ শোনায়। পাকা যে শুধু তাকেই একখানা চিঠি লিখেছিল স্পষ্ট করে কিছু না বলেও সব কথা আরও বেশী স্পষ্ট করে জানিয়ে, তারই প্রতিদানে এ জগতে কেউ যা জানে না তাও পাঁচু বন্ধুকে জানিয়ে দেয়, গুমোটের ভাপসা দুপুরে বাঁশবনে তার প্রেমের কথা। রঙ চড়িয়ে গুছিয়ে বলতে সে জানে না, অত্যাচার হাঙ্গামার কথা বলার সময় তার চোখ জ্বল জ্বল করে, ভালবাসার কথা বলার সময় সে মুখ টিপে হাসে। শিশুর মতো মশগুল হয়ে রূপকথা শোনবার মত পাকা তার এলোমেলো কাহিনী শোনে।

গাড়ী আসে, জ্ঞানদাস পাকার কুশল শুধিয়ে পাঁচুকে শেষ কটা উপদেশ শুনিয়ে গাড়ীতে ওঠে, গাড়ী ছেড়ে যায়। নাগপুরের টিকিট পকেটে নিয়ে পাকা গাড়ীটাকে চলে যেতে দেয়।

বলে, নাঃ আজ যাব না। তোর সঙ্গে দেখা হল।

বলে, চ তোর বউ দেখে আসি।

শুনে পাঁচু ভাবে, সেরেছে! দু'কলিকে দেখতে কানাই-এর বাড়ী গিয়ে পাকা আর কানাই যখন মুখোমুখি হবে তখন কি ঘটবে কে জানে! বিশেষত পাকার যে রকম অসুস্থ অস্বাভাবিক মনের অবস্থা, এক কাপড়ে কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে আসবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টেশনে টিকিট কিনে এক কথায় যাওয়া বাতিল করে দিয়েছে!

পাঁচু বলে, শোন বলি, মোর গেঁয়ো বৌ ভাই, তাতে আবার ভীষণ বাচ্চা। পরের বাড়ীতে পাঁচজনের সামনে তোর সঙ্গে হয় তো কথাই বলবে না। তার চেয়ে এক কাজ করি আয় না? ওবেলা বৌকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাব, তুই সঙ্গে আয়। অনেকদিন নদীর ধারে বেড়াই নি। শুধু আমরা তিনজন।

পাকা বলে, ধেৎ! কি বুদ্ধি তোর। আজ দুপুরে তোরা দু'জন আমার বাড়ীতে খাবি! গাড়ী পাঠাব?

পাঁচু আঁতকে উঠে বলে, না না, গাড়ী লাগবে না। আমরা এমনি আসব।

পাঁচুর উঁচু ঘরের বড়লোক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্নের খবর শুনে দু'কলি বিপন্নভাবে তাকায়, ঠোঁট উল্টে বলে, না, আমি যাব না।

—কেন ? কিসের ভয় তোমার ? খেয়ে ফেলবে না কি !

—বিচ্ছিরি লাগবে মোর। তোমার মোটে কাণ্ডজ্ঞান নাই। মোর শ্যামা পিসী, বাবার মাসতুতো বোন, ওদের ঘরে ঝি খাটে জানো না?

শুনে পাঁচুও হঠাৎ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। ভেবে চিন্তে বলে, সে বাড়ী নয়, সেটা রায়বাহাদুরের বাড়ী। পাকা এখন অনন্তবাবুর বাড়ী থাকে। না গেলে চলবে না দুক্‌লি।

দু'কলি অগত্যা রাজী হয়, তিতো ওষুধ গিলতে রাজী হওয়ার মত মুখ করে। বলে, তোমার যে কি মতিগতি ! কাজ কি বাবা মোদের ওদের সঙ্গে মিতালিতে ! কথায় বলে না, ভিখারি যায় রাজার বাড়ী চাল চেয়ে পায় ঝাঁটার বাড়ি ! তাই জুটবে দেখো মোদের।

পাকাকে এখানে আসতে বললেই ভাল হত। দু'কলিকে বিপদে ফেলার জন্য বড়ই মায়া বোধ করে পাঁচু। সহজ বিপদ নয়। দু'কলি কি এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারবে যাদের বাড়ী সে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে তাদের আরেকটা বাড়ীতে ঝি-গিরি করছে তার মাসতুতো পিসী। মায়া বোধ করে, হাসিও পায়। যোগাযোগটা মন্দ হয়নি। পাকার সে প্রাণের বন্ধু, বিয়ে করেছে পাকার যে এঁটো বাসন মাজত তার ভাই-ঝি কে !

গোমড়া মুখে দু'কলি নড়ে বেড়ায়, দুপ্‌ দুপ্‌ পা ফ্যালে। পাঁচুর নির্বুদ্ধিতায় তার গোসা হয়েছে ! নাইতে যাবার জন্য চুল খুলে পাঁচুকে চিন্তিত দেখে নিজেই থুতনি ধরে মুখ তুলে হেসে বলে, আ মরি, ভাবনার কি হল ? জেলে তো দেবে না। পাঁচু স্পষ্টভাবে অনুভব করে, দু'কলিকে কোনো দিক দিয়ে বোঝা মনে করার রাত্রিকালীন চিন্তাগুলি দিনের আলোয় কত অর্থহীন অবাস্তব মনে হচ্ছে। সেদিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত দু'কলির শিয়রে বসে জীবনটা যে ভাগ করা মনে হয়েছিল, ঢেঁকি-ঘরে ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় কানাই কালীনাথ প্রতিমাদের মরণ-পণ জীবনব্রত পালনের পরামর্শ সভা থেকে উঠে এসে ইংরেজ পুলিশ রাজা জমিদার থেকে জগতের সমস্ত অত্যাচারীকে শেষ করার সাধ নিয়ে বেঁচে থাকার সঙ্গে দু'কলিকে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা বিরাট হয়ে উঠেছিল, তার জের রাত্রে মেটে নি। মিটবারও নয়। কিন্তু পরদিন দিনের আলোয় তার সমস্যার সমস্ত চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল তার চোখে, মনে হয়েছিল রাত্রে ভাবকল্পনাকে অকারণে ফেনিয়ে তুলে অবাস্তব নাটকীয় চিন্তা নিয়ে খানিকটা সে খেলা করেছে নিজের সঙ্গে ! আটুলিগাঁর সংঘর্ষ থেকে সে সদ্য সদ্য শহরে এসেছে, চারিদিক থেকে সাধারণ মানুষের দেশ জোড়া বিক্ষোভের যে খবর শুনছে আর কাগজে পড়ছে—বয়কট, হরতাল, ধর্মঘটের বন্যা—তার গাঁয়ের মতই এই শহরেরও বাইরের শান্তভাবের তলে মানুষের দুরন্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়াবেগ অনুভব করছে। দিনে এসব বাস্তব হয়ে উঠে যেন তার রাত্রের মনগড়া সমস্যাকে ছাপিয়ে ওঠে। ভেবে সে পায় না যে সমস্যাটা কি ! দেশকে ভালবাসার জন্য তাকে যদি ধরে নিয়ে যায়, দু'কলি যদি না আসে তার সঙ্গে, দু'কলি ঘরে থাকবে আর দশটা মেয়ে বৌ এ অবস্থায় যেমন থাকে। তাকে যদি মরতে হয়, দু'কলি যদি মরতে না চায়, দু'কলি বিধবা হবে আর দশটা বৌ এ অবস্থায় যেমন হয়। এ নিয়ে ভাবনার কি আছে ভাবনাটাকে এমনভাবে আকাশে তুলে দিয়ে ?

সত্যিকারের ভাবনার কথা যদি বলতে হয়, সেটা বরং দাঁড়িয়েছে টাকাপয়সার ভাবনা। বৌ নিয়ে উঠেছে বন্ধুর বাড়ী, রোজগারের সমস্যাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড়। ওদিকে গাঁয়ে তার বাবা-খুড়োর অবস্থা এবারের হাঙ্গামায় আরও কাহিল কাহিল হয়ে পড়েছে। রোজগারের ব্যবস্থা তার না করলেই নয়।

তবু এখানেই জের মেটে নি। রাত্রে আবার দু'কলি ঘুমিয়েছে, তাকে জোরে আঁকড়ে ধরা হাতের বাঁধন তার শিথিল হয়ে গেছে, বুকে গুঁজে দেওয়া মাথা ঢলে পড়েছে আলগা হয়ে। ধীরে ধীরে আবার তোলপাড় উঠেছে পাঁচুর মনে—এই দু'কলিকে নিয়ে। দিনের আলোয় তুচ্ছ হয়ে যাওয়া ওই সমস্যা আবার মাথা তুলেছে জীবনের পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত, জীবন ভাগ করা, সাধ আহ্লাদ আশা আনন্দ আদর্শ উদ্দেশ্য নদীর দু'তীরের মত পৃথক, এক তীরে দুর্গম তপ্ত বালুচরের বুক দিয়ে মৃত্যু ভেদ করা অনন্ত ভবিষ্যতের পথ, অন্য তীরে শুধু দুদিনের একটি অস্থায়ী কুটিরে দু'কলির গায়ের মাটির গন্ধ, উষ্ণ নিশ্বাস আর হৃদয়স্পন্দন।

ক'দিন এমনিভাবে পৃথক হয়ে আছে পাঁচুর দিন ও রাত্রি।

অনন্তের বাড়ীতে ঢুকতে পাঁচুর সত্যই এবার অনধিকার প্রবেশের সংকোচ ও অস্বস্তিবোধ জাগে—শুধু দু'কলি এবার সঙ্গে আছে বলে। স্টেশনে একা পাকার সঙ্গে কথা বলার সময়ও এটা অনুভব করে নি। পাকার বাড়ী যাবে তাতে আবার অসঙ্গতি কি আছে ? এবার স্পষ্ট বোঝে দু'কলিকে বিয়ে করে, সামাজিকভাবে চাষা হয়ে, তার জাত গেছে ! পাকা যেন যেচে সাগ্রহে তাদের ডাকে নি, এককালে একসাথে পড়েছিল এই ছুতোয় সে-ই জোর করে বেহায়ার মত সস্ত্রীক এই ফুলের গন্ধে ম-ম করা সাজানো বাগান দিয়ে মস্ত আধুনিক বাড়ীটির অন্দরে প্রবেশ করছে !

পাকা বলে, আয়।

বলে সেও আর কথা খুঁজে পায় না। তিনজনে বোবার মত চুপ করে থাকে। তাঁতের রঙীন শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছে দু'কলি একটা ঢোঁক গেলে। মনে হয়, এজগতে মানুষের মনের মিল অন্তরঙ্গতা ভাবসাব আত্মীয়তা সব যেন মিছে বানানো কথা মানুষের। নিছক কতগুলি বাস্তব ইঁট কাঠ লোহালক্কর ন্যাকড়া কাগজের সাজানো গোছানো রং করা রূপ যে এই ঘরবাড়ী আসবাব জামা কাপড় বইপত্র শুধু সেগুলিই দুটি মুখোমুখি প্রাণের বন্ধুকে অচেনা অজানার মতো বাক্যহারা করে দিতে পাবে।

সুধা মুচকে হাসে। হাসিটা পাঁচু স্পষ্ট দেখতে পায়।

এগিয়ে এসে সুধা বলে, ওমা, এই নাকি তোর বন্ধুর বৌ পাকা ? দিব্যি কচি বৌ তো ! এসো ? এগিয়ে এসো ? বোসো ? বড্ড খুশি হয়েছি তোমরা এসেছ। পাকা যখন আমায় বললে পাঁচু, তুমি নতুন বৌ নিয়ে আসবে—

কী অসহ্য ঢং ! দু'কলি যে বলে ন্যাংটো হয়ে নাচতে নেমে ঘোমটা টানা, এ বুঝি তারই আরেক নমুনা। পায়ে নীচে নরম কার্পেট, তবু পাঁচু আর দু'কলির দূরে ফেলে আসা মাটি দূরেই যেন লজ্জায় ফেটে দুফাঁক হয়ে যায়। দু'জনে সসংকোচে সোফায় বসে, ব'সে প্রাণপণে অল্প একটু হাসি ফোটায়।

সুধা বলে, বেশ মানিয়েছে দু'জনকে পাকা, নয় ? পাঁচু মনে মনে বলে, পাকার সঙ্গে তোমায় কিছু মানায় না।

ইতিমধ্যে অনন্ত ঘরে এসেছিল। কাল বিকালে সে এসেছে, আজ বিরাট এক জনসভায় বক্তৃতা দেবে। সে বলে, শুধু হাতে মুখ দেখলে নতুন বৌয়ের ?

সুধা বলে, দ্যাখো না পাকাব কাণ্ড, এমন সময় খবর দিলে যে একটা প্রেজেন্ট কিনে আনব তার সময় নেই। কি দিই আমি এখন ওকে ! তুমি ভাই আমাব এই পুরোনো জিনিসটাই নাও। কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মী মেয়ে। মনে করবে নাকি ?

নিজেব কানেব দুল খুলে সুধা দু'কলিকে পরিয়ে দেয়। সেজন্য অবশ্য আগে দরকার হয় দু'কলির কানের গয়না পবার ফুটো থেকে সরু রুপোর তাবের রিং দুটি খুলে ফেলার। তার মোট দাম, মজুরি সমেত সাত সিকে।

—বাঃ ! বেশ মানিয়েছে।

কি আব করা যায়। এরা বন্ধু, এদের আক্রমণ অহিংস। হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি ভারত-মাতার কানে পর্যন্ত এরা ইংবেজী ভদ্রতায় সোনার দুল পবিযে দিয়ে বলতে পারে, বাঃ, বেশ মানিয়েছে—দু'কলি কোন ছার ! তাই নিরুপায় হয়ে সয়ে যেতে হয়। এদের সাথে পীবিত করা তাদের ঝকমারি এই জন্য। নতুবা প্রতিবাদটা মনে মনে না আউড়ে পাঁচুও কি আর মুখ ফুটে বলতে পারত না যে ছি, তোমার এ উপহার কি ওকে মানায়, না ও ওটা নিতে পারে তোমার কাছ থেকে ? অনন্তবাবুকে দেখে বড খুশি হয়েছি আমরা—অনেকদিন বাদে কাল তুমি স্বামীর পাশে শুয়েছিলে। তাই বুঝি পাকা আজ ভোরে উঠেই এক কাপড়ে নাগপুবে চলেছিল, অনেকদিন পরে স্বামীকে পেয়ে সারা রাত একটিবারও ওকে তুমি আদর করার অবসর পাওনি বলে ?

এমনই অসহ্য লাগে পাঁচুর যে সেইখানে তখনই উঠে দু'কলির সোনাব দুল পরা কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে, বাড়ী গিয়ে খুলে ওতে পেচ্ছাব করে দিস বৌ।

দু'কলিও ফিস ফিস কবে বলে, দেব।

সুধা ভাবে, পাঁচু বুঝি তাকে প্রণাম করাব কথাটা দু'কলিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। দু'কলি প্রণাম না করায় সে আশ্চর্য হয়, আহত হয় তার চেয়ে বেশী !

অনন্ত বলে, কোন কলেজে ভর্তি হবে ভেবেছ পাঁচু ?

পাঁচু বলে, পডব কিনা ঠিক নেই। পডা বোধ হয় আর হবে না।

অনন্ত বলে, শিক্ষার যা ব্যবস্থা আব দেশেব যা অবস্থা, না পড়লেও আপশোষের কিছু নেই !

পাকা যখন সুধাকে পাঁচুর গাঁয়ের হাঙ্গামার কথা বলছিল, অনন্ত তা শুনেছিল। পাঁচুর সঙ্গে সে অনেকক্ষণ আলাপ করে, নানা বিষয়ে।

অনন্ত পাকা রাজনীতিক। একুশ সালের আন্দোলনে ভাল করে না নেমেও তর তর করে সে কংগ্রেসে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। দক্ষিণ আঁকড়ে থেকেও কৌশলে মাঝে মাঝে বাঁয়ে হেলে পড়ে নরম থেকেও মাঝে মাঝে গরম দলের সুরে কথা কয়। স্বরাজের দাবী দিয়ে আর যে দেশকে ঠেকানো যাবে না, উগ্র দলের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীই তুলে ধরতে হবে, এবারের কলকাতার কংগ্রেসেই সে এটা জানে নি, আগেই টের পেয়েছিল দেশের দিকে চেয়ে। কলকাতা কংগ্রেসে শুধু তার অনুমানটাই প্রকাশিত হয়েছে। সরকারকে এক বছরের নোটিশ দেবার নামে স্বাধীনতার দাবী পিছিয়ে দেবার জন্য অনিচ্ছুক অসহিষ্ণু সারা দেশটার সঙ্গেই এবার কংগ্রেস মণ্ডপে গান্ধীজিকে লড়াই করতে হয়েছে, গান্ধীজি ছাড়া কারো সাধ্য ছিল না বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধে নামতে উদ্যত দেশটাকে সংযত করে। শুধু তাই নয়। অনন্ত এটাও বুঝেছে,

দেশের মজুর চাষী সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড শক্তি মাথা তুলছে, নির্জলা দক্ষিণ মার্কা নীতি ধরে তার মত কম বয়সী নবাগত কোন রাজনীতিক আর বেশী দূর এগোতে পারবে না, সাধারণ মানুষের এই সংগ্রামী চেতনার নতুন বিকাশকে খানিকটা হিসাবে আনতে হবেই।

পাঁচুর মত যে ছেলেরা আজ উঠছে তাদের দাম আছে। একদিন এই পাঁচুর সমর্থনই হয় তো ভোট-যুদ্ধে তার অনেক কাজে লাগবে।

তাই, পাঁচুকে একটু সস্নেহ মর্যাদা দিয়ে সে তার সঙ্গে আলাপ করে। কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে পাঁচুর মনে কৌতূহল জমা ছিল। খেতে বসে সে প্রশ্ন করে, আপনি কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের পক্ষে জোরালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আবার মত পাল্টালেন কেন ?

—মত পাল্টাবো কেন ? বক্তৃতায় যা বলেছিলাম এখনো তাই বলি।

পাঁচু মাথা নাড়ে।—প্রথম বক্তৃতায় বললেন, অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করা উচিত। পরে—এক বছর আন্দোলন পিছিয়ে দেবার পক্ষেও সায় দিলেন।

অনন্ত একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। এতটুকু এই সব ছেলে তারাও তার সঙ্গে তর্ক করতে আসে, বড় বড় কত ঝুনো রাজনীতিক তার কাছে কাবু হয়ে গেছে। তবে এরকম জিদ ভাল, এরকম শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা তর্ক তোলে তারাই কাজের হয়—একটু বুঝিয়ে দিলেই খুশি। অনন্ত বলে, আমি যা বলেছিলাম মন দিয়ে তার রিপোর্ট পড়নি মনে হচ্ছে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আমি সমর্থন করেছিলাম, এখনো করি। স্বাধীনতা অবশ্যই আমাদের গোল হবে, স্বাধীনতার জন্য অবশ্যই আমরা স্ট্রাগল করব। কিন্তু স্ট্রাগলের তো নিয়ম আছে, কৌশল আছে ! শুধু কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চাই, স্ট্রাগল চাই বলে চেঁচালেই তো হয় না। এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পেলে আমরা ফাইট্ করব, এই ঘোষণাটাই তো কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের স্ট্রাগলের ঘোষণা—লেফটিস্টরা যা খুব কুঁদুলি চেয়েছিল এটাই তো তার কারেক্ট পলিটিক্যাল ফর্ম। বুঝলে না ? গান্ধীজির চেয়ে আমরা কি বেশী বুঝি ভাই। এ দেশে একমাত্র তিনি আছেন যিনি দেশের পালস্ ফিল করতে জানেন।

—সবাই পাগল হয়ে উঠেছে, এসময় এক বছর চুপ করে থাকতে বলা. .

—তুমি ঠিক ধরতে পারছ না। চুপ করে থাকতে তো বলা হয় নি। এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস চাই বলা মানেই যে ফাইট সুরু করে দেওয়া।

কে জানে এ কেমন ফাইট সুরু করা, রাজনীতিক কৌশলের মানের মধ্যে যে ফাইট গোপন হয়ে থাকে ! পাঁচু বুঝতে পারে না, তবে তর্কও সে আর করে না। কারণ, এ তর্কের মানেও সে বুঝতে পারছিল না ! সে অন্য কথা পাড়ে, বলে, মজুররা যখন প্যাণ্ডেল দখল করেছিল আপনি সে সময় ছিলেন ?

—ছিলাম বইকি। সে এক কাণ্ড হয়েছিল !

—কতজন হবে ?

—চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের কম নয়।

—চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার !

পাঁচু সিধে হয়ে বসে, মুখের সুস্বাদু পোলাও মাংসের গ্রাসটি চিবানো স্থগিত হয়ে যায়।

—বলুন না শুনি।

বলার কি আছে ? যা শুনেছ ব্যাপার তাই—বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে মার্চ করে এসে প্যাণ্ডেল জুড়ে বসল, কিছুতেই নড়বে না ! সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল, ব্যাপার কি ! ওরা না নড়লে সব কাজ বন্ধ, গান্ধীজি পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেলেন। কুলি মজুর তো, না আছে কাণ্ডজ্ঞান না জানে নিয়মনীতি ভদ্রতা। জহরলালের ঘোড়াকে পর্যন্ত এমন ভাবে ভড়কে দিল, তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, ছি, ছি। স্টান্টটা যারা খাড়া করেছিল তাদের কিন্তু বাহাদুর বলতে হবে। এতগুলি মজুরকে জোগাড় করা, কন্ট্রোল করা কি সোজা ব্যাপার ! এইদিক থেকে ব্যাপারটা সত্যি খুব সিরিয়াস।

ইতিহাসে কখনো যা ঘটে নি সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনতে শুনতে পাঁচুর চোখ জ্বল জ্বল করে, সুধা আর পাকাও খাওয়া ভুলে শুনে যায়।

পাঁচু বলে, আচ্ছা ভাবুন দিকি, শুধু কলকাতাতেই চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ! সারা দেশে এরকম লাখ লাখ আছে, এমনি ভাবে মার্চ করে তারা যদি গবর্ণমেন্টের সব ঘাঁটি দখল করে, একদিন আমরা ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে কাৎ করতে পারি।

তার উত্তেজনায় অনন্ত মৃদু হেসে বলে, তুমি ছেলেমানুষ, ওরকম ইচ্ছে তো তোমার করবেই ! এতো সত্যি কথাই, সকলে যদি একসঙ্গে স্বাধীনতা চায়, এক মুহূর্ত বৃটিশ রাজত্ব টিঁকতে পারে ? কিন্তু ওই যদিটা আছে বলেই মুস্কিল। সেইজন্যই পলিটিকস্ দরকার হয়। ওরকম একটা স্টান্ট হয়, ওতে তো পলিটিকস্ হয় না।

কে জানে, হয় তো তাই ! পাঁচুও তো জল্পনা কল্পনা করেছে যে দেশের লোক, যথেষ্ট লোক, যদি স্বাধীনতা চায়, ইংরেজ রাজত্ব বজায় থাকে কিসে ? তবে কি স্বাধীনতা চায় না দেশের লোক, যথেষ্ট লোক ? কিন্তু দেশের দিকে তাকালে

তো তা মনে হয় না। স্বাধীনতাব জন্য সাবাটা দেশ উন্মুখ উন্মাদ হয়ে আছে তাবই শুধু প্রমাণ মেলে। কিসে তবে বাধা দেয়, ঠেকিয়ে বাখে ? সকলে দাবী কবলেই স্বাধীনতা, দাবী সকলে কবছে, অথচ দাবী মিটছে না ! এ কি ধাঁধাঁ ?

তবে কি পলিটিকস্ যাবা কবে তাবাই ঠেকাচ্ছে ? দেশেব মানুষ মাথা তুলে হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিলে যা মিলবে সেটা মেকী স্বাধীনতা হবে, নেতাদেব পলিটিক্সেব মাবফতে এলে তবেই আসল খাঁটি জিনিসটা পাওয়া যাবে, এই জন্য ? এই জন্য দেশেব লোককে দাযিত্ব না দিযে কংগ্রেসকে সংগ্রাম কবতে হয়, কালীনাথদেব গোপনে বোমা বানাতে হয় ?

কে জানে !

সুধাই কথা ঘুবিয়ে দেয়, তাব সহ্য হচ্ছিল না। বলে, আব নয়, থাক। বাজনীতি চর্চা আব সয় না ! বান্না কেমন হয়েছে দু'কলি ? তুমি তো কিছুই খেলে না !

দু'কলি যথেষ্ট খেয়েছিল, পেট ভবে। থেকে থেকে পাকা দু'কলিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল, সেটা সুধাব চোখ এড়ায নি, তাব মুখেব ভাব কুটিল ও কঠিন হয়ে উঠছিল পাকা'ব তন্ময হয়ে দু'কলিকে দেখাব সময। খোঁচা দিযে কথাটা বলাও আশ্চর্য নয়—সকলেব সঙ্গে পাকাবও খেযাল কবিয়ে দেওয়া যে গেঁযো হ্যাংলা মেয়েটা মাছ মাংস পোলাও মিষ্টি কি গোগ্রাসে গিলছে দ্যাখো। অন্তত পাঁচুব তাই মনে হল।

খাওয়াব পব পাকা দু'জনকে নিজের ঘবে নিয়ে যায়, খানিক পবেই সুধা সেখানে গিয়ে হাজিব। পাকা তখন সামনা সামনি কাছাকাছি বসে দু'কলিব সঙ্গে কথা বলছিল।

বিকালে ভীমশ্রীতিলক মেমোবিযাল হলে বিবাট জনসভা। কলকাতাব কংগ্রেস অধিবেশনেব পব অনন্ত এই প্রথম এখানে এসেছে, মানুষ ভীড কবে তাব বক্তৃতা শুনতে আসে, প্রকাণ্ড হলটা ভবে গিয়ে বহুলোক বাইবে দাঁডিয়ে থাকে। দু'কলিকে নিয়ে পাঁচুব সভায় যেতে একটু দেবী হয়ে গিয়েছিল। পাকা তাদেব ছাডতে চায নি, বলেছিল সাবাদিন তাবা তাব বাডীতে থা—ে বিকলে একসঙ্গে সভায যাবে। ঘণ্টাখানেক থেকে পাঁচু জোব কবে বাডী ফিবে গিয়েছিল। একটু শোবে মনে কবে বিছানায় উঠে দু'জন কখন ঘুমিয়ে গেছে, ঘুম ভাঙতে বেলা কাবাব ! অল্প বয়সী ছেলেমেয়েব নতুন বিয়ে হলে বড্ড তাদেব ঘুমে ধবে।

হলেব কাছাকাছি গিয়ে পাঁচু দেখতে পায়, আবদুবীব চামডাব কাবখানাব চামাব ও শহবেব ধাঙব ঝাড়ুদাববা বাইবে ভিডেব একটু তফাতে দল বেঁধে দাঁডিয়ে আছে। পাকা সেইখানে বুডো নাপিব সঙ্গে কথা বলছে।

পাকাব অদ্ভুত বকম উত্তেজিত ভাব। পাঁচুকে দেখে একটু আডালে ডেকে চুপি চুপি বলে, আজ সভায কি সেনসেশন কবি দেখিস !

—কি কববি ?

—কাউকে বলবি না কিন্তু—বিশ্বাস কবে বলছি। আমি নতুন পথ খুঁজে পেযেছি—আজ এই সভা থেকে সুবু। নাঙি এদেব বাইবে দাঁড কবিয়ে বাখলাম তো—নতুন মামা বক্তৃতায হবিজনদেব কথা তুলবে, আমি তখন উঠে দাঁডিয়ে চ্যালেঞ্জ কবব ! বলব, শত শত হবিজন যখন সভাব বাইবে তফাতে পবেব মত দাঁডিয়ে ব'হু—দেখিস কি কাণ্ড কবি !

[ক্রমশ]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায

৪র্থ কিস্তি

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

—ভাল কবে ভেবে দেখেছিস তো ? এ কিন্তু যেমন তেমন সভা নয়।

—ভেবেছি বৈকি ! কতক্ষণ লাগে ভাবতে, সহজ স্পষ্ট কথা। অস্পৃশ্য হবিজন নিয়ে বড বড কথা বলা হবে—হবিজন কে ? যে মেথবটা বাডীব ময়লা সাফ কবতে আসে, যে মুচিটা বাস্তায় জুতো সাবায়। আমি নাপিদেব ডেকে এনেছি। ওবা সভায় ঢুকতে পেল না। জাযগা নেই ! সভায় যাদেব জাযগা হয় না তাদেব জন্য নাকি কান্না কাঁদাব মানেটা আজ টেব পাইয়ে দেব।

—তোকে যদি পাত্তা না দেয় ?

পাকা হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, পাত্তা দেবে না ? আমি বলব উচিত কথা, পাত্তা দেবে না ! অত সস্তা নয়।

পাঁচু আর দুকলিকে সাথে নিয়ে সামনের দিকে সম্মানের আসন দখল করে বসে, মঞ্চের ঠিক নীচে যে আসনগুলি মান্যগণ্যদের জন্য রিজার্ভ থাকে এবং সভা সুরু হওয়ার সময় না পেরিয়ে যাবা কদাচ সভায় আসে না। যেমন উৎসুক ও উজ্জ্বল তেমনই খুশি ও সন্তুষ্ট মনে হয় পাকাকে, আত্মবিশ্বাসের বিরাট ফাটলটা যেন যাদুমন্ত্রে জোড়া লেগে গেছে। ওবেলা নিজেদের বাড়ীতে তার আড়ষ্টভাব ছিল, এ বেলা এই প্রকাশ্য সভায় সে দুকলির সঙ্গে বিনা ভূমিকায় অন্তরঙ্গ হয়ে যায়, প্রাণখোলা হাসি তামাসা চালায়। বলে, দুকলিকেও আজ বক্তৃতা দিতে হবে, সভায় সে চাষী মেয়েদের দুঃখদুর্দশার কথা জানাবে। পাকাই তার নাম ঘোষণা করে দেবে—ভাল নামটা কি যেন দুকলির ? বলতে বলতে দুকলির মুখে আতঙ্ক ঘনিয়ে আসতে দেখে শুধু হেসেই পাকা আবার তাকে আশ্বস্তও করতে পারে যে ভয় নেই, সে তামাসা করছে।

এক বেলায় যেন বদলে গেছে অদ্ভুতভাবে। যে একটা খোলস ছিল সেটা শুধু ছেড়েই ফেলে নি, আরেকটা খোলস গজিয়েও ফেলেছে ইতিমধ্যে !

দেখে শুনে খুশি হয়েও পাঁচু ভেবে পায় না আগে থেকে খুশি হওয়া ঠিক হবে কিনা। পাকা যদি গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পেরে থাকে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। সবাই বুনছে অনিয়মের জটিল ফাঁদ নিজের তেজের চোটে খানিকটা দিশেহারা পাগলাটে হয়ে থেকেছে বেচারা, আবোল তাবোল বিদ্রোহই করে গেছে। একটা ডাইনীর মায়ায় সে পঙ্গু হয়ে জীর্ণ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য, এটা ঘটলে, সংসারে নিয়মনীতির মানে বোঝাই দায় হয়ে যেত। গরুতে মুড়িয়ে খেলে বুনো চারা আবার ডালপাতা গজায়, পাকার শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবার কি কারণ ঘটেছে ?

কিন্তু এ সভা কি তার আত্মজয়ের ভূমিকায় খাপ খায় ? এইটুকু ভাবনা পাঁচুর। দেশের জন্য স্বাধীনতার জন্য ত্যাগী জেলখাটা সৎ মানুষে জমজমাট এই সভা, এখানে তো শুধু ফাঁকিবাজ আর রাজনীতির ব্যবসায়ীরাই এসে জোটে নি। পাঁচু কাশীনাথদের উপায়ে বিশ্বাসী, কিন্তু একই ভাবের ভাবুক সাধারণ মানুষের বড় সমাবেশ তাকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় পঞ্চাশ হাজার তুচ্ছ কুলি-মজুর একজোট হয়ে কংগ্রেস-মণ্ডপ দখল করেছিল এ সংবাদে পর্যন্ত তার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাই মঞ্চে আর নীচে জমায়েৎ অহিংসায় বিশ্বাসী খদ্দর-পরা আন্তরিক দেশভক্ত মানুষগুলিকে সে শ্রদ্ধা করে ওরা বহু দুর্দমনের মুক্তি কামনার প্রতিনিধি। ওদের ওজন, ওদের গুরুত্ব নেহাৎ মূর্খ ছাড়া অস্বীকার করতে পারে না। ছেলেমানুষ পাকা কি এদের নীতি আর বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে পার পাবে ?

হয়তো শুধু লজ্জা পাবে, অপদস্থ হবে। আবার রাতারাতি উল্টো দিকে ঘুরে যাবে পাকার মন। আরও মারাত্মক হতাশার গভীর অতলে তলিয়ে যাবে।

ঠিক সামনে মুখোমুখি বসে আছে রোগা ও ফর্সা সুশীলবাবু, সিক্সথ্ ক্লাসে পাঁচুদের ইতিহাস পড়াত। সাতটি মেয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দ্বিধা না করে একুশ সালের আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে জেলে গিয়েছিল সংসার ছারেখারে দিয়েও আজও সে একাগ্র একনিষ্ঠ কংগ্রেস-সেবক। সভায় আজ এরকম কতজন এসেছে।

কাণ্ড পাকা সত্যই করে—সেরকম কাণ্ড পাঁচু কল্পনাও করতে পারে নি। এমন ধীর ভাবে সুকৌশলে অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে পাকা এরকম একটা ব্যাপার ঘটাতে পারে, শুধু পাঁচু কেন, পাকাকে যারা জানত তাদের একজনও আগে বিশ্বাস করতে পারত না। সে একটা হৈ চৈ গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে, খুব বেশী হলে সভার কর্তাব্যক্তিদের মানতে সে বাধ্য করাবে যে তার প্রতিবাদটা খুবই যুক্তিসঙ্গত, নাস্তিদের সভায় ঢুকতে না দেওয়া অন্যায় হয়ে গেছে। সাময়িক একটু বিশৃঙ্খলার পর আবার সভার কাজ চলতে থাকবে। কিন্তু পাকার মত একটা ছেলে যে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিরাট একটা সভাকে বয়স্ক অভিজ্ঞ সম্মানিত একজন ব্যক্তির মত কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলবে, ঘন ঘন হাততালি ও বন্দেমাতরম জয়ধ্বনিতে সমস্ত হলটি মুখরিত করে তুলবে, মঞ্চের নেতারা পর্যন্ত তাকে বিজয়ী বীরের সম্মান দেবে, কে তা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল ? পাকা ! আমাদের সেই পাকা !

নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পরে সভার কাজ সুরু হয়। সভাপতি ভুবন—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচনে ভৈরবের সঙ্গে লড়ায়ে নেমে একদিন সে পাকার তুচ্ছ একটা ছেলেমানুষী মারামারির ব্যাপারকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে শহরের ভদ্রসমাজের জীবনমরণ সমস্যায় দাঁড় করিয়ে নয়নতারা ক্লাবে পাকার প্রকাশ্য বিচারের মধ্যে ভৈরবকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল এবং আচমকা হাজির হয়ে অনন্ত এক রকম ছেলেখেলার কায়দায় ফাঁস করে দিয়েছিল তার মতলব। সে সব ব্যাপার মিটে গেছে, ভাব হয়ে গেছে ভৈরব আর ভুবনের। ইলেকশনে জিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার চেয়ে একটা বড় স্বার্থ ছিল ভৈরবের, ভুবন একদিন গিয়ে আপোসে দুজনের বড় স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে আসে। ভৈরব সরে দাঁড়ায় নির্বাচন থেকে, ভুবন ন'হাজার টাকা খরচ করে ভৈরবের কাজটা হাঁসিল করে দেয়। ও টাকা ভুবন ইতিমধ্যেই তুলে নিয়েছে, আরও অনেক গুণ তুলে নেবে। তাই, অনন্ত সম্পর্কেও এখন তার অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ মনোভাব। অনন্তকে সম্মানিত করতে সে এ সভায় সভাপতি হয়েছে। সভাপতি হয়ে সম্মানিত করতে নয়, ভুবনের সভাপতিত্বে অনন্তের সম্মান বাড়ে না বরং যে সভায়

অনন্ত প্রধান ব্যক্তি, সে সভার সভাপতি হতে পাবাটা তার পক্ষেই পরম সম্মানের ব্যাপার। সভাপতি হিসাবে অনন্তের গুণকীর্তনের দ্বারা তাকে সম্মানিত করার জন্য।

সত্য কথা বলতে কি, বন্দেমাতরম সংগীতের পর ভুবনের বিশ মিনিট ব্যাপী ভূমিকায় অনন্তের নির্লজ্জ প্রশংসা কীর্তন সমস্ত সভাটিকে লজ্জা সংকোচের অস্বস্তিতে বারবার কাঠ কবে দেয়। ভুবন যেন বারংবার ইঙ্গিত দেয় যে গান্ধী মতিলাল চিত্তরঞ্জন যতীন্দ্রনাথ প্যাটেল আছে বটে কিন্তু প্রধানত আমাদের এই অনন্তলালের জন্যই তারা আছে, নইলে কি থাকত।

অনন্ত বুদ্ধিমান। বক্তৃতা দিতে উঠে সে ভুবনের অতিশয়োক্তির কোন সবিনয় প্রতিবাদের ভূমিকা পর্যন্ত করে না। কিছুক্ষণ নতমুখে হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুবনের মত আহাম্মক সংসারে অনেক আছে বলে অনন্তের মত বুদ্ধিমানদের এই ধরনের কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছে। তা ছাড়া উপায় কি। হাজার তিনেক মানুষ যে জড়ো হয়েছে সভায়, তাদের মোট সমগ্র চেতনাই যে-চরম বিচার এবং সে চেতনা শস্তা চালাকিবাজীর অতীত। ওরা বোঝে, ওবা মর্ম ধরতে পারে। ওরা যে বোঝে, ওরা যে মর্ম ধবতে পারে—এইটুকু জ্ঞানই তো যে-কোন রাজনীতিকের দুর্গম পথের সর্বনিম্ন কানাকড়ি পাথেয়। ভুবন ন্যাকামি করেছে, তোমরা তা বুঝেছ, আমিও তা বুঝেছি, এ বিষয়ে একটি কথা না বলেও আমি তাই মাথা হেঁট কবে জোড় হাতে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি অবশ্য মস্ত লোক, বিরাট ব্যক্তি, ভুবন যে আসলে খুব ভুল কথা বলেছে তা নয়, কিন্তু বোকার মত এমনভাবে আমাকে সে বড় করেছে যে তাতে আমার বড়ত্ব লজ্জায় মুখ ফুটে বক্তৃতা সুরু করতে পারছে না।

অনন্ত চমৎকার বক্তৃতা দেয়—হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা। তার আরম্ভটাই অদ্ভুত—একেবারে যেন নিজের আত্মীয়স্বজনের ঘরোয়া একটা সমাবেশে পারিবারিক কোন গুরুতর বিষয়ে সে কথা সুরু করেছে।

—আমি অনেকক্ষণ বলব। আমার অনেক কথা বলার আছে। আপনাদের ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। একবার যদি দেশের দিকে তাকান, মায়ের অবস্থাটা একবার যদি বুঝবার চেষ্টা করেন—

হবিজনদের কথা সে তোলে প্রায় আধঘণ্টা বলার পর, ভারত-মাতার মজুর সন্তানদের অন্যায় অসন্তোষের মর্ম ব্যাখ্যা করার প্রসঙ্গে। হরিজনরা এদেশের আদর্শ সেবক, আদর্শ শ্রমিক। শিবের মত তারা কর্মসমুদ্র মন্থনের বিষ গ্রহণ ক'রে সৃষ্ট রক্ষা করে, নিজেরা সব ত্যাগ ক'রে দূবে শ্মশানে মশানে মহাযোগীব জীবন যাপন করে।

—অস্পৃশ্যতা তাই আমাদের চরম অভিশাপ। অস্পৃশ্যতা দূর না ক'রে স্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের কোনদিন সফল হবে না। স্বাধীনতার সাধনায় সকলের অগ্রগামী কে, কে আমাদের স্বাধীনতা কামনার মূর্ত প্রতীক? তিনি গান্ধীজি। তার দিকে তাকালে কি দেখি? তিনি সর্বত্যাগী—তাঁর ত্যাগের তুলনা একমাত্র তিনি। গান্ধীজিকে অস্পৃশ্য ক'রে দূরে সরিয়ে রেখে স্বাধীনতাব কথা আমরা ভাবতে পারি কি? তেমনই আমাদের সমাজে যারা সর্বত্যাগী, যাদের ত্যাগের তুলনা একমাত্র তারাই দেখাতে পেরেছে আমাদের অস্পৃশ্য হয়েও আমাদেরই সেবায় জীবন দিয়ে, সেই হরিজনদের আগে বুকে না টেনেও আমরা স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারি না। হবিজন আন্দোলনের এই মর্ম কথা—

ঠিক এইখানে উঠে দাঁড়িয়ে পাকা স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় বলে, আমি একজন হরিজন প্রতিনিধি, এই সভায় উপস্থিত শ-দুই হরিজনেব পক্ষ থেকে আমি কয়েকটি গুরুতর কথা নিবেদন কবতে চাই। আগামী কাল আমাদের প্রতিনিধি গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করবে। বিষয়টির গুরুত্ব এত বেশী, সকলেব এ বিষয়ে জানা এত দরকার যে বাধ্য হয়ে সভার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ভুবন বলে, পরে বলবে, পরে। বসে পড়ো, বসে পড়ো।

সভার চারিদিক থেকে রব ওঠে: বলতে দিন। বলতে দিন। আমরা শুনতে চাই। বলতে দিন।

এটুকু সোজা পরিষ্কার স্পষ্ট খোলা গলায় বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করে, স্বয়ং গান্ধীজিকে টেনে এনে, সভায় প্রবল কৌতূহল সঞ্চার করা কঠিন নয়। এ কৌতূহল না মিটিয়ে সভার কাজ চালানোও সম্ভব হয় না। একটু ইতস্তত করে অনন্ত মুখে হাসি ফুটিয়ে দু'হাত তুলে সভার কলরব শান্ত করে, পাকাকে ডেকে বলে, তুমি এখানে উঠে এসো। এখানে দাঁড়িয়ে বলো।

একটু সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে দাবী করলে এটুকু সুযোগ যে কেউ পেতে পারে। আসল ঝক্কিটা আসে তখন। এভাবে সভায় উত্তেজিত প্রত্যাশা সঞ্চার করিয়ে তা মেটাতে না পারলে, সত্যসত্যই সভার বিচারে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে না পারলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ক্রুদ্ধ হয়ে সকলে টিটকারী দেয়। পাঁচু তাই রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করে। পাকা কি সামলাতে পারবে?

মঞ্চে উঠে সভাপতির টেবিলের কোণে একটি হাত রেখে মাথা উঁচু সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে পাকা সুরু করে, মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত দেশভক্ত ভদ্রমহোদয়গণ—

নিজের বয়স ও অভিজ্ঞতার অভাব, নাম ও প্রতিষ্ঠার অভাব, নিছক একটু সাময়িক কৌতুহল [কৌতূহল] ভিন্ন তার কথা শুনতে সভার লোকের কোনরূপ ইচ্ছার অভাব, সব যেন পাকা ভুলে গেছে। তার এক অদ্ভুত আত্মসমাহিত ভাব,

প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে পর্যন্ত এক আশ্চর্য দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা। পাঁচু বুঝতে পারে, পাকা নিজেকে ভুলে গেছে, যে ভাবে সে মশগুল সে ভাব ছাড়া বিশ্বসংসার ভুলে গেছে। পাকার এ অবস্থা পাঁচুর একেবারে অপরিচিত নয়। কিন্তু এত বড় একটা সভায় এতলোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ? পাঁচু অভিভূত হয়ে থাকে।

পাঁচু যেরকম ভেবেছিল, সেরকম বুঢ় স্থূল আক্রমণের মধ্যে হরিজন সম্পর্কে শুধু তার নালিশটা প্রকাশ ক'রে পাকা শেষ করে না। নাপিরা সভায় স্থান না পেয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হওয়ায় দেশসেবকদের যে নিন্দনীয় মনোভাব, শোচনীয় আত্মপ্রতারণা প্রকট হয়ে পড়েছে তার তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে পাকা ঘোষণা করে : আজকের এই একটি ঘটনার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়। হরিজন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি আর কাজের মধ্যেই এই গরমিল, এই ফাঁকি, জ্বল জ্বল করছে। গান্ধীজি কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছেও গোড়াব গলদটা সুস্পষ্ট নয়। সমস্ত হরিজন আন্দোলনের মধ্যে ফুটে ওঠে কি ? ফুটে ওঠে এই সত্য যে আমাদের কাছে হরিজনরা আসল নয়, হরিজনরা প্রধান নয়, তাদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলনটাই সব। মানুষ হয়ে হরিজনবা যে অমানুষিক অকথ্য অবস্থায় জীবন কাটায় সেটা আমাদের কাছে প্রথম ও প্রধান সত্য নয়, সবার বড় অন্যায় নয়, হরিজনদের প্রতি আমাদের দরদের অভাব, আমাদের উদাসীনতা আমাদের কাছে বড় কথা, বড় অন্যায়। হরিজনরা মরুক বাঁচুক চুলোয় যাক তাতে কিছু আসে যায় না—আসে যায় একমাত্র আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা আর না থাকায়। এই যে পাকা আজ শহরের হরিজনদের প্রতি সভাব অসঙ্গত আচরণের প্রতিবাদ করতে দাঁড়িয়েছে, সভা হয়তো তার প্রতিবাদ মেনে নেবে, স্বীকার করবে, হ্যাঁ, কথা ও কাজে ফাঁক ঘটে গেছে, এটা অনুচিত। কিন্তু না, শুধু এইটুকু দেখিয়ে দিতে পাকা দাঁড়ায় নি। হরিজনদের বিষয়ে আমাদেব কথা ও কাজের পার্থক্য মেনে লজ্জা বোধ করে এ প্রশ্ন শেষ করে দেওয়ার মধ্যেই আমাদের স্বার্থান্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ লুকানো আছে সেটাও পাকা সকলকে দেখিয়ে দিতে চায়। মজুবচাষী অভাজন হরিজনদের সম্পর্কে বড বড কথা বললাম, কাজে তাদের অবজ্ঞা করলাম এবং এটা অন্যায় জেনে লজ্জা পেলাম, তাব অর্থ কী ? তার অর্থ, মজুরচাষী অভাজন হরিজনদের চেয়ে আসল হল ওদের হয়ে ওকালতির কায়দাকানুনের আন্তরিকতা—ওদের সম্পর্কে আন্তরিকতা নয। ওবা যেন আমাদের মক্কেল, মক্কেলেব মর্যাদাটুকু না দেওয়া ভুল হয়েছে অন্যায় হয়েছে মনে করা আমাদেব হীন অহংকারেরই পরিচয়। রিক্ত বঞ্চিত নিপীড়িত অবজ্ঞেয় মানুষরাই তো আমাদেব উকীল মক্কেল মোকদ্দমা সব—স্বাধীনতার জীবন্ত সওয়াল, প্রত্যক্ষ যুক্তি, আমোঘ দাবী।

আমরা কি ভাবি না ভাবি তার চেয়ে হরিজনরা বড়—এটা আমাদের বুঝতে হবে, বাজনৈতিক মক্কেলেব বদলে মানুষ হিসাবে তাদের মানতে হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের একটু মর্যাদা দিলে চলবে না। এই শহরে যে হরিজনবা বাস কবে, তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলে—

পাকা নাপিদের বস্তির জীবনের বর্ণনা দেয়, ধর্মঘট করায় তাদের বস্তিতে আগুন দিয়ে কয়েকজনকে হত্যা করাব কাহিনী বলে। এ সব তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা, বর্ণনাটা অত্যন্ত জীবন্ত হয।

পরিশেষে পাকা ঘোষণা করে, শহরের হরিজনদের প্রতিনিধি হিসাবে পরদিন সে-ই গান্ধীজিব সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওনা হবে। উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের সঙ্গে হরিজনদের উপর যে বিশেষ অনাচাব অত্যাচার চলে তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তোলায় গান্ধীজির সমর্থন লাভ, শুধু অস্পৃশ্যতা দূর করে লাভ হবে না। এই শহরে, সারা বাংলায়, সারা ভারতে হরিজনদের একটা প্রকাণ্ড হরতাল পালনের চেষ্টা হবে। উপর থেকে আন্দোলন নয়—হরিজনরা নিজেরাই সমাজকে টের পাইয়ে দেবে তারা তুচ্ছ নয়, তাদের বাদ দিয়েও সমাজ চলে না !

পাকা আধঘণ্টার বেশী বলে। ভুবন ও মঞ্চের আরও কয়েকজন উশখুশ করে, কিন্তু সভার ভাব দেখে কিছু বলতে সাহস পায় না। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নেমে এসে পাকা তার চেয়ারে বসে। অনন্তের প্রস্তাবে নাপি এবং আরও চারজন হরিজনকে মঞ্চে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়—সকলকে সভায় ঢোকানো সম্ভব ছিল না। তারপর বক্তৃতায় সংক্ষেপে কংগ্রেসের হরিজন আন্দোলন থাকতে হরিজনদের নিজেদের আন্দোলন গড়ার অবাস্তবতা ও অসার্থকতা দেখিয়ে অনন্ত অন্য কথায় চলে যায়—কলকাতা কংগ্রেসেব প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে। সভা আবার জমে যায়, সবাই মন দিয়ে শোনে। কিন্তু পাকার মতো ঘন ঘন করতালি অনন্ত পায় না।

সুধাও সভায় গিয়েছিল, মঞ্চে বসেছিল। পাঁচু আর দুকলির সঙ্গে পাকাকে এসে বসতে দেখেছিল, পাকার বক্তৃতা শুনেছিল। অনন্তের সঙ্গে গাড়ীতে বাড়ী ফেরার সময় সমস্ত পথ সে অন্যমনা হয়ে থাকে, অনন্তের কথার ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা জবাব দেয়।

চা খেতে বসে অনন্ত বলে, রাত্রেই সব গুছিয়ে রেখো। সকালে সময় পাবে না।

সুধা বলে, আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

—আবার ওই কথা তুলছ ? যাবে ঠিক করলে, এখন আবর বলছ ইচ্ছে করছে না ?

—কেন যে এত জোর জবরদস্তি করছ ! ইচ্ছে করছে না, দু'দিন পরেই নয় যাব ?

অনন্ত গম্ভীব মুখে বলে, দু'দিন পবে ক'বে ক'বে ক'মাস কাটালে খেয়াল আছে ? আমি ওখানে একা পড়ে থাকব, তুমি এখানে ফুর্তি কববে—

সুধা টলে যায় ফুর্তি কিসেব ?

—তবে কেন তুমি এখানে থাকতে চাও ?

—আমাব শবীব ভালো না। কলকাতাব হৈ চৈ আমাব সয় না।

—হৈ চৈ ক'বো না। বাড়িতে বিশ্রাম ক'বো। তোমাব শবীব খাবাপ, তোমাকে আমি কী কবে একা বেখে যাব ?

সুধা আব কথা বলে না। কিছুক্ষণ পবেই বাড়ীতে লোকজন আসতে আবম্ভ কবে, অনন্তকে বাত এগাবোটা পর্যন্ত বসবাব ঘবে আলাপ আলোচনা কবতে হয়। সভাব পব পাকা ফেবে নি, নাড়িদেব শোভাযাত্রায় সঙ্গে গিয়েছিল। হলেব বাইবে নাড়িদেব জমায়েতে পাকা সভায় তাদেব সম্পর্কে কি বলেছিল বুঝিয়ে বলায় নাড়িবা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাকে সামনে নিয়ে শোভাযাত্রা কবে। সাড়ে ন'টাব সময় অনন্তেব কাছে সংবাদ আসে, শহবে গুরুতব হাঙ্গামা হয়েছে, পাকাকে পুলিশে ধবে নিয়ে গিয়েছে।

কি হাঙ্গামা ?

ব্যাণ্ড বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে মহা সমাবোহে বাজা জয়শ্রীতিলকেব ভাই কুমাব সুবশ্রীতিলকেব বিয়েব বিবাট শোভাযাত্রা চলছিল, নাড়িদেব শোভাযাত্রাব সামনাসামনি পড়ে যায়। বাজপথে কাব অধিকাব বেশী, কোন শোভাযাত্রা কোনটিকে পথ ছেড়ে দেবে ? ধাঙড় চামাবদেব শোভাযাত্রাই নিশ্চয ! পাকা বলেছে, না তা হবে না। নাড়িবাও সায় দিয়ে বলেছে, না তা হবে না। তাবা অর্ধেকেব বেশী বাস্তা ছেড়ে দিয়ে শোভাযাত্রা কবছে, বিয়েব শোভাযাত্রাই সমস্ত পথ জুড়ে চলেছে। তাদেব পাশে যথেষ্ট পথ ফাঁকা আছে, তাবা নয় আবও ধাব ঘেঁষে গিয়ে আব ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আবও জায়গা বাড়িয়ে দেবে, বিয়েব শোভাযাত্রাকে চওড়ায় ছোটো হয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে তাদেব। বিয়েব শোভাযাত্রা একটু অসুবিধা স্বীকাব কবলে দুটি শোভাযাত্রাই অনায়াসে পবস্পবেব পাশ কাটিয়ে এগোতে পাববে। কিন্তু বাজকুমাবেব বিয়েব শোভাযাত্রা কি কখনো ধাঙড় চামাবদেব যুক্তি মেনে অপমান ববণ কবতে পাবে ? ধমক ধামক চোটপাট গালাগালি দিয়ে ভয় দেখিয়ে নাড়িদেব তাবা হটিয়ে দিতে চায়।

পাকা বলে চোপবাও !

নাড়িবা গর্জন কবে ওঠে, চোপবাও !

তাবপব সংঘর্ষ, পুলিশেব আবির্ভাব, নাড়িদেব উপব লাঠিচার্জ, পাকা ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তাব। চিবদিন যেমন ঘটে থাকে।

সুধাও জেনেছিল। এসব খবব বাতাসে ছড়িয়ে যায়। অনন্তকে সে দু বাব অন্দবে ডেকে পাঠায়। অনন্ত এলেই বলে বসে গল্প কবছ ? পাকাকে ছাড়িয়ে আনবে না ?

—আমি ? আমি পাবব না।

—সেকি ! পাকা জেলে পচবে ?

— পচবে। ধাঙবদেব সঙ্গে জুটে মাবামাবি কববে, এ ব্যাপাবে আমি নেই।

সুধা স্তব্ধ হয়ে অনন্তেব মুখেব দিকে চেয়ে থাকে।

—তুমিও তো পাঁচজন ধাঙড়কে অভ্যর্থনা কবে সভায় পাশে বসিয়েছিলে ?

—সে আলাদা কথা।

সুধা আব তর্ক কবে না। গাড়ী বাব কবাব হুকুম দেয়।

—কোথা যাবে ? থানায় ?

—দবকাব হলে যাব। আগে ভৈববাবুব বাড়ী যাচ্ছি।

মুখ থম থম কবে অনন্তেব, চোখে ক্রুব দৃষ্টি দেখা দেয়। একটা সিগাবেট ধবিয়ে আচমকা সে ভ্রূযিংবুমে ফিবে যায়।

ভৈবব বলে, তাই তো। ও ছেলেকে নিয়ে আব পাবা গেল না !

সুধা বলে, সে তো পবেব কথা। আগে জামিনেব ব্যবস্থা করুন ? তাড়াতাড়ি যান—ও যা ছেলে থানায় আবাব না একটা কাণ্ড কবে বসে।

ভৈবব যেন কেমন ভাবে তাকায় সুধাব দিকে, নাক টেনে কেমন ভাবে যেন মৃদু খাঁকাবি দিয়ে ঢোক গেলে। বলে অ্যাঁ ? হ্যাঁ। জামিন ? তা জামিনেব জন্য আমায় যেতে হবে না। আমি একটা নোট পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাতেই হবে।

—নোটটা আমায় দিন।

ভৈবব আবাব যেন কেমন ভাবে তাকায়।

—তোমাব যাবাব দবকাব নেই।

সুধা ছাড়বে না। বলে, না, আমাকেই দিন। গাড়ী এনেছি, ফেবাব পথে ওকে তুলে নিয়ে যাব।

ভৈরব বলে, তুমি নিজে গেলে আমার চিঠি কি হবে ? তুমি বললেই যথেষ্ট।

—আমি নামব না, গাড়ীতে থাকব। ড্রাইভার আপনার চিঠি নিয়ে যাবে।

ভৈরবের চিঠি নিয়ে সুধা সোজা থানায় চলে যায়। ড্রাইভারকে ভিতরে পাঠিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভার একা ফিরে আসে।

—কি হল ?

—পাকাবাবু জামিন নেবে না।

—নেবে না ? কেন ?

—বললে, সঙ্গে যাদের ধরেছে তাদেরও জামিন দিতে হবে। একা জামিন নেবে না।

সুধা কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে।

—বাড়ী চল।

সামান্য কিছু খেয়ে সুধা শুতে যায়। তাকে বেশ শান্ত মনে হয়, এতক্ষণের উত্তেজনার কোন লক্ষণ নেই। অনন্ত তাকে নীরবে লক্ষ্য করছিল, এতক্ষণে বলে, পাকার কি হল ?

—নাঃ, ও একা জামিন নেবে না। কাল সকলের জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

—কে করবে ? তুমি ?

—তোমরা যখন করবে না, আমাকেই করতে হবে।

—তুমি তো সকালে ন'টার গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছ।

অনন্তের কণ্ঠ শান্ত, গম্ভীর।

সুধা হাই তোলে। মৃদুস্বরে বলে, কাল আমার যাওয়া হবে না।

—কাল তুমি যাচ্ছ।

—জোর করে বেঁধে নিয়ে যাবে ?

—না। তুমি নিজেই যাবে। এ পর্যন্ত বলি নি, এবার বলা দরকার। পাকাকে নিয়ে তুমি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছ। তুমি বুঝতে পার না, কিন্তু সংসারে সবকিছুর সীমা আছে। সবাই নানা কথা বলাবলি করছে। কাল আমার সঙ্গে না গেলে বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারি হবে।

—হলে হবে।

—তার ফলাফল বুঝতে পারছ ?

—আমায় ত্যাগ করবে, এই তো।

—সেটা তোমার কাছে কিছু নয় ?

—না। কিছু নয়।

অনন্ত স্তব্ধ হয়ে একটা সিগারেট ধরায়। আচমকা পাশের ঘরে চলে যায়। দু'ঘরে তারা দু'জনে কে কত রাত জেগে কাটায়, অপরজন টের পায় না—সুধা বিছানায়, অনন্ত ইজিচেয়ারে। অনন্ত যদি বা ঘুমায়, সুধা জেগেই রাতটা কাটিয়ে দেয়। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে ছটফট পর্যন্ত না ক'রে জেগে রাত কাটানো যে মানুষের পক্ষে সম্ভব এটা সুধার জানা ছিল না। অনন্ত যদি একটিবার উঠে আসত, আরেকবার তার সঙ্গে ঝগড়া করত, বুকে কত জোর পেত সুধা। এত সংক্ষেপে বোঝাপড়া শেষ করে অনন্ত ও ঘরে চলে গেছে, তার আর কিছুই বলার নেই—ভাবলেও সুধার ভেতরটা হিম হয়ে আসে। অনন্তও কম একগুঁয়ে কড়া মানুষ নয়।

সকালে উঠেই সুধা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলে। কান্না পাওয়ায় বারকয়েক বাথরুমে গিয়ে কেঁদে আসে। সাড়ে আটটায় জিনিসপত্র নিয়ে অনন্তের সঙ্গে সে রওনা হয়ে যায়।

[ক্রমশ]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ম বা শেষ কিস্তি

জীয়ন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

কাজ খুঁজতে লেগে গিয়ে পাঁচু টের পায় এ বড় মন্দ মজা নয়। কাজের বাজারেও দারুণ মন্দা, খেটে খাওয়াতেও বিষম দুর্ভিক্ষ। যোয়ান যোয়ান কাজ-জানা কত মরদের কাজ জোটে না, তার মত আনাড়ি ছোকরার দিকে কে তাকিয়ে দেখতে চাইবে। মনের মত কাজ জোটা অসম্ভব। যাহোক কিছু একটা জোটার ভরসাও কম।

মনের মত কাজটা ঠিক কি তার পরিষ্কার ধারণা নেই। শুধু এইটুকু সে জানে যে এমন কাজে ঢোকা উচিত যাতে ধাপে ধাপে শিখতে শিখতে এগোনো যায়, ওঠা যায়। কাজ তাকে শিখতেই হবে, যে কাজেই ঢুকুক। কিন্তু একটা কাজের যেটুকু দরকার অল্পদিনে শিখে নিয়ে শেখা খতম করে সারাজীবনের মত ওইখানে আটকে যাবার সাধ তার নেই। সাধ তো নেই, সুযোগ আছে কি ?

পাঁচু কানাইকে বলে, তোর দোকানেই কাজ শেখা। বসে খেতে পাবব না ভাই।

কানাই মাথা নেড়ে বলে, বসে খাবার জন্য নয়। আমিই তোকে বলব ভাবছিলাম, এবার নিজের পথ দ্যাখ্। এখানে তোদের আর থাকা উচিত নয়। নানা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, বিপদে পড়বি।

—বিপদের পথেই নামব ভাবছিলাম।

—ও।

কানাই এক মুহূর্ত ভাবে। বলে, তাহলেও তোকে কিছুদিন অপেক্ষা কবতে হবে পাঁচু। আগে তাড়াতাড়ি হত—এখন এই মুহূর্ত একটু মুস্কিল আছে। অন্যেরা বড় বড় প্ল্যান করেছে, চাটগাঁ নিয়ে নানারকম কানাঘুষো শুনছি। বিরাট ব্যাপার নাকি ঘটবে। আমাদেরও তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার। নইলে—বুঝলি না ?

পাঁচু সায় দেয়। এক পথের যাত্রী দলের মধ্যে এগিয়ে চলা পিছিয়ে পড়া নিয়ে রেশারেশি বোঝা কঠিন নয়।

কানাই বলে, কাজেই তোদের সরে যাওয়াই ভাল। কি দাঁড়ায় না দাঁড়ায় ঠিক নেই, মিছামিছি হাঙ্গামাব জড়িয়ে লাভ কি ? তার কোন মানে হয় না। এই ক'দিন এখানে থেকে গেলি, এইজন্যেই হয়তো তোর অনেক গুঁতো জুটবে ! বন্ধু হিসেবে যদি কিছু সাহায্য করতে চাস, তফাতে থেকেই সেটা ভাল পারবি। কে বলতে পারে তোকে দিয়ে কত বড় উপকার হবে ? আমাকেই হয় তো একদিন ফাঁসি থেকে বাঁচিয়ে দিবি ! কালীদা বলেন, সময় বিশেষে একজনের অতি তুচ্ছ একটু সাহায্যের ওপর বিপ্লবীর জীবনমরণ নির্ভর করে।

পাঁচু ভাবে, কি করা যায়। কয়েকটা দিনের উদয়াস্ত প্রাণপণ চেষ্টার মধ্যে যেন স্পষ্ট ও অভ্রান্ত হয়ে উঠেছে এই সত্যটা—চাষীর ছেলে একটু লেখাপড়া শিখেছে কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে বাপদাদার সেই চাষবাসে মুখ গুঁজে দেওয়া ছাড়া গতি নেই : যাতে আর দিন চলে না !

তার বাপ খুড়ো আরও কয়েক সন আধখানা বেঁচে টিঁকিতে পারে, তার উপায় নেই গাঁয়ে তিনবেলার ভাত রোজগার করে। আপন জন তার কাছে কত আশা করেছিল।

পাকা তাকে বলে, আমার সাথে কলকাতা চল। যেমন চাইছিস হয় তো জুটে যেতে পারে। না জুটলে ফিরে আসবি, ক'দিন বেড়ানো হবে।

পাকার সঙ্গে নাগুিরাও সকলে দিন তিনেক আটক থেকে ছাড়া পেয়েছিল। পাকাকে কোন মতেই ওদের থেকে পৃথক করতে পারা যায় নি বলে অগত্যা বিনা শর্তে সকলকেই মুক্তি দিতে হয়েছে। পাকা কার ছেলে কার ভাগ্নে কার ভাইপো এসব বিবেচনা থেকে নয়। পাকা যদিও স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল নাগুদের শোভাযাত্রা পরিচালনা করা, রাজপরিবারের বিয়ের শোভাযাত্রার অন্যায় আব্দারের প্রতিবাদে ওদের নিয়ে রুখে দাঁড়ানো, রাজার লোকেরা মারতে এলে মারপিট করা—সব বিষয়ে সেই আসল অপরাধী, তবু তাকে সামান্য কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিয়ে নাগুিদের কয়েকজনকে জেলে দেওয়া চলত। পাকার কম বয়সের অজুহাতটা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় দিন বিকালে স্বয়ং ভৈরব দেখা করতে গেলে জেলার কর্তাব্যক্তিটি তাকে এই আশ্বাসই দিয়েছিল—ভৈরবও তাতে রাজী হয়। কিন্তু মুস্কিল হল সহরের মানুষগুলিকে নিয়ে। অনন্তের সভায় পাকার বক্তৃতা, হরিজনদের শোভাযাত্রা, বিয়ের শোভাযাত্রার সঙ্গে সংঘর্ষ এবং শেষে পাকাদেরই লাঠিপেটা করে হাজতে পোরা—ব্যাপারটা সহরের সাধারণ মানুষের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। স্কুলের ছেলেরা অসন্তোষটাকে প্রথম প্রকাশ্য রূপ দেয়। কর্তাদের কাছে খবর পৌঁছতে থাকে, চারিদিকে ক্রোধ ফেনিয়ে উঠছে, আলোড়ন বাড়ছে। বিরাট প্রতিবাদ-সভার আয়োজন চলছে এবং সভার প্রতিবাদেই ব্যাপার শেষ হবে কিনা সন্দেহ।

এরকম একটা ঘটনাকে এতখানি বাড়তে দিতে কর্তারা রাজী ছিল না। সময়টা খারাপ। তাই ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজের খোঁজে একেবারে কলকাতা গিয়ে হাজির হবার কথাটা পাঁচুর মনেও আসে নি। পাকার কথায় সে ভাবে, গেলে দোষ কি ? তার কাছে এ সহরও যা, কলকাতা সহরও তাই। এখানে এক বন্ধুর বাড়ী কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে নয় পাকার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাবে। পাঁচু ভেবে চিন্তে বলে, যাব, একটা যদি কাজ করিস। খুব শস্তা হোটেলে উঠব আমরা—যত শস্তা পাই। আর এটা সেটা কিনে কেটে বড়লোকত্বের ফুটানী চালাতে পারবি না।

পাকা চটে বলে, কত বড়লোক আমি, লাখটাকা রোজগার করি !

—তোর বাবা কাকারা তো বড়লোক।

—আমার তাতে কি ? জেলে গিয়ে বাপ কাকাদের হারিয়েছি। বাবা চিঠি লিখেছে পড়ে দ্যাখ।

ক্ষুব্ধ গম্ভীর অভিমানহত ভীষণ কড়া চিঠি

ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি, তুমি শাসন সংশোধনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছ। অনন্তও আমাকে এই কথাই লিখিয়াছে। ভৈরবও আমাকে জানাইয়াছে যে তুমি যদি এইভাবে চলিতে থাক আমার চাকুরী যাওয়াও আশ্চর্য নয়। সে সত্য কথাই লিখিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমার নিকট প্রশ্রয় পাইয়া পাইয়া তুমি এরূপভাবে বিগড়াইয়া গিয়াছ, আমি তোমাকে একেবারেই শাসন করি না। তোমার মায়ের কথা ভাবিয়া তোমাকে একটি কড়া কথাও কখনো আমি বলিতে পারি নাই, তুমি যা বলিয়াছ যা করিয়াছ তাহাই মানিয়া লইয়াছি। তুমি তাহার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে বসিয়াছ। এই বয়সে তুমি আমাকে পথে বসাইতে চাও, আমার পেনসনের মাত্র আট বৎসর বাকী আমি আর তোমাকে এরূপভাবে তোমার নিজের এবং আমার সর্বনাশের পথে চলিতে দিতে পারিব না। নিজেকে না শোধরাইলে আমি তোমাকে এক পয়সা খরচ দিব না যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর কলিকাতায় কলেজে ভর্তি হইয়া মন দিয়া পড়াশোনা করিবে, কোনরূপ আন্দোলনে যোগ দিবে না অনন্ত আমার পত্রের জবাবে জানাইয়াছে তাহার বাড়ী থাকিয়া কলেজে পড়া অপেক্ষা হোস্টেলে থাকিলেই তুমি বেশী নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিবে। আমিও তাহাই মনে করি তোমার নতুন মা বলিতেছেন গরম ও পূজার ছুটিটা তোমার আমাদের সঙ্গে থাকাই উচিৎ নিজের খেয়ালমত চলিতে চাহিলে নিজের রোজগারে চলিও, আমি তোমাকে একটি কপর্দকও দিব না আশা করি তুমি এতদূর অধঃপাতে এখনও যাও নাই যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে আত্মীয়স্বজনের নিকট অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আমার মাথা হেঁট করিয়া দিবে। এই পত্র পাঠ করিয়া আঘাত পাইলে মনে রাখিও এজন্য আমি দায়িক নহি, সমস্ত দায়িত্ব তোমার। এখনো তুমি সুপথে চলিলে তোমার সুমতি হইলে এ জগতে আমিই সর্বাপেক্ষা সুখী হইব।

—মানে বুঝেছিস পাঁচু ?

—মানে তো সোজা।

—সোজা মানে ছাড়াও আরেকটা মানে আছে, সেটাই আসল মানে।

—আসল মানে আবার কি ?

—বাবা যদি আবার বিয়ে না করত তবে এ চিঠি লিখত না। নিজে ছুটে আসত আমার কাছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যাই লিখে থাক যাই বলে থাক, বাবা গ্রাহ্যও করত না। সোজা আমার কাছে এসে আমার কাছ থেকে বুঝবার চেষ্টা করত আমার মনের গতি কোন দিকে। দেশটাকে স্বাধীন করবার জন্য আমিও আসরে নামতে চাই টের পেলে বাবা চাকরীতে রিজাইন দিত। তারপর হয় সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেত, নয় পলিটিক্‌সে নামত।

পাকা ঝকঝকে দাঁতে হাসে . আমার সঙ্গে নয় কিন্তু। সন্ন্যাসী হোন আর পলিটিক্‌সে নামুন, বাবা কখনো বোকামি করে না। সন্ন্যাসী হলে হিন্দুধর্মের কিছু একটা নিয়ে আন্দোলন করে দুদিনে ফ্যামাস হয়ে যেত, তার ছেলে বলে আমার লাইনে আমি যাতে সুযোগ সুবিধা সম্মান পাই। পলিটিক্‌সে নামলে, রিজাইন দেবার আগে গান্ধীজির সঙ্গে পরামর্শ করে আসত। সরকারী চাকরী ছাড়বে, বাকী জীবনটা গান্ধীজির আদেশে নির্দেশে আশ্রম করে রাজনীতি করে জেল খেটে কাটাবে, কিন্তু তার একটি অল্পবয়সী ছেলে আছে, একটু বামপন্থী একটু উগ্র ছেলেটা, ওই ছেলেটার ভবিষ্যৎ যাতে গড়ে ওঠে সেটাও গান্ধীজিকে একটু দেখতে হবে। বামপন্থী ভাবেই যাতে গড়ে ওঠে।

পাকা বাড়িয়ে বলছে মনে হলেও মোটামুটি বাপের সম্পর্কে তার বর্ণনাটা পাঁচু মেনে নেয়। মানুষটার সম্পর্কে তারও ওইরকম ধারণাই খানিকটা হয়েছিল। সে সায় দিয়ে বলে, সংসারে এইরকমই তো হয়, অবস্থা মানুষকে চালায়। আগে তুই ছিলি যথাসর্বস্ব, এখন তো আর তা নয়। ওঁকে এখন অন্য হিসাব করতে হয়।

পাকা স্থির চোখে চেয়ে বলে, সেই কথাই বলছিলাম। ক'মাসে আমার চোখ খুলে গেছে পাঁচু ! স্নেহ মায়া প্রেম সব ভুয়ো, সব ফাঁকি, সব উপর চালাকি।

পাঁচু হেসে বলে, মাইরি বলছিস্ ? দেয়ালে তবে তোর মাথা ঠুকলো !

পাকাও লাগসই হাসি হাসতে পারে। —শুধু ঠুকলো ? মাথা ফেটে চৌচির। রক্ত আর ঘিলু বেরোয় গলগল করে। আমি হলাম এ যুগের মন্দ ছিন্নমস্তা। আয়নায় মুখ দেখি না পাঁচু। মনে হয় আমার এত ছদ্মবেশ যে তার বেশীর ভাগ

নিজেই চিনি না। এখন আমি যা হয়েছি সেটা মবাব বাডা, নিজেকে নিজে গিলে নিজেব গলা কেটে সং সেজেছি। পাঁচু আমি কি পাগল ? আমাব মাথা কি খাবাপ ছিল, আবও বেশী বিগড়ে গেছে ?

পাকাই পাঁচুকে ডেকে এনেছে তাব আস্তানায়। ভৈববেব বাড়ীব তেতালায় তাব সেই নিবালা ঘুপচি কুঠবিতে। সাফসুফ কববাব যথেষ্ট চেষ্টা চলে, তবু যেন ঘবটা ইতিমধ্যে নিঃস্ব এবং নোংবা হয়ে গেছে। চৌকীব বিছানাব কোণাব দিকে বসায় পাঁচুব দেহে একটা ভিজে ভিজে স্যাতসেঁতে স্পর্শ চুইয়ে চুইয়ে ঢুকছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়। চেয়ে দেখেই বুঝতে পাবে বিছানাব কোণায় চায়েব দাগটা কাঁচা, কাপখানেকেব কম চা পড়েনি নিশ্চয়। সবে গিয়ে পাকাব গা ঘেঁষে বসে পাঁচু কোচায় নাক ঝেড়ে বড বড চুলগুলি দু'হাতে পিছনে ঠেলে দিয়ে। পাঁচুব এই গেঁযো চালচলন স্বভাব সহবেও বয়ে গেছে—একবাব কদমছাঁটা চুল ছেটে দু'চাব মাসে চুল আবাব প্রায় বাববি হয়ে না এলে ছাঁটতে খেয়াল হয় না বলে, তোব কথাব মানে বুঝি না, তবে কি বলছিস বুঝতে পাবি। পাকা, আমি একটু বোকা হাবা চালাকচতুব নই। তুই পাগল হলে আমি কি এতদিন তোব বন্ধু হতে পাবতাম ? একটা গেঁয়ো ছড়া শোন—

বাজায় বাজায় লড়াই খাডিব,
পীবিত বিনাশ মন্দ মাগীব,
চোব পুলিশে সাক্ষাৎ বনে,
পাগল নাচে আপন মনে।

বুঝতে পাবলি ? তুই পাগল হলে অনেককাল আগে আমাব সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে একলাটি গাট হয়ে বসতিস, মনে আপন মনে নাচতিস।

—আমি যে পাগল নই এই হল তাব সার্টিফিকেট ? তোব সঙ্গে সম্পর্ক বজায় বেখেছি বলে ? জানিস পাঁচু তোব একটা আশ্চর্য দিক আছে। নিজেকে চেপে গিয়ে তুই এমনভাবে নিজেব কথা বলতে পাবিস। এই কথাটা আমি বললে শোনাত যেন অহংকাব কবছি। তুই ছড়া দিয়ে এ ভাবে বললি—আমি হলে কিভাবে বলতাম জানিস ? বলতাম তুই পাগল হলে আমি কি তোব সঙ্গে মিশতাম বে পাঁচু ? এই হত আমাব সার্টিফিকেট—আমি যখন তোব সঙ্গে মিশি তোব মাথা নিশ্চয়ই ঠিক আছে।

পাঁচু মন দিয়ে তাব সূক্ষ্ম আত্মবিচাবমূলক কথাগুলি শোনে। বলে, নিজেকে যা তা মনে হচ্ছে না ? আমি বাজে আমাকে ধিক ? খুব কামড়াচ্ছে ভেতবটা ? নিজেকে ছিঁড়ে কুটি কুটি কবে ফেলতে সাধ যাচ্ছে ?

পাকা বলে, না, মোটেই না। মানুষ ফাঁকিব কাববাবে মেতে থাকবে আমি কেন ছোট হতে যাব ? এতদিন বুঝতে পাবি নি সে দোষও আমাব নয়। শূন্য থেকে তো আব অভিজ্ঞতা আসে না ? তুই বুঝতে পাবছিস না। বাবাব স্নেহ টকে গেল, একটা মেয়েমানুষ আমাকে ফাঁকি দিল এতে ছোট হলে আমি ভাবছি না। শুধু আমাব বেলা তো নয় মানুষ এই বিশ্রী নোংবা মিথ্যাটাকে মেনে নিয়েছে। প্রেম ভালবাসাকে খালি বাজাবেব কেনা বেচায় টেনে নামায় নি, ভাঁওতা দিয়ে এই পচা ভেজাল মালটা আসল খাঁটি জিনিস বলে চালাচ্ছে। মুখে প্রেমেব জন্য জয়কাব চালাচ্ছে প্রেমকে আকাশে তুলে দিচ্ছে, কাজেও ভাণ কবছে তাদেব ফাঁকিটাই ওই প্রেম। আমাব জ্বালা এইখানে। আমাব ঘা লেগেছে এইজন্য।

পাঁচু সংশয়ভবে বলে, আসল খাঁটি প্রেম ভালবাসা ? সেটা আবাব তাহলে কি জিনিস ? সংসাবে যেটা আছে সেটা তো ফাঁকি বুঝলাম। যেটা ফাঁকি নয়, সেটা কোথায় আছে ? সংসাবেই যদি না থাকে জিনিসটা, তাব জন্য কেঁদে কবিয়ে জ্বলে মবা কেন ? শ্যামলদা বলেন, সংসাবে মধু আছে, স্বর্গেব সুধা নেই—

পাকা হঠাৎ চটে বলে, পাঁচু, সব বিষয়ে ইয়ার্কি দিস না। জানি সুধাকে তুই যাচ্ছেতাই মনে কবিস, ওটা তোব ভুল ধাবণা। তুই ওকে জানিস না। ও তবু যেখানে উঠতে পেবেছে, আব কোন মেয়ে তা পাবে আমি বিশ্বাস কবি না। আবও উঠতে পাবল না, সে দোষ ওব নয়।

শুনে পাঁচুও চটে যায়, বলে, ক্ষমা চাইছি, জোড় হাতে ক্ষমা চাইছি। সুধা কথাটাই যে তোব একচেটে হয়ে গেছে ভুলে গিয়েছিলাম। স্বর্গেব অমৃত বলা উচিত ছিল।

পাকাব কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায় লজ্জায়। লজ্জা পাওয়া তাব ধাতে ছিল না। অনভ্যাস তাকে আবও কাবু কবে দেয়।

পাঁচুই সদয় হয়ে বলে, থাক থাক, আমাব কাছে লুকিয়ে কি হবে ? কথাটা শেষ কবি আয়। শ্যামলদাব সঙ্গে প্রায় এই প্রেমেব বিষয়টা নিয়ে কয়েকদিন তর্ক কবেছিলাম, তাই দু'চাব কথা বলতে পাবছি, নইলে বিদ্যেবুদ্ধিতে কুলোত না। বলছিলাম কি, মধু যে অমৃত নয়, সেটাই তো ভাগ্যেব কথা। অমৃত হলে দু'চাব ফোঁটা মধু যা পাই তাও জুটত না। কেনা মধুতে মন না উঠলে চাক ভেঙে মধু খেতে গেলে অবশ্য হুল ফোটে—

পাকা সামলে গিয়েছিল, বলে, তুই বুঝতে পাবিস নি। আমি স্বর্গেব সুধা চাই না। মধুকে যাবা স্বর্গেব সুধা বলে চেঁচায় আমি ববং তাদেব গলা টিপে ধবতে চাই। আমি বলছি, মধু থাকতে ভেজালেব কাববাব কেন, ভেজাল মধুকে অমৃত

বলা হয় কেন ?—নইলে কারবার চলবে কি করে ? লোককে ভোলানো যাবে কি করে ? মানুষকে যারা শুষে খাচ্ছে, মানুষ যদি দৈত্যের মত হয় তারা হবে মশার চেয়ে ছোট ! মানুষকে তো ওষুধ খাইয়ে ঝিমিয়ে রাখতে হবে রক্ত খেতে হলে।

—কিন্তু মানুষ তো শুধু ঝিমোয় না। কতদূর এগিয়েছে মানুষ, সভ্যতাকে কোথায় এগিয়ে এনেছে। প্রেম মানুষের সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রেমকে কে সে নিখুঁত করতে পারবে না ? মুখে যে প্রেমের আদর্শের কথা বলে, কাজে সেই আদর্শকে রূপ দেবে না ? আদর্শের জন্য মানুষ হাসিমুখে প্রাণ দেয়। প্রেমের চেয়ে বড় আদর্শ জগতে কি আছে ?

পাঁচু হেসে বলে, তোর হল কি পাকা ? একবার বলছিস প্রেম ভালবাসা সব ফাঁকি, আবার বলছিস জগতে প্রেমের চেয়ে বড় আদর্শ নেই ! প্রেম কি একটা আদর্শ ? শ্যামলদা বলেন, আদর্শ মানেই ন্যায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, ঘৃণা ছাড়া লড়াই হয় না, তাই ঘৃণা ছাড়া আদর্শও হয় না। আদর্শের জন্য লোকে ফাঁসি যায়, প্রেমের জন্য নয়। দেশপ্রেমের জন্য কেউ কোনদিন ফাঁসি যায় নি, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে গিয়েছে—এটা হল আদর্শ। দু'কলিকে ডাকাতে ধরলে ওকে বাঁচাতে আমি প্রাণ দেব, সেটা কি দু'কলিকে ভালবাসি বলে ?

পাকা আশ্চর্য হয়ে বলে, দু'কলিকে ভালবাসিস বলে নয় ? মিছামিছি প্রাণটা দিবি, খেয়ালের বশে ?

—খেয়ালের বশে কেউ প্রাণ দেয় না, ভালবাসার জন্যও দেয় না। দু'কলিকে ডাকাতে ধরলে আমি একটা আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে যাব—ওকে ডাকাতে ধরার অন্যায়টা প্রাণ দিয়েও ঠেকানো উচিত, এই আদর্শের জন্য। ভালবাসাটাই যদি আসল কারণ হত তাহলে যে মেয়েটাকে দু'চোখে দেখতে পারি না তাকে ডাকাতে ধরলে তার জন্যও কেন তবে প্রাণ দিতে যাব ?

—তা কি যাবি ?

—যাব। যদি না যাই, তবে নিশ্চিত জানিস দু'কলির বেলাতেও প্রাণ দিতে কখনো এগোবো না, যতই দু'কলিকে ভালবাসি। অন্য মেয়েটির বেলায় যেমন নিজেকে বাঁচাব, দু'কলিকে ভালবেসে তার বেলাতেও তেমনই প্রাণ নিয়ে পালাব।

—কি যে বলিস তুই পাঁচু ! অন্যের ছেলের জন্য দিতে পারে না কিন্তু নিজের ছেলের জন্য মা কেন প্রাণ দেয় ?

—এত বুদ্ধি নিয়ে তুই এত বোকা পাকা ? সে তো কচি বাছুরের জন্য গরুও প্রাণ দেয়—বাঘের সঙ্গে লড়ে। গরুর কি প্রেম আছে ?

—আদর্শবোধও নিশ্চয় নেই।

—তা নেই। কিন্তু মানুষের আছে। সেইজন্যই মানুষ গরু নয়। বুনো মানুষ সভ্য হতে চেয়েছে, সভ্য মানুষ স্বাধীন হতে, শোষণ শেষ করতে চেয়েছে, এজন্য যেমন যেমন আদর্শ দরকার মানুষের সেই সেই আদর্শবোধ গজিয়েছে। আদর্শবোধ অতি বাস্তব জিনিস। প্রেমও তাই—তবে প্রেম হল আদর্শবোধের একটা লেজুড় মাত্র। সে হিসাবে ঘৃণার লেজুড়টিও কম যায় না। তবে এ ঘৃণাও তোমার এই স্বার্থপরের হিংসা নয়, এ প্রেমও তোমার ওই ফাঁকা প্রেমের আদর্শ নয়।

পাকা কথা বলতে যায়, পাঁচু বাধা দিয়ে বলে, থাম, আরেকটা মজার কথা শোন। শ্যামলদা বলেন প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে গেলে ভদ্রলোক আর ভদ্র থাকে না। হয় ছোটলোক, মানে চাষীমজুর হতে চায়, নয়তো সাধু বনে গিয়ে প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করে। শ্যামলদা আরও বলেন, ভদ্রলোকের প্রেমের স্বপ্ন ভাঙবেই।

—শ্যামলদা বুঝি তোর গুরু ?

—আমার গুরু নেই। নটবর গোঁসাই আমাদের বংশের গুরু, তাকে দেখে আর তার কাণ্ডকারখানা দেখে এ জন্মের মত গুরু ছাঁটাই করে দিয়েছি।

পাকা ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। বাইরের ছটফটানি তার আশ্চর্য রকম কমে গেছে। পথ খুঁজে পেয়েছে, তার চোখ খুলে গেছে, তবু তার হৃদয় মনের সমুদ্রে ঝড়ো তোলপাড় থামে না। তার বাইরের বাহ্যিক উদ্দাম দুরন্তপনা যেন কয়েক মাসে অন্তরে আন্তরিক হয়েছে। কি হল, কেন হল, ফাঁকিটা কোথায়, সত্যটা কি—সে অবিলম্বে জানতে চায় বুঝতে চায়। নিজে নিজে একা একা জানতে বুঝতে চায়। তার একদণ্ড বিলম্ব সইবে না। সুধা তাকে ত্যাগ করেছে। একে ত্যাগ করাই বলে। সুধা তাকে চিঠি লিখেছে যে তাকে দেখতে না পেলে সে পাগল হয়ে যাবে, তার জন্য রোজ সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। পাকা জানে, সে যদি আজ কলকাতা যায়, সুধা হেসে কেঁদে পাগলের মতই তাকে সাগ্রহে বরণ করে নেবে, বুকে চেপে ধরে রেখে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলোবে, ঘন ঘন তার চুলের গন্ধ গায়ের গন্ধ নিশ্বাসে টেনে নেবে। পরামর্শ করবে কি করে তাদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এটা তো আসল কথা নয় ! এতই যদি ভালবাসে সুধা তাকে, তার জন্য অনন্তকে চিরকালের মত ছাড়তে পারল না কেন, তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারল না কেন ? অনন্ত আসবার দু'দিন আগে সে দু'খানা নাগপুরের টিকিট কিনেছিল। সুধা তার প্রস্তাব শুনে হেসে বলেছিল, যাঃ, পাগল নাকি ? তাই কখনো হয় !

সুধা যদি তাকে না দেখলে পাগলই হয়ে যাবে, দূরদেশে গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা দু'চোখ ভরে তাকে দেখার ব্যবস্থা করায় এই সুধাই কেন তাকে পাগল বলেছিল ?

তার টাকা নেই। সুধাকে সে খাওয়াতে পরাতে পারবে না। প্রথমে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি যে সুধা সত্য সত্যই তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত সে যাবে ধরে নিয়েই সে বলেছিল, গয়না গাঁটি সব খুলে রাখো। এক কাপড়ে আমার সঙ্গে চলো।

সুধা বলেছিল, পাগল নাকি? সেখানে কি অবস্থা হবে?

বুকটা জ্বলে যায় পাকার, কিন্তু সজ্ঞানে সে তো আত্মপ্রতারণা শেখে নি, নিজের কাছে তাকে স্বীকার করতে হয় যে সুধা সত্য কথাই বলেছিল। এক কাপড়ে দু'জন তারা নাগপুরে পালিয়ে গেলেই তো হবে না, তারপর কি হবে এ প্রশ্নও আছে।

তারপর কি হবে এ একটা সমস্যা বটে। সেজন্য পাকার জ্বালা নয়। কারণ, সমস্যাটা মেনে নিয়েও সে সমস্যাটার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল। সমস্যাটা সে বাতিল করে নি, উড়িয়ে দেয় নি। ঠিক করেছিল, তারপর যা হবার হবে। সে কুলি খাটবে, ভিক্ষা করবে, দু'জনে তারা গাছতলায় মাথা গুঁজে বাঁচবার চেষ্টা করবে—না পারলে মরবে। সুধা কেন তার সঙ্গে এখানে উঠতে পারল না? ভয়ঙ্কর দুঃখ কষ্ট মরণের ভয় কেন তাকে অনন্তের সঙ্গে এই কুৎসিৎ বীভৎস আপোষের পথে নামিয়ে দিল? তারা কি মনে প্রাণে এক হয়ে যায় নি? তারা কি এমন ভাবে ভালবাসে নি জগতে আর কোন দু'জন যে ভালবাসার, উগ্র মধুর ঘন গভীর স্বাদ কল্পনাও করতে পারে না?

অথবা সবটাই ফাঁকি, স্বপ্ন? সব ভালবাসাই এই রকম? পাঁচু আর দু'কলি হয় তো তাদের চেয়েও তীব্র ভাবে গভীর ভাবে এই ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে। ওরা সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাপারটা বোঝে বলে এতেই সুখী আছে, সে বোকা বলেই অসম্ভব অবাস্তব কামনা নিয়ে মিছেমিছি ব্যাকুল হয়েছে।

প্যাঁচ আছে। নইলে সুধার সঙ্গে মিলনের কোন বাস্তব বাধা সত্যই তো নেই। বাবাকে একটি মিষ্টি চিঠি লিখে কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে প্রতিদিন সুধার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা সে অনায়াসেই করতে পারে। কিন্তু কথাটা ভাবতেও মনটা তার ।৫ রকম কুঁকড়ে যায়। যেন আত্মহত্যার কথা ভাবছে।

কিন্তু বাবাও তাকে ত্যাগ করল? সে জানে, ত্যাগ বাবা তাকে করে নি, কিন্তু এ যে ত্যাজ্যপুত্র কবার চেয়ে কদর্য ব্যবহার। এতকাল তার অন্য সমস্ত আবোল তাবোল পাগলামি সহ্য হল, শুধু সহ্য হল না জেলে যাবার এই মহৎ পাগলামি, চাকরি আর পেনসনের ক্ষতি হবার ভয়ে। তার খরচ বন্ধ করে তাকে ভাল ছেলে করার হুমকি এল! বাপের সঙ্গেও তবে কি ছেলের শুধু টাকাব সম্পর্ক?

পাঁচু চলে যাবার পর তেতালার নিজের বেছে নেওয়া ছোট কুঠরিটায় একা হয়ে পাকার ব্যাহত হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়। যেহেতু সে ব্যাকুল হয়েছে আসল মানে জানবার আর বুঝবার জন্য, সেই হেতু পাঁচুর কথাগুলি সে একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে শুনেছে, বিচার করেছে। পাঁচুর কথা কেন, দীঘির ধারের কোন গাছের ডালে কোকিল টৌকিল কোন একটা পাখীর ডাক কাণে বিঁধলে সে গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করবে, পাখীর ডাকের এই অদ্ভুত প্রভাবের মানেটা কি, মানুষ কেন পাখী নিয়ে কবিতা লিখেছে, স্কুলে তাকে যে কবিতা নোটের মানে শুদ্ধ মুখস্থ করতে হয়েছে পরীক্ষা পাশের জন্য।

পথ খুঁজে পেয়েছে, পথ! সারা ভারতে বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যে সুবু করে সে নিজের বিরাট ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে, উপর তলার কৃত্রিম কুৎসিৎ ফাঁকিভরা রাজনীতিকে গরীব পদানত মানুষের সত্যিকারের রাজনীতিতে দাঁড় করাবে! বাপের একটি চিঠিতে নতুন পথের কল্পনা তার স্বপ্নের মতো অবাস্তব হয়ে গেল।

খরচ বন্ধ হলে আন্দোলন চালাবে কি করে?

আবার মাথা [হেঁট] করে ভাল ছেলে হতে গেলেও এ সব দুর্বুদ্ধি তাকে ছেড়ে দিতে হবে!

এ রকম অবস্থাও সম্ভব হয়? তার এত বড় আদর্শ, ভবিষ্যতের এমন বিরাট কল্পনা সব শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছিল বাপকাকার কাছে মাসে মাসে কিছু খরচ পাবার ওপর?

পাকার চোখে জগতটা নতুন রকম ঠেকছে। হঠাৎ বয়স যেন তার অনেক বেড়ে গেছে—বছর দিয়ে যার হিসেব হয় না।

আত্মীয়-স্বজনের কাছে খরচ নেওয়ার ওপর তার বেছে নে৩য়া ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—এই কি তবে চরম হিসাব? পাকা তো তা মেনে নিতে পারবে না। ভুল হোক, গোঁয়ার্তুমি হোক, বোকামি হোক, এই চরম বাস্তব হিসাবটাকে অস্বীকার তাকে করতেই হবে। সেজন্য যদি তাকে ধ্বংস হয়ে যেতে হয়, ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা ছেলে ধ্বংস হয়ে গেলে কি আসে যায় জগতের?

নিকট বা দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়, কোন আত্মীয়ের চেনাজানা কোন বন্ধুবান্ধব কারো কাছে একটি পয়সা সাহায্য না নিয়েই সে নিজের ভবিষ্যৎ গড়বে। কি করবে এখন কিছুই জানে না। সামনে মিশকালো অন্ধকার। মরণপণ করে সে এই অন্ধকারকে জয় করবে।

ভৈরবের সেজ মেয়ে সরযূ ছাড়া এ বাড়ীতে পাকার দিকে এখন কেউ ফিরেও তাকায় না, সকলের ব্যবহারেই একটা তিরস্কার ভরা অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব। বড় মেয়েটাকে বড় ঘরে দেবার ফল দেখে সরযূর জন্য ভৈরব গরীবের ছেলে এনে ঘরে রেখেছিল। রাত্রে সরযূর প্রতীক্ষায় তার বর বই পড়ে সময় কাটাত—অল্পদিন আগেও। ভৈরবের সঙ্গে ঝগড়া করে হঠাৎ একদিন সে চলে গেছে—আজ পর্যন্ত তার একটা খবর পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ঝগড়ার কারণ, সে এ বাড়িতে থাকবে না, সরযূকে নিয়ে ভিন্ন বাড়িতে স্বাধীন সংসার পাতবে !

পাকাকে সরযূ বলে, চা খেতে ভাত খেতে তুমি নীচে যেও না। আমি ঘরে এনে দেব।

—কেন ?

—তোমার একটু তেজ দেখানো হবে। এ বাড়ীর মানুষগুলি ছোটলোক, ওনাকে গাল দিয়ে অপমান করে তাড়িয়েছে। বজ্জাতদের সঙ্গে তুমি কথা বলো না।

সরযূ আবার চুপি চুপি বলে, পিসেমশাই বাবাকে যে চিঠি লিখেছে, আমি সেটা পড়েছি ভাই। তোমায় যেন কেউ একটি পয়সা না দেয়, তোমার ভালর জন্য তোমাকে কিছুদিন কড়া শাসনে রাখা দরকার, এই সব কথা। ছি ! ধিক ! তোমাকেও এরা তাড়াতে চায় !

সরযূ কাঁদে। পাকা চুপ করে থাকে। তার কান্নার প্রতিকার করার ক্ষমতা তার নেই। ভাব মনে হয়, সে এমন একটা জগতে বসে একজনের কান্না শুনছে যে জগতটা সব দিক দিয়ে দেউলে হয়ে যেতে বসেছে।

দু'দিন পরেই পাকা পাঁচু আর দু'কলি কলকাতা রওনা হয়ে যায়। পাঁচু কানাই-এর কয়েকটা টাকা ধার করে। পাকা ধার করে তিনুর কাছে !

তিনু একদিন তার বন্ধুদের দোকানের অনেক তামাক খাইয়েছে। পাকা মাঝখানে সিগারেট টানত, এখন আবার পাঁচুর মত বিড়ি খায়। মিছামিছি কতগুলি ধোঁয়া গিলে সুখ পাবার দুর্বলতাকে কানাই প্রশ্রয় দেয় না। তিনু আজকাল তামাক খায়, অবিকল বাপের ভঙ্গিতে ! একটু যেন মোটা হতে সুরু করেছে তিনু।

দোকানটা অনেক বদলে গেছে। একজোড়া তক্তপোষে শুধু তেল নুন ডাল মশলা মুড়ি চিড়ে এইসব মুদিখানার জিনিস সাজিয়ে দোকান পেতেছিল, তিনু দোকানটি নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছে। টিনের নীচু চাল উঁচু করিয়ে, ঝাঁপের বদলে কাঠের ভাঁজ দেওয়া দুয়োর লাগিয়ে, সিমেন্ট দিয়ে উঁচু ভিত বাঁধিয়ে, সারি সারি কাঠের তাক বসিয়ে আর মুদিখানার জিনিস ছাড়াও হরেকরকম মনোহারি মাল রেখে একেবারে নতুন চেহারা করে দিয়েছে দোকানটার। তিনুর বাবা অল্প অল্প জিনিস এনে বেচত, তিনু একেবারে বস্তা হিসাবে ডজন হিসাবে পাইকারী ব্যবস্থায় মাল আনায়।

পাঁচুর প্রশংসায় খুশি হয়ে তিনু বলে, বাবার জ্ঞান বুদ্ধি নেই মোটে। দোকানটা একটু বাড়াবে, তা নয়, লাভের টাকা জমলে মেঝেতে পুঁতে রাখত ! ব্যাঙ্কে রাখলে তবু দুটো পয়সা সুদ মিলত, ভয় কিনা যে ব্যাঙ্ক যদি ফেল পড়ে ! আমি কি ছাই জানতাম এত টাকা আছে ? আমার বিয়ের ক'দিন পরে বলে কি, কবে মরে টরে যাই হঠাৎ, তোকে হিসেবটা বুজিয়ে রাখি তিনু, লায়েক হয়েছিস। বললে বিশ্বাস করবি না পাঁচু, তিন ঘড়া কাঁচা টাকা বার করলে ! ভাব দিকি একবার, টাকাগুলো ওমনি করে আটকে না রেখে দোকানে লাগালে অ্যাদ্দিনে কতটাকা কামাই হত ? পাড়ায় একটা বড় দোকান নেই, ভাল একটা সাবান কিনতে সেই বাজারে ছুটতে হয়, দোকান বাড়ালে হু হু করে মাল কাটবে। এটা কি সহজে বুঝতে চায় ? কত লড়াই করে এক ঘড়া টাকা দিতে রাজি করিয়েছিলাম। তাও সব সময় খালি হায় হায় করত, গেল গেল সব গেল, ছেলে সব ডুবিয়ে দিল। এখন মালের কাটতি দেখে মুখে হাসি ফুটেছে।

তিনু সস্নেহে দোকানের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। বলে, আরও বাড়াব দোকান, কলকাতা থেকে মাল আনাব। দু'চার বছর পরে এ দোকানটা বাবার হাতে দিয়ে বাজারে বড় একটা দোকান খুলব।

টাকা তিনু ধার দেয়। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখে, টাকা পেলেই ফেরত দিস ভাই। দোকানে অনেক টাকা ঢেলেছি, বাজার সুবিধে নয় !

শস্তা হোটেলেই তারা ওঠে কিন্তু একদিনের বেশী সেখানে থাকে না। সহরের শস্তা উপ-এলাকায় জীর্ণ পুরনো একতলা বাড়ীর দুটি ছোট ছোট কুঠরি ভাড়া নিয়ে তারা উঠে যায়। হোটেলের চেয়ে এ ব্যবস্থা ভাল—কম খরচ। মাটির হাঁড়ি লোহার কড়াই কিনে পাতায় খেয়েও সংসার পাতা যায়—রাঁধবার জন্য দু'কলি আছে। অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং চরম রকমের অনিশ্চিত, অথচ তিনজনেই একটা খাপছাড়া যুক্তিহীন আনন্দ ও উৎসাহের জোয়ার অনুভব করে। এটা তিনজনেই চেপে যাবার চেষ্টা করে, কারণ ধার করা সামান্য টাকার মোটা অংশ ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে, এ অবস্থায় এ রকম মজা লাগাটা উচিত নয়। কিন্তু এ বয়সে নতুন জীবন সুরু করার ভূমিকায় জাগা উল্লাস কি চাপা যায় ?

পাঁচু কাজ খোঁজে। পাকা উপায় খোঁজে। সারাদিন তারা বাইরে ঘোরে।

পাকা একদিন সকালে বেরিয়ে এগারোটার মধ্যে ফিরে আসে। দু'কলিকে বলে, আমার একটা মোটামুটি ব্যবস্থা হল।

দু'কলি খুশি হয়ে সাগ্রহে বলে, কি হল ?

পাকা একজন খ্যাতনামা রাজনীতিকের নাম করে, দু'কলি অবশ্য তার নাম শোনে নি। অনন্ত তার নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী, ইতিমধ্যে দু'জনের দু'এক চোট সংঘাত হয়ে গিয়েছে। পাকা সেটা হিসেব করেই তার কাছে গিয়েছিল। সুখের বিষয় ভদ্রলোক অনন্তের সভায় পাকার চমকপ্রদ বক্তৃতা আর শোভাযাত্রার হাঙ্গামায় জেলে যাবার ব্যাপারটা জানত, পাকাকে নিজের মুখে জানাতে হয় নি। তার পরিচয় শোনা মাত্র অত্যন্ত খুশি হয়ে বলে, তুমিই সেই ছেলেটি নাকি ? বেশ বেশ। এই তো চাই !

পাকা তাকে সব জানায়—কি ভাবে কোথা থেকে সে কোথায় এসে ঠেকেছে তার বিবরণ এবং তার রাজনৈতিক উচ্চাশার কথা পর্যন্ত। আলাপ আলোচনা বিচার বিবেচনার পর ঠিক হয়েছে, পাকা তার ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে পড়াবে, তার সাধারণ চিঠিপত্র লেখা, খবরেব কাগজের কাটিং রাখা এই সব ছোটখাট কাজও কিছু কিছু করবে। নিজে কলেজে পড়বে, ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলবে। ভদ্রলোক নিজে তাকে রাজনীতি শেখাবে।

হ্যাঁ, অনেক কিছু তোমাকে শিখতে হবে বাপু। হঠাৎ লাফিয়ে রাজনীতিক হওয়া যায় না। হওয়া উচিতও নয়। অন্য সব কিছুর মত রাজনীতিও শিখতে হয়, মাথা ঘামিয়ে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তুমি যদি লেগে থাকো, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তুমি দেশের মস্ত নেতা হবে, তোমাকে দিয়ে দেশের অনেক কাজ হবে।

পাকা হাসে, মানুষটা খুব বুদ্ধিমান, অথচ এমন সরল সহজ কথাবার্তা ব্যবহার, আমার খুব ভাল লেগেছে দু'কলি। বললেন কি জানো ? দেশের যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজিকে খুব বড় স্কেলে একটা আন্দোলন আরম্ভ করতেই হবে। হয়তো এবারেই শেষ আন্দোলন, আমাদের জয় হবে, বৃটিশ এদেশ ছেড়ে যাবে। যে সময় আছে আমি যদি তার মধ্যে একদল ছাত্রকেও গড়ে তুলতে পারি—

পাঁচু ফেবে সন্ধ্যাব সময়। পাকাব সব বিবরণ শুনে বলে, শেষ আন্দোলন ? আমার কিন্তু খটকা আছে। তা যাক গে, সুখবব আছে, আমিও একটা কাজ পেয়েছি।

দু'কলিব মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পাকা ও দু'কলি প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞাসা কবে, কি কাজ ?

—কাবখানায়।

—কারখানায় ? কাজটা কি ?

—মজুরের কাজ।

পাকা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

পাঁচু হেসে বলে, ছিলাম চাষা, হলাম মজুর !

সমাপ্ত : প্রথম ভাগ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবকুলপুরের যাত্রী গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত মেজাজ গল্পের তিনটি পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা।

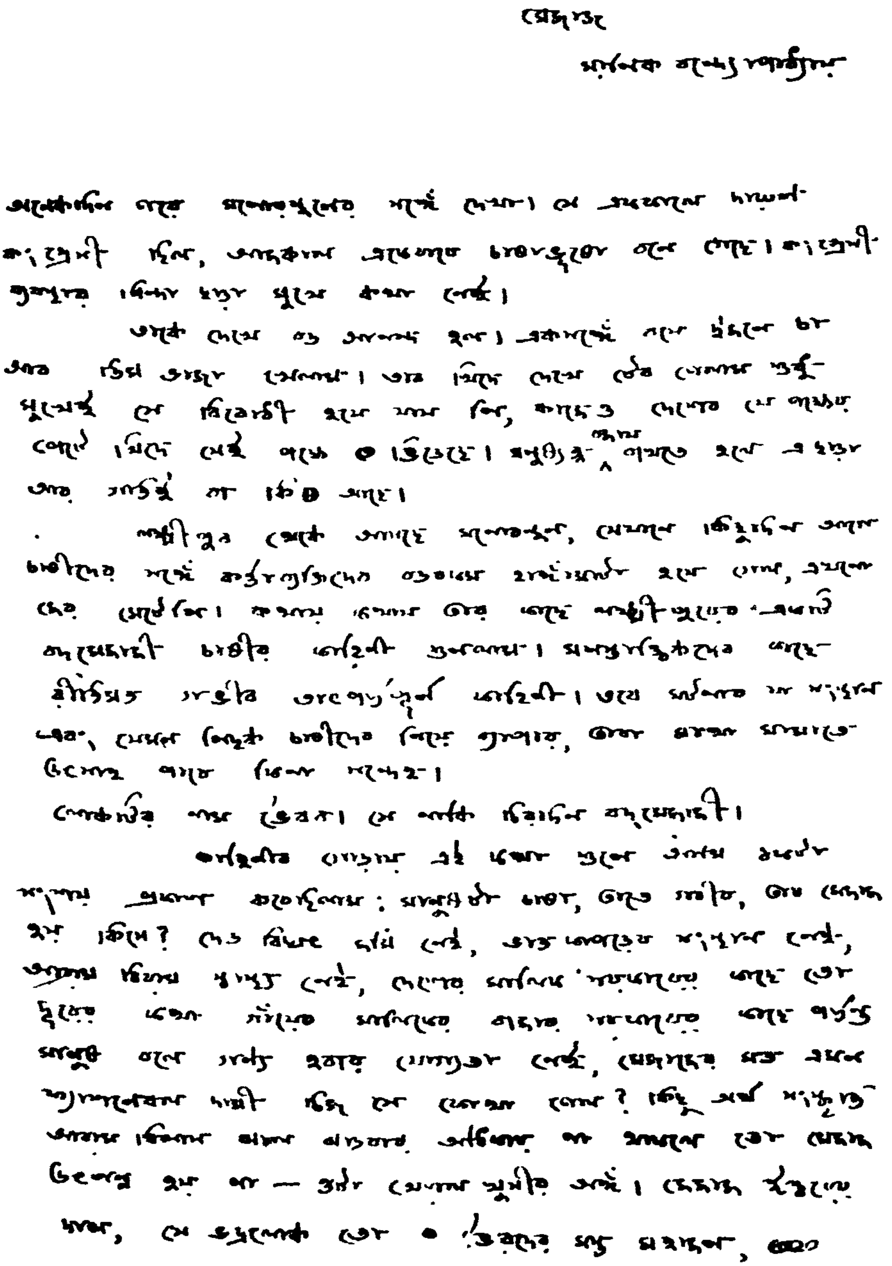
মেজাজ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রেলস্টেশনের সম্বন্ধে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করে প্রাণের সুখ আমার পাইনে — ট্রেনের উপর আমার মোটেই ভরসা নেই এখনও [illegible] তিনি স্থির হন, [illegible]। ট্রেনকে তিনি মোটেই [illegible] খেয়াল রেখে, এখনই না ছেড়ে যায় যেন?

প্রত্যেক বুড়ো ভদ্রলোক খুব [illegible] রেখেছিলেন।— ওর কাজী [illegible], [illegible] সবুর। [illegible] কিছু [illegible], [illegible] [illegible] তার [illegible], [illegible] করতে পারেন না।

সবাই গেলো ট্রেনের কামরাগুলোর দিকে। [illegible] লোককে ঠেলিয়ে একেবারে সে [illegible] [illegible]। মোটা মোটা হাত, [illegible] [illegible] চেহারা, বেশ [illegible] নীচে একজোড়া [illegible] [illegible] [illegible] চোখ। একমুহূর্ত তাকালে তার [illegible] দু হাত। [illegible] [illegible] এ জন্য [illegible] [illegible] কোন [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। প্রত্যেক হাত [illegible] কাছে [illegible] [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চোখ [illegible] আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি যেন [illegible] খেয়ে যায়, [illegible] যায় তার তোমায়। দেখলে ভয় করে!

কম বেশী ভয় তাকে সকলেই করে — [illegible] লোক থেকে পুলিশের লোক পর্যন্ত। কারণ, সকলেই জানে তার স্বভাব [illegible], সে প্রতিশোধ। [illegible] সে ছাড়ে না, [illegible] তার [illegible] হাতিয়ে যখন উপরতলায় পৌঁছে যায়

[illegible]
[illegible]
[illegible]।

[redacted]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ?

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] ?
[illegible] ?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেকটর পদে পিতার চাকরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

তবে আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লেখার আগেই লিখিত, কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশোটি কবিতা-লেখা সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতর পাওয়া গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেকী' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'ব্যথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন'-নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয় ; ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষ পর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য'-নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর-পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy-র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন—চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস—'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে যোগদান ; 'বঙ্গশ্রী'-র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু ; পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী, প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী'—'সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ' ; সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচার ও আরও নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব'-নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছরে, বা পরবর্তী বছর, উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

২৫-২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প'-পর্যায়ে ভাষণদান।

অক্টোবর-ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সঙ্গীতকার-বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার ভাষণ।

প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ ;

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল-মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি : উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ : গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন—'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে।
চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'—২৮ জুলাই মুক্তি পায়।
একমাত্র গ্রন্থ, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্যে এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।
'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।
ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'—চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।
১১-১৫ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।
প্রকাশিত গ্রন্থ 'নাগপাশ' 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'—চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।
বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।
প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি উপন্যাস 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।
বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দু' মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।
একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প-সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।
২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।
৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যুষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।